প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮
ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে ঃ
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা

পরমারাধ্য ৺পিতৃদেবের শ্রীপাদপদ্মে

সূচীপত্র

ভূমিকা

বঙ্কিমের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'সাহিত্য কর্মযোগী' আখ্যা দিয়াছেন। উপন্যাস ও সমালোচনা-সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ, গুরুগম্ভীর গবেষণা এবং লঘুহাস্য ও ব্যঙ্গরচনা—সর্ব্বত্রই বঙ্কিম তাঁহার অসামান্য প্রতিভার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায়, 'বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুরভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।'[১] বঙ্কিমের এই বহুমুখী প্রতিভার বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে; ইহার পরিধি তাঁহার উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (প্রকাশকাল ১৮৬৫ খ্রীঃ)। ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র পূর্ব্বে কলেজে পাঠ্যাবস্থায় বঙ্কিম একখানি বাংলা উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।[২] ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন, 'অষ্টাদশ-বর্ষ বয়সে বঙ্কিম একটি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন' এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্ব্বে তিনি একখানি নহে, দুইখানি বাংলা উপন্যাস রচনা করেন।[৩] কিন্তু সে গল্প বা উপন্যাস পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং 'দুর্গেশনন্দিনী'ই বঙ্কিমের প্রথম বাংলা উপন্যাসের মর্য্যাদা দাবী করিতে পারে। 'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ' (Rajmohan's wife) ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বের রচনা,[৪] কিন্তু মাইকেলের 'ক্যাপ্‌টিভ্ লেডি'র (Captive Ladie) ন্যায় ইহাও ইংরেজীতে রচিত।

'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ'এ বঙ্কিমের রোমান্স প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়; ইহা রোমান্সবহুল গার্হস্থ্য উপন্যাস। মাধব ঘোষের বাড়ীতে ডাকাতির

১ বঙ্কিমচন্দ্র—আধুনিক সাহিত্য, ১২ পৃঃ।

২ বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩ ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র', প্রথম খণ্ড, ১৮৯-৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪ Rajmohan's wife-এর (শতবার্ষিক সংস্করণ) Preface দ্রষ্টব্য।

আয়োজন, মাতঙ্গিনীর দুঃসাহসিক চেষ্টায় ইহার ব্যর্থতা, চোরাকুঠরিতে মাতঙ্গিনী ও মাধব ঘোষের বন্দিদশা ও তাহাদের মুক্তি সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম না করিলেও দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাহিরে।

মাধব ঘোষের অন্দরমহলের বর্ণনায় 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথের অন্দর-মহল বর্ণনার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায় এবং কলসীকাঁখে মধুমতী হইতে প্রত্যা-বর্ত্তনের পথে ক্ষণিকের জন্য মাতঙ্গিনীর অবগুণ্ঠন উড়িয়া যাওয়া এবং এই ক্ষুদ্র ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া তাহার জীবনে বিপর্য্যয়—ঘটনার এইরূপ পরিকল্পনা এবং পরিবেশন তরুণ বঙ্কিমের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া, মাতঙ্গিনীর তৎপরতায় আসন্ন বিপদ হইতে মাধব ঘোষের উদ্ধারের পর তাহার নিকট হইতে মাতঙ্গিনীর বিদায়ের চিত্র ক্ষীণ হইলেও, আমরা পরিণত বঙ্কিমের কিছুটা আভাস পাই। যাহা হউক, ইংরেজীতে রচিত বলিয়া এই উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয়ভূত নহে। বাঙ্গালী পাঠকের নিকট 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতেই বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক জীবনের আরম্ভ।

'দুর্গেশনন্দিনী' একদিন পাঠকসমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া-ছিল। এই চাঞ্চল্যের কারণ ইহার অভিনবত্ব। এই অভিনবত্ব তথা বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে প্রাক্-বঙ্কিম উপন্যাস-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

অতীতের সাহিত্যে পূর্ব্বাভাস থাকিলেও বাংলা উপন্যাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি; প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবেই ইহার জন্ম। প্রথম হইতেই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য প্রধানতঃ দুইটি বিশিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়াছে। এক শ্রেণীর আখ্যায়িকায় ঐতিহাসিক কাহিনীর সহিত কম বেশী কাল্পনিক কাহিনী বা কিংবদন্তীর মিশ্রণ রহিয়াছে। এবং ইহারই পার্শ্বে রহিয়াছে এমন কতকগুলি আখ্যায়িকা যাহাতে পাত্রপাত্রীর ইতিহাস-ঘেঁষা নাম এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্য বা নগরের ভৌগোলিক নাম বাদ দিলে বাকী সবটাই অর্থাৎ সমগ্র বিষয়বস্তুই কাল্পনিক। অর্থাৎ, এই সকল আখ্যায়িকায় ইতিহাসের অনুকরণ রহিয়াছে, কিন্তু ইতিহাস নাই। এই উভয়বিধ আখ্যা-য়িকাই দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের সহিত নিঃসম্পর্কিত কোন দূর অতীতের বা নিছক কল্পনার জগতের সম্ভব ও অসম্ভব রোমান্টিক কাহিনী লইয়া রচিত এবং এই হিসাবে ইহারা সমগোত্রীয়। দ্বিতীয় এক শ্রেণীর আখ্যায়িকায় ইতিহাস বা ইতিহাসের ভান নাই, আছে সমসাময়িক সমাজ-জীবন বা গার্হস্থ্য-জীবনের চিত্র। প্রথম শ্রেণীর আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশের ফলে ঐতিহাসিক

উপন্যাসের স্বষ্টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কাহিনীর পরিণতি সামাজিক বা গার্হস্থ্য উপন্যাসে।

ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার প্রথম দিকের নিদর্শন হিসাবে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র (১৮০১ খ্রীঃ) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রতাপাদিত্যের বংশ পরিচয়ের পর তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক কাহিনীর সহিত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য কিংবদন্তীর মিশ্রণ রহিয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা, উপন্যাস নহে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্ব্বে একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস শ্রদ্ধেয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র অন্তর্গত 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (প্রকাশকাল ১৮৬২ খ্রীঃ); ইহাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্য্যাদা দাবী করিতে পারে।

যে সকল কাল্পনিক আখ্যায়িকায় ঐতিহাসিকতার ভান রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে রামগতি ন্যায়রত্নের 'রোমাবতী' (১৮৬২ খ্রীঃ) এবং গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়বল্লভ' (১৮৬৩ খ্রীঃ) উল্লেখযোগ্য। 'বিজয়বল্লভে'র 'বিজ্ঞাপনে' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 'ইংলণ্ডীয় ভাষায় নবল নামে মনোহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকল যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকে, সেই প্রণালী অনুসারে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে।' কিন্তু ইংরেজী উপন্যাসের প্রণালী অনুসরণের প্রয়াস থাকিলেও 'বিজয়বল্লভ' এবং 'রোমাবতী' রোমান্স, রোমান্টিক উপন্যাস নহে। উভয় আখ্যায়িকাতেই রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ রহিয়াছে। কিন্তু কাহিনীগুলি খণ্ডচ্ছিন্ন এবং রূপকথার ছাঁচে ঢালা। উভয় আখ্যায়িকাতেই রূপকথার কুখ্যাত বিমাতা রহিয়াছে এবং উভয়ক্ষেত্রেই সপত্নীপুত্রের প্রতি ঈর্ষ্যা নায়কের জীবনে বিপর্য্যয়ের কারণ। উভয় আখ্যায়িকাতেই নায়ক-নায়িকার মিলনে কাহিনীর পরিসমাপ্তি এবং বিমাতার জীবন্ত সমাধি না হইলেও বিজয়বল্লভের বিমাতার মৃত্যু হইয়াছে বজ্রাঘাতে এবং 'রোমাবতী'র নায়ক রঞ্জনের বিমাতার মৃত্যু হইয়াছে উন্মাদ অবস্থায় আত্মহত্যায়। কোন আখ্যায়িকাতেই চরিত্রাঙ্কনের প্রয়াস নাই।

'বিজয়বল্লভে'র আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, 'বঙ্কিমের রচনায় বিজয়বল্লভের অল্পস্বল্প প্রভাব আছে মনে করি।' দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি 'বিজয়বল্লভে'র বিন্ধ্যাচলবাসী তান্ত্রিকের সহিত 'কপালকুণ্ডলা'র কাপালিকের এবং বিজয়বল্লভের স্বপ্নের সহিত কুন্দের স্বপ্নের সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।[১] এই প্রসঙ্গে আখ্যায়িকার পরিবেশন সম্বন্ধে অপর এক

১ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ), ১৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সাদৃশ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে: 'বিজয়বল্লভে' যে কারণে আখ্যায়িকায় জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা, অর্থাৎ অযোধ্যার জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর পরামর্শে দুর্ব্বৃত্ত পাতঙ্গি কর্ত্তৃক সপত্নী চন্দ্রাবতীর গর্ভজাত শিশুপুত্রের সর্পদংশনের ব্যবস্থার কথা আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তির দিকে আত্মহত্যার পূর্ব্বে পাতঙ্গি কর্ত্তৃক লিখিত পত্রে বিবৃত হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বীরেন্দ্রসিংহ এবং বিমলার সম্পর্কের পরিচয় দিতে যাইয়া বঙ্কিম অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন ; আমরা এই পরিচয় পাই কাহিনী অনেকটা অগ্রসর হইবার পর জগৎসিংহের নিকট লিখিত বিমলার পত্রের মাধ্যমে।

ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী রহিয়াছে: 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। ভূদেব লিখিয়াছেন, "ইংরাজীতে 'রোমান্স অব হিষ্টরি' নামক একখানি গ্রন্থ আছে,[১] তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফল স্বপ্ন' নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।" (বিজ্ঞাপন)। ভূদেব উপন্যাস আখ্যা দিলেও 'সফল স্বপ্ন' নিতান্ত ক্ষুদ্র কাহিনী, ইহাতে না আছে উপন্যাসের আয়তন, না আছে ছোট গল্পের আঁট। কিন্তু প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। ইহার গল্পাংশ এইরূপ:

শিবজীর অনুচরগণ একদা আরঙ্গেব বাদশাহের কন্যা রোসিনারাকে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রমকালে অপহরণ করিয়া শিবজীর দুর্গে লইয়া আসিল। সেখানে তিনি 'মহাসম্ভ্রমসূচক' ব্যবহার পাইলেন এবং শিবাজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন যে, বাদশাহের সহিত 'স্থিরসৌহার্দ' স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহাকে নিজের দুর্গে আনিয়াছেন। ক্রমে রোসিনারা শিবজীর যত্ন এবং অমায়িক আচরণে মুগ্ধ হইলেন। শিবজীও তাঁহার প্রণয়াসক্ত হইলেন। একদিন এক সেনানী বাদশাহজাদীর রূপমুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করিল। শিবজী তাহাকে প্রকাশ্যে শাস্তি না দিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং যুদ্ধান্তে পরাজিত সেনানীর মৃতবৎ দেহ দুর্গের বাহিরে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু শিবজী নিজেও

১ Rev. Hobart Counter প্রণীত 'The Romance of History'। ইহার প্রথম কাহিনী The Traveller's Dream অবলম্বনে 'সফল স্বপ্ন' রচিত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র আখ্যানবস্তু গৃহীত হইয়াছে তৃতীয় ভলুমের 'The Mahratta chief' হইতে। শেষোক্ত উপন্যাসে ভূদেব মূল কাহিনীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করিয়াছেন। স্থানান্তরে তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিব।

এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত হইলেন। রোসিনারা এই সময় তাঁহার শুশ্রূষা করেন। এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে শিবজী তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে রোসিনারা একটি 'পারশ্য কবিতা' আবৃত্তি করিলেন, যাহার অর্থ এই যে গুরুজনের অসম্মতিতে বিবাহ করিলে সে বিবাহের ফল শুভ হয় না। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও জানাইলেন, যে, পিতার অনুমতি লাভের উপায় থাকিলে তিনি সুখী হইবেন।

মৃতকল্প সেনানী সংজ্ঞালাভ করিয়া আরঙ্গেবের সেনাদলের শিবিরে উপস্থিত হইল এবং মোগলের সহিত চক্রান্ত করিয়া প্রথমে শিবজীর উদারতার সুযোগ লইয়া তাঁহার ক্ষমা লাভ করিল. পরে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক মোগল সেনাবাহিনীকে রাত্রির অন্ধকারে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করাইল। শিবজী অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত হইলেন। দুর্গত্যাগের প্রাক্কালে রোসিনারার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বিদায়ের মুহূর্ত্তে রোসিনারা তাঁহাকে জানাইলেন, যদি কখনও পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাঁহারই।

আরঙ্গেব এইরূপ সংবাদ পাইলেন যে পলায়নকালে শিবজীর মৃত্যু হইয়াছে। তথাপি পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে রোসিনারা যখন শিবজীর আচরণের প্রশংসা করিলেন, ক্রুদ্ধ বাদশাহ তখন তাঁহাকে সাজাহানের সহিত একই দুর্গে বন্দিনীর ন্যায় রাখিলেন।

ইহার অল্পদিন পরে শিবজী শতাধিক বিশ্বস্ত অনুচরসহ সওদাগরের ছদ্মবেশে দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং পুনরায় দুর্গজয় করিলেন এবং গুরু রামদাস স্বামীর নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়া খণ্ডযুদ্ধে মোগল বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে কপট সন্ধি স্থাপন করিয়া আরঙ্গেব শিবজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিলেন। কিন্তু গুরু রামদাস স্বামী ছদ্মবেশে স্বস্ত্যয়নের অভিনয় করিয়া তাঁহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিলেন। এই সময় বাদশাহের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বৃদ্ধ সাজাহানের অনুরোধে রোসিনারা যখন 'মোহিনীবিপণী স্থলে' উপস্থিত হইলেন, তখন জনৈক বারবণিতা তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া নিয়া একটি অঙ্গুরীয় এবং একটি উষ্ণীষ দেখাইল। রোসিনারা তাহা শিবজীর বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বারবণিতা জানাইল, তিনি যদি শিবজীর সহিত পলায়নে সম্মত থাকেন তাহা হইলে যেন রাত্রিশেষে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকেন। বৃদ্ধ সাজাহান পৌত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে শিবজীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী রোসিনারা বলিলেন, তিনি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া শিবজীর সহিত মিলিত

হইলে দিল্লীশ্বর ও মহারাষ্ট্রজাতি উভয়েই শিবজীর শত্রু হইবে; জানিয়া শুনিয়া তিনি প্রণয়াস্পদের এরূপ বিপদের নিমিত্তরূপিণী হইতে পারেন না। তিনি শিবজীর উদ্দেশ্যে একখানি পত্র লিখিয়া বারবণিতার নিকট হইতে শিবজীর অঙ্গুরীয় গ্রহণপূর্ব্বক পত্রখানি এবং নিজের অঙ্গুরীয় তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। পত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ: শিবজীই তাঁহার স্বামী এবং অঙ্গুরীয় বিনিময় দ্বারাই তাঁহাদের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার সমভি-ব্যাহারিণী হইলে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে। শিবজী তাঁহার জন্য রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও দুঃখিত হইবেন না সত্য; কিন্তু রাজা হওয়াই তাঁহার জীবনের আদর্শ নহে। রোসিনারা যেমন স্বামীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিজেকে স্বামীসহবাস হইতে বঞ্চিত করিলেন, শিবজীও যেন এই মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন যে, 'স্বদেশবাৎসল্য প্রযুক্ত' তিনি নিজ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র কাহিনীর পরিবেশনে কোনরূপ জড়তা নাই এবং ইহাতে সুষ্ঠু চরিত্রাঙ্কন রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রেম ও কর্ত্তব্যের সঙ্ঘাতে রোসিনারার চরিত্র সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। এই উপন্যাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন 'দুর্গেশনন্দিনী'র উপর ইহার প্রভাবের উল্লেখ করিয়াছেন।[১] বিশেষ করিয়া আয়েষার চরিত্রের পরিকল্পনায় এই প্রভাব সুস্পষ্ট। অয়েষা ও রোসিনারা উভয়েই উচ্চবংশসম্ভবা, একজন নবাবনন্দিনী অপর দিল্লীশ্বরের দুহিতা। উভয়ের অন্তরে আহত বীরপুরুষের শুশ্রূষার সূত্র ধরিয়া প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রণায়স্পদ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী এবং পিতৃশত্রু। উভয়ের জীবনসমস্যা একই প্রকারের এবং দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্যের ফলে উভয়েই এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন একই প্রকারে। তফাৎ এই, আয়েষার ক্ষেত্রে প্রণয়াস্পদের সহিত মিলনের অন্তরায় একদিকে ধর্ম্মের ব্যবধান, অন্যদিকে মধ্যবর্ত্তিনীরূপে তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থিতি; পক্ষান্তরে ধর্ম্মের ব্যবধান থাকিলেও রোসিনারার ক্ষেত্রে মিলনের প্রকৃত অন্তরায় প্রণয়াস্পদের আদর্শের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা। কিন্তু 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র প্রভাব থাকিলেও আখ্যায়িকা এবং কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের পরিকল্পনায় বঙ্কিমের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য্য এবং অপরিণত রচনার চিহ্ন থাকিলেও বিভিন্ন কাহিনীর সংযোজনায় অঙ্কনকৌশলে, পরস্পরবিরোধী চরিত্রের সমাবেশে একের সাহায্যে অপরের রূপায়ণে. গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে লঘু

১ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃতীয় সংস্করণ), ৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অথচ বিশুদ্ধ হাস্যরসের পরিবেশনে 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। ইহাই বাংলা সাহিত্যে 'উচ্চাঙ্গের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস।'[১]

এইরূপ বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ'ই উচ্চাঙ্গের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে ইংরেজী সভ্যতার সহিত সনাতন প্রথার সঙ্ঘাতে সমাজ-জীবনে যে বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুগের সামাজিক উপন্যাসের উপাদান যোগাইয়াছে। প্রধানতঃ এই কারণেই প্রথম যুগের সমাজচিত্র সম্বলিত কাহিনী দুইটি স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করিয়াছে: একটি শ্লেষাত্মক, অপর গঠনমূলক। সে-যুগে যে সকল ধনীর সন্তান দু' একটি ইংরেজী বুলি শিখিয়া, ইংরেজের বাহিরের সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিত তাহাদের কাহিনী অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ শ্লেষাত্মক সামাজিক নক্সা রচনা করেন। এই শ্রেণীর নক্সার মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' সমধিক উল্লেখযোগ্য। নক্সাখানি প্রকাশিত হয় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমনাথ শর্ম্মা—এই ছদ্মনামে।

ভবানীচরণ প্রাচীনপন্থী; তিনি ইংরেজীয়ানার বিরুদ্ধে বিদ্রূপের শর নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সমাজচিত্রের একটি দিক মাত্র। পক্ষান্তরে ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন কোন প্রগতিবাদী লেখক যুগে যুগে সঞ্চিত যে কুসংস্কার আমাদের সমাজ-জীবনকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছে, শিক্ষাপ্রদ কাহিনীর মাধ্যমে সে সকলের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ইহাদের অন্যতম। মধুসূদন তাঁহার 'সুশীলার উপাখ্যানে' (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রকাশকাল ১৮৫৯-৬৫ খ্রীঃ[২]) সুশীলার বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার জীবনকাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হইতে আরম্ভ করিয়া কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রসূতি ও নবজাত শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার আলোচনা করিয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সুশীলার উদ্যোগে বালবিধবার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও 'সুশীলার উপাখ্যানে' স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই চিন্তার খোরাক রহিয়াছে। কিন্তু ইহার 'উপাখ্যান'ভাগ নিতান্ত গৌণ, যতটুকু কাহিনী রহিয়াছে তাহা একান্তভাবে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মতবাদ প্রকাশের উপকরণস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে না আছে আখ্যানবস্তু (plot) না আছে চরিত্রাঙ্কন। সুতরাং সমাজচিত্র

১ ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (তৃতীয় সংস্করণ), ৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২ ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য' (তৃতীয় সংস্করণ) ৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

থাকিলেও 'সুশীলার উপাখ্যান'কে ঠিক সামাজিক উপন্যাস বলা চলে না। বাংলাসাহিত্যে প্রথম সামাজিক উপন্যাস, তথা প্রথম উপন্যাস প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। এই উপন্যাসখানি ১২৬১ সালের ফাল্গুন মাস (ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫ খ্রীঃ) হইতে প্যারীচাঁদ কর্ত্তৃক পরিচালিত 'মাসিক পত্রিকা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে এবং সমগ্র উপন্যাসখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ, রচনা এবং প্রকাশকাল হিসাবেও ইহা 'সুশীলার উপাখ্যানে'র পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা।

'আলালের ঘরের দুলালে'র উপর 'নববাবুবিলাসে'র প্রভাব সুস্পষ্ট। মতিলাল 'নববাবুবিলাসে'র 'বাবু'র আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছে এবং উভয়ের শিক্ষা-পদ্ধতিতেও আশ্চর্য্যরকমের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, " 'আলাল' সকল দিক হইতেই আরও পরিবর্দ্ধিত ও বিকশিত হইলেও 'নববাবুবিলাস' হইতেই যে সূচিত হয় তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। ইহার প্রধান এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই দুইটি আখ্যায়িকার বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য। 'আলালের ঘরের দুলাল' যে-যুগের উহার সমাজচিত্র সে যুগের নয়। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালেও এদেশে 'আলালে'র নায়কের মত অশিক্ষিত ধনীপুত্র যে ছিল না তাহা নয়। তবু একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায়, একটু ইতরবিশেষ থাকিলেও 'আলালে'র নায়ক আমাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বের যুগের অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু। এই বিচিত্র চরিত্রটি আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ইংরেজ শাসনতন্ত্র ও বাণিজ্যের ছায়ায় বর্দ্ধিত নূতন ধনীসম্প্রদায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়াছিল। 'আলালে' এই সমাজেরই চিত্র দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাপারটা 'আলালের ঘরের দুলালে' ইংরেজী শিক্ষার যে রীতি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা দেখিলেই বোঝা যায়। 'আলাল' যখন রচিত হয় তখন এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার বেশ প্রসার হইয়াছে। তবু উহাতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের স্কুলের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 'নববাবুবিলাসে'ও ঠিক এই যুগের সামাজিক আচার ব্যবহারই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বহু সামাজিক পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও 'আলালের ঘরের দুলালে' 'নববাবুবিলাসে' বর্ণিত সমাজের চিত্র দেওয়াতে এই অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, এই দুইটি পুস্তকের মধ্যে পিতাপুত্র সম্পর্ক আছে।"[১]

১ নববাবুবিলাস (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা, ১/০—১/০ পৃঃ।

উপরোক্ত মন্তব্যের মূল সত্য অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ইহাতে কিছুটা আতিশয্য রহিয়াছে। কারণ 'নববাবুবিলাসে'র প্রভাব 'আলালের ঘরের দুলালে' যে সমাজচিত্র রহিয়াছে তাহার কেবলমাত্র একটি দিক সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 'নববাবুবিলাসে'র ন্যায় 'আলালে'র উদ্দেশ্য শ্লেষ নহে, ইহার উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা; প্যারীচাঁদের আদর্শ গঠনমূলক। 'নববাবুবিলাস' এবং 'সুশীলার উপাখ্যান' ইংরেজী শিক্ষার প্রতি দুইটি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতীক। এবং এই কারণেই 'সুশীলার উপাখ্যানে'র একটুকু বিস্তারিত উল্লেখ করিয়াছি। 'আলালের ঘরের দুলালে' এই দুই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এবং এই উপন্যাসে প্যারীচাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহার অপক্ষপাতিতা। তিনি একদিকে যেমন মতিলাল ও তাহার ইয়ারবর্গের চিত্র আঁকিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনিই সৃষ্টি করিয়াছেন বরদাবাবু এবং তাঁহার শিষ্য রামলালকে, যাঁহাদের চরিত্রে ইংরেজীশিক্ষার যাহা কিছু ভাল তাহার সবটাই প্রতিফলিত হইয়াছে।

'সুশীলার উপাখ্যানে'র ন্যায় 'আলালের ঘরের দুলালে'ও কৌলীন্য-প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার প্রতি কটাক্ষ রহিয়াছে। কিন্তু প্যারীচাঁদের আক্রমণের ধারা ভিন্ন প্রকৃতির। একটি উদাহরণ দিতেছি: মধুসূদন কৌলীন্যপ্রথার উল্লেখ করিয়াছেন সুশীলার বিবাহ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার পিতামাতার সংলাপের ভিতর দিয়া, প্যারীচাঁদ এই কুপ্রথাকে আক্রমণ করিয়াছেন বাবুরামবাবুর কন্যার ব্যর্থ জীবনের চিত্রের ভিতর দিয়া। অর্থ্যাৎ প্যারীচাঁদের রীতি উপন্যাসের রীতি। 'আলালে'র প্রধানতম আকর্ষণ কাহিনীর মাধ্যমে বাস্তব সমাজচিত্র। চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়াও ঠকচাচা বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।

কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস নহে। ইহার গল্পাংশের বাঁধুনি নাই, উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীগুলি অনেক স্থলেই অসংলগ্ন; এবং ইহার অধিকাংশ চরিত্রই বর্ণহীন; বিশেষ করিয়া বরদাবাবু সম্বন্ধে মনে হয় ইনি যেন কতগুলি গুণের সমাবেশ মাত্র।

'আলাল' শিক্ষামূলক উপন্যাস। এই কারণেই ইহাতে সুশিক্ষা, উপযুক্ত শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা, দেশভ্রমণের উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। ফলে আখ্যায়িকার গতি অবাঞ্ছনীয়রূপে মন্থর হইয়াছে; এবং শিক্ষামূলক বলিয়াই এই উপন্যাসে বিশেষ করিয়া পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি দেখান হইয়াছে। ঠকচাচা এবং বাহুল্যকে না হয় কৃতকর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে নির্ব্বাসনদণ্ড

ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইল, উপায়ান্তর না থাকায় ঠকচাচীকেও না হয় পেটের দায়ে চুড়িওয়ালী সাজিতে হইল কিন্তু বাঞ্ছারামের বজ্রাঘাতে মৃত্যুর সহিত তাহার কার্য্যের কোনরূপ স্বাভাবিক যোগাযোগ থাকিতে পারে না, পাপের পরাজয় ঘোষণা করা ছাড়া ইহার অপর কোন সার্থকতা নাই। অবশ্য পাপের অভ্যুদয়ে কোন ঔপন্যাসিক তাঁহার কাহিনীর উপর যবনিকা টানিতে পারেন না, কারণ তাহাতে রসহানি হয়। কিন্তু প্রত্যেক চরিত্রের পরিণতি হইবে তাহার কার্য্যের স্বাভাবিক পরিণতি, প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের নিকট আমরা ইহাই প্রত্যাশা করি। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই কি পুণ্যের পুরস্কার লক্ষিত হয়? ব্যর্থতার ভিতর দিয়াই কি অনেক অমূল্য জীবনের অবসান হয় না? মানবজীবনের এই ট্র্যাজেডি যে তরুণ বয়সেই বঙ্কিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে আয়েষার পার্থিব জীবনের ব্যর্থতা ইহার অন্যতম নিদর্শন। অবশ্য বঙ্কিমের পূর্ব্বে ভূদেবের রোসিনারার পরিণতিও এই সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে।

পরিশেষে ভাষার কথা—'আলাল' কথ্য ভাষায়, যে ভাষা সাধারণ বাঙ্গালী ব্যবহার করে এবং বুঝিতে পারে সেই ভাষায় রচিত। ইহার ভাষা সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে লিখিত কষ্টবোধ্য সংস্কৃত-শব্দবহুল, সমাস-জটিল তৎকালীন বাংলা রচনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। সে যুগে এরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু 'আলালে'র ভাষা নিতান্ত হালকা ভাষা। ইহা সাধারণ সংলাপের এবং সাধারণ ভাব প্রকাশের উপযোগী হইলেও উন্নততর ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

'আলাল' সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উপন্যাস নহে। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে প্যারীচাঁদের দান অবিস্মরণীয়। প্যারীচাঁদ সংস্কৃতানুগ কঠিনবোধ্য গদ্যরীতির নাগপাশ হইতে বাংলা ভাষাকে মুক্ত করিলেন এবং তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে আমাদের ঘরের কথা লইয়া স্থায়ী সাহিত্য রচনা করা সম্ভব।[১] এই উভয় দিক দিয়াই বঙ্কিমের উপর প্যারীচাঁদের প্রভাব রহিয়াছে। 'আলালে'র ভাষার আলোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালে"র পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের

১ 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদের স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিম স্বয়ং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। 'বিবিধ', ১৪১-৪৪ পৃঃ।

প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।' সাহিত্য রচনায় ভাষার দিক দিয়া ইহাই বঙ্কিমের লক্ষ্য। ফলে তাঁহার ভাষা কাদম্বরীর কাঠিন্যবর্জ্জিত এবং মুখ্যতঃ বিদ্যাসাগরের রীতিঘেঁষা, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নমনীয়। বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও বঙ্কিম তাঁহার গার্হস্থ্য উপন্যাসে বাঙ্গালীর ঘরের কথা লইয়াই স্থায়ী সাহিত্য রচনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমের উপর প্যারীচাঁদের প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু 'আলালে' রোমান্স বা প্রণয়কাহিনী নাই। 'আলাল' এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র অন্তর্বর্ত্তী কালের রচনা 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' ভূদেব প্রথম বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী আমদানি করিয়াছেন এবং এই পথেই বঙ্কিম তাঁহার জয়যাত্রা সুরু করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ

'দুর্গেশনন্দিনী'র ন্যায় বঙ্কিম তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসেই ঐতিহাসিক পটভূমিকার সাহায্যে উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীকে অতীত যুগে টানিয়া নিয়াছেন। 'রাজসিংহে' শুধু পটভূমিকাই ঐতিহাসিক নহে, ইহার মূলকাহিনী: ওরঙ্গজেব-চঞ্চলকুমারী-রাজসিংহ কাহিনী ইতিহাস হইতে গৃহীত। হয়ত এই কারণেই বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র 'রাজসিংহ'কেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[১] এ সম্বন্ধে আচার্য্য যদুনাথের মন্তব্য এইরূপ: 'বঙ্কিম নিজে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে একটি বড়ই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ ছিল যে, ইতিহাসের সত্য ঘটনা মাত্র উপন্যাসের ভাষায় বিবৃত করিলে তবেই তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস নামের যোগ্য; অর্থাৎ তাহাতে অধিকাংশ পুরুষগুলি ইতিহাসে পরিচিত ব্যক্তি হইবে, এবং অতি কম সংখ্যায় কাল্পনিক চরিত্র থাকিবে; কথাবার্ত্তাগুলি প্রায়শঃ তাঁহার নিজের রচিত। কিন্তু বর্ণিত ঘটনা এবং বিষয়-পরিকল্পনা (প্লট) একেবারে নিছক সত্য, ইতিহাস হইতে তোলা।'[২]

প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। অধ্যাপক ষ্টডার্ড (F. H. Stoddard) বলেন, 'It is a record of individual life, of individual emotion in circumstances and times of historical interest. For its making two things are requisite—that there be a conception of, and a fondness for, the facts and spirit of history ; and that there be a knowledge of and an appreciation of, the importance of individual life.'[৩] অর্থাৎ, ঐতিহাসিক উপন্যাস ঐতিহাসিক কাল ও প্রতিবেশে ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যক্তিগত অনুভূতির কাহিনী। ইহার জন্য দুইটি জিনিষ অবশ্য প্রয়োজন: এক, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ইতিহাসের অন্তর্নিহিত গূঢ় সত্য

১ রাজসিংহ, চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

২ আনন্দমঠ (শতবার্ষিক সংস্করণ), আচার্য্য যদুনাথ লিখিত ভূমিকা।

৩ Evolution of the English Novel, p. 87.

সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা এবং তাহার প্রতি প্রাণের টান; দুই, ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও উপলব্ধি। ঐতিহাসিক প্রতিবেশ রচনায় এবং ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তাহার মূল সত্য রূপায়ণে উপন্যাসের ঐতিহাসিকত্ব এবং ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাব পরিবেশনে ইহার ঔপন্যাসিকত্ব। এই সংজ্ঞা অনুসারে বঙ্কিমের যে সকল উপন্যাসে ইতিহাসের সংস্পর্শ রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'দেবী চৌধুরাণী' ভিন্ন অপর সকল উপন্যাসকেই ঐতিহাসিক বলা চলে। 'কপালকুণ্ডলা'র জাহাঁগীর এবং মেহের-উন্নিসা ঐতিহাসিক চরিত্র এবং দু' একটি রেখায় ইঁহাদের যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এবং উপন্যাসবর্ণিত রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার চিত্র ইতিহাসসম্মত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে 'কপালকুণ্ডলা'য় যুগোপযোগী প্রতিবেশ নাই এবং অধিকাংশ ঘটনা সপ্তগ্রামে ঘটিলেও ইহাতে সপ্তগ্রামের তৎকালীন পৌরজীবনের কোন চিত্র নাই। পক্ষান্তরে, 'দেবী চৌধুরাণী'তে যুগোপযোগী প্রতিবেশ রহিয়াছে, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক চরিত্র বা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা নাই; দেবী চৌধুরাণী ও ভবানী পাঠক নামে ঐতিহাসিক হইলেও আসলে ইহারা বঙ্কিমের কল্পনার সৃষ্টি। অবশ্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকুক বা না থাকুক, ঐতিহাসিক পরিবেশ থাকিলেই সে উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে। অর্থাৎ ইঁহাদের মতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ যুগোপযোগী প্রতিবেশ, চরিত্রসৃষ্টি সম্পূর্ণ কাল্পনিক হইলেও ক্ষতি নাই। 'আনন্দমঠের'র (শতবার্ষিক সংকরণ) ভূমিকায় আচার্য্য যদুনাথ এই মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ ব্যাপক সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইলে 'দেবী চৌধুরাণী'কেও ঐতিহাসিক পর্য্যায়ভুক্ত করিতে হয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস ইত্যাদি বাঁধাধরা শ্রেণীবিভাগ অনেকক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ হইয়া থাকে, কারণ অনেক সময় একই উপন্যাসে বিভিন্ন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'দেবী চৌধুরাণী'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যাপক সংজ্ঞা অনুসারে ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাস; অথচ ইহাতে নিখুঁত গার্হস্থ্য জীবন ও সমাজ জীবনের চিত্র রহিয়াছে। সবার উপরে ইহার প্রধানতম আকর্ষণ বঙ্কিমের অধ্যাত্মবাদ। এরূপ ক্ষেত্রে যে শ্রেণীর উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণের প্রাধান্য রহিয়াছে, কোন উপন্যাসকে সেই শ্রেণীভুক্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। বঙ্কিম সম্বন্ধে প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহার সবগুলি উপন্যাসই কমবেশী রোমান্সগন্ধী। ইহার পর বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার উপন্যাসের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে:

১। ঐতিহাসিক উপন্যাস: দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ।
২। সামাজিক বা গার্হস্থ্য উপন্যাস: বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল।
৩। ক্ষুদ্রাকার রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী: রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়।
৪। সমস্যামূলক: কপালকুণ্ডলা।
৫। তত্ত্বমূলক: আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম।

বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাস ও সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা

বঙ্কিম তাঁহার সামাজিক বা গার্হস্থ্য উপন্যাসে ভালোয় মন্দয় মিশানো তৎকালীন সমাজ জীবনের চিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু এই চিত্র প্রধানতঃ অভিজাত-সম্প্রদায়ের চিত্র, সেখানে সাধারণ মানুষ আসিয়াছে পরিপূরক হিসাবে; বঙ্কিমের উপন্যাসে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র নাই। আসলে তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগ অভিজাত-সম্প্রদায়ের যুগ। শরৎচন্দ্রের এবং আধুনিক যুগে তারাশঙ্করের সাধারণ মানুষের সহিত নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। বঙ্কিম সহানুভূতিশীল হইলেও সাধারণ মানুষকে দেখিয়াছেন দূর হইতে, তিনি তাহাকে চিনিয়াছেন বুদ্ধির সাহায্যে, নিকট হইতে তাহার জীবনের স্পন্দন অনুভব করেন নাই।

বঙ্কিম তাঁহার একাধিক প্রবন্ধে সে যুগের সামাজিক সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার উপন্যাসেও এই সকল সমস্যার উল্লেখ বা আভাস রহিয়াছে। এই সকল সমস্যার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচালনায় বিধবাবিবাহ আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসে বিধবাবিবাহের প্রশ্ন তুলিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, 'বিষবৃক্ষে' তিনি বিধবা কুন্দের বিবাহ দিয়াছেন। কুন্দের এই বিবাহ সুখের হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহার করুণ পরিণতির পশ্চাতে রহিয়াছে আর্টের দাবীর প্রশ্ন, ইহা বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতবাদের পরিচয় দেয় না।

বঙ্কিম হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসনের সূত্র ধরিয়া প্রশ্নটির বিচার করেন নাই। এইখানেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য। সহজ বিচারবুদ্ধি দিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা এইরূপ: 'বিধবা বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহের

অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্ব পতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনও পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না ;........কিন্তু যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃ পরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী'।[১]

ইহা যুক্তির কথা। কিন্তু আমাদের বিচারবুদ্ধি যাহা সমর্থন করে, সকল সময় আমরা তাহা সব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারি না। বঙ্কিম যে সকল উপন্যাসে বিধবাবিবাহের প্রশ্ন তুলিয়াছেন, সে সকল উপন্যাসে আখ্যায়িকার পরিবেশন প্রণালী হইতে মনে হয়, তিনি বলিতে চাহেন যে, শাস্ত্র বা বিচারবুদ্ধি যাহাই বলুক, হিন্দুর সংস্কার কখনও বিধবাবিবাহকে সমাজে চালু হইতে দিতে পারে না। 'মৃণালিনী'র পটভূমিকা সুদূর অতীতের হইলেও এই উপন্যাসেই প্রথম বিধবাবিবাহের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। পশুপতি বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন, তিনি বল্লালসেনের ন্যায় নূতন সমাজ-বিধান প্রবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত তাগিদে। তিনি বিধবা-বিবাহের ভাল মন্দ, ঔচিত্যানৌচিত্যের বিচার করেন নাই। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী কতকটা একই প্রকারের। কুন্দ না থাকিলে এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনরূপ প্রশ্ন উঠিত না, অথবা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি-তর্কের দ্বারা ইহা প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করিতেন না। তারাচরণ ভিন্ন প্রকৃতির; তাহার পক্ষে বিধবাবিবাহ সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ পাঠ বা দীর্ঘ বক্তৃতা আসর জমাইয়া সস্তায় নাম কিনিবার উপায়স্বরূপ; দেবেন্দ্রনাথের পারিষদ হিসাবেও ইহা তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্মের তালিকাভুক্ত। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' হরলালের যুক্তিতর্কের বালাই নাই; তাহার দৃষ্টি স্বচ্ছ। হরলাল প্রথমে প্রাচীনপন্থী পিতাকে বিধবাবিবাহের হুমকি দিয়া নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিতে চাহিয়াছে, পরে নিরাশ হইয়া শেষ উপায় হিসাবে রোহিণীকে হাতের মুঠোয় আনিবার জন্য তাহাকে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করিয়াছে, কিন্তু কোন সময়েই সে সত্যসত্যই বিধবাবিবাহের কল্পনা করে নাই। গোবিন্দলাল গণনার বাহিরে, কারণ তিনি বিধবা

১ সাম্য ৫, ৩৯ পৃঃ। 'সাম্য' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ১৮৮৩ কি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময় কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'সাম্যটা' সব ভুল,........আর ছাপাব না।' (বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, ১ম প্রস্তাব—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ১৯৮ পৃঃ)। প্রকৃতপক্ষে প্রথম সংস্করণের পর তিনি আর পুস্তকখানি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে যুক্তির দিক দিয়া তাঁহার মতের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

রোহিণীকে লইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন, রোহিণীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত সম্পর্ক বৈধ করিতে চেষ্টা করেন নাই। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে যে, পশুপতি হইতে আরম্ভ করিয়া হরলাল পর্য্যন্ত যাঁহারাই বিধবাবিবাহের প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাঁহারাই কমবেশী আত্মসুখ ও আত্মস্বার্থ খুঁজিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের ন্যায় বিধবার দুঃখ তাঁহাদের মর্ম্মস্পর্শ করে নাই। বঙ্কিম হয়ত বলিতে চাহেন, হিন্দুসমাজে যাঁহারা বিধবাবিবাহের আন্দোলন তোলেন বা আন্দোলনকারীকে সমর্থন করেন তাঁহাদের মধ্যে একটা মোটা সংখ্যা কেহ বা পশুপতি-নগেন্দ্রনাথের, কেহ বা হরলালের, কেহ বা তারাচরণের সমগোত্রীয়। এ ত গেল পুরুষের কথা। আর যাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া এই প্রথা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা তাঁহারাও বড় কেহ ইহাকে অন্তরের সহিত সমর্থন করিতে পারেন নাই। রোহিণীর মত কোন বালবিধবা হয়ত এই আন্দোলনের কথা শুনিয়া ক্ষণিকের জন্য উন্মনা হইতে পারে, কুন্দের মত কেহ হয়ত নবোন্মেষিত প্রণয়ের আবেগে ভালমন্দ বিচার না করিয়া বা বিচার কবিতে না পারিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুনারীর অভিমত প্রকৃতপক্ষে ব্যক্ত হইয়াছে সূর্য্যমুখীর মুখে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গোক্তি[১] (ইহা সূর্য্যমুখীর তৎকালীন মানসিক অবস্থায় ক্ষমার্হ) বাদ দিলে সূর্য্যমুখী যাহা বলিয়াছেন তাহাই হিন্দুনারীর মর্ম্মকথা এবং বিভিন্ন

১ অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, 'স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ উক্তিটির জন্য বঙ্কিমকে ক্ষমা করেন নাই।' (বঙ্কিমচন্দ্র, ২৩৩ পৃঃ)। তিনি এই তথ্য কোন্ সূত্রে অবগত হইয়াছেন দত্তগুপ্ত মহাশয় তাহার উল্লেখ করেন নাই। তবে তারকনাথ বিশ্বাস মহাশয় একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ বদ্ধ কবিযাছেন। মনে হয় ইহাই দত্তগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যেব ভিত্তি। কাহিনীটি এইরূপ: বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন বর্দ্ধমানে তারকবাবুর পিতা দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয়ের বাসায় স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজ দিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন। 'আহাবেব সময়......বিদ্যাসাগব মহাশয় স্বহস্তে........পরিবেশন করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "এমন সুস্বাদু অমৃত কখন খাই নাই।" সঞ্জীববাবু সহাস্যে বলিলেন, "হবে না কেন, রান্না কাব, জানত, বিদ্যাসাগবের।" বিদ্যাসাগব মহাশয় তেমনি হাসিব সহিত উত্তর দিয়া বলিলেন, "না হে না, বঙ্কিমের সূর্য্যমুখী আমার মত মূর্খ দেখেনি।" বঙ্কিমবাবু কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু একটা হাসিব তুফান উঠিয়াছিল।' (বঙ্কিম প্রসঙ্গ—ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, অক্টোবব, ১৯২৬, কার্ত্তিক, ১৩২৩)। ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় কাহিনীটি উল্লেখ করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। (বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম খণ্ড, ১৫১ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সত্য হইলেও ইহা দত্তগুপ্ত মহাশয়েব উক্তির সমর্থন করে না। বরং মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় খেলোয়াডী মনোভাব লইয়া জিনিষটীকে হালকাভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাব অন্যথা মনে করিলে তাঁহাব রসজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। উক্তিটি সূর্য্যমুখীর, বঙ্কিমের নহে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে একই উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যদি কেহ বলে যে, বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে?" নগেন্দ্রর মুখে তাহার উক্তি যেমন স্বাভাবিক ও মানানসই, সূর্য্যমুখীর মুখে তাঁহার উক্তিও তেমনই স্বাভাবিক ও মানানসই।

পাত্রপাত্রীর দৃষ্টিকোণ দিয়া বঙ্কিম যে ভাবে প্রশ্নটির বিচার করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শুদ্ধ যুক্তির দিক দিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে বিধবাকে বিবাহের অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার মন উহাতে সায় দেয় নাই।

বিধবাবিবাহের পরই যে প্রশ্ন বিশেষভাবে সে যুগের সমাজ-সংস্কারকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা বহুবিবাহের প্রশ্ন। এই আন্দোলন ব্যাপারে বঙ্কিম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।[১] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার মতানৈক্যের কারণ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যেখানে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন, বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয়, বঙ্কিম সেখানে মনে করেন শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া বিপজ্জনক, কারণ বহুবিবাহ যেমন সাধারণভাবে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, তেমন শাস্ত্রেই আবার এমন অনেক অবস্থার উল্লেখ রহিয়াছে যাহার অন্যায় সুযোগ লইয়া শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘন না করিয়াও বহুবিবাহ সম্ভব। সুতরাং বঙ্কিমের মতে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে অন্য উপায়ে জনমত গঠন করাই বাঞ্ছনীয়। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু প্রশ্ন এই, বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসে বহুবিবাহের যে সকল চিত্র আঁকিয়াছেন জনমতগঠনে তাহা কতখানি সহায়ক। 'রজনী'তে রামসদয় মিত্রের বহুবিবাহ তাঁহার পরিবারে কোন-রূপ অশান্তির সৃষ্টি করে নাই। 'দেবী চৌধুরাণী'তে দেবীর নূতন বৌ-রূপে ব্রজেশ্বরের সংসারে আসার পরের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম; পূর্ব্বের কথাই বলিতেছি: নয়ানবৌ কুরূপা ও ঝগড়াটে। কিন্তু একে সাগরবৌ প্রায়ই শ্বশুরবাড়ী আসিত না, তাহাতে সে সদাহাস্যময়ী। দু' একটি খোঁচা দিয়া নয়ানবৌকে রাগাইয়া তুলিয়া তাহাকে লইয়া রঙ্গ করা ভিন্ন সে কখনও সতীনের সহিত সত্যকার কলহ করিয়া ব্রজেশ্বরকে বিব্রত করে নাই। 'সীতারামে' দেখিতে পাই, কারণ যাহাই হউক, নন্দা কখনও রমাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে নাই, পরন্তু জ্যেষ্ঠার স্নেহ দিয়া তাহাকে আগুলিয়া রাখিয়াছে। এবং শেষ পর্য্যন্ত সীতারামের অনাদরে রমা মরিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার কারণ সন্ন্যাসিনী শ্রীর প্রতি সীতারামের অনুচিত মোহ। শ্রী যদি গৃহিণীরূপে সীতারামের সংসারে তাহার ন্যায্য আসন গ্রহণ করিতে পারিত তাহা হইলে এরূপ অনর্থ ঘটিত না। একমাত্র 'বিষবৃক্ষে' এ সম্বন্ধে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়; এই উপন্যাসে নগেন্দ্র-কুন্দের বিবাহ

১ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয় বিচার। দ্বিতীয় পুস্তকে'র উত্তরে 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮০, ৯৭—১০৯ পৃঃ।

সূর্য্যমুখীর জীবনে, তথা নগেন্দ্রের সংসারে দারুণ বির্পযয় আনিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে সূর্য্যমুখীর জীবনে স্বামীর দ্বিতীয়বারের বিবাহের সাময়িক প্রতিক্রিয়া যাহাই ইউক, বাঁচিয়া থাকিলে কুন্দ তাঁহার নিকট হইতে ভগিনীর স্নেহলাভে বঞ্চিত হইত না। এই সকল চিত্র নিশ্চয়ই বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমতগঠনের সহায়ক নহে।

'রজনী'তে যেমন বহুবিবাহের চিত্র রহিয়াছে. তেমনই বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের পার্শ্বে রহিয়াছে তাঁহার তরুণী ভার্য্যা লবঙ্গলতা। কিন্তু লবঙ্গের মনের নিভৃত কোণে অমরনাথের সম্বন্ধে যে দুর্ব্বলতাই থাকুক, বৃদ্ধ স্বামী এবং সপত্নীপুত্র শচীন্দ্রকে লইয়া তাহার দিনগুলি সুখেই কাটিয়াছে। অর্থাৎ, বহুবিবাহের ন্যায় বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যার চিত্রেও বঙ্কিম এই কুপ্রথার কুৎসিত দিক এড়াইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিম বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী না হইতে পারেন, কিন্তু কেহই বলিবেন না যে তিনি বহুবিবাহ বা বয়সে অসমঞ্জস বিবাহ সমর্থন করিতেন। সুতরাং এই সকল চিত্র হইতে একমাত্র যে সিদ্ধান্ত সম্ভব তাহা এই যে, সমসাময়িক কোন সামাজিক সমস্যা বঙ্কিমের মনে গভীর রেখাপাত করে নাই। তাঁহার সমস্যামূলক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিম যে সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন তাহাও এই ধারণার পরিপোষক।

সমস্যামূলক উপন্যাসঃ কপালকুণ্ডলা—'কপালকুণ্ডলা'র সমস্যা বাস্তব জীবনের সমস্যা নহে; ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অবাস্তব। শকুন্তলা ও মিরাণ্ডার (Miranda) ন্যায় কপালকুণ্ডলা সমাজ-জীবন হইতে দূরে প্রকৃতিপালিতা। কিন্তু শকুন্তলা ও মিরাণ্ডা উভয়েই দাম্পত্যজীবনকে কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, বঙ্কিম কপালকুণ্ডলার চারিদিকে এমন প্রতিবেশ রচনা করিয়াছেন যে, অবস্থার চাপে পড়িয়া বিবাহ করিতে হইলেও কপালকুণ্ডলা বিবাহিত জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কালিদাস ও শেক্সপীয়ারের প্রভাবমুক্ত হইয়া তরুণ বঙ্কিম যে সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া কপালকুণ্ডলার জীবন-সমস্যার বিচার করিতে পারিয়াছেন এবং অতি স্বাভাবিকভাবে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে এক অতি করুণ পরিণতির দিকে টানিয়া নিয়াছেন. ইহা তাঁহার স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় দেয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাসঃ বঙ্কিম বর্ত্তমান বাস্তবকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার রোমান্সধর্ম্মী মন অতীতের প্রতিবেশেই অধিকতর স্বস্তি বোধ করিত। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসেই যে অতীতের প্রতিবেশ রহিয়াছে ইহা তাহার অন্যতম কারণ। কিন্তু অতীতের পৃষ্ঠায় বঙ্কিম কি

খুঁজিয়াছেন? 'দুর্গেশনন্দিনী'তে জগৎসিংহ অতীতের রাজপুত শৌর্য্য ও মহত্ত্বের প্রতীক। 'রাজসিংহে' হিন্দুর বাহুবল তাঁহার প্রতিপাদ্য উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিম নিজেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিম স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না এবং ভারতের অতীত গৌরব তাঁহাকে আকৃষ্ট করিলেও জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। এবং ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বঙ্কিম তাঁহার আখ্যায়িকায় বখ্তিয়ারের বাংলা বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাসী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত বাংলার ইতিহাসের যে সকল অধ্যায় বাছিয়া নিয়াছেন তাহার সবগুলিই পরাজয়ের কালিমালিপ্ত। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী' ভিন্ন অপর সকল ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক তথা তত্ত্বমূলক উপন্যাসে বঙ্কিমের লক্ষ্য এক, তিনি চাহিয়াছেন জাতীয় চরিত্রে আত্মচেতনাবোধের উন্মেষ।[১] 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিম জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এই উপন্যাসেই পশুপতি ও শান্তশীলের পার্শ্বে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মাধবাচার্য্যকে। তরুণ বঙ্কিম এই চরিত্রটিকে যথাযথ রূপ দিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু উত্তরকালে বঙ্কিমের পরিণত প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে এই মাধবাচার্য্যই পুনর্জীবন লাভ করিয়া সত্যানন্দরূপে সন্তানসেনার অধিনায়ক হইয়াছেন। পরাধীনতার গ্লানি বঙ্কিমকে কতখানি মর্ম্মপীড়া দিয়াছে কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু ঋষি বঙ্কিম ইহাও জানিতেন যে, এই ভারতবাসীই একদিন নূতন ইতিহাস রচনা করিবে, তাঁহার দিব্যদৃষ্টি পরাজয়ের গ্লানির ভিতরেও দেখিতে পাইয়াছে আগামী দিনের ইতিহাসের সেই নূতন পথের রেখা, অতীতের পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করিয়াছে ভাবীকালের ইতিহাসরচয়িতাদের অলক্ষ্য পদক্ষেপ। বঙ্কিমের প্রতাপ, জীবানন্দ, সত্যানন্দ, মহাপুরুষ চিকিৎসক, তাঁহার শান্তি, তাঁহার দেবী চৌধুরাণী অতীতের পটভূমিকায় সৃষ্ট হইলেও অতীতের নহেন। বঙ্কিমের কল্পনা ভবিষ্যৎ ভারতের যে রঙিন ছবি আঁকিয়াছে ইঁহারা তাহাতেই বর্ণবৈচিত্র্য যোগাইয়াছেন।

তত্ত্বমূলক উপন্যাস: বঙ্কিমের কল্পনার এই যে ভবিষ্যৎ ভারত ইহার স্বরূপ কি? বঙ্কিম ভারতবাসীকে কি রূপে দেখিতে চাহিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিম নিজেও একদিনে পান নাই। এই প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর রহিয়াছে তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্বে' এবং তত্ত্বমূলক উপন্যাসে। 'আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারামে'র বাণী পরিণত বঙ্কিমের বাণী। বঙ্কিমের উপন্যাসে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিতেছি।

১

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশ

বঙ্কিমের উপন্যাসে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশের সূত্র অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে: উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমের উদ্দেশ্য কি? 'উত্তরচরিতে'র আলোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম কাব্যের উদ্দেশ্যের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন, 'কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধি-জনন। কবিরা........সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।'[১] উপন্যাস রচনায় বঙ্কিম এই উভয় উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছেন।

'সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন' দ্বারা কি বুঝিতে হইবে, একই প্রবন্ধে বঙ্কিম তাহারও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কবির সৃষ্টিকে 'স্বভাবানুকারী' হইতে হইবে, কারণ যাহা 'স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না।' কিন্তু যাহা শুধুই 'স্বভাবানুকারী' অর্থাৎ 'যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতিমাত্র........তাহাকে "সৃষ্টি" বলা যায় না। যাহা সতের প্রতিকৃতিমাত্র নহে........যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষ-রূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ-সংস্পৃষ্ট, পুরাতন এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট।

১ উত্তরচরিত—বিবিধ প্রবন্ধ, ৪১ পৃঃ।
অবশ্য গৌণভাবেও চিত্তশুদ্ধিজনন কাব্যের উদ্দেশ্য কিনা, ইহা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু কবির জ্ঞাতসারে না হইলেও সুকাব্য চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। সোফোক্লেসের আলোচনা প্রসঙ্গে গেটে (Goethe) বলিয়াছেন: If a poet has as high a soul as Sophocles, his influence will always be moral, let him do what he will.' (Conversations of Goethe with Eckermann and Soret. Translated from the German by John Oxenford. Revised Edition of 1913. p 228)। কাব্যে নীতির প্রশ্ন সম্পর্কে ইহাই শেষ কথা।

কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন—সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।'[১] বঙ্কিমের চরিত্রসৃষ্টির ইহাই মূল নীতি। তিনি তাঁহার উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন মানব জীবনের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি এরূপ প্রতিবেশ রচনা করিয়াছেন যাহাতে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্যক পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। এইরূপে তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি স্বভাবানুকারী হইয়াও 'স্বভাবাতিরিক্ত।' অবশ্য ইহাতে সর্ব্বত্রই যে আর্টের দাবী রক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে। পক্ষান্তরে, কোন কোন স্থলে চরিত্রবিশেষের কোন বিশিষ্ট বৃত্তির উপর আলোকপাত করিতে যাওয়ার ফলে আখ্যায়িকা অবাঞ্ছনীয়রূপে জটিল ও ভারাক্রান্ত হইয়াছে। কোথাও বা চরিত্রবিশেষকে কোন বিশেষ ছাঁচে ঢালিতে যাওয়ার ফলে তাহা কম বেশী প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রথমোক্ত দোষদুষ্ট (এই উপন্যাসে যে উপায়ে বিমলার পতিভক্তির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শুধু যে আখ্যায়িকা জটিল হইয়াছে তাহা নহে, চমৎকারিত্ব থাকিলেও স্থানে স্থানে তাহা অতিনাটকীয়), এবং দ্বিতীয়োক্ত দোষের চরম দৃষ্টান্তস্থল 'সীতারামে' জয়ন্তীর দ্বারা প্রভাবিত শ্রীর চরিত্র।

উদ্দেশ্য ও ভাবধারার ক্রমবিকাশের দিক দিয়া বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' প্রথম যুগের উপন্যাস। এই সময় বঙ্কিমের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। তবে শেষোক্ত উপন্যাসে মৃণালিনীর চরিত্রে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। এই চরিত্রে পতিভক্তির আদর্শকে রূপায়িত করিতে যাইয়া বঙ্কিম উপন্যাসের গৌণ উদ্দেশ্যকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এইখানেই উপন্যাস-সাহিত্যে নীতিবিৎ বঙ্কিমের প্রথম আত্মপ্রকাশ। তবুও মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, এই যুগের উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টি এবং বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনা পরোক্ষে চিত্তশুদ্ধির সহায় হইলেও, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উপন্যাসের গৌণ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্তরালে রহিয়াছে এবং আখ্যায়িকার মাধ্যমে বঙ্কিম কোন বিশিষ্ট বাণী প্রচার করেন নাই।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে আখ্যায়িকার পরিবেশনগুণে—কোন বিশিষ্ট বাণী নহে—মানবজীবনের প্রতি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমের প্রথম যুগের উপন্যাসে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী কি? বঙ্কিম

১ বিবিধ প্রবন্ধ, ৪২ পৃঃ।

অদৃষ্টবাদী ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে থাকিয়া এক অদৃশ্য মহাশক্তি মানবজীবনের উপর দুর্জ্ঞেয় প্রভাব বিস্তার করে—এই সত্য প্রথম হইতেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রথম যুগের তিনখানি উপন্যাসেই ('দুর্গেশ-নন্দিনী' ও 'মৃণালিনী'তে অদৃষ্টগণনার ভিতর দিয়া[১] এবং 'কপালকুণ্ডলা'য় সূক্ষ্মতর ও শ্রেষ্ঠতর উপায়ে) তিনি এই অদৃষ্ট মহাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই রহস্যময় শক্তি মানবের ক্ষুদ্র শক্তিকে উপহাস করিয়া, কখন কখন ইহার গতিরোধপ্রয়াসী অজ্ঞ মানবকে অলক্ষ্যে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া দুর্ব্বার বেগে অসহায় নরনারীকে পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত পথে চালিত করিয়াছে, কোথাও এতটুকু নড়চড় হইবার উপায় নাই। মানবের অদৃষ্ট-দেবতা সহানুভূতিহীন, বিচারহীন, অন্ধ নিয়তি।

কিন্তু বঙ্কিম এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনি নিয়তিকে স্বীকার করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি বিশ্বময় নীতির রাজত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। কতলু খাঁ এবং পশুপতির জীবনের পরিণতিতে ইহার অভাস থাকিলেও, 'বিষবৃক্ষ' হইতেই এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এবং এই উপন্যাসে বঙ্কিম পরোক্ষে নীতির বাণী প্রচার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; পরন্তু নীতিবেত্তার উচ্চ আসন হইতে তিনি সেই বাণীর ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ('বিষবৃক্ষ' ২৯, ৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই সময় হইতেই বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন যুগের সূচনা। এবং এই উপন্যাসে যাহা নীতির নিয়ম ক্রমে ভগবদ্ভক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাই ঐশী বিধানে রূপান্তরিত হইয়াছে।

'বিষবৃক্ষে' পাশাপাশি নিয়তি ও নীতির বিধান লক্ষ্য করা যায়। কুন্দ, কপালকুণ্ডলা ও মনোরমার ন্যায় ভাগ্যহতা ; পক্ষান্তরে নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও হীরা প্রত্যেককেই নিজ নিজ জীবনে স্বরোপিত বিষবৃক্ষের ফলভোগ করিতে হইয়াছে। এই উপন্যাসে অসংযমের দুঃখময় পরিণতির ভিতর দিয়া বঙ্কিম এই সত্য প্রচার করিয়াছেন যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সুখ নাই এবং ইহার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন সংযম শিক্ষা। ইহাই দ্বিতীয় যুগের উপন্যাসের বিশিষ্ট বাণী।

'ইন্দিরা', 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' রচনাকাল হিসাবে দ্বিতীয়

১ বঙ্কিম স্বয়ং জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন। পূর্ণচন্দ্র বলেন, মাতুলের নিকট হইতে বঙ্কিম মাতামহের বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'জ্যোতিষ ও তন্ত্রের পুঁথিও ছিল। সেজন্য তিনি ফলিত-জ্যোতিষ শিখিয়াছিলেন।'

'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মশিক্ষা'—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ৯৩ পৃঃ।

যুগের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহাদের স্থান স্বতন্ত্র; হালকা গল্পের ভিতর দিয়া 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন এস্থলে বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু পরবর্ত্তী উপন্যাস 'চন্দ্রশেখরে' নীতিবেত্তা বঙ্কিমের কণ্ঠস্বর 'বিষবৃক্ষ' হইতে সুস্পষ্ট এবং এই উপন্যাসে শৈবলিনীর অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পরিকল্পনার পশ্চাতে রহিয়াছে অসংযম-অসহিষ্ণু বঙ্কিমের কঠিন অনুশাসন। এ ক্ষেত্রে রমানন্দ স্বামী বঙ্কিমের মুখপাত্রস্বরূপ।

'চন্দ্রশেখরে'র গৌণ উদ্দেশ্য সাধারণভাবে নীতিশিক্ষা নহে; এই উপন্যাসে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বঙ্কিমের প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই 'চন্দ্রশেখরে'র বিশিষ্ট সুর এবং পরবর্ত্তী উপন্যাস 'রজনী'তেও এই বিশিষ্ট সুর লক্ষ্য করা যায়। 'চন্দ্রশেখরে' চন্দ্রশেখরের প্রতি রমানন্দ স্বামীর উপদেশ (চন্দ্রশেখর ৩।১, ৫৭-৫৮ পৃঃ) এবং 'রজনী'তে সন্ন্যাসী ঠাকুর ও শচীন্দ্রের প্রশ্নোত্তর (রজনী ৩।৬) 'ধর্ম্মতত্ত্বে' গুরুশিষ্য সংবাদ স্মরণ করাইয়া দেয়।

বঙ্কিম নিজেই বলিয়াছেন, প্রথম জীবনে তিনি নাস্তিক ছিলেন।[১] এই সময় তিনি পাশ্চাত্ত্য নিরীশ্বরবাদী বা সংশয়বাদী দার্শনিকগণের চিন্তা-ধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম জীবন অনির্দ্দিষ্ট-কাল এবং বঙ্কিমের কোন উপন্যাসই প্রকৃতপক্ষে 'নাস্তিক্যগন্ধি' নহে। কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে'র পূর্ব্বে তাঁহার অপর কোন রচনায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন নাই। নাস্তিক বঙ্কিমের মনে কবে, কেমন করিয়া ঈশ্বরবিশ্বাস এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিল, তাহার ইতিহাস আজ হয়ত জানিবার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন:

[বঙ্কিমচন্দ্র] যখন হুগলীতে বদলী হইয়া আসিলেন, তখন কয় বৎসর পিতৃদেবের নিকট থাকিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। কিছুকাল চুঁচুড়ায় থাকিতে হইয়াছিল; তথাপি রবিবারে রবিবারে কাঁটালপাড়ায় আসিতেন। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা হইল।......তাঁহার একমাত্র উপদেষ্টা ছিলেন আমাদের পিতৃদেব।..........

বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুড়ায় থাকাকালেই পিতৃদেবের মৃত্যু ঘটে। [১৮৮১ খ্রীঃ] এই ঘটনার পরেই তাঁহার ভিতরে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়। ইহার পর যাহা লিখিতেন তাহাই হিন্দুধর্ম্ম বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লিখিতেন; ইহার পর যে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই এই উদ্দেশ্য থাকিত।[২]

৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' ১ম প্রস্তাব—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ১৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মশিক্ষা'—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ৯৩-৯৪ পৃঃ।

শচীশচন্দ্রের বিবরণ এইরূপ : '১২৮২ সালের চৈত্র মাসে—ইংরেজী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে—বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলী হইলেন।........এই সময় তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সমুদিত হয়।......১২৮৩ সালের শেষভাগে বঙ্কিম-চন্দ্রের ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হয়—....ধর্ম্মভাবের সূচনা পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু হইয়াছিল—কোনও কারণ অবলম্বনে সহসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। যখন তাঁহার জেষ্ঠ্যা কন্যা আসন্নপ্রসবা তখন তিনি রাধাবল্লভের মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া সাশ্রুনয়নে ঠাকুরকে কত ডাকিয়াছিলেন। লোক-চক্ষুর সম্মুখে এই তাঁহার প্রথম ডাক। তারপর দুই তিনি বৎসর যাইতে না যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আবার কাতর হইয়া রাধাবল্লভের চরণে পড়িতে দেখিলাম। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র কঠিন রোগাক্রান্ত—মরণাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে নিশিশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রিতাবস্থায় নবদুর্ব্বাদলশ্যাম বংশীবদন রাধাবল্লভকে স্বপ্ন দেখিলেন। পরদিন ঠাকুরের নির্ম্মাল্য আনিয়া শিশুর মাথায় দিলেন। শিশু অচিরে আরোগ্যলাভ করিল। তদবধি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হইল।'[১]

পূর্ণচন্দ্র ও শচীশচন্দ্র উভয়ের মতে হুগলী বদলী হইবার পর হইতে বঙ্কিম হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' এবং 'রজনী' উভয় উপন্যাসই তৎপূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছে। শচীশচন্দ্র যে দুইটি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাহার সন তারিখ দেন নাই ; কিন্তু তাঁহার লেখা হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহার মতে প্রথমোক্ত ঘটনা ১২৮৩ সালের 'দুই তিন বৎসর' পূর্ব্বের কথা এবং শেষোক্ত ঘটনা হয়ত ঐ সালের শেষের দিকে ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? বঙ্কিমের জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান এবং তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে[২] অর্থাৎ ১২৬৭ সালের জৈষ্ঠ্য/আষাঢ় মাসে। সুতরাং ১২৮৩ সালের পূর্ব্বে প্রথমোক্ত ঘটনা সম্ভব হইলেও দ্বিতীয়োক্ত ঘটনা সম্ভবতঃ ইহার পরের কথা। সুতরাং শচীশচন্দ্রের হিসাবে হয়ত কোথাও কিছু গরমিল হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই উভয় ঘটনার পূর্ব্বেই 'চন্দ্র-শেখর' সম্পূর্ণ এবং 'রজনী' অন্ততঃ আংশিক প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কারণ 'চন্দ্রশেখর' 'বঙ্গদর্শনে' সম্পূর্ণ হইয়াছে বঙ্কিমের দ্বিতীয়বারের বিবাহের কিঞ্চিদধিক চৌদ্দ বৎসব পরে ১২৮১ সালের ভাদ্রসংখ্যায় এবং 'বঙ্গ-

১ বঙ্কিম-জীবনী, ১৪৩-৪৪ পৃঃ।
২ বঙ্কিম-জীবনী, ১১৩ পৃঃ।

দর্শনে'র পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতেই 'রজনী' প্রকাশিত হইতে থাকে। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি বঙ্কিমের অনুরাগের প্রথম নিদর্শন হিসাবে এই উভয় উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। বঙ্কিমের ধর্ম্মমত এখনও দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই সত্য; কিন্তু তিনি সংশয় কাটাইয়া শক্ত জমিতে পদার্পণ করিয়াছেন।

যাঁহারা ঈশ্বরাভিপ্রেত জীবন যাপন করেন, এই সময় হইতে তাঁহাদের শক্তি সম্বন্ধেও বঙ্কিম সচেতন হইয়াছেন। প্রথম যুগের উপন্যাসে এবং 'বিষবৃক্ষে' কুন্দের চিত্রে মানুষ নিয়তির হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। শেষোক্ত উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ স্বরোপিত বিষবৃক্ষের ফলভোগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিও (নিয়তি না হইলেও) প্রবৃত্তির সম্মুখে সম্পূর্ণ শক্তিহীন। 'চন্দ্রশেখরে' এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর মিশ্রণ লক্ষণীয়। এই উপন্যাসে ভাগ্যহতা দলনীর পার্শ্বে দেখিতে পাই রমানন্দ স্বামীকে, যিনি সাধনা দ্বারা অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং প্রয়োজনানুরূপ সেই শক্তি শৈবলিনী ও ফষ্টরের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। 'রজনী'তে সন্ন্যাসী ঠাকুর রমানন্দ স্বামীর ন্যায় অতিমানব নহেন, কিন্তু তিনিও অলৌকিক শক্তির অধিকারী। বঙ্কিমের ভাবধারার ক্রমাভিব্যক্তির নিদর্শন হিসাবে ইহা তাৎপর্য্যপূর্ণ।

পরবর্ত্তী উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' 'বিষবৃক্ষে'র ন্যায় অসংযমের কুফল প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই উপন্যাসে বঙ্কিম প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয়তার উপর অতখানি জোর দেন নাই; গোবিন্দলাল কতকটা স্বেচ্ছায় প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের চরিত্রাঙ্কনে এই মৌলিক পার্থক্য পরোক্ষে এবং নঞর্থকভাবে হইলেও, মানবশক্তিতে বঙ্কিমের ক্রমবর্দ্ধমান প্রত্যয়ের অন্যতম নিদর্শন এবং 'পরিশিষ্টে' সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের চিত্র শুধু নীতিবেত্তা বঙ্কিম নহেন, বিশেষ করিয়া ভগবদ্ভক্ত বঙ্কিমের পরিচয় দেয়। 'রজনী'তে সর্ব্বত্যাগী অমরনাথের চিত্রে যাহার ক্ষীণ আভাস, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের চিত্রে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথম সংস্করণে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি গোবিন্দলালের মৃত্যুতে এবং ১৮৯২ সালের চতুর্থ সংস্করণে, অর্থাৎ 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' এবং 'সীতারামে'র পরবর্ত্তী-কালে তাঁহার এই নূতন পরিণতি পরিকল্পিত হইয়াছে। 'ত্রয়ী'র সহিত ইহার ভাবধারার সাদৃশ্যের ইহাই মূল কারণ।

'রাজসিংহ' দ্বিতীয় যুগের শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসে হিন্দুর

বাহুবল প্রতিপাদ্য হইলেও রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের জয়পরাজয়ের মধ্যে বঙ্কিম ঐশী নিয়ম লক্ষ্য করিয়াছেন এবং 'উপসংহারে' তিনি ইহার ব্যাখায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা 'ত্রয়ী'র দৃষ্টিভঙ্গীর দ্যোতক। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের পরিবর্ত্তিত পরিণতির ন্যায় এই 'উপসংহার'ও 'ত্রয়ী'র পরবর্ত্তীকালে (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণে নূতন সংযোজনা। এবং ইহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই সময় নূতন চরিত্র ও কাহিনী সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিম উপন্যাসখানিকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দিয়াছেন। এই হিসাবে 'পুনঃ-প্রণীত' 'রাজসিংহ'কে বঙ্কিমের শেষ উপন্যাস বলা যাইতে পারে। কিন্তু 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র ব্যাখ্যা হিসাবে 'ত্রয়ী' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্য্যায়ের। এই কারণে প্রথম সংস্করণের তারিখ ধরিয়া ইহাকে দ্বিতীয় যুগের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

বঙ্কিমের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে 'সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধারে'র পরিকল্পনায়।[১] এস্থলে লক্ষণীয় এই যে, তরুণ বঙ্কিম 'কপালকুণ্ডলা'য় যে প্রকৃতিকে নিয়োজিত করিয়াছেন বিচারবিহীন, উদ্দেশ্যহীন নির্ম্মম ধ্বংসকার্য্যে, এ ক্ষেত্রে সেই প্রকৃতিকেই তিনি ভক্তের উদ্ধারকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। ইহা তাৎপর্য্যপূর্ণ। 'সীতারাম' উপন্যাসেও আখ্যায়িকার পরিবেশনগুণে মনে হয় যেন চরম সঙ্কটকালে সীতারামের প্রার্থনায় সাড়া দিয়াই 'নিরুপায়ের উপায়' তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রকন্যার সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। (সীতারাম ৩।২১-২৩, ১৪৫-৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ঐশী শক্তি এবং ঐশী বিধানকে প্রাধান্য দিতে যাইয়া বঙ্কিম কোন কোন উপন্যাসে নিয়তিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে (দলনী ও মবারকের জীবনে) তিনি নিয়তিকে অপেক্ষাকৃত অন্তরালে রাখিয়াছেন এবং একটি ক্ষেত্রে (চঞ্চলকুমারীর জীবনে) নিয়তির প্রভাব একেবারেই উপেক্ষণীয়। কিন্তু কোন সময়েই বঙ্কিম নিয়তিকে অস্বীকার করেন নাই। (চঞ্চলকুমারীর ক্ষেত্রেও অদৃষ্টগণনা অন্ততঃ ব্যর্থ হয় নাই) এবং তাঁহার শেষ উপন্যাস 'সীতারামে' শ্রীর অদৃষ্টগণনার ভিতর দিয়া তিনি নিয়তিকে পুরাপুরি প্রাধান্য দিয়াছেন।

প্রথম যুগের উপন্যাসে এবং পরবর্ত্তীকালে যে সকল উপন্যাসে নিয়তির পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহার কোন কোন স্থলে মানবশক্তির বিরাট অপচয়

১ ধর্ম্মতত্ত্ব ১৯, ৯৭ পৃঃ ও ঐ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পাঠককে বিস্ময়বিমূঢ় করে। আয়েষার পার্থিব জীবনের নিষ্ফলতার সার্থকতা কি? নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, মনোরমা, কুন্দ ও দলনীর শোচনীয় পরিণতির পশ্চাতে বিশ্বস্রষ্টার কোন্ সে নিগূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে—পাঠকের মনের এই সকল এবং অনুরূপ প্রশ্নের সহজবিচারবুদ্ধিপ্রসূত কোন সদুত্তর নাই। যে সকল স্থলে নিয়তির পরিকল্পনা নাই, সে সকল স্থলেও যে কোথাও কোথাও করুণ ট্র্যাজেডির চিত্র নাই তাহা নহে। উদাহরণস্বরূপ প্রতাপ ও ভ্রমরের মৃত্যুর উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি অমূল্য জীবনের পরিণতি যতই দুঃখের হউক, ইহাদের জীবনে পরম সার্থকতা রহিয়াছে। নিয়তির বিধান এবং ঐশী বিধানের পরিকল্পনায় এই মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়।

মানবের অদৃষ্টের মধ্যে শৃঙ্খলার সূত্র আবিষ্কার করিতে যাইয়া বঙ্কিম কখন কখন নিয়তিব অনতিক্রমনীয়তার সহিত ঐশী বিধানের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। 'রাজসিংহে' মবারকের মৃত্যু শুধু নিয়তির বিধান নহে, ঐশী নিয়মও এক্ষেত্রে একই বিধান দেয়। 'সীতারামে' তোরাব্ খাঁর আক্রমণ হইতে সীতারাম কর্তৃক নগর রক্ষা ব্যাপারে বঙ্কিম পুরুষকার, নিয়তি[১] এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানের সুন্দর সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। এবং একই উপন্যাসে গঙ্গারামের মৃত্যু সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, এইরূপে শুধু শ্রীর অদৃষ্টগণনাই সফল হয় নাই; বঙ্কিম দেখাইতেছেন যে, সীতারাম ক্ষমা করিলেও বিধাতার ন্যায়বিচারে গঙ্গারাম অব্যাহতি পায় নাই। পরন্তু, ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হইয়া শ্রী জয়ন্তীর সাহায্যে বাজকার্য্যে যে অন্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে,[২] ভ্রাতার মৃত্যুর নিমিত্তরূপিণী হইয়া তাহাকে তাহার শাস্তি পাইতে হইল। ইহাই ঐশী বিধান। কিন্তু বঙ্কিমের ধর্ম্মানুভূতি যাহাই বলুক, বাস্তব জগতের সীমাবদ্ধ জীবনে মানবের অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয় রহস্য কোনও বাঁধাধরা নৈতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা চলে না। হয়ত এই কারণেই বঙ্কিম কখন পৃথক পৃথকভাবে নিয়তি বা ঐশী বিধানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কখন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন, কখন দার্শনিকের উচ্চ আসন হইতে

১ এস্থলে গঙ্গাধর স্বামী কর্ত্তৃক শ্রীর অদৃষ্টগণনার ভিতর দিয়া নিয়তির প্রভাব সূচিত হইয়াছে। যথাস্থানে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিব।

২ গঙ্গারামের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা ব্যাপারে শ্রীর পরোক্ষ হাত রহিয়াছে, গঙ্গারামকে মুক্তিদান-কালে জয়ন্তী তাহাকে স্পষ্টই সে কথা জানাইয়া দিয়াছে: "শ্রী বাঁচিয়া আছে। তার অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। ভিক্ষা পাইয়াছি।" (৩৫, ১০০ পৃঃ)। তাহার কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে সীতারামের জেরার উত্তরে শ্রীও এই সত্য অস্বীকার করিতে পারে নাই (৩৭, ১০৩ পৃঃ)।

প্রচার করিয়াছেন, 'সুখদুঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র—সুখদুঃখের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই।'[১]

'আনন্দমঠ' হইতে বঙ্কিমের উপন্যাসে নূতন সুর লক্ষ্য করা যায়। ইহাই তৃতীয় যুগের অর্থাৎ তত্ত্বমূলক উপন্যাসের বিশিষ্ট সুর; 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' তৃতীয় যুগের 'ত্রয়ী'। জীবনব্যাপী সাধনার ফলে বঙ্কিম হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব যেমন বুঝিয়াছেন, 'ধর্ম্মতত্ত্বে' তিনি যাহা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 'ত্রয়ী'তে তাহারই মর্ম্মকথা তিনি যথাযোগ্য কাহিনী এবং চরিত্রের পরিকল্পনার ভিতর দিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। বঙ্কিম বলিয়াছেন, 'ভগবদ্‌গীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত।' (ধর্ম্মতত্ত্ব ১৯, ৯৫ পৃঃ)। তাঁহারই ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, 'ধর্ম্মতত্ত্বে' যাহা উপদেশ, 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' এবং 'সীতারামে' তাহাই 'উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত।' 'ত্রয়ী'তে বঙ্কিম শুধু নীতিবেত্তা নহেন, তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা। সুতরাং বঙ্কিমের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'একটি কথা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথম জীবনে বঙ্কিম যে সকল পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন তন্মধ্যে কোঁতে (Auguste Comte) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তীকালে ভগবদ্‌ভক্ত বঙ্কিম এই পাশ্চাত্ত্য মনীষীর মতবাদের সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া[২] গীতার বাণী অবলম্বনে ধর্ম্মের এমন এক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ

১ ধর্ম্মতত্ত্ব ২, ৭ পৃঃ। 'চন্দ্রশেখরে' রমানন্দ স্বামীর কণ্ঠেও অনুরূপ উক্তি শুনিতে পাই।
(চন্দ্রশেখর ৬।১, ৫৭-৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

২ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম কোঁতের মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। (ধর্ম্মতত্ত্ব, ক্রোড়পত্র খ, ১৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কোঁতে বলেন: 'Religion in itself expresses the state of perfect unity which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose.' বঙ্কিম ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত সত্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী কোঁতে ঈশ্বরের স্থানে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার Cultus of Humanity প্রচার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে গীতার বাণীপুষ্ট বঙ্কিম ঈশ্বরবিহীন ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পারেন নাই; তাঁহার মতে বৃত্তিসমূহকে ঈশ্বরমুখী করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ 'one common purpose'। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' ১।১, ৩৫-৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পরোপকারব্রতী নবকুমার, 'বিষবৃক্ষে'র ব্রহ্মচারী ঠাকুর এবং এমন কি 'চন্দ্রশেখরে' রমানন্দ স্বামী Cultus of Humanity-র পূজারী। 'ত্রয়ী'র বঙ্কিমের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তীকালের বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য লক্ষণীয়। অবশ্য ভগবদ্‌ভক্ত বঙ্কিমও পরোপকার বৃত্তিকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন, তফাৎ এই যে, পরোপকার আর প্রধান লক্ষ্যবস্তু নহে, ইহা বৃহত্তর মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পন্থাস্বরূপ।

করিয়াছেন যাহা সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্দ্ধে। এই ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম বা মনুষ্যত্ব। শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জনী—এই চতুর্বিধ বৃত্তির 'উপযুক্ত স্ফুর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যে' ইহার পূর্ণ বিকাশ।[১] ইহা অনুশীলনসাপেক্ষ এবং অনুশীলনতত্ত্বের মূল কথা এই যে, সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির মধ্যে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের এইরূপ অনুশীলন করিতে হইবে যাহাতে কোন বৃত্তি অপর কোন বৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি না পাইতে পারে।[২] কিন্তু বৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্যের মাপকাঠি কি? বঙ্কিম বলেন, যখন সকল বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী হইবে, অর্থাৎ যখন ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া মানুষ তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদন করিবে, তখনই বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য হইল বুঝিতে হইবে। ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব, ইহাই ভক্তি।[৩] 'ত্রয়ী'তে বঙ্কিম হিন্দুধর্ম্মের শাশ্বত সত্য এই ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

'আনন্দমঠে'র স্বল্প-পরিসর 'উপক্রমণিকা' বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এবং এই 'উপক্রমণিকা'র বাণী সম্মুখে রাখিয়াই আমাদিগকে সত্যানন্দ তথা সন্তানসম্প্রদায়ের কার্য্য ও আদর্শের বিচার করিতে হইবে। সত্যানন্দ ঠাকুর (সন্তানসম্প্রদায়ের ইনিই শক্তির উৎস) সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রীতিবৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি তাঁহার দেশপ্রীতিকে ঈশ্বরমুখী করিতে শিক্ষা করেন নাই। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে শিক্ষা এবং সাধনার এই অসম্পূর্ণতার জন্যই জয়ের মুহূর্ত্তে তাঁহার নিকট বিসর্জ্জনের আহ্বান আসিল। কারণ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য 'জীবনসর্ব্বস্ব' যথেষ্ট নহে, ইহার জন্য চাই ভক্তি।

ভক্তিতত্ত্বের দিক দিয়া 'আনন্দমঠে'র যেখানে পরিসমাপ্তি, 'দেবী চৌধুরাণী'র সেখানে আরম্ভ। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিম ভক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন; 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লের চরিত্রে বঙ্কিম ভক্তির আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে চাহিয়াছেন—প্রফুল্ল নিষ্কাম কর্ম্মসাধনার, অর্থাৎ ভক্তির প্রতীক।

দেহীমাত্রকেই কর্ম্ম করিতে হইবে। কারণ

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
>
> ভগবদ্গীতা ৩।৫

১—২ ধর্ম্মতত্ত্ব ৫, ২২ পৃঃ এবং ঐ ৯, ৫২ দ্রষ্টব্য।
৩ 'যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।' (ধর্ম্মতত্ত্ব ১১, ৬৫ পৃঃ) এবং 'ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।' (ঐ, ৬৬ পৃঃ)।

অর্থাৎ, 'কেহই কখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে প্রকৃতিজাত গুণসকলের দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।'[১] অথচ বিষয়ের ধ্যান বিনাশের হেতু:

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।

ভগবদ্গীতা ২।৬২, ৬৩

সীতারামের চরিত্রে ইহাই বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য।

তাহা হইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি?

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।

ভগবদ্গীতা ৩।৯ প্রথম পঙ্ক্তি

অর্থাৎ, যজ্ঞার্থ, অর্থাৎ 'ঈশ্বারার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধন মাত্র,'[২] সুতরাং অনুষ্ঠেয় নহে। 'যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।'[৩] ইহাই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায়। ইহাই কর্ম্মসন্ন্যাস, ইহাই ভক্তি। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ইহাই প্রফুল্লের জীবনবাণী।

প্রফুল্লের জীবন কর্ম্মের ভিতর দিয়া পূর্ণতা লাভ করিল এবং তাঁহার অনাসক্ত মনের সোনার কাঠির স্পর্শে ব্রজেশ্বরের সংসারের জড়তা ঘুচিল। পক্ষান্তরে, কর্ম্মত্যাগের অভিমানের ফলে শ্রীর নিষ্কাম সাধনা অপূর্ণ রহিয়া গেল এবং শ্রী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে একদিকে সীতারামের আসক্তি, অন্যদিকে শ্রীর অনাসক্তির বিকার—উভয় মিলিয়া সীতারামের জীবনের ব্রত ব্যর্থ করিয়া দিল। নিষ্কাম সাধনার ব্যাখ্যা হিসাবে 'সীতারাম' 'দেবী চৌধুরাণী'র পরিপূরক। 'দেবী চৌধুরাণী'তে নিষ্কাম সাধনার প্রণালী ও পরিণতি এবং 'সীতারামে' এই সাধনার পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ যত বড় জিনিষই হউক, আর্টের বিচারে ইহা উপন্যাসের গৌণ উদ্দেশ্য। 'ত্রয়ী'তে এই গৌণ উদ্দেশ্যই প্রকৃতপক্ষে মুখ্য

১ বঙ্কিমকৃত অনুবাদ—ধর্ম্মতত্ত্ব ১৪, ৭৭ পৃঃ
২-৩ ধর্ম্মতত্ত্ব ১৪, ৮০ পৃঃ।

উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির অনুকূল নহে। তাহা হইলেও মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, গীতার সারতত্ত্ব সাধারণের নিকট আকর্ষণীয় করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমের চরিত্রসৃষ্টি ও প্রতিবেশ-পরিকল্পনা অনন্যসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ধারাবাহিক আলোচনা

দুর্গেশনন্দিনী

'দুর্গেশনন্দিনী' রোমান্সবহুল প্রণয়কাহিনী এবং এই প্রণয়কাহিনী ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যায় মোগল-পাঠানের বিরোধ এবং মোগল কর্তৃক উড়িষ্যাবিজয়—এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ঐতিহাসিক উপাদান ষ্টুয়ার্ট সাহেবের (Charles Stewart) বাংলার ইতিহাস হইতে গৃহীত।[১] মানসিংহ, জগৎসিংহ, কতলু খাঁ, ওসমান ও ইসা খাঁ ঐতিহাসিক চরিত্র এবং ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে পাঠানের হস্তে জগৎসিংহের বন্দিত্বের উল্লেখ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক মোগল-পাঠানের বিরোধকে পটভূমিকা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনের যে সকল সুখ-দুঃখের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে মুখ্যতঃ তাহা ঔপন্যাসিকের কল্পনার সৃষ্টি।

বঙ্কিমানুজ ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, 'আমাদের মেজঠাকুরদাদার [খুল্লপিতামহের] মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম, জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিংবদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন, এবং মান্দারণের জমীদারের গড় ও বৃহৎপুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। রাজপুত-কুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হইল।'[২] 'মেজঠাকুরদা'র গল্প 'দুর্গশনন্দিনী'র গল্পাংশের অন্যতম উৎস। এবং নিঃসন্দেহ এই গল্প হইতেই বঙ্কিম উপন্যাস-রচনার প্রেরণা পাইয়াছেন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল (১৩৭১ সালের ২১শে চৈত্র)

১ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

২ 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা'—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ৫০ পৃঃ।

রবিবাসরীয় ষ্টেট্স্‌ম্যান্' পত্রিকায় (The Statesman—Letters to the Editor section) পত্রলেখক চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় অপর একটি তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র গল্লাংশের উৎস হিসাবে তিনি রাজমহলের পাশ্ববর্ত্তী মণিহারী অঞ্চলে প্রচলিত একটি কাহিনীর উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার উক্তির সমর্থনে ও'ম্যালির (L.S.S. O'Malley) সাঁওতাল পরগণার গেজেটিয়ার (Gazetteer of the Santal Parganas) হইতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দিয়াছেন: Mangarh, a mouza contiguous to Kasba, is associated with the memory of Akbar's general Man Singh. The story current among the people of the place is that when Man Singh came to conquer Bengal, he encamped at Manihari and built a fort which was called Mangarh after him. Legend also relates that his son Jagat Singh married the daughter of Birendra Singh, the chieftain of the *tappa*, without his father's permission. Bikram Kita is said to have been the capital of Birendra Singh, and there are still remains of a fortress there called Bimligarh after Bimala, his wife and step-mother of Jagat Singh's bride.'[১] অর্থাৎ, কস্‌বার পার্শ্ববর্ত্তী মানগড় মৌজার সহিত আকবরের সেনাপতি মানসিংহের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এই গল্পটি প্রচলিত আছে যে, বাংলা বিজয়াভিযানকালে মানসিংহ মণিহারীতে শিবির স্থাপন করেন এবং সেখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; তাঁহার নামানুসারে এই দুর্গের নাম মানগড়। কিংবদন্তী এইরূপ যে, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ পিতার বিনানুমতিতে উক্ত তপ্পের[২] অধিনায়ক বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। কথিত আছে যে বীরেন্দ্রসিংহের রাজধানী ছিল বিক্রমকিতা এবং সেখানে এখনও একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী এবং জগৎ-সিংহের নবোঢ়া পত্নীর বিমাতা বিমলার নামানুসারে এই দুর্গের নাম বিমলিগড়।

ইহা লক্ষণীয় যে উপন্যাসের মান্দারণাধিপতির ন্যায় উপরোদ্ধৃত কাহিনীর মণিহারীর অধিনায়কের নাম বীরেন্দ্রসিংহ; উভয় স্থলেই বীরেন্দ্রসিংহের পত্নীর নাম বিমলা এবং জগৎসিংহের নবোঢ়া পত্নী বিমলার সপত্নীকন্যা। এরূপ সাদৃশ্য আকস্মিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ

১ Gazetteer of the Santal Parganas (Second Edition), p. 395.

২ তপ্পে-পরগণার অংশ বিশেষ; গ্রাম সমষ্টি। —পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'।

অনুমান অযৌক্তিক নহে যে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র গল্পাংশে 'মেজঠাকুরদা'র গল্প এবং ও'ম্যালি বর্ণিত কাহিনী—এতদুভয়ের মিশ্রণ রহিয়াছে। অবশ্য কাহিনী দুইটি বঙ্কিমকে কতখানি সাহায্য করিয়াছে উপরোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে তাহা অনুমান করা সম্ভব নহে। সম্ভবতঃ এই দুইটি উৎস হইতে তিনি উপন্যাসের কাঠামো মাত্র পাইয়া থাকিবেন। ইহার উপর রং ফলাইয়া এবং আয়েষা-কাহিনী সংযোজনায় যে পূর্ণাবয়ব কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে কল্পনা-কুশল তরুণ ঔপন্যাসিকের সহজাত সৃজনী প্রতিভা।

এক্ষণে প্রশ্ন এই: আয়েষা-কাহিনীর উৎস কোথায়?

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইলে ইহার গল্পাংশের সহিত 'আইভ্যানহো'র (Ivanhoe) গল্পাংশের সাদৃশ্য, বিশেষ করিয়া রেবেকার (Rebecca) চরিত্রের সহিত আয়েষার চরিত্রের আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য স্বভাবতঃই পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেহ কেহ ইহা লইয়া বিরুদ্ধ সমালোচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম স্কটের নিকট ঋণী নহেন, একথা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "তিনি [বঙ্কিমচন্দ্র] বলিয়াছিলেন,—'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার আগে 'আইভ্যানহো' পড়ি নাই।"[১] ইহার পর আর সুধীসমাজে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তথাপি উভয় উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করিলে ইহাদের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। 'আইভ্যানহো' এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যায়িকার সাদৃশ্য সংক্ষেপতঃ এইরূপ: আহত যুবক-যোদ্ধার শুশ্রূষা করিতে যাইয়া শুশ্রূষাকারিণী যুবতীর মনে প্রণয় সঞ্চার হইল। কিন্তু ধর্ম্মের বৈষম্য উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে বুদ্ধিমতী যুবতী বুঝিল, তাহার প্রণয়তৃষ্ণা মিটিবার নহে। সুতরাং আত্মমর্য্যাদাশালিনী উদার-চেতা যুবতী যুবকের অন্তরজয়ের ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া, যুবকের প্রণয়িনীর সহিত তাঁহার মিলনের ক্ষণে ভগিনীস্থানীয়া পতিসোহাগিনীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নীরবে বিদায় লইল। এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে: উভয় উপন্যাসে এই যে সাদৃশ্য, বঙ্কিম যদি স্কটের নিকট ঋণী নহেন তাহা হইলে ইহা কি সম্পূর্ণ আকস্মিক?

আয়েষার চরিত্রের পরিকল্পনায় ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র রোসিনারার প্রভাবের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যে প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে তাহার সুষ্ঠু উত্তরের জন্য ভূদেবের উপন্যাসের উৎস 'দি মারাঠা

১ 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র'—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ১০৬ পৃঃ।

চিফে'র সহিত 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে তাহার আংশিক আলোচনা প্রয়োজন।

'দি মারাঠা চিফে' দেখিতে পাই শিবজী যখন বাদশাহজাদীর অবমাননাকারী কামোন্মাদ সেনানীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া তাহার যোগ্য শাস্তিবিধান করিলেন, তখনই রোসিনারা তাঁহার শৌর্য্য ও ঔদার্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।[১] আহত শিবজীর শুশ্রূষা এবং পূর্ব্ব হইতে গুণমুগ্ধ হইলেও ইহার ফলে রোসিনারার অন্তরে প্রণয়সঞ্চার (রেবেকা কর্তৃক আহত উইলফ্রেডের শুশ্রূষা এবং ইহার ফলে রেবেকার অন্তরে প্রণয়সঞ্চার তুলনীয়) অথচ কর্ত্তব্যবোধে শিবজীর প্রণয়প্রত্যাখ্যান 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' নূতন সংযোজনা। এই প্রণয়প্রত্যাখ্যানের ফলে রোসিনারাকে আমরা যে রূপে দেখিতে পাই এবং যে রূপে তিনি রেবেকা ও আয়েষার সমগোত্রীয়া, 'দি মারাঠা চিফে'র রোসিনারা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। 'দি মারাঠা চিফে'র রোসিনারা শিবজীর পত্নী এবং বিশ্বাসঘাতক সেনানীর কৃতঘ্নতায় আরঙ্জেবের পক্ষে যখন তাঁহাকে উদ্ধার করা সম্ভব হইল, তখন তিনি শিবজীর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন এবং ইহাই তাঁহার প্রতি বাদশাহের ক্রোধের কারণ।[২] উক্ত গ্রন্থে বন্দী শিবজীর উদ্ধারের কাহিনীও অন্যরূপ: রোসিনারা একজন বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে শিবজীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিলেন। তাঁহার এই অনুচরটি পুষ্পবিক্রেতার ছদ্মবেশে শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং ইহারই আনুকূল্যে শিবজী পুষ্পবিক্রেতার ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন এবং পূর্ব্ব-পরিকল্পনানুযায়ী রোসিনারা কৌশলে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।[৩] শিবজীর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন নাই। বস্তুতঃ যেহেতু তিনি শিবজীর পত্নী সেই হেতু এরূপ প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নও ওঠে না।

উভয় কাহিনীতে অপর যে সকল পার্থক্য রহিয়াছে এ স্থলে তাহার উল্লেখ

This feat of gallantry in vindication of the insult offered to the daughter of Aurungzebe completely decided her affection. She accepted the Mahratta's proposal and from this time felt a greater pride in being the wife of a petty sovereign than the daughter of a mighty emperor. The Mahratta Chief—(The Romance of History Vol. III, p. 289).

Aurungzebe was greatly exasperated when he discovered that she (Rochinara) was about to be a mother...She was confined to the harem, and he refused to see her. As soon as the babe was born, it was taken from her and put under the care of a nurse. —Ibid pp. 301-02

The Mahratta Chief, Chapters V & VI.

নিষ্প্রয়োজন। আমাদের আলোচনার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, যে সকল পার্থক্যের উল্লেখ করা হইল তাহার সবগুলিই ভূদেবের উপর স্কটের প্রভাবের ইঙ্গিত করে। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হইবে না যে, স্কটের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন ভূদেব এবং ভূদেব প্রভাবিত করিয়াছেন বঙ্কিমকে। এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'আইভ্যানহো'র আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্যের একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

কিন্তু সাদৃশ্য যতই প্রকট হউক, উভয় উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র নায়ক জগৎসিংহ পিতার স্নেহের পাত্র; 'আইভ্যানহো'র নায়ক উইলফ্রেড্ (Wilfred) পিতার ত্যাজ্যপুত্র, তাঁহার পরিচয় তিনি 'ডিস্ইন্হারিটেড নাইট' (Disinherited Knight)। জগৎসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী ওসমান প্রণয়ে নৈরাশ্যহেতু ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইলেও উদারচরিত্র; উইলফ্রেডের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রায়েন দ্য বোয়া গিলবার্ট (Brian de Bois-Guilbert) লম্পট ও অনুদার। এইরূপ, আইভ্যানহো (উইলফ্রেড)-রওয়েনা (Ivanhoe-Rowena) আখ্যায়িকার সহিত জগৎসিংহ-তিলোত্তমা আখ্যায়িকার মূলতঃ পার্থক্য রহিয়াছে। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রণয়াকৃষ্ট হইয়াছেন, আইভ্যানহো ও রওয়েনার ন্যায় তাঁহাদের প্রণয় পরস্পরের সান্নিধ্যসঞ্জাত নহে এবং যে সন্দেহের ছায়া জগৎসিংহের বিচারবুদ্ধি সাময়িক আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে তিলোত্তমার প্রতি বিরূপ করিয়াছে, রওয়েনা শত্রুর দুর্গে বন্দিনী থাকিলেও সে সন্দেহের ছায়া কখনও আইভ্যানহোকে স্পর্শ করে নাই। রেবেকা ও আয়েষার আবেষ্টনগত পার্থক্যও লক্ষণীয়। রেবেকা লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত ইহুদী বংশসম্ভূতা, আয়েষা নবাবনন্দিনী। অবস্থার এই তারতম্য হেতু রেবেকার প্রতি আইভ্যান্হোর এবং আয়েষার প্রতি জগৎসিংহের আচরণে তাৎপর্য্যপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে। জগৎসিংহ আয়েষার নিকট শুধু কৃতজ্ঞ নহেন, নবাবনন্দিনীর প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। পক্ষান্তরে জীবনদাত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া আইভ্যান্হো তাহার উদ্ধারকল্পে জীবন বিপন্ন করিলেও, তিনি ইহুদী জাতির প্রতি তৎকালীন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অনুদারতার ঊর্দ্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকিয়াও যে মুহূর্ত্তে তিনি শুশ্রূষাকারিণীর বংশপরিচয় পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত অন্তর তাহার প্রতি বিতৃষ্ণ হইল।[১]

রেবেকার শেষ বিদায়ের দৃশ্যের সহিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনুরূপ দৃশ্যের সাদৃশ্য সবচেয়ে অধিক প্রকট। কিন্তু এস্থলেও উভয় উপন্যাসের পার্থক্য

১ Ivanhoe, Chapter VIII দ্রষ্টব্য।

পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রেবেকা যখন স্বামীসৌভাগ্যবতী রওয়েনাকে বহুমূল্য রত্নহারাদি উপহার প্রদান করিয়া বিদায় লইল, স্কট সেইখানেই তাঁহার আখ্যায়িকার উপর যবনিকা টানিলেন। রেবেকা ইতিপূর্ব্বেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছে: রেবেকা ভগবৎচিন্তা ও আর্ত্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে।[১] পক্ষান্তরে, আয়েষা জগৎসিংহ এবং তিলোত্তমার প্রতি কর্ত্তব্য স্থির করিলেও, তিলোত্তমার সহিত বিদায়ের ক্ষণে তাঁহার জীবনের কোন লক্ষ্য নাই। এই কারণেই বঙ্কিম ইহার পর সর্ব্বহারা আয়েষার অন্তর্দ্বন্দ্বের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, স্কটের উপন্যাসে তাহার অনুরূপ চিত্র নাই।

বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসের ন্যায় 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনী মিশ্র ধরনের। ইহাতে দুইটি আখ্যায়িকা রহিয়াছে: এক, জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষা-ওসমান কাহিনী; দুই, বীরেন্দ্রসিংহ-বিমলা-কতলুখাঁ কাহিনী। উভয় কাহিনীর গোড়াপত্তন করিয়াছেন বিমলা এবং উভয় কাহিনীই তিনি প্রায় সমভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন। অবস্থার চাপে পড়িয়া বীরেন্দ্রসিংহ বিমলাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহার উগ্র জাত্যভিমানের ফলে বিমলাকে স্বামীর গৃহে পরিচারিকারূপে বাস করিতে হইয়াছে। হয়ত ইহারই প্রতি-ক্রিয়ায় তিনি যে অবাধ স্বাধীনতা পাইলেন, তিলোত্তমার সহিত জগৎসিংহের গোপন সাক্ষাৎ ঘটাইতে যাইয়া তাহার অপব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার জীবনে জটিলতা আসিল এবং আয়েষা ও ওসমান তাঁহাদের কাহিনীর সহিত জড়াইয়া পড়িলেন, অন্যদিকে তেমনই বীরেন্দ্রসিংহ এবং বিমলার মাঝখানে রাহুরূপী কতলুখাঁর ছায়া পড়িল, বিমলা পরোক্ষে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গধ্বংসের সহিত তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইলেন। বীরেন্দ্র-সিংহের এই যে পরিণতি, ইহাই হয়ত প্রকৃতির বিধানে অলঙ্ঘনীয় প্রতি-শোধবিধি (nemesis)। বীরেন্দ্রসিংহ বিমলার প্রতি নিষ্ঠুর অবিচার করিয়াছেন, বিমলা নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার সেই জ্ঞানকৃত অপরাধের শাস্তিবিধানের নিমিত্তরূপিণী হইলেন।

অতঃপর স্বামীহত্যার প্রতিশোধ লইয়া বিমলা বীরেন্দ্রসিংহ-বিমলা-

[১]'Among our people, since the days of Abraham downwards, have been women who have devoted their thoughts to heaven, and their actions to works of kindness to men tending the sick, feeding the hungry, and relieving the distressed. Among them will Rebecca be numbered'. Ivanhoe, Chapter XLIV.

কতলুখাঁ কাহিনীর উপর যবনিকা টানিলেন এবং তাঁহার প্রতি ওসমানের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে তিনি যে সুযোগ পাইলেন তাহার সাহায্যে তিনি তিলোত্তমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এখনও জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মিলনের প্রবল অন্তরায় রহিয়াছে। বিমলার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিলেন আয়েষা এবং আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশে এইখানেই তাঁহার ভূমিকা। তিলোত্তমা নিজের মুক্তির কথা বিস্মৃত হইয়া জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ কামনা করিলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল তাহার ফলে বুদ্ধিমতী আয়েষা জগৎসিংহের অমূলক সন্দেহের কথা বুঝিতে পারিলেন (এইখানেই এই চিত্রের প্রধান সার্থকতা) এবং তাঁহার তৎপরতায় জগৎসিংহের ভ্রান্তি ঘুচিল, জগৎসিংহ-তিলোত্তমা কাহিনীর জটিল গ্রন্থি উন্মোচিত হইল।

আখ্যায়িকার পরিবেশনে চমৎকারিত্ব 'দুর্গেশনন্দিনী'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রবল ঝটিকা ও বারিধারার মধ্যে জনহীন প্রান্তরে একমাত্র অশ্বারোহী যুবক; দুর্যোগের রাত্রে ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ দেবমন্দির; ঝটিকার বেগে নিষ্প্রদীপ মন্দির মধ্যে অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীদ্বয়ের সহিত অশ্বারোহী পুরুষের সাক্ষাৎকার —সকলই যেন রহস্যের বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া পাঠকের মনে কৌতূহলের পর কৌতূহলের উদ্রেক করিতেছে। কুমার জগৎসিংহের পরিচয় পাইয়া বয়োজ্যেষ্ঠা কেন তাঁহার নিকট নবীনার পরিচয় দিতে অসম্মত হইলেন? গড় মান্দারণাধিপ বীরেন্দ্রসিংহ কেন মহারাজা মানসিংহের নাম স্মরণমাত্র ক্রোধোন্মত্ত হইলেন? জগৎসিংহের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে বিমলা কেন বলিলেন, তাঁহার সহচরীর পরিচয় পাইলে কুমার হয়ত অসুখী হইবেন? পরিচয় পাইয়া কেনই বা জগৎসিংহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, তিলোত্তমা তাঁহার হইবে না? বীরেন্দ্রসিংহের সহিত বিমলার সম্পর্ক কি? বিমলার নিকট হইতে জগৎসিংহ কি সে গোপন কাহিনী শুনিলেন যাহার ফলে দুর্গাধিপের অজ্ঞাতে দুর্গপ্রবেশের সঙ্কোচ দূর হইল এবং সহসা তিনি বিমলার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন?—এইরূপ প্রশ্নের পর প্রশ্ন পাঠককে বিব্রত করে এবং অবশেষে জগৎসিংহের নিকট লিখিত বিমলার পত্রের ভিতর সকল সমস্যার সমাধানের সূত্র পাওয়া যায়।

কিন্তু চমৎকারিত্ব থাকিলেও 'দুর্গেশনন্দিনী'র গল্পাংশ অবাঞ্ছনীয়রূপে জটিল। এবং বিমলার পত্রে বর্ণিত ছেলেধরার হাত হইতে ওসমানের উদ্ধারের কাহিনীকে পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে মনে হয় যেন উত্তরকালে কতলুখাঁর অন্তঃপুর হইতে তিলোত্তমার উদ্ধারের ব্যবস্থা হিসাবে বিধাতা-

পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ যোগাযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন।[১] এই প্রসঙ্গে আখ্যায়িকার পরিকল্পনায় এবং পরিবেশনে কয়েকটি মৌলিক ত্রুটির উল্লেখ করা যাইতে পারে :

বিমলার যে ভুলের সুযোগ লইয়া পাঠানসৈন্য বীরেন্দ্রসিংহ এবং জগৎ-সিংহকে বন্দী করিয়া গড় মান্দারণ দুর্গ দখল করিল (সমগ্র কাহিনী অনেকাংশে এই ভুলের উপর নির্ভর করিতেছে), তাঁহার ন্যায় চতুর এবং স্থিরবুদ্ধি নারীর পক্ষে সেইরূপ ভুল কি সম্ভব এবং স্বাভাবিক? বঙ্কিম লিখিয়াছেন, 'ব্যস্ততা প্রযুক্তই হউক, বা নিকটে থাকিবেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এই বিশ্বাসজনিত নিশ্চিন্তভাব প্রযুক্তই হউক, বিমলা বহির্গমনকালে জালরন্ধ্রপথ পূর্ব্ববৎ অবরুদ্ধ করিয়া যান নাই।' (১।১৭, ৫৫ পৃঃ)। কিন্তু শৈলেশ্বরের মন্দিরে গমনকালে এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বিমলা যে সব অমঙ্গল চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল যে, শত্রুসৈন্য হয়ত তাঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যেই জগৎসিংহের অনুরোধে বর্শা আনিবার জন্য তিনি দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় 'নিশ্চিন্ততা প্রযুক্ত' দূরের কথা, 'ব্যস্ততাপ্রযুক্ত'ও এরূপ সাংঘাতিক ভুল তাঁহার পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে করা কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ, কতলু খাঁর অন্তঃপুরে আয়েষা কর্ত্তৃক জগৎসিংহের শুশ্রূষা সম্পূর্ণ অসম্ভব কাহিনী। রাজনৈতিক কারণে বন্দীর সেবাযত্ন এবং তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিবার প্রয়াস বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে পাঠানের অন্তঃপুরে বন্দী আহত রাজপুত যুবার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবার এবং তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য নবাবনন্দিনীকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন ছিল না। এরূপ চিত্র ইতিহাসসম্মত নহে। অবশ্য বঙ্কিম এই উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া দাবী করেন নাই। তাহা হইলেও যেখানে ঐতিহাসিক পটভূমিকা রহিয়াছে সেখানে সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ কল্পনা সমর্থন করা যায় না। বঙ্কিম নিজেও এরূপ চিত্রের অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন; নহিলে ওসমানের মুখে তিনি এ ব্যাপারে একটা কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করিতেন না।

১ কিন্তু যে উপায়ে ওসমানকে অতীতের এই কাহিনী জ্ঞাত করান হইয়াছে অহা তরুণ ঔপন্যাসিকের শিল্পকুশলতার পরিচয় দেয়। বিমলার পক্ষে এ সকল কথা ওসমানকে জানান সম্পূর্ণ অর্থহীন, সুতরাং সেরূপ ব্যবস্থা অস্বাভাবিক হইত। কিন্তু পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতিমত আত্মপরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বিমলা জগৎসিংহের নিকট লিখিত পত্রে ইহার উল্লেখ করিলেন এবং বন্দীর নিকট পত্র পৌঁছাইয়া দিবার পূর্ব্বে কতলু খাঁর প্রতিনিধিরূপে লিপিপাঠ করিয়া অতি স্বাভাবিকভাবেই ওসমান ইহা অবগত হইলেন।

জগৎসিংহ 'স্বাধীন আছেন কি বন্দী হইয়াছেন ?'—বিমলার এই প্রশ্নের উত্তরে ওসমান বলিতেছেন, "বন্দী বটে কিন্তু আপাততঃ কারাগারে নহে। তাঁহার অঙ্গের অস্ত্রক্ষতের হেতু পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছেন। কতলুখাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অন্তঃপুরেই রাখিয়াছি। সেখানে বিশেষ যত্ন হইবে বলিয়া রাখিয়াছি।" (২।৫)। কিন্তু ইহা অতি দুর্ব্বল কৈফিয়ত।

তৃতীয়তঃ, আয়েষাকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎসিংহ ও ওসমানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ সে যুগের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও অনাবশ্যক কাহিনী।

বঙ্কিমের কোন কোন উপন্যাসের আখ্যায়িকায় তথা চরিত্রবিশেষের জীবনে নিয়তি বা অদৃষ্ট দেবতার প্রভাবের কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছি। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ' ও 'সীতারামে' জ্যোতির্গণনার ভিতর দিয়া এই প্রভাব সূচিত হইয়াছে। জ্যোতির্গণনার মাধ্যমে অদৃষ্টবাদের পরিকল্পনার মৌলিক ত্রুটি এই যে, ইহাতে অদৃষ্টবাদকে বাহির হইতে কৃত্রিম উপায়ে আখ্যায়িকার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই যে কাজ সহজ অবস্থায় চরিত্রবিরুদ্ধ কোন কোন চরিত্রকে সেইরূপ কাজে প্রবৃত্ত করান হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', ও 'সীতারামে' এই ত্রুটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহ' কতকটা স্বতন্ত্র পর্য্যায়ের, কারণ এই দুইখানি উপন্যাসে জ্যোতির্গণনার মাধ্যমে অদৃষ্টদেবতার ইঙ্গিত থাকিলেও, ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আখ্যায়িকাকে কোন নূতন খাতে চালিত করা হয় নাই।

আলোচ্য উপন্যাসে অভিরাম স্বামী কর্ত্তৃক দৌহিত্রীর অদৃষ্টগণনার ফলে তাঁহারই উপদেশে বীরেন্দ্রসিংহ চিরশত্রু মানসিংহের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া পাঠানের বৈরিতা করিলেন। কিন্তু স্বীয় গণনা ব্যর্থ করিবার এই যে নিষ্ফল প্রয়াস ইহারই পরিণতিতে অভিরাম স্বামী নিজেই যেন অদৃষ্ট-দেবতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্তরূপী হইলেন।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠেঃ তিলোত্তমার ভাগ্যাকাশে অশুভ গ্রহরূপী *মোগল সেনাপতি কে ?* *বিমলা অবশ্য পাঠান সৈনিক করিম* বক্সের 'মোগল-সেনাপতি' নাম শুনিয়া 'শিহরিয়া উঠিলেন'। কিন্তু করিমবক্সকে তাহার দলের অপরাপর সৈনিক পরিহাস করিয়া 'মোগল-সেনাপতি' বলিয়া ডাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে সে মোগল কিনা তাহা অজ্ঞাত (সে নিজে বলিতেছে, "আমি পূর্ব্বে মোগল-সৈন্য ছিলাম"—ইহাই তাহার অতীতের পরিচয়), এবং সে সাধারণ সৈনিক মাত্র, সেনাপতি নহে। সুতরাং করিমবক্সকে বিধিনির্দ্দিষ্ট মোগল সেনাপতি বলিয়া ধরিয়া লইলে অভিরাম স্বামীর গণনা ম্যাক্‌বেথে (Macbeth)

ডাইনিত্রয়ের দ্বিতীয়বারের ভবিষ্যৎবাণীর অনুরূপ হইয়া পড়ে: বিরনাম অরণ্যানী ('the woods of Birnam') যে উপায়ে ডান্‌সিনেনে (Dunsinane) 'ভ্রমণ' করিয়া ডাইনিত্রয় কর্ত্তৃক আহূত ছায়ামূর্ত্তির ভবিষ্যৎবাণী সফল করিল, পাঠানদলভুক্ত 'মোগল-সেনাপতি' কতকটা তুল্য উপায়ে তিলোত্তমার অদৃষ্ট-লিপি সফল করিল। কিন্তু ডাইনিত্রয় সয়তানের উপাসিকা ; ম্যাক্‌বেথের সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থ ভাষার প্রয়োগে তাঁহাকে বিভ্রান্ত করা তাহাদের চরিত্রের অনুরূপ। মানবের ভাগ্যনিয়ন্তার পক্ষেও কি একই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্য্যপ্রণালী স্বাভাবিক ? 'দুর্গেশনন্দিনী'র অব্যবহিত পরেই যিনি 'কপাল-কুণ্ডলা'র অদৃষ্টদেবতার পরিকল্পনা করিয়াছেন, এরূপ চিত্রের অসঙ্গতি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, করিমবক্সকে অভিরাম স্বামীর গণনার মোগল সেনাপতি বলিয়া ধরিয়া লইলে ইহা জ্যোতিষশাস্ত্রে বঙ্কিমের বিশ্বাসের পরিচয় দেয় না ; পরন্তু মনে হয় তিনি এইরূপে জ্যোতিষ শাস্ত্রকে উপহাস করিতেছেন। অথচ বঙ্কিমের একাধিক উপন্যাসে জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার বিশ্বাসের নিদর্শন রহিয়াছে। সুতরাং অন্যত্র আমাদিগকে মোগল সেনাপতির সন্ধান করিতে হইবে।

বিমলা যাহাই বুঝিয়া থাকুন (তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থায় এরূপ ভুল সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক), মনে হয় অভিরাম স্বামীর গণনার মোগল সেনাপতি করিমবক্স নহে ; ইনি মোগল সম্রাটের উড়িষ্যা অভিযানে মানসিংহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত 'নবীন সেনাপতি' জগৎসিংহ। জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার পরিণয় তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখের প্রতীক ; কিন্তু ইহাও অতি নিষ্ঠুর সত্য যে গড় মান্দারণে জগৎসিংহের নৈশ অভিযান দুর্গাধিপ ও তাঁহার কন্যার 'মহৎ অমঙ্গলে'র কারণ হইল। বস্তুতঃ এই অমঙ্গল সঙঘটন ব্যাপারে নিজের অজ্ঞাতসারে হইলেও জগৎসিংহ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার তুলনায় করিমবক্সের ভূমিকা নগণ্য।

জগৎসিংহকে বিধিনির্দ্দিষ্ট মোগল সেনাপতি মনে করার বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, জগৎসিংহ মোগল নহেন। কিন্তু 'মোগল সম্রাটের পক্ষ হইতে নিয়োজিত'—মোগল সেনাপতির এরূপ ব্যাখ্যা হয়ত অসঙ্গত নহে। দ্বিতীয় আপত্তি অপেক্ষাকৃত ঘোরালো : জগৎসিংহকে মোগল সেনাপতি বলিয়া ধরিয়া লইলে করিমবক্সের 'মোগল-সেনাপতি' নামের উল্লেখ তাৎপর্য্যহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে বঙ্কিম হয়ত ইহাই বলিতে চাহেন যে, অদৃষ্টদেবতা নিগূঢ় উপায়ে অলক্ষ্যে নিজের কাজ করিয়া যান। মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে ইহার যতটুকু দেখিতে পায়

তাহারই ভিত্তিতে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। অভিরাম স্বামী জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ; কিন্তু তাঁহার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি শুধু এইটুকু বুঝিলেন যে, মোগল সেনাপতি তাঁহার দৌহিত্রীর 'মহৎ অমঙ্গলে'র কারণ হইবে ; এই মোগল সেনাপতিই যে একদিন তাঁহার নারীত্বকে সার্থক করিবে, ইহা তাঁহার গণনায় ধরা পড়িল না। অথবা দৌহিত্রীর অমঙ্গল আশঙ্কা হয়ত তাঁহাকে এমনই অভিভূত করিয়া থাকিবে যে, ইহার পরে আরও কি ঘটিতে পারে সে সম্বন্ধে গণনা করার মত মানসিক অবস্থা তাঁহার ছিল না। আবার অভিরাম স্বামীর দৃষ্টিতে যতটুকু ধরা পড়িল বিপদকালে বিমলা তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'সীতারামে' গঙ্গাধর স্বামীর গণনাও অভিরাম স্বামীর গণনার ন্যায় অসম্পূর্ণ (যথাস্থানে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিব) এবং 'মৃণালিনী'তে মাধবাচার্য্যের গণনা নির্ভুল হইলেও তিনি ইহার ব্যাখ্যায় ভুল করিয়াছেন। হয়ত জ্যোতিষ গণনায় এবং তাহার ব্যাখ্যায় এই সকল স্বাভাবিক ভুলভ্রান্তি এবং অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াই শেষ জীবনে বঙ্কিম জ্যোতিষগণনায় (জ্যোতিষশাস্ত্রে নহে) বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন।[১]

বস্তুতঃ তাঁহার বিভিন্ন উপন্যাসে অদৃষ্টগণনার পরিবেশন প্রণালী হইতে মনে হয় জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চা করিলেও বঙ্কিম অদৃষ্ট গণনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র 'যুগলাঙ্গুরীয়'তে দেখিতে পাই আনন্দস্বামী কর্ত্তৃক অদৃষ্ট গণনার ফলে হিরণ্ময়ীর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। অন্যত্র যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, অধিকন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই অদৃষ্টকে ব্যর্থ করিবার নিষ্ফল প্রয়াসের ফলে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা অতিরিক্ত মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছে। বঙ্কিম নিজে তাঁহার অদৃষ্ট গণনা করিয়াছেন কিনা জানি না ; তবে এ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের দৃষ্টিভঙ্গী তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রশেখর নিশ্চয়ই নিজের অদৃষ্টগণনা করেন নাই, নচেৎ তাঁহার ভবিষ্যৎ পারিবারিক বিপর্য্যয়ের কথা তাঁহার অজ্ঞাত থাকিত না।[২] এবং অদৃষ্টবাদী

---

১ ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে লেখা বঙ্কিমের পত্রাংশের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য। বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম খণ্ড—১১৯ পৃঃ।

২ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে : চন্দ্রশেখর মহারাজ স্বরূপচন্দকে বলিতেছেন, "মহারাজ! আমি নিজের অদৃষ্ট বিষয়ে গণনা করি না বা করিব না। ....যাহা অবশ্য ঘটিবে তাহা জানিলে কি হইবে? আমি কি অগ্রে জানিলে ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারিতাম? ভবিতব্য পুরুষকারের দ্বারা অন্যথা হইবার নহে। তবে পূর্ব্বজ্ঞানের কেবল এই ফল হইত যে, যে কয় বৎসর আমি সুখে কালযাপন করিয়াছি, সেই কয় বৎসরও আমার অসুখে যাইত।" বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮০, ২৭৮-৭৯ পৃঃ।

হইলেও তিনি পুরুষকারকে যোগ্য আসন দিয়াছেন। তাঁহার চিন্তার ধারা এইরূপ : 'ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।' (চন্দ্রশেখর ২।৩, ৩৭ পৃঃ)। নিশ্চিত ইহা বঙ্কিমের মতবাদের প্রতিধ্বনি এবং এইখানেই অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকারের সুন্দর সমন্বয়।

বঙ্কিমের অনেক উপন্যাসেই সন্ন্যাসীচরিত্র রহিয়াছে; অভিরাম স্বামী ইঁহাদের অগ্রণী। বঙ্কিমের পিতা যাদবচন্দ্রের প্রথম যৌবনে দুরারোগ্য রোগে তাঁহাকে মৃত মনে করায় শেষকৃত্যের জন্য তাঁহার দেহ শ্মশানে নীত হইলে সন্ন্যাসীর কৃপায় অলৌকিক উপায়ে তিনি পুনর্জীবন লাভ করেন।[১] বঙ্কিম নিজেও অনেক সন্ন্যাসী দেখিয়াছেন। হয়ত ইহাই তাঁহার উপন্যাসে সন্ন্যাসী-চরিত্রের প্রাচুর্য্যের কারণ। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছেন, 'বইএর অনুরূপ কোন সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য কীর্ত্তি-কলাপ' তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই।[২] পিতৃকাহিনী এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়ত বঙ্কিমের অবচেতন মনে সন্ন্যাসীচরিত্রের প্রেরণা যোগাইয়াছে, কিন্তু উপন্যাসে তাঁহারা মূর্ত্ত হইয়াছেন তাঁহার শিল্পী-মনের সোনার কাঠির স্পর্শে।

অভিরাম স্বামীর চরিত্রে কোনরূপ অসাধারণত্ব নাই এবং সংসারত্যাগী হইলেও তিনি অনাসক্ত নহেন; তাঁহার আসক্তি তাঁহার দৌহিত্রীকে কেন্দ্র করিয়া জাগরূক রহিয়াছে। চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া একটি বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে তাঁহার আচরণ উল্লেখযোগ্য। জগৎসিংহ যখন তাঁহার নিকট তিলোত্তমার পাণিপ্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি প্রদীপের আলোকে পুঁথি পড়িতেছিলেন। 'অভিবাম স্বামী পুঁথি ফেলিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, পুঁথির উপর যে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা জ্ঞান নাই।' (২।২১)। ক্ষুদ্র ঘটনা; কিন্তু অভিরাম স্বামীর তৎকালীন আনন্দের আতিশয্যের অভিব্যক্তি হিসাবে ইহা অতি বাস্তব চিত্র।

বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ হাস্যরসের পরিবেশন করিয়াছেন। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে তাঁহার শিক্ষানবিশী। দিগ্‌গজ এবং আশ্‌মানীর চরিত্রের ব্যঞ্জনায় উচ্চাঙ্গের হাস্যরসের নিদর্শন নাই, পরন্তু স্থানে স্থানে ভাঁড়ামির মিশ্রণ রহিয়াছে।

১ শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী', ১৪—১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও 'বঙ্কিম-চন্দ্রের পিতৃকাহিনী' প্রবন্ধে ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ২৯০-৯৩ পৃঃ।

২ ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ ১ম প্রস্তাব' বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ১৮৩—৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তথাপি তরুণ শিল্পীর প্রথম প্রয়াস হিসাবে ইহা প্রশংসনীয়। দিগ্‌গজের গৃহে আশ্‌মানীর অভিসার ও উৎকট প্রেমাভিনয়, বিমলার সহিত 'রসিকরতনে'র গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ এবং পরিশেষে ভূতের ভয়ে প্রেমপর্ব্বের পরিসমাপ্তি, অবস্থাবিপর্য্যয়ে 'বিদ্যাদিগ্‌গজে'র 'সেখদিগ্‌গজে' রূপান্তরণ অফুরন্ত হাসির উৎস। গল্পাংশের ক্রমবিকাশের দিক দিয়াও আশ্‌মানী ও দিগ্‌গজের সুনির্দ্দিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। বিমলার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য যে শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন পাঠানের অন্তঃপুরে তাহার যোগান দিতে পারে এমন একজন পরিচারিকা যে পরিচারিকা হইয়াও সুচতুরা এবং বিমলা ও তিলোত্তমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী ও বিশ্বাসের পাত্রী। এইখানেই আশ্‌মানীর চরিত্রের পরিকল্পনার সার্থকতা। এইরূপ, যে অমূলক সন্দেহ জগৎসিংহের মনঃপীড়ার কারণ হইল এবং তাঁহার ও তিলোত্তমার মধ্যে সাময়িক নিষ্ঠুর ব্যবধান সৃষ্টি করিল, দিগ্‌গজের সহিত জগৎসিংহের সাক্ষাৎ তাহার কারণ।

দিগ্‌গজের নিকট আশ্‌মানীর প্রেমাভিসারের বর্ণনায় উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ হইতে পরবর্ত্তী সংস্করণে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।[১] এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের বক্তব্য এইরূপঃ 'এক শ্রেণীর অনুকরণপ্রিয় লেখক বিদ্যাদিগ্‌গজ চরিত্রের নামে বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতা আনিতেছে। তাহাদের মুখবন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে সে চরিত্রের কোনও কোনও স্থল নূতন করিতে হইয়াছে।'[২] কিন্তু এ স্থলে বঙ্কিম যাহা কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছেন, উপরোক্ত যুক্তি তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে প্রথম সংস্করণের চিত্রে ভাষা ও ভাবের অসংযম সম্পূর্ণ অবঙ্কিমেয় এবং এই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন বঙ্কিমের রুচির সংস্কারের পরিচয় দেয়।[৩]

বঙ্কিম কখন কখন হাস্যোদ্দীপক ঘটনার ন্যায় চরিত্রবিশেষের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনার ভিতর দিয়াও হাস্যরসের সৃষ্টি করেন। দিগ্‌গজ ইহার উদাহরণস্থল। দিগ্‌গজ মহাশয়ের দেহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, তাহার গায়ের রং, নাসিকার গঠন, মাথার চুল (অবশ্য যাহা আছে), মায় আর্কফলাটি পর্য্যন্ত হাসির সওদাগরিতে তাহার ব্যক্তিগত মূলধন। অবশ্য এই প্রকার বর্ণনায় আতিশয্য ও অসঙ্গতিই হাস্যরসের উপকরণ এবং ইহা উচ্চ শিল্পশক্তির পরিচয় দেয় না।

দিগ্‌গজের দৈহিক অবয়বের বর্ণনা যেমন হাস্যোদ্দীপক, আশ্‌মানীর

১ পরিত্যক্ত অংশের জন্য শতবার্ষিক সংস্করণের 'পাঠভেদ' ১৫৬—৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২ ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ ১ম প্রস্তাব'—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ১৮১ পৃঃ।

৩ এই প্রসঙ্গে 'দাসী চরণে' শীর্ষক পরিচ্ছেদে কতলু খাঁর হত্যার অব্যবহিত পূর্ব্বের চিত্রের পরিবর্জ্জিত অংশ দ্রষ্টব্য। (শতবার্ষিক সংস্করণের 'পাঠভেদ' ১৬৫ পৃঃ)।

রূপের বর্ণনা তেমনই শ্লেষাত্মক। এই কৌতুকপূর্ণ রূপবর্ণনার ভিতর দিয়া বঙ্কিম কোন কোন সংস্কৃত কবি এবং ভারতচন্দ্র প্রমুখ বাঙ্গালী কবির বর্ণনাভঙ্গী বিদ্রূপ করিয়াছেন। [১]

দিগ্‌গজ ও আশ্‌মানী উভয়েই হাসির যোগান দিয়াছে; কিন্তু হাসির পরিবেশনে আশ্‌মানীর ভূমিকা সক্রিয়, দিগ্‌গজের ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। দিগ্‌গজের স্থূলবুদ্ধি তাহার অজ্ঞাতসারে সহজেই তাহাকে আশ্‌মানী ও বিমলার বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু করিয়াছে।

পরিচারিকা হইলেও আশ্‌মানী বিমলার ভগিনীস্থানীয়া এবং উভয়েই তুল্য কৌতুকপ্রিয়। কিন্তু আশ্‌মানী শুধু বিমলার হাস্য কৌতুকের সহচরী নহে; দুঃখের দিনেও সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

যে হাসিতে জানে সে দুঃখজয়ের মন্ত্র আয়ত্ত করিয়াছে। বিমলা ও আশ্‌মানী উভয়েই হাসি দিয়া দুঃখ জয় করিতে জানে। নৈদাঘ ঝটিকাবসানে ঊষার আলোকচ্ছটা যখন নূতন করিয়া পৃথিবীকে অভিনন্দিত করিল; জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার জীবনে সেই নূতন প্রভাতের সূচনায় বিমলার হাসি ও আশ্‌মানীর নৃত্য দেখিয়া কে মনে করিবে যে, এ সেই বিমলা যাঁহার হস্তের শাণিত ছুরিকা স্বামীঘাতী লম্পটের বক্ষ চুম্বন করিয়াছে, আর এ সেই আশ্‌মানী যে সে দিনের নটী বিমলার 'অলৌকিক আভরণ' সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে?

বীরেন্দ্রসিংহ ও কতলু খাঁর চরিত্র বৈচিত্র্যহীন। বীরেন্দ্রসিংহের উৎকট জাত্যভিমানের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার অতীতের ইতিহাস মসীলিপ্ত। কিন্তু অতীতের ইতিহাস যাহাই হউক, বন্দী অবস্থায় কতলু খাঁর সম্মুখে তাঁহার তেজোদৃপ্ত আচরণ, বধ্যভূমিতে তাঁহার নিঃশঙ্ক মনোবল স্বতঃই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। আর্টের দিক দিয়া ইহার প্রয়োজনও রহিয়াছে, কারণ অন্যথা বিকৃত প্রতিবেশে বিমলার অমলিন পতিনিষ্ঠা পাঠকের দৃষ্টিতে মূল্যহীন হইয়া পড়িত।

কতলু খাঁ চরিত্রহীন লম্পট। ঐতিহাসিক কতলু খাঁর মৃত্যু হইয়াছে

১ আশ্‌মানীর রূপ বর্ণনার পূর্ব্বে বাণীবন্দনা দ্রষ্টব্য। (১।১২)। এবং এই রূপবর্ণনার সহিত বিদ্যার রূপ বর্ণনা তুলনীয়:

বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥ বিদ্যাসুন্দর।

বৃদ্ধ বয়সে স্বাভাবিক রোগ ভোগের ফলে।[১] উপন্যাসে বর্ণিত কতলু খাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে আচার্য্য যদুনাথ লিখিয়াছেন, 'বঙ্গদেশ পাঠান শের শাহের হাতে পড়িবার পর হইতে এতগুলি লোক খুন হয় যে, তাহার তালিকা ছাপিলে এক পৃষ্ঠারও অধিক হইবে। সুতরাং কতলু খাঁর অপঘাত মৃত্যু বঙ্গীয় লেখকের অসম্ভব কল্পনা ছিল না।'[২] কিন্তু 'অসম্ভব কল্পনা' না হইলেও ইহা কি সমর্থনযোগ্য ? অবশ্য শিল্পকলার দিক দিয়া এই চরিত্রটিকে কলঙ্কিত করার একাধিক কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, এই উপায়ে তিলোত্তমা সম্বন্ধে জগৎসিংহের সন্দেহ উদ্রিক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কতলু খাঁর কলুষ স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা একদিকে যেমন বিমলার স্বামীহত্যার প্রতিশোধের সঙ্কল্প দৃঢ়তর করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই সেই প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমের ন্যায় প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের লেখনীতে কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের পরিণতির এইরূপ বিকৃতির বিপদ এই যে, ইহার ফলে ঐতিহাসিক চরিত্রের সত্যকার কাহিনী লুপ্ত হইলেও ঐতিহাসিক নামধারী কল্পিত চরিত্র চিরদিন বাঁচিয়া থাকে। মোগলের গতিবোধ-প্রয়াসী উড়িষ্যার নবাব কতলু খাঁর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্থলে বাঁচিয়া রহিয়াছেন বঙ্কিমের কল্পনার কতলু খাঁ, শোচনীয় মৃত্যুতে যাঁহাকে উন্মাদ ইন্দ্রিয়-লালসার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে 'আকবর-নামা'য় তাঁহাকে 'crafty' এবং 'scoundrel' বলা হইলেও[৩] (এই নিন্দাবাদের কারণ এই যে, তিনি দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিযাছিলেন[৪]), তাঁহার উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তির উল্লেখ নাই।

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, 'কতলু খাঁর অন্তিম-কালের বর্ণনা একেবারেই অবিশ্বাস্য। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তাঁহার অবরোধে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে নবাবের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নাই। বীরেন্দ্রসিংহের স্ত্রীর পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে প্রাণহন্ত্রীর নাম করিয়া যাইবেন

১ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

২ "'দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিক ভিত্তি"—সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ৫০শ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৫০ সাল।

৩-৪ মূল পারসিক শব্দের বেভারিজ (Beveridge) কৃত অনুবাদ: (ক) 'Crafty Qutlu' Vol III, chapter LXXI, p. 600 ; (খ) 'The scoundrel [Qutlu] established forts and firmly planted the foot of audacity.' Ibid, p. 602.

ইহাই স্বাভাবিক। জগৎসিংহের সহিত বীরেন্দ্রসিংহের কন্যার কি সম্পর্ক তাহা তিনি জানিতেন এমন কোন প্রমাণ গ্রন্থে নাই। অথচ মরিবার পূর্ব্বে তিনি বীরেন্দ্রসিংহের যে কন্যাকে দেখেন নাই তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সাধুবাদ জানাইতেই ব্যস্ত। যে আগ্রহ ও দুশ্চিন্তা অভিরাম স্বামীতে স্বাভাবিক হইত তাহাই কতলু খাঁতে আরোপিত হইয়াছে।'[১] দেখা যাইতেছে এস্থলে ডক্টর সেনগুপ্তের অভিযোগ দুইটি: এক, কে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহা জানাইয়া যাওয়াই কতলু খাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। দুই, তিলোত্তমা যে জগৎসিংহের প্রণয়িনী একথা যখন তাঁহার অবিদিত, তখন তিলোত্তমা নিষ্কলঙ্ক জগৎসিংহকে ইহা জানাইবার আগ্রহ শুধু যে অর্থহীন তাহা নহে, ইহা অস্বাভাবিক। মৃত্যুকালে হত্যাকারীর নাম জানাইয়া যাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক একথা নিশ্চিত; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুকালে মৃত্যুভীতিজনিত অনুশোচনাও অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিশোধের বাসনা জন্মে না, সুতরাং হত্যাকারীর নাম জানাইবার লিপ্সা থাকে না। ডক্টর সেনগুপ্তের প্রথম অভিযোগের ইহাই বোধ হয় যথেষ্ট উত্তর।[২] তাঁহার দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর এই যে, কতলু খাঁ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বীরেন্দ্রসিংহের কন্যার উল্লেখ করেন নাই। মৃত্যুর বিভীষিকা যখন তাঁহার সম্মুখে তখন শেষ মুহূর্ত্তে আয়েষা তাঁহাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, যন্ত্রচালিতের ন্যায় তিনি সেইরূপ কাজ করিয়াছেন। ইহার জন্য জগৎসিংহের সহিত বীরেন্দ্রসিংহের কন্যার কি সম্পর্ক তাহা জানিবার প্রয়োজন ছিল না।

জগৎসিংহের চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধেও ডক্টর সেনগুপ্তের গুরুতর অভিযোগ রহিয়াছে। অধিকাংশ অভিযোগ তিলোত্তমা ও আয়েষার প্রতি তাঁহার আচরণ সম্পর্কে। একে একে সে সকলের আলোচনা করিতেছি:

ডক্টর সেনগুপ্ত প্রশ্ন করিয়াছেন: 'তিলোত্তমাকে জগৎসিংহ দেখিয়াছেন এক মুহূর্ত্তের জন্য, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের দেখাতেই তাঁহার মন এমন চঞ্চল হইল যে তিনি কোথাও স্থির থাকিতে পারিলেন না এবং যে রমণীকে পাইবেন না স্থির জানিয়াছেন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্যই তিনি ব্যগ্র হইলেন। ইহা শিল্পীর সুন্দরকে দেখিবার ইচ্ছা না কামুকের ক্ষণিকের চরিতার্থতার

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ৭৫ পৃ:।

২ কতলু খাঁ যে সত্যই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুকালীন উক্তি (পিতৃহীনা—আমি পাপিষ্ঠ—উঃ তৃষা।) তাহার প্রমাণ।

আকাঙ্ক্ষা ?'[১] নায়কনায়িকা পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও প্রথ: দর্শনেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইল, সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত বির: নহে।[২] কিন্তু প্রথম দর্শনে অনুরাগের সঞ্চার এক্ষেত্রে আসল কথা নহে আসল কথা এই যে, তিলোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে না ইহা নিশ্চিত জানিয়াও জগৎসিংহ কেমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব করিলেন বিমলার আশ্বাসবাক্য ('যুবরাজ। যদি স্নেহের পুরস্কার থাকে' ইত্যাদি হয়ত তাঁহাকে কিছুটা আশান্বিত করিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা তাঁহার আচরণে সঙ্গত কৈফিয়ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সংসারে হয়ত 'অঘটনীয় কিছুই নাই, কিন্তু 'অঘটনীয়' যদি না ঘটে, তাহা হইলে এইরূপ সাক্ষাৎকা: উভয়ের পক্ষেই, বিশেষ করিয়া তিলোত্তমার পক্ষে, কতখানি অনিষ্টক: জগৎসিংহের তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। অপ্রাপনীয়া অপরিচিত কুমারীর সহিত এরূপ সাক্ষাতের প্রস্তাব কোন চরিত্রবান যুবকের পক্ষে সম্ভব এবং স্বাভাবিক নহে। কিন্তু জগৎসিংহ শুধু প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বিমলার মারফত তিলোত্তমার নিকট হইতে তাঁহার প্রস্তাবে: উত্তরের আশায় তিনি নিশীথকালে দুর্গাধিপের অজ্ঞাতে চোরের মত গ: মান্দারণ দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই বিসদৃশ আচরণের কো: সঙ্গত কৈফিয়ত নাই। সত্য বটে, প্রথমে তিনি বিমলার আহ্বানে দুর্গে প্রবেশ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং পরে বিমলা তাঁহার কানে কানে যতটুকু আত্মপরিচয় দিলেন তাহাতেই তাঁহার মনের পরিবর্তন হইল কিন্তু এস্থলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অসংযত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বিমলার পক্ষে তাঁহাকে দুর্গমধ্যে আহ্বান করিবার অধিকা: রহিয়াছে, এইরূপ যুক্তি জগৎসিংহের পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। ডক্টর সেন-গুপ্তের অভিযোগের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য্য।

ডক্টর সেনগুপ্তের অপর এক অভিযোগ এই যে, তাঁহার [জগৎ-সিংহের] সহিত তিলোত্তমার সাক্ষাৎ হইয়াছে দুই দিন অল্প সময়ের জন্য কিন্তু আয়েষার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে অনেকদিন ধরিয়া অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে এবং আযেষার মনের কথাও তিনি জানিয়াছেন।......সুতরাং তাঁহা: হৃদয় বলিয়া কোন বস্তু থাকিলে এই দুই পরস্পর বিরোধী আকর্ষণের মধ্যে

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ৭৪ পৃঃ।

২ ইহা স্মরজ অনুরাগ। এ সম্বন্ধে পরিণত বঙ্কিমের মতবাদের জন্য 'সীতারাম' ১।১৩ ৩৩ পৃঃ এবং 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ২১, ১২৮–২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দ্বন্দ্ব হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাইতেছে তিনি তিলোত্তমা সম্পর্কে উন্মত্ত এবং আয়েষার সম্পর্কে নির্ব্বিকার।'[১] প্রেমের বিচিত্র গতি, তাহা কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়ম অনুসারে কোন নির্দ্দিষ্ট রাজপথ অনুসরণ করে না। আয়েষার সহিত পরিচয় 'অনেকদিন ধরিয়া অতি ঘনিষ্ঠভাবে' এবং তিনি 'আয়েষার মনের কথা' জানিয়াছেন বলিয়াই যে জগৎসিংহকে আয়েষার প্রণয়াকৃষ্ট হইতে হইবে এবং ইহার ফলে 'দুই পরস্পর বিরোধী আকর্ষণের মধ্যে দ্বন্দ্বে'র সৃষ্টি হইবে এরূপ যুক্তি বিচারসহ নহে। জগৎসিংহ যদি পূর্ব্ব হইতেই তিলোত্তমার প্রণয়মুগ্ধ না হইতেন তাহা হইলে কি হইতে পারিত, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ও অবান্তর। কিন্তু তিনি তিলোত্তমার প্রণয়-মুগ্ধ; এ অবস্থায় আয়েষার সান্নিধ্য যদি তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইত, তাহা হইলে তাহা 'কামুকের' আচরণ বলিয়াই গণ্য হইত। তথাপি আয়েষা যদি জগৎসিংহের মনে কোনরূপ রেখাপাত না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার 'হৃদয় বলিয়া কোন বস্তু' নাই। কিন্তু জগৎসিংহের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করা চলে না। 'মুক্তকণ্ঠ' আয়েষা সহসা যখন হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিলেন, 'রাজপুত্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া' থাকিলেও তখন তাঁহার 'অন্তঃকরণ সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিল।' আয়েষার পত্রের উত্তরেও তিনি লিখিয়াছেন, 'আয়েষা তুমি রমণীরত্ন।...তোমার পত্রে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। আমাকে ভুলিও না।' ইহা হৃদয়হীনতার সাক্ষ্য দেয় না। তবে একথা নিশ্চিত যে, আয়েষার প্রতি সহানুভূতির গভীরতর অভিব্যক্তি শিল্পকলার দিক দিয়া অধিকতর উপভোগ্য হইত।

ডক্টর সেনগুপ্তের তৃতীয় অভিযোগ এই যে, 'তিলোত্তমার স্খলনের কথা তিনি [জগৎসিংহ] শুনিলেন গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের কাছে, যাঁহার কথায় কোন বুদ্ধিমান লোকই আস্থা স্থাপন করিবে না। ওসমান অবশ্য দিগ্‌গজের কথার সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু সে অতি সাধারণভাবে। জগৎসিংহ অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়াই প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইলেন। ইহা প্রকৃত প্রণয়ীর ধর্ম্ম নহে।'[২] এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, তিলোত্তমার সহিত জগৎসিংহের পরিচয় ক্ষণিকের, সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ আসিলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা অগ্রাহ্য করা জগৎসিংহের পক্ষে সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, তিলোত্তমা অসহায়া বন্দিনী, তাহাতে কতলু খাঁর ব্যাভি-চারের কাহিনীও হয়ত জগৎসিংহের অবিদিত নহে। এরূপ অবস্থায় কোন

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ৭৪ পৃঃ।
২ বঙ্কিমচন্দ্র, ৭৪-৭৫ পৃঃ।

কুৎসার কথা শুনিলে তাহা বিশ্বাস না করিলেও সরাসরি অগ্রাহ্য করা সহজ নহে। ডক্টর সেনগুপ্তের প্রধান আপত্তি তিনি কেন বিদ্যাদিগ্‌গজের ন্যা মূর্খের কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন। কিন্তু মনে হয় মূর্খ বলিয়াই দিগ্‌গজে কথা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। কারণ এরূপ লোক অন্ততঃ ষড়যন্ত্র করিয়া মিথ্য রটনা করিবে না ইহা সুনিশ্চিত। বিশেষতঃ দিগ্‌গজ উপযাচক হইয়া কিছু বলিতে আসে নাই, সুতরাং তাহার কোন দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে না। এব আপত্তি উঠিতে পারে যে, মূর্খ ব্রাহ্মণ কি শুনিতে কি শুনিয়াছে, হয়ত না বুঝিয় মিথ্যা সংবাদ দিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন বীরেন্দ্রসিংহের হত্যার সংবাদ জানাইল, ওসমান তাহা সমর্থন করিলেন। সুতরাং জগৎসিংহের প্রতীতি জন্মিল, মূর্খ হইলেও দুর্গের সংবাদ তাহার অজ্ঞাত নহে। তিলোত্তমা সম্বন্ধেও 'অতি সাধারণভাবে' হইলেও ওসমান তাহার উক্তি সমর্থন করিলেন। এমত অবস্থায় জগৎসিংহের সন্দেহ অনুচিত হইলেও, অস্বাভাবিক নহে ; এবং সন্দেহই যদি হইল তাহা হইলে রাজপুতগৌরবাভিমানী রাজপুত্রের পক্ষে 'প্রতিমা বিসর্জ্জনে' উদ্যত হওয়া চরিত্রবিরুদ্ধ নহে।

কিন্তু জগৎসিংহ যেরূপ সহজে 'প্রতিমা বিসর্জ্জন' করিতে পারিলেন তাহা নিতান্ত বিস্ময়কর এবং অস্বাভাবিক। জগৎসিংহ সমস্ত রাত্রি 'উৎকট মানসিক যন্ত্রণা' ভোগ করিলেন ; কিন্তু নিশান্তে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া তিনি যখন তাঁহার চরণে হৃদয়ের বেদনা নিবেদন করিলেন, অমনি 'প্রতিমা বিসর্জ্জন হইল।' এমন কি, গভীর রাত্রে সহসা তিলোত্তমা যখন কারাগারে জগৎসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখনও তিনি এদিক দিয়া নির্ব্বিকার। নিশ্চিত 'ইহা প্রণয়ীর ধর্ম্ম নহে।' ডক্টর সেনগুপ্ত অভিযোগ করিতেছেন : 'তিলোত্তমা জগৎসিংহের নিকট কারাগারে উপস্থিত হইলেন ; জগৎসিংহ তাঁহার কথা না শুনিয়া তাঁহাকে কর্কশকণ্ঠে বিদায় দিলেন। একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে দিগ্‌গজের কথা সত্য হইলে তিলোত্তমা ঐ সময় ঐ অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন কেন ?'[১] ইহার উত্তরে হয়ত বলা চলে যে, কারণে হউক অকারণে হউক, সন্দেহ যখন মানুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তখন সম্ভব অসম্ভব বিচার করার শক্তি থাকে না। তাহা হইলেও তিলোত্তমার দর্শনে, এমন কি তাঁহাকে মূর্চ্ছাগত দেখিয়াও যে জগৎসিংহের মনে কোনরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল না, ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ইয়াগোর (Iago) প্ররোচনায় ডেস্‌ডেমোনার (Desdemona) চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইলেও তাঁহাকে দর্শনমাত্র ওথেলোর (Othello) মনে হইয়াছে :

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ৭৫ পৃঃ।

If she be false, O, then heaven mocks itself!
I'll not believe it. Othello. Act III. Sc. 2.

এমন কি, তাঁহার ভ্রান্তদৃষ্টিতে ডেস্‌ডেমোনার অপরাধ যখন অসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে এবং তিনি তাঁহাকে হত্যা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প তখনও নিদ্রিত ডেস্‌ডেমোনার দিকে তাকাইতে প্রণয় ও অপরাধীকে শাস্তি দিবার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে, ওথেলোর স্বগতোক্তিতে তাহার অভিব্যক্তি ('It is the cause, it is the cause, my soul' ইত্যাদি Act V. Sc. 2) ইংরেজী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই চিত্রের পার্শ্বে জগৎসিংহের 'প্রতিমা বিসর্জ্জনে'র চিত্র একেবারেই নিষ্প্রভ। যদিই কেহ মনে করেন, জগৎসিংহের আচরণ তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাব্যঞ্জক, তাহা হইলেও প্রশ্ন ওঠে: যাঁহার চরিত্রে এমন অতিমানবীয় দৃঢ়তা, তাঁহার পক্ষে তিলোত্তমাকে অপ্রাপনীয়া জানিয়াও তাহাকে একবার মাত্র দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা দমন করা সম্ভব হইল না কেন? উভয় চিত্রে সামঞ্জস্য কোথায়? মোটের উপর ডক্টর সেনগুপ্তের সকল অভিযোগ সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে না পারিলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জগৎসিংহের চরিত্রাঙ্কন 'অপরিণত শিল্পকৌশলের পরিচয় দেয়।'

ডক্টর সেনগুপ্ত শুধু প্রণয়ী জগৎসিংহের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেন নাই। জগৎসিংহের বীরত্ব স্বীকার করিয়াও তিনি বলিতেছেন, 'কিন্তু গ্রন্থমধ্যে তাঁহার বীরত্ব অপেক্ষা আস্ফালনের পরিচয় অনেক বেশী। দেবমন্দিরে অসহায় রমণীদের কাছে, বিজয়ী শত্রুর সম্মুখে, শত্রুশিবিরে রোগশয্যায়, পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর বক্ষোপরি আসীন হইয়া—সর্ব্বত্রই তিনি স্বীয় বীরত্ব অথবা ঔদার্য্যের আস্ফালন করিয়াছেন।'[১] জগৎসিংহ বীরত্বাভিমানী রাজপুত যুবা, তাঁহার বীরত্বের সঙ্গে কিছুটা 'আস্ফালনে'র মিশ্রণ রহিয়াছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। হয়ত ইহা কতকটা বয়সের ধর্ম্ম। কিন্তু ডক্টর সেনগুপ্তের অভিযোগ সত্যের অতিরঞ্জন বলিয়া মনে হয়। দেবমন্দিরে অসহায় রমণীদের সম্মুখে তাঁহার উক্তি আত্মশক্তিতে আস্থাবান বীর যুবকের উক্তি এবং দাম্ভিকতার মিশ্রণ থাকিলেও ইহা যে নিতান্ত অর্থহীন আস্ফালন নহে, সহসা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অগণিত শত্রুর বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম তাহার সাক্ষ্য দেয়। এরূপ সংগ্রামে পরাজয় সুনিশ্চিত, কিন্তু জগৎসিংহ কোনরূপ কাপুরুষোচিত আচরণ করেন নাই অথবা বিজয়ী শত্রুর সম্মুখে কোনরূপ 'আস্ফালন' করেন নাই। রোগশয্যায় ওসমানের সহিত আচরণে তিনি সর্ব্বদাই আত্মসম্মান সম্বন্ধে সজাগ

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ৭৫-৭৬ পৃঃ।

রহিয়াছেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ কালেও তাঁহার আচরণে কোন অসঙ্গতি লক্ষিত হয় না। ওসমান যখন তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন, শত্রু হইলেও জগৎ-সিংহ তাঁহার নিকট হইতে উপকারের কথা বিস্মৃত হইলেন না। তিনি ক্রোধোন্মত্ত আততায়ীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত না করিয়া কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ওসমান তাঁহাকে দারুণ অপমানিত না করিলে তিনি কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেন না। পরিশেষে, জিঘাংসাপরায়ণ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে অভিভূত করিবার পরেও তিনি আত্মরক্ষাকল্পে তাঁহার অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। ইহা 'বীরত্ব বা ঔদার্য্যের আস্ফালন' নহে, প্রকৃতই বীরত্ব ও ঔদার্য্যব্যঞ্জক। ডক্টর সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন: 'মনে হয় গ্রন্থকার নিজেই জগৎসিংহকে অনেক বেশী মূল্য দিয়া ফেলিয়াছেন।'[১] ইহা মানিয়া লইলাম, কিন্তু (হয়ত ইহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ) ডক্টর সেনগুপ্ত কি তাঁহার প্রতি কোন অবিচার করেন নাই? জগৎসিংহ উদার-চরিত্র রাজপুতবীর; তিনি ধর্ম্মভীরু ও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এবং তিলোত্তমা সহসা কারাকক্ষে উপস্থিত হইলে তাঁহার আচরণ যতই দূরত্বব্যঞ্জক হউক, এস্থলেও তিনি নারীর প্রতি বৃহত্তর কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই।

জগৎসিংহের ন্যায় ওসমান উদার-চরিত্র বীরপুরুষ এবং নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিশীথে অতর্কিতে দুর্গ আক্রমণকালে বিমলার প্রতি তাঁহার আচরণ কঠোর হইলেও তিনি এক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন (১।১৮) তাহা সেনাপতির যুদ্ধকালীন অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য, এবং এই কর্ত্তব্য করিতে যাইয়া তিনি যথাসম্ভব নারীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিলোত্তমা ও বিমলা যখন নবাবের অন্তঃপুরে বন্দিনী, তখনও তাঁহারই জন্য তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা, ওসমান একথা বিস্মৃত হন নাই। এই কারণেই বিমলার অনুরোধে কতলু খাঁর বিনা অনুমতিতে তিনি তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেলেন এবং এইরূপে স্বামীর সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন।

ওসমান জগৎসিংহের ন্যায় উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, বিমলাই একদিন তাঁহাকে ছেলেধরাব হাত হইতে উদ্ধার করার নিমিত্তরূপিণী হইয়াছিলেন, তখন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি তাঁহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিলেন (২।৭, ৯৭ পৃঃ); বিমলা যে এই সুযোগের অন্যরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা স্বতন্ত্র কথা। বন্দী জগৎসিংহের প্রতি আচরণও ওসমানের উদার মনের পরিচয় দেয় এবং তিনি যে রাজনৈতিক লাভা-লাভের প্রশ্ন তুলিয়া আপনার দয়ার্দ্র চিত্তকে এমন কি আয়েষারও দৃষ্টির অন্তরালে

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ৭৬ পৃঃ।

রাখিতে চাহিয়াছেন (২।২, ৭৬-৭৭ পৃঃ) ইহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে।

কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও প্রণয়ে ঈর্ষ্যা ওসমানের শুভ্র চরিত্র ম্লান করিয়া দিয়াছে। নিশীথে বন্দীর কক্ষে আয়েষাকে একাকিনী দেখিতে পাইয়া ঈর্ষ্যা ও তজ্জনিত ক্রোধে ওসমান হিতাহিত জ্ঞান হারাইলেন। এই সময় আয়েষার প্রতি তাঁহার উক্তি যেমন অনুদার ও অশোভন, আয়েষার প্রত্যুত্তর তেমনই আত্মমর্য্যাদানুভূতিসূচক। ওসমান একে নিরাশপ্রণয়ী, তাহাতে আয়েষার আচরণ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এরূপ অবস্থায় সাময়িক উত্তেজনায় তাঁহার উষ্মা ও অসহিষ্ণুতা হয়ত আংশিক ক্ষমার্হ। কিন্তু এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন তৎকালীন তাঁহার আচরণের (ইহা সাময়িক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া নহে) কোনরূপ সঙ্গত কৈফিয়ত নাই! এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে ডক্টর সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন, 'উপন্যাসের আরম্ভ হইতে এই মল্লযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ওসমান বুদ্ধি, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও মার্জ্জিত রুচির যে পরীক্ষা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে এইরূপ বর্ব্বরতা শুধু যে অশোভন তাহা নহে, অবিশ্বাস্যও।'[১] ওসমানের আচরণ যে অশোভন সে সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহা অবিশ্বাস্য কিনা সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায়দানের পূর্ব্বে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রণয়ে ঈর্ষ্যা ওসমানের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিলেও, এই সময়েও তাঁহার সহজাত মহত্ত্ব তাঁহাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই।

'দুর্গেশনন্দিনী'র নারীচরিত্রের মধ্যে বিমলার একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশে বিমলা যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রসঙ্গতঃ তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বাহিরের দৃষ্টিতে বিমলা তিলোত্তমার সহচরী। কিন্তু সহচরী বলিতে আমরা সহজভাবে যাহা বুঝিয়া থাকি বিমলা তাহা হইতে স্বতন্ত্র পর্য্যায়ের। বিমলা প্রৌঢ়া এবং তিলোত্তমার সহিত তাঁহার যে শুধু বয়সের তারতম্য রহিয়াছে তাহা নহে, বিমলা তিলোত্তমার বিমাতা। এই নিঃসন্তান নারী অন্তরের সঞ্চিত মাতৃস্নেহ অকার্পণ্যে সপত্নীকন্যাকে বিলাইয়া দিয়াছেন; বিমলা একাধারে তিলোত্তমার মাতা ও সহচরী।

বিমলার চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রথমেই একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়েঃ হউক জগৎসিংহ অম্বরকুমার, নিশীথে দুর্গাধিপের অজ্ঞাতে তাঁহাকে দুর্গমধ্যে আহ্বান করা এবং নির্জ্জন কক্ষে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমাকে নিভৃতালাপের সুযোগ দিয়া

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ৭৩ পৃঃ।

আপন কক্ষে ফিরিয়া আসা কি বিমলার পক্ষে উচিত কার্য্য হইয়াছে ? প্রকৃতপক্ষে বিমলার কার্য্যের কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত নাই। তিলোত্তমার দিক দিয়া ইহা অশোভন ও অসঙ্গত এবং বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে যে অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছেন, ইহা তাহার অন্যায় অপব্যবহার। কিন্তু অন্যায় হইলেও বিমলার আচরণ তাঁহার চরিত্রবিরুদ্ধ নহে এবং ঔপন্যাসিকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট কৈফিয়ত। জগৎসিংহের নিকট লিখিত পত্রে (২।৬-৭) তাহার বাল্য ও যৌবনেব যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় (আমাদের আলোচনাব পক্ষে তাহাই যথেষ্ট) তাহাতে মনে হয় বিমলা সামাজিক বিধিনিষেধেব ভিতব দিয়া জীবনের শিক্ষা লাভ করেন নাই ; তিনি সর্ব্ব অবস্থায় স্বীয় চিত্তের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন। প্রেমাস্পদের সহিত গোপন অভিসার তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ইহাতে আর যাহাই হউক ধর্ম্ম ও বিবেকের নিকট তাঁহাকে খাটো হইতে হয় নাই। সুতরাং বিমলা নিজের পক্ষে যাহা দূষণীয় মনে করেন নাই, তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের পক্ষেও তাহা দূষণীয় মনে কবিলেন না। তা ছাড়া, বীরেন্দ্রসিংহ যখন কন্যার মঙ্গলার্থ পূর্ব্ব অপমান বিস্মৃত হইয়া মানসিংহের সহিত মিত্রতা করিলেন, তখন তাঁহারই শুভ কামনা কবিযা তিনি যে তিলোত্তমা ও জগৎসিংহেব পরিণয়ে সম্মতি দান করিবেন বিমলা এ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিত ছিলেন।[১]

বিমলা খাঁটি সোনা ; কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার স্থান যেমন সাধাবণ হইতে স্বতন্ত্র, তাঁহার আচরণও তেমনই সাধাবণ হইতে স্বতন্ত্র। বিমলা স্বভাবতঃই রঙ্গপ্রিয়, অবস্থাবিপর্য্যয়ে এই রঙ্গপ্রিযতা বিদ্যাদিগ্‌গজকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে, এবং করিমবক্সের সহিত তাঁহার আচরণ সহজ অবস্থায় দূষণীয় হইলেও অনন্যোপায হইয়াই তাঁহাকে এইরূপ কুৎসিত ছলনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এইরূপ, যে ধীরবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ছলাকৌশল তাঁহাকে করিমবক্সের নিকট হইতে নিকৃতির উপায করিয়া দিল, তাহাই অবস্থান্তরে কতলু খাঁকে তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলি করিয়া তাঁহার জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থতার সহায় হইল। তীক্ষ্ণধীশালিনী, 'স্থিরযৌবনা' এই প্রৌঢ়ার নিকট গজপতি, করিমবক্স ও কতলু খাঁ একই স্তরের পশু এবং আপনার কার্য্যোদ্ধারের জন্য তিনি ইহাদিগকে একই মন্ত্রে আযত্ত করিয়াছেন।

১ জগৎসিংহের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাতেব পূর্ব্বে অভিরাম স্বামীর নিকট তাহার উক্তি : 'এক্ষণে যদি সিংহমহাশয় মানসিংহের সহিত মিত্রতা করিলেন, তবে জগৎসিংহকে জামাতা করিতে হানি কি ?' (১।৮, ২৫ পৃঃ) ইহাব প্রমাণ। জগৎসিংহের নিকট পত্রেও বিমলা লিখিযাছেন. 'ভরসা করিয়াছিলাম, আমার তিলোত্তমা অম্বরেব সিংহাসনরূঢ়া হইলে পবিচয দিব।'

ইহা বুঝিলাম। কিন্তু জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ কামনায় নৈশ অভিযান-কালে তাঁহার অপরূপ বেশভূষার তাৎপর্য্য কি? কৈফিয়তস্বরূপ বঙ্কিম নিজেই লিখিয়াছেন: 'পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষীযার বেশভূষা? কেনই বা না করিবে? বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপ আর মনে; যার রূপ নাই, সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ; যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন। বিমলার আজও রূপে শরীর ঢল ঢল কবিতেছে, রসে মন টল টল করিতেছে।' বিমলার রূপ ও রস দুইয়েরই প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, কিন্তু ভাগ্যদোষে সহজ ও সরলভাবে তাহা প্রকাশের পথ অবরুদ্ধ। তাই সময়ে অসময়ে বিমলাকে রঙ্গরস ও বেশ-ভূষার পারিপাট্য করিতে দেখা যায়। হয়ত এইরূপে তাঁহার দৈন্য তিনি নিজের কাছেই লুকাইতে চাহিয়াছেন। তবে এস্থলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রখর বুদ্ধিশালিনী হইলেও বিমলার চরিত্রে পরিমাণবোধের অভাব লক্ষিত হয়। পাঠান যখন দুর্গমধ্যে, বীরেন্দ্রসিংহ যখন বন্দী, সে অবস্থাতেও তিলোত্তমা ও জগৎসিংহকে সতর্ক করিতে আসিয়া তাঁহারা কি করিতেছেন তাহা লক্ষ্য করিবার কৌতূহল (১।২০, ৬৭ পৃঃ) ইহার অন্যতম প্রমাণ। অবশ্য এই চিত্র কতখানি স্বাভাবিক তাহা প্রশ্নাতীত নহে।

কিন্তু ইহা বিমলার চরিত্রের একটি দিক মাত্র। এই রঙ্গরসপ্রিয় মুখরার হাসির অন্তরালে যে মর্ম্মন্তুদ যাতনা লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার ধৈর্য্য ও সংযম স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সহজ অবস্থায় আমরা একবার মাত্র বিমলাকে আপনার মন্দভাগ্যের জন্য আক্ষেপ করিতে দেখিতে পাই। তিনি সামান্য পরিচারিকা নহেন, গড় মান্দারণে আগমনকালে জগৎ-সিংহ এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিলে, 'বিমলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিঞ্চিৎ কাতরস্বরে কহিলেন, "আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন; আমি পরিচারিকা নহি। অদৃষ্টক্রমে পরিচারিকার ন্যায় আছি।"' কিন্তু এই দুর্ব্বলতা ক্ষণিকের; পরক্ষণেই বিমলা নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন, "অদৃষ্টকেই বা কেন দোষি? আমার অদৃষ্ট মন্দ নহে।" তাঁহার অন্তরের পুঞ্জীভূত ব্যথা আগ্নেয়গিরির গৈরিক স্রাবের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিল বধ্য-ভূমিতে বীরেন্দ্রসিংহের করুণ সম্ভাষণের কঠিন আঘাতে। তারপর? ভাল-বাসার যে দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ বিমলাকে সকল লাঞ্ছনার গ্লানি হাসিমুখে সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে পরিবর্ত্তিত প্রতিবেশে স্বামীহত্যার প্রতিশোধের পথ দেখাইয়া দিল।

বিমলা স্বভাবতঃ কোমলপ্রাণা। তাঁহারই আনীত বর্শায় জগৎসিংহ

লুক্কায়িত শত্রুকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া একদিন তিনি নিজেকে 'মহাপাতকিনী' মনে করিয়াছেন। অবস্থান্তরে সেই বিমলাকেই হত্যাকারিণী হইতে হইল। এই হত্যাকে সম্ভাব্য করিবার জন্য সুকৌশলী শিল্পী ইহার পশ্চাতে একাধিক কারণের সমাবেশ করিয়াছেন। কতলু খাঁ তাঁহার স্বামীহন্তা, চরম মুহূর্তে স্বামীর সম্মুখে বিমলা প্রতিশোধের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বামীর রুধিরাপ্লুত ছিন্নশির এই সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করিয়াছে। কতলু খাঁর হত্যার ইহাই প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু এই হত্যাকার্য্যে পরোক্ষ প্রেরণা যোগাইয়াছে কতলু খাঁর ইন্দ্রিয়লোলুপতা। তিলোত্তমা ও বিমলাকে তিনি ভোগের সামগ্রী বলিয়া বাছিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং স্বামীহত্যার প্রতিশোধ ছাড়াও বিমলাকে তাঁহার আক্রমণ হইতে তিলোত্তমা ও নিজেকে রক্ষা করার উপায় ভাবিতে হইয়াছে। বিমলা একই অস্ত্রে স্বামীহত্যার প্রতিশোধ লইলেন এবং নিজের ও তিলোত্তমার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

বিমলার হত্যাকারিণী রূপ ঘটনা-পরম্পরায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, কিন্তু ইহা তাঁহার সহজ পরিচয় নহে। সুনিপুণ ঔপন্যাসিক তাই তাঁহাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে পুনরায় তাঁহার চপলতা ও মুখের হাসি ফিরাইয়া আনিয়াছেন। (২।২১, ১৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অদৃষ্টের কঠিন আঘাত তাঁহার সরসতা ও সজীবতা নষ্ট করিতে পারে নাই, বিমলার চরিত্রালোচনায় ইহাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তিলোত্তমা[১] ও আয়েষাকে অতি অল্প সময়ের জন্য পরস্পরের সান্নিধ্যে দেখিতে পাই, তথাপি ইঁহারা পরস্পরের ভগিনীস্বরূপা। তিলোত্তমা কুসুমের ন্যায় কোমলপ্রাণা, লতার ন্যায় অপরের আশ্রয়ভিখারিণী; আয়েষা স্নেহপরায়ণা ও করুণহৃদয়া হইলেও আত্মনির্ভরশীলা ও আপনার সহজাত মহত্ত্বে দীপ্তিময়ী। উভয়েই প্রেমিকা। তিলোত্তমার প্রেম প্রথমদর্শনসঞ্জাত, পর্ব্বতকন্দর হইতে সদ্য বিনির্গত জলধারার ন্যায় আবেগময়ী, নবোন্মিষিত কুসুমকোরকের ন্যায় ব্রীড়াময়ী; আয়েষার প্রেম প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য-সঞ্জাত, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ, ফল্গুর ন্যায় অন্তঃসলিলা।

তিলোত্তমা প্রেমাস্পদের সত্তায় আত্মবিলোপকারিণী, ব্যক্তিত্ববর্জ্জিতা নারীচরিত্রের অন্যতমা। এই শ্রেণীর নারীচরিত্র যে বিশেষ করিয়া বঙ্কিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহার বহু উপন্যাসে ইহার নিদর্শন রহিয়াছে।

১ ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন বঙ্কিম তাঁহার প্রথমা পত্নী মোহিনী দেবীকে স্মরণ করিয়া তিলোত্তমার রূপ কল্পনা করিয়াছেন (বঙ্কিমচন্দ্র, ১ম ভাগ, ৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা লক্ষ্য কবিবার বিষয় যে, তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর এবং ঠিক এই বয়সে মোহিনী দেবী দেহত্যাগ করেন।

গড় মান্দারণ দুর্গের নিভৃত কক্ষে আপন মনে যাহা খুশি লিখিতে লিখিতে সহসা আপনার অজ্ঞাতসারে জগৎসিংহের নাম লিখিয়া ফেলা, সে লেখা নিজের চক্ষে ধরা পড়িতেই একাকিনী হইলেও, লজ্জায় মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হওয়া, চোরের মত দ্বারের দিকে চাহিতে চাহিতে জপমন্ত্রের ন্যায় সে নাম পাঠ করা, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে ত্রস্তে লিপি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াও বুঝি বা অক্ষরগুলি তখনও সুস্পষ্ট এই অনুভূতি—সকল মিলিয়া প্রথম প্রণয়ের আবেগ-বিহ্বল ব্রীড়াময়ী তরুণীর একখানি নিখুঁত ছবি সৃষ্টি করিয়াছে। এই চিত্র দেখিয়া আর একখানি চিত্র মনে পড়ে। মন্দভাগিনী কুন্দ যেদিন প্রদোষকালে নিজের দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে একাকিনী বাপীতীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেদিন সে সময় নগেন্দ্রনাথের নাম এমনই তাহার জপমন্ত্র হইয়াছিল, সে নাম উচ্চারণ করিতে এমনই তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তিলোত্তমা ও কুন্দনন্দিনী। উভয়ের জীবনেই বসন্তের আহ্বান আসিয়াছে। দুর্গেশ-নন্দিনী কুমারী তিলোত্তমার দ্বারে বসন্ত আসিয়াছে ভবিষ্যতের বার্ত্তাবহ রূপে, আর সর্ব্বহারা কুন্দের নিকট বসন্ত আসিয়াছে রিক্ততার স্মৃতি লইয়া, সেখানে শ্যামলতা নাই, আছে ঊষর মরুর রুক্ষতা। কিন্তু উভয়েই প্রেমিকা এবং প্রেমাস্পদকে কেন্দ্র করিয়া উভয়ের অনুভূতি একই প্রকারের। আবেষ্টনগত পার্থক্য এই দুইটি নারীর জীবনে যত পার্থক্যের সৃষ্টি করুক না কেন, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে।

তিলোত্তমার চরিত্র আলোচনা করিতে যাইয়া আর একটি নারীমূর্ত্তি স্মরণে আসে, সে মূর্ত্তি মৃণালিনীর। তিলোত্তমা যখন কতলু খাঁর অন্তঃপুরে বন্দিনী, তখনও জগৎসিংহের চিন্তা তাঁহাকে এমনই অভিভূত করিয়াছে যে, বিমলার অনুকম্পায় যখন তাঁহার মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইল, তখনও তিনি আপনার আসন্ন বিপদের কথা বিস্মৃত হইয়া ভাবিলেন, 'তাঁহার মুক্তির জন্য এ কৌশল হয় না? এ অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকট পাঠাইলে হয় না?' এই চিন্তা তাঁহাকে এমনই বিহ্বল করিল যে, প্রহরী যখন সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় দেখিয়া তাঁহাকে গন্তব্যস্থান নির্দ্দেশ করিতে বলিল, তিলোত্তমা ব্রীড়াজড়িতকণ্ঠে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জগৎসিংহের নাম উচ্চারণ করিলেন। (২।১৩)। এই আত্মভোলা ভালবাসার বিনিময়ে তিলোত্তমা জগৎসিংহের নিকট পাইলেন নির্ম্মম উপেক্ষা। ইহার ফলে তিনি রোগশয্যা লইলেন এবং জগৎসিংহকে ফিরিয়া না পাইলে ইহাই তাঁহার শেষ শয্যা হইত। তথাপি তিলোত্তমার অভিমান নাই। অভিরাম স্বামীর আহ্বানে 'ব্যাধিক্ষীণা' তিলোত্তমা যখন জগৎসিংহের দিকে তাকাইলেন, তখন 'সে দৃষ্টি কোমল, কেবল স্নেহব্যঞ্জক, তিরস্কারাভিলাষের চিহ্নমাত্র বর্জ্জিত।'

(২।২০)। বহু লাঞ্ছনা ও বহু অপমান সহিয়া মৃণালিনীও ঠিক এমনই অভিমানরহিতা। এ হিসাবে সূর্য্যমুখীও একই উপাদানে গঠিত। তিলোত্তমা, মৃণালিনী ও সূর্য্যমুখীর মধ্যে প্রকৃতগত ও আবেষ্টনগত যত বৈষম্য থাকুক, এক জায়গায় তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, তাঁহাদের ভালবাসায় অভিমান নাই।

তিলোত্তমার প্রেমের পরিণতি মিলনে; আয়েষার প্রেমের চরিতার্থতা ব্যর্থতায়। আয়েষাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে যাইয়া বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা।' কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভার উদ্যানের এই পদ্মটি যতই সুন্দর হউক, ইহা পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে নাই। আয়েষার চরিত্রের পরিকল্পনা বঙ্কিমের প্রতিভার পরিচয় দেয়, কিন্তু তাঁহার নবোন্মিষিত প্রতিভা এই চরিত্রটিকে যথাযোগ্য রূপ দিতে পারে নাই। রাত্রিদিন মুমূর্ষু রাজপুত্রের সেবা করিতে করিতে কখন যে তাঁহার অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হইল, হয়ত আয়েষা নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যখন তাঁহার অন্তরের কথা তাঁহার নিকট ধরা পড়িল, তখনই তিনি বুঝিলেন প্রেমের ব্যবসায়ে অশ্রুই তাঁহার লভ্যাংশ। কারণ জগৎসিংহ ও তাঁহার মধ্যে যে শুধু ধর্ম্মের ব্যবধান রহিয়াছে তাহা নহে, জগৎসিংহের চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই তিলোত্তমার নিকট বিক্রীত।[১] আয়েষা আপনার কর্ত্তব্য বাছিয়া লইলেন। তিনি দৃঢ়চেতা, প্রবৃত্তিদমন তাঁহার সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অন্তরে কি কোন সংগ্রাম হয় নাই? চিত্তজয় কি এতই সহজ? আয়েষার শেষ বিদায়ক্ষণের চিত্রে আমরা তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই; কিন্তু তৎপূর্ব্বে ইহার কোনরূপ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নাই। অনুরূপ অবস্থায় রেবেকার ছোটখাটো উক্তির ভিতর দিয়া আইভ্যানহোর দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণে তাঁহার চিত্তের দুর্ব্বলতা এবং এই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রাম যেরূপ সুকৌশলে বর্ণিত হইয়াছে,[২] আয়েষার চিত্রে তাহার একান্ত অভাব! ইহা চরিত্রাঙ্কনের ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

তাহা হইলেও আয়েষা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী সম্পদ। আয়েষা ব্যর্থ-

---

১ জগৎসিংহ জ্ঞানলাভ করিয়া যখন তিলোত্তমার নাম উচ্চারণ করিলেন, যখন আয়েষাকে বলিলেন, "আমি পীড়ার মোহে স্বপ্নে দেখিতাম, স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, সে তুমি না তিলোত্তমা?" (২।৩)। বুদ্ধিমতী আয়েষার তখন কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তাঁহার সহজ উত্তর, "আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্নে দেখিয়া থাকিবেন।" গভীর অর্থপূর্ণ।

২ Ivanhoe, Chapters XXIX ও XLIV দ্রষ্টব্য।

প্রেমিকা, কিন্তু কাহারও বিরুদ্ধে তাঁহার কোনরূপ অভিযোগ নাই। যাঁহারা প্রেমাস্পদের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির সঞ্জীবনী সুধা না পাইলে সূর্য্যালোকবঞ্চিত তরুর ন্যায় শুকাইয়া যান, আয়েষা তাঁহাদের নহেন। তিনি ভালবাসিয়াছেন, প্রতিদান চাহেন নাই। আয়েষা ঈর্ষ্যার অতীত। ঘটনাস্রোত যখন তাঁহাকে কারাকক্ষে মূর্চ্ছিতা তিলোত্তমার পার্শ্বে টানিয়া আনিল (২।১৪), পরিচয় পাইয়া আয়েষা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, সস্নেহ সম্ভাষণে তাঁহার সকল শঙ্কা দূর করিলেন, তিলোত্তমা তাঁহার নিকট জ্যেষ্ঠ সহোদরার আশ্রয় পাইলেন। শুধু ইহাই নহে, তিনি যখন তিলোত্তমার প্রতি জগৎসিংহের বিতৃষ্ণার কারণ অনুমান করিতে পারিলেন, তখন আসন্ন পিতৃবিয়োগবেদনার মধ্যেও তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগরূক রহিল; আয়েষার তৎপরতায় জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মিলনের অন্তরায় দূর হইল।

আয়েষা নিষ্পাপ, সুতরাং নিঃশঙ্ক। কারাকক্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে তিনি যখন বুঝিলেন, জগৎসিংহের হয়ত কিছু বলিবার আছে, তখন তিনি দাসীর সহিত তিলোত্তমাকে স্বীয় শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দিয়া একাকিনী অপেক্ষা করিলেন। (২।১৫)। এরূপ অবস্থায় কিছুটা সঙ্কোচ নারীমাত্রেই স্বাভাবিক, তাহাতে আয়েষার চিত্ত যে ভাবে উদ্বেল ইহাও সহজেই অনুমান করা যায়। বঙ্কিম নিপুণ কৌশলে আয়েষার এই সঙ্কোচ ও চিত্তের উদ্বেলতার ইঙ্গিত করিয়াছেন। চিত্রটি এইরূপ: জগৎসিংহের যদি কিছু বলিবার থাকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সময় 'আয়েষা কবরী হইতে একটি গোলাব খসাইয়া তাহার দলগুলি নখে ছিঁড়িতে' লাগিলেন। ইহা অতি স্বাভাবিক চিত্র। কোন কারণে সঙ্কোচ বা ভাবের আতিশয্য ঘটিলে হাতের কাছে যাহা কিছু পাওয়া যায় যন্ত্রচালিতের ন্যায়, অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই, তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করা মানবচরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

জগৎসিংহের সহিত এই সময়ের আচরণে আমরা প্রথম আয়েষার দুর্ব্বলতার আভাস পাই। আয়েষার অশ্রু, জগৎসিংহের নিকট তাঁহাকে মুক্তিদানের প্রস্তাব, জগৎসিংহ কর্ত্তৃক তাঁহার ক্রন্দনের হেতু ব্যক্ত করার অনুরোধের (জগৎসিংহ যুদ্ধব্যবসায়ী, প্রেমের বিদ্যালয়ে এখনও তাঁহার শিক্ষানবিশী এবং নারীর হৃদয় তাঁহার নিকট অনাবিষ্কৃত রাজ্য) উত্তরে অশ্রু মুছিয়া বালিকার ন্যায় তাঁহার উক্তি: "রাজপুত্র! আমি আর কাঁদিব না।"—একই কাহিনী ব্যক্ত করে। আয়েষার এই একরূপ, এ রূপে তিনি সেবাপরায়ণা, প্রেমময়ী ও স্বল্পভাষিণী।

আর একরূপে তিনি তেজোদৃপ্তা, স্পষ্টভাষিণী ও প্রগল্‌ভা। আয়েষাকে

গভীর নিশীথে একাকিনী বন্দীর কক্ষে দেখিতে পাইয়া ঈর্ষ্যায় উন্মত্ত ওসমান যখন তাঁহার সহজ মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া কুৎসিত ইঙ্গিতে তাঁহার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিলেন, তখন আমরা এই মূর্ত্তির পরিচয় পাই। ওসমানের ব্যঙ্গোক্তির প্রতিবাদে আয়েষার আচরণ প্রথমদিকটা যেমন নির্ভীক ও আত্মমর্য্যাদানুভূতি-সূচক, তেমনই সংযত। কিন্তু উত্তরোত্তর ওসমান যখন স্পষ্টই তাঁহার অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন করিলেন, তখন আয়েষা আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। জগৎসিংহের স্নেহার্দ্র কণ্ঠের সহানুভূতিতে যাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই, ওসমানের নির্ম্মম আঘাতে তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল, স্বল্পভাষিণী আয়েষা 'মুক্তকণ্ঠ' হইলেন।

আয়েষার প্রণয়জ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আর্টের দিক দিয়া দু'একটি গুরুতর অভিযোগ রহিয়াছে। বঙ্কিম সেবারতা আয়েষার চিত্রে কোথাও তাঁহার প্রেমোন্মেষের আভাস দেন নাই। এ সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু আভাস পাই তাহা এই পরিচ্ছেদে ওসমানের আকস্মিক আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, সুতরাং আয়েষার প্রণয়জ্ঞাপনে জগৎসিংহ ও ওসমানের ন্যায়, পাঠকও প্রায় সমভাবেই 'চমকিত' হইয়াছেন। ইহাতে নাটকীয় চমৎকারিত্ব থাকিলেও নিঃসন্দেহ আর্টের দাবী ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আয়েষার উচ্ছ্বাসপর্ণ দীর্ঘবক্তৃতা অতিনাটকীয়ভাবাপন্ন এবং অশোভন।

যাহা অতিনাটকীয় স্বভাবতঃই তাহা কিছুটা অস্বাভাবিকতাদুষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু তরুণ ঔপন্যাসিক এস্থলে শিল্পীজনোচিত সংযম রক্ষা করিতে না পারিলেও, ভাষার আতিশয্য বাদ দিলে আয়েষার পক্ষে সহসা ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। ডক্টর সেনগুপ্ত বলেন, আয়েষার দীর্ঘ বক্তৃতা শুধু অশোভন নহে, তাঁহার 'সহজ সংযমের সঙ্গে এই প্রগল্ভতার সঙ্গতিও নাই।'[১] ঠিক কথা। কিন্তু ডক্টর সেনগুপ্ত এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার মতে 'যে রমণীর সংযম ["আর আমিই যদি জিজ্ঞাসা করি ?" —ওসমানের] এই ব্যঙ্গোক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অটুট রহিয়াছে, ইহার উত্তরে তাঁহার কিছুই বলিবার থাকে না।'[২] অর্থাৎ তিনি আয়েষার কোনরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি স্বাভাবিক বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু আয়েষা একে নবাবনন্দিনী, তাহাতে পিতার নিকট হইতে তিনি অত্যধিক স্বাধীনতা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ ভর্ৎসনা ও ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে তিনি অভ্যস্ত নহেন এবং আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ মাত্রায় সচেতন। তাহার উপর জগৎসিংহের কাতরতায়

১-২ বঙ্কিমচন্দ্র। ৭১ পৃঃ।

করিয়াছেন। দেবীর অনুমতি লাভ না করিলে অধিকারী হয়ত এই বিবাহে উদ্যোগী হইতেন না। দেবী যখন বিমুখ হইলেন কপালকুণ্ডলা তখন অদৃষ্টের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়াছেন; তিনি নবকুমারের বিবাহিতা পত্নী।

কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টদেবতার হস্তে ক্রীড়নক মাত্র, বঙ্কিম কোন অবস্থাতেই পাঠককে এই নিষ্ঠুর সত্য বিস্মৃত হইতে দেন নাই। অজ্ঞাতকুলশীলা হইলেও ...ণ্ডলা যখন স্বামীর গৃহে সাদরে সম্বৰ্দ্ধিত হইলেন, তখন আপাতদৃষ্টিতে বিবাহের ফলে কোন অমঙ্গলের কারণ রহিল না। কিন্তু ননদিনীর সহিত বিশ্রম্ভালাপের ভিতর দিয়া সুকৌশলে পতিগৃহযাত্রার প্রাক্কালে দুর্লক্ষণের পুনরুল্লেখ করিয়া বঙ্কিম পুনরায় তাঁহার অদৃষ্টদেবতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। পাঠক যে কথা বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, তাহার পুনঃস্মরণে শ্যামাসুন্দরীর ন্যায় তিনিও 'শিহরিয়া' উঠিলেন। কপালকুণ্ডলার অন্তিমযাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গেও বঙ্কিম তাঁহার অদৃষ্টদেবতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন: 'কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায়........কাপালিকের অনুসরণ করিলেন।'

শুধু কপালকুণ্ডলা নহে, বিলাসপরায়ণা মতিবিবিও একদিন তাঁহার জীবনে অদৃষ্টের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। যখন ঘটনার সংঘাতে নূতন আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণে সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার জীবনের গতিকেন্দ্র পরিবর্ত্তিত হইল, যখন আগ্রার বিলাসসম্ভার তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তিনি সুদূর সপ্তগ্রামে বসবাসের সঙ্কল্প করিলেন, তখন তিনি হয়ত বুঝিতে পারিলেন যে, কোন অজ্ঞাত শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, যাহার সম্মুখে তাঁহার ব্যক্তিগত সত্তা একেবারেই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত এই কারণেই পেষমনের প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার কার্য্যের কৈফিয়তস্বরূপ তিনি শুধুমাত্র বলিলেন, "ললাট লিখন"। (৩।৫, ৬২ পৃঃ)।

বঙ্কিম তাঁহার আখ্যায়িকায় যে সকল অলৌকিক ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন (কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন এবং কপালকুণ্ডলা কর্ত্তৃক অলৌকিক ...শ্য দর্শন ও অলৌকিক বাণী শ্রবণ) সে সকলও অদৃষ্টবাদের পরিপোষক। ...ঙ্কিমের অনেক উপন্যাসেই স্বপ্নের পরিবেশন রহিয়াছে। সকল ক্ষেত্রেই ...য তাহা তাৎপর্য্যপূর্ণ এমত নহে। উদাহরণস্বরূপ 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিলোত্ত...ার স্বপ্নের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রোগশয্যায় তিলোত্তমার স্বপ্ন তাঁহার ...্যাধিদুর্ব্বল মস্তিষ্কপ্রসূত 'বিভীষিকামাত্র'। কতলু খাঁর ভীতি এবং জগৎসিংহ ...র্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে নৈরাশ্যজনিত চিত্তবিক্ষোভ এই স্বপ্নকে ...পায়িত করিয়াছে। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' কুন্দের স্বপ্নের এবং 'আনন্দমঠে'

কল্যাণীর স্বপ্নের এরূপ প্রাকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। প্রশ্ন এই: কপালকুণ্ডলা ও কাপালিকের স্বপ্ন ইহাদের কোন পর্য্যায়ভুক্ত? প্রথমে কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের আলোচনা করিতেছি: বৈচিত্র্যময় নৈশ অভিযানের পর বিদ্যুতালোকে প্রাঙ্গণমধ্যে কাপালিককে দেখিতে পাইয়া কপালকুণ্ডলা স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সেই রাত্রির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এবং অতীতের ভয়াবহ স্মৃতি উভয় মিলিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক উত্তেজিত করিল। কপালকুণ্ডলার অনেকক্ষণ নিদ্রা আসিল না। এমত অবস্থায় ঊষাকালে 'অপ্রগাঢ় নিদ্রা'য় বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্নদর্শন স্বাভাবিক। শুধু তাহাই নহে, স্বপ্নের সহিত কপালকুণ্ডলার বাস্তব অনুভূতির যথেষ্ট যোগাযোগ রহিয়াছে। স্বপ্নে দৃষ্ট 'জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ' ও 'ভীমকান্ত শ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী' যথাক্রমে কাপালিক ও ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির প্রতিচ্ছবি। সুতরাং সেই রাত্রিতে কপালকুণ্ডলা যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাহার সহিত কাপালিকের আকস্মিক আবির্ভাবের যোগাযোগের ফলে তাঁহার অবচেতন মনে অদূর ভবিষ্যতে নিজের গুরু বিপদ সম্বন্ধে যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল স্বপ্ন তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র, অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন আত্মমুখ (subjective), বিষয়মুখ (objective) নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে যুক্তির দিক দিয়া কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা বঙ্কিমের অভিপ্রেত বলিয়া মনে করা কঠিন, কারণ তিনি যে পরিচ্ছেদে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন তাহার প্রথমেই ইংরেজ কবি বাইরণের যে পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এইরূপ: "I had a dream which was not all a dream." ইহা হইতেই বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র নহে এবং এই স্বপ্নের সহিত তাঁহার জীবনের করুণ পরিণতির যে আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাও নিরর্থক নহে।

দ্বিতীয়, কাপালিকের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতে পারে: ইহা কি দুরভিসন্ধি সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাপালিকের মিথ্যা রচনা? এ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নবকুমারের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই কাপালিক ছদ্মবেশিনী মতিবিবির নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়াছেন এবং কাপালিক যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তখন তাঁহার পক্ষে মতিবিবির সহিত সাক্ষাৎমাত্র এরূপ স্বপ্নের পরিকল্পনা সম্ভব ও স্বাভাবিক নহে। যদিই মনে করা যায় যে, কাপালিক নবকুমারের সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন এবং নবকুমারের পলায়নে তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার সাহায্যকারিণী কপালকুণ্ডলার উপর তিনি স্বভাবতঃই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন

বলিয়া নবকুমারের সাহায্যে কপালকুণ্ডলার সর্ব্বনাশ সাধন মানসে তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্বপ্নের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন (অবশ্য এরূপ অনুমান যুক্তিসহ নহে), তাহা হইলেও প্রশ্ন ওঠে, স্বপ্ন যদি অলীক কল্পনা মাত্র, তাহা হইলে তাহার উল্লেখকালে কাপালিক 'রোমাঞ্চিত' হইলেন কেন ? (৪।৬, ৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ একটা আজগুবী স্বপ্ন আমদানী করিয়া স্বামীকে তাঁহার পত্নীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা সম্ভব হইতে পারে, কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কল্পনা করা স্বাভাবিক নহে। অন্ততঃ তাঁহার সহিত অতীতের সম্পর্ক স্মরণ করিয়াও এই উপায়ে নবকুমারকে আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা কাপালিকের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং কাপালিকের স্বপ্নকে কল্পিত মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তিনি ধর্ম্মের যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যতই ভ্রান্ত হউক, কাপালিক তাহাকে সত্য পথ বলিয়াই বাছিয়া নিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার আন্তরিকতা প্রশ্নের অতীত। এ অবস্থায় ভৈরবী পূজায় ব্যাঘাতের অব্যবহিত পরেই নিজের আকস্মিক বিপদ ঘটায় ঐ বিপদকে ভৈরবী প্রদত্ত শাস্তি বলিয়া গ্রহণ করা এবং কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁহার কলুষিত মনের দুর্ব্বলতার জন্য তিনি এতদিন তাহার শোণিতে দেবীর পূজা করেন নাই বলিয়াই তাঁহার পূজার বিঘ্ন ঘটিয়াছে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কপালকুণ্ডলাকে বলি না দিলে দেবী প্রসন্ন হইবেন না এরূপ বিশ্বাস করা কাপালিকের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাহার স্বপ্ন এই বিশ্বাসের বহিঃ-প্রকাশ।

কাপালিকের স্বপ্নের ন্যায় কপালকুণ্ডলার অলৌকিক অনুভূতিও আত্মমুখ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিভ্রম মাত্র এবং এতদুভয়ের মধ্যে এমন এক নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে যে কপালকুণ্ডলার অলৌকিক অনুভূতিকে কাপালিকের স্বপ্ন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধে আকাশপথে যে দৃশ্য দেখিলেন এবং সেখান হইতে যে আদেশবাণী পাইলেন তাহা তাঁহার কোমল ভক্ত্যাপ্লুত মনে কাপালিকের স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তিনি পূর্ব্বেই মতিবিবির নিকট এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ভবানীর চরণে প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; ইন্দ্রিয়বিভ্রম ইহার পরিণতি। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।' এই দিক দিয়া বিচার করিলে কপালকুণ্ডলার অলৌকিক অনুভূতি ডান্‌কান্‌কে (Duncan) হত্যা করার পূর্ব্বে ম্যাক্‌বেথের (Macbeth) পরশু দর্শনের অনুরূপ। ম্যাক্‌বেথ

পরশু দর্শন করিয়াছেন বলিয়াই হত্যা করেন নাই। পরন্তু হত্যার চিন্তা তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল বলিয়াই তিনি পরশু দর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপ, ভৈরবীর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া কপাল-কুণ্ডলা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন নাই; পক্ষান্তরে পূর্ব্বাহ্নে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ অলৌকিক অনুভূতি হইয়াছিল। কিন্তু যুক্তির দিক দিয়া যাহাই বলি না কেন, দক্ষ শিল্পীর প্রয়োগকুশলতায় মনে হয় কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন, কাপালিকের স্বপ্ন ও কপালকুণ্ডলার অলৌকিক অনুভূতি—সবই যেন কোন রহস্যলোকের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে এবং এই তিনটি জিনিষের মধ্যেই মানবজ্ঞানের অতীত অদৃষ্টদেবতার কোন গূঢ় সঙ্কেত রহিয়াছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা'র অদৃষ্টবাদের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত উপন্যাসে অদৃষ্টবাদ বাহির হইতে আখ্যায়িকার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত উপন্যাসে অদৃষ্টবাদ আখ্যায়ি-কার সহিত এমন ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে যে, মনে হয় অদৃষ্টদেবতা যেন এক অশরীরী চরিত্র, তাহাকে প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করা যায়, কিন্তু ধরাছোঁয়া যায় না। কাব্যে অতিপ্রাকৃতের পরিবেশন সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।'[১] 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিম এ সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। এই উপন্যাসে প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের মধ্যে সীমারেখা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ইহা প্রথম শ্রেণীর শিল্পী-প্রতিভার নিদর্শন।

কপালকুণ্ডলা ভাগ্যহতা। কিন্তু এক হিসাবে তিনি নিজেই তাঁহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশের মধ্যে অদৃষ্টদেবতার অদৃশ্য সঙ্কেত রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক অবস্থাতেই কপালকুণ্ডলার কার্য্যাবলী তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। শুধু কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রেই নহে, বঙ্কিমের উপন্যাসে যে সকল চরিত্রকে আমরা সাধারণতঃ ভাগ্যহত বলিয়া থাকি (উদাহরণস্বরূপ কুন্দ, দলনী ও মবারকের উল্লেখ করা যাইতে পারে) তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই একই উক্তি প্রযোজ্য।

'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনীর পরিবেশনের ন্যায় ইহার চরিত্রসৃষ্টিও অনবদ্য। 'দুর্গেশনন্দিনী'র চরিত্রাঙ্কনে স্থানে স্থানে যেরূপ কাঁচা হাতের নিদর্শন রহিয়াছে, 'কপালকুণ্ডলা'য় কোথাও সেরূপ ত্রুটি লক্ষিত হয় না।

---

১ প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত-বিবিধ প্রবন্ধ, ৫১ পৃঃ।

সমুদ্রতটচারী ভীষণদর্শন কাপালিক মধ্যযুগের বিকৃত তান্ত্রিক সাধকের প্রতীক।[১] তিনি নির্ম্মম-প্রকৃতি নরঘাতক; মানবজীবনের মূল্য সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা নাই। নরবলি তাঁহার পূজার অঙ্গ। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। প্রশ্নটি এই: কাপালিক যখন নবকুমারকে কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার সাহায্যে কপালকুণ্ডলাকে হত্যার আয়োজন করিলেন, তখন কি তিনি সকল জানিয়া শুনিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নবকুমারকে বিভ্রান্ত করিলেন, না মতিবিবির ব্রাহ্মণবেশ দেখিয়া তিনি নিজেই বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন? অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় বলেন, 'কপালকুণ্ডলার চরিত্র স্বয়ং নির্ম্মল জানিয়া কাপালিক যে বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে বা স্বপ্রয়োজন সাধনার্থ ডনজন, আয়েকিমো, বা আয়েগোর ন্যায় তৎপ্রতি নবকুমারের মিথ্যা সন্দেহ জন্মাইয়াছিল তাহা নহে। মতিবিবিকে সে ব্রাহ্মণ কুমার বলিয়াই জানিত, এবং তাহার সহিত রজনীযোগে কপাল-কুণ্ডলাকে মিলিত হইতে দেখিয়া তাহাকে অসতী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সে মিথ্যাবাক্যে নবকুমারকে প্রতারিত করিয়া কপালকুণ্ডলার বধে নিযুক্ত করে নাই।'[২] পক্ষান্তরে ডক্টর সেনগুপ্ত বলেন, 'কাপালিক জানিতেন যে নবকুমারের সন্দেহ অলীক; কিন্তু নরঘাতকের কাছে সত্যাসত্যের কোন মূল্য নাই।'[৩] বঙ্কিম এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছুই লিখিয়া যান নাই এবং কাপালিক ও মতিবিবির গোপন পরামর্শের যে অংশ কপালকুণ্ডলা শুনিতে পাইলেন, তাহা অতি অসম্পূর্ণ এবং তাহা হইতে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। এই কারণেই এ ব্যাপারে এরূপ মতানৈক্য সম্ভব হইয়াছে।

নবকুমারকে মিথ্যা প্রতারিত করা কাপালিকের চরিত্রবিরোধী নহে এবং কপালকুণ্ডলাকে হত্যা করা ভবানীর আদেশ ও তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বিশ্বাস

১ তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতবাদ সুস্পষ্ট। 'কপালকুণ্ডলা' রচনার বহু বৎসর পরে (১৮৮২ খ্রীঃ) হেষ্টি (Hastie) সাহেবের সহিত মসীযুদ্ধের জেরস্বরূপ তিনি রেভারেণ্ড কে. এম্. ব্যানার্জ্জির পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন, 'I can assure Dr. Banerjee that he cannot be more emphatic in the condemnation of Tantrikism than I am, and that I have in no respect departed from the view I put forth and illustrated in Kapalkundala in regard to the morality of that form of Hinduism. True Hinduism and Tantrikism are as much opposed to each other as light and darkness.' Essays and Letters, pp 108-09.

২ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৫৪-৫৫ পৃঃ।

৩ বঙ্কিমচন্দ্র, ৯১ পৃঃ।

করিলেও এই প্রত্যাদেশ পালনের আগ্রহের সহিত কিছুটা বিদ্বেষ বুদ্ধির মিশ্রণ ছিল অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সুতরাং দত্তগুপ্ত মহাশয় যাহাই বলুন, কাপালিক 'বিদ্বেষবুদ্ধিতে বা স্বপ্রয়োজন সাধনার্থে নবকুমারের মনে মিথ্যা সন্দেহ' জন্মাইয়াছিলেন, কোন প্রতিকূল প্রমাণ না থাকিলে এরূপ অনুমান সহসা নাকচ করা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রে কপালকুণ্ডলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে মতিবিবি কাপালিক সম্বন্ধে বলিতেছেন, "আমাকে ব্রাহ্মণতনয় বিবেচনা করিয়া সহায় করিবার প্রত্যাশায় সকল বৃত্তান্ত বলিল।" (৪।৭, ৮৬ পৃঃ)। এই সময় মতিবিবি কপালকুণ্ডলার সহিত যেরূপ খোলাখুলিভাবে কথা বলিলেন তাহাতে তিনি কাপালিকের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া থাকিলে কপালকুণ্ডলার নিকট হইতে তাহা গোপন রাখিয়া তাহাকে প্রতারিত করিবেন এইরূপ অনুমান করা শক্ত। এবং এরূপ প্রতারণায় মতিবিবির কোনরূপ স্বার্থও লক্ষিত হয় না। মতিবিবির উক্তি দত্তগুপ্ত মহাশয়ের মতের পরিপোষক। কিন্তু একই সংলাপ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কপালকুণ্ডলাব সহিত সাক্ষাতের পর মতিবিবি যখন কাপালিকের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন, কাপালিক তখন তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু কাপালিক যদি সত্যই ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবিকে কপালকুণ্ডলার সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে মতিবিবি কপালকুণ্ডলার অনিষ্টসাধন করিতে চাহেন, এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইয়া (অর্থাৎ তিনি যে পুরুষ নহেন, এই তথ্য অবগত না হইয়া) তিনি কখনও সাহায্যের আশায় তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেন না। ইহা ডক্টর সেনগুপ্তের সিদ্ধান্তের অনুকূলে একরূপ অকাট্য যুক্তি। সুতরাং দেখা যাইতেছে উপরোক্ত কোন সিদ্ধান্ত দ্বারাই সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা হয় না। কিন্তু সমগ্র জিনিষটি যখন অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে, তখন এস্থলে তৃতীয় এক সম্ভাবনার উল্লেখ করা যাইতে পারে: প্রথম রাত্রে কাপালিক কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, বঙ্কিম ইহাব উল্লেখ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি যখন কপালকুণ্ডলার উদ্দেশ্যে তাঁহাব লিপি কপালকুণ্ডলার শয়নকক্ষের গবাক্ষসংলগ্ন বনলতার মধ্যে রাখিয়া গেলেন. তখন তিনি হয়ত অলক্ষ্যে তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহার ফলে মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষ না করিলেও তাঁহাদের যে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল. এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যয় জন্মিল। দ্বিতীয় রাত্রে হয়ত ছদ্মবেশী মতিবিবিকে ভগ্নগৃহমধ্যে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া এবং সেই সঙ্গে

কপালকুণ্ডলার বনগমন লক্ষ্য করিয়া এরূপ অবস্থায় যেরূপ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক তিনি সেইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন এবং নবকুমারকে কপালকুণ্ডলার কুকার্য্য প্রত্যক্ষ করাইয়া তাঁহারই সাহায্যে ভবানীর অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদনের সঙ্কল্প করিলেন, এবং নবকুমারকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শান সম্ভব হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়া তাহাকে পূর্ব্বাহ্নে উত্তেজিত কবিবার উদ্দেশ্যে তিনি এমন এক মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ('কল্য রাত্রে...........স্বচক্ষে দেখিলাম' ইত্যাদি—৪।৬, ৮৩ পৃঃ) যাহার মূল সত্য সম্বন্ধে তাহাব কোনরূপ সংশয় ছিল না। এইরূপ অনুমানের সুবিধা এই যে, দত্তগুপ্ত মহাশয় এবং ডক্টর সেনগুপ্ত—উভয়ের সিদ্ধান্তের অসুবিধাগুলি ইহাতে খণ্ডিত হয়।

কাপালিকের চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। নবকুমারের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন, ভবানী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্ব্বকৃত্য ফল বিনষ্ট হইল।" ইহা কাপালিকের দুর্ব্বলতার পরোক্ষ স্বীকৃতি। কাপালিক যতই ক্রূরপ্রকৃতি হউন, কার্য্যকরী না হইলেও তাঁহার অবচেতন মনে কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে হয়ত কোথাও একটুকু দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে; নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে ভ্রষ্ট-চরিত্র মনে করিয়া 'দৃঢ়মুষ্টিতে' তাহার 'হস্তধারণ' করিলে, কাপালিক যখন তাঁহাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন, তৎকালীন তাহার 'করুণার্দ্র ও মধুময়' কণ্ঠস্বর ইহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু কাপালিকের চরিত্রে মানবীয়তার এই ক্ষীণ আভাস মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি অনুকম্পা মাত্র। উপন্যাসে তাঁহার আচরণে স্বপ্নোক্ত বিশিষ্ট দুর্ব্বলতার ক্ষীণতম আভাসও পাওয়া যায় না। পরন্তু, এই দিক দিয়া তাঁহাকে অনুভূতিহীন বলিয়াই মনে হয়। আচরণে যেখানে মৌখিক উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না সেখানে ইহাকে চরিত্রাঙ্কণের ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

নবকুমার কাপালিকের বিপরীতধর্ম্মী চরিত্র। তাঁহার ধর্ম্মমত উদার এবং পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত, তিনি স্থিরধী ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়।[১]

১ বঙ্কিমের একাধিক উপন্যাসের নায়ক সৌন্দর্য্যপ্রিয়; তন্মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম নিজেও সৌখীন ও সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন। 'কপালকুণ্ডলা'য় সমুদ্রের শোভার ন্যায় বঙ্কিমের বহু উপন্যাসে স্বভাবসুন্দর নদনদী এবং পুষ্পপত্রশোভিত উদ্যান পরিবেষ্টিত পুষ্করিণীর বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা তাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়।

প্রথম দর্শনেই তাঁহার চরিত্রের এই সকল বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কপালকুণ্ডলার সহিত তাঁহার বিবাহ ঘটনা-পরম্পরার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু বিবাহের কারণ যাহাই হউক, কপালকুণ্ডলার রূপ সহজেই নবকুমারের সৌন্দর্য্যপিপাসু মন আকৃষ্ট করিল। (২।৫)। কিন্তু প্রশ্ন এই : বনবিহারিণীকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া তিনি সুখী হইলেন কি? সমাজের বাহিরে স্বাধীন জীবনে অভ্যস্ত রমণীর পক্ষে সহসা নূতন আবেষ্টনের সহিত নিজেকে মানাইয়া লওয়া সহজসাধ্য নহে। সুতরাং সপ্তগ্রামে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার প্রথম জীবনের ভিতর দিয়া এই প্রশ্নের উত্তর আশা করা যায় না, এবং সুসংযত শিল্পী তাঁহাদের মিলিত জীবনের এই সময়ের কোন চিত্রও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু বৎসরাধিককাল পর্য্যাপ্ত সময়। কপালকুণ্ডলা যখন 'একবৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিণী', সেই সময়ের একটি ঘটনার ভিতর দিয়া বঙ্কিম এই প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত করিয়াছেন : রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর উপকারার্থ ওষধির সন্ধানে বনে চলিয়াছেন। নবকুমার বহিঃপ্রকোষ্ঠ হইতে ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং বাহিরে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। এই সময় তাঁহাদের সংলাপ বিস্তারিত উদ্ধৃত করিতেছি :

'কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি?"

নবকুমার কহিলেন, "কোথা যাইতেছ?" নবকুমারের স্বরে তিরস্কারের সূচনামাত্র ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।"

নবকুমার পূর্ব্ববৎ কোমল স্বরে কহিলেন, "ভাল, কালি ত একবার গিয়েছিলে? আজি আবার কেন?"

ক। কালি খুঁজিয়া পাই নাই ; আজি আবার খুঁজিব।

নবকুমার অতি মৃদুভাবে কহিলেন, "ভাল, দিনে খুঁজিলেও ত হয়?" নবকুমারের স্বর স্নেহপরিপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দিবসে ও ঔষধ ফলে না।"

নব। কাজই কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও। আমি ওষধি তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকে এলোচুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলা এই কথা অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন। নবকুমার আর আপত্তি করিলেন না।[১] বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিতবচনে কহিলেন, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।" [এই উক্তির মধ্যে নাটকীয় শ্লেষ লক্ষণীয়।]

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশ্বাসসহকারে কপাল-কুণ্ডলার হাত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।' (কপালকুণ্ডলা ৪।১)।

এই সংলাপ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক বৎসরের অধিককাল গৃহবাসেও কপালকুণ্ডলার চরিত্রে মুখ্যতঃ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। গৃহস্থের কুলবধূর পক্ষে রাত্রিকালে একাকিনী বনভ্রমণে যে কোন কিছু অশোভন থাকিতে পারে ইহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সুতরাং গৃহস্থ নবকুমার কেন তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিলেন, অথবা কেন তাঁহার অনুগমন করিতে চাহিলেন তাহা না বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহার অতি স্বাভাবিক প্রস্তাবের কদর্থ করিয়া মনে করিলেন, নবকুমার তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেছেন, এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহাকে অন্যায় আঘাত করিলেন। অবশ্য পূর্ব্বরাত্রির অভিযানের জন্য তিনি ও শ্যামাসুন্দরী যে ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার অসহিষ্ণুতার অন্যতম পরোক্ষ কারণ। কিন্তু ইহাও সুনিশ্চিত যে, নবকুমারকে চিনিতে পারিলে তিনি কখনও তাঁহার আচরণের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেন না। পক্ষান্তরে, নবকুমারের প্রত্যেকটি কথার ভিতর দিয়া কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসার, তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা।—নিষ্ঠুর নিয়তি এই দুইটি মহাপ্রাণ নরনারীর ভাগ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে, অথচ ইঁহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কারগত যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অনতিক্রমনীয়। বঙ্কিম লিখিয়াছেন, 'একাভিসন্ধি-সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্যসুখ'। (সীতারাম ১।১০, ৩২ পৃঃ)। নবকুমারের দুর্ভাগ্য কপালকুণ্ডলা বহুগুণের অধিকারিণী হইলেও, তিনি তাহার সাহচর্য্যে এই দাম্পত্যসুখ পাইলেন না। অথচ ইহার জন্য কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে তাঁহার কোন অভিযোগ নাই, একটুকু 'নিশ্বাস' তাঁহার পারিবারিক জীবনের রিক্ততার একমাত্র সাক্ষী।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নবকুমার কর্ত্তৃক মতিবিবির প্রণয় প্রত্যাখ্যান-

---

১ অজ্ঞাতসারে হইলেও কপালকুণ্ডলা নবকুমারের হৃদয়ের এমন এক কোমল তন্ত্রীতে আঘাত করিলেন যে, ইহার পর আর তাঁহার পক্ষে আপত্তি করা সম্ভব ছিল না।

কালীন তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁহার সহজাত সংযম অধিকতর প্রশংসনীয়। চিত্তসংযমের দিক দিয়া তাঁহার স্থান প্রতাপের পার্শ্বে। মতিবিবির গৃহে নবকুমার ও মতিবিবির চিত্র প্রতাপের গৃহে প্রতাপ ও শৈবলিনীর চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়।

যে নিষ্ঠুর সন্দেহ নবকুমারের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া কপাল-কুণ্ডলার সহিত তাঁহাকেও মৃত্যুর পথে টানিয়া নিল, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গেও আমাদিগকে তাঁহাদের পারিবারিক জীবনের ব্যর্থতার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নবকুমার যে কপাল-কুণ্ডলার নিকট হইতে শুধু তাহার প্রণয়ের প্রতিদান পান নাই তাহা নহে, হয়ত প্রতিদান পান নাই বলিয়াই তিনি তাহার স্বভাবসুলভ স্বাধীন গতি-বিধিকে সন্দেহের চক্ষে না দেখিলেও সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। (৪।৫, ৮০-৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ফলে কপালকুণ্ডলার স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্লিপ্ততা নবকুমারের ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাঁহার সন্দেহের পরিপোষক হইল।

প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক ৺মোহিতলাল মজুমদার মনে করেন কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে নবকুমারের সন্দেহের অন্যতম কারণ তাঁহার প্রথম বিবাহের 'লজ্জাজনক ও দুঃখকর' পরিণামের স্মৃতি। তিনি লিখিয়াছেন: 'তাহার প্রথমা স্ত্রীর সেই স্মৃতি, সেই দাহ-চিহ্ন সে ভুলিতে পারে নাই। ফলে সে এই স্ত্রীর সম্বন্ধেও সন্দেহকাতর হইয়া ওঠে। বাহিরে যেমন সেই পদ্মাবতী তাহাকে এখনও অনুসরণ করিতেছে, ভিতরেও সেই নারীর স্মৃতি তাহার প্রেমকে পঙ্গু করিয়া তাহার চরিত্রের এমন অবনতি ঘটাইয়াছে।'[১] অনুরূপ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ পরিণতি অসম্ভব নহে। কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে কপালকুণ্ডলার বিসদৃশ আচরণে কখন কখন বিরক্ত হইলেও উপরোদ্ধৃত সংলাপ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নবকুমারের উদার মন এতাবৎকাল কোন অবস্থাতেই কুৎসিত সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয় নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে নবকুমার মতিবিবির প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছেন। (পরিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য)। এবং এইরূপে অতীতের 'দাহচিহ্নে'র প্রতি নূতন করিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতি যদি সত্যই তাঁহার 'প্রেমকে পঙ্গু' করিয়া থাকিত তাহা হইলে এই সময়ে, বিশেষ করিয়া কপালকুণ্ডলার সর্ব্বশেষ উক্তির প্রতিক্রিয়ায় নবকুমারের আচরণে তাহার অন্ততঃ কিছুটা নিদর্শন পাওয়া যাইত। কিন্তু

১ বঙ্কিম-বরণ, ৭৮ পৃঃ।

তাঁহার আচরণে উষ্মা বা সন্দেহের ক্ষীণতম আভাসও লক্ষিত হয় না। ৬মজুমদার মহাশয়ের মন্তব্য আপাতদৃষ্টিতে অযৌক্তিক মনে না হইলেও তথ্যের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নহে।

ডক্টর জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় নবকুমারের চরিত্রে ভারসাম্যের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এই অভিযোগের সমর্থনে তাঁহার যুক্তি এই যে, কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের বিবাহ আকস্মিক ঘটনা এবং তিনি অতি সহজেই কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে কাপালিকের কাহিনী বিশ্বাস করিয়াছেন।[১] কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের বিবাহ নিশ্চিত আকস্মিক ঘটনা, তবুও নবকুমার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই। কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি কাপালিকের নিকট আত্মসমর্পণের কথাও চিন্তা করিযাছিলেন। (১৮, ২৬ পৃঃ)। এবং অধিকারী যখন সমস্যার সহজ সমাধানের পথ দেখাইয়া দিলেন তখনও কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি সহসা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। পরে যখন সম্মত হইলেন তখনও প্রাণরক্ষাকর্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধিই বিবাহের প্রেরণা যোগাইল। ইহা নিশ্চয়ই ভারসাম্যের অভাবের নিদর্শন নহে। দ্বিতীয়তঃ, কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে কাপালিকের মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী তিনি অতি সহজেই বিশ্বাস করিয়াছেন, একথা বলিলে শুধু নবকুমারের প্রতি অবিচার করা হয় না, বঙ্কিমের প্রতিভার প্রতিও অন্যায় অবিচার করা হয়। কাপালিকের কাহিনী একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। পরন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে নবকুমার কপালকুণ্ডলার কবরীচ্যুত লিপি পাঠ করিয়াছেন। এই লিপির ভাষা নিতান্তই সাঙ্কেতিক। কিন্তু ইহা হইতে দুইটি জিনিষ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়ঃ এক, লিপিলেখকের সহিত কপালকুণ্ডলার পূর্ব্বরাত্রে সাক্ষাৎ হইয়াছে; দুই, এই সাক্ষাৎকারের সহিত কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বরাত্রে যে উদ্দেশ্য লইয়া বনগমন করিয়াছিলেন তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। পক্ষান্তরে, লিপিলেখকের সহিত কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ যে নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা লিপিপাঠে তাহা অনুমান করা যায় না।' এমত অবস্থায় এই হেঁয়ালিপূর্ণ লিপি পাঠ করিয়া কপালকুণ্ডলার চরিত্রে সন্দিগ্ধ হওয়া যতই দুঃখের হউক, ইহা নবকুমারের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। এবং পূর্ব্বাপর কপালকুণ্ডলার আচরণ এই সন্দেহ নিরাকরণের সহায় না হইয়া বরং ইহার পোষকতা করিল। নবকুমার লিপিপাঠে সন্দিগ্ধ হইলেন এবং

১ 'He is too lopsided. His marriage with Kapalkundala was a sudden affair and he readily believed the Kapalik's tale of infidelity to him.'—Life and novels of Bankimchandra, pp. 45-46.

তাঁহার অজ্ঞাতসারে আমন্ত্রণরক্ষাকল্পে কপালকুণ্ডলার দ্বিতীয় রাত্রির অরণ্যাভিযান এই সন্দেহ দৃঢ় করিল। ইহাই হইল কাপালিকের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বের ইতিহাস।

তথাপি কাপালিককে দেখিয়া নবকুমারের উদার মন এই কুৎসিত সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিল; তিনি ভাবিলেন কপালকুণ্ডলা বুঝি বা কাপালিকের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই বনগমন করিয়াছেন। নবকুমার সাগ্রহে কাপালিককে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু কাপালিক তাঁহাকে শুধু নিরাশ করিলেন না, তিনি যাহা বলিলেন তাহা নবকুমারের মনের সন্দেহের প্রতিধ্বনি মাত্র। সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহার কথায় নবকুমারের প্রত্যয় জন্মিল এবং কাপালিকের নির্দ্দেশমত তিনি তাঁহার অনুগমন করিলেন।

তাঁহারা দূর হইতে কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির সংলাপের কিছুই শুনিতে পাইলেন না। সুতরাং নবকুমার সহজেই মতিবিবিকে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া ভুল করিলেন। তিনি দেখিলেন 'কপালকুণ্ডলা আলুলায়িতকুন্তলা' এবং তাঁহার 'কুন্তলরাশি আসিয়া ব্রাহ্মণকুমারের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া তাঁহার অংস-সংবিলম্বী কেশদামের সহিত মিশিয়াছে', দেখিলেন ব্রাহ্মণকুমার 'আপন অঙ্গুলি হইতে......অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলার হস্তে দিলেন।' তাঁহার ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাঁহার মনের সন্দেহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইল। আর্টের দিক দিয়া ঘটনা পরম্পরার এই যোগাযোগ এবং নবকুমারের মনে ইহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোনরূপ অভিযোগের কারণ নাই।

কপালকুণ্ডলার কবরীচ্যুত হইয়া লিপিপতন (৪।৫) আকস্মিক ঘটনা, কিন্তু ইহা যেমন স্বাভাবিক তেমন এরূপ আকস্মিক ঘটনা মানবজীবনে অতি নিষ্ঠুর সত্য। বঙ্কিম বলিয়াছেন: 'কপালকুণ্ডলা লেখার সময় সেক্ষপীয়র বড় বেশী পড়িতাম।'[১] উল্লিখিত লিপিপতন ঘটনাটি বিশিষ্ট অসতর্ক মুহূর্ত্তে ডেস্‌ডেমোনার হাত হইতে রুমালপতনের অনুরূপ এবং উভয় ঘটনার পরিণাম তুল্য ভয়াবহ। এইরূপ, কাপালিকের মন্ত্রণায় নবকুমার কর্ত্তৃক অন্তরাল হইতে কপালকুণ্ডলা ও ব্রাহ্মণবেশীর আচরণ লক্ষ্য করার চিত্র (৪।৭) ইয়াগোর প্ররোচনায় ওথেলো কর্ত্তৃক অন্তরাল হইতে ক্যাসিও (Cassio) এবং ইয়াগোর সংলাপ শ্রবণের চিত্র (চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) স্মরণ করাইয়া দেয়। শেষোক্ত চিত্রদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিলে বঙ্কিমের স্বকীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তেজনার মুখে ওথেলোর ভাঙ্গা ভাঙ্গা

১ ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ ১ম প্রস্তাব'—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ১৯৫ পৃঃ।

স্বগতোক্তি ('Do you triumph, Roman ? Do you triumph ?'; 'Have you scored me ? Well.'; 'O, I see that nose of yours, but not the dog I shall throw it to.' ইত্যাদি) হাস্যোদ্দীপক এবং ওথেলোর আবেগপ্রবণ চরিত্রের সহিত অসঙ্গতি না থাকিলেও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং ট্রাজেডির নায়ক হিসাবে তাঁহার মর্য্যাদার সহিত ইহার কতখানি সঙ্গতি রহিয়াছে তাহা প্রশ্নাতীত নহে। বঙ্কিমের বর্ণনা এইরূপ: কপালকুণ্ডলা এবং ব্রাহ্মণবেশীকে 'লঘুস্বরে' কথোপকথনরত দেখিয়া 'নবকুমার ধীরে ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।' কাপালিক তাঁহাকে 'স্বহস্তপ্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা' পান করাইলেন। নবকুমার 'অন্যমনে পান' করিলেন, 'পান করিবামাত্র সবল হইলেন'। ব্রাহ্মণবেশী যখন কপালকুণ্ডলাকে অঙ্গুরীয় দান করিলেন, কাপালিক তখন নবকুমারকে ধরিয়াছিলেন, 'আবার তাঁহাকে কম্পমান দেখিয়া পুনরপি মদিরা সেবন করাইলেন। মদিরা নবকুমারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকৃতি সংহার করিতে লাগিল, স্নেহের অঙ্কুর পর্য্যন্ত উন্মূলিত হইতে লাগিল।' সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, কিন্তু ইহা ওথেলোর সহিত ধীরপ্রকৃতি নবকুমারের চরিত্রগত পার্থক্যের দ্যোতক। এইরূপ, কপাল-কুণ্ডলার সম্মুখীন হইবার অবব্যহিত পূর্ব্বে নবকুমারের উক্তি: 'পানীয়ং দেহি মে' (নবকুমার এক্ষণে নিজেই পানীয় চাহিয়াছেন এবং উত্তেজনার বশে বাংলা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহার করিয়াছেন।) সংক্ষিপ্ত হইলেও, তাঁহার ঝটিকাক্ষুব্ধ অন্তরের পরিচয় হিসাবে যথেষ্ট।

বস্তুতঃ দৈববিড়ম্বনায় বিরুদ্ধ ঘটনার যোগাযোগের ফলে ওথেলোর ন্যায় পত্নীর চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইলেও নবকুমার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধপ্রকৃতির এবং শিক্ষা ও সংস্কারের পার্থক্যহেতু তাঁহাদের চিন্তাধারাও বিভিন্নমুখী। ওথেলো উদ্দাম-স্বভাব যুদ্ধব্যবসায়ী; তাঁহার মনের সন্দেহ যখন বিশ্বাসে পরিণত হইল, তখন তিনি ডেস্‌ডেমোনাকে নির্ম্মমভাবে হত্যার সঙ্কল্প করিলেন, আত্মহত্যার দ্বারা স্মৃতির দংশন হইতে অব্যাহতিলাভের চিন্তা তাঁহার মনে আসে নাই। নবকুমার শান্তস্বভাব বাঙ্গালীঘরের গৃহস্থ যুবক; তাঁহার মনে যখন সন্দেহ জন্মিল, তখন তিনি স্থির করিলেন, কপালকুণ্ডলার 'মহাপাপ প্রত্যক্ষীভূত করিবেন', পরে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, 'কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না।' বস্তুতঃ, কাপালিকের নিকট প্রেরণা না পাইলে তিনি তাঁহাকে হত্যার কল্পনা করিতে পারিতেন না। এবং নবকুমারকে স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে যাইয়া (কপালকুণ্ডলাকে ভবানীর পূজায় বলি না দিলে দেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন না, এইখানেই কাপালিকের স্বার্থ) কাপালিককে সুরার

সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে হইয়াছে। বঙ্কিম দু' একটি কথায় মহাপূজায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কপালকুণ্ডলার শান্ত, সমাহিত ভাবের সহিত নবকুমারের এই সময়ের অপ্রকৃতিস্থ ও উন্মত্ত অবস্থার পার্থক্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন: 'নবকুমারের পদের আঘাতে একটি জলপূর্ণ শ্মশান-কলসী ভগ্ন হইয়া গেল। তাহাব নিকটেই শব পড়িয়াছিল.... কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন, নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন।' ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মদিরার মোহ মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কপালকুণ্ডলার স্নেহার্দ্র কণ্ঠের প্রশ্নের পব প্রশ্নে ক্রমে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল এবং তিনি কাপালিকের প্রভাবমুক্ত হইলেন। যিনি কাপালিকের সহিত হাত মিলাইয়া কপালকুণ্ডলাকে হত্যার আয়োজন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কপালকুণ্ডলার পদতলে পড়িয়া আর্ত্তস্বরে তাঁহার নিকট শুনিতে চাহিলেন, তিনি অবিশ্বাসিনী নহেন।

নবকুমারের ভ্রান্তি ঘুচিল, কিন্তু দেবতা যাঁহাকে ডাকিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি নিজেও আর ফিরিলেন না। মিথ্যা সন্দেহবশে নবকুমার যাঁহার হত্যার আযোজন করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার প্রাণদাত্রী কপালকুণ্ডলা, তাঁহার গৃহলক্ষ্মী মৃণ্ময়ীকে উদ্ধার করিতে যাইয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিয়া তিনি তাঁহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

'কপালকুণ্ডলা'র নারীচরিত্রের মধ্যে শ্যামাসুন্দরী ও মেহের-উন্নিসা অপ্রধান চরিত্র। প্রধানতঃ কপালকুণ্ডলার চরিত্র বিকাশের জন্যই শ্যামাসুন্দরীর প্রয়োজনীয়তা এবং এই সহৃদয়া ননদিনীর সহিত বিশ্রম্ভালাপের ভিতর দিয়াই আমরা কপালকুণ্ডলার গৃহাশ্রমের চিত্র পাই। আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশের দিক দিয়াও শ্যামাসুন্দরীর একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। শ্যামাসুন্দরীর জন্য স্বামীবশের ঔষধ সংগ্রহ করিতে যাইয়া যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, তাহারই ফলে নবকুমার কপালকুণ্ডলার চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইলেন। কপাল-কুণ্ডলার পূর্ব্বের ইতিহাস যাহাই হউক, এক্ষণে তিনি গৃহস্থের কুলবধূ। এমত অবস্থায় পরিবর্ত্তিত প্রতিবেশে সহসা রাত্রিকালে বনগমনের সঙ্গত কৈফিয়ত প্রয়োজন। যে কার্য্য অন্যথা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারিত, পল্লী-রমণীর অন্ধ সংস্কারের সাহায্যে তাহাই স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে।

শ্যামাসুন্দরী হাস্যরসিকা, স্নেহপরায়ণা ননদিনী। কিন্তু ননদিনী সম্প্রদায়ের মনেব যে দুর্ব্বলতার ফলে বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহে ভ্রাতৃজায়া ও ননদিনীর মধুর সম্পর্ক সময় সময় তিক্ত হইয়া ওঠে, বঙ্কিম কপালকুণ্ডলা ও

শ্যামাসুন্দরীর প্রথম দিনের সংলাপের ভিতর দিয়া তাহারও ক্ষীণ আভাস দিয়াছেন। (২।৬)। কপালকুণ্ডলা মূর্ত্ত সরলতা, ননদিনীর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি সহজভাবে বলিলেন, বুঝি বা পূর্ব্বের ন্যায় সমুদ্রতীরে বেড়াইতে পারিলেই তিনি সুখী হইতেন। কপালকুণ্ডলা তাঁহাদের সংসারে নবাগতা, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এইরূপ উক্তি স্বাভাবিক। কিন্তু শ্যামাসুন্দরী ইহাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যে শুধু 'বিস্মিতা' হইলেন তাহা নহে, 'তাঁহাদের যত্নে যে মৃণ্ময়ী উপকৃতা হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন, কিছু রুষ্টা হইলেন।' ইহা অতি বাস্তব চিত্র এবং খুঁটিনাটির প্রতি এইরূপ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টির ফলে বঙ্কিমের অতি সাধারণ চরিত্রও প্রাণবন্ত হইয়া ওঠে।

শ্যামাসুন্দরীর মুখের হাসির অন্তরালে রহিয়াছে বুভুক্ষু অন্তরের অতৃপ্ত ক্ষুধা। কপালকুণ্ডলা যে ভালবাসা অকার্পণ্যে লাভ করিয়াছেন, অথচ তিনি যাহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই, শ্যামাসুন্দরীর সেই ভালবাসার কাঙ্গালিনী; তিনি স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা কুলীনপত্নী। ভ্রাতৃবধূর সহিত রহস্যালাপের ভিতর দিয়াই বঙ্কিম সুকৌশলে তাঁহার জীবনের ইতিহাসের এই বিষাদপূর্ণ অধ্যায়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন: ননদিনী কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, "বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ?" ভ্রাতৃজায়া অধিকারীর শিষ্যা, তিনি উত্তর করিলেন, "লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?" কপালকুণ্ডলার এই নির্দ্দোষ উক্তি শ্যামাসুন্দরীর এক অতি দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করিল। সহসা তাঁহার 'মুখকান্তি গম্ভীর হইল; প্রভাতবাতাহত নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল; বলিলেন "ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।"' ইহা আনুমানিক এক বৎসর পরে স্বামী-বশের ঔষধের জন্য আগ্রহান্বিত শ্যামাসুন্দরীর চিত্রের পূর্ব্বাহ্ন-প্রস্তুতি এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রাতৃজায়ার প্রতি তাঁহার স্নেহ আরও উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্যামাসুন্দরী স্বামীবশের ঔষধ চাহেন, তাঁহার বিশ্বাস ইহার সাহায্যে তিনি 'মনুষ্যজন্ম সার্থক' করিতে পারিবেন। তথাপি কপালকুণ্ডলা রাত্রিকালে একাকিনী ঔষধ খুঁজিতে গেলে মন্দ লোকে মন্দ বলিবে, হয়ত তাঁহার দাদা অসুখী হইবেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাকে বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। ননদিনী ও ভ্রাতৃজায়ার এই সময়ের বিশ্রান্তালাপের ভিতর দিয়া (৪।১, ৬৯-৭০ পৃঃ) আমরা যেমন শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রের তেমনই কপালকুণ্ডলার অপরিবর্ত্তিত ও অনমনীয় মনোবৃত্তির পরিচয় পাই এবং

কপালকুণ্ডলার এই পরিচয়ের পর নৈশ অভিযানের প্রাক্কালে নবকুমারের প্রতি তাঁহার বিসদৃশ আচরণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বুঝিতে পারি এবং ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না।

শ্যামাসুন্দরীর ন্যায় মেহের-উন্নিসারও আখ্যায়িকায় একটি সুনির্দ্দিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। অকস্মাৎ নবকুমারের সহিত সাক্ষাতের ফলে মতিবিবির মনে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, বর্দ্ধমানে মেহের-উন্নিসার সহিত সাক্ষাতের পর তাহাই বাহির হইতে গতিবেগ লাভ করিয়া প্রবল বাসনায় রূপান্তরিত হইল। স্বল্প আয়তনের ভিতর দু'একটি রেখায় বঙ্কিম এই চরিত্রটি সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। মতিবিবির সহিত সংলাপের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহার আত্মমর্য্যাদানুভূতি এবং স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধের সহিত সেলিমের প্রতি তাঁহার প্রণয়াসক্তির পরিচয় পাই। এবং এতদুভয়ের সঙ্ঘাতের ফলে শেষ পর্য্যন্ত যে প্রণয়েরই জয় হইবে তাহারও সুস্পষ্ট আভাস পাই।

উপন্যাসের প্রধান দুই নারীচরিত্র: কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি[১] পরস্পরের বিপরীতধর্ম্মী চরিত্র। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিপালিতা, সংসারানভিজ্ঞা, স্নেহপরায়ণা, পরদুঃখকাতরা, ভোগতৃষ্ণারহিতা ও ভক্তিমতী; মতিবিবি কুটিল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্তা, কূটবিষয়বুদ্ধিসম্পন্না, আত্মসুখান্বেষিণী, ইন্দ্রিয়সম্ভোগরতা ও ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিতা। উভয়েই স্বাধীনতা কামনা করিয়াছেন; কিন্তু কপালকুণ্ডলার চক্ষে স্বাধীনতার অর্থ সমাজবন্ধনহীন প্রাকৃতিক জীবন, মতিবিবির নিকট স্বাধীনতা ব্যভিচারের নামান্তর মাত্র।

ভোগরতা মতিবিবির জীবন 'প্রতিপুষ্পবিহারিণী মধুকরীর' ন্যায়। এই প্রণয়হীনার পাষাণ প্রাণে কেমন করিয়া প্রণয় সঞ্চার হইল এবং যে প্রণয় প্রথমে এমন কি তাহার নিজেরই অগোচর ছিল তাহাই কেমন করিয়া বাহির হইতে গতিবেগ লাভ করিয়া তাঁহার চিরাভ্যস্ত জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিল, মতিবিবির চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রধানতঃ ইহাই লক্ষণীয় বিষয়।

পান্থনিবাসে মতিবিবি কর্ত্তৃক নবকুমারের পরিচয় প্রাপ্তির পরিকল্পনা অতীব মনোরম। মতিবিবি তখনও নবকুমারের পরিচয় পান নাই, তথাপি তাঁহার মুখে সপ্তগ্রামের উল্লেখে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, 'সহসা তিনি মুখাবনত

---

১ পূর্ণচন্দ্র মনে করেন মতিবিবির চরিত্র একটি কুলত্যাগিনী গৃহস্থবধূর গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হইয়াছে। এই হতভাগিনী দীর্ঘ বৎসর পরে হঠাৎ একদিন স্বামীকে দেখিতে পাইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে 'স্বামীদর্শন-আকাঙ্ক্ষায়' গ্রামে ফিরিয়া আসিল এবং 'এমত স্থানে বাসা লইল যাহাতে প্রতিদিন স্বামীকে দেখিতে পায়। প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিত আর কাঁদিত।'

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ৫০-৫১ পৃঃ।

করিয়া, প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।' ইহা তিলোত্তমাকে বিদায় দিবার পরে কুমার জগৎসিংহের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আয়েষা কর্ত্তৃক 'কবরী হইতে একটি গোলাব খসাইয়া তাহার দলগুলি নখে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে' তাঁহার সহিত আলাপন আরম্ভ করার চিত্রের সহিত তুলনীয়।

মতিবিবি 'ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?"

নবকুমার বলিলেন, "নবকুমার শর্ম্মা।"

প্রদীপ নিবিয়া গেল।[১] •

নবকুমার গৃহস্বামীকে ডাকিয়া অন্য প্রদীপ আনিতে

অন্য প্রদীপ আনিবার পূর্ব্বে একটি দীর্ঘনিশ্বাসশব্দ শুনিতে পাইলেন।'

কপালকুণ্ডলা, ২।২-৩।

অতি সাধারণ ঘটনা; কিন্তু ইহার ভিতর যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার নিদর্শন। স্থলবিশেষে ভাষা অপেক্ষা নীরবতা অধিকতর ভাবপ্রকাশক। অন্ধকার গৃহে 'একটি দীর্ঘনিশ্বাসশব্দ' এস্থলে মনের যে ভাবকে রূপদান করিয়াছে, ভাষায় তাহা অবর্ণনীয়। মতিবিবির 'দীর্ঘনিশ্বাসে'র মধ্যে রহিয়াছে তাঁহার বিগত জীবনের ইতিহাসের চুম্বক এবং ভবিষ্যতের ইতিহাসের পূর্ব্বাভাস।

মতিবিবি রূপগর্ব্বিতা। প্রধানতঃ এই কারণেই নবকুমারের নিকট সপত্নীর রূপের খ্যাতি শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য কুতূহলী হইলেন। কিন্তু সপত্নী সম্ভাষণের পূর্ব্বে এত করিয়া বেশভূষার পারিপাট্যের কারণ কি? নবকুমারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন, "গহনাগুলি না হয় দেখাইবার জন্য পরিয়াছি। স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে, সে না দেখাইলে বাঁচে না।" পরিহাসছলে বলিলেও ইহাই হয়ত ঠিক কথা। কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে নাই বা চিনিলেন, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী মতিবিবি হয়ত সপত্নীকে

১ অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, 'প্রদীপটি যে বাতাসে হঠাৎ নিবে নাই তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন।' (বঙ্কিমচন্দ্র, ১৪২ পৃঃ)। মতিবিবি যে ইচ্ছা করিয়া প্রদীপ নিবান নাই ইহাও সহজেই অনুমেয়। মনে হয় তিনি যখন অন্যমনে প্রদীপ উজ্জ্বল করিতেছিলেন, তখন সহসা নবকুমারের পরিচয় পাইয়া উত্তেজনাবশতঃ হাত কাঁপিবার ফলে প্রদীপ নিবিয়া থাকিবে।

আপনার রূপ ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য দেখাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চাহিয়াছেন, হয়ত এইরূপে আপনার অজ্ঞাতেই তিনি তাঁহার অবচেতন মনের নূতন বাসনার কণ্ঠরোধ করিতে চাহিয়াছেন। যদি তিনি পূর্ব্ব হইতেই সপত্নীকে গহনাগুলি উপহার দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন (ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না), তাহা হইলেও সে সঙ্কল্পের পশ্চাতে রহিয়াছে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার গোপন আকাঙ্ক্ষা।

মতিবিবি অস্পষ্ট আলোকে প্রথমে কপালকুণ্ডলাকে ভাল দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার 'অধর পার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল।' এ হাসি নগণ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে দেখিয়া বিজয়গর্ব্বিতার তাচ্ছিল্যের হাসি। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তিনি যখন প্রদীপটি কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন, 'তখন সে হাসি-হাসি ভাব দূর হইল, মতির মুখ গম্ভীর হইল।' আপনার রূপের প্রভায় যিনি প্রসিদ্ধ ওমরাহগণকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছেন, যুবরাজ সেলিম যাঁহার রূপের পূজারী, সামান্য নারীর নিকট আজ তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

কিন্তু গর্ব্বিতা হইলেও মতিবিবি সৌন্দর্য্যের সেবিকা। তিনি 'অনিমিষলোচনে' কপালকুণ্ডলার রূপমাধুরী দেখিতে লাগিলেন। মতিবিবির পার্শ্বে কপালকুণ্ডলা—তাপনিয়ন্ত্রিত উদ্যানগৃহ মধ্যে সযত্নরক্ষিত পুষ্পবৃক্ষের পার্শ্বে স্বচ্ছন্দজাত বনলতা। মতিবিবি নিরাভরণা কপালকুণ্ডলার স্বভাব-সৌন্দর্য্যদর্শনে 'মুগ্ধা', কপালকুণ্ডলা অপরূপ সজ্জায় শোভিতা মতিবিবিকে দেখিয়া 'কিছু বিস্মিতা।' মতি অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি খুলিয়া কপাল-কুণ্ডলাকে সাজাইতে লাগিলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যেই আসিয়া থাকুন, এক্ষণে তিনি যে কপালকুণ্ডলাকে স্বীয় অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন, ইহা সৌন্দর্য্যের উপাসিকার সুন্দরের পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। কপালকুণ্ডলাও ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না, কারণ সমগ্র ব্যাপারটি তাঁহার নিকট অর্থহীন হেঁয়ালি। এ যেন ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা উপাসিকা উপাস্য দেবতাকে মনোমত আভরণে সাজাইয়া দিলেন, ইহাতে উপাসিকার আত্মপ্রসাদ, দেবতা নির্ব্বিকার। পর দিবস কপালকুণ্ডলা যখন সমুদায় অলঙ্কার ভিক্ষুককে দান করিলেন (২।৪), তৎকালীন তাঁহার আচরণ একদিকে যেমন তাঁহার নির্লোভ সারল্যের পরিচয় দেয়, অন্যদিকে ইহা তেমনই মতিবিবির ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বের উপর নির্জ্ঞাত টিপ্পনী।

স্বামী ও সপত্নীর সহিত আকস্মিক সাক্ষাতে মতিবিবির মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া হইল, বর্দ্ধমানের পথে পেষমনের সহিত সংলাপের ভিতর দিয়া আমরা তাহার প্রথম আভাস পাই। (৩।২)। মতিবিবি যখন সেলিমের

পরিবর্ত্তে খস্রুকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, তখনই তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, এই উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিনী মেহের-উন্নিসার সিংহাসনপ্রাপ্তির পথরোধ করিতে পারিলে তিনি অতঃপর কোন ওমরাহকে বিবাহ করিয়া অবশিষ্ট জীবন ওমরাহগৃহিণীরূপে কাটাইয়া দিবেন। (৩।২)। এক্ষণে তাঁহার মনে হইল যদি ওমরাহগৃহিণী হইতে হয়, তাহা হইলে নবকুমারকেই কেন ওমরাহের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন না? এইরূপে তিনি নবোন্মেষিত প্রণয়ের সহিত তাঁহার স্বাভাবিক ভোগলিপ্সার মোটামুটি রকমের একটা বোঝাপড়া করিতে চাহিলেন।

কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া ওমরাহগৃহিণী হইবার পরিকল্পনা করিলেও ইহাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। মতিবিবির গোপন বাসনা ইহার অনেক ঊর্দ্ধে। তিনি ভুলিতে পারেন নাই যে, যুবরাজ সেলিমের সহিত মেহের-উন্নিসার সাক্ষাতের পূর্ব্বে তিনি ভারতসম্রাজ্ঞী হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।[১] পক্ষান্তরে, তাঁহার নূতন বাসনাও এখন পর্য্যন্ত দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই। এই কারণেই তিনি যখন দূত মারফত সেলিমের সিংহাসনপ্রাপ্তির সংবাদ পাইলেন, তখন প্রথমেই তাঁহার মেহের-উন্নিসার কথা মনে হইল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মতিবিবি জানিতেন মেহের-উন্নিসা সেলিমের অনুরাগিণী হইলে তাঁহার সকল আশাই নির্ম্মূল হইল, অন্যথা তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক। সুতরাং তিনি মেহেরের মন বুঝিবার জন্য বর্দ্ধমানে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ইহাই ইতিহাসের সহিত 'কপালকুণ্ডলা'র আখ্যায়িকার যোগসূত্র। এতদিন মতিবিবির জীবন একটানা স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে, এক্ষণে তিনি যখন দুই পথের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ইতিহাস তখন তাঁহার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিল। অন্তরে প্রণয়ের সঞ্চার না হইলে মতিবিবি কখনও রাজধানীর মোহ ছাড়িয়া সপ্তগ্রামে ছুটিয়া আসিতেন না, ইহা যেমন সত্য, মেহের-উন্নিসা তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার অন্তরায় না হইলে এই প্রণয় যে অঙ্কুরেই শুকাইয়া যাইত, ইহাও তেমনই সত্য।

১ সেলিমের সহিত মতিবিবির প্রণয়কাহিনী কাল্পনিক হইলেও এরূপ গোপন প্রণয় সেলিমের চরিত্রবিরুদ্ধ নহে। সেলিম ও কুমারী মেহের-উন্নিসার গোপন প্রণয়কাহিনীর ঐতিহাসিকত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে ডক্টর মজুমদার-রায়চৌধুরী-দত্ত লিখিয়াছেন: 'That Jahangir was not above the habit of having secret love affairs with the ladies of the court is proved by the case of Anarkali, for whom he raised in 1615 a beautiful marble tomb at Lahore.'

An Advanced History of India (2nd Edition) p. 466.

পান্থনিবাসে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে একটি 'দীর্ঘনিশ্বাসশব্দে' যাহার সূচনা, নবকুমারকে ওমরাহ করিবার সঙ্কল্পে যাহার প্রথম স্পষ্ট অভিব্যক্তি, আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তনান্তর পুনরায় পেষমনের সহিত বিশ্রাম্ভালাপের ভিতর দিয়া আমরা মতিবিবির জীবনের সেই গতিকেন্দ্র পরিবর্ত্তনের পূর্ণ ইতিহাস পাই। (৩।৫)। মতিবিবি সুখ খুঁজিয়াছেন। সুখের সন্ধানে তিনি বাংলাদেশ ছাড়িয়া সুদূর আগ্রায় আসিয়াছেন। 'ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা'—কোন কিছুরই তাঁহার অপ্রাচুর্য্য নাই। কিন্তু সুখ কোথায়? এতদিনে তিনি বুঝিয়াছেন, একদিনের জন্যও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই, বুঝিয়াছেন ভোগে 'কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র।' এবং এই অনুভূতির সঙ্গেই তাঁহার মনে হইয়াছে, আগ্রায় যুবরাজ সেলিমের বিলাসসজ্জায় তিনি যে ঐশ্বর্য্য খুঁজিয়া পান নাই, পান্থনিবাসে আর্দ্র মৃত্তিকায় তিনি যে নিরাভরণা তরুণীকে দেখিয়াছেন সেই দরিদ্রাই হয়ত সেই ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী। ভোগের চরিতার্থতায় সুখ হয় না কেন, পেষমনের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন, "কেন হয় না, তা এতদিনে বুঝিয়াছি। তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে একরাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছি।" তিনি বলিতেছেন, "আমি এত কাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ-মধ্যে খুঁজিয়া একটি রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।" মেহের-উন্নিসার সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহার অবচেতন মনে এই আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল বলিয়াই মেহেরের মন বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দুঃখ না হইয়া 'বরং ঈষৎ সুখানুভব হইল।' এবং এই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণানুভূতির ফলেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেহেরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সম্রাট জাহাঁগীরের নিকট বিদায়গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইল।

মতিবিবি পরাজয় স্বীকার করিলেন, কিন্তু সম্রাট জাহাঁগীরের সহিত আচরণে আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে দিলেন না; অথচ তদানীন্তন অবস্থায় যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলেন, সুকৌশলে বাদশাহের নিকট হইতে তিনি তাহা আদায় করিয়া লইলেন: তিনি জাহাঁগীরের নিকট হইতে স্বামীকে ওমরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন। (৩।৪)। কিন্তু বুদ্ধিমতী হইয়াও মতিবিবি এখানে হিসাবের মস্ত বড় ভুল করিলেন। তিনি যে জগতের সহিত পরিচিত সেখানে রূপের পণ্যের কেনাবেচা হয়, সেখানে ঐশ্বর্য্যের মাপকাঠিতে মনুষ্যত্বের বিচার হয়; মতিবিবির দৃষ্টি যতই প্রখর হউক, তাহা

এই সীমাবদ্ধ জগতের বাহিরে প্রসারিত হয় নাই। তাই মেহের-উন্নিসার নিকট নহে, মতিবিবির সত্যকার পরাজয় হইল নবকুমারের নিকট।

চমকপ্রদ দৃশ্যাদির পরিকল্পনায় বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত। ইহা তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সপ্তগ্রামে নবকুমার ও মতিবিবির সাক্ষাৎকারের চিত্র (৩।৬) অতীব চমকপ্রদ। এবং ইহা একদিকে যেমন নবকুমারের চরিত্রের দৃঢ়তা, অন্যদিকে তেমনই মতিবিবির নবোন্মেষিত প্রণয়ের উচ্ছ্বাস, তাঁহার নারীসুলভ অভিমান ও সহজাত আত্মমর্য্যাদাবোধের পরিচয় দেয়। প্রত্যাখ্যাতা মতিবিবি যখন 'মস্তক উন্নত করিয়া, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া, নবকুমারের প্রতি অনিমিষ আয়তচক্ষু স্থাপিত করিয়া, রাজ রাজমোহিনী' মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন সেই 'বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী' মূর্ত্তি দেখিয়া নবকুমারের মনে পড়িল বহুকালবিস্মৃত তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর 'তেজোময়ী মূর্ত্তি', পরিবর্ত্তিত প্রতিবেশে মতিবিবির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল দীর্ঘদিনের নিদ্রাগতা পদ্মাবতী। বঙ্কিম দেখাইতেছেন, যে লুৎফ-উন্নিসা একদিন ভারতসমাজ্ঞী হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, অবস্থান্তরে তিনি পদ্মাবতীরই রূপান্তর মাত্র। সিংহাসনাভিলাষিণী লুৎফ-উন্নিসা, ব্যর্থপ্রেমিকা মতিবিবি এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণপত্নী পদ্মাবতীর মধ্যে গর্ব্ববোধ ও মানসিক শক্তির দিক দিয়া কোন পার্থক্য নাই।

মতিবিবির এই সময়ের গর্ব্বিত উক্তিঃ "তুমি আমারই হইবে", আর একটি গর্ব্বিত উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। রূপমুগ্ধ গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরকে ত্যাগ করিলেন, তখন সতীর সহজ দৃপ্তকণ্ঠে ভ্রমর বলিয়াছিল, "তবে যাও—পার, আসিও না।....কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে।" ভ্রমরের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয় নাই, কারণ তাহার ভালবাসায় আবিলতা ছিল না এবং রোহিণী তাহার সর্ব্বনাশ করিলেও ভ্রমর কখন প্রতিহিংসা চিন্তা করে নাই। মতিবিবির গর্ব্বিতবাণী ব্যর্থ হইল, কারণ তাঁহার প্রণয় কামনার কলুষতাদুষ্ট এবং স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আগ্রায় তিনি যেমন রাজনৈতিক জুয়াখেলায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এস্থলেও তিনি নিষ্পাপ, নিরপরাধিনী কপালকুণ্ডলাকে স্বার্থের অন্তরায় মনে করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্তুতঃ নবকুমারের দর্শনে তাঁহার প্রাণে প্রণয়সঞ্চার হইলেও, অন্য দিক দিয়া তাঁহার চরিত্রে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। রূপ পরিবর্ত্তিত হইলেও, তাঁহার ভোগতৃষ্ণা তেমনই প্রবল, আকাঙক্ষা তেমনই দুর্দ্দমনীয় এবং কার্য্যসিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে তিনি তেমনই ঔচিত্যানৌচিত্য বিচারশূন্য। ফলে, এক্ষণে তিনি যে নূতন চাল চালিলেন তাহাতে তাঁহার

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, পরন্তু তিনি দুইটি অমূল্য জীবন ধ্বংসের পরোক্ষ কারণ হইলেন।

তাহা হইলেও মতিবিবির চরিত্রে যাহা কিছু মহৎ তাহা নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার সংস্পর্শেই বিকাশলাভ করিয়াছে। নবকুমার হইতেই তাঁহার নারীত্বের নব-জাগরণ। এবং প্রত্যাখ্যাত হইয়া মতিবিবি তাঁহার চরিত্রানুযায়ী নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার চিরবিচ্ছেদ ঘটাইবার সঙ্কল্প করিলেও (৩।৭), তিনি কাপালিকের সহিত হাত মিলাইতে পারিলেন না ; তাঁহার ভিতরকার শাশ্বত নারীত্ব হত্যার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। শুধু তাহাই নহে, কপালকুণ্ডলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই পরিবর্ত্তনের কারণ অনুমান করা কঠিন। হয়ত কাপালিকের নিকট কপালকুণ্ডলার বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণান্তর তিনি তাহাকে নিতান্ত অযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী মনে করিয়া অনুকম্পাবশতঃ মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলেন ; এমন কি নিজের দুরভিসন্ধির কথাও তাঁহার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিলেন। (৪।৭)। অবশ্য এস্থলেও মতিবিবি আত্ম-কেন্দ্রিক ; তিনি কপালকুণ্ডলার যে উপকার করিলেন বলিয়া মনে করিলেন, তাহার বিনিময়ে তিনি কঠিন মূল্য প্রার্থনা করিলেন, তিনি তাঁহাকে স্বামীত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মতিবিবির বুদ্ধি যতই প্রখর হউক, তাহা একটি নির্দ্দিষ্ট জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ইহার বাহিরে তাঁহার ভুল-ভ্রান্তি এমন কি হাস্যোদ্দীপক। কপালকুণ্ডলা এ অবস্থায় যাহাই করুন, গার্হস্থ্য জীবনের শুচিতা অথবা দাম্পত্য-প্রণয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতিবিবির যদি কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখন স্ত্রীর নিকট স্বামীত্যাগের মত আজগুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিতেন না। অথবা কপালকুণ্ডলা তাঁহার দেওয়া অলঙ্কারাদি ভিক্ষুককে দান করিয়াছেন, একথা জানিয়া শুনিয়াও (৪।৭, ৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সংস্কারবশতঃ তাঁহাকে অট্টালিকা, ধনসম্পদ ও দাসদাসীর প্রলোভন দেখাইতেন না। তথাপি মতিবিবির আন্তরিকতা প্রশ্নের অতীত। নবকুমারের প্রতি প্রণয় এবং কপালকুণ্ডলার সহিত আচরণে আন্তরিকতা মতি-বিবির মসীলিপ্ত জীবনে দুইটি শুভ্র চিহ্ন।

কপালকুণ্ডলা ভিন্ন জগতের—যেন আমাদের পরিচিত জগত হইতে বহুদূরের, কোন স্বপ্নলোকের জীব। তাঁহার জীবনের ধারাও স্বপ্নময়, প্রহেলিকা-পূর্ণ। এই স্বপ্নময় জগত ও স্বপ্নময় জীবনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বঙ্কিম কপালকুণ্ডলার প্রথম পরিচয়ের চিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন। অস্পষ্ট সন্ধ্যা-

লোকে সমুদ্র সৈকতের অপূর্ব্ব শোভা, কপালকুণ্ডলার নিরাভরণ দেহের স্বভাব-সৌন্দর্য্য, তাঁহার সঙ্গীততুল্য কণ্ঠস্বর—সকল মিলিয়া যেন এক ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে। কপালকুণ্ডলার অলক্ষ্য আগমন এবং তেমনই অলক্ষ্য তিরোধান নবকুমারের ন্যায় মন্ত্রমুগ্ধ পাঠকের মনেও প্রশ্ন জাগায়: 'একি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়ামাত্র।'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিম দীনবন্ধুর নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কপাল-কুণ্ডলা তাহার কাব্যাত্মক উত্তর। এই উত্তরের যাথার্থ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পরীক্ষিত হইতে পারে না, অথবা মানবজাতির ইতিহাসে আমরা কপাল-কুণ্ডলার ন্যায় প্রকৃতিপালিতার উদাহরণ পাই না। সুতরাং এস্থলে মনোবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান বঙ্কিমের সিদ্ধান্তকে কতখানি সমর্থন করে আমাদিগকে প্রধানতঃ তাহার বিচার করিতে হইবে।

কপালকুণ্ডলার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অধিকারী বলিতে-ছেন, তিনি 'ইহার বৃত্তান্ত' সবিশেষ অবগত আছেন কিন্তু নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ ঘটাইবার জন্য যতটুকু বলা প্রয়োজন, অর্থাৎ ইনি ব্রাহ্মণকন্যা, 'বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ-প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন'—তিনি ইহার অধিক কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। এইরূপে বঙ্কিম কপালকুণ্ডলার চরিত্রাঙ্কন ব্যাপারে বংশগত দোষগুণের প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা অরণ্যাকীর্ণ নির্জ্জন সমুদ্রতীরে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছেন এবং সেখানে তিনি কাপালিক ভিন্ন একমাত্র অধিকারীর সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় তাঁহার চরিত্রে আমরা সেই সকল গুণের বিকাশ আশা করিতে পারি যাহা নারীপ্রকৃতির মৌলিক বৃত্তি এবং প্রকৃতি যাহার পরিপোষক, অথবা কাপালিক এবং অধিকারীর সাহচর্য্য যাহার বিকাশের সহায়। ইহাই হইল কপালকুণ্ডলার চরিত্রের আলোচনার ভিত্তি।

অনুকম্পা (পরোপচিকীর্ষা ইহার একটি বিশিষ্ট রূপ) নারীপ্রকৃতির সহজাত মৌলিক বৃত্তি; কপালকুণ্ডলা অনুকম্পাপরায়ণা ও পরোপকারিকা।[১] নারী-প্রকৃতির অপর এক গুণ ধর্ম্মভাব, কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রে কাপালিক ও অধি-কারীর সাহচর্য্য এই ধর্ম্মভাবের পরিপোষক, এবং সাংসারিক রীতিনীতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইলেও, ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া কপালকুণ্ডলা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কারে

১ কপালকুণ্ডলা একদিকে যেমন নবকুমারের প্রাণরক্ষা করিলেন, অন্যদিকে তেমনই কাপালিকের আশ্রয়ে থাকিলে তাঁহার নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কা রহিয়াছে, একথা জানিয়া-শুনিয়াও কাপালিককে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার দুঃখ হইল। (১১৮, ২৪ পৃঃ)।

আস্থাবতী।[১] আদিম মানবমন নিঃশঙ্ক ও স্বাধীনতাপ্রিয়; কপালকুণ্ডলা শঙ্কাহীনা ও স্বাধীনতাপ্রিয়। সাধারণ অবস্থায় লজ্জা নারীর ভূষণ; কিন্তু লজ্জার সহিত সাংসারিক জ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। লৌকিক আচার ও সংস্কার বর্জ্জিত বলিয়া অপরিচিতের সহিত আচরণেও কপালকুণ্ডলা লজ্জা ও সঙ্কোচহীনা। এবং ইহার সহিত আদিম মানবমনের সারল্যের সংযোগ রহিয়াছে বলিয়া এই লজ্জা ও সঙ্কোচহীনতা কপালকুণ্ডলার চরিত্রে অশোভন না হইয়া তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত বুঝিলাম। কিন্তু কপালকুণ্ডলার চরিত্রে প্রণয়ের বিকাশ হইল না কেন? আপাতদৃষ্টিতে ইহার উত্তর এই যে, প্রাকৃতিক জীবনে কপালকুণ্ডলা যে দুই জন লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি কোনরূপ সাংসারিক বা লৌকিক জ্ঞান লাভ করেন নাই। তিনি কাপালিক প্রতিপালিতা, সুতরাং 'অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান।' নরঘাতক কাপালিকের সাহচর্য্য প্রণয়বিকাশের বা গার্হস্থ্যজীবনের অনুকূল নহে। তারপর অধিকারী? কপালকুণ্ডলাকে তিনি অপত্যবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার নিকট কপালকুণ্ডলা 'যুবতীর....যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত'—এইরূপ মামুলী ধরণের দু-একটি কথা শুনিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি এ সকল কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অধিকারী সেকেলে মানুষ, এ বিষয়ে ইঙ্গিতেও কোনরূপ আভাস দেওয়া সঙ্গত বা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই। ফলে কপালকুণ্ডলা লোকাচার ও গার্হস্থ্যজীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়া গেলেন।[২]

কিন্তু এই যুক্তি দ্বারা প্রশ্নটির প্রকৃত মীমাংসা পাওয়া যায় না। কারণ যৌবনের বিশিষ্ট চাঞ্চল্য সমাজ-জীবনের শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না; ইহা

১ কপালকুণ্ডলার উপর কাপালিকের প্রভাবের একটুকু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। কাপালিকের সংস্পর্শে আসিয়া ভৈরবীর প্রতি ভক্তিমতী হইলেও কপালকুণ্ডলার সহজাত অনুকম্পাবৃত্তি তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ নরবলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। এই কারণেই নবকুমারকে রক্ষা করিতে যাইয়া তিনি মাতৃপূজার ব্যাঘাত করিতেছেন, এরূপ চিন্তা তাঁহার মনে আসে নাই। অথচ ভৈরবী মাতা তাঁহাকে বলি চাহিতেছেন যখনই তাঁহার এই প্রতীতি জন্মিল, তখনই তিনি আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

২ বিভিন্ন সাহিত্যে যে সকল প্রকৃতিপালিত নারী চরিত্র রহিয়াছে তাঁহাদের সহিত এইখানেই কপালকুণ্ডলার মৌলিক পার্থক্য। ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্বে' এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। এবং বিভিন্ন সমালোচক শকুন্তলার ও মিরাণ্ডার সহিত কপালকুণ্ডলার তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন।

সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। অবশ্য ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য বৃত্তির ন্যায়, যৌবনের বিশিষ্ট বৃত্তির বিকাশও অনেকটা পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ অনুকূল আবেষ্টনে ইহা যেমন সহজেই বিকাশলাভ করে, প্রতিকূল আবেষ্টনে ইহা তেমনই দীর্ঘকাল বিলম্বিত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে: নবকুমারের পূর্ব্বেও অনেক হতভাগ্য পথিক কাপালিকের পূজার বলি হইয়াছে; কপালকুণ্ডলা তাহাদের কাহাকেও রক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছেন উপন্যাসে এরূপ কোন আভাস নাই। অরণ্যমধ্যে পথ হারাইলে তিনি যখন নবকুমারকে পথ দেখাইয়া কুটীরে ফিরাইয়া আনিলেন তখনও কাপালিকের হস্তে তাঁহার সম্ভাব্য পরিণতির কথা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং নিছক পরোপকার বৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইলে তিনি এই সময় বিনা বিপত্তিতে নবকুমারকে অধিকারীর আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন। এমত অবস্থায় সহসা মৃত্যুপথযাত্রী নবকুমারকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার বেপরোয়া চেষ্টা কি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না? মনে হয় কপালকুণ্ডলার অজ্ঞাতে করুণার ছদ্মবেশে ইহাই তাঁহার যৌবনের জাগরণের প্রতীক। অন্ততঃ, এইরূপ অনুমান করিয়া লইলে কপালকুণ্ডলার প্রথম দিনের আচরণের সহিত তাঁহার দ্বিতীয় দিনের আচরণের অসঙ্গতির একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নারীত্বের জাগরণ একটি বিশিষ্ট মুহূর্ত্তের অপেক্ষা রাখে, সে মুহূর্ত্ত কখন কোন্ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া দেখা দিবে তাহা একমাত্র তাঁহার ভাগ্যবিধাতাই জানেন। সে পুরুষ হয়ত পূর্ব্বপরিচিত, হয়ত সম্পূর্ণ অপরিচিত হইতে পারে, কিন্তু সেদিন সে মুহূর্ত্তে সে দেখা দেয় নূতন রূপে নূতন আকর্ষণীশক্তি লইয়া।[১] নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া কপালকুণ্ডলা যখন নবকুমারকে রক্ষা করিলেন, নিজে না বুঝিলেও তখনই হয়ত তাঁহার জীবনে আসিয়াছে সেই বিশিষ্ট মুহূর্ত্ত এবং নিজে না জানিলেও নবকুমারই হয়ত সেই বিশিষ্ট পুরুষ। ইহার পর নবকুমারের সহিত যদি তাঁহার অদর্শন

১ ফার্‌ডিনাণ্ড্ (Ferdinand) এবং মিরাণ্ডার প্রথম দর্শনে পরস্পরের প্রতি প্রণয়সঞ্চারের আলোচনাপ্রসঙ্গে দার্শনিক-কবি কোল্‌রিজ (Coleridge) লিখিয়াছেন: It appears to me that in all cases of real love, it is at one moment that it takes place. That moment may have been prepared by previous esteem, admiration, or even affection,—yet love seems to require a momentary act of volition, by which a tacit bond of devotion is imposed, a bond not to be thereafter broken without violating what should be sacred in our nature.

Essays and Lectures on Shakespeare, p. 68

নরনারী উভয়ের অন্তরে যুগপৎ প্রণয়ের উন্মেষ সম্বন্ধে কোল্‌রিজ এস্থলে যে মন্তব্য করিয়াছেন এককভাবে প্রেমিক বা প্রেমিকা সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য।

ঘটিত, তাহা হইলে স্বাধীনভাবে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তিনি হয়ত পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ পাইতেন না, হয়ত কোথাও কি যেন অপূর্ণতা রহিয়া যাইত।

যাহা হউক, এই অনুমান অগ্রাহ্য করিলেও প্রশ্ন রহিয়া যায় (অবশ্য ইহাকে স্বীকার করিলে প্রশ্নটি আরও ঘোরালো আকার ধারণ করে): বিবাহের পর 'এক বৎসরের অধিক কাল' নবকুমারের সংসার করিয়াও তাঁহার প্রতি কপালকুণ্ডলার প্রণয়সঞ্চার হইল না কেন? তিনি যে মতিবিবির অনুরোধে স্বামীত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন ইহার অন্যতম কারণ নবকুমারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণের অভাব। এই সম্পর্কে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'কপালকুণ্ডলা ....পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না, অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন?' কপালকুণ্ডলার এই নিঃস্পৃহতা কি স্বাভাবিক? অথবা, এই নিঃস্পৃহতার মূলে যে যৌন আকর্ষণের অভাব তাহাই কি স্বাভাবিক?

যৌনজীবনে কপালকুণ্ডলার নিঃস্পৃহতার আলোচনাপ্রসঙ্গে (এই চরিত্রটির আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন) ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন: 'বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বুঝাইতে চাহেন:—এই Sex-attraction, এই আসঙ্গলিপ্সা, এই যৌনসম্বন্ধ, এই হৃদয়মিলন, এই প্রণয়, এই দাম্পত্য প্রেম, হয়ত সম্পূর্ণ নৈসর্গিক প্রকৃতিজাত নহে; শরীরবৃত্তিই বল আর হৃদয়বৃত্তিই বল, এই আকর্ষণ, এই আকাঙ্ক্ষা, হয়ত নারীপ্রকৃতির মৌলিক অঙ্গ নহে; ইহা কতকটা কৃত্রিম, সমাজ ও সভ্যতার সংস্পর্শে সঞ্জাত, মানব-জাতির হৃদয়বৃত্তির ক্রমিক অনুশীলনে উদ্ভূত। যেখানে সমাজের, সভ্যতার প্রভাব নাই, এবং সেই প্রভাবে নারীপ্রকৃতি প্রভাবিত হয় নাই, সেখানে ইহা নাও জন্মিতে পারে।'[১] এই যুক্তি মানিয়া লইলে পূর্ব্বে যে যৌবনের জাগরণের উল্লেখ করিয়াছি তাহা পুরাপুরি নাকচ করিতে হয়। কিন্তু বঙ্কিমের নিজের উক্তি এই মতের পোষকতা করে না, কারণ তিনি স্মরজ অনুরাগকে 'সহজ' ও 'স্বতঃস্ফূর্ত্ত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[২] কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রে যদি এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার কারণ কি? ডক্টর সেনগুপ্ত প্রশ্নটির এইরূপ উত্তর দিয়াছেন: 'স্বভাব সৌন্দর্য্য....অযৌন। এই সৌন্দর্য্য কাহারও মন গভীরভাবে আকর্ষণ করিলে তাহার যৌনপ্রবৃত্তি (অথবা

১ কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব, ৯ পৃঃ।

২ ধর্ম্মতত্ত্ব ২৩, ১২৮-২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অন্য যে কোনও প্রবৃত্তি) সমধিক স্ফূর্ত্তি পাইবে না।[১] কিন্তু ইহাও মূল প্রশ্নটির সদুত্তর বলিয়া মনে হয় না। কারণ প্রাকৃতিক জীবনে 'স্বভাব সৌন্দর্য্যে'র প্রভাব যাহাই হউক, বৎসরাধিককাল নবকুমারের সংসার করা সত্ত্বেও কপাল-কুণ্ডলা এই প্রভাব কাটাইতে পারিলেন না কেন? প্রাকৃতিক জীবনের পরি-প্রেক্ষিতে তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশের মধ্যেই আমাদিগকে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

প্রাকৃতিক জীবন সমষ্টিগত জীবনধারার পরিপন্থী এবং প্রাকৃতিক জীবনযাপনের ফলে যদি কোন বিশিষ্ট ঝোঁক (bias) জন্মে, তাহা হইলে কোনরূপেই তাহা প্রশমিত করা যায় না অথবা তাহার সহিত অপর কোন জিনিষের আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হয় না। প্রাকৃতিক জীবনে কপাল-কুণ্ডলার বিশিষ্ট ঝোঁক স্বাধীনতাপ্রীতি। বিবাহের পর তিনি যদি এই স্বাধীনতাপ্রীতির সহিত সামাজিক বিধিনিষেধের বোঝাপড়া করিয়া উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে (নবকুমারকে রক্ষা করার ব্যাপারে প্রণয়ের পূর্ব্বাভাস না থাকিলেও) স্বামীর ভালবাসা হয়ত তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিত এবং উভয়ের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ফলে তিনি হয়ত গার্হস্থ্য জীবনকেই কাম্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেন, অন্ততঃ ইহার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করিতেন না। কিন্তু কপালকুণ্ডলার পক্ষে তাহা সম্ভব হইল না। বিবাহের অনতিপরে তিনি ননদিনীকে বলিতেছেন, "বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" বৎসরেক পরেও এই দিক দিয়া তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। কপালকুণ্ডলা পরশপাথর ছুঁইয়াছেন, তিনি আর 'আলুলায়িতকুন্তলা ভূষণহীনা নহেন', তাঁহার 'আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ', 'কর্ণে হেমকর্ণভূষা......কণ্ঠে হিরণ্ময় কণ্ঠমালা।' এ ত গেল বাহিরের পরিবর্ত্তন। সাংসারিক জ্ঞানের দিক দিয়াও তাঁহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যৌনজীবন তাঁহার নিকট আর অনাবিষ্কৃত রাজ্য নহে, তিনি 'কুচরিত্রা' ও 'অবিশ্বাসিনী' শব্দের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন এবং ছদ্মবেশধারিণী মতিবিবির সহিত প্রথম সাক্ষাতে তাঁহার সহিত আচরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সাংসারিক জ্ঞান লাভের ফলে তিনি 'কতক দূর গৃহ-রমণীর স্বভাবসম্পন্না' হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন মন আজিও লৌকিক আচারের নিকট নতি স্বীকার করিতে শেখে নাই। ওষধি সংগ্রহার্থ রাত্রি-

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ১০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কালে একাকিনী বনগমনের প্রস্তাব করিলে শ্যামাসুন্দরী যখন লোকনিন্দার সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিলেন, কপালকুণ্ডলা সে যুক্তি উপেক্ষা করিলেন। ইহাতে নবকুমার অসুখী হইবেন, এরূপ যুক্তিও তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিল না। তিনি শ্যামাসুন্দরীকে স্পষ্টই বলিলেন, "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" অর্থাৎ অন্তঃকরণের দিক দিয়া আজও কপালকুণ্ডলা বন্ধনহীনা, সমুদ্রচারিণী কপালকুণ্ডলা। বিবাহ তাঁহার নিকট এক্ষণে বর্ণসমষ্টিমাত্র নহে, এ কথা সত্য; কিন্তু তাঁহার চক্ষে বিবাহ স্ত্রী-জাতির পক্ষে দাসীত্ববরণ। প্রধানতঃ এই কারণেই নবকুমারের সহিত তাঁহার অন্তরের যোগাযোগ হইল না। কারণ তিনি ভুলিতে পারিলেন না যে নব-কুমারের জন্যই তিনি স্বাধীনতা হারাইয়াছেন। নবকুমার যে মাঝে মাঝে তাঁহার স্বাধীন গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিতেন, তাহাতে এই ধারণা আরও দৃঢ়মূল হইল। ফলে (নবকুমারকে রক্ষা করার ব্যাপারে প্রণয়ের পূর্ব্বাভাস থাকিলেও) স্বামী হইয়াও তিনি তাঁহার মন হইতে দূরে রহিয়া গেলেন এবং কপালকুণ্ডলা সর্ব্ব বিষয়েই অন্তরের বাণীকে প্রাধান্য দিলেন। প্রথম রাত্রির অভিযানের প্রাক্কালে নবকুমারের প্রতি তাঁহার অপ্রীতিকর কঠিন বাক্য প্রয়োগ নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহা উভয়ের মধ্যে অন্তরের সংযোগের অভাবের ফলে কপালকুণ্ডলার মনে ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষের আকস্মিক বহিঃ-স্ফুরণ। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে, কপালকুণ্ডলা নিঃসন্তান। তিনি যদি সন্তানের জননী হইতেন তাহা হইলে ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহার ও নবকুমারের মধ্যে মিলনের সেতু রচিত হইতে পারিত। অন্ততঃ কপালকুণ্ডলা এতখানি অনাসক্ত থাকিতে পারিতেন না।

এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া লইলে কপালকুণ্ডলার প্রত্যেকটি আচরণ সহজবোধ্য হইয়া পড়ে এবং আমরা বুঝিতে পারি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সহিত বিরুদ্ধ ঘটনার যোগাযোগ কেমন করিয়া তাঁহাকে বিধিনির্দ্ধারিত পরিণতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। কপালকুণ্ডলার চরিত্রে অভিনবত্ব রহিয়াছে, কিন্তু ইহা অস্বাভাবিকতা দুষ্ট নহে।

কপালকুণ্ডলা পরোপকারিকা, নিঃশঙ্ক, স্বাধীনতাপ্রিয় এবং লৌকিক অনুশাসনে শ্রদ্ধাহীন। সুতরাং তিনি স্বামীর নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করিয়া, এমন কি তাঁহাকে অনুচিত আঘাত করিয়া ননদিনীর উপকারার্থ একাকিনী বনে গমন করিলেন। ঘটনাস্রোত তাঁহার প্রতিকূল; একই রাত্রে তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত ছদ্মবেশিনী মতিবিবির সহিত হোমরত কাপালিকের

সাক্ষাৎ হইল এবং ইহার অনতিপরেই মতিবিবির সহিত কপালকুণ্ডলারও সাক্ষাৎ হইল। ঘটনার এই যোগাযোগ আকস্মিক হইলেও কোনস্থলেই ইহা সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করে নাই।

ঐ রাত্রেই মতিবিবি যদি কপালকুণ্ডলার নিকট তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে পারিতেন তাহা হইলে কি হইতে পারিত তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার যাহা বলিবার ছিল তাহা বলা হইল না। মতিবিবি সোজাপথে চলিতে শেখেন নাই, তিনি তাঁহাব স্বভাবানুযায়ী অদ্ভুত উপায়ে কপালকুণ্ডলার নিকট নৈশসাক্ষাতের আমন্ত্রণ পাঠাইলেন। ইহাতে যে সমস্যার সৃষ্টি হইল সাধারণ গৃহস্থ রমণীর পক্ষে তাহা সমস্যাই নহে। সাধারণ গৃহস্থবধূ এরূপ আমন্ত্রণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতেন। অন্ততঃ স্বামীর নিকট হইতে ইহা গোপন রাখিতেন না। কিন্তু কপালকুণ্ডলা অনন্যসাধারণ। তাঁহার নৈতিক আদর্শ অনুসারে 'সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দূষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই।' এমন কি, তিনি এ সম্বন্ধে স্বামীর সহিত কোনরূপ পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিলেন না। তিনি প্রশ্নটিকে সাধারণ গৃহস্থ রমণীর দৃষ্টি দিয়া না দেখিয়া আপনার ভক্ত্যাপ্লুত হৃদয় দিয়া ইহার বিচার করিলেন। এই আমন্ত্রণপত্রের মধ্যে তিনি 'ভক্তবৎসল ভবানী'র ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেন; সুতবাং তিনি 'ব্রাহ্মণবেশী'র সহিত সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত করিলেন। বাহিরের ঘটনার সমাবেশ এক্ষেত্রে উপলক্ষ্য মাত্র; কপালকুণ্ডলার চরিত্রই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

দ্বিতীয় রাত্রির অভিযানের বর্ণনা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী; এবং ইহাতে যে সকল সঙ্কেত (symbolism) রহিয়াছে তাহা উচ্চশ্রেণীর শিল্পশক্তির পরিচয় দেয়। প্রত্যেকটি ছোটখাটো ঘটনাই যেন গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। একটি উদাহরণ দিতেছি: 'কপালকুণ্ডলা যাত্রাকালে শয়নাগারে প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া গেলেন। তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল।' (৪।৪)। কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের ভাগ্যলক্ষ্মীও যে তাঁহার গৃহের প্রদীপ নিবাইয়া চিরদিনের জন্য বিদায় লইলেন, ইহা তাহারই ইঙ্গিত। ইহার অব্যবহিত পরের ঘটনাটি আরও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতপূর্ণ। 'ব্রাহ্মণবেশী' কোন্ স্থানে তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছেন তাহা জানিয়া লইবার জন্য কপালকুণ্ডলার পক্ষে 'পুনর্ব্বার লিপিপাঠের আবশ্যক হইল।' তিনি অনুসন্ধান করিয়া লিপি পাইলেন না, 'স্মরণ হইল যে, কেশবন্ধন সময়ে ঐ লিপি সঙ্গে রাখিবার জন্য কবরীমধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। অতএব কবরীমধ্যে অঙ্গুলি দিয়া সন্ধান করিলেন। অঙ্গুলিতে লিপি স্পর্শ না হওয়াতে কবরী

আলুলায়িত করিলেন, তথাপি সে লিপি পাইলেন না। তখন....পূর্ব্বসাক্ষাৎ-স্থানেই সাক্ষাৎ সম্ভব সিদ্ধান্ত করিয়া পুনর্যাত্রা করিলেন। অনবকাশপ্রযুক্ত সে বিশাল কেশরাশি পুনর্বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই, অতএব আজি কপালকুণ্ডলা অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন।' অতি স্বাভাবিক ক্ষুদ্র ঘটনা ; কিন্তু ইহার পরিণামফল যেমন ভয়াবহ (নবকুমার যখন দূর হইতে মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলাকে লক্ষ্য করিলেন, তখন মতিবিবির 'পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কপালকুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল।.......দেখিয়া নবকুমার ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।'), ইঙ্গিত হিসাবে ইহা তেমনই অর্থপূর্ণ। পূর্ব্ব-রাত্রির অভিযানে কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির আহ্বান শুনিয়াছিলেন, সে আহ্বানে তিনি আপনার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আজিকার রাত্রে তিনি যেন একেবারেই ক্ষণিকের মৃণ্ময়ীজীবন ত্যাগ করিয়া অন্তরে বাহিরে কপাল-কুণ্ডলা সাজিলেন। দূর হইতে নবকুমার যখন তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণবেশী'র সহিত সংলাপরত দেখিতে পাইলেন, তখন 'কপালকুণ্ডলা আলুলায়িতকুন্তলা। যখন কপালকুণ্ডলা তাঁহার হয় নাই, তখনই সে কুন্তল বাঁধিত না।' মিথ্যা সন্দেহের তাড়নায় মৃণ্ময়ী যখন তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইলেন, নবকুমার তখন বাহিরেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না ; যাহাকে দেখিলেন তিনি কপালকুণ্ডলা। তাঁহার মনগড়া মৃণ্ময়ীর মাপকাঠিতে এই বনচারিণীর বিচার করিতে যাইয়া নবকুমার সর্ব্বনাশী ভুল করিলেন।

মতিবিবির সহিত কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎকার একদিকে যেমন নবকুমারের ভ্রান্ত বিচারে তাঁহার সন্দেহ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিল, অন্যদিকে তেমনই কপালকুণ্ডলাকেও আত্মবিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত করিল, এবং ভ্রান্তিবশে নবকুমারের ক্ষণিক উন্মাদ অবস্থা ও কপালকুণ্ডলার ভৈরবীপূজায় আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প—এই উভয়ের যোগাযোগের ফলে তাঁহারা সহজেই অদৃষ্টদেবতার শিকার হইলেন। কথাটির একটুকু বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন :

কপালকুণ্ডলা যে মতিবিবির প্রার্থনানুযায়ী অতি সহজেই স্বামীত্যাগে সম্মত হইলেন, ইহার এক কারণ তাঁহার নিঃস্পৃহতা, পূর্ব্বেই ইহার উল্লেখ করিয়াছি। ইহার অপর কারণ তাঁহার ভৈরবী ভক্তি ; পরোপচিকীর্ষা নিতান্তই গৌণ। মতিবিবির মুখে কাপালিকের স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া কপালকুণ্ডলা 'চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন—চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন।' ইহার পর তিনি যখন স্বামীত্যাগের অনুরোধ পাইলেন, তখন তাঁহার পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ হইল। ভৈরবী ডাকিয়াছেন, সংসারেও কোন আকর্ষণ নাই—তবে কেন তিনি অপরের সুখের অন্তরায় হইবেন ?

কপালকুণ্ডলার মনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন সহসা অলৌকিক দৃশ্য দর্শনে ও অলৌকিক বাণীশ্রবণে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। ঠিক এই সময় কাপালিক সমভিব্যাহারে নবকুমার তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সহজ অবস্থায় নবকুমারকে কাপালিকের সহিত আসিতে দেখিয়া কপালকুণ্ডলা হয়ত বিস্মিত হইতেন। তিনি যতই সাংসারিকজ্ঞানশূন্য হউন, এক বৎসরের অধিককাল সমাজে বাস করিয়াছেন এবং সামাজিক রীতিনীতি না মানিলেও ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এমত অবস্থায় স্বামীর বিসদৃশ আচরণে (তিনি কখন তাঁহার নিকট রূঢ় ব্যবহার পান নাই) হয়ত তিনি তাঁহাব মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতেন। অন্ততঃ নবকুমারের আচরণের প্রতিবাদ করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত; এবং তিনি কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেই হয়ত নবকুমাবের ভ্রান্তি ঘুচিত। কিন্তু কপালকুণ্ডলার চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। তিনি প্রথমে তাঁহাদিগকে 'যমদূত' বলিয়া ভ্রম করিলেন; পরে যখন চিনিতে পারিলেন তখনও বিস্মিত বা বিচলিত হইলেন না। কাপালিকের ন্যায় নবকুমারকেও তিনি ভবানীপ্রেরিত বলিয়া মনে করিলেন। নবকুমার যখন 'দৃঢ়মুষ্টিতে' তাঁহার হস্তধারণ করিলেন, কপালকুণ্ডলা প্রতিবাদ না করিয়া ঊর্দ্ধে আকাশপথে ভবানীর ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। নবকুমারের অন্তরের আলো নিবিয়া গিয়াছে, এক্ষণে বাহিরের আলোও নিবিয়া গেল। 'চন্দ্রমা অস্তমিত হইল।' (৪।৯)। এস্থলে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা লক্ষণীয়।

নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার শোচনীয় পরিণতির চিত্রে বঙ্কিম সময়োপযোগী ভীষণ-সুন্দর পটভূমিকা পরিকল্পনা করিয়াছেন। অন্ধকার নদীসৈকতে শ্মশানভূমিতে কাপালিকের পূজার আয়োজন আর একটি দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেদিনও নবকুমার ছিলেন পথভ্রান্ত পথিক। সেদিন কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার পথনির্দ্দেশ করিবে কে?

নবকুমারের এই সময়ের ব্যাধিগ্রস্ত উন্মত্ত অবস্থার সহিত কপালকুণ্ডলার শান্ত, সমাহিতভাবের পার্থক্য প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কাপালিকের আদেশমত নবকুমার যখন তাঁহাকে শেষ স্নান করাইতে চলিয়াছেন, সেই সময় তাঁহার ছোটখাটো প্রশ্ন: "ভয় পাইতেছ?"; "তবে কাঁপিতেছ কেন?"; "কাঁদিবে কেন?"—কপালকুণ্ডলার সারল্য ও পরদুঃখকাতর অন্তরের পরিচয় দেয়। ইনি সেই কপালকুণ্ডলা যিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া নবকুমারের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সেদিন তিনি নিজের জন্য চিন্তা করেন নাই;

আজিও তাঁহার নিজের জন্য চিন্তা নাই। এমন কি সুরার প্রভাবমুক্ত নবকুমারের মুখে তিনি যখন তাঁহার উত্তেজনার প্রকৃত কারণ শুনিতে পাইলেন, তখনও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, পরন্তু সস্নেহে উত্তর করিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!" স্বামী অবিশ্বাস করিতেছেন এই সন্দেহে পূর্ব্বরাত্রে যাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল, স্বামী তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছেন ইহা নিশ্চিত জানিয়াও আজ তাঁহার ক্ষোভ নাই, অভিযোগ নাই, অভিমান নাই। কারণ কপালকুণ্ডলা সংসারের দেনাপাওনা চুকাইয়া ফেলিয়াছেন।

কিন্তু তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের নিকট ব্রাহ্মণবেশীর প্রকৃত পরিচয় দিলেন। কিন্তু তাহা নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য নহে; নবকুমারের অশান্ত মন শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে। এবং সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বলিলেন, "কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।" তাঁহার কণ্ঠস্বরে অভিযোগ বা উষ্মা নাই, আছে সংসারবন্ধনহীনা ভক্তিমতীর দেবতার পূজায় আত্মোৎসর্গের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

কপালকুণ্ডলা ফিরিলেন না। বাহিরের ঘটনার সঙঘাতে দুইটি অসমঞ্জস চরিত্রের মিলনে নিষ্ঠুর নিয়তির যে খেলার আরম্ভ, প্রকৃতির খেয়াল সেই খেলার পরিসমাপ্তি করিল। সাগরতীরে যাঁহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছেন, নবকুমারকে গঙ্গাবক্ষে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইল। কপালকুণ্ডলার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেও গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বঙ্কিম প্রশ্ন করিতেছেন: 'সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?'[১] কোথায় এ প্রশ্নের সমাধান?

১ উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের পরিসমাপ্তি এইরূপ:

কাপালিক আসনে বসিয়া দেখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বাণী প্রত্যাগমন করিলেন কি কি, এই আশঙ্কায় কাপালিক আসন ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া কূলে গমন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে কোন পদার্থ ভাসিয়া ডুবিল দেখিলেন—বোধ হইল, যেন মনুষ্যমস্তক মনুষ্যহস্ত। লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন। দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলা জলমগ্না আছে। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

তীরে পুনরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্যবিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র নিশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। সে বাক্য কেবল "মৃণ্ময়ি! মৃণ্ময়ি!"

নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা বিরাট মন, বিরাট সম্ভাবনা লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের জীবনে এই ব্যর্থতা, এই করুণ পরিণতির অর্থ কি? যুগে যুগে মানব মন হইতে প্রশ্ন আসিতেছে, কেন এ নির্ম্মম খেলা? এই প্রশ্নের, মানবজীবনে এই যে ট্র্যাজেডি ইহার মীমাংসা কোথায়?

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণ্ময়ী কোথায়?" নবকুমার উত্তর করিলেন, "মৃণ্ময়ি—মৃণ্ময়ি—মৃণ্ময়ি।" কপালকুণ্ডলা (শতবার্ষিক সংস্করণ—পাঠভেদ), ১০১-১০২ পৃঃ।
নবকুমার দেখিয়াছেন, কাপালিকের 'উভয় বাহু ভগ্ন'; কাপালিক বলিয়াছেন, বাহুতে 'আর কিছুমাত্র বল নাই। এমন কি, ইহার দ্বারা কাষ্ঠাহরণে কষ্ট হয়।' (কপালকুণ্ডলা ৪।৬, ৮২-৮৩ পৃঃ)। এমত অবস্থায় তাঁহার পক্ষে 'লম্ফ দিয়া অনায়াসে....নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ' কূলে তুলিয়া আনা কোন প্রকারেই সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই অংশ পরিবর্ত্তনের ইহাই সঙ্গত কারণ বলিয়া অনুমান করা চলে।

মৃণালিনী

'দুর্গেশনন্দিনী'র সহিত 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্ত্তী উপন্যাস 'মৃণালিনী'র নানাদিক দিয়া যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। তিলোত্তমা কতলু খাঁর দুর্গে বন্দিনী ছিলেন, মৃণালিনীর অবস্থা অন্যরূপ হইলেও হৃষিকেশ শর্ম্মার গৃহে এক হিসাবে তিনিও বন্দিনী ছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই এই বন্দিদশা অপরিসীম লাঞ্ছনার কারণ হইল; জগৎসিংহ যেমন তিলোত্তমার, হেমচন্দ্র তেমনই মৃণালিনীর চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইলেন। এবং উভয় ক্ষেত্রেই নায়িকার রূপলোলুপ দুর্ব্বৃত্তের মৃত্যুকালীন উক্তিতে সন্দেহের নিরাকরণ হইল। অবশ্য 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আয়েষার মধ্যবর্ত্তিতায় কতলু খাঁর মৃত্যুকালীন উক্তি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু 'মৃণালিনী'তে মনে হয় যেমন করিয়া হউক হেমচন্দ্রের সন্দেহ দূর করিবার জন্যই যেন ব্যোমকেশের স্বীকারোক্তি একরূপ জোর করিয়াই আখ্যায়িকার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

খুঁটিনাটি জিনিষেও উভয় উপন্যাসে কিছু কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে। মণিমালিনীর কানে কানে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সম্বন্ধে যে পরিচয় দিলেন (১।২, ১০ পৃঃ) তাহা দুর্গপ্রবেশের প্রাক্কালে বিমলা জগৎসিংহের নিকট গোপনে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন তাহার সহিত তুলনীয়। আবার বিমলা চুপি চুপি যাহাই বলুন, তাহার সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়াছে উপন্যাসের শেষের দিকে বিমলার আত্মপরিচয় জ্ঞাপনে; এইরূপ, আলোচ্য উপন্যাসে মৃণালিনী যে হেমচন্দ্রের পরিণীতা পত্নী মণিমালিনীর নিকট তাঁহার গোপন কথায় ইহার সুস্পষ্ট আভাস থাকিলেও মৃণালিনীর জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায় বিবৃত হইয়াছে আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তির দিকে গিরিজায়ার নিকট তাঁহার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার ভিতর দিয়া! তফাৎ এই যে বিমলা তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন লিপির সাহায্যে, মৃণালিনীর বিবৃতি মৌখিক।[১]

১ ডক্টর সেনগুপ্তের মতে এই মৌখিক বিবৃতিতে 'হেমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার (মৃণালিনীর) প্রথম সাক্ষাৎ ও তাঁহার বিবাহ সম্পর্কে বহু তথ্য দেওয়া হইয়াছে যাহা মূল উপন্যাসে অবান্তর।' (বঙ্কিমচন্দ্র, ১২২ পৃঃ)। কিন্তু তাঁহার এই অভিযোগের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই বিবাহ যে গোপনে নিষ্পন্ন হইয়াছে ইহা হেমচন্দ্র-মৃণালিনী কাহিনীর ভিত্তিস্বরূপ; সুতরাং বিবাহ কেন গোপন রহিল এবং বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যাকে অনূঢ়া মনে করিয়াও মৃণালিনীর পিতা কেন তাঁহার বিবাহ দিলেন না, উভয় ব্যাপারেই সঙ্গত কৈফিয়ত প্রয়োজন।

ঘটনা বিন্যাসের ন্যায় চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়াও উভয় উপন্যাসের সাদৃশ্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিলোত্তমা ও মৃণালিনীর চরিত্রগত সাদৃশ্যের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জগৎসিংহ ও হেমচন্দ্রের মধ্যেও বীরোচিত ঔদার্য্য ও ভাবপ্রবণতায় যতটুক সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাতে মনে হয় অপর কোন জগতে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারিবেন। কতলু খাঁর সহিত বখ্‌তিয়ারের কোন সাদৃশ্য নাই ; কিন্তু বখ্‌তিয়ারের পার্শ্বে মহম্মদ আলি কতকটা কতলু খাঁর পার্শ্বে ওসমানের অনুরূপ। এইরূপ, মাধবাচার্য্য অভিরাম স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দেন। উভয়েই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, অথচ আকর্ষণের প্রকারভেদ থাকিলেও উভয়ের ক্ষেত্রেই সংসারের আকর্ষণ রহিয়াছে এবং উভয়েই জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী। অভিরাম স্বামী স্বীয় গণনার উপর নির্ভর করিয়া দৌহিত্রীর কল্যাণকামনায় বীরেন্দ্রসিংহকে মোগলের পক্ষাবলম্বনে প্ররোচিত করিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা তাঁহার এই চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিয়া অদৃষ্টের প্রাধান্য প্রমাণ করিল। মাধবাচার্য্য স্বীয় গণনার উপর নির্ভর করিয়া বখ্‌তিয়ারের অগ্রগতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রিয় শিষ্যকে লইয়া গৌড় রাজ্যে আগমন করিলেন। সেদিনের বাংলার মসীলিপ্ত ইতিহাস তাঁহার জ্যোতির্গণনাকে উপহাস করিলেও বহু শতাব্দী পরে পলাশীর রণক্ষেত্র (ইহাও বাংলার পক্ষে কম অগৌরবের নহে) তাঁহার গণনাকে অভ্রান্ত প্রমাণ করিল।

'মৃণালিনী'তে মাধবাচার্য্যের গণনার প্রভাব নিতান্ত গৌণ। মগধবিজয়ী বখ্‌তিয়ার মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্রের পরম শত্রু। এবং হেমচন্দ্র যে পিতৃরাজ্য অপহরণের প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজিবেন ইহাই স্বাভাবিক। তিনি নিজেই বলিতেছেন, রণক্ষেত্রে বখ্‌তিয়ারকে স্বহস্তে বধ করিবেন বলিয়াই তিনি তাঁহাকে মত্ত হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এ অবস্থায় মাধবাচার্য্যের গণনা গুরু এবং শিষ্য উভয়কেই অধিকতর আশান্বিত করিলেও তাঁহাদের পক্ষে সহজ অবস্থাতেও গৌড়েশ্বরের সাহায্যে বখ্‌তিয়ারের বিজয়াভিযান প্রতিরোধ করার চেষ্টা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু পশুপতি-মনোরমার কাহিনী পুরাপুরি অদৃষ্টগণনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং এক্ষেত্রে জ্যোতির্গণনার মাধ্যমে অদৃষ্টবাদের প্রভাব 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে সুস্পষ্ট। হৈমবতীর জন্মক্ষণে বিধাতাপুরুষ তাহার ললাটে অপরিবর্ত্তনীয় অক্ষরে যে লিপি লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার জীবনে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল এবং তাহার পিতা অজ্ঞতাবশতঃ বিধিলিপি খণ্ডন করিতে যাইয়া কন্যা ও জামাতার জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি করিলেন, তাহাই শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে নির্দ্ধারিত পরিণতির

পথে টানিয়া নিল। এস্থলে বিধাতাপুরুষ শুধু নির্ম্মম নহেন, তিনি যেন একটুকু পরিহাসপ্রিয়; নহিলে যে মানুষটি পৃথিবীতে হৈমবতীর সবচেয়ে হিতকামী বাছিয়া বাছিয়া তিনি কেন তাঁহাকেই স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিলেন?

মৃণালিনীর কাহিনীকে বঙ্কিম বাংলার ইতিহাসের এক অভিশপ্ত অধ্যায়ের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের ঝটিকাবর্ত্ত পশুপতির (সুতরাং মনোরমার) অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিলেও, হেমচন্দ্র-মৃণালিনী কাহিনীর সহিত ইতিহাসের সংযোগ অতি ক্ষীণ ও অকিঞ্চিৎকর। বখ্‌তিয়ারের গৌড়াভিযানের প্রাক্কালে মাধবাচার্য্য যখন হেমচন্দ্রকে গৌড়েশ্বরের সহায়তায় যবনবিতাড়নের কার্য্যে নিয়োগ করিলেন, তখন পাছে নারীর মোহে তাঁহার প্রিয় শিষ্য পুনরায় কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন, এই আশঙ্কায় বৃদ্ধ আচার্য্য কৌশলে মৃণালিনীকে স্থানান্তরিত করিলেন—ইহাই ইতিহাসের সহিত হেমচন্দ্র-মৃণালিনী কাহিনীর একমাত্র সম্পর্ক। অবশ্য, এইখানেই আখ্যায়িকার গোড়াপত্তন।

সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বাংলা জয়ের কাহিনী মিন্‌হাজউদ্দিন কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে এবং ষ্টুয়ার্টসাহেব তাঁহার বাংলার ইতিহাসে এই কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন।[১] ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য সে সম্বন্ধে বঙ্কিম তাঁহার অভিমত 'মৃণালিনী' উপন্যাসেই ব্যক্ত করিয়াছেন: ষষ্ঠিবৎসর পরে যবন-ইতিহাস-বেত্তা মিন্‌হাজউদ্দিন এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।[২] (৪।৪. ১০২ পৃঃ)।

মিন্‌হাজউদ্দিনের কাহিনী অতিরঞ্জিত এবং বখ্‌তিয়ার অতর্কিত আক্রমণে নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিলেও দীর্ঘকাল দখলে রাখিতে পারেন নাই। নবদ্বীপ তথা গৌড়রাজ্য জয় করিয়াছেন তাঁহার পুত্র ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন।[৩] কিন্তু বঙ্কিম-যুগে এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যাদি জানা সম্ভব ছিল না। তিনি প্রচলিত কাহিনী গ্রহণ করিয়া কল্পনার সাহায্যে ইহাকে সম্ভাব্য রূপ দিয়াছেন এবং এইরূপে

১ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

২ এই প্রসঙ্গে 'বাংলার ইতিহাস' ও 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' বঙ্কিমের এই প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য—বিবিধ প্রবন্ধ, ৩১০ ও ৩২১-২২ পৃঃ।

৩ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

ইতিহাসের মূল সত্য রক্ষা করিয়াছেন। মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের মূল কারণ তিনটি: বঙ্গবিজেতার চাতুর্য্য, রাজশক্তির দুর্ব্বলতা এবং সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ক্ষমতাবান রাজকর্ম্মচারিগণের হীন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা। প্রধানতঃ জাতীয় জীবনে শেষোক্ত দুর্ব্বলতাদ্বয়ের জন্যই সাম্রাজ্যলোলুপ বহিঃশক্তির পক্ষে বাংলা জয় সহজ হইয়াছে। হেমচন্দ্রের শৌর্য্য, পশুপতির কূটবুদ্ধি, চৌরোদ্ধরণিক শান্তশীলের কার্য্যকুশলতা যদি একত্র মিলিত হইয়া জন্মভূমির কল্যাণে নিয়োজিত হইত, বাংলাব ইতিহাস তাহা হইলে অন্য অক্ষরে লিখিত হইতে পারিত। বাংলার পরাজয়ের কাহিনীর স্মৃতি বাঙ্গালী বঙ্কিমকে যে কতখানি আঘাত করিয়াছে, দু'একটি কথায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। নবদ্বীপ জয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেছেন: 'নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে আর তাহাব উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম।' যে দেশপ্রীতি উত্তরকালে 'কমলাকান্তে'র 'একটি গীতে' অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং 'আনন্দমঠ'কে রূপায়িত করিয়াছে 'মৃণালিনী'তে আমরা তাহার প্রথম আভাস পাই। এবং এই উপন্যাসের মাধবাচার্য্যের চরিত্রে আমরা প্রথম বঙ্কিমের দেশভক্তির বিশিষ্ট সুর লক্ষ্য করি।

'মৃণালিনী'র প্রথম কয়েকটি সংস্করণে 'রঙ্গভূমি' ও 'গজহস্তা' শীর্ষক দুইটি পরিচ্ছেদ উপন্যাসের প্রথমেই সংযোজিত হইয়াছিল। এই দুই পরিচ্ছেদে বখ্‌তিয়ারের হস্তিযুদ্ধ, হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণরক্ষা ও কতুবুদ্দিনের দুর্গ হইতে হেমচন্দ্রের পলায়ন বর্ণিত হইয়াছে। বখ্‌তিয়ারের হস্তিযুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা এবং স্টুয়ার্টসাহেবের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।[১] কিন্তু উপন্যাসের গল্পাংশের দিক দিয়া ইহা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়; সুতরাং পরবর্ত্তীকালে এই দুইটি পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং উপন্যাসে প্রসঙ্গতঃ ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রহিয়াছে।

বঙ্কিম কোন নাটক রচনা না করিলেও প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই তাঁহার স্বাভাবিক নাট্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।[২] 'মৃণালিনী'তে ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মৃণালিনী ও মণিমালিনী যখন বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন, তখন গিরিজায়ার 'কোমলকণ্ঠনিঃসৃত' মধুর সঙ্গীত শ্রবণে মৃণালিনীর চাঞ্চল্য (১।৩,

---

১ Stewart's History of Bengal (Edited by Mouat), pp. 25-26.

২ বঙ্কিম কেন নাটক রচনা করেন নাই, এ সম্বন্ধে ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, 'লিখব কার জন্য? তেমন শ্রোতা নাই, অভিনেতা নাই, তারপর নাটকের ভাষা এখনও হয় নাই।' বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ১৯১ পৃঃ।

১৩ পৃঃ), জ্যোৎস্নাধৌত রজনীতে বাপীসোপানোপরি উপবিষ্টা শ্বেতবসনা মনোরমার সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ (১।৫, ৪৩-৪৪ পৃঃ), মৃণালিনী স্বপ্নে হেমচন্দ্রের যে মধুর আহ্বানবাণী শুনিতে পাইলেন, স্বপ্নান্তে জাগরণের মুহূর্ত্তে হেমচন্দ্রের কণ্ঠে তাহারই প্রতিধ্বনি শ্রবণ (৪।৯, ১১৩ পৃঃ), লেলিহান 'অনল মণ্ডলমধ্যে' স্বর্ণময়ী অষ্টভুজার সম্মুখে উন্মত্তপ্রায় পশুপতির চিত্র (৪।১৪, ১২৪ পৃঃ), শ্মশানভূমিতে পশুপতির সজ্জিত চিতাপার্শ্বে সহসা 'মলিনবসনা, রুক্ষ্মকেশী, আলুলায়িতকুন্তলা, ভস্মধূলিসংসর্গে বিবর্ণা, উন্মাদিনী' মনোরমার আবির্ভাব (৪।১৫, ১২৫ পৃঃ) নাটকীয় পরিস্থিতির পরিকল্পনায় বঙ্কিমের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

সঙ্গীত বাংলা নাটকের একটি প্রধান অঙ্গ। এ হিসাবেও আলোচ্য উপন্যাসখানি বিশেষভাবে নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত। 'মৃণালিনী'র সঙ্গীতগুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথম পর্য্যায়ে তিনটি সঙ্গীত[১] মৃণালিনীর বিরহে হেমচন্দ্রের মানসিক অবস্থা এবং মৃণালিনীর সন্ধানে তাঁহার 'ঘাট বাট তট মাঠ' পর্য্যটনের বর্ণনা দিতেছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সঙ্গীতগুলি মৃণালিনীর বিরহব্যঞ্জক। কোন সঙ্গীতে মৃণালিনীর আত্মপরিচয়,[২] কোন সঙ্গীতে হেমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ যাত্রাকালীন তাঁহার মনোভাব,[৩] কোথাও হেমচন্দ্রের দর্শন না পাইলে 'শ্যাম শ্যাম, শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপয়ি' তনুত্যাগের বাসনা[৪], কোথাও এ জন্মে না হউক, জন্মান্তরেও একদিন মনের সাধ পূর্ণ হইবে এইরূপ আশা[৫] এবং কোথাও প্রত্যাখ্যাতা মৃণালিনীর মর্ম্মবেদনা[৬] প্রকাশ পাইয়াছে। তৃতীয় পর্য্যায়ে একটি সঙ্গীত।[৭] ইহা গিরিজায়ার নিজস্ব সম্পত্তি এবং মৃণালিনীর কার্যে তাহার আত্মনিয়োগের সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি।

'মৃণালিনী'র গল্পাংশ দুইটি আখ্যায়িকা লইয়া গঠিত: প্রধান আখ্যায়িকা হেমচন্দ্র-মৃণালিনী কাহিনী মিলনান্ত, গৌণ আখ্যায়িকা পশুপতি-মনোরমা কাহিনী বিয়োগান্ত; গিরিজায়া-দিগ্বিজয় শাখাকাহিনী (episode) হেমচন্দ্র-

১ 'মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী, শ্যামবিলাসিনী-রে'; 'যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল' ও 'ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরিনু বহুদেশ'।

২ 'কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে'।

৩ 'চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন' ও 'সাধের তরণী মোর কে দিল তরঙ্গে'।

৪ 'কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান?'

৫ 'এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে'।

৬ 'পরাণ না গেলো'।

৭ 'মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে'।

মৃণালিনী কাহিনীর অন্তর্গত। বাস্তব জগতে হাসি ও কান্না যমজ ভগিনীর ন্যায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। একের অশ্রুপণ্যে অপরের হাসি ফুটিয়া ওঠে; মিলনের শঙ্খধ্বনি শ্মশানের আর্ত্তনাদের মধ্যে ডুবিয়া যায়। বঙ্কিমের কল্পনার জগতেও আমরা অনুরূপ চিত্র দেখিতে পাই। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে হাস্যমুখী তিলোত্তমার পার্শ্বে দেখিতে পাই সজলনয়না আয়েষার চিত্র। 'মৃণালিনী'তে হেমচন্দ্রের সহিত পুনর্মিলনে মৃণালিনীর মুখের হাসি ফুটিতে না ফুটিতেই সহসা পটপরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং চক্ষের সম্মুখে জাগে সর্ব্বহারা মনোরমার শেষ বিদায়ের ছবি। মনোরমার আত্মাহুতিতেই প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। কিন্তু 'পরিশিষ্ট' বঙ্কিম হেমচন্দ্র-মৃণালিনী কাহিনীর জের টানিয়াছেন এবং এইরূপে তিনি নায়ক-নায়িকার প্রতি পুনরায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে মনোরমার অর্থে হেমচন্দ্র যে নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার সমৃদ্ধি, রাজ অন্তঃপুরে মণিমালিনীর সহিত মৃণালিনীর সুখের জীবন এবং দিগ্বিজয়-গিরিজায়ার দাম্পত্যলীলাভিনয়ের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ঝড়ের পরে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে।

উপন্যাসের আখ্যায়িকাদ্বয়ের সংযোগ সাধন করিয়াছে মনোরমা। মনোরমা পশুপতির পত্নী ও হেমচন্দ্রের ভগিনীস্থানীয়া। মনোরমা হেমচন্দ্রকে 'তুরকে'র সন্ধান বলিয়া দিল এবং শান্তশীলের কৌশলে হেমচন্দ্র যখন পশুপতির গৃহে বন্দী হইলেন, মনোরমাই তখন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া 'মহাবনে' শত্রু শিবিরের সংবাদ দিল এবং তাঁহাকে হত্যা করার গোপন ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করিয়া সতর্ক করিয়া দিল। কিন্তু এ সকল ঘটনা হেমচন্দ্র-মৃণালিনী কাহিনীর দিক দিয়া অবান্তর। হেমচন্দ্র-মৃণালিনী কাহিনীর উপর মনোরমার প্রভাব প্রকৃতপক্ষে এইখানে: মনোরমাকে আহত হেমচন্দ্রের শুশ্রূষারত দেখিয়া এবং উভয়কে 'চুপি চুপি' কথা বলিতে লক্ষ্য করিয়া গিরিজায়া সিদ্ধান্ত করিল বুঝি বা 'ঠাকুরাণী'র কপাল ভাঙ্গিয়াছে; সুতরাং হেমচন্দ্রের মনোভাব পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে বলিল যে, মৃণালিনীর বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন। ইহার ফল এই হইল যে, মাধবাচার্য্য যখন হেমচন্দ্রের নিকট মৃণালিনীর সংবাদ (অবশ্য তিনি যেরূপ শুনিয়াছেন) জানাইতে ইতস্ততঃ করিলেন, হেমচন্দ্র তখন বলিলেন, তিনিও 'কিয়দংশ' অবগত আছেন, সুতরাং আচার্য্য যাহা জানেন তাহা 'নিঃসঙ্কোচে' প্রকাশ করিতে পারেন। মাধবাচার্য্যও হেমচন্দ্র 'কতক কতক' শুনিয়াছেন এইরূপ অনুমান করিয়া হৃষীকেশের নিকট শ্রুত কুৎসিত কলঙ্ককাহিনী শিষ্যের নিকট ব্যক্ত করিতে আর কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিলেন না। সুতরাং হেম-

চন্দ্রের যে সন্দেহ তাঁহার মনঃপীড়া এবং মৃণালিনীর বহু দুঃখের কারণ হইল মনোরমা তাহার পরোক্ষ নিমিত্তরূপিণী।

কিন্তু আখ্যায়িকা দুইটি পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত নহে। ইহারা পাশাপাশি সজ্জিত হইলেও সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। হেমচন্দ্র-মনোরমা কাহিনীতে মনোরমার যদি বা পরোক্ষ প্রভাব রহিয়াছে, পশুপতির এই কাহিনীতে কোন স্থান নাই এবং পশুপতি ও মনোরমার জীবনেও হেমচন্দ্র বা মৃণালিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনরূপ প্রভাব নাই। 'কপালকুণ্ডলা'র অব্যবহিত পরে গল্পের গাঁথুনিতে এই খুঁত বিশেষ করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু গাঁথুনিতে নহে, নায়কের চরিত্রাঙ্কনেও এই উপন্যাসে অপকর্ষের চিহ্ন বিদ্যমান। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ন্যায় 'মৃণালিনী'তেও বঙ্কিমের শিক্ষানবিশী।

হেমচন্দ্র-মৃণালিনী কাহিনীর পার্শ্বে দিগ্বিজয়-গিরিজায়া সংবাদ 'মারচেণ্ট অব্ ভিনিসে'র (Merchant of Venice) গ্র্যাসিয়্যানো-নেরিসা (Gratiano-Nerissa) শাখা কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। এবং শেষোক্ত প্রণয়-কাহিনী যেমন বেসানিও (Bassanio) ও পোর্শিয়ার (Portia), দিগ্বিজয় ও গিরিজায়ার প্রেমাভিনয় তেমনই হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর রোমান্টিক প্রণয়ের বিপরীত চিত্র।

কিছুটা ভাঁড়ামির মিশ্রণ থাকিলেও বঙ্কিমের গৌণ চরিত্রের মধ্যে গিরিজায়ার একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং তাহার সুকণ্ঠের সঙ্গীত 'মৃণালিনী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। গিরিজায়া 'ষোড়শী', তাহাতে সে পরিহাসনিপুণা। নবোন্মেষিত যৌবনের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য তাহার প্রতি কথায় ও প্রতি কার্য্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। গিরিজায়া যে হেমচন্দ্রের দৌত্য গ্রহণ করিল যৌবনসুলভ ঔৎসুক্যই ইহার প্রকৃত কারণ, পুরস্কারের প্রত্যাশা তাহাকে প্রলুব্ধ করে নাই। এবং গিরিজায়ার প্রণয় যতই গদ্যময় হউক, মৃণালিনীর ন্যায় তাহার প্রাণেও রোমান্স্ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, রোমান্স্ যৌবনের ধর্ম্ম, যৌবনের সম্পদ। মৃণালিনীর জীবনে রোমান্সের পরিচয় তাঁহার গোপন বিবাহে ও গোপন অভিসারে; গিরিজায়ার প্রাণে রোমান্সের পরিচয় হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী প্রেমদৌত্যে আত্মবিনিয়োগে। গিরিজায়া যখন নিঃসম্বল ও নিঃসহায় মৃণালিনীকে লইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিল তখন সহানুভূতিতে তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইলেও ভবিষ্যৎ দিনের রোমান্সের সম্ভবনাও যে তাহাকে কিছুটা আকৃষ্ট করিয়াছিল একথা বলিলে তাহার প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হইবে না।

কিন্তু ইহাই গিরিজায়ার সম্পূর্ণ পরিচয় নহে; গিরিজায়া ক্ষুরধার-রসনা। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করিলেন, নিরভিমানিনী মৃণালিনীর পক্ষে তাহার কোনরূপ প্রতিবাদ করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; হেমচন্দ্র তাঁহার কার্য্যের যথাযোগ্য পুরস্কার পাইলেন গিরিজায়ার নিকট। একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি: হেমচন্দ্র হিতাহিতজ্ঞান হারাইয়া মৃণালিনীর দূতী বলিয়া গিরিজায়াকে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলে গিরিজায়া বলিতেছে, "বীরপুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরীবদুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।" হেমচন্দ্র 'অপ্রতিভ হইয়া বেত ফেলিয়া দিলেন।' 'কিন্তু গিরিজায়ার রাগ গেল না।' গিরিজায়া বলিল, "তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাকুক, তুমি আমারও যোগ্য নও।" (৩।৮, ৮৩ পৃঃ)। অন্ততঃ একজনও যে হেমচন্দ্রকে যথাযোগ্য ভাষায় অভ্যর্থিত করিতে পারিল, পাঠক ইহাতে কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিলেন সন্দেহ নাই।

পরবর্ত্তীকালে অনুতপ্তচিত্তে মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াও হেমচন্দ্র যখন স্বভাবদোষে তাঁহার সকল কথা না শুনিয়াই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং গমনকালে গিরিজায়াকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন না (৩।১০, ৯১ পৃঃ), তখন মৃণালিনীর অবস্থা বুঝিয়া এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিলেও সময়ান্তরে গিরিজায়া মৃণালিনীর অবিচলিত নিষ্ঠার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া যেন পাঠকের মনোভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া হেমচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে, "পাষণ্ড বলিব না? একবার বলিব? ....শতবার বলিব........হাজার বার বলিব।" (৪।৮, ১১১ পৃঃ)। গিরিজায়ার ভাষায় পাঠক তাঁহার বিক্ষুব্ধ অন্তরের নীরব ভাষার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। গিরিজায়ার সঙ্গীত ও তাহার ক্ষুরধাররসনা উভয়ই তুল্য উপভোগ্য।

গিরিজায়া মৃণালিনীর দূতী ও সহচরী, তাঁহার সুখদুঃখের সঙ্গিনী। কিন্তু মৃণালিনীর পরম শুভানুধ্যায়িনী হইয়াও বুদ্ধির দোষে গিরিজায়া তাঁহার কতখানি সর্ব্বনাশ করিল হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর জীবনে মনোরমার পরোক্ষ প্রভাবের আলোচনাপ্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ শুধু দিগ্বিজয়ের প্রতি সম্মার্জ্জনী প্রয়োগে নহে, স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম উপায়ে বঙ্কিম এই সত্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, নানাগুণসম্পন্না হইলেও গিরিজায়া নিম্নজাতীয়া ও ভিখারিণীর আবেষ্টনের মধ্যে বর্দ্ধিত। গিরিজায়া চতুর

কিন্তু কল্পনাকুশল নহে, নহিলে মৃণালিনীকে তাঁহার পিতা বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, হেমচন্দ্রের নিকট এই মিথ্যা সংবাদ দিবার পূর্ব্বে সে ইহার ফলাফল সম্বন্ধে চিন্তা করিত। এমন কি, হেমচন্দ্র যখন বলিলেন, "গিরিজায়া, তোমার সংবাদ শুভ। উত্তম হইয়াছে।"—তখনও তাহার কোনরূপ সন্দেহ হইল না যে, তিনি হয়ত রাগে বা অভিমানে এইরূপ বলিয়া থাকিবেন।

সাধারণ গৃহস্থকন্যার সহিত এই ভিখারিণী বালিকার পার্থক্য আর একটি জায়গায় আরও সুস্পষ্ট। হৃষীকেশ শর্ম্মার কন্যা মণিমালিনী মৃণালিনীর প্রিয় সখী, কিন্তু তাঁহার গোপন অভিসারের কথা শুনিয়া তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "ঐ কথাটি মনে পড়িলেও আমার বড় অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপন প্রণয় করিতে?" মৃণালিনীকে কুমারী মনে করিয়াই মণিমালিনী এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তিনি যে হেমচন্দ্রের পরিণীতা পত্নী গিরিজায়াও এ তথ্য অবগত ছিল না, কিন্তু এই গোপন প্রণয়ের মধ্যে যে কোন কিছু অন্যায় থাকিতে পারে এ প্রশ্ন কখনও তাহার মনে আসে নাই। মণিমালিনী ও গিরিজায়ার সংস্কার-গত ও আবেষ্টনগত পার্থক্যই উভয়েব দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্যের মূল কারণ। এবং সংস্কারগত ও আবেষ্টনগত পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়াই মৃণালিনীর নিকটতম বন্ধু হইয়াও গিরিজায়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারে নাই। পারিলে. হেমচন্দ্র মৃণালিনীর প্রতি যতই দুর্ব্যবহার করুন, গিরিজায়া কোনক্রমেই বলিতে পারিত না, "কিন্তু সাহস পাই ত বলি—রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আব কার্ত্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?" (৪।৮, ১১০ পৃঃ)। ভিখারিণীর মাপকাঠিতে মৃণালিনীর ভালবাসার বিচার করিতে যাওয়া যে কত বড় দুরূহ কাজ গিরিজায়া নিজেও যে ইহা বুঝিত না তাহা নহে। মনোরমাকে আহত হেমচন্দ্রের সেবারত দেখিয়া প্রশ্নোত্তর ছলে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারের চিত্র (৩।৩, ৬৮–৬৯ পৃঃ) ইহার প্রমাণ। এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আব একটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ এই যে, গিরিজায়া নিছক মৃণালিনীকে ভালবাসে বলিয়াই তাঁহার দৌত্য গ্রহণ করিয়াছে এ সত্য সে নিজের কাছেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। সে নিজেকে বুঝাইতে চাহে যে, কাজ নাই বলিয়াই সে মৃণালিনীর কাজে লাগিয়াছে এবং 'বড় মাথা ধরিয়াছে' বলিযাই সে হেমচন্দ্রের গৃহের সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত. পরে সে হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিল কেন, গিরিজায়া নিশ্চয়ই উত্তর করিত, "ভিক্ষার উদ্দেশ্যে।"

হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর পুনর্মিলনের অব্যবহিত পরেই দিগ্বিজয় ও গিরিজায়ার উৎকট প্রেমাভিনয় নিরর্থক নহে। হেমচন্দ্র নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্তচিত্তে ক্ষমাভিক্ষা করিলে 'নিরভিমানিনী নির্লজ্জা মৃণালিনী' যখন তাঁহার 'কণ্ঠলগ্না' হইলেন, তখন পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিল: এত অন্যায় অবিচার করিয়াও হেমচন্দ্র এত সহজে অব্যাহতি পাইলেন কেমন করিয়া? ঠিক এই সময় দিগ্বিজয়-গিরিজায়ার প্রণয়লীলা যে হাসির প্রবাহ সৃষ্টি করিল তাহার বন্যায় পাঠকের বিচারপ্রবৃত্তি ভাসিয়া গেল।

বঙ্কিম মৃণালিনীতে আর একটি চরিত্রের পরিকল্পনায় বিশুদ্ধ হাস্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে গজপতির মূলধন তাহার দৈহিক অবয়ব ও বুদ্ধিহীনতা; 'মৃণালিনী'তে জনার্দ্দন শর্ম্মার মূলধন বার্দ্ধক্যজনিত শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা। জনার্দ্দন শর্ম্মার বধিরত্বের বৈশিষ্ট্য এই যে ইনি হেমচন্দ্রের 'অত্যুচ্চৈঃস্বর' শুনিতে না পাইলেও মনোরমার মৃদু কথা শুনিতে পাইলেন। অঙ্গবৈকল্যের সাহায্যে উচ্চ শ্রেণীর হাস্যরসের সৃষ্টি সম্ভব না হইলেও জনার্দ্দন শর্ম্মার বধিরত্বের এই বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ করিয়া বধির জনার্দ্দন কর্তৃক তাঁহার গৃহিণীর প্রতি বধিরত্ব আরোপ উপভোগ্য সন্দেহ নাই।

হেমচন্দ্র ও পশুপতি বিপরীতধর্ম্মী চরিত্র। পশুপতি কূট বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন; বুদ্ধিবলে তিনি গৌড়ের ধর্ম্মাধিকার, তিনিই 'দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর।' কিন্তু ইহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় নাই, তাঁহার দৃষ্টি সিংহাসনের প্রতি। এই কারণেই তিনি গোপনে বখ্‌তিয়ারের সহিত হাত মিলাইলেন। এরূপ ষড়যন্ত্র হেমচন্দ্রের কল্পনার অতীত। কোনরূপ হীন চক্রান্তে লিপ্ত হওয়া দূরের কথা, আততায়ীর অসহায়তার সুযোগ লইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করাও তিনি কাপুরুষোচিত মনে করিতেন। এই কারণেই বখ্‌তিয়ারকে তিনি মত্ত হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলেন। হেমচন্দ্র 'চোরের মত বিনা যুদ্ধে' শত্রুজয়ে অভ্যস্ত নহেন; মগধবিজেতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প।

হেমচন্দ্র যুদ্ধব্যবসায়ী, তিনি বীরোচিত সিদ্ধান্ত করিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি অসিচালনাই শিক্ষা করিয়াছেন; রাজনীতিক্ষেত্রে বখ্‌তিয়ার বা পশুপতির নিকট তিনি বালক মাত্র। শান্তশীল যেরূপ অতি সহজেই তাঁহাকে বন্দী করিল তাহা নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক। এবং তাঁহার বীরত্ব যাহাই হউক (আখ্যায়িকায় ইহার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নাই), তিনি যে মনোরমার নিকট সংবাদ পাইয়া শত্রুসৈন্য লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যে যোদ্ধৃবেশে 'মহাবনে'র

পথে অগ্রসর হইলেন, ইহা দুঃসাহসের পরিচয় দিলেও নির্বুদ্ধিতার কার্য্য। শান্তশীল যেরূপ চতুরতার সহিত শত্রুসৈন্যের সহিত মিশিয়া তাহাদের সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিল, তাহার পার্শ্বে হেমচন্দ্রের অনুসৃত কার্য্য-পদ্ধতি নিছক ছেলেমানুষী বলিয়াই মনে হয়।

পশুপতি ধীর, স্থির, গম্ভীর-প্রকৃতি। তাঁহার কার্য্যাবলী বুদ্ধিসঞ্জাত, তাহাতে ভাবের উচ্ছ্বাস নাই। কেবল দু'একটি বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে আমরা তাঁহার অন্তরের ভাবপ্রবাহের সন্ধান পাই। হেমচন্দ্র অব্যবস্থিতচিত্ত ও ভাবপ্রবণ। প্রথম দর্শনেই মাধবাচার্য্যের সহিত বিসদৃশ আচরণে আমরা তাঁহার চরিত্রগত দুর্ব্বলতার পরিচয় পাই। হেমচন্দ্র সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়েন এবং কোন কারণে উত্তেজিত হইলে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

হেমচন্দ্রের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে মৃণালিনী ও গিরিজায়ার প্রতি তাঁহার আচরণে। মৃণালিনীর দূতী গিরিজায়াই নহে, হেমচন্দ্র নিজেই যেদিন গিরিজায়াকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেদিনও এই পরিহাসপ্রিয় বালিকা সফল দৌত্যের প্রথম পুরস্কার হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছিল রূঢ় তিরস্কার। (১।৪, ২১ পৃঃ)। মৃণালিনীর প্রতি তাঁহার আচরণ শুধু অসংযত নহে, কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষে এরূপ আচরণ সম্ভব বলিয়া মনে করা কঠিন। মৃণালিনী হেমচন্দ্রের বিবাহিতা পত্নী। বহু দিন, বহু রূপে তিনি তাঁহার আত্মবিলোপকারী প্রণয়ের পরিচয় পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে, হৃষীকেশের একমাত্র পরিচয় তিনি মাধবাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য, তাঁহার বা তাঁহার পুত্রের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি কিছুই অবগত নহেন। অথচ মাধবাচার্য্যের নিকট হৃষীকেশবর্ণিত বিবরণ শ্রবণমাত্র তিনি মৃণালিনীকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন, পিতৃদত্ত শূল ধারণ করিয়া বলিলেন, "মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।" (৩।৫)। অবশ্য গিরিজায়ার নিকট তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহাতে তাঁহার এরূপ প্রতীতি জন্মিতে পারে যে, কারণ যাহাই হউক, মৃণালিনী হয়ত লক্ষ্মণাবতীতে হৃষীকেশের আশ্রয়ে নাই। কিন্তু তিনি যদি একটুকু স্থির ভাবে বিচার করিতে জানিতেন তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিতেন যে মৃণালিনীর পক্ষে কুলটা বৃত্তি অবলম্বন বা বিবাহার্থ পিত্রালয়ে গমন—এই উভয়বিধ কার্য্যই অসম্ভব; সুতরাং তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকিলে অবশ্য ইহার অন্য কারণ থাকিবে। মৃণালিনীর চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁহার অপ্রত্যক্ষ নহে, সুতরাং 'হৃষীকেশের প্রত্যক্ষ' এরূপ যুক্তি একেবারেই মূল্যহীন। জগৎসিংহও তিলোত্তমার চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু হেমচন্দ্রের সহিত মৃণালিনীর পরিচয় জগৎসিংহের সহিত

তিলোত্তমার পরিচয়ের ন্যায় ক্ষণিকের নহে এবং মৃণালিনী তিলোত্তমার ন্যায় উচছৃঙ্খলচরিত্র শত্রুর হস্তে বন্দিনী নহেন। মৃণালিনীকে সন্দেহ, গিরিজায়ার মারফত মৃণালিনীর পত্র ছিঁড়িয়া ফেলা, পুনরায় ছিন্নপত্রের সন্ধানে বনে গমন, গিরিজায়ার নির্দ্দেশমত সরোবরতীরে মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার প্রতি বিসদৃশ আচরণ--সর্ব্বত্রই আমরা হেমচন্দ্রের অব্যবস্থিত-চিত্তের পরিচয় পাই।

অবশ্য ইহাই হেমচন্দ্রের পূর্ণ পরিচয় নহে। পরন্তু তাঁহার চরিত্রগত দুর্ব্বলতার সহিত যে অপূর্ব্ব সংযম ও সত্যনিষ্ঠার মিশ্রণ রহিয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। তবুও মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, এই চরিত্রটি একেবারেই পাঠকের সহানুভূতি বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অথচ ইহাকেই মাধবাচার্য্য যবনবিতাড়নকার্য্যে বখ্‌তিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ডক্টর সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন, 'হেমচন্দ্রের চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে কি ভাবকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ঠিক করিয়া বলা মুস্কিল। তাঁহার চরিত্র নায়কের প্রতিকৃতি না তাহার 'ভেঙ্গান' বুঝা যায় না।' ইহা অতি কঠোর সমালোচনা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সমর্থনে তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন[১] তাহা অখণ্ডনীয়। হেমচন্দ্রের ন্যায় অ্যাণ্টনিও (Antony) প্রেমোন্মাদ, তিনি প্রেমের জন্য সাম্রাজ্য হারাইয়াছেন। কিন্তু শেক্স্‌পীয়ার এমন এক প্রতিবেশ রচনা করিয়াছেন যেখানে ক্লিওপেট্রার (Cleopetra) রূপের আকর্ষণ অনিবার্য্য। রণস্থলেও অ্যাণ্টনির অধিনায়কত্ব অনন্যসাধারণ, তিনি সর্ব্বাংশে অক্‌টাভিয়াসের (Octavius Caesar) যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। ওথেলোর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনি সাধ্বী পত্নীর চরিত্রে শুধু সন্দিগ্ধ হন নাই, তিনি তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছেন। কিন্তু শেক্স্‌পীয়ারের পরিবেশনগুণে তাঁহার ভুলের জন্য পাঠকের মনে অনুকম্পার উদ্রেক হয়, তাঁহার বিরুদ্ধে তিক্ততা জন্মে না। হেমচন্দ্রের চরিত্রে অ্যাণ্টনি ও ওথেলোর চরিত্রের দুর্ব্বলতা রহিয়াছে, কিন্তু যে সকল পারিপার্শ্বিকের গুণে সকল দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও এই দুইটি চরিত্র আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, বঙ্কিমের উপন্যাসে তাহার একান্ত অভাব।

কিন্তু হেমচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কনের বিরুদ্ধে যতই অভিযোগ থাকুক না কেন, বঙ্কিমের পুরুষচরিত্রের মধ্যে পশুপতির একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে; পশুপতি বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম জটিল পুরুষচরিত্র। পশুপতির জীবনে দুইটি

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ১১৭—১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আকর্ষণ: এক, সাম্রাজ্যলিপ্সা; অপর, মনোরমার প্রতি ভালবাসা। এই উভয় আকর্ষণের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাঁহার চরিত্র সুন্দর বিকাশ লাভ করিয়াছে। স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা অষ্টভুজার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা পশুপতির চরিত্রের অপর এক বৈশিষ্ট্য। পাষাণময়ী বিগ্রহ যেন তাঁহার সকল কার্য্যের নীরব সাক্ষীরূপিণী। পশুপতির পিতা 'শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন'; দেবতার প্রতি নিষ্ঠা ও শাস্ত্রোক্ত বিধানের প্রতি আস্থা[১] তাঁহার পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল।

পশুপতির চরিত্রের আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার অতীত জীবনের সহিত পরিচয় প্রয়োজন। এই সম্পর্কে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'পশুপতি যৌবন-কালে কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ছিল। তাহার সহিত পশুপতির পরিণয় হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব, সম্প্রদানের পর কন্যা লইয়া অদৃশ্য হইল। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কারণবশতঃ একাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে রাজপ্রাসাদতুল্য উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বামানয়ননিঃসৃত জ্যোতির অভাবে সেই উচ্চ অট্টালিকা আজি অন্ধকারময়।' সহজ অবস্থায় পত্নীপ্রেম ও অপত্যপ্রীতি তাঁহার হৃদয়ের অনেকটা স্থান জুড়িয়া থাকিত। দৈববিড়ম্বনায় যখন তাহা সম্ভব হইল না, তখন হয়ত বিশেষ করিয়া বুভুক্ষু হৃদয়ের দৈন্য ভুলিবার জন্যই তিনি বিষয় কর্ম্মে আপনার সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ নিয়োগ করিলেন। তিনি 'পণ্ডিত ও বিচক্ষণ', সুতরাং সহজেই অনুরূপ সাফল্য লাভ করিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র গৌড়েশ্বরের ধর্ম্মাধিকারের সম্মান লাভ করিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষার ধর্ম্ম এই যে, ইহার নেশা কাহাকেও পাইয়া বসিলে সে মানুষ কখনও আপনার আকাঙ্ক্ষাকে কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সংহত ও সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে না। ক্রমে গৌড়ের সিংহাসন পশুপতির লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কবে, কি অবস্থায় হৈমবতী নবরূপ পরিগ্রহ করিয়া মনোরমার ছদ্মবেশে তাঁহাকে রূপমোহিত করিল, তাহার ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। তবে মনে হয় যে 'কারণবশতঃ' তিনি 'একাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই'

১ পশুপতি যে শাস্ত্রোক্ত অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাবান তাহার এক প্রমাণ এই যে, মনোরমা তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় দিবার সময় জ্যোতির্ব্বিদের গণনার উল্লেখ করিলে তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "আমি গ্রহশান্তি করাইতাম।" মৃণালিনী ৪।৩, ৯৯ পৃঃ।

(বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর) তাহা মনোরমার নূতন আকর্ষণ। এবং মনোরমার সহিত পশুপতির প্রথম সাক্ষাৎ, রাজ্যলিপ্সা তাঁহাকে আকৃষ্ট করার পূর্ব্বে বা পরে যখনই হউক, ইহার ফলে যে তাঁহার নীতিবিগর্হিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রশমিত না হইয়া নূতন ইন্ধন পাইয়া তীব্রতর জ্বলিয়া উঠিল, ইহা নিশ্চিত সত্য। লোকলজ্জা ও সামাজিক কলঙ্কের ভয় পশুপতির চরিত্রের অন্যতম দুর্ব্বলতা। সেন রাজাকে 'স্ববলে' সিংহাসনচ্যুত না করিয়া তিনি যে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন লোকনিন্দাভীতি ইহাব এক কারণ, একথা তিনি মহম্মদ আলির নিকট উল্লেখ করিয়াছেন। (২।৬, ৪৯ পৃঃ) সুতরাং অষ্টমবর্ষীয়া হৈমবতী যখন যৌবনের কোঠায় পৌঁছিয়া বিধবা মনোরমার বেশে তাঁহাব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন পশুপতি তাহার প্রণয়মুগ্ধ হইলেও সামাজিক কলঙ্কভয় তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায় হইল। শাস্ত্রজ্ঞ পশুপতি জানিতেন বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে, সুতরাং শাস্ত্রের অনুশাসনের দিক দিয়া তাঁহার বিচারে বিধবা মনোবমাকে বিবাহ করার কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু লৌকিক আচারে বিধবা বিবাহ নিন্দনীয়; তিনি বুঝিলেন মনোরমাকে বিবাহ করিলে হয়ত তাঁহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে। ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, তিনি না পারিলেন মনোবমাকে বরণ করিয়া গৃহে আনিতে, না পারিলেন তাহাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে। কিন্তু এই উভয়সঙ্কটে তিনি ইহাও জানিতেন যে, সমাজ ধর্ম্মাধিকার পশুপতিকে ত্যাগ করিতে পারিলেও কোনক্রমেই রাজা পশুপতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইবে না। মনোরমা যখন মহম্মদ আলির সহিত তাঁহার গোপন মন্ত্রণা শুনিতে পাইয়া ব্যথিতচিত্তে বলিল, "পশুপতি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?"—পশুপতি তখন এই যুক্তি দ্বারাই আত্মসমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন। (২।৭, ৫৬ পৃঃ)। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তিনি মনোরমাকে একটুকু প্রবঞ্চনা করিলেন একথা সত্য, কারণ শুধু মনোরমাকে লাভ করিবার সোপান হিসাবে নহে, পশুপতির চক্ষে সিংহাসনের একটা নিজস্ব মোহ রহিয়াছে। তথাপি তাঁহার উক্তির মধ্যে এইটুকু আংশিক সত্য রহিয়াছে যে, মনোরমার আকর্ষণ তাঁহার চক্ষে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিকূল না হইয়া তাঁহার হীন ষড়যন্ত্রের পরিপোষক বলিয়া গণ্য হইল। এইরূপে হৈমবতীর পিতা কন্যার অদৃষ্টলিপি ব্যর্থ করিতে যাইয়া প্রকৃতপক্ষে তাহাকে সফল করার নিমিত্তরূপী হইলেন। কারণ মনোরমা যদি আপনার অজ্ঞাতসারে পশুপতির উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইন্ধন যোগাইল, সহজ অবস্থায় হৈমবতী হয়ত জ্ঞাতসারে তাহা প্রশমিত করিতে পারিত। এবং তাহা হইলে ভাগ্যদেবতা অন্য যে কোন উপায়ে স্বহস্তের লিখন সার্থক

করুন না কেন, হয়ত পশুপতির পক্ষে এরূপ আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুর কারণ ঘটিত না, এবং দেহের মৃত্যু হইলেও হয়ত তাঁহার মনুষ্যত্ব অটুট থাকিত।

প্রেমের পথ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির পথ যে এক নহে, সিংহাসন চাহিলে যে তাহার মূল্যস্বরূপ মনোরমাকে পাইবার আশা ত্যাগ করিতে হইতে পারে, একথা পশুপতি প্রথম বুঝিলেন মনোরমার কথায়। পশুপতিকে পাপের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া মনোরমা যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল (২।৯), তখন প্রেম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোকনিন্দাভীতি এই তিন বিভিন্ন বৃত্তির সঙ্ঘাতে যেমন পশুপতির চরিত্র, কঠিন কর্ত্তব্যের প্রেরণা ও 'কূলপরিপ্লাবনী' প্রণয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্ঘাতে তেমনই মনোরমার চরিত্র সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। আত্মসমর্থন করিতে যাইয়া পশুপতি যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলেন সাধারণ বালিকা হয়ত তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। কিন্তু মনোরমা অনন্যসাধারণ। পশুপতি তাহাকে বুঝাইলেন, তাহারই জন্য তিনি গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন, বুঝাইলেন রাজা হইলে বিধবাবিবাহের অন্তরায় সমাজ-শাসনের ভয় দূর হইবে। যুগে যুগে প্রেমিক পুরুষ প্রেমিকার কানে কানে যে কথা বলিয়া আসিয়াছে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "আগে তুমি—পরে রাজ্য।" কিন্তু পশুপতির অন্তঃসার-শূন্য যুক্তি, তাঁহার আপাতমধুর প্রণয়বাণী মনোরমার মর্ম্ম স্পর্শ করিল না। মনোরমা বলিল, "রাজা হইয়া....রাজ্য অপেক্ষা মহিষী যদি অধিক ভালবাস, তবে তুমি রাজ্য করিতে পারিবে না।....স্ত্রৈণ-রাজার রাজ্য থাকে না।"

ইহার পরের উত্তর প্রত্যুত্তরের একটুকু বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিতেছি :

'পশুপতি প্রশংসমান লোচনে মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; কহিলেন, "যাহার বামে এমন সরস্বতী, তাহার আশঙ্কা কি? না হয়, তাহাই হউক। তোমার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিব।"

ম। তবে রাজ্য গ্রহণ করিতেছ কেন? ত্যাগের জন্য গ্রহণে ফল কি?

প। তোমার পাণিগ্রহণ।'

ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে পশুপতি বখ্‌তিয়ারের প্রতিনিধির সহিত জটিল রাজনীতি আলোচনা করিয়াছেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে যে প্রথম যুক্তির পুনরাবৃত্তি করিতে হইল, ইহা ক্ষুদ্র বালিকার নিকট তাঁহার পরাজয়ের প্রতীক।

অতঃপর :

ম। 'সে আশা ত্যাগ কর। তুমি রাজ্যলাভ করিলে আমি কখনও তোমার পত্নী হইব না।'

প। 'কেন, মনোরমা! আমি কি অপরাধ করিলাম?'

মনোরমা এতক্ষণ পশুপতির বিরুদ্ধে স্পষ্টতঃ কোন অভিযোগ আনে নাই। এখন নিরুপায় হইয়াই তাহাকে বলিতে হইল, "তুমি বিশ্বাসঘাতক-- আমি বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে ভক্তি করিব? কি প্রকারে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসিব?"

পশুপতি বুঝিতেছিলেন যে, তাঁহার পদতল হইতে শক্ত জমি সরিয়া যাইতেছে। তবুও তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কেন, আমি কিসে বিশ্বাসঘাতক হইলাম?"

এবার মনোরমাকে স্পষ্টতর বলিতে হইল, "তোমার প্রতিপালক প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিবার কল্পনা করিতেছ,....ইহা কি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম নয়? যে প্রভুর নিকট বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী না হইবে কেন?"

'পশুপতি নীরব হইয়া রহিলেন।' তাঁহাকে নীরব দেখিয়া মনোরমা তাঁহাকে 'এই দুর্বুদ্ধি' ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল।

পশুপতি কি উত্তর করিবেন? তাঁহার একদিকে সাম্রাজ্য, অন্যদিকে মনোরমা। উভয়েই অত্যাজ্য। তাঁহার এই সময়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা এইরূপঃ 'উভয় সঙ্কটে চিত্তমধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্মিল। তাঁহার মতির স্থিরতা দূর হইতে লাগিল। "যদি মনোরমাকে পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাজ কি?" এইরূপ পুনঃ পুনঃ মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে লাগিলেন, "কিন্তু তাহা হইলে লোকনিন্দা, জনসমাজে কলঙ্ক, জাতিনাশ হইবে; সকলের ঘৃণিত হইব। তাহা কি প্রকারে সহিব?" পশুপতি নীরব রহিলেন; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।' কন্যার শুভ কামনা করিয়া হৈমবতীর পিতা পশুপতি ও মনোরমার জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি করিলেন, তাহারই ফলে পশুপতি কঠিন সমস্যার সময় কর্ত্তব্যপথ বাছিয়া লইতে পারিলেন না।

'মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিল, "শুন পশুপতি, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিল। পশুপতি রোদন করিয়া উঠিলেন।'

পশুপতি যতক্ষণ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, মনোরমা যুক্তি দ্বারা যুক্তি খণ্ডন করিয়াছে। কিন্তু পশুপতির অশ্রু তাহার সকল সঙ্কল্প, ক্ষণপূর্ব্বের তাহার প্রতিজ্ঞা ভাসাইয়া লইয়া গেল। 'মনোরমা আবার ফিরিল।' ফিরিয়া পশুপতিকে শান্ত করিবার জন্য 'রাজমহিষী' হইতে প্রতিশ্রুত হইল। পশুপতি শান্ত হইলেন; কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস!—এইরূপে পশুপতির প্রত্যাবর্ত্তনের শেষ ক্ষীণ সম্ভাবনা লুপ্ত হইল।

মনোরমা যখন আত্মপরিচয় দিয়া দ্বিতীয়বার তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইল (৪।৩), পশুপতি তখন যবনের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, আর তাঁহার ফিরিবার উপায় নাই। মনোরমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহাকে বলিতেছেন, "মনোরমা, আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম—তোমাকে লইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই—যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছি তাহা আর খুলিতে পারি না—স্রোতে ভেলা ভাসাইয়া আর ফিরাইতে পারি না।" ফিরিবার উপায় থাকিলেও তিনি আর ফিরিতে পারিতেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে; কিন্তু পশুপতির উক্তির মধ্যে কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই। মনোরমার নূতন পরিচয়ের ফলে তাহার আকর্ষণ তীব্রতর অনুভূত হইয়াছে, কিন্তু উর্ণনাভের ন্যায় পশুপতি যে জাল বিস্তার করিয়াছেন, সে জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি লাভ করা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত। পশুপতি ও মনোরমা উভয়েই অদৃষ্টদেবতার নাগপাশে শৃঙ্খলিত।

মনোরমার সহিত আচরণে পশুপতির চরিত্রে একটা সহজ সংযম লক্ষিত হয়। তিনি যখন মনোরমাকে কৌশলে দেবীমন্দিরে বন্দী করিলেন, তখন তিনি তাহাকে পত্নীরূপে চিনিয়াছেন, সুতরাং এরূপ কার্য্য যতই গর্হিত হউক, পশুপতির চক্ষে ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। এতদ্ভিন্ন আমরা একবার মাত্র তাঁহাকে মনোরমার সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইতে দেখিতে পাই। তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে 'দন্তে অধর দংশন করিয়া....দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে' মনোরমা যখন 'মার্জ্জার-প্রসাদ' মালা পশুপতির গলায় পরাইয়া দিল, তখন 'অল্প ক্রোধ' হইলেও 'দংশিতাধরা হাস্যময়ীর তৎকালীন অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহুপ্রসারণ করিলেন।' কিন্তু এই আত্মবিস্মৃতি ক্ষণিকের, মনোরমা ক্ষিপ্রগতিতে দূরে দাঁড়াইবামাত্র পশুপতি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, বুঝিতে পারিয়া 'অপ্রতিভ হইলেন।' লজ্জায় 'ক্ষণেক মনোরমার মুখ-

প্রতি চাহিতে পারিলেন না।' পরে যখন কথা কহিলেন, তখন যথাসম্ভব স্বীয় দোষস্খালনের জন্য বলিলেন, "মনোরমা, দোষ ভাবিও না। তুমি আমার পত্নী—আমাকে বিবাহ কর।" ইহাতে দোষস্খালন হইল না সত্য, কিন্তু পশুপতি যে ধর্ম্মভীরু এবং তিনি যে বিবেকহীন নহেন, ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল।

শুধু মনোরমার সহিত আচরণে নহে, পশুপতি যখন বখ্‌তিয়ারের সহিত হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখনও বিবেক তাঁহাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই। মহম্মদ আলির সহিত গোপন পরামর্শ শেষ করিয়া, শান্তশীলকে গোপনে হেমচন্দ্রকে বধ করিবার আদেশ দিয়া পশুপতি দেবী অষ্টভুজার সম্মুখে প্রার্থনা জানাইতেছেন, "জননি! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। আমি জননীস্বরূপা জন্মভূমি কখন দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না। কেবলমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, অক্ষম প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া, পরে উভয় কণ্টককে দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনি যবন-সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য-সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মা? যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎপ্রসবিনি! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর।" (২।৭, ৫৩ পৃঃ)। পশুপতির প্রার্থনা যেমন দেবতার প্রতি নিষ্ঠার, তেমনই তাঁহার তৎকালীন অন্তর্দ্বন্দ্বের নিদর্শন। রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য তিনি যে হীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার বিবেক ইহাতে সায় দিতেছে না। তাই শুধু পাষাণময়ী বিগ্রহকে নহে, পশুপতি আপনার অন্তরকে বুঝাইতেছেন যে রাজ্যলাভের জন্য ষড়যন্ত্র 'পাপাভিসন্ধি' হইলেও, রাজা "অক্ষম প্রাচীন" সুতরাং রাজ্যপরিচালনায় অপটু বলিয়াই তিনি তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু জন্মভূমিকে তিনি যবনহস্তে সমর্পণ করিবেন না। যবন তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত মাত্র। উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইলেই 'রাজ্য-সহায়তায় যবনকে নিপাত' করিয়া তিনি দেবতার প্রীতি সম্পাদন করিবেন। কিন্তু এই দুর্ব্বল যুক্তিতে তাঁহার অন্তর সাড়া দিল না। তাই নিরুপায় হইয়াই তিনি বলিতেছেন, "যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" এইরূপে পশুপতি নিজেকে প্রতারিত করিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যই তাঁহার কাম্য, যে উপায়ে এবং যে সর্ত্তেই তিনি তাহা লাভ করেন না কেন। তাই দেবীর সম্মুখে অত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলেও যখন তিনি শুনিলেন, শান্তশীল ও দামোদর তাঁহার উপদেশানুযায়ী সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছে

এবং বৃদ্ধ রাজার দিক দিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোনরূপ প্রতিবন্ধক নাই তখন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে আনন্দের আতিশয্যে দেবীর সমক্ষে তাঁহার সঙ্কল্প বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, "নিতান্ত পক্ষে স্বাধীন রাজা না হই, যবন-রাজ-প্রতিনিধি হইব।" (৪।১, ৯৪ পৃঃ)। এইরূপ অসতর্ক মুহূর্ত্তেই মানবমনের স্বরূপ পরিচয় পা'ওয়া যায়। তাহা হইলেও পশুপতি যে দেবীর সম্মুখে আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বিবেকের কণ্ঠরোধ করিতে পারে নাই।

পশুপতি ভাল মন্দ প্রতি কার্য্যে এবং প্রত্যেক অবস্থাতেই, বিশেষ করিয়া জীবনের বিশিষ্ট বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে গৃহদেবতা অষ্টভুজাকে স্মরণ করিতেন এবং তাঁহার আশিস কামনা করিতেন। মহম্মদ আলির সহিত গোপন চক্রান্তের পর তিনি যেমন দেবীর নিকট আত্মনিবেদন করিলেন, তেমনই মনোরমা যখন তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় দিল, তখন সেই অপ্রত্যাশিত সুসংবাদে 'চিত্ত' হারাইলেও, 'বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া' পশুপতি সর্ব্বপ্রথম 'প্রতিমাসমীপে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।' (৪।৩, ৯৮ পৃঃ)। তাঁহার এই ধর্ম্মানুরাগ যে তাঁহাকে পাপের আবর্ত্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না, ইহার অন্যতম কারণ হয়ত এই যে, শাস্ত্রজ্ঞ পিতার পুত্র পশুপতি আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মানুশাসনে শ্রদ্ধাবান হইলেও, জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে নির্দোষভাবে কর্ত্তব্যপালন যে বৃহত্তর মানবধর্ম্মের অঙ্গ, হয়ত সে সম্বন্ধে শিক্ষালাভের তিনি কোনরূপ সুযোগ পান নাই। নহিলে ধর্ম্মান্তরগ্রহণের প্রস্তাবমাত্র যিনি 'সদর্পে' বলিলেন যে 'যবন-সম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্যও সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িয়া নরকগামী' হইবেন না (৪।৫, ১০৩ পৃঃ), তিনি কেন এই সহজ সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না যে, 'যবন-সম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্য' নহে, শুধুমাত্র গৌড়ের সিংহাসনলোভে তিনি যে কুকার্য্যে ব্রতী হইলেন তাহার ফলে সনাতনধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়াও তিনি 'নরকগামী' হইয়াছেন?

কিন্তু তাহা হইলেও পশুপতির ধর্ম্মানুরাগই তাঁহার সুপ্ত মনুষ্যত্ব পুনরুদ্বোধিত করিল। 'গৌড়েশ্বরপুরে' অধিষ্ঠিত হইয়া চক্রী বখ্‌তিয়ার যখন তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন, তখন 'রাজভৃত্যবর্গের রক্তনদীতে চরণ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়াছেন' বলিয়া স্বতঃই তাঁহার অন্তঃকরণ তিক্ত হইল। তাহাতে বখ্‌তিয়ার যখন তাঁহাকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত অন্তর এই শঠতাপূর্ণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। পশুপতির ধর্ম্মানুভূতিই এই সময় তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দিল; তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা অপেক্ষা কারাবরণ শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন।

পশুপতির অপরাধ যেমন গুরুতর, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তও তেমনই ভয়ঙ্কর। রাজ্যপ্রাপ্তির আশা যখন লুপ্ত হইয়াছে, বখ্‌তিয়ারের শঠতায় পশুপতি যখন কারাগারে তখনও তাঁহার জীবনের স্পৃহা লোপ পায় নাই। এই কারণেই যে উপায়ে মহম্মদ আলি তাঁহাকে মুক্তি দান কবিলেন (৪।১৩) তাহাতে তাঁহার আচরণে 'কিয়ৎকাল বিস্ময়াপন্ন' হইলেও তাঁহার মুক্তিদাতা স্বীয় নিরাপত্তার জন্য যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাই পর্য্যাপ্ত কিনা সে সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়াই তিনি মহম্মদ আলির নির্দ্দেশমত 'গঙ্গাতীরাভিমুখে' গমন করিলেন। কিন্তু যবনের অত্যাচারের বীভৎস চিহ্নগুলি যতই তাঁহার নিকট তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতকতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিল, ততই তাঁহার জীবনের আকর্ষণ শিথিল হইতে লাগিল। পশুপতির লোমহর্ষণ অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল—অকারণ ভয়ে তিনি আর পদক্ষেপ করিতে পারিলেন না। সহসা বলহীন হইলেন। বিশ্রাম করিবার জন্য পথিমধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন—এক শবাসনে উপবেশন করিতেছিলেন। শবনিস্রুত রক্ত তাঁহার বসনে ও অঙ্গে লাগিল। তিনি কণ্টকিত কলেবরে পুনরুত্থান করিলেন। আর দাঁড়াই-লেন না।—দ্রুতপদে চলিলেন।' এ যেন অতীতের বিভীষিকাময় স্মৃতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিবার ব্যাকুল নিষ্ফল প্রয়াস।

পশুপতির মৃত্যুর চিত্র (৪।১৪) বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। উৎকট রাজ্যাকাঙ্ক্ষায় তিনি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন তাহার শিখা তাঁহার প্রাসাদোপম অট্টালি-কাকেও অব্যাহতি দেয় নাই। পশুপতি 'দগ্ধশরীরে' উন্মত্তের ন্যায় কক্ষে কক্ষে মনোরমার সন্ধান করিলেন। তারপর প্রজ্বলিত দেবীমন্দিরে চারিদিকের অনলশিখার মধ্যে 'অদগ্ধা স্বর্ণপ্রতিমা'র সম্মুখে দাঁড়াইয়া সর্ব্বহারা পশুপতি বলিতেছেন, "মা! জগদম্বে! আর তোমাকে জগদম্বা বলিব না। আর তোমার পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। আশৈশব আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম—ঐ পদধ্যান ইহজগতে সার করিয়া-ছিলাম—এখন, মা, একদিনের পাপে সর্ব্বস্ব হারাইলাম। তবে কি জন্য তোমার পূজা করিয়াছিলাম? কেনই বা তুমি আমার পাপমতি অপনীত না করিলে?" অদৃষ্টের দারুণ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও পশুপতির অন্তরে দেবতার প্রতি নিষ্ঠা অটুট রহিয়াছে এবং তাঁহার প্রত্যেকটি উক্তির ভিতর দিয়া মাতৃভক্ত সন্তানের মায়ের প্রতি অভিমানের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুহূর্ত্তে পশুপতির শেষ ভুল ভাঙ্গিল। পশুপতি যখন দেখিলেন তাঁহার চিরারাধ্যা দেবী শুধু তাঁহার শুভাশুভ সম্বন্ধেই উদাসীন নহেন, আজ এই দুর্দ্দিনে

আত্মরক্ষা করিতেও অসমর্থ, তখন জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া তিনি এই প্রথম বুঝিলেন, অন্তরের দেবতাকে লাঞ্ছিত করিয়া তিনি যে বাহিরের দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, সে শুধুই ধাতুমূর্ত্তি। তিনি প্রতিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ! ধাতুমূর্ত্তি!—তুমি ধাতুমূর্ত্তি মাত্র, দেবী নহ—ঐ দেখ অগ্নি গর্জ্জিতেছে! যে পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে—সেই পথে অগ্নি তোমাকেও প্রেরণ করিবে। কিন্তু আমি অগ্নিকে এ কীর্ত্তি রাখিতে দিব না—আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম—আমিই তোমাকে বিসর্জ্জন করিব। চল! ইষ্টদেবি! তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিব।" কিন্তু বৃথাই এই অভিমানপূর্ণ আস্ফালন। পশুপতি যখন প্রতিমা উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তে প্রতিমার সহিত তাঁহার 'সজীবন সমাধি' হইল।

পশুপতির প্রায়শ্চিত্তের এই যে চিত্র, পাপের ভয়াবহ পরিণাম দর্শানই ইহার একমাত্র সার্থকতা নহে। দুরাকাঙ্ক্ষাতাড়িত পশুপতিকে আমরা প্রথম হইতেই একটা কুৎসিত প্রতিবেশে দেখিতে পাই। সুতরাং তাঁহার প্রতিভা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই এবং জাতির জীবনে তাঁহার কুকার্য্যের পরিণতি এমনই ভয়াবহ যে, তাঁহার দুর্ভাগ্যের সূচনাতে তিনি যখন ধর্ম্মত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলেন তখনও তাঁহার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতির সঞ্চার হইল না। কিন্তু তাঁহার কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ফলে আমরা তাঁহার অপরাধ বিস্মৃত হইতে না পারিলেও, তাঁহার শোচনীয় পরিণতিতে স্বভাবতঃই কিছুটা করুণার উদ্রেক হইল। যদি তাহা না হইত, পশুপতির মৃত্যুর পর তাঁহার অপরাধকেই যদি আমরা বড় করিয়া দেখিতাম, তাহা হইলে সতীর আত্মোৎসর্গ স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও মনোরমার আত্মাবসর্জ্জনে কোথায় যেন কি একটা অপূর্ণতা থাকিয়া যাইত।

মনোরমা অভিনব স্থষ্টি। তাহার বালিকাসুলভ সারল্য, তাহার ভীতিহীন নৈশভ্রমণ কপালকুণ্ডলাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু উভয় চরিত্রের পার্থক্যও লক্ষণীয়। যে মূর্ত্তিতে মনোরমা হেমচন্দ্রকে প্রথম সম্ভাষণ করিল, যে মূর্ত্তিতে নিস্তব্ধ নিশীথে বাপীতটে হেমচন্দ্র তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন, সে মূর্ত্তি কপালকুণ্ডলার পরিচিত। কিন্তু যে মূর্ত্তিতে প্রগল্‌ভা মনোরমা হেমচন্দ্রের নিকট প্রেমের গূঢ় ব্যাখ্যা করিতেছে, যে মূর্ত্তিতে সে পশুপতির পাপ-অভিসন্ধির জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে, সে মূর্ত্তি কপালকুণ্ডলার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তীক্ষ্ণধী পশুপতি মনোরমার চরিত্রের এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন: 'তোমার দুই মূর্ত্তি--একমূর্ত্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা........সেইরূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্ত্তি গম্ভীরা তেজস্বিনী প্রতিভাময়ী প্রখরবুদ্ধিশালিনী—

এ মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই।' (২।৯, ৫৫ পৃঃ)। ইহা মনোরমার স্বরূপ বর্ণনা এবং এই দুই পরস্পরবিরোধী মূর্ত্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাহাকে প্রহেলিকা বলিয়াই মনে হয় এবং তাহার বিচিত্র বাল্য ইতিহাস ও তাহার জীবনের উপর নিয়তির ক্রূর দৃষ্টি তাহাকে অধিকতর প্রহেলিকাময়ী করিয়া তুলিয়াছে।

মনোরমার চরিত্রে বিরুদ্ধগুণাবলীর সমন্বয় কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা বুঝিতে হইলে, এক কথায় তাহার চরিত্র বুঝিতে হইলে, তাহার বয়স সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বঙ্কিম স্পষ্টতঃ কিছু উল্লেখ করেন নাই। আনুপূর্ব্বিক তাহার জীবন যেমন একটা হেঁয়ালি, তাহার বয়সের প্রশ্নও কতকটা তেমনিই হেঁয়ালি। বঙ্কিম যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপ: 'মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ, কি ষোড়শ, কি তদধিক, কি তন্ন্যূন, তাহা ইতিহাসে লেখে না, পাঠকমহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।' পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহার সম্বন্ধে ইতিহাস স্পষ্টতঃ কিছু না লিখিলেও এরূপ সব মালমসলা উপকরণাদি রাখিয়া যায় যাহার উপর নির্ভর করিয়া অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান অসম্ভব নহে। এক্ষেত্রেও বঙ্কিম যে সকল উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে মনোরমার বয়স মোটামুটি অনুমান করা চলে। পশুপতির যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি যুবক এবং হৈমবতী (মনোরমা) অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা। আখ্যায়িকায় বর্ণিত ঘটনাকালে 'পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর।' যৌবনকাল ব্যাপক সময়, ইহা দ্বারা বিংশ হইতে ত্রিংশ পর্য্যন্ত যে কোন বয়স বুঝাইতে পারে। কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিবাহকালে পশুপতি ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্র এবং পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর বয়সে তিনি গৌড়ের ধর্ম্মাধিকার। তিনি যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন, কপর্দ্দকহীন ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে সাত আট বৎসরের পূর্ব্বে এরূপ সম্মান লাভ করা সম্ভব নহে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় এই সম্মান লাভ করিতে পশুপতির সাত হইতে দশ বৎসর লাগিয়া থাকিবে (এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে) তাহা হইলে বিবাহকালে তাঁহার বয়স দাঁড়ায় পঞ্চবিংশতি হইতে অষ্টবিংশতির মধ্যে। এবং এই হিসাব অনুসারে উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাকালে মনোরমার বয়স দাঁড়ায় আনুমানিক পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশের মধ্যে। অর্থাৎ বয়সে মনোরমা বাল্য ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে। এবং তাহার চরিত্রে এই উভয়কালের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এই বয়সে বিবাহিতা নারীকে যুবতী এবং কুমারীকে বালিকা বলিয়া অভিহিত করা চলে। বিবাহের পর মনোরমা যদি সাধারণ রমণীর ন্যায় স্বামীর গৃহে

প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিত্রে বালিকাজনোচিত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা যুবতীজনোচিত বৈশিষ্ট্যই অধিক প্রকাশ পাইত। কিন্তু ভাগ্যদোষে মনোরমা স্বামীসঙ্গ সুখ হইতে বঞ্চিত। সুতরাং স্বামীর গৃহে নারী স্বভাবতঃই যে শিক্ষা লাভ করে, যে শিক্ষা বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য সংযত করিয়া বালিকা বয়সেই নারীকে প্রবীণা করিয়া তোলে, সে শিক্ষালাভের সুযোগ সে পায় নাই। অধিকন্তু মনোরমা বাল্যেই মাতৃহীনা, সুতরাং বুদ্ধিমতী মাতার নিকট কন্যা অনূঢ়া অবস্থাতেও যে শিক্ষা লাভ করে তাহাও তাহার অদৃষ্টে জুটিয়া ওঠে নাই। পরে পিতার মৃত্যুর পর সে যখন পিতামহতুল্য বৃদ্ধ জনার্দ্দন শর্ম্মার আশ্রয়ে আসিল, তখন সংসারানভিজ্ঞ, সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণদম্পতির সান্নিধ্য যে কোনরূপ সাংসারিক শিক্ষার অনুকূল হয় নাই, একথা নিঃসংশয়ে অনুমান করা চলে। মনোরমা স্বভাবতঃ স্বাধীনভাবাপন্না ও ভয়শূন্যা, এবং শিক্ষার অভাবে সে অনেকটা সংস্কারবর্জ্জিতা। এই কারণেই কপালকুণ্ডলার সহিত তাহার কিছু কিছু সাদৃশ্য অনুভূত হয়। অনেকটা সংস্কারবর্জ্জিতা বলিয়াই অপরিচিত হইলেও হেমচন্দ্রের সহিত আচরণে তাহার কোন সঙ্কোচ নাই। আবার স্বভাবগুণে স্বাধীনভাবাপন্না ও ভয়শূন্যা বলিয়া ভূতযোনির ভয়ে যে বৃক্ষবহুল ঘনান্ধকার বাপীতটে দিবাভাগেও কেহ একাকী আসিতে সাহসী হয় না, মনোরমা নিত্য রাত্রে সেখানে আসিয়া সরোবরজলে অবগাহন স্নান করিতে শঙ্কাবোধ করে নাই।

কিন্তু স্বভাবগুণে ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মনোরমার চরিত্র একদিকে যেভাবেই বিকাশলাভ করুক না কেন, বয়সে মনোরমা যৌবনের কোঠায় না হইলেও অন্ততঃ সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এ নবরাজ্যের শিক্ষা প্রকৃতির, সে শিক্ষা মানুষের অপেক্ষা রাখে না।[১] যে যাদুকরীর যাদুপ্রভাবে নব বসন্তে প্রতি বৃক্ষ নবকিশলয়ে সজ্জিত হয়, উল্লসিত বিহঙ্গকণ্ঠের কাকলি আকাশবাতাস মুখরিত করিয়া তোলে, সেই যাদুকরীই একদিন মনোরমার কানে কানে জানাইয়া দিল যে, তাহার জীবনেও বসন্তের সমাগম হইয়াছে। কিন্তু কোথায় সে দেবতা যাহার অভ্যর্থনার জন্য মনোরমার জীবনে এই বসন্তোৎসবের আয়োজন? হৈমবতীর পিতা অদৃষ্টদেবতাকে ফাঁকি দিতে যাইয়া অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার জীবন লইয়া যে প্রহসনের অভিনয় করিয়াছিলেন, জ্ঞানহীনা বালিকার নিদ্রালস নয়নে তাহা একটা কিছু নূতন রকমের খেলা বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকিবে। ক্ষণিকের স্মৃতি ক্ষণিকেই

---

১ কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রে এই শিক্ষা কেন ব্যর্থ হইল যথাস্থানে তাহার বিচার করিয়াছি।

মিলাইয়া গেল। হৈমবতী মরিল, কিন্তু তাহার অশুভ গ্রহ তাহার পিতার সমস্ত চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিয়া মনোরমার পশ্চাদনুসরণ করিল।

এইখানে একটা প্রশ্ন আসিয়া পড়েঃ পশুপতি যে তাহার স্বামী একথা মনোরমা জানিল কবে? এ প্রশ্নের উত্তরও ইতিহাসে লেখা নাই। সুতরাং এক্ষেত্রেও আখ্যায়িকার মধ্যে যতটুকু উপকরণ পাওয়া যায় তাহাকেই ভিত্তি করিয়া কল্পনার সাহায্যে ইতিহাস গড়িয়া লইতে হইবে। আখ্যায়িকায় মনো-রমাকে পশুপতির সম্মুখে দেখিতে পাই পর পর দুই রাত্রিতে। প্রথম রাত্রির সংলাপ হইতে তৎপূর্ব্বে মনোরমা আপনার সত্যকার পরিচয় জানিত কিনা সে সম্বন্ধে কোন কিছু অনুমান করা চলে না। দ্বিতীয় রাত্রিতে দেখিতে পাই মনোরমা পশুপতির নিকট আপনার পবিচয় দিল। তবে কি প্রথম রাত্রে পশুপতির নিকট হইতে বিদায় লইবার পর ও দ্বিতীয় রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে কোন সময় সে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর মনোরমার উক্তি হইতেই অনুমান করিয়া লইতে হইবে। মনোরমা পশুপতিকে বলিতেছে, "একদিন [জনার্দ্দন শর্ম্মা] গোপনে ব্রাহ্মণীর নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি দৈবাৎ গোপনে শুনিয়া-ছিলাম।" মনোরমা যদি সেই দিন অথবা তৎপূর্ব্বরাত্রিতে পশুপতির নিকট হইতে বিদায়ের পর তাহার অতীত ইতিহাস শুনিয়া থাকে, তাহা হইলে এস্থলে 'একদিন' এই উক্তির কোন তাৎপর্য্য থাকে না। পক্ষান্তরে, পশুপতি যখন তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "মনোরমা—রাক্ষসী! এতদিন কেন আমাকে এ অন্ধকারে রাখিয়াছিলে?"—ইহার উত্তরে সে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করিতে পারিত যে, তাহার অতীত জীবনের ইতিহাসের সহিত তাহার পরিচয় 'এতদিনে'র অর্থাৎ দীর্ঘদিনের নহে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, মনোরমাকে যখন আখ্যায়িকার মধ্যে পশুপতিব সংস্পর্শে দেখিতে পাই তৎপূর্ব্বেই সে সকল তথ্য অবগত হইয়াছে।

কিন্তু তাহা মনোরমারূপে পশুপতির সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের পূর্ব্বে কি পবে?

সন্দেহকাতর হেমচন্দ্র যখন মনোরমার প্রশ্নের উত্তরে দারুণ অভিমানে বলিলেন, "আমি মণি ভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি", তখন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে যাইয়া মনোরমা যে সকল কথার অবতারণা করিল (৩।৬), তাহা হইতে অনুমান করা চলে যে, পশুপতির সহিত প্রথম পরিচয়কালে সে নিজেকে বিধবা বলিয়াই জানিত। পুরাণোক্ত ভাগীরথী-মৃত্যুঞ্জয়-ঐরাবতকাহিনীর ব্যাখ্যা মনোরমা সুপণ্ডিত পশুপতির

নিকট যেরূপ শুনিয়াছে, হেমচন্দ্রের নিকট ঠিক সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু অন্তর মধ্যে সে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল বলিয়াই ইহা তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে।

অষ্টমবর্ষীয়া হৈমবতী যেদিন মনোরমায় রূপান্তরিত হইল, সেদিন সে শুনিল তাহার পূজার নৈবিদ্যের ডালি পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কে জানে কোন দেবতার অভিসম্পাতে তাহাব অজানিতে উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে বয়সে নব নব আশা ও আকাঙ্ক্ষা তরুণ মনকে আবেগচঞ্চল করিয়া তোলে, সে বয়সে মনোরমা পাইল ব্যর্থতার দুঃসহ জ্বালা, তাহার অন্তর জুড়িয়া উঠিল রিক্ততার করুণ আর্ত্তনাদ। তারপর, অদৃষ্টদেবতার নির্দ্ধারিত দিবসে —শুভ কি অশুভক্ষণে কে জানে—তাহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার ভাগ্যনিয়ন্তা—হৈমবতীর স্বামী পশুপতি।

মনোরমা নিজেকে বিধবা জানিয়াই পশুপতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আকৃষ্ট হইয়াই বুঝিয়াছিল, 'তুমি বালির বাঁধ দিয়া........কূলপরিপ্লাবনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি........প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না।' সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞ পশুপতি যখন তাহাকে বুঝাইলেন যে, বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে, মনোরমা তখন সহজেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল। তারপর যেদিন সে তাহার প্রকৃত ইতিহাস শুনিল, সেদিন তাহার মনে হইল, জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, দেবতা সাক্ষী করিয়া একদিন সে যাঁহার গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিয়াছিল, অজানিতেও যে তাহার মন তাঁহাকেই আপনার বলিয়া চিনিয়া লইল, বুঝি বা ইহার ভিতর দেবতার কোন নিগূঢ় ইঙ্গিত রহিয়াছে ; তাহার অন্তর বলিল, 'ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।'

প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়াও মনোরমা কেন পশুপতিকে 'অন্ধকারে' রাখিয়াছে, পশুপতির প্রশ্নের উত্তরে তাহা সে নিজেই ব্যক্ত করিয়াছে। মনোরমা বিধবা বলিয়া পরিচিত, সহসা হৈমবতী বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে পশুপতি হয়ত সে কথা বিশ্বাস করিতেন না। আর যদিই তিনি বিশ্বাস করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলেও লোক সমক্ষে তাঁহাকে নিন্দনীয় হইতে হইত ; কারণ পশুপতি বিশ্বাস করিলেও অপরে তাহার কথা প্রত্যয় করিবে কেন? ইহা ছাড়াও 'জ্যোতির্ব্বিদের গণনা' তাহার নীরবতার অন্যতম কারণ। ভবিষ্যৎ হয়ত অখণ্ডনীয় ; কিন্তু অনাগত ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কথা প্রকাশ করিয়া মনোরমা কেন পূর্ব্বাহ্নেই তাহার স্বামীর মনের শান্তি নষ্ট করিবে? জ্বলিতে হয়, সে একাই জ্বলিবে। তাই পশুপতি যখন রাজ্যেশ্বর হইবার সুখস্বপ্ন দেখিয়াছেন, মনোরমা তখন নীরবে

সেই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়াছে, যেদিন শ্মশানভূমিতে তাহার জন্য অভিনব বাসরশয্যা রচিত হইবে।

জ্ঞান হওয়া অবধি অসহ্য দহন জ্বালা মনোরমার নিত্য সহচর। প্রথমে বৈধব্যজ্বালা, পরে দৈবক্রমে যেদিন সে নিজের পরিচয় পাইল, সেদিন হইতে জ্যোতির্ব্বিদের গণনা বিধাতার অভিশাপের ন্যায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছে। অথচ কোন অবস্থাতেই সে এমন কোন সঙ্গিনী পায় নাই, যাহার নিকট দুঃখের কথা বলিয়া সে বুকের বোঝা কথঞ্চিৎ হালকা করিতে পারে। মৃণালিনীর দুর্দ্দিনে তাঁহার পাশে গিরিজায়া রহিয়াছে; মনোরমা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ বলিয়াই নির্জ্জন প্রকৃতি তাহাকে আকর্ষণ করে। নিত্য রাত্রে জনহীন পথপার্শ্বে ভয়সঙ্কুল সরোবর তাহাকে আহ্বান করে। এবং সবোবরের শীতল জলে অবগাহন স্নান করিয়া শুধু যে তাহার গাত্রজ্বালাই নিবারিত হয় তাহা নহে, শান্ত, স্নিগ্ধ প্রকৃতির ক্রোড়ে আশ্রয় লইলে হয়ত তাহার প্রাণের জ্বালাও কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। বস্তুতঃ, কত বড় ব্যথার বোঝা বহিয়া তাহাকে তাহার নিঃসঙ্গ দিনগুলি কাটাইতে হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাহার বিসদৃশ আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মনোরমা অনেক সময় আত্মবিস্মৃত হইয়া যেন এক স্বপ্নময় জগতে বিচরণ করে। এই কারণেই স্বভাবতঃ প্রখরবুদ্ধিশালিনী হইলেও কোনরূপ কঠিন আঘাতে মর্ত্তে নামিয়া না আসিলে আমরা তাহার 'সরস্বতী মূর্ত্তির' পরিচয় পাই না। পশুপতির সহিত আচরণে তাহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। হেমচন্দ্রও যে একবার তাহার প্রতিভাময়ী মূর্ত্তির পরিচয় পাইলেন (৩।৬, ৭৭-৭৯ পৃঃ), তাহার মূলে এই যে, এই সময় তাঁহার প্রাণের ব্যথা সহানুভূতিশীলা মনোরমার অন্তরের এক স্পর্শকাতর গোপনতন্ত্রীতে আঘাত করিয়া তাহাকে মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। পশুপতি হয়ত তাহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য জানিতেন এবং এই কারণেই বিবাহ সম্বন্ধে তাহার সহিত আলোচনা করিতে যাইয়া যখন দেখিলেন যে সে 'চিত্ত হারাইয়াছে', তখন তাহার 'বুদ্ধি প্রদীপ জ্বালিবার' উদ্দেশ্যে 'ভয়সূচক চিন্তার আবির্ভাবে কার্য্যসিদ্ধ হইবেক' এইরূপ ভাবিয়া তাহার নিকট যবনের প্রসঙ্গ তুলিলেন। (৪।৩, ৯৬ পৃঃ)। তাঁহার চেষ্টা যে ফলবতী হইল না ইহার কারণ এই যে, মনোরমা আর নিজের অশুভকে ভয় করে না, তাহার যাহা কিছু ভাবনা পশুপতিকে লইয়া। সাম্রাজ্যলোভে তিনি যে আজ নিরয়গামী হইয়াছেন, ইহা তাহার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তুরকের ভীতি তাই তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিল না।

মনোরমা যে কখন কখন কতখানি আত্মবিস্মৃত হইত এইখানেই তাহার পূর্ণ পরিচয় পাই। পূর্ব্বরাত্রে পশুপতিকে তাঁহার পাপাভিসন্ধি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া সে যে তাঁহার নিকট আপনার যথার্থ পরিচয় দিবার সঙ্কল্প লইয়াই দেবীমন্দিরে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল, ইহা তাহার পরবর্ত্তী আচরণ হইতে সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু 'পূজাবশিষ্ট পুষ্পগুলি লইয়া বিনাসূত্রে মালা' গাঁথিতে গাঁথিতে এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে মনোরমা আত্মবিস্মৃত হইল। পশুপতি আসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিলে 'কোন উত্তর দিল না', হয়ত তাহার প্রশ্ন তাহার কানে পৌঁছিল না। পশুপতি যখন দ্বিতীয়বার তাহাকে আহ্বান করিলেন, 'মনোরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল', হয়ত যে কথাটি বলিবার জন্য এতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছে, ভুলিয়া-যাওয়া সেই কথাটি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল। 'ক্ষণেক পরে কহিল, "আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে হইতেছে না।"'

'পশুপতি বসিয়া রহিলেন, মনোরমা মালা গাঁথিতে লাগিল।' গাঁথিতে গাঁথিতে পুনরায় সে পশুপতিকে, তাহার নিজেকে বিস্মৃত হইল। তাহার হাত দু'খানি যখন যন্ত্রচালিতের ন্যায় মালা গাঁথিয়া চলিয়াছে, মনোরমা যেন তখন কোন দূর স্বপ্নলোকে—সেখানে পশুপতি নাই, কেশবের কন্যা নাই, পশুপতি ও কেশবের কন্যার জীবনে বিধাতার অভিসম্পাতের জ্বালা নাই।

পশুপতি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে অনেক কথা কহিলেন, কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া, সে তাহা শুনিল কিনা সন্দেহ। তিনি যখন বুঝাইতে-ছিলেন যে, 'কুলরীতি........শাস্ত্রমূলক নহে', মনোরমা তখন 'বিনাসূত্রের মালা' একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের গলদেশে পরাইতেছিল। 'পরাইতে মালা খুলিয়া গেল। মনোরমা........আপন মস্তক হইতে কেশগুচ্ছ ছিন্ন করিয়া, তৎসূত্রে আবার মালা গাঁথিতে লাগিল।' তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার পশুপতির সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

মালা গাঁথা শেষ হইলে. মনোরমা পুনরায় তাহা মার্জ্জারের গলায় পরাইতে গেল। পশুপতি প্রশ্ন করিলেন, "তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না?" মনোরমা মালা ও মার্জ্জার লইয়া ব্যস্ত, 'পশুপতির কথা কর্ণে গেল না।' মার্জ্জার যতই মালা পরিধানের গুরু সম্মান গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া 'মালার ভিতর হইতে মস্তক বাহির করিয়া লইতেছিল—মনোরমা কুন্দনিন্দিত দন্তে অধর দংশন করিয়া ঈষৎ হাসিতেছিল, আর আবার মালা তাহার গলে দিতেছিল।' মার্জ্জারের সৌভাগ্যের সহিত আপনার

দুর্ভাগ্যের তুলনা করিয়া পশুপতি ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন কিনা জানি না, কিন্তু তিনি আর সহিতে না পারিয়া এই অপূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'চপেটাঘাত' করিলেন। বেচারা মার্জ্জার আপনার অপরাধ বুঝুক আর না বুঝুক, বর্ত্তমান অবস্থায় পলায়ন করিয়া প্রণয় ও ঈর্ষ্যা উভয় প্রকারের নির্য্যাতন হইতে আত্মরক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। 'মনোরমা সেইরূপ দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করস্থ মালা পশুপতিরই মস্তকে পরাইয়া দিল।' চিত্রটি অর্থপূর্ণ; বঙ্কিম এস্থলে পশুপতির মার্জ্জারোচিত আচরণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু মনোরমার দিক দিয়া তাহার আচরণ জ্ঞানহীন শিশুর আচরণের ন্যায় সম্পূর্ণ অর্থহীন।

পশুপতির ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতি তাঁহার চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। মনোরমার ক্ষেত্রে ইহার ফল হইল এই যে, যবনের আগমনের আশঙ্কা যাহা নিষ্পন্ন করিতে পারে নাই, পশুপতির অনুচিত আচরণ তাহাই নিষ্পন্ন করিল—কঠিন আঘাতে তাহাকে মর্ত্তের মৃত্তিকায় নামাইয়া আনিল। পশুপতিকে বাহুপ্রসারণ করিতে দেখিয়া 'মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইল—পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্প দেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল।' পশুপতি যখন দোষস্খালনের চেষ্টা করিলেন, মনোরমা তাঁহার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিল, "পশুপতি! কেশবের কন্যা কোথায়?" তাহার এই তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া কে বলিবে, এ সেই মনোরমা ক্ষণপূর্বে যে মার্জ্জারের গলায় পুষ্পমালা পরাইতে প্রয়াস পাইয়াছে?

মনোরমার অবস্থায় পড়িলে মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হওয়া ত সাধারণ কথা, উন্মাদগ্রস্ত হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। তাহার প্রথম দর্শনে তাহার 'কথার প্রণালীতে' হেমচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, 'এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা? না উন্মাদিনী?' মনোরমা নিজেও স্থানান্তরে হেমচন্দ্রকে বলিতেছে, "কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী।" কিন্তু সত্যই সে উন্মাদিনী নহে। এত ব্যথা বুকে চাপিয়া রাখিয়াও সে যে উন্মাদিনী হয় নাই তাহার কারণ তাহার বয়স তাহার অনুকূল। বয়সে মনোরমা বাল্য ও যৌবনের সীমান্ত প্রদেশে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়াই অতি সহজেই সে যৌবনের 'প্রতিভাময়ী প্রখরবুদ্ধিশালিনী' মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া 'অবিকৃতা' বালিকার সাজে সাজিতে পারিত। এবং সেই সঙ্গে তাহার সকল চিন্তা যেন কোন যাদু-প্রভাবে অন্তর্হিত হইত। এইরূপ রূপান্তরণ যেন অনেকটা তাহার ইচ্ছাধীন বঙ্কিম একস্থলে (৩১৬) এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন: হেমচন্দ্রকে ভর্ৎসনা

করিতে যাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রেমের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজের অজ্ঞাতেই মনোরমা তাঁহার নিকট হৃদয়ের দ্বার কতকটা উন্মুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। হেমচন্দ্র যখন প্রশ্ন করিলেন, "তুমি বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি যদি ধর্ম্মে একের পত্নী, মনে অন্যের পত্নী হইলে, তবে তুমি দ্বিচারিণী হইলে কি না ?"—তখন সে বুঝিল যে, সে অধিক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। মনোরমা হেমচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর করিল না. 'গৃহমধ্যে হেমচন্দ্রের অসিচর্ম্ম ঝুলিতেছিল ; মনোরমা চর্ম্ম হস্তে লইয়া কহিল, "ভাই, হেমচন্দ্র, তোমার এ ঢাল কিসের চামড়া ?" সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত এই বিষয়বস্তু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনোরমার রূপও মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইল। কোথায় গেল সেই 'প্রতিভা-দেবী'। 'হেমচন্দ্র হাস্য করিলেন। মনোরমার মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা!' যাহা কিছু চিন্তা তাহা যুবতী মনোরমার, বালিকা মনোরমা চিন্তা-ভাবনার অতীত।

মনোরমার চরিত্রের এই বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে তাহার কাহিনী সম্বন্ধে ডক্টর সেনগুপ্ত যে সকল অসঙ্গতির উল্লেখ করিয়াছেন,[১] সে সকলের সহজ মীমাংসা হইয়া যায়। ডক্টর সেনগুপ্ত অনুমান করেন যে, মহম্মদ আলির সহিত পশুপতির মন্ত্রণার পর মনোরমা তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিয়া থাকিবে, 'কারণ তাহা না হইলে সে বহু পূর্ব্বেই পশুপতিকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতে পারিত। যখন সে শুনিয়াছে তাহার পর প্রথম অবসরে সে পশুপতিকে জানাইয়া নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছে।' ইহার পরই ডক্টর সেনগুপ্ত প্রশ্ন করিয়াছেন, 'অপরাহ্লে সে হেমচন্দ্রকে বুঝাইল যে প্রেমের বৈধতা অবৈধতা নাই, প্রেম গঙ্গা প্রবাহস্বরূপ সুতরাং অপ্রতি-রোধনীয় ও পবিত্র এবং তাহার কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইল যে ইহা তাহার নিজের অভিজ্ঞতার ফল। অথচ সেই দিন রাত্রিতেই সে প্রমাণ করিয়া দিল তাহার প্রেম বিশুদ্ধ, বৈধ প্রেম। তবে কি মনোরমা প্রথম হইতেই জানিত যে সে পশুপতির স্ত্রী এবং তাহা জানিয়াই কি সে প্রণয়ের প্রতিদান দিয়াছে ?' এইরূপ অনুমান করায় যে সকল অসুবিধা রহিয়াছে তাহাও ডক্টর সেনগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি বলিতেছেন, 'এইরূপ অনুমান করিলে মনোরমার অধিকাংশ কথা ও কার্য্য তাৎপর্য্যহীন হইয়া পড়ে এবং মনোরমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়া যায়।' অর্থাৎ, ডক্টর সেনগুপ্তের মতে মনোরমার কাহিনীর বিভিন্ন অংশ পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের পরিপোষক এবং কোন

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ১১১—১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধান্তকেই অসংশয়ে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু (১) মনোরমা পশুপতিকে ভালবাসে, তাহার পক্ষে পশুপতিকে পাপকার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টার পক্ষে ইহাই পর্য্যাপ্ত কারণ, আত্মপরিচয় জানা না-জানার সহিত ইহাকে সম্বন্ধযুক্ত হইতে হইবে এমত নহে। পক্ষান্তরে, মনোরমার পক্ষে প্রকৃত পরিচয় দিয়া পশুপতিকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা অধিকতর ফলবতী হইতে পারে এরূপ সম্ভাবনা থাকিলেও, পরিচয় দেওয়াব পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে সে সকলের আলোচনা করিলে 'প্রথম অবসরে সে পশুপতিকে জানাইয়া নিবৃত্ত কারতে চাহিয়াছে' এরূপ অনুমানের কারণ থাকে না এবং মনোরমার নিজের উক্তি ('একদিন' সে এই কাহিনী শুনিয়াছে) যে এরূপ অনুমানের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মনে হয় পশুপতির আচরণ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ার পর হইতেই মনোরমা তুরকের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে এবং যখনই সে তাঁহার কুমন্ত্রণা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছে, অর্থাৎ, মহম্মদ আলির সহিত তাঁহার গোপন ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়াছে, তখনই, আত্মগোপন করিলেও, 'প্রথম অবসরে' সে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং অকৃতকার্য্য হইয়া (অবশ্য ইহার জন্য তাহার নিজের দুর্ব্বলতাও অংশতঃ দায়ী) শেষ উপায় হিসাবেই দ্বিতীয় রাত্রে সে আত্মপরিচয় দিয়াছে। (২) মনোরমা হেমচন্দ্রকে প্রেম সম্বন্ধে যাহা কিছু বুঝাইয়াছে, সে সমস্তই 'তাহার নিজের অভিজ্ঞতার ফল' ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু সকল অভিজ্ঞতাই যে একই সময় অর্জ্জিত হইয়াছে এরূপ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। মনোরমা হয়ত নিজেকে বিধবা মনে করিয়াই পশু-পতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে এবং তখনই বুঝিয়াছে যে, 'প্রেমের বৈধতা অবৈধতা নাই। প্রেম গঙ্গা প্রবাহস্বরূপ, সুতরাং অপ্রতিরোধনীয়।' হয়ত একই সময় পশুপতি তাহাকে বুঝাইয়া থাকিবেন যে, প্রেম পবিত্র। কিন্তু এই বাণী তাহার অন্তরে তখনই পরিপূর্ণ সাড়া দিয়াছে যখন পরবর্ত্তী কোন সময় সে জানিয়াছে যে যাঁহাকে সে না চিনিয়া ভালবাসিয়াছে তাহার সেই প্রণয়াস্পদই তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী। অর্থাৎ, হেমচন্দ্রের সহিত আলোচনাকালে মনোরমা নিজেকে পশুপতির স্ত্রী বলিয়া জানিলেও, ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, প্রথম হইতেই সে ইহা জানিত এবং জানিয়াই সে প্রণয়ের প্রতিদান দিয়াছে। ডক্টর সেনগুপ্ত তাঁহার প্রথমোক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, অর্থাৎ, মহম্মদ আলির সহিত পশুপতির মন্ত্রণার পর মনোরমা তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছে এই অনুমানের ভিত্তিতে মনোরমার জীবনে 'তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট ভাগ' লক্ষ্য করিয়াছেন: '(১) পশুপতির সঙ্গে প্রণয়

ও বিশ্বাসঘাতকতায় সম্মতি, (২) হৈমবতীর ইতিহাস শ্রবণ, (৩) পশুপতিকে নিরস্ত করিবার বিফল চেষ্টা ও জ্যোতির্ব্বিদের গণনার সফলতা।' আমি এস্থলে একটুকু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে চাই। আমার বিবেচনায় মনোরমার জীবনের 'তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট ভাগ' এইরূপঃ (১) নিজেকে বিধবাজ্ঞানে পশুপতির সহিত প্রণয়, (২) হৈমবতীর ইতিহাস শ্রবণ করিয়া পশুপতির নিকট হইতে তাহা গোপন রাখা এবং পশুপতিকে নিবৃত্ত করিবার প্রথম ব্যর্থ প্রয়াস, (৩) পশুপতির নিকট পরিচয় প্রদানান্তর তাঁহাকে নিরস্ত করিবার দ্বিতীয় ব্যর্থ প্রয়াস ও জ্যোতির্ব্বিদের গণনার সফলতা।—এইরূপ ভাগ করিলে তাহার কাহিনীতে কোথাও কোন অসঙ্গতি থাকে না, মনোরমার কথা ও কার্য্য তাৎপর্য্যহীন হইয়া পড়ে না এবং তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হয় না।

মনোরমার চরিত্র যেমন প্রহেলিকা, মৃণালিনীর চরিত্র তেমনই বৈচিত্র্যহীন। এই চরিত্রটিতে বঙ্কিম সর্ব্ব অবস্থাতেই স্বামীর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা—হিন্দুনারীর এই আদর্শকে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন। মৃণালিনী সম্পূর্ণ নিরভিমানিনী। স্বামী তাঁহাকে কুলটা জ্ঞানে ত্যাগ করিয়াছেন, গিরিজায়ার মুখে এই নিষ্ঠুর সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে হেমচন্দ্র যখন সকল কথা না শুনিয়াই তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে ত্যাগ করিলেন, তাহার পরেও মৃণালিনী ক্রুদ্ধ গিরিজায়াকে বুঝাইতেছেন, তাঁহারই দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে, তিনি 'গুছাইয়া সকল কথা' বলিতে পারেন নাই—কি বলিতে কি বলিয়াছেন। তিনি গিরিজায়াকে স্পষ্টই বলিতেছেন, "গিরিজায়া—যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তুমি স্থানান্তরে তাঁর নিন্দা করিও। হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই—আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব?" (৪।৮)। ডেস্‌ডেমোনাও নিরভিমানিনী; কুলটা সন্দেহে ওথেলো যখন তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেন, এমন কি, সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে আঘাত করিলেন, তাহাতেও তাঁহার অনুরাগ কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। কিন্তু তিনি ওথেলোর নিষ্ঠুরতা অস্বীকার করেন নাই। পরন্তু তাঁহার নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে ভালবাসেন একাধিক স্থলে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ডেস্‌ডেমোনা ইয়াগোকে বলিতেছেন,

Unkindness may do much ;
And his unkindness may defeat my life,
But never taint my love.

Othello : Act IV. Sc 2.

অন্যত্র তিনি এমিলিয়াকেও (Emilia) প্রায় একই সুরে বলিতেছেন,

My love doth so approve him,
That even his stubbornness, his checks and frowns,
......have grace and favour in them.

Ibid . Act IV. Sc 3.

এবং ক্ষণিকের জন্য হইলেও আমরা তাঁহাকে অভিমানে একবার আত্মবিস্মৃত হইতে দেখিতে পাই। ওথেলোর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া এমিলিয়া যখন প্রশ্ন করিল, "Good madam, what's the matter with my lord ?" ডেস্‌ডেমোনা পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, "Who is thy lord ?" এমিলিয়া সহজভাবে উত্তর করিল, "He that is yours, sweet lady." ডেস্‌ডেমোনা ক্ষোভে ও অভিমানে বলিলেন, "I have none." (Othello : Act IV. Sc 2.)। মৃণালিনীর কণ্ঠে কখন কোন অবস্থাতেই এরূপ কথা উচ্চারিত হয় নাই। এই যে অন্ধ পতিভক্তি, ইহাতে আদর্শ হিসাবে যত বড়ই হউক, আর্টের দিক দিয়া এই চরিত্রটি বর্ণহীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ডক্টর সেনগুপ্ত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে যাইয়া বলিতেছেন, 'হিন্দুদের মধ্যে নারীর একনিষ্ঠ পতিভক্তির আদর্শ খুব গৌরব লাভ করিয়াছে ; ইহার মহিমা যুগে যুগে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সব আদর্শেরই আতিশয্যে তাহার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হয় এবং যাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি মহনীয় তাহারই অস্বাভাবিক অনুশীলন অপচারগ্রস্ত মনের পরিচয় দেয়।........মৃণালিনীর একনিষ্ঠ সতীত্ব ও পতিভক্তি........অতিশয় হাস্যোদ্দীপক।........যে একনিষ্ঠ ভক্তি কোন অবস্থায়ই এক চুল বিচলিত হয় না তাহা সজীব হৃদয়ের পরিচয় দেয় না। মনে হয় মৃণালিনী যেন কলের পুতুল ; একবার যখন দম দেওয়া হইয়াছে তখন আর কোন ব্যতিক্রম হইবে না।'[১] ডক্টর সেনগুপ্তের অভিমত বিরুদ্ধ

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ১১৯—২০ পৃঃ। ডক্টর সেনগুপ্ত প্রসঙ্গতঃ লক্ষহীরার কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষহীরার কাহিনীর সহিত মৃণালিনীর কাহিনীর মৌলিক প্রভেদ রহিয়াছে। লক্ষহীরার পতিভক্তি এমনই উৎকট যে, তিনি স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির চরিতার্থতার সক্রিয় সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং নৈতিক আদর্শের মাপ-কাঠিতেও তাঁহার আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে, মৃণালিনী স্বামীর দুর্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাকে লক্ষহীরার অবস্থায় পড়িতে হয় নাই ; অথবা অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে তিনি যে লক্ষহীরার ন্যায় আচরণ করিতেন এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই। অবশ্য ডক্টর সেনগুপ্ত এই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ; তাই লক্ষহীরার কাহিনীকে তিনি বলিয়াছেন 'বীভৎস' আর মৃণালিনীর কাহিনী তাঁহার বিবেচনায় 'হাস্যোদ্দীপক'।

সমালোচনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ। এক যুগে যে উপকরণ যে রসের সৃষ্টি করে, চিন্তা ও ভাবধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্ত্তী কোন যুগে সে উপকরণ যদি সে রসের যোগান না দেয়, তাহা হইলে তাহা লইয়া দুঃখ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না; কিন্তু সত্যই কি মৃণালিনীর 'একনিষ্ঠ সতীত্ব ও পতিভক্তি হাস্যোদ্দীপক?' এরূপ আত্মবিলোপকারী প্রেম ভাল কি মন্দ এবং সমাজ-জীবনে ইহার মূল্য কতটুকু, আজ তাহা বিচারের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু স্বামীর সত্তায় আত্মবিলোপ করিতে চরিত্রের যে দৃঢ়তার প্রয়োজন তাহা 'কলের পুতুলে' সম্ভব নহে এবং তাহার চিত্রও হয়ত আজিও অনেকের নিকট নিছক 'হাস্যোদ্দীপক' বিবেচিত হইবে না। মৃণালিনীর চরিত্রে যে চিরন্তন হিন্দু নারীচিত্তের প্রেরণা রহিয়াছে, শত বিপ্লব ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও হিন্দুর সংস্কার তাহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবে।

বিষবৃক্ষ

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। 'কপালকুণ্ডলা'য় গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যাত্রীদের এবং পরবর্ত্তীকালে কপালকুণ্ডলা ও শ্যামা-সুন্দরীর সংলাপের ভিতর দিয়া তৎকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের কিছুটা আভাস থাকিলেও উপন্যাসে এই সমাজচিত্রের স্থান নিতান্ত গৌণ। এবং যে সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র আখ্যায়িকা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাও কল্পিত সমস্যা, সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যা নহে। 'বিষবৃক্ষ' খাঁটি সামাজিক উপন্যাস। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর সুখদুঃখের চিত্র চিরন্তন মানব-জীবনেব একটি বিশিষ্ট দিকের চিত্র হইলেও, ইহা প্রধানতঃ বাঙ্গালীজীবনের সুখদুঃখের চিত্র। এবং নগেন্দ্রের তেমহলা বাড়ী[১] ও সেখানকার দৈনন্দিন কার্য্যতালিকা, মধ্যাহ্নের পর রসকলিকাটা বৈষ্ণবীকে ঘিরিয়া পুরমহিলাদের গানের ফরমাস, পরিচারিকায় পরিচারিকায় কলহ, পুরুষানুক্রমিক কলহের ফলে সড়িকি মামলায় দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তিনাশ এবং লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী অযোগ্য পাত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ, দেবেন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, সেখানে তারাচরণ কর্ত্তৃক সমাজ-সংস্কারবিষয়ক চুরি-করা প্রবন্ধ পাঠ, এমন কি অর্থলোভে চণ্ডাল কর্ত্তৃক বিষবড়ি বিক্রয়—এ সমস্তই বঙ্কিমের সমসাময়িক সমাজ-জীবনের চিত্র। এতদ্ব্যতীত এই উপন্যাসে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনেরও একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে।

বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া 'বিষবৃক্ষে'র সহিত পাঁচ বৎসরের

---

১ শচীশচন্দ্র বলেন: 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথের অট্টালিকার বর্ণনা পড়িলে মজিলপুরের দত্তবাবুদের অট্টালিকা মনে পড়ে। মজিলপুর পূর্ব্বে বারুইপুরের এলাকাভুক্ত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরে ছিলেন [১৮৬৪ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ১৮৬৭ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত, মাঝে অল্প দিনের জন্য ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হইয়াছিলেন এবং দেড়মাস ছুটিতে ছিলেন], তখন তিনি দত্তবাবুদের অট্টালিকা বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন। বঙ্কিম-জীবনী, ৪৪১ পৃঃ।

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন এই বর্ণনায় কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের গৃহদেবতা রাধাবল্লভজীর বাড়ীর ছায়া রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র—প্রথম ভাগ, ১৪-১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পরের উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নিকট-সম্বন্ধ রহিয়াছে। উভয় উপন্যাসেই বিষবৃক্ষের বিষময় ফল ফলিয়াছে। বহুগুণসম্পন্ন হইলেও নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল উভয়েরই চরিত্রে চিত্তসংযমের অভাব তাঁহাদের অধঃপতনের কারণ এবং উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্কিম অসংযমের শোচনীয় পরিণতি দেখাইয়াছেন। চরিত্রগত বহু বৈষম্য সত্ত্বেও রোহিণী যেমন গোবিন্দলাল-ভ্রমরের সুখের সংসারে, কুন্দ তেমনই নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর সুখের সংসারে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম আশাবাদী। উভয় উপন্যাসে তিনি অসংযমের কুফল দেখাইয়াছেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ইহা শেষ কথা নহে। অনুতপ্ত নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকে ফিরিয়া পাইলেন; গোবিন্দলালের অপরাধ গুরুতর এবং ভ্রমরও সূর্য্যমুখী নহে, সুতরাং পার্থিব জীবনে তিনি ভ্রমরকে পাইলেন না। কিন্তু ভ্রমরের অশরীরী আত্মার প্রেরণায় তিনি যে সম্পদের অধিকারী হইলেন তাহা 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর'। এইখানে একটি প্রশ্ন ওঠে: গোবিন্দলাল যেখানে গুরুতর অপরাধে অপরাধী, সেখানে তিনি শ্রেষ্ঠতর অপার্থিব সম্পদের অধিকারী হইলেন কেমন করিয়া? ইহার উত্তর এই যে, গোবিন্দলাল যতই অধঃপতিত হন, তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব ছিল না; তাই কঠিন আঘাতে তাঁহার জীবনের মোড় ফিরল। পক্ষান্তরে, নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল না; তাই সূর্য্যমুখীকে ফিরিয়া না পাইলে তাঁহার পক্ষে উন্মাদ হওয়া অসম্ভব ছিল না, হয়ত আত্মহত্যাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁহার পক্ষে সূর্য্যমুখীর অধিক যে সূর্য্যমুখী তাঁহার সন্ধানে ব্রতী হওয়া সম্ভব হইত না।

'মৃণালিনী'র ন্যায় 'বিষবৃক্ষে'ও দুইটি কাহিনী রহিয়াছে: এক, নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী-কুন্দ কাহিনী, ইহা প্রধান আখ্যায়িকা; দুই, দেবেন্দ্র-হীরা কাহিনী, ইহা গৌণ। আখ্যায়িকাদ্বয় শুধু পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত নহে, ইহারা একে অপরের উপব আলোকপাত করে। অঙ্কনকৌশলে বঙ্কিম আর শিক্ষানবিশ নহেন।

প্রধান আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশের জন্য দেবেন্দ্র ও হীরা অপরিহার্য্য। নগেন্দ্র কুন্দের রূপে আকৃষ্ট হইলেও তিনি গোবিন্দলাল নহেন, অথবা কুন্দও রোহিণী নহে। সুতরাং অবৈধ উপায়ে লালসাতৃপ্তি তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। এবং দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নগেন্দ্র কুন্দের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেও সূর্য্যমুখীর প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া কুন্দ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এ অবস্থায় কমলমণি যদি পরিকল্পনানুযায়ী কুন্দকে কলিকাতা লইয়া যাইতে পারিতেন তাহা হইলে হয়ত আখ্যায়িকার মোড় ফিরিতে পারিত। কিন্তু

হরিদাসী বৈষ্ণবীরূপী দেবেন্দ্রনাথ গোল বাধাইলেন। হীরার সফল দৌত্যের ফলে সূর্য্যমুখী যখন তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইলেন তখন স্বভাবতঃই তিনি কুন্দের চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন। অভিমানিনী কুন্দ গৃহত্যাগ করিল এবং ইহারই সুযোগ লইয়া চতুরা হীরা যখন নগেন্দ্রকে সূর্য্যমুখীর প্রতি বিরূপ করিবার চক্রান্ত করিল, তখন সে যেমনটি আশা করিয়াছিল ঠিক তেমনটি না ঘটিলেও, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। এবং সহজ অবস্থায় সূর্য্যমুখীর পক্ষে যাহা অসম্ভব ছিল, তিনি স্বেচ্ছায় তাহাই করিলেন, স্বামীর সহিত কুন্দের বিবাহ দিলেন। এইরূপে দেবেন্দ্র ও হীরা মূল কাহিনীকে প্রভাবিত করিল।

নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী-কুন্দ কাহিনীর উপর হীরার (এবং পরোক্ষে দেবেন্দ্রের) প্রভাবের এইখানেই শেষ নহে। দুঃখের দিনে কুন্দ যখন মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিল প্রতিহিংসাপরায়ণা হীরা তখন কপট সহানুভূতির ছলে তাহার নিকট আত্মহত্যার ইঙ্গিত করিয়া কৌশলে তাহার নিকট আত্মহত্যার উপকরণ রাখিয়া গেল। দেবেন্দ্রের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে যাইয়া হীরা কুন্দের মৃত্যুর কারণ হইল।

এইরূপ, নিজেদের অজ্ঞাতসারে হইলেও দেবেন্দ্র-হীরা কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন সূর্য্যমুখী এবং কুন্দ। সূর্য্যমুখীর দৌত্য করিতে যাইয়া হীরা দেবেন্দ্রের নিকট ধরা পড়িল, তাঁহার রূপে মজিল। এইখানেই দেবেন্দ্র-হীরা কাহিনীর সূত্রপাত। কুন্দের ভূমিকা স্বতন্ত্র প্রকারের। দেবেন্দ্র ও হীরা পরস্পরের জীবনে অভিসম্পাতস্বরূপ, এবং কুন্দ না জানিলেও তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ইঁহাদের দানবীয় লড়াই। কুন্দ হইতেই উভয় আখ্যায়িকায় জটিলতার সৃষ্টি এবং প্রধানতঃ কুন্দই ইহাদের যোগসূত্র।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও উভয় কাহিনীর যোগাযোগ রহিয়াছে। বঙ্কিম লিখিয়াছেন, 'ক্ষেত্রভেদে, বিষবৃক্ষে নানা ফল ফলে। পাত্রবিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগশোকাদি নানাবিধ ফল।' বিষবৃক্ষের বিষময় ফলের প্রকারভেদ দেখাইবার জন্যই বঙ্কিম দুইটি বিভিন্ন কাহিনীর পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিবার ফলে কাহিনীর পরিবেশনে আর্টের দিক দিয়া একটি অপরিহার্য্য ত্রুটি লক্ষিত হয়। কুন্দের মৃত্যুতেই প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ; কিন্তু গৌণ আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকার জীবনে বিষবৃক্ষের পরিণতি দেখাইবার জন্য বঙ্কিম 'সমাপ্তি'তে ইহার জের টানিয়াছেন। কিন্তু হীরার উন্মত্ততা এবং মৃত্যুকালে দেবেন্দ্রের বিভীষিকাদর্শন নীতিবিদের আলোচনার বিষয় হইতে পারে ; শিল্পীর দৃষ্টিতে এই কাহিনীর বিশেষ কোন

মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

'বিষবৃক্ষে' প্রকৃতির বিধানে অলঙ্ঘনীয় প্রতিশোধবিধির প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সূর্য্যমুখীর অকারণ তিরস্কারে কুন্দকে গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে, ফলে কুন্দকেই গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সূর্য্যমুখীকে গৃহত্যাগ করিতে হইল। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে নির্ম্মম আঘাত দিয়া বলিয়াছেন, কুন্দের সন্ধানে তিনি দেশদেশান্তরে ঘুরিবেন; তাঁহাকে দেশদেশান্তরে ঘুরিতে হইল সত্য, কিন্তু কুন্দের সন্ধানে নহে, সূর্য্যমুখীরই সন্ধানে। আবার সূর্য্যমুখী যেমন চক্ষের জলে সঙ্কল্প করিলেন কুন্দকে ফিরিয়া পাইলে তাহারই হাতে স্বামীকে সঁপিয়া দিয়া সংসার হইতে বিদায় লইবেন, কুন্দকেও তেমনই চক্ষের জলে সঙ্কল্প করিতে হইলে, সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জিনিষ তাহাকেই প্রত্যর্পণ করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইবে। এইরূপ, হীরার জীবনেও এই প্রতিশোধবিধির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। হীরা যেমন নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর প্রণয়-নীড়ে ভাঙ্গন ধরাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তেমনই প্রণয় হইতেই তাহার চরম শাস্তি আসিল।

পত্রমাধ্যম উপন্যাস (epistolary novel) না হইলেও 'বিষবৃক্ষে' অনেকগুলি পত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অবশ্য অন্যান্য উপন্যাসেও বঙ্কিম কোন কোন স্থলে পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। কোন পত্রে অতীতের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে (যেমন জগৎসিংহের নিকট বিমলার পত্র), কোন পত্র বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে কাহিনীকে, তথা নায়ক নায়িকার অদৃষ্টকে প্রভাবিত করিয়াছে (যেমন কপালকুণ্ডলার নিকট ব্রাহ্মণবেশীর পত্র, গোবিন্দলালের নিকট ভ্রমরের প্রথম পত্র, চঞ্চলকুমারীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পত্র); কিন্তু অপর কোন উপন্যাসে পত্রের এমন বহুল প্রয়োগ নাই। শ্রীশচন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের[১] নিকট নগেন্দ্রনাথের পত্র এবং কমলমণির নিকট লিখিত সূর্য্যমুখীর পত্র যেমন আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশের সহায়ক, তেমনই বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে নায়ক নায়িকার মনোভাবের নির্দ্দেশক। (গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের পরস্পরের নিকট লিখিত পত্র তুলনীয়)। নগেন্দ্রের নিকট হরদেব ঘোষালের পত্র স্বতন্ত্র

১ ৺ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন: 'তাঁহার [বঙ্কিমের] একজন প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। ইনি "পণ্ডিতাগ্রণী কাব্যামোদী" ৺জগদীশ নাথ রায়। ....এই জগদীশবাবুই "বিষবৃক্ষের" 'হরদেব ঘোষালে' কল্পিত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের ন্যায় বঙ্কিমবাবু ও জগদীশবাবুর চিঠিপত্র চলিত।' 'বঙ্কিমবাবু'—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ। ২৭৮-৭৯ পৃঃ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'বন্ধুত্ব এবং স্নেহের চিহ্নস্বরূপ' বঙ্কিম এই 'সুহৃদ্বরকে'ই উপন্যাসখানি উৎসর্গ করিয়াছেন।

পর্য্যায়ের। নগেন্দ্রের এই অকৃত্রিম সুহৃদ্‌কে আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাই না। কিন্তু তাঁহার পত্রের ভিতর দিয়া মানবচরিত্রাভিজ্ঞ গম্ভীরপ্রকৃতি হরদেব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার একখানি পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পত্রখানি সূর্য্যমুখীর পলায়নের পর অনুতপ্ত নগেন্দ্র তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার উত্তর। গল্পাংশের ক্রমবিকাশে ইহার (বা হরদেব ঘোষালের অপর পত্রের) কোন মূল্য নাই, কিন্তু দূরে থাকিয়াও তিনি নগেন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থার যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সময়োপযোগী যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। হরদেব আখ্যায়িকায় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই অথবা তাঁহার উপদেশও নগেন্দ্রনাথের জীবনে ফলপ্রসূ হয় নাই। তিনি দূরদর্শী দর্শকমাত্র। এই হিসাবে তাঁহার ভূমিকা কতকটা গ্রীক ট্র্যাজেডির কোরাসের অনুরূপ। হরদেব ঘোষাল রূপজ মোহ ও গুণজনিত প্রণয়ের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা তাঁহার দার্শনিক মনের পরিচয় দেয়। উত্তরকালে 'ধর্ম্মতত্ত্বে' গুরুর কণ্ঠে আমরা অনুরূপ বাণী শুনিতে পাই।

আখ্যায়িকার পরিবেশনে কোন কোন বিষয়ে 'কপালকুণ্ডলা'র সহিত আলোচ্য উপন্যাসের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উভয় উপন্যাসেই আখ্যায়িকার সহিত বহিঃপ্রকৃতির যোগাযোগ সুস্পষ্ট। 'কপালকুণ্ডলা'য় এই যোগাযোগ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। 'বিষবৃক্ষে' আখ্যায়িকার প্রারম্ভে প্রকৃতির বিপ্লব যেন নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী-কুন্দের জীবনে আসন্ন বিপ্লবের পূর্ব্বাভাস। প্রকৃতির বিপ্লবের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে কুড়াইয়া পাইলেন; প্রকৃতির বিপ্লবের প্রাক্কালে কুন্দ দত্তগৃহের আশ্রয় ত্যাগ করিল; পরিশেষে এক ঝড়ের রাত্রির অবসানে মৃত্যুর হিমক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কুন্দ যেমন জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করিল, তেমনই সেই একই ঝড়ের রাত্রির অবসানেই নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকে ফিরিয়া পাইলেন। প্রকৃতির বিপ্লবে যে পারিবারিক বিপ্লবের সূচনা, প্রকৃতির বিপ্লবান্তে তাহার নিবৃত্তি।

'কপালকুণ্ডলা'য় দেবীর পাদমূল হইতে বিল্বপত্র পতনের ন্যায় আলোচ্য উপন্যাসে কুন্দের স্বপ্ন প্রারম্ভেই অলৌকিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। কুন্দের স্বপ্ন কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের অনুরূপ, অথবা কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন হইতেও অধিকতর নিশ্চিতরূপে অতিপ্রাকৃত। যে অবস্থায় সে মৃত মাতাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইল, সে অবস্থায় মৃত মাতার স্বপ্নদর্শন অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু এই স্বপ্নের বিষয়বস্তুর আলোচনা করিলে ইহার কোনরূপ প্রাকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। স্বপ্নদৃষ্ট মাতা যখন তাহার বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যতের

দুঃখের উল্লেখ করিয়া কুন্দকে নক্ষত্রলোকে আহ্বান করিতেছেন, তখন তাঁহার এই সতর্ক আহ্বানবাণী হয়ত কুন্দের তৎকালীন আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনিমাত্র। কিন্তু ইহার পরেই দেখিতে পাই কুন্দের মাতা অঙ্গুলিসঙ্কেতে 'এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি' এবং 'এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশনয়নী' নারীমূর্ত্তি দেখাইয়া তাহাকে বলিতেছেন, 'ইহার দেবকান্ত রূপ দেখিয়া ভলিও না। ইনি মহদাশয় হইলেও, তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধরবোধে ইহাকে ত্যাগ করিও', এবং 'এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।' স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ ও নারী যথাক্রমে নগেন্দ্রনাথ ও হীরা। বালিকা কুন্দ তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ করে নাই, সুতরাং তাহার পক্ষে তাঁহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভব নহে। কুন্দের রোমাঞ্চকর স্বপ্ন নিঃসন্দেহ অতিপ্রাকৃত।

আর একদিন কুন্দ স্বপ্নে তাহার মাতাকে দেখিতে পাইল। সেদিন তাহার দুঃখের পাত্র পূর্ণ হইয়াছে, সেদিন সে মরিতেই চাহে। সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া দীর্ঘদিন বিদেশবাসের পর নগেন্দ্র যেদিন গৃহে ফিরিলেন, সেদিন কুন্দ তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইয়া সারারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রভাতকালে তন্দ্রার ঘোরে মাতাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইল। এবার তিনি একক নহেন, তাঁহার পার্শ্বে 'অন্ধকার মধ্যে এক মনুষ্যমূর্ত্তি অল্প অল্প হাসিতেছে।........কুন্দ সভয়ে দেখিল যে, ঐ হাস্যনিরত বদনমণ্ডল, হীরার মুখানুরূপ।' এস্থলেও হীরাকে 'হাস্যনিরত' দেখিতে পাওয়ার কোন স্বাভাবিক ব্যাখ্যা সম্ভব নহে, কারণ তাহার দুঃখেই যে হীরার আনন্দ এবং ইহাই যে তাহার চক্ষে বিজয়চিহ্নস্বরূপ সরলা কুন্দ তাহা জানে না। বস্তুতঃ, কুন্দের মাতা প্রথম স্বপ্নে তাহাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন দ্বিতীয় স্বপ্নে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন এবং একথা তিনি কুন্দকে স্পষ্টই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন: 'বলিয়াছিলাম আর একবার আসিব; তাই আবার আসিলাম।' সুতরাং কুন্দের দ্বিতীয় স্বপ্ন প্রথম স্বপ্নের জের এবং একই পর্য্যায়ের। তাহার স্বপ্নদ্বয় এই সত্যের উপরই জোর দিতেছে যে, কপালকুণ্ডলার ন্যায় কুন্দও ভাগ্যদেবতার চিহ্নিত বলি। এবং 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিম যেমন আখ্যায়িকার মাঝখানে শ্যামাসুন্দরীর সহিত নায়িকার সংলাপের ভিতর দিয়া কৌশলে পাঠককে বিল্বপত্রপতনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, আলোচ্য উপন্যাসেও সেইরূপ দেখিতে পাই যে, কুন্দের জীবনের এক বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে, যখন সে দীঘির শীতল জলে জীবনের জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছে, তখন সহসা তাহার ভুলিয়া-যাওয়া

স্বপ্নের কথা স্মরণে আসিল। এইরূপে বঙ্কিম কুন্দের মারফত তাহার অদৃষ্ট-দেবতার প্রতি পুনরায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।[১]

কিন্তু কপালকুণ্ডলার জীবনের এক বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে তাঁহার স্বপ্ন তাঁহাকে যেভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, কুন্দের কার্য্যের উপর তাহার স্বপ্নের সেরূপ কোন প্রভাব নাই। এমন কি, তাহার প্রথম স্বপ্ন পরোক্ষেও তাহাকে প্রভাবিত করে নাই এবং আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশেও ইহার কোন ভূমিকা নাই। নিছক অতিপ্রাকৃতের পরিবেশনের জন্য এরূপ স্বপ্নের আমদানি আর্টের বিচারে সমর্থনযোগ্য নহে। তবে তাহার দ্বিতীয় স্বপ্ন সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া কুন্দ যখন মৃত্যুকামনা করিয়াছে, স্বপ্ন তাহার সেই কামনাকে দৃঢ় করিয়াছে।

কুন্দ ও কপালকুণ্ডলা উভয়েই যেমন ভাগ্যহতা, তেমন এক হিসাবে কুন্দের অদৃষ্ট কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টের অনুরূপ। কপালকুণ্ডলাকে রক্ষা করিতে যাইয়া নবকুমার যে গ্রন্থিবন্ধন করিলেন, কপালকুণ্ডলার মৃত্যুতে তাহা উন্মোচিত হইল; কুন্দকে আশ্রয় দান করিয়া নগেন্দ্র যে গ্রন্থিবন্ধন করিলেন, কুন্দ তাহার জীবন বিসর্জ্জন দিয়া তাহা উন্মোচন করিল। বঙ্কিম কপালকুণ্ডলাকে পতঙ্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কুন্দকে তিনি পতঙ্গের সহিত তুলনা না করিলেও, গভীর রাত্রে তাহার গৃহত্যাগের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বদ্ধ গবাক্ষের প্রতি ধাবমান 'পতঙ্গজাতি'র এবং 'কাচে ঠেকিয়া' তাহাদের ফিরিয়া আসার যে সঙ্কেতপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে যেমন কুন্দের তৎকালীন মানসিক অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমনই এই বৃহত্তর সত্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, কুন্দ-পতঙ্গের নিকট নগেন্দ্র আজ বদ্ধ গবাক্ষের অন্তরালে আলোকশিখার ন্যায় অপ্রাপনীয় হইলেও যেদিন সে তাহার স্পর্শ লাভ করিবে, সেদিন সে স্পর্শে সে বহ্নিমুখে পতঙ্গের মতই পুড়িয়া মরিবে।

'বিষবৃক্ষে'র সুপরিসর চিত্রপট চরিত্রচিত্রে পরিপূর্ণ; অথচ কোন চরিত্রই অপ্রয়োজনীয় বা উদ্দেশ্যবিহীন নহে এবং কোন চরিত্রকেই প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। অতি সাধারণ চরিত্রের মধ্যে হীরার আয়ি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। হীরার আয়ি হীরার 'ইষ্টিরসের' ব্যাধির জন্য

১ ইহা শেক্স্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডিতে অনুসৃত অঙ্কনরীতি স্মরণ করাইয়া দেয়। যে শক্তি বাহির হইতে নায়ককে মৃত্যুর দিকে টানিয়া নেয়, শেক্স্‌পীয়ারের প্রত্যেক ট্র্যাজেডিতেই আমরা তাহাকে একবার প্রথম দৃশ্যে, পরে পুনরায় আখ্যায়িকার মাঝের দিকে দেখিতে পাই।

ডাক্তারের নিকট 'কেষ্টরস' সংগ্রহ করিতে যাইয়া যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিল, চারিদিকের ঘনান্ধকার দুর্য্যোগের মধ্যে তাহা এক ঝলক সূর্য্যকিরণের মত উপভোগ্য। অধিকন্তু বৃদ্ধার মুখে এই প্রসঙ্গে হীরা গর্ভে থাকাকালীন তাহার মাতার উন্মাদরোগের উল্লেখ অদূর ভবিষ্যতে হীরার পাপের ভয়াবহ পরিণতির জন্য পূর্ব্বাহ্ন-প্রস্তুতি হিসাবে লক্ষণীয়।

'বিষবৃক্ষ' করুণরসাত্মক উপন্যাস হইলেও শুধু হীরার আয়ির চরিত্রের পরিকল্পনায় নহে, অন্য উপায়েও বঙ্কিম বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে হৃদয়বিদারক করুণ ঘটনাবলীর ফাঁকে ফাঁকে হাস্যরসের যোগান দিয়া পাঠকের হৃদয়াবেগ শমিত করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর শোকে নগেন্দ্রের বিদেশ যাত্রার পরে হীরার চক্রান্তে অভিসারক দেবেন্দ্রের 'দোবে, চোবে, পাঁড়ে এবং ভেওয়ারি' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইবার কাহিনী ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। অথচ এই কাহিনীটি নিছক হালকা রসের পরিবেশনের জন্যই পরিকল্পিত হয় নাই ; পরন্তু হীরার জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া অতি ভয়াবহ। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমান সতীশচন্দ্রের শিশুমুখের হাসি যেমন পাঠকের হৃদয়াবেগ শমিত করে, তেমনই বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুণে চারিদিকের বিষাদের ছবি স্ফুটতর করিয়া তোলে।

৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় (ইনি ঘনিষ্ঠভাবে বঙ্কিমের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন) লিখিয়াছেন, 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হইলে কেহ কেহ মনে করেন, এই উপন্যাসে বঙ্কিমের 'নিজের জীবনের একটা ছবি আছে।' বঙ্কিমকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি ইহা স্বীকার করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে মন্তব্য করেন যে, 'আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হয়েছে।'[১] একই প্রবন্ধে বঙ্কিমের জীবনে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীর প্রভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমের উক্তির উদ্ধৃতি এইরূপ : 'আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের।........তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম প্রমাদ তিনি জানেন, আর আমি জানি।'[২] বঙ্কিমের জীবনের এই অবিশ্রান্ত সংগ্রামের ইতিহাস আজ হয়ত জানিবার উপায় নাই ; নহিলে তাহা হয়ত তাঁহার উপন্যাস-সৃষ্টির উপর নূতন আলোকপাত করিত। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, নগেন্দ্র (ও গোবিন্দলালের) ন্যায় বঙ্কিম মার্জ্জিতরুচি ও সৌন্দর্য্য-প্রিয় ছিলেন। নগেন্দ্রের ন্যায় তিনি বন্ধুবৎসল ছিলেন। এবং সূর্য্যমুখী আর ইহজগতে নাই এই সংবাদ শ্রবণে নগেন্দ্রের শোক প্রথমা পত্নী মোহিনী

১-২ ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ ১ম প্রস্তাব'—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ১৯৪—৯৫ পৃঃ।

দেবীর মৃত্যুতে বঙ্কিমের শোক স্মরণ করাইয়া দেয়।[১] এবং নগেন্দ্রের চরিত্রে যেমন বঙ্কিমের, সূর্য্যমুখীর চরিত্রেও তেমনই বঙ্কিমপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীর কিছুটা ছায়া পড়িয়াছে ; সূর্য্যমুখীর ন্যায় রাজলক্ষ্মী দেবীও রাসভারী ছিলেন।[২]

নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর গার্হস্থ্যজীবনের প্রচ্ছদপট হিসাবে বঙ্কিম এক দিকে সৃষ্টি করিয়াছেন সতীশচন্দ্রকে লইয়া শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির সুখের সংসার, অন্যদিকে সৃষ্ট করিয়াছেন হৈমবতীর দুর্ব্যবহারের ফলে দেবেন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খল জীবন। শ্রীশচন্দ্র 'পুণ্ডর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি' হইলেও সওদাগরী আফিসের নীরস বিষয়কর্ম্ম তাঁহার স্বাভাবিক পরিহাসপটুত্ব নষ্ট করিতে পারে নাই। বিষয়কর্ম্মের অবসরে কমলমণির সহিত তাঁহার লঘু হাস্য-পরিহাস, 'বাদলের বৃষ্টির মত' ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাদের 'সন্ধিবিগ্রহ', সর্ব্বোপরি শ্রীমান সতীশচন্দ্রের অপূর্ব্ব মধ্যস্থতা শ্রীশচন্দ্রের গৃহখানিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। পতি পত্নীতে যখন নিত্য নব প্রেমের দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে, সতীশচন্দ্র সম্মুখে বসিয়া কখন সংবাদপত্র ভোজনের চেষ্টা করেন, কখন পিতার 'সুবর্ণময় পেন্‌সিল্‌টি' ভোজ্য বিবেচনা করিয়া লেহন করিতে প্রবৃত্ত হন, কখন ফুল সমেত ফুলদানি উল্টাইয়া দেন। এবং শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণি যখন পরস্পরের প্রতি 'অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র' নিক্ষেপ করেন, কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণের মত সতীশচন্দ্র তখন 'মহাস্ত্র সকল' আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া 'যুদ্ধের শমতা' আনেন। এক কথায়, শ্রীমান সতীশচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির প্রেমের বন্ধন নিবিড়তর করিয়াছে। ঠিক এইখানেই নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর সংসারের অপূর্ণতা। সূর্য্যমুখী যদি স্বামীকে একটি শিশু নগেন্দ্রনাথ বা শিশু সূর্য্যমুখী উপহার দিতে পারিতেন তাহা হইলে কুন্দ কখনও তাঁহাদের সুখের সংসারে ভাঙ্গন ধরাইতে পারিত না, শ্রীমান সতীশচন্দ্রের চরিত্রের পরিকল্পনা দ্বারা বঙ্কিম এই সহজ সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। এবং আর্টের দিক দিয়া এইখানেই এই চরিত্রটির বিশেষ সার্থকতা। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে আত্মপ্রবঞ্চনা হইলেও, কুন্দকে বিবাহ করার পূর্ব্বে শ্রীশচন্দ্রের নিকট লিখিত পত্রে নগেন্দ্রনাথ বিবাহের সমর্থনে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি এই যে, তিনি নিঃসন্তান।

দেবেন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খল জীবন শ্রীশচন্দ্রের এবং কুন্দ আসিয়া তাঁহার সংসারে ভাঙ্গন ধরাইবার পূর্ব্বে নগেন্দ্রনাথের গার্হস্থ্যজীবনের বিপরীত চিত্র। কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে পারিবারিক ইতিহাস রহিয়াছে তাহা অতীব করুণ ;

১ ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম খণ্ড', ২০৯—১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২ ঐ, ২১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীশচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ গুণবতী ভার্য্যার নিকট যে সাংসারিক সুখ পাইয়াছেন দেবেন্দ্রনাথ সে সুখে বঞ্চিত। আমরা আখ্যায়িকায় তাঁহার পত্নী হৈমবতীকে প্রত্যক্ষ করি না, কিন্তু তাহার কার্য্যের ফলাফল প্রত্যক্ষ করি। বঙ্কিম লিখিয়াছেন, 'হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা। যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক।........কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল......... বয়োগুণে তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা ত নিবারণ হইল না। বয়োগুণে দাম্পত্যপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিল—কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হৈমবতীকে দেখিবামাত্র সে আকাঙ্ক্ষা দূর হইত।' নিরানন্দ গৃহের শ্বাসরোধকারী আবেষ্টন হইতে মুক্তিলাভের আশায় এবং গৃহে যে আনন্দ পাইলেন না তাহাই খুঁজিতে যাইয়া দেবেন্দ্র আকণ্ঠ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইলেন। বড় দুঃখেই তিনি একমাত্র সুহৃদ্ সুরেন্দ্রকে বলিতেছেন, "যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ কর্ণে শুনি—তবে মদ ছাড়িব। নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।"

দেবেন্দ্রের কথা বলিতে যাইয়া সুরেন্দ্রের সম্বন্ধে দু'একটি কথা না বলিলে এই সর্বগুণান্বিত 'সুশীতলকান্তি' যুবকের প্রতি অবিচার করা হইবে। সুরেন্দ্র যেন দেবেন্দ্রের বিবেকের বহিঃপ্রকাশ। তাঁহাকে আমরা দুইবারমাত্র দেখিতে পাই। একবার দেখিতে পাই নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে দেবেন্দ্রের বৈষ্ণবী-বেশে অভিযানের অব্যবহিত পরে। সুরেন্দ্র তাঁহার নূতন কু-অভিসন্ধির বিষয় অবগত নহেন; তথাপি তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহাকে মদ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবেন্দ্র তাঁহার হিতবাণী অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু তাঁহার 'চক্ষে জল আসিল।' দেবেন্দ্র পশুবৎ আচরণ করিতেছেন, কিন্তু আজিও বিবেক তাঁহাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই। প্রত্যাখান করিলেও সুরেন্দ্রের উপদেশ, তাঁহার ভালবাসা তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। দ্বিতীয়বার যখন সুরেন্দ্রকে দেখিতে পাই, তখন তিনি বন্ধুর ঘৃণ ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়াছেন, তিনি কঠোর কণ্ঠে বলিতেছেন, "তুমি যদি এই দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ না করিবে—তুমি যদি সে পথে আর যাইবে—তবে আমার সঙ্গে তোমার আলাপ এই পর্য্যন্ত বন্ধ। আমিও তোমার শত্রু হইব।' এ যেন পরাভূত বিবেকের শেষ সতর্কবাণী। বন্ধুবিচ্ছেদে ক্ষুণ্ণ হইলেও এবার আর দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল না। তিনি সুরার আশ্রয় লইয়া বন্ধুকে ভুলিলেন। ইহার পরে প্রতিশোধ লইতে যাইয়া তিনি যখন হীরার চর সর্ব্বনাশ করিলেন, তখন কাহারও নিষেধবাণী তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল না

দেবেন্দ্রের বিবেকের কণ্ঠরোধ হইয়াছে, সুরেন্দ্রের সহিত তাঁহার চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে।

দেবেন্দ্রের অধঃপতনের ইতিহাসে কোথাও কোন জটিলতা নাই। পারিবারিক জীবনের ব্যর্থতার সহিত অসংযত চিত্তবৃত্তির যোগাযোগ তাঁহার অধঃপতনের কারণ। কিন্তু দেবেন্দ্রের অধঃপতনের সমশ্রেণীয় না হইলেও, সূর্য্যমুখীর ন্যায় পতিব্রতা পত্নীর সাহচর্য্য লাভ করিয়াও নগেন্দ্রের অধঃপতন হইল কেন? প্রকৃতপক্ষে নগেন্দ্রের চরিত্রের আলোচনায় মুখ্যতঃ ইহাই বিচার্য্য বিষয়।

নগেন্দ্র রূপবান ও গুণবান। কিন্তু রূপতৃষা তাঁহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা; এবং নঞর্থকভাবে, চিত্তসংযমের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তিনি সে শিক্ষা লাভ করেন নাই। সুতরাং কুন্দের রূপ যেমন সহজেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল, তেমন চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও তিনি সফলকাম হইলেন না। ইহাই তাঁহার অধঃপতনের মূল কথা।

কুন্দকে কুড়াইয়া পাইবার অব্যবহিত পরেই নগেন্দ্রনাথ বন্ধু হরদেব ঘোষালের নিকট যে পত্র লিখিলেন তাহাতেই তাঁহার চরিত্রগত দুর্ব্বলতার প্রথম আভাস পাই। কুন্দের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন, "বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু........আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই,........আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয়,........কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী তাহা নহে।........অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।" অবশ্য, নগেন্দ্রের মনে কোন পাপ নাই; থাকিলে তিনি এরূপ অসঙ্কোচে কুন্দের রূপের 'মোহিনীশক্তি' বর্ণনা করিতে পারিতেন না, অথবা ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বন্ধুর সহিত যে হালকা পরিহাস করিলেন ('তুমি আমার মতিস্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে' ইত্যাদি), তাহা সম্ভব হইত না। কিন্তু এস্থলে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। একই সময় নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকেও এক পত্র লিখিলেন। সে পত্রে কি লিখিত ছিল, বঙ্কিম তাহার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু মনে হয় বন্ধুর নিকট তিনি যেমন খোলাখুলিভাবে কুন্দের রূপের আকর্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন, এ পত্রে সেরূপ করেন নাই। করিলে, পত্রোত্তরে (৫।-) সূর্য্যমুখী কুন্দকে লইয়া স্বামীর সহিত যে রহস্য করিয়াছেন (এই পত্রের শেষ ছত্রে যে নাটকীয় শ্লেষ রহিয়াছে, তাহা মর্ম্মান্তিক) তাহাতে নগেন্দ্রের সৌন্দর্য্যপূজার উল্লেখপূর্ব্বক হয়ত একটুকু

অতিরিক্ত খোঁচা থাকিত। এই অনুমান সত্য হইলে আপনার অজ্ঞাতসারে হইলেও নগেন্দ্র জীবনে এই প্রথম সূর্য্যমুখীর নিকট আত্মগোপন করিলেন। এবং ইহাই তাঁহার অধঃপতনের পূর্ব্বাভাস।

হরদেব ঘোষালের নিকট লিখিত পত্রে যে রূপজমোহের আভাস রহিয়াছে, অনুকূল প্রতিবেশে তাহা কেমন করিয়া নগেন্দ্রনাথকে অভিভূত করিল, কুন্দের বৈধব্যের কয়েক মাস পরের লেখা কমলমণির নিকট সূর্য্যমুখীর পত্রে (১১।–) আমরা তাহার পূর্ণ পরিচয় পাই। এই পত্রের পরিকল্পনা সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। যাহা অপরের চক্ষে ধরা পড়িবে না তাহা যে সর্ব্বাগ্রে পতিব্রতা সূর্য্যমুখীর চক্ষে ধরা পড়িবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কমলমণি যদি তৎকালে সূর্য্যমুখীর নিকট উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে পত্রের অভিযোগ তিনি যেমন হালকাভাবে উড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, বাচনিক উক্তি এবং সেই সঙ্গে চাক্ষুষ প্রমাণকে তিনি কখনও সেরূপ সহজে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। এবং তাহা হইলে সময় থাকিতেই তিনি কুন্দকে নগেন্দ্রের চক্ষের অন্তরাল করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু দূরে থাকিয়া তিনি পত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। পরে যখন তাঁহার টনক নড়িল, তখন ব্যাধি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

সূর্য্যমুখীর পত্রে নগেন্দ্রনাথের আচরণের খুঁটিনাটির যে বিশ্লেষণ রহিয়াছে তাহা যেমন তাঁহার দুর্ব্বলতার, তেমনই সেই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রামের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই পত্রে তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্বের যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহা ছাড়া তাঁহার আচরণে কোথাও সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের নিদর্শন নাই। নগেন্দ্রকে আমরা যে রূপে দেখিতে পাই তাহাতে তিনি স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় প্রবৃত্তির বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রবৃত্তির অনিবার্য্যতা দর্শিত হইলেও এই চরিত্রটি ব্যক্তিত্ববর্জ্জিত[১] ও বর্ণহীন হইয়া পড়িয়াছে।

সূর্য্যমুখীর পত্রে পাঠক যখন নগেন্দ্রের চরিত্রের পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন পর পর কয়েকটি ঘটনার ভিতর দিয়া বঙ্কিম তাঁহার দ্রুত পরিবর্ত্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১২।–)। কিন্তু অন্যদিকে চরিত্রের যতই পরিবর্ত্তন হউক না কেন, এখনও কুন্দের সম্পর্কে লজ্জার আবরণ রহিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস। কমলমণি

১ নগেন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিত্ববর্জ্জিত বঙ্কিম উপন্যাসের প্রথমেই তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। ঝড়ের সূচনায় তাঁহার চিন্তার ধারা পত্নীপ্রীতির নিদর্শন হইলেও, এক হিসাবে ইহা আত্মপ্রত্যয়ের অভাবের সাক্ষ্য দেয়।

যখন ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ এবং কুন্দের কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন, তখন ইহারই প্রতিক্রিয়ায় নগেন্দ্রের সংযমের বাঁধ ঘুচিল। এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তিনি কুন্দের নিকট প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। প্রত্যাখ্যাত হইলেও নগেন্দ্রনাথ অধঃপতনের এক ধাপ নীচে নামিলেন।

কিন্তু এখনও সূর্য্যমুখীর নিকট সঙ্কোচ রহিয়াছে। কুন্দের পলায়নের পর হীরার চক্রান্তে নগেন্দ্র যখন সূর্য্যমুখীকেই তাহার গৃহত্যাগের জন্য দায়ী মনে করিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিতে আসিলেন (২১।--), তখন এই সঙ্কোচের প্রাচীরও ধ্বসিয়া পড়িল। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর এই সময়ের সাক্ষাৎকার উভয়ের জীবনে একটি বিশিষ্ট ঘটনা এবং উভয়ের জীবনেই ইহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর নিকট কোন কথাই গোপন করিলেন না; কিন্তু সূর্য্যমুখীকে প্রবঞ্চনা না করিলেও তিনি ঘোরতর আত্মপ্রবঞ্চনা করিলেন। তিনি বলিতেছেন, কুন্দের সন্ধানে তিনি দেশদেশান্তরে ফিরিবেন এবং যদি কখনও কুন্দকে ভুলিতে পারেন, তবেই দেশে ফিরিবেন, নচেৎ তাঁহাতে সূর্যমুখীতে 'এই সাক্ষাৎ'। প্রথম উক্তিটি কুন্দের প্রেমোন্মত্ত নগেন্দ্রনাথের এবং দ্বিতীয় উক্তিটি সূর্য্যমুখীর প্রতি অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে সচেতন নগেন্দ্রনাথের। অসংযত প্রবৃত্তি যদি তাঁহার বিচার বুদ্ধি আচ্ছন্ন না করিত তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন কুন্দের সন্ধানের সুব্যবস্থা করা তাঁহার কর্ত্তব্য হইলেও, তিনি যদি সত্যই তাহাকে ভুলিতে চাহেন, তাহা হইলে দেশদেশান্তরে স্বয়ং তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ান তাহার পথ নহে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ আত্মপ্রবঞ্চনা করিলেও (অবশ্য জ্ঞাতসারে নহে), তাঁহার এই সঙ্কল্প সূর্য্যমুখীকে কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিল। তিনি স্বামীর নিকট এক মাসের সময় ভিক্ষা করিলেন এবং কুন্দ যখন ফিরিয়া আসিল তখন স্বামীর সুখের জন্য তিনি তাহারই হাতে স্বামীকে তুলিয়া দিলেন। নগেন্দ্র যতই অধঃপতিত হউন, তিনি সাময়িক উত্তেজনায় কুন্দের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিলেও সূর্য্যমুখী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কুন্দের সহিত তাঁহার বিবাহ না দিলে, এই বিবাহ সহজ হইত না, অন্ততঃ কুন্দের দিক দিয়াও হয়ত আপত্তি উঠিতে পারিত।

বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে নগেন্দ্রের মনের অবস্থা শ্রীশচন্দ্রের নিকট লিখিত তাঁহার পত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। পত্রখানি আদ্যন্ত আত্মপ্রবঞ্চনায় পূর্ণ। ইহা যেন ব্যবহারাজীবের পক্ষে দুর্ব্বল আত্মপক্ষ সমর্থনের নিষ্ফল প্রয়াস। শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি: নগেন্দ্র নিজেকে বুঝাইলেন, শ্রীশচন্দ্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, 'সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই

বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার আপত্তি?' ইহা অপেক্ষা সত্যের বিকৃতি কল্পনা করা শক্ত। সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিতেছেন, ইহাই নগেন্দ্রের চক্ষে বড় হইল, অথচ তাঁহার এই কার্য্যের পশ্চাতে যে মর্ম্মন্তুদ যাতনা লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা তাঁহার মোহান্ধ দৃষ্টিতে ধরা পড়িল না।

নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর বিবাহ হইল। বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে, হিন্দু পুরুষের বহুবিবাহও অশাস্ত্রীয় নহে, সুতরাং আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের কোন বিধানই হয়ত লঙ্ঘিত হইল না। কিন্তু নগেন্দ্র বুঝিলেন না, অথবা বুঝিয়াও স্বীকার করিলেন না, বৃহত্তর মানবধর্ম্মের প্রতি তিনি কতখানি অবিচার করিলেন। ইহাই নগেন্দ্রনাথের অধঃপতনের শেষ ধাপ।

কিন্তু অধঃপতনের মধ্যেও বিবেক তাঁহাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই। বিবাহের পর নগেন্দ্র যখন কুন্দের চিন্তায় মসগুল তখনও এক একবার তাঁহার মনে হইয়াছে: "সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে—তবে আমার এ সুখে কাহার আপত্তি!" আর কাহারও আপত্তি না থাকুক, তাঁহার নিজের মনেই যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট খট্‌কা রহিয়াছে, কেহ প্রশ্ন না করিলেও থাকিয়া থাকিয়া নিজের কাছে এই একই যুক্তির অবতারণা তাহার প্রমাণ।

'বিষবৃক্ষে'র নারীচরিত্রের মধ্যে হীরা অনন্যা। হীরা অতি বাস্তব চরিত্র এবং তাহার চিন্তার ধারার মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরের এক শ্রেণীর নারীর মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রহিয়াছে। হীরা কুন্দের বিপরীতধর্ম্মী চরিত্র। কুন্দ সরলপ্রকৃতি এবং নিঃস্বার্থ; হীরা চতুরা ও পরশ্রীকাতরা এবং এই পরশ্রীকাতরতার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহার শ্রেষ্ঠমন্যতা (superiority complex)। বিধাতা হীরার ন্যায় কুন্দের ললাটেও দুর্ভাগ্যের ললাটিকা পরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কুন্দের কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নাই। পক্ষান্তরে, হীরা বিধাতার অবিচারের প্রতিশোধ লইতে চাহে। কুন্দের পলায়নের পর হীরা যখন তাহাকে হাতের মুঠোয় পাইল, তৎকালীন তাহার চিন্তার ধারার মধ্যে (২০।-) আমরা তাহার যথার্থ পরিচয় পাই। হীরার যুক্তি এইরূপ: 'বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়।' তাহার ক্রোধ সূর্য্যমুখীর উপর। ইহার কারণও সে নিজেই বিশ্লেষণ করিতেছে: 'সূর্য্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, সেই জন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট,—সে মুনিব, আমি বাঁদী, সুতরাং তার উপরে আমার রাগ।' হীরা জানে, লোকে তাহাকে হিংসুক বলিবে, কিন্তু সে যে হিংসুক, সে কি তাহার অপরাধ? ঈশ্বর

সূর্যমুখীকে 'বড়' করিয়াছেন, ইহা যদি তাঁহার অপরাধ বলিয়া গণ্য না হয়, তাহা হইলে হীরার হিংসাই বা তাহার পক্ষে দূষণীয় হইবে কেন? 'হীরাকে সূর্যমুখীর আসনে বসাইলে, হীরার কি খলকপট থাকিত? হীরা বলে, "না।" হীরাকে হীরার আসনে বসাইয়াছে বলিয়াই হীরা, হীরা।' হীরার এই যুক্তি দুষ্কৃতকারীর চিরন্তন যুক্তি। কিন্তু হীরা যতই অধঃপতিত হউক, এ যুক্তি হয়ত তাহার মনে সম্পূর্ণ সাড়া পাইল না। সুতরাং নিজেকে সমর্থন করিতে যাইয়া হীরা নিজেকে আরও বুঝাইল, 'তা, আমি খামকা তার মন্দ করিতে চাই না, কিন্তু যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? আপনার ভাল কে না করে?' যাহারা স্বার্থ ছাড়া জগতে অপর কিছু বোঝে না, ইহা তাহাদের একচেটিয়া যুক্তি।

হীরার কার্য্যপদ্ধতি তাহার চাতুর্য্য ও হিসাবীমনের পরিচয় দেয়। নগেন্দ্রের দুর্ব্বলতা তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, কুন্দকে হাতে পাইয়া সে ইহার পূর্ণ সুযোগ লইতে চাহে। কুন্দ হীরার হাতের পাকা ঘুঁটি, কুন্দের সাহায্যে সে বাজী জিতিবে, সূর্য্যমুখীর 'থোঁতামুখ ভোঁতা' করিবে। কৌশল্যার সহিত কলহের ভান করিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট গালি খাইয়া নগেন্দ্রের নিকট অভিযোগের অছিলায় কুন্দের প্রতি সূর্য্যমুখীর দুর্ব্যবহারের উল্লেখ (২১।–) তাহার প্রধান চাল। এবং ইহাতে সে যে আংশিক কৃতকার্য্য হইয়াছে, নগেন্দ্রের সহিত কুন্দের বিবাহ তাহার সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু এই হৃদয়হীনা দুর্ব্বৃত্তার অন্তরেও শাশ্বত নারীপ্রকৃতি জাগ্রত হইয়াছে। পরের চোর ধরিতে যাইয়া হীরা নিজের প্রাণ বিলাইয়া আসিয়াছে। প্রচুর অর্থের প্রলোভন সত্ত্বেও সে যে প্রাণ ধরিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিতে পারিল না, ইহা তাহার অন্যতম কারণ। এবং নগেন্দ্র যখন সূর্য্যমুখীর শোকে গৃহত্যাগী হইলেন, তখনও ঠিক এই কারণেই হীরা বাহিরে দাসী সাজিয়া কুন্দকে আগুলিয়া রহিল।

কিন্তু হীরা ভালবাসিলেও সে ভালবাসা কুন্দের ভালবাসার ন্যায় আত্ম-বিলোপকারী ভালবাসা নহে। কুন্দ নিজের সুখ খোঁজে নাই, তাহার ভালবাসা প্রতিদান চাহে নাই, অবজ্ঞায় ম্লান হয় নাই। হীরা সম্পূর্ণ আত্ম-কেন্দ্রিক, তাহার ভালবাসায় পুরাপুরি লালসার, সুতরাং স্বার্থের খাদ মিশানো রহিয়াছে। প্রতিদান না পাইয়া তাই ইহা হিংসার রূপ ধারণ করিল। পূর্ব্বে যদি সূর্য্যমুখী তাহার চক্ষুশূল ছিলেন, তিনি অন্তরাল হইলে কুন্দ তাহার ঈর্ষ্যার লক্ষ্যবস্তু হইল; কুন্দের অপরাধ দেবেন্দ্র তাহাকে ভালবাসেন, তাহাকেই চাহেন। শুধ কুন্দ নহে, এমন কি তাহার প্রণয়াস্পদ দেবেন্দ্রও

হীরার সর্ব্বগ্রাসী হিংসার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। চতুরা হীরার কৌশলে দেবেন্দ্র লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইলেন। তবুও যে চাতুর্য্যের সংগ্রামে হীরাকেই দেবেন্দ্রের নিকট শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করিতে হইল তাহার কারণ হীরা প্রণয়িনী। হীরার প্রণয়দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াই দেবেন্দ্র তাঁহার অপমানের চরম প্রতিশোধ লইলেন।

হীরা কর্ম্মতৎপর; কুন্দের ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। অথচ বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্ঘাতের প্রতিক্রিয়ার আঘাত কুন্দকেই নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে এবং অবশেষে সেই আঘাতের অসহনীয় বেদনায় তাহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। কুন্দ কুন্দেরই মত শুভ্র, স্পর্শকাতর ও স্বল্পপ্রাণ। এবং তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহার সারল্য, তাহার প্রণয়বিহ্বলতা ও তাহার কর্ত্তব্যানুভূতি। আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা কবে, কেমন করিয়া ভালবাসায় রূপান্তরিত হইল, তাহার ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত; হয়ত কুন্দ নিজেও তাহা জানিতে পারে নাই।[১] তবে একথা নিশ্চিত যে তিন বৎসর তারাচরণের সংসার করিলেও এই বিকৃতরুচি, অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক তাহার মনের উপর কোনরূপ রেখাপাত করিতে পারে নাই, এবং কোন অবস্থাতেই আমরা তাহাকে তারাচরণের সহিত তাহার বিবাহিত জীবনের কথা স্মরণ করিতে দেখি না। সুতরাং কৃতজ্ঞতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, হয়ত বিরুদ্ধধর্ম্মগুণে নগেন্দ্রের আকর্ষণ কুন্দের পক্ষে দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকিবে।

১ বঙ্কিম লিখিয়াছেন, 'বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই।' (৪২।-, ১২৮ পৃঃ)। প্রধানতঃ এই উক্তির ভিত্তিতে ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "নগেন্দ্রের প্রথম দর্শনে 'কুন্দ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল' (৪র্থ পরিচ্ছেদ), নগেন্দ্রের পত্রে 'সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে, কিছু বলে না' (৫ম পরিচ্ছেদ) এ শুধু বিস্ময় নহে, রূপমোহ।" ('বিধবা'—ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৮, ৪১৯ পৃঃ)। কিন্তু নগেন্দ্রের প্রথম দর্শনে কুন্দের বিস্ময় ও বিমূঢ়ভাবের সুস্পষ্ট কারণ এই যে, তিনি কুন্দের স্বপ্নদৃষ্ট 'দেবকান্তি' পুরুষ। এ অবস্থার বিস্ময় শুধু স্বাভাবিক নহে, অবশ্যম্ভাবী। ইহাকে 'রূপমোহ' বলা চলে কিনা, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে, অর্থাৎ নগেন্দ্রের নিকট আশ্রয় পাইবার পর কৃতজ্ঞতামিশ্রিত বিস্ময় যে প্রণয়ে রূপান্তরিত হইয়াছিল, বঙ্কিমের নিজের উক্তির পর এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু তাহা নগেন্দ্র যে সময় হরদেব ঘোষালের নিকট পত্র লিখিলেন সম্ভবতঃ তাহার পরের কথা, নহিলে চারি চক্ষের মিলন হইলেই তাহার 'বৃহৎ নীল....চক্ষু দুইটি' আপনা হইতেই ব্রীড়াবনত হইত।

কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু এমন কি সূর্য্যমুখীর সতর্ক ইহার কোন আভাস পায় নাই ; পাইলে কমলমণির নিকট লিখিত তাঁহার পত্রে ইহার উল্লেখ থাকিত। কুন্দ প্রথম ধরা পড়িল কমলমণির নিকট। এই স্নেহময়ী নারীর স্নেহের স্পর্শে তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ অর্গল উন্মুক্ত হইল। চিত্রটি মনোরম। ইহা যেমন কমলমণির দরদী মনের, তেমনই কুন্দের প্রণয়বিহ্বলতার সহিত তাহার কর্ত্তব্যবোধের পরিচয় দেয়।

কুন্দের নিকট কমলমণির প্রস্তাব একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ইহা একদিকে যেমন নগেন্দ্রের প্রণয়জ্ঞাপনের প্রত্যক্ষ উত্তেজক শক্তি (exciting force), অন্যদিকে তেমনই এইরূপে কমলমণির নিকট নগেন্দ্রের প্রণয়ের আভাস পাইবার ফলে তাঁহার আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত প্রণয়জ্ঞাপন অন্যথা কুন্দকে যতখানি হতবুদ্ধি করিতে পারিত তাহাকে ঠিক ততটা হতবুদ্ধি করিতে পারিল না এবং এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে কমলমণির উপদেশবাণী তাহাকে কর্ত্তব্যের প্রেরণা যোগাইল। এই হিসাবে কমলমণির প্রস্তাবে কুন্দের সম্মতি নগেন্দ্রের প্রণয়-প্রত্যাখ্যানের জন্য কুন্দের মনের পরোক্ষ প্রস্তুতি। রোহিণীও একদিন গোবিন্দলালের প্রস্তাব মত হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে সাময়িক সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত তাগিদে, অর্থাৎ উপায়ন্তর না দেখিয়া নিজেকে অপমানের হাত হইতে রক্ষার উপায় হিসাবে ; গোবিন্দ-লাল বা ভ্রমরের শুভাশুভের প্রশ্ন তাহার মনে আসে নাই। কিন্তু কুন্দের স্বীকৃতির পশ্চাতে রহিয়াছে নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর কল্যাণে আত্মত্যাগের সঙ্কল্প। এবং এই সঙ্কল্পই তাহাকে নগেন্দ্রের প্রণয়-প্রত্যাখ্যানের প্রেরণা যোগাইয়াছে। নগেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার বিচিত্র চিন্তার ধারা (এই চিন্তার ধারার মধ্যে প্রথম যৌবনের ব্রীড়ামিশ্রিত প্রণয়বিহ্বলতা, আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা, শিশুসুলভ সারল্য, নৈরাশ্যজনিত মৃত্যু-কামনা এবং সেই সঙ্গে বাঁচিবার স্বাভাবিক স্পৃহা—এক কথায় কুন্দের চরিত্রের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে) এবং তাহার মৃত্যুর সঙ্কল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রত্যাখ্যান আরও মর্ম্মস্পর্শী। কুন্দের এই আত্মজয় 'রমণীরত্ন' আয়েষাকে স্মরণ করাইয়া দেয়,[১] কিন্তু আয়েষাকেও এরূপ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

১ সুসাহিত্যিক মোহিতলাল বলেন, 'কুন্দনন্দিনী আয়েষারই নব সংস্করণ।' (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, ৩৪ পৃ.)। 'প্রেমের আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যে নারীর যে অসীম শক্তি—অতখানি কোমলের মধ্যেও ঐ কঠিন আত্মস্থতা' নিঃসন্দেহ উভয় চরিত্রের মধ্যে আত্মিক যোগসূত্র। কিন্তু মোহিতলালের মন্তব্য আতিশয্যদোষদুষ্ট। এক হিসাবে ইঁহারা বিপরীতধর্ম্মী—আয়েষা আত্মনির্ভরশীলা, কুন্দ সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীলা।

তবুও কুন্দ শেষরক্ষা করিতে পারিল না। কারণ সে আয়েষার মত বুদ্ধিমতী নহে। অবস্থার নাটকীয় পরিবর্ত্তনে সূর্য্যমুখী যখন নিজেই উদ্যোগী হইয়া স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন, তখন তাহার মনে একবারও প্রশ্ন উঠিল না, এমন অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইল কেমন করিয়া? আয়েষা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিতেন, কোথাও কিছু গলদ রহিয়াছে। কিন্তু কুন্দ কিছুই বুঝিল না, বুঝাইয়া দিবার জন্য কমলমণিও নিকটে ছিলেন না। সুতরাং যে যুক্তি দ্বারা নগেন্দ্র আত্মপ্রবঞ্চনা করিলেন, সেই একই যুক্তি দ্বারা কুন্দ বিভ্রান্ত হইল। তফাৎ এই যে, নগেন্দ্র জানিয়া শুনিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিলেন, কুন্দ না বুঝিয়া প্রতারিত হইল।[১] এবং মৃত্যুতেই তাহাকে এই না বুঝিয়া ভুল করার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

কিন্তু কুন্দ মরিল কেন? সাধারণভাবে হয়ত প্রশ্নটির তেমন কোন গুরুত্ব নাই; কিন্তু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন, বঙ্কিম একদিন (মজুমদার মহাশয়ের হিসাব মত ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়) বলিয়াছিলেন, 'কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিরুদ্ধ তাহা আমি স্বীকার করি।'[২] মনে হয় বঙ্কিমের এই উক্তি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার আত্মহত্যার সাময়িক প্রতিক্রিয়া। অবশ্য এই শোচনীয় দুর্ঘটনার সন তারিখ না জানা থাকায় এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না।[৩] যাহা হউক, ইহা তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাহা হইলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার দীর্ঘকাল পরেও তিনি যেমন গোবিন্দলালের পরিণতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, কুন্দনন্দিনীকেও তেমনই আত্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তি দিয়া তাহার জীবনের অন্যরূপ পরিণতি পরিকল্পনা করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রশ্নটি যখন উঠিয়াছে তখন ইহার একটুকু বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আত্মহত্যা মাত্রই নীতিবিরুদ্ধ, সুতরাং মানিয়া লইলাম কুন্দ নীতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছে। কিন্তু ইহাই আমাদের সত্যকার বিচারের বিষয় নহে।

১ দুঃখের দিনে নগেন্দ্র কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া কুন্দ ভাবিতেছে, "আমার ভাগ্য মন্দ—কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। সূর্য্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।" (৩১।-, ৯৪ পৃঃ)। ইহা দোষস্খালনের প্রয়াস নহে; ইহা তাহার সরল বিশ্বাস।

২ 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ ১ম প্রস্তাব'—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ১৭৯ পৃঃ।

৩ কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার 'আমার জীবন' চতুর্থ ভাগে এবং তারকনাথ বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিম প্রসঙ্গে' (ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—নবেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯১৬, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩২৩ সংখ্যা) ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উভয়ের কেহই সন তারিখ দেন নাই।

প্রশ্ন এই, কুন্দের আত্মহত্যার পরিকল্পনা তাহার স্রষ্টার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে কিনা। চরিত্রস্রষ্টা শিল্পী, তাঁহার নীতি আর্টের নীতি। সুতরাং আর্টের কষ্টিপাথরেই আমাদিগকে প্রশ্নটির বিচার করিতে হইবে। এস্থলে বিচার্য্য বিষয় দুইটি: এক, কুন্দের আত্মহত্যা তাহার চরিত্রানুরূপ কিনা; দুই, নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়ার, অর্থাৎ কুন্দের মৃত্যুতে তাঁহাদের পুনর্মিলনে যে বিষাদের ছায়া পড়িল তাহার সার্থকতা কি?

মনঃসমীক্ষণবিদ্‌গণ বলেন, যাহারা আত্মহত্যা করে তাহাদের অনেকেরই এদিকে পূর্ব্ব হইতেই একটা বিশেষ ঝোঁক থাকে। কুন্দের চরিত্রেও আমরা এই বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করি। দুঃখের দিনে অনেক সময় সে মৃত্যুর কথা ভাবিয়াছে এবং এক সময় সত্যই সে দীঘির জলে ডুবিয়া মরিবার আয়োজন করিয়াছিল। তাহার কার্য্যের স্বাভাবিকত্ব বিচার করিতে যাইয়া আমাদিগকে প্রথমেই এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

কুন্দের জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের ইতিহাস। সূর্যমুখীর পলায়নের পর এই দুঃখের বোঝা একেবারেই অসহনীয় হইল। একে চরিত্রগুণে সূর্য্য-মুখীর পলায়নের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করিয়া আত্মগ্লানি জন্মিল, তাহাতে স্বামীর সংসারে সকলেই, এমন কি সহৃদয়া কমলমণি পর্য্যন্ত তাহার প্রতি বিরূপ হইলেন। কুন্দ বুঝিল, অন্তরের দেবতাকে বাহিরে পাইতে যাইয়া আজ সে সকলই হারাইয়া ফেলিয়াছে। কুন্দ কাঁদে আর ভাবে, "কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়?" একদিন প্রদোষে (প্রদোষকালেই নগেন্দ্র কুন্দের নিকট প্রথম প্রণয়জ্ঞাপন করেন।) স্বামীর নিকট এই প্রশ্ন করিতে যাইয়া কুন্দ অনুচিত রূঢ় আঘাত পাইল।[১] কুন্দ কমলমণির নিকট কাঁদিতে গেল, তিনি "আমার কাজ আছে" বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কুন্দ একা, এত বড় পৃথিবীতে সে নিতান্তই একা।

তবুও দুঃখের মধ্যে তাহার সান্ত্বনা কুন্দ স্বামীকে দেখিতে পায়। বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন, নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শোকে দেশত্যাগী

১ স্বামীর নিকট হইতে প্রণয়সম্ভাষণ বিধাতা কুন্দের অদৃষ্টে লেখেন নাই। তারাচরণ সম্বন্ধে বঙ্কিম স্পষ্টই লিখিয়াছেন, 'প্রণয় বিষয়টা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাঁহার কতদূর ছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু একটি পোষা বানরীর সঙ্গে একটু একটু ছিল।' তারাচরণ ও নগেন্দ্র আকাশ-পাতাল প্রভেদ; কিন্তু কুন্দের ভাগ্যদোষে স্বামী নগেন্দ্রের নিকট হইতেও লাঞ্ছনাই তাহার একমাত্র প্রাপ্য। যে নগেন্দ্র কুন্দ যখন তাঁহার হয় নাই, তখন তাহাকে আবেগভরে প্রণয়জ্ঞাপন করিয়াছেন, পত্নী কুন্দকে তিনি বলিতেছেন, "বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন?—লোহার শিকলই ভাল।" (৩১।-, ৯৫ পৃঃ)।

হইলেন। ফলে মৃত্যুর চিন্তা পুনরায় তাহাকে পাইয়া বসিল। কিন্তু কুন্দ মৃত্যুকামনার সহিত জীবনের স্পৃহার একটা সাময়িক বোঝাপড়া করিয়া লইল; সে মরিবে, কিন্তু এখন নয়, তিনি আসুন, সূর্যমুখী ফিরিয়া আসুক, তখন সে মরিবে; আর সে সূর্য্যমুখীর 'সুখের পথে কাঁটা' হইবে না।

কিন্তু দীর্ঘকাল এরূপ বোঝাপড়া সম্ভব হইল না। নগেন্দ্র ফিরিয়া আসিলে একদিকে তাহার অবহেলা, অন্যদিকে কুন্দের দ্বিতীয়বারের 'লোমহর্ষণ স্বপ্ন'—প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত—এই উভয় মিলিয়া তাহার মৃত্যুর ইচ্ছাকে প্রবল বাসনায় পরিণত করিল। তথাপি কুন্দের মত দুর্ব্বল নারীর পক্ষে সক্রিয়ভাবে মৃত্যুর উপায় উদ্ভাবন করা হয়ত সহজ হইত না। হীরার চক্রান্তে সে অভাব দূর হইল। স্বপ্ন ভাগ্যদেবতার ইঙ্গিত, হীরা ভাগ্যদেবতা-প্রেরিত কুন্দের মৃত্যুদূত। কুন্দের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহার মৃত্যু কার্য্যকারণপরম্পরার অনিবার্য্য পরিণতি।

এক্ষণে এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনা করিতেছি: কুন্দের আকস্মিক মৃত্যু নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর মিলনের আনন্দ ম্লান করিয়া দিয়াছে, ইহা অতি কঠোর সত্য। কিন্তু এ শাস্তি নগেন্দ্রের অবশ্য প্রাপ্য। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর প্রতি যে অবিচার করিলেন তাহাতে তিনি স্বভাবতঃই পাঠকের সহানুভূতি হারাইলেন। বঙ্কিমের পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি সূর্য্যমুখীকে ফিরিয়া পাইলেন। এই কারণেই পুনর্মিলনের পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তের ভিতর দিয়া বঙ্কিম তাঁহার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু নগেন্দ্র কি কুন্দের প্রতিও গুরুতর অবিচার করেন নাই? সূর্য্যমুখীর প্রতি অবিচার করিয়া তিনি অনুতপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু নিরপরাধিনী কুন্দের প্রতি তিনি যে কোনরূপ অবিচার করিয়াছেন, কুন্দের মৃত্যুকালে তাহার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে একথা একবারও তাঁহার মনে আসে নাই। কুন্দের আত্মহত্যা তাহার প্রতি নগেন্দ্রের অবিচারের পরোক্ষ প্রতিবাদ। সূর্য্যমুখী ও কুন্দের চরিত্রে বড় মৌলিক পার্থক্য থাকিলেও এক জায়গায় তাঁহাদের আশ্চর্য্যরকমের মিল রহিয়াছে: উভয়ের জীবন নগেন্দ্রের জন্য উৎসর্গীকৃত। সূর্যমুখী বা কুন্দ জ্ঞাতসারে নগেন্দ্রের মনে এতটুকু ব্যথা দিতে পারেন না। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে যাহা অসম্ভব, বিরুদ্ধ ঘটনার যোগাযোগে তাহাই সম্ভব হইল। কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়া তাঁহাকে যে শাস্তি দিল, অতি বড় শত্রুও কখন তাঁহাকে এত কঠোর শাস্তি দিতে পারিত না। আর্টের দিক দিয়া কুন্দের মৃত্যুর ইহাও অন্যতম কৈফিয়ত।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে: নগেন্দ্র দোষ করিয়াছেন, তিনি শাস্তি

পাইলেন, ইহা বুঝিলাম; কিন্তু সূর্য্যমুখীকে যে এই শাস্তির অংশভাগিনী হইতে হইল, তাঁহার কি অপরাধ? ইহার উত্তর এই যে, মানবজীবনে শাস্তির পরিমাণ কাব্যিক সুবিচারের (poetic justice) তুলাদণ্ডে নির্ণীত হয় না, অর্থাৎ যাহার যতটুকু অপরাধ ঠিক সেই পরিমাণে শাস্তি হইল বাস্তব জীবনে আমরা এরূপ দেখিতে পাই না। আমাদের আলোচনার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, কুন্দের প্রতি আচরণে সূর্য্যমুখীও সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী নহেন। কুন্দের প্রতি তাঁহার ঈর্ষ্যা স্বাভাবিক, সুতরাং মার্জ্জনীয়। কিন্তু স্বামীর তৃপ্ত্যর্থ কুন্দকে স্বামী দান করিয়া গৃহত্যাগকালে কমলমণির নিকট লিখিত পত্রে তিনি স্পষ্টই জানাইয়া গেলেন, 'কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না—এবং আমার সন্ধানও পাইবে না।' তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না (অবশ্য, এই না-ভাবিয়া-দেখাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক) যে, এ ব্যাপারে কুন্দের অপরাধ কতটুকু। নিরপরাধিনী কুন্দের প্রতি এই যে অন্যায় রূঢ়তা, কুন্দের মৃত্যু ইহার যোগ্য প্রত্যুত্তর। এবং সূর্য্যমুখীকে যে মৃত সপত্নীর প্রতি চাহিয়া বলিতে হইল, "ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।" (৪৯।-)।—মৃত্যুতেও ইহাই কুন্দের বিজয়গৌরব।

নগেন্দ্রের নিকট হইতে কুন্দের শেষ বিদায়ের চিত্র (৪৯।-) বড়ই করুণ। অভিমানের তীব্র বেদনা, বাঁচিয়া থাকিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেই সঙ্গে মৃত্যুকালে স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার নিষ্ফল প্রয়াস—এ সকলই কুন্দের বিদায় সম্ভাষণের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে. কুন্দ মরণের ডাক শুনিয়াছে, ব্রীড়াবতী কুন্দ তাই প্রগল্‌ভা। নগেন্দ্র যখন 'গদগদ কণ্ঠে' প্রশ্ন করিলেন, "এ কি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?" কুন্দ তখন সজল নয়নে উত্তর করিল, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?" তাহার এ অভিযোগের উত্তর নাই, নগেন্দ্র মৃত্যু-পথের যাত্রী কুন্দের প্রশ্নে নিরুত্তর রহিলেন। তাঁহার এই পরাজয় কুন্দের মৃত্যু-মলিন ললাটে বিজয়টীকা পরাইয়া দিল। কুন্দ সকল লঞ্ছনা ও অবহেলার উপর জয়ী হইল।

স্বামীকে নীরব দেখিয়া কুন্দ পুনরায় বলিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকট এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না।" ইহা তাহার অন্তরের কথা। কুন্দের তরুণ বয়স, তরুণ সাধ, অথচ কোন সাধই তাহার পূর্ণ হয় নাই—কুন্দ মরিতে চাহে না।

নগেন্দ্রের শুষ্ক মুখ দেখিয়া মৃত্যুকালেও কুন্দ ব্যথা পাইল। মৃত্যুকালেও স্বামীর সুখ ভিন্ন তাহার অন্য কোন কামনা নাই। তাহার কথায় স্বামী আঘাত পাইয়াছেন বুঝিয়া, পাছে তাহার মৃত্যুর জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে করিয়া তিনি দুঃখ পান এই আশঙ্কায় কুন্দ 'বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্ব্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায় মৃদুমধুর দিব্য হাসি হাসিয়া' সান্ত্বনার সুরে বলিল, "যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের আবেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম যে,.........দিদি যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম"—বলিতে বলিতে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা, স্বামীসঙ্গসুখের আকাঙ্ক্ষা পুনরায় প্রবল হইল, কুন্দ স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার কথা ভুলিল, বলিল, "তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।" অতৃপ্ত বাসনার কি নিষ্ফল করুণ অভিব্যক্তি। কুন্দ বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হইতে পারিত। কিন্তু এক শ্রেণীর ভাগ্যহত নরনারী আছেন দুর্ভাগ্য যাঁহাদের নিত্য সহচর এবং যখনই কোন সুখের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখনই তাঁহাদের জীবনাবসান হয়। কুন্দ সেই শ্রেণীর। হীরা যদি একটুকু পরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, অথবা সূর্য্যমুখী যদি একটুকু আগে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কুন্দকে মরিতে হইত না। কিন্তু ভাগ্যদেবতার ইচ্ছা অন্যরূপ; তাই নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর পুনর্মিলনের ফলে যখন হয়ত তাহার জীবনেও নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইতে পারিত, তখনই মৃত্যুর হিমস্পর্শ তাহার সকল দুঃখের সহিত তাহার সকল সুখের সম্ভাবনার শেষ করিয়া দিল।

সূর্যমুখী ও কমলমণি বাঙ্গালী পরিবারের স্নেহশীলা ভ্রাতৃজায়া ও দরদী ননদিনীর প্রতীক। কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে শ্যামাসুন্দরীর পরিকল্পনায় যাহার খসড়া, সূর্য্যমুখীর পার্শ্বে কমলমণিতে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'সোনার কমল' হাসির নির্ঝরিণী, তাঁহার চক্ষে ছোট বড় প্রভেদ নাই। প্রথমদর্শনেই কুন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া পরিচারিকার সহিত সখীসদৃশ আচরণে আমরা তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। সূর্য্যমুখী বিপরীতধর্ম্মী; তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি, 'কিছু গর্ব্বিতা।' সাধারণ পৌরস্ত্রীর আসরে তিনি 'বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না।'

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কমলমণি বুঝি বা সূর্য্যমুখী অপেক্ষা অধিক স্নেহশীলা। কিন্তু সূর্য্যমুখীও কম স্নেহশীলা নহেন, তবে রাশভারী বলিয়া তাঁহার স্নেহ বাহিরে তেমন প্রকাশ পাইত না। অন্ততঃ কুন্দের প্রতি তাঁহাদের আচরণের তারতম্য হইতে তাঁহাদের স্নেহের তারতম্যের বিচার করা চলে না। সূর্য্যমুখী যখন তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ দিলেন, তখন তাহা নিঃসহায়া বালিকার প্রতি অহৈতুকী করুণার নিদর্শন না হইলেও কুন্দের প্রতি তাঁহার স্নেহের অভাব ছিল না। কিন্তু স্বামী যখন কুন্দের রূপে আকৃষ্ট হইলেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি তাহার প্রতি বিরূপ হইলেন। "কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল?" (১১।-) —সূর্য্যমুখীর এই উক্তি সহজ অবস্থায় তাঁহার মনের পরিচয় দেয় না। এবং হরিদাসী বৈষ্ণবীর স্বরূপ অবগত হইয়া তিনি যখন কুন্দকে কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়াই তাহার প্রতি অযথা কটূক্তি করিলেন, তখন ঈর্ষ্যা আসিয়া তাঁহার সহজ বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার বিচার একরূপ একতরফা হইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে, কমলমণির ঈর্ষ্যা নাই, সুতরাং তিনি কুন্দকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ও মাগী যাহা বলে বলুক; আমি উহার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।" (১৭।-)। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সূর্য্যমুখীর পলায়নের পর স্বভাবতঃই কমলেরও ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পক্ষান্তরে, নগেন্দ্রের সহিত পুনর্মিলনের দিনে আনন্দের আবেগ শমিত হইলে সূর্য্যমুখীই অগ্রণী হইয়া কমলকে লইয়া কুন্দকে দেখিতে গেলেন এবং কুন্দের মৃত্যুতে তিনিও কমলমণির ন্যায় কনিষ্ঠা ভগিনীর মৃত্যুদুঃখ অনুভব করিলেন। সূর্য্যমুখী ও কমলমণি উভয়েই তুল্য স্নেহশীলা, অবস্থাভেদে কুন্দের প্রতি আচরণে যাহা কিছু পার্থক্য।

সূর্য্যমুখী বয়োজ্যেষ্ঠা; কমলকে তিনি নিজের হাতে মানুষ করিয়াছেন। গৃহিণী হিসাবেও তিনি অনেক বেশী পাকা। তারাচরণের জীবিতাবস্থায় তিনি যেরূপ সতর্কতার সহিত কুন্দকে দেবেন্দ্রের কুৎসিত সংস্পর্শ হইতে আগুলিয়া রাখিয়াছেন, কমলমণির পক্ষে তাহা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। হরিদাসী বৈষ্ণবীকেও সূর্য্যমুখীই প্রথমে পুরুষ বলিয়া সন্দেহ করেন; অবশ্য কুন্দের প্রতি বিদ্বেষ হইতেই হয়ত এই সন্দেহের উৎপত্তি। তাহা হইলেও সন্দেহ করিয়া সূর্য্যমুখী যখন হীরাকে দিয়া সন্ধান লইবার ব্যবস্থা করিলেন, কমলের তখন 'মিন্সেকে কাঁটা ফোটার সুখটা' দেখাইবার জন্য 'বাবলার ডালের' কথা মনে আসিল। (১৫।-)। সূর্য্যমুখীর আচরণ গৃহিণীজনোচিত; কমলের আচরণ তাঁহার হালকা পরিহাস-প্রবণতার অন্যতম নিদর্শন।

প্রকৃতিগত বৈষম্য থাকিলেও সূর্য্যমুখী ও কমলমণি উভয়েই স্বামীর প্রতি অনন্যানুরাগিণী। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর 'সর্ব্বস্ব ধন', তাঁহার 'পায়ের কাঁটাটি' তুলিবার জন্য তিনি প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। শ্রীশচন্দ্রও তেমনই কমলমণির ইহকাল পরকাল। তিনি সূর্য্যমুখীর প্রথম পত্রের উত্তরে যাহা লিখিলেন ('স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল'), পরিহাসচ্ছলে লিখিত হইলেও তাহা তাঁহার প্রাণের কথা। কিন্তু কমলমণি শুধু পত্নী নহেন, তিনি জননী। এইখানেই কমলমণির নিকট সূর্য্যমুখীর পরাজয়। কমলমণির মাতৃত্ব তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং এই মাতৃত্বের চিত্র 'বিষবৃক্ষে'র অন্যতম আকর্ষণ।

কমলমণি জীবনকে অতি সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা তাহার নিকট হাসি আর খেলা। প্রধানতঃ এই কারণেই তিনি সূর্য্যমুখীর প্রথম পত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন না যে, নেহাৎ দায়ে না পড়িলে সূর্য্যমুখীর মত ভ্রাতৃজায়া কখনও এরূপ পত্র লিখিতে পারেন না। বস্তুতঃ, এই পত্র সূর্য্যমুখীর চক্ষের জলে লেখা এবং ইহা যেমন নগেন্দ্রের চরিত্রের পরিবর্ত্তনের প্রথম আভাস দেয়, তেমনই ইহার ভিতর দিয়া সূর্য্যমুখীর নারীজনোচিত স্বাভাবিক ঈর্ষ্যার[১] সহিত তাঁহার পতিপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়! সূর্য্যমুখী কুন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন, তাহাকে আশ্রয় দিয়া 'আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছেন' বলিয়া নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্য দুঃখ করিতেছেন; কিন্তু স্বামীর দুর্ব্বলতা আলোচনা করিতে যাইয়াও তিনি যথাসাধ্য তাঁহার হইয়া ওকালতি করিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন, 'তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না।' ইত্যাদি। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে তাঁহার আক্রোশের মধ্যে খানিকটা ঈর্ষ্যার ঝাঁজ থাকিলেও, ইহাও মুখ্যতঃ তাঁহার পতিপ্রাণতার নিদর্শন।

সহজ অবস্থায় যাহা প্রশংসনীয় সূর্য্যমুখীর ঈর্ষ্যাদুষ্ট দৃষ্টিতে তাহাও দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইল। তিনি লিখিতেছেন, 'একদিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বালবৈধব্য, অনাথিনীত্ব, এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।' অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে নগেন্দ্রের এই সময়ের অন্যান্য আচরণের কথা স্মরণ করিলে এই সহানুভূতিও অর্থপূর্ণ হইয়া পড়ে।

সূর্য্যমুখীর প্রত্যেকটি কার্য্য তাঁহার পতিপ্রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কুন্দের প্রতি রোষ এবং অভিমানিনী কুন্দ ফিরিয়া আসিলে তাহার প্রতি অযাচিত করুণা—এই দুইয়েরই উৎস নগেন্দ্রনাথ। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পশ্চাতেও রহিয়াছে স্বামীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা। স্বামীর সহিত কুন্দের বিবাহ ঘটাইবার পর তাঁহার মনের অবস্থা কতকটা কমলমণির সহিত তাঁহার সংলাপের ভিতর দিয়া (২৭।-), কতকটা কমলমণির নিকট তাঁহার বিদায়কালীন পত্রের ভিতর দিয়া (২৮।-) প্রকাশ পাইয়াছে। সূর্য্যমুখী কেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ দিলেন, সহোদরাতুল্য কমল এই প্রশ্ন করিলে, তিনি মৃদু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া ...বৃষ্টির পর আকাশপ্রান্তে ছিন্ন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস;—তখন জানিবে, তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না?" কমলমণি এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; তিনি এইবার সোজা আসল জায়গায় আঘাত করিলেন, প্রশ্ন করিলেন, "আর তুমি সুখী হইয়াছ?" সূর্য্যমুখী যেন প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইতে চাহিলেন। বলিলেন, "আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখন স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।" কিন্তু বেশীক্ষণ এরূপ লুকোচুরি চলিল না। সূর্য্যমুখী হাসি দিয়া অশ্রু ঢাকিতে চাহিয়াছিলেন, সে হাসি অশ্রুর স্রোতে ভাসিয়া গেল, 'তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল।' সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে?" সূর্য্যমুখীর দুঃসহ ব্যথা তাঁহার প্রশ্নের ভিতর দিয়া অতর্কিতে প্রকাশ পাইল। এবং ইহাই কমলমণির প্রশ্নের পরোক্ষ উত্তর। সূর্য্যমুখী যখন কমলমণিকে 'খোস্ খবর' জানাইয়া, তিনিই এ বিবাহের ঘটক এই কথার উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাকে ফুলশয্যায় উপস্থিত থাকিবার নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন, তখন দুঃখের মধ্যেও তাঁহার অবচেতন মনে হয়ত একটুকু গর্ব্বের ভাব রহিয়াছিল, যদি তাহাই সত্য হয় তাহা হইলে এইরূপে তাঁহার সে গর্ব্ব চূর্ণ হইল।

সূর্য্যমুখী কমলের নিকট মর্ম্মব্যথা লুকাইতে পারিলেন না। কমলের জেরার উত্তরে তাঁহাকে বলিতে হইল, "আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ।—" সহসা সূর্য্যমুখীর 'কণ্ঠ রুদ্ধ হইল—চক্ষু ভাসিয়া গেল।' দরদী ননদিনী তাঁহার 'অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম' বুঝিলেন, বুঝিয়া যাহাতে ভ্রাতৃজায়া এ অবস্থায়

নিজেকে একটুকু শক্ত করেন হয়ত সেই উদ্দেশ্যেই সহানুভূতিমিশ্রিত অভিযোগের সুরে বলিলেন, ''তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দ্দাহ হতেছে। তবে কেন বল 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?'' তাঁহার এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিক সত্য। সূর্য্যমুখী আত্মবিসর্জ্জন করিয়া অনুতাপ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার 'অন্তঃকরণের আধখানা আমিতে ভরা।' অবশ্য ইহাও সত্য যে ঠিক এই কারণেই আমরা তাঁহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারি।

সূর্য্যমুখী কমলের নিকট অনেক কথাই বলিলেন, বলিলেন না তাঁহার গৃহত্যাগের সঙ্কল্পের কথা। কিন্তু সে রাত্রে কমলমণিকে বিদায় দিবার সময় তিনি যখন সতুবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন তাঁহার 'কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে' কমলের 'চমকিয়া' ওঠার ভিতর দিয়া বঙ্কিম ভবিষ্যতের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর অকথিত কথা প্রকাশ পাইল তাঁহার বিদায়কালে লেখা পত্রের ভিতর দিয়া। এই পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার গৃহত্যাগ আকস্মিক ঘটনা নহে, ইহা পূর্ব্বপরিকল্পিত। তাঁহার প্রথম পত্রের ন্যায় এই পত্রেও তাঁহার পতিভক্তি ও ঈর্ষ্যা, এই উভয় বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়; তফাৎ এই যে ঈর্ষ্যা আরও ঝাঁজালো, পতিভক্তি আরও প্রকট।

গৃহত্যাগের পর সূর্য্যমুখীর কঠিন অভিজ্ঞতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার পুনর্মিলনের চিত্রের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে সূর্য্যমুখী শুধু নগেন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির দৃষ্টিতে নহে, পাঠকের দৃষ্টিতেও মৃত। এই কারণেই নিশীথকালে ক্ষীণালোকে নগেন্দ্রনাথের শয়নপ্রকোষ্ঠে তাঁহার আকস্মিক আবির্ভাব এবং তেমনই আকস্মিক তিরোধান নগেন্দ্রের ন্যায় পাঠককেও বিস্ময়াবিষ্ট করে।[১]

এই পুনর্মিলনের পটভূমিকা হিসাবে বঙ্কিম যে প্রতিবেশ রচনা করিয়া-

---

১ কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর পুনর্মিলনের চিত্রের চমৎকারিত্ব বজায় রাখিতে যাইয়া শ্রীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকালে সূর্য্যমুখী যে জীবিত সে সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর নীরবতা প্রশ্নাতীত নহে। বিষয়টির একটুকু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। সূর্য্যমুখীর আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার আশ্রয়দাতা ব্রহ্মচারী তাঁহাকে গোবিন্দপুর লইয়া আসেন এবং নগেন্দ্রনাথ 'দেশে নাই' এই সংবাদ পাইয়া তিন ক্রোশ দূরে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে 'আপন কন্যা পরিচয়ে' তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং নগেন্দ্রনাথের সন্ধানে বাহির হইলেন। (৪৬।- দ্রষ্টব্য)। কলিকাতায় তিনি শ্রীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং শ্রীশচন্দ্র তাঁহার নিকট সূর্য্যমুখীর

ছেন, তাহা তাঁহার প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নিশীথকাল, পৃথিবী সুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে—সূর্য্যমুখীর স্মৃতিতীর্থে। চারিদিকে সূর্য্যমুখীর স্মৃতি—তাঁহাদের মিলিতজীবনের স্মৃতি। 'কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত' চিত্রগুলির বিষয়বস্তু নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী উভয়ে মিলিয়া ভারতের প্রাচীন কাহিনী হইতে মনোনীত করিয়া সুদক্ষ চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত করিয়াছিলেন। চিত্রগুলি আজিও তাঁহাদের সুরুচির এবং কুন্দনন্দিনী আসিয়া তাঁহাদের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মধুর দাম্পত্য-জীবনের সাক্ষ্য দেয়। আখ্যায়িকায় আমরা নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীকে একটা অপ্রীতিকর আবেষ্টনের মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহাদের জীবনের গতি স্বাভাবিক পথে ফিরাইয়া আনিবার পূর্ব্বে এই সকল চিত্রদর্শনে নগেন্দ্রের মনের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম সুকৌশলে তাঁহাদের বৈচিত্র্যময় মধুর অতীত জীবনের আভাস দিয়াছেন। একটি চিত্রকে কেন্দ্র করিয়া যে কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'একদিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ী হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটি ছোট ছোট বর্ম্মা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যানমধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্যজন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বল্গা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া, সূর্য্যমুখী সুভদ্রার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দংশিতাধরে টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একেবারে গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোকলজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজ হস্তে বল্গা ধারণ করিয়া গাড়ী অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন। এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, "তুই সর্ব্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া।" সেদিন যাহা অফুরন্ত হাসির যোগান দিয়াছিল, আজ তাহা স্মরণ করিতে নগেন্দ্রের চক্ষে অজস্রধারায় অশ্রু ঝরিল।

পীড়া ও 'অপেক্ষাকৃত আরোগ্য লাভের' সংবাদ পাইলেন। (৩১-)। এই সময় শ্রীশচন্দ্র সূর্য্যমুখীর বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইবেন এবং ব্রহ্মচারীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। এবং প্রশ্ন করিলে, এমন কি প্রশ্ন না করিলেও, নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন কিনা সূর্য্যমুখীর মনে এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হইলেও, ব্রহ্মচারী যখন কাশী হইতে মধুপুর যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীশচন্দ্রের নিকট লিখিত নগেন্দ্রনাথের পত্র পড়িয়াছেন (৩১- দ্রষ্টব্য), তখন তাঁহার নিকট সত্য গোপনের কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

'দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ।' নগেন্দ্রের মনের ভিতরের ঝড়ের প্রতিধ্বনি করিয়া বাহিরেও তুমুল আলোড়ন আরম্ভ হইল। বাহিরে ঝঞ্ঝার আর্ত্তনাদ কক্ষমধ্যে সূর্য্যমুখীর স্মৃতি, নগেন্দ্রের অন্তর সূর্য্যমুখীময়। সহসা 'ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে চমকিত হইয়া' নগেন্দ্র মুক্তদ্বারের দিকে তাকাইলেন। 'সেই মুক্তদ্বার-পথে, ক্ষীণালোকে, এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী... সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা।' নগেন্দ্র 'ছায়াপ্রতি' ছুটিলেন; 'ছায়া অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে আলো নিবিয়া গেল। নগেন্দ্র....মূর্চ্ছিত হইলেন।' ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকৃতি, অস্পষ্টালোকিত, পরে সম্পূর্ণ অন্ধকার সূর্য্যমুখীর স্মৃতিবিজড়িত কক্ষ, নগেন্দ্রের শোকবিমূঢ় মন—সকল মিলিয়া অতিপ্রাকৃতের অনুকূল আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছে। বিস্মিত পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে : ছায়ামূর্ত্তি কি সূর্য্যমুখীর ছায়াশরীর, অথবা ইহা কি অত্যধিক উত্তেজনার ফলে নগেন্দ্রের দৃঠিবিভ্রম?

বঙ্কিম অতঃপর ধাপে ধাপে পাঠকের বিস্ময় বাড়াইয়া তুলিলেন। মূর্চ্ছান্তে নগেন্দ্র যখন অনুভব করিলেন যে কোন রমণী তাঁহার মস্তক উরুদেশে তুলিয়া লইয়াছেন, পাঠক বুঝিলেন নগেন্দ্রের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে নাই অথবা রমণী ছায়া-শরীর নহেন। কিন্তু কে এই রমণী? পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কেন তাঁহার চক্ষে অশ্রু ঝরিল? 'এ কি কুন্দনন্দিনী?' কিন্তু কুন্দ হইলে তাহার অঙ্গস্পর্শে নগেন্দ্র 'বুদ্ধিভ্রষ্ট' হইলেন কেন? কেন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল? ঝটিকান্তে অরুণোদয়ে গৃহমধ্যে যে অস্পষ্ট আলোক আসিল, তাহাতে নগেন্দ্র রমণীকে চিনিতে না পারিলেও, রমণী যখন গমনোদ্যত হইলেন তখন তাঁহার আকৃতি ও চলনভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া কেন তিনি করুণভাবে তাঁহার পদতলে পড়িলেন? কেন তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য কাতর হইলেন? তাঁহার কথা না বুঝিলেও কণ্ঠস্বরে কেন তিনি চমকিয়া উঠিলেন? কেন তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন? এইরূপ প্রশ্নের পর প্রশ্ন যখন তাঁহাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিযাছে, তখন রমণীর মুখে তাঁহার আত্মপরিচয় এবং তাঁহার কাহিনীর বিবৃতি যেমন নগেন্দ্রের অশান্ত মন শান্ত করিল, তেমনই পাঠকের কৌতূহলের নিবৃত্তি করিল।

মিলনের আনন্দে সূর্য্যমুখীর সকল গ্লানি, সকল দুঃখ দূর হইল। এমন কি, তিনি স্বামীর সহিত একটুকু রহস্য করিবার প্রলোভনও ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলিলেন, "কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভালবাস না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।" এ সেই সূর্য্যমুখী যিনি প্রথম যৌবনে সুভদ্রার অনুকরণে স্বামীর সহিত যানারোহণ করিয়া স্বয়ং অশ্ববল্গা ধরিয়াছিলেন, যিনি কুড়াইয়া পাওয়া কুন্দকে

লইয়া স্বামীর সহিত পত্রে রহস্যালাপ করিয়াছিলেন। মাঝখানে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা যেন ক্ষণিকের দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা।

বিপ্লবের রাত্রির বিভীষিকান্তে অরুণোদয়ের ন্যায় নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর জীবনেও নবারুণোদয় হইল। কিন্তু বিপ্লব কাটিয়া গেলেও সে যে দাগ রাখিয়া যায় তাহা মুছিবার নহে। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মিলনের মাঝখানে রহিয়া গেল অবহেলিত কুন্দের আত্মাহুতির স্মৃতি।

রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় ও ইন্দিরা

'রাধারাণী',[১] 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'ইন্দিরা' তিনখানি গ্রন্থই প্রথমে ছোট গল্পের আকারে প্রকাশিত হয়। পরে ছোট 'ইন্দিরা' বড় হইয়াছে; শেষ পর্য্যন্ত কিছুটা 'কলেবর' বৃদ্ধি পাইলেও 'রাধারাণী' মোটের উপর ছোটই রহিয়া গিয়াছে; 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র ক্ষেত্রে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গল্পত্রয়কে (তখনও 'ইন্দিরা' বড় হয় নাই) বঙ্কিম এক সময় 'উপকথা' আখ্যা দিয়াছিলেন।[২] উপকথার রাজ্যে অসম্ভব সম্ভব হয়, সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেখানে রাজপুত্র ও রাজকন্যার মিলন হয়। সেখানকার স্বপ্নপুরীতে বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা নাই, সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না। হিংস্র ডাকাতের অভিশপ্ত স্পর্শে পাচিকায় রূপান্তরিতা ইন্দিরার পক্ষে স্বামীর সহিত পুনর্মিলন সম্ভব কিনা, হিরণ্ময়ীর অশুভ গ্রহ কাটিয়া গেলে পুরন্দরের সহিত যেরূপে তাহার মিলন ঘটিল বাস্তব জগতে তাহা সম্ভব কিনা, শ্রাবণের ধারার মাঝে গভীর অন্ধকারে যে অসহায়া বালিকার সহিত রুক্মিণীকুমারের ক্ষণিকের পরিচয় তাহাকে চক্ষে না দেখিয়া শুধু স্বর শুনিয়া শরবিদ্ধ হওয়া এবং শিল্প-স্রষ্টার সোনার কাঠির স্পর্শে রাজকন্যায় পরিবর্ত্তিতা মাহেশের রথতলার সেই ভিখারিণীর সহিত বহুবর্ষ পরে তাঁহার বিবাহ স্বাভাবিক কিনা—উপকথার পাঠকের পক্ষে এই সকল বা অনুরূপ প্রশ্ন অবান্তর, কারণ সেখানকার মায়া-রাজ্যে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে রাতারাতি রাজপ্রাসাদ রচিত হইলে বা সোনার গাছে হীরার ফুল ফুটিলেও কোনরূপ বিস্ময়ের কারণ থাকে না।

---

১ 'রাধারাণী'র পরিকল্পনা সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র লিখিয়াছেন: 'গৃহ-বিগ্রহ রাধাবল্লভ জীউর রথযাত্রা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইত। ....বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটি লইয়া গৃহে বসিয়াছিলেন। রথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভীড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার আত্মীয়স্বজনের অনুসন্ধানার্থ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে "রাধারাণী" লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "রাধারাণী" রচনা করিয়াছিলেন।' বঙ্কিম-জীবনী, ৪৪২ পৃঃ।

২ পূর্ব্বে পৃথক পৃথক প্রকাশিত হইলেও ১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (নবেম্বর, ১৮৭৭ খ্রীঃ) তিনটি গল্পই একসঙ্গে 'উপকথা' নামে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু শিল্পী বঙ্কিম সত্যসত্যই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে রাতারাতি রাজপ্রাসাদ গড়িয়া তোলেন নাই বা সোনার গাছে হীরার ফুল ফোটান নাই। ইন্দিরার সৌভাগ্যোদয়ের পশ্চাতে রহিয়াছে রামরামবাবুর সহিত উপেন্দ্রবাবুর বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া সম্পর্ক এবং রমণবাবু ও সুভাষিণীর ষড়যন্ত্র; পুরন্দর ও হিরণ্ময়ীর মিলনের পশ্চাতে রহিয়াছে উভয়ের কল্যাণকামী আনন্দস্বামীর শুভ প্রচেষ্টা; এবং রুক্মিণীকুমারের সহিত রাধারাণীর মিলন সম্ভব হইয়াছে রাধারাণীর প্রিয়সখী বসন্তের মধ্যবর্ত্তিতায়। এইরূপে বঙ্কিম তাঁহার কাহিনীগুলিকে সম্ভাব্যের রাজ্যে টানিয়া আনিয়াছেন। এবং পরবর্ত্তীকালে 'উপকথা' আখ্যা বর্জ্জন করিয়া তিনি গল্পত্রয়ের উপন্যাস নামই বাহাল রাখিয়াছেন। সুতরাং উপন্যাসের আইনেই আমাদিগকে ইহাদের বিচার করিতে হইবে।

'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' সম্বন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতে পারে: ইহারা ছোট গল্প না উপন্যাস? ছোট গল্প মানবজীবনের পূর্ণায়তন চিত্র দেয় না। ইহা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সেই উদ্দেশ্যের পরিপোষক কোন বিশিষ্ট ঘটনা বা ঘটনাপরম্পরাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে এবং সেই বিশিষ্ট ঘটনা বা ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়া সেই বিশেষ উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করাই গল্প-লেখকের একমাত্র লক্ষ্য। উদ্দেশ্যের একত্ব (unity of motive) এবং গাঢ়ীকরণ (concentration) ইহার প্রাণ। 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়'তে ছোট গল্পের এই বৈশিষ্ট্যের অভাব লক্ষিত হয়; ক্ষুদ্র হইলেও এই গল্পদ্বয় প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্রাবয়ব উপন্যাস। 'ইন্দিরা' পূর্ণাবয়ব উপন্যাস।

'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' উভয়েই প্রণয়কাহিনী এবং উভয়ক্ষেত্রেই প্রণয়ের পরিণতি মিলনে। প্রথম যুগের উপন্যাসের ন্যায় 'যুগলাঙ্গুরীয়'তেও বঙ্কিম অতীতের প্রতিবেশ রচনা করিয়াছেন: হিরণ্ময়ী প্রাচীন তাম্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠীকন্যা। পক্ষান্তরে, 'রাধারাণী', 'বিষবৃক্ষে'র ন্যায়, সমসাময়িক যুগের কাহিনী, গল্পের নায়িকা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত স্বাধীনচেতা নারী। শিক্ষা ও প্রতিবেশের তারতম্যের ফলে হিরণ্ময়ী ও রাধারাণীর মধ্যে স্বভাবতঃই চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। উভয়েই প্রেমিকা। কিন্তু হিরণ্ময়ীর পিতা যখন তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন, তখন সে অবস্থায় বিবাহ তাহার পক্ষে মৃত্যুতুল্য হইলেও হিরণ্ময়ী মুখ ফুটিয়া কোনরূপ প্রতিবাদ বা আপত্তি করিতে পারিল না। ধনদাস শ্রেষ্ঠীও এ ব্যাপারে কন্যার মতামতের অপেক্ষা করিলেন না। (এস্থলে স্মরণীয় যে মৃণালিনীকেও ফিকির করিয়া বিবাহের উদ্যোগ পণ্ড করিতে হইয়াছে, এ সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে তিনি পিতার নিকট কোন কথা বলিতে পারেন নাই এবং তাঁহার পিতাও তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন নাই।) আধুনিক যুগের কামাখ্যাবাবু কিন্তু রাধারাণীর বিবাহ বিষয়ে

বসন্তের মারফত তাহার মতামত গ্রহণ করিলেন এবং রাধারাণীও তাঁহাকে জানাইয়া দিল যে রুক্মিণীকুমার ভিন্ন অপর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না। অবশ্য রাধারাণীর ব্যাপারে কামাখ্যাবাবুর দায়িত্ব কন্যার প্রতি পিতার দায়িত্ব হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের; তাহা হইলেও রাধারাণী ও কামাখ্যাবাবু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীই অতীতের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ আধুনিক।

রুক্মিণীকুমারের সহিত রাধারাণীর কোর্টশিপ-পর্ব্ব শুধু আধুনিক নহে, অতি-আধুনিক। এ সম্বন্ধে রাধারাণীর কৈফিয়ত এইরূপ: 'উঁতে আমাতেই যে কথাটা কি হবে? ক্ষতি কি, ইংরেজের মেয়ের কি হয়? আমাদের দেশে তাতে নিন্দা আছে, তা আমি দেশের লোকের নিন্দার ভয়ে কোন্ কাজটাই করি? এই যে উনিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি বিয়ে কর্‌লেম না, এতে কে না কি বলে? আমি ত বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কুমারী;—তা এ কাজ-টাও না হয় ইংরেজের মেয়ের মত হইল।' কিন্তু পাছে পাঠক তাহাকে ভুল বুঝিয়া ফেলেন, এই কারণে পরক্ষণেই বঙ্কিম তাহার মুখে বলাইতেছেন, 'তা যেন হলো; তাতেও বড় গোল! মম-বাতিতে গড়া মেয়েদের মাঝখানে প্রথাটা এই যে, পুরুষ মানুষেই কথাটা পাড়িবে। ইনি যদি কথাটা না পাড়েন? না পাড়েন, তবে—হে ভগবান্! বলিয়া দাও, কি করিব! লজ্জাও তুমি গড়িয়াছ—যে আগুনে আমি পুড়িতেছি, তাহাও তুমি গড়িয়াছ! এ আগুনে সে লজ্জা কি পুড়িবে না? তুমি এই সহায়হীনা অনাথাকে দয়া করিয়া, পবিত্রতার আবরণে আমাকে আবৃত করিয়া লজ্জার আবরণ কাড়িয়া লও। তোমার কৃপায় যেন আমি এক দণ্ডের জন্য মুখরা হই।' রাধারাণী দায়ে পড়িয়া মুখরা সাজিয়াছে, কিন্তু রাধারাণী ফ্লার্ট (flirt) নহে; তাহার পবিত্রতা তাহার প্রগল্‌ভ আচরণ শোভন করিয়াছে। রুক্মিণীকুমারের আগমনে তাহার চাঞ্চল্য, সহসা এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে হৃদয়াবেগ সংযত করিতে না পারিয়া সজল-নয়নে 'মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া' কক্ষত্যাগ (৫।-২১ পৃঃ), পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ধরা পড়িতে পড়িতে নিজেকে সামলাইয়া লওয়া (৭।-২৩ পৃঃ), অথচ ইহারই ফাঁকে ফাঁকে রুক্মিণীকুমারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানিয়া লওয়া—এক কথায় রাধারাণীর এই সময়ের প্রত্যেকটি আচরণের ভিতর দিয়া এই চরিত্রটি জীবন্ত রূপ ধারণ করিয়াছে।

কিন্তু 'রাধারাণী'র মৌলিক দুর্ব্বলতা রুক্মিণীকুমারকে লইয়া। সহৃদয় যুবকের পক্ষে বালিকা রাধারাণীর করুণ কাহিনী শুনিয়া তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইলেও রুক্মিণীকুমারের এই অনুকম্পা প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল কবে ও কেমন করিয়া? যাহাকে তিনি চক্ষে দেখেন নাই অজ্ঞাতকুলশীলা

সেই দরিদ্র বালিকার প্রতি প্রণয় কি নিতান্তই রূপকথার কাহিনীর ন্যায় অবিশ্বাস্য নহে ?

রাধারাণীর সহিত পুনঃ সাক্ষাৎকালেও এই চরিত্রটি বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। একটি বিশিষ্ট অবস্থায় তাঁহার আচরণের উল্লেখ করিতেছি: রুক্মিণীকুমারকে জেরা করিতে যাইয়া নিজেকে সংযত করিতে না পারিয়া রাধারাণী সহসা বলিয়া ফেলিল, 'যে রাধারাণী আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য—এইটুকু বলিতেই......ফুলের কুঁড়ির ভিতর যেমন বৃষ্টির জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলেই ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই, তাহার চোখের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল। অমনই যে দিকে রুক্মিণীকুমার ছিলেন, সেই দিকের মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সেঘর হইতে রাধারাণী বাহির হইয়া গেল। রুক্মিণীকুমার বোধ হয়, চক্ষের জলটুকু দেখিতে পান নাই, কি পাইয়াই থাকিবেন, বলা যায় না।' এস্থলে রাধারাণীর চিত্র অনবদ্য ; কিন্তু ইহার পার্শ্বে রুক্মিণীকুমার একেবারেই বর্ণহীন হইয়া পড়িয়াছেন। রাধারাণীর চক্ষের জল তিনি দেখিয়া থাকুন বা না দেখিয়া থাকুন, তাহার মুখের কথা তিনি নিশ্চিত শুনিতে পাইয়াছেন। অথচ এই অর্থপূর্ণ উক্তির অর্দ্ধপথে থামিয়া যাইয়া সহসা রাধারাণীর পক্ষে না বলিয়া কক্ষত্যাগ যে তাঁহার মনে কোনরূপ চাঞ্চল্য বা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে উপন্যাসে তাহার নিদর্শন নাই। ইহাতে আরও আশ্চর্য্য হইবার কারণ এই যে, কিছু পূর্ব্বেই কথা প্রসঙ্গে রাধারাণী যখন 'ছল ধরিয়া' বলিয়াছে, ''তোমার রাধারাণী।'''—'রুক্মিণীকুমারও তখন মনে মনে ছল ধরিল—''এ তুমি বলে কেন ? কে এ ?'' (৫।-১৯ পৃঃ)। মনে হয় রাধারাণীর চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে বঙ্কিম যে পরিমাণে সজাগ রহিয়াছেন, তাহার তুলনায় রুক্মিণীকুমার সম্পর্কে তিনি একেবারেই উদাসীন।

'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র গল্পাংশ আনন্দস্বামীর জ্যোতির্গণনার ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই হিসাবে ইহা 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী'র পশুপতি-মনোরমা কাহিনী এবং পরবর্ত্তীকালের 'সীতারামে'র সহিত তুলনীয়। কিন্তু এই সকল কাহিনীতে দেখিতে পাই বিধাতার অব্যর্থ লিখন মানুষের ক্ষুদ্র প্রয়াসকে বিড়ম্বিত করিয়াছে। 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' আনন্দস্বামী যে বিধাতার লিখন ব্যর্থ করিয়াছেন তাহা নহে ; প্রকৃতপক্ষে তিনি সেরূপ কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি অদৃষ্টের বিধান মানিয়া লইয়া তাহারই ফাঁকে কৌশলে বিধাতার অভিশাপের সহিত আশীর্ব্বাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

পুরন্দর-হিরণ্ময়ীর বাল্যপ্রণয় প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় স্মরণ করাইয়া

দেয়। এই প্রসঙ্গে হিরণ্ময়ী ও শৈবলিনীর চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষণীয়। হিরণ্ময়ী পিতার ব্যবস্থানুযায়ী বিবাহ করিল, আনন্দস্বামী বিবাহরাত্রে তাহাকে যে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন, অনুরূপ অঙ্গুরীয় রাজা মদনদেবের নিকট দেখিতে পাইয়া এবং বিবাহরাত্রে আনন্দস্বামী ঐ অঙ্গুরীয় তাঁহার হস্তে পরাইয়া দিয়াছেন, রাজা মদনদেবের মুখে এইরূপ বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে 'আর্য্যপুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও তাহার মনে হইল, "আমি এত দিন পুরন্দরকে পাই নাই বটে, কিন্তু পরপত্নীত্বের যন্ত্রণাভোগ করি নাই, এখন হইতে আমার সে যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। আর আমি হৃদয়মধ্যে পুরন্দরের পত্নী—কি প্রকারে অন্যানুরাগিণী হইয়া এই মহাত্মার গৃহ কলঙ্কিত করিব?" (৯।-)। অতঃপর রাজা মদনদেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া হিরণ্ময়ী মুহূর্ত্তে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল এবং পুরন্দরের প্রতি তাহার আসক্তির স্বীকারোক্তি সহজ করিবার উদ্দেশ্যে, রাজা মদনদেব তাহাকে যে রত্নহার পাঠাইয়াছিলেন, পুরন্দরপ্রদত্ত মনে করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেও, সে রত্নহার সে প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং পরে অমলার মারফত তাহা রাজা মদনদেবের নিকট বিক্রয় করিয়াছে, এই মিথ্যা কলঙ্কও সে অসঙ্কোচে বরণ করিয়া লইল। পক্ষান্তরে, শৈবলিনী অশুচি মন লইয়া বৎসরের পর বৎসর চন্দ্রশেখরের সংসার করিল, কিন্তু সহজ অবস্থায় তাহার পাপ বাসনার কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিল না! হিরণ্ময়ীর প্রণয় কামনাদুষ্ট নহে। দুর্দ্দশাগ্রস্ত হিরণ্ময়ী যেদিন শুনিল পুরন্দর অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া সিংহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, সেদিন মুহূর্ত্তের জন্য তাহার 'হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল', পুরন্দর তাহাকে রত্নহার পাঠাইয়াছেন, এ সংবাদ তাহাকে 'ক্ষণেক বিমনা' করিল। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা সাময়িক, ইহা তাহাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারিল না। হিরণ্ময়ী নিজেকে কুলটা বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজা মদনদেবকে বিবাহের কথা বিস্মৃত হইতে অনুরোধ করিল; কিন্তু সত্যই যদি সে রাজমহিষী হইত তাহা হইলে বাল্যপ্রণয় স্মরণ করিয়া রাজার প্রতি কর্ত্তব্যবোধে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেও পুরন্দরের পশ্চাতে ছুটিয়া সত্যকার কুলটা সাজিত না।

মোটের উপর হিরণ্ময়ীর চরিত্রাঙ্কন অনবদ্য। পুরন্দরের মুখে তাঁহার সিংহলযাত্রার সঙ্কল্প শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহত্যার চিন্তা; পরক্ষণেই জীবনের আকর্ষণে এই চিন্তা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলার নিষ্ফল প্রয়াস; পরে নিরুপায় হইয়া পুনরায় কাঁদিতে বসা; দীর্ঘ বৎসর পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিবেশে, পুরন্দর তাম্রলিপ্ত প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া তিনি তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, এইরূপ অনুভূতির ফলে গোপনে অশ্রুবিসর্জ্জন;

তিনি আজিও অবিবাহিত এই সংবাদে 'ইন্দ্রিয় সকল অবশ' হওয়া; রাজা মদনদেবকে 'আর্য্যপুত্র' সম্বোধনান্তর হীরকহার সম্বন্ধে অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়া মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যের প্রেরণায় মিথ্যা কলঙ্ক মাথা পাতিয়া লওয়া—এইরূপ বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে তাহার প্রত্যেকটি আচরণে, শক্তিতে ও দুর্ব্বলতায় এই চরিত্রটি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই: পুরন্দরের প্রতি আসক্তি স্মরণ করিয়া যে নারী রাজা মদনদেবের সম্মুখে মুখরা সাজিল, বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বেও যাহার চিন্তার ধারা এইরূপ: 'পুরন্দরের সঙ্গে যদি বিবাহ না হইল—তবে যে হয় তাহার সঙ্গে বিবাহ হউক—সে আমার স্বামী হইবে না।' (৩।-৭পৃঃ)।—তাহার পক্ষে বিনা প্রতিবাদে বিবাহে সম্মতিজ্ঞাপন কি স্বাভাবিক? অবশ্য, পিতার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় প্রতিবাদ হয়ত সহজ বা সম্ভব ছিল না (ঠিক এই কারণেই এই কাহিনীতে সুদূর অতীতের প্রতিবেশের প্রয়োজন হইয়াছে), কিন্তু বিবাহে বিঘ্ন ঘটাইবার কোনরূপ পরোক্ষ চেষ্টা (মৃণালিনীর আচরণ স্মরণীয়) কি এক্ষেত্রে অধিকতর স্বাভাবিক ছিল না? অনুরূপ অবস্থায় পুরন্দরের আচরণও আদর্শ হিসাবে পিতৃভক্তির দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে (ইহা কি ব্রজেশ্বরের অপরিণত খসড়া?), কিন্তু ইহা সজীব মনের পরিচয় দেয় না। পুরন্দর ব্যক্তিত্ববর্জ্জিত ছায়াময় চরিত্র।

'ইন্দিরা' সম্পূর্ণ রোমাণ্টিক প্রতিবেশে সমাজ-জীবনের চিত্র। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য রচনাপদ্ধতির অভিনবত্ব; এই উপন্যাসে বঙ্কিম নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রাখিয়া নায়িকার মুখে সুখদুঃখপূর্ণ তাহার বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। উপন্যাস-সাহিত্যে এইরূপ রচনাপদ্ধতি নূতন না হইলেও বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। ইহার অসুবিধা এই যে উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার ব্যঞ্জনা চরিত্রবিশেষের (অর্থাৎ বক্তার) দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হয়, যাহার ফলে হয়ত অন্যান্য চরিত্রের নিরপেক্ষ বিচার ও বিশ্লেষণের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। আলোচ্য উপন্যাসে ইন্দিরা তাহার স্বভাবসুলভ ঔদার্য্যগুণে প্রত্যেক চরিত্রের প্রতি যথাসম্ভব সুবিচার করিয়াছে, মোটের উপর একথা সত্য হইলেও, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে নায়িকা এক্ষেত্রে এক তরফা ডিক্রী পাইয়াছে, বেচারা উ-বাবুর আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলিবার ছিল কিনা, পাঠক তাহা জানিবার সুযোগ পান নাই।

এইরূপ রচনাপ্রণালীতে আর একটি বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন; তাহা এই যে, সমগ্র কাহিনীর ভাব ও ভাষায় বক্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকিতে হইবে। এ বিষয়ে বঙ্কিমের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ; ইন্দিরার প্রতিটি কথা,

ভাবে ও ভাষায়, তাহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। এই হিসাবে 'ইন্দিরা'র জগৎ সম্পূর্ণ নারীর জগৎ। এবং ঠিক এই কারণেই এই উপন্যাসে কোন পুরুষচরিত্র সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। ইন্দিরার আশ্রয়দাতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণদাসবাবু, রামরামবাবু এবং রমণবাবুকে আমরা ততটুকু দেখিতে পাই যতটুকু তাঁহারা ইন্দিরার সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং তাহাও ইন্দিরার দৃষ্টি দিয়া। এমন কি, নায়ক উপেন্দ্রবাবুও কোনরূপ প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন নাই। উপেন্দ্রবাবু নারীর রূপমুগ্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুবক এবং তাঁহার হাস্যোদ্দীপক কার্য্য দ্বারা তিনি ইন্দিরা ও কামিনী—কৌতুকপ্রিয় এই ভগিনী-দ্বয়ের রঙ্গরসের রসদ যোগাইয়াছেন। পক্ষান্তরে, যে শক্তি ও বুদ্ধিবলে 'কমি-সেরিয়েটের কর্ম্ম' করিয়া তিনি দরিদ্র অবস্থা হইতে প্রভূত অর্থের অধিকারী হইলেন, উপন্যাসে তাহার কোন পরিচয় নাই। অবশ্য ইহা উপন্যাসের ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ উপন্যাসের পরিকল্পনায় ঔপন্যাসিক যাহা দিতে চাহেন নাই, উপন্যাসে তাহা খুজিয়া না পাইলে তাহাতে অভিযোগের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

কিন্তু উপেন্দ্রবাবুর চরিত্রের যে দিকটা উপন্যাসে প্রতিভাত হইয়াছে তাহার পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ রহিয়াছে। এক, তাহার অন্ধ কুসংস্কার। যে কোন লোকের পক্ষেই খানিকটা অন্ধসংস্কার হয়ত অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য নহে। কিন্তু উপেন্দ্রবাবু যে ভাবে ইন্দিরাকে বিদ্যাধরী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলেন, তাহা কি স্বাভাবিক? ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত—উভয়েই এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন,[১] এবং তাঁহাদের অভিযোগের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য্য। প্রকৃত-পক্ষে, এইরূপ অভিযোগের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়াই বঙ্কিম ইন্দিরার মুখে এ বিষয়ে মোটামুটি রকমের একটা কৈফিয়ত রাখিয়া গিয়াছেন।[২] ইন্দিরা স্বামীর সম্বন্ধে বলিতেছে, "তিনি বুদ্ধিমান্ কর্ম্মঠ লোক। নহিলে এত অল্প দিনে এত টাকা রোজগার করিতে পারিতেন না। ...কিন্তু রমণবাবুর মত, এখনকার ছেলের মত, "উচ্চ শিক্ষা" শিক্ষিত নহেন। তিনি ঠাকুর দেবতা মানিতেন। নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া, ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী, যোগী মায়াবিনী প্রভৃতির গল্প শুনিয়াছিলেন। সে সকল একটু বিশ্বাস করিতেন। তিনি আমার দ্বারা যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার এই সময়ে স্মরণ

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (তৃতীয় সংস্করণ), ৯৭ পৃঃ; বঙ্কিমচন্দ্র, ২১৩ পৃঃ।

২। তাঁহার অভিযোগের অব্যবহিত পরেই ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বঙ্কিমের তরফ হইতে এই কৈফিয়তের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

হইল ; যাহাকে আমার অসাধারণ বুদ্ধি বলিতেন, তাহাও স্মরণ হইল।.... অতএব আমি যে বলিলাম, 'আমি মানুষী নহি, তাহাতে তাঁহার একটু বিশ্বাস হইল।''' (১৮।-)। তথাপি উপেন্দ্রবাবু বুদ্ধি দ্বারা এই বিশ্বাসকে দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণেই তিনি এই সময় ইন্দিরাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং জেরায় যখন ইন্দিরা নিখুঁতভাবে উত্তীর্ণ হইল, তখনও তিনি অন্ধসংস্কারকে আঁকড়িয়া ধরিলেন না ; কুমুদিনী সত্যই 'মায়াবিনী' এরূপ সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দিতে না পারিলেও, তাঁহার সন্দেহ হইল হয়ত বা সে 'স্বয়ং ইন্দিরা'। ইহার পরে রমণবাবুর সহিত কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়াও (১৯।-) তাঁহার মনের এই সন্দেহের আভাস পাওয়া যায়। রমণবাবু যখন ইন্দিরার সহিত স্বর মিলাইয়া বলিলেন, "সুভাষিণী বলেন, কুমুদিনী শাপগ্রস্ত বিদ্যাধরী", উপেন্দ্রবাবু তদুত্তরে বলিলেন, "কুমুদিনী কি ইন্দিরা, আপনার স্ত্রীকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন।" ইন্দিরার (উপেন্দ্রবাবুর দৃষ্টিতে কুমুদিনী) সহিত পরামর্শানুযায়ী মহেশপুরে যাইয়াও কামিনীর নিকট প্রথমে তিনি কুমুদিনী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন না, তাহাকে তাহার দিদির কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্থাৎ তিনি মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে, মহেশপুর পৌঁছিয়া কুমুদিনী আর কুমুদিনী থাকিবে না, ইন্দিরায় রূপান্তরিত হইবে। কিন্তু উপেন্দ্রবাবু রূপোন্মাদ, তাঁহার আশঙ্কা পাছে কুমুদিনীকে হারাইয়া বসেন ; সুতরাং যখন শুনিলেন যে, ইন্দিরার কোন খবর পাওয়া যায় নাই, তখন (ইন্দিরার জন্য নহে) বুঝি বা কুমুদিনীকে হারাইলেন, এই ভাবিয়া তিনি এতই অভিভূত হইলেন যে, যে বিচারবুদ্ধি দ্বারা তিনি অন্ধসংস্কারকে অগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা লোপ পাইল এবং তিনি অতি সহজেই সম্পূর্ণরূপে ইন্দিরা ও কামিনীর ফাঁদে পড়িলেন। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুর আচরণের ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বল কৈফিয়ত। তাঁহার বিস্ময়সূচক উক্তি ('তুমি মানুষ, না কোন মায়াবিনী ?') হইতে ইঙ্গিত পাইয়া বিদ্যাধরীর পরিকল্পনা ইন্দিরার চরিত্রানুরূপ এবং ভবিষ্যতে হাসির রসদ যোগাইবে বলিয়া ইহা তাহার নিকট লোভনীয়ও বটে। কিন্তু উপেন্দ্র-বাবুর চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া ইহাকে ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

উপেন্দ্রবাবুর চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্নটিও অল্পতঃ কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। উপেন্দ্রবাবু রূপপিপাসু ; এ হিসাবে তাঁহাকে নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের সহিত তুলনা করা চলে। রূপের নেশায় বিভ্রান্ত হইয়া নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে বিবাহ করিলেন, গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া সমাজ ত্যাগ করিলেন। রূপের নেশায় মজিয়া উপেন্দ্রবাবু পাচিকারূপিণী ইন্দিরাকে অভিসারিকার বেশে

তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন এবং তাহার ইচ্ছাক্রমে তাহাকে গভীর নিশীথে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। এ পর্য্যন্ত বুঝিলাম। কিন্তু এই 'আস্ত কেউটে' যখন অষ্টাহকাল তাঁহার উপর হাসিচাহনির বিষ উদ্গিরণ করিতে লাগিল, তখন সৌন্দর্য্যমুগ্ধ উপেন্দ্রবাবুর হাবভাবে দেহের ক্ষুধার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। এ সম্বন্ধে ইন্দিরার উক্তি এইরূপ: 'আমি হাসিতে জানি, হাসির কি উতোর নাই? আমি চাহিতে জানি, চাহনির কি পাল্টা চাহনি নাই? আমার অধরোষ্ঠ দূর হইতে চুম্বনাকাঙ্ক্ষায় ফুলিয়া থাকে, ফুলের কুঁড়ি পাপড়ি খুলিয়া ফুটিয়া থাকে, তাঁহার প্রফুল্লরক্তপুষ্পতুল্য কোমল অধরোষ্ঠ কি তেমনি করিয়া, ফুটিয়া উঠিয়া, পাপড়ি খুলিয়া আমার দিকে ফিরিতে জানে না? আমি যদি তাঁর হাসিতে, তাঁর চাহনিতে, তাঁর চুম্বনাকাঙ্ক্ষায়, এতটুকু ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দেখিতাম, তবে আমিই জয়ী হইতাম। তাহা নহে। সে হাসি, সে চাহনি, সে অধরোষ্ঠবিস্ফুরণে, কেবল স্নেহ—অপরিমিত ভালবাসা। কাজেই আমিই হারিলাম। হারিয়া স্বীকার করিলাম যে, ইহাই পৃথিবীর ষোল আনা সুখ।' (১৬০-, ৬১ পৃঃ)। 'ইহাই পৃথিবীর ষোল আনা সুখ' কিনা, অথবা 'যে দেবতা ইহার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, তাহার নিজের দেহ যে ছাই হইয়া গিয়াছে' তাহা 'খুব হইয়াছে' কিনা, এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দেহের সম্বন্ধবিহীন এই যে ভালবাসা, অন্ততঃ উপেন্দ্রবাবুর পক্ষে ইহা কি স্বাভাবিক?

'ইন্দিরা'র আলোচনাপ্রসঙ্গে ডক্টর সেনগুপ্ত আরও কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন।[১] ইন্দিরার ডাকঘর সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং যেখানে সে প্রথম আশ্রয় পায় সেখানে কেহ যে তাহার পিতৃগৃহে সংবাদপ্রেরণের কথা চিন্তা করে নাই—এই উভয় অভিযোগ সম্বন্ধেই বঙ্কিম নিজেই হয়ত সচেতন ছিলেন এবং মোটামুটি কৈফিয়তও রাখিয়া গিয়াছেন। (৪০- ও ১০০- দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অন্তঃপুরচারিণী 'রাজার দুলালী' হইলেও ডাকঘর সম্বন্ধে ইন্দিরার অজ্ঞতা নিঃসন্দেহ বিস্ময়কর। এবং পাড়াগেঁয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণের একথা মনে না আসিলেও কৃষ্ণদাসবাবুর পক্ষে ইন্দিরাকে লইয়া কলিকাতা আসার পূর্ব্বে তাহার পিত্রালয়ে, ইহা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ নিকটবর্ত্তী থানায় সংবাদ দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। ডক্টর সেনগুপ্তের উভয় অভিযোগই অখণ্ডনীয়। তাঁহার তৃতীয় অভিযোগের একটুক্ বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। অভি-

১। বঙ্কিমচন্দ্র, ২১২-১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

যোগটি এইরূপ: 'স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইন্দিরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহাই যে একমাত্র পথ এই কথাও আমাদিগকে ইন্দিরার কথা হইতেই মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে ইন্দিরাকে লইয়া এমন কোন সামাজিক গোলযোগ হয় নাই যাহার জন্য এত বড় ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে।' ইন্দিরা যখন অভিসারিকার বেশে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, তখন তাহার সম্বন্ধে স্বামীর মনোভাব কৌশলে বুঝিয়া লওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং তখন পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে সে কোন কিছুই স্থির করে নাই। কিন্তু উপেন্দ্রবাবু যখন স্পষ্টই বলিলেন যে, ইন্দিরাকে পাওয়া গেলেও তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন না, কারণ 'তাহার আর জাত নাই বিবেচনা করিতে হইবে', তখন ছদ্মবেশেই তাহাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করা ভিন্ন ইন্দিরার আর উপায়ান্তর রহিল না। তাহাকে লইয়া শেষ পর্য্যন্ত 'কোন সামাজিক গোলযোগ হয় নাই', একথা সত্য, কিন্তু তাহার প্রধান কারণ তাহার স্বামীর ঐশ্বর্য্য। কিন্তু উপেন্দ্রবাবু যদি তাহাকে তাহার ন্যায্য অধিকার ফিরাইয়া দিতে অসম্মত হইতেন, তাহা হইলে সমাজে তাহার স্থান হইত কোথায়? ডক্টর সেনগুপ্তও এরূপ প্রশ্নের যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অভিযোগের পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন, 'অবশ্য এই কথা বলা যাইতে পারে যে যদি ইন্দিরা স্বামীকে বশীভূত করিতে না পারিত তাহা হইলে শ্বশুরালয়ে তাহার স্থান হইত না।' তাঁহার প্রধান আপত্তি 'বিদ্যাধরী-ঘটিত অংশ' লইয়া। এ ব্যাপারে 'কৌতুকপ্রিয়' ইন্দিরার দিক দিয়া তিনি কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। তাঁহার আপত্তি উপেন্দ্রবাবুর চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইন্দিরার জগৎ নারীর জগৎ; নারীর দৃষ্টি দিয়া দেখা এই জগৎকে বঙ্কিম নিপুণ তুলিতে চিত্রিত করিয়াছেন। ইংরেজ ঔপন্যাসিক মেরি অ্যান্ ইভান্স (Mary Ann Evans; ইনি George Eliot নামে সুপরিচিতা) যখন জর্জ ইলিয়ট এই ছদ্মনামে মাসিকপত্রে তাঁহার গল্প প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তখন অনেকেই তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন এবং জনৈক সমালোচক সেদিন এই মর্ম্মে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এই প্রতিভাবান লেখক সম্ভবতঃ তাঁহার বিদুষী পত্নীর নিকট হইতে নারী-জগতের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। 'ইন্দিরা' পাঠ করিয়া বঙ্কিম সম্বন্ধেও ঠিক এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিবার প্রলোভন জন্মে। বিবাহের পর দীর্ঘ দিন স্বামীর ঘর করিতে না পারায় বয়ঃপ্রাপ্তা নারীর পিতামাতার

উপর অভিমান এবং সুকৌশলে তাহার অভিব্যক্তি,[১] ঘটনাচক্রে বিবাহের পর স্বামীসঙ্গসুখবঞ্চিতা নারীর প্রথম স্বামীসন্দর্শনে যাত্রাকালীন চিত্তের ব্যগ্রতা এবং ছোটখাটো কার্য্যের ভিতর দিয়া এই ব্যগ্রতার পরোক্ষ প্রকাশ,[২] সহসা ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নিরাভরণা হইলেও এয়োতি নারীর পক্ষে যাহাতে হাত খালি না থাকে যে কোন উপায়ে তাহার চেষ্টা,[৩] গঙ্গার ঘাটে জল আনিতে যাইয়া পল্লীবালিকার 'মলবাজানর গান,[৪] বৃদ্ধা গৃহিণীর 'সোমত্ত' মেয়েকে রাঁধুনি বা পরিচারিকারূপে নিযুক্ত করার আপত্তি,[৫] রন্ধনশালার কৌতুকপূর্ণ ইতিহাস, মায় 'লঙ্কার ফোড়ন'টুকু পর্য্যন্ত, ফুলশয্যার রাত্রে কনে সাজাইবার পর্ব্ব,[৬] বাসর-ঘরের 'নির্লজ্জ ব্যাপার'—কোন কিছুই বঙ্কিমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এবং এই নারীর জগৎ সম্পূর্ণ করিয়াছে সুভাষিণীর পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা হেমা ও তাহার তিন বৎসরের শিশুভ্রাতা, যাহাকে সূত্র ধরিয়া সুভাষিণী ইন্দিরার সহিত 'বেহাইন' সম্পর্ক পাতাইল। কথায় কথায় হেমার ছড়া[৭] এবং

১ ইন্দিরা বলিতেছে, 'রাগে আমার শরীর গর গর করিত। ...পিতামাতার উপর রাগ হইত—কেন, পোড়া টাকা উপার্জ্জনের কথা তাঁহারা তুলিয়াছিলেন? টাকা কি আমার সুখের চেয়ে বড়। আমার বাপের ঘরে অনেক টাকা—আমি টাকা লইয়া "ছিনিমিনি" খেলিতাম। মনে মনে করিতাম, একদিন টাকা পাতিয়া শুইয়া দেখিব—কি সুখ? একদিন মাকে বলিলাম, "মা, আমি টাকা পাতিয়া শুইব।" মা কথাটা বুঝিলেন।'

২ যাত্রাকালে "দিদি! আবার কবে আসিবে?" কামিনীর এই প্রশ্নের উত্তরে ইন্দিরা তাহার গাল টিপিয়া ধরিল।

৩ ইন্দিরা দস্যুদিগকে অপর সকল অলঙ্কার নিজেই খুলিয়া দিল, কিন্তু হাতের বালা তাহাদিগকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে হইল। এবং রাত্রির অবসানে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ইন্দিরা যখন দেখিল, তাহার 'হাতে কিছু নাই, বাঁ হাতে একটুক্‌রা লোহা আছে—কিন্তু দাহিন হাতে কিছু নাই, তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে একটু লতা ছিঁড়িয়া দাহিন হাতে বাঁধিল।

৪ 'ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে' ছড়াটি যে চিত্র জাগাইয়া তোলে তাহা সহজে ভুলিবার নহে।

৫ 'কালির বোতল' সোমত্ত বলিয়া ইন্দিরাকে নিযুক্ত করিতে চাহেন নাই, পরে যখন পুত্রের খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবিয়া তাহাকে নিযুক্ত করিলেন, তখনও বৃদ্ধ রামরামবাবুকে পরিবেশন করা সম্বন্ধে তাঁহার নিষেধাজ্ঞা ছিল।

৬ ইন্দিরাকে ফুলের সাজে সাজাইয়া তাহাকে লইয়া সুভাষিণীর রঙ্গরস ফুলশয্যার রাত্রে নব পরিণীতাকে স্বামীসম্ভাষণের জন্য সাজাইবার চিত্রের অনুরূপ।

৭ হেমা সকল সময়েই তাহার ছড়ার ভাণ্ডার লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রান্না হয়েছে, হেমা?" অমনি হেমা উত্তর করিল,

"বেশ গো বেশ,
বাঁধ বেশ, বাঁধ কেশ,
বকুল ফুলের মালা।
রাঙ্গা সাড়ী, হাতে হাঁড়ী
রাঁধছে গোয়ালার বালা।" ইত্যাদি।

আবার বামন ঠাকুরাণী যখন ইন্দিরার 'মুণ্ড ভোজনের জন্য' পুনঃ পুনঃ যমকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল, তখনও হেমার ছড়ার শ্লোক মনে পড়িল:

"যে ডাকে যমে।
তার পরমাই কমে।" ইত্যাদি।

তাহার শিশুভ্রাতার ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুলি উপন্যাসখানিকে স্নিগ্ধ বাৎসল্যরসে সিঞ্চিত করিয়াছে।

'ইন্দিরা'র প্রধানতম আকর্ষণ হাস্যরসের প্রাচুর্য। ইন্দিরার দুঃখের কাহিনী বলিতে যাইয়া কুশলী শিল্পী অফুরন্ত হাসি পরিবেশন করিয়াছেন। এই কাহিনীর উপক্রমণিকা হিসাবে পাশ্চাত্ত্য কবি শেলির 'Rarely, rarely comest thou' কবিতাটির কয়েকটি বিশিষ্ট স্তবকের উদ্ধৃতি তাৎপর্যপূর্ণ। ইহার প্রতিটি ছত্রে ইন্দিরা তাহার অন্তরের প্রতিধ্বনি খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাই হাসির আবরণে সে তাহার দুঃখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং অপরকে শুধু যে তাহার দুঃখের তীব্রতা অনুভব করিতে দেন নাই তাহা নহে, পাচিকারূপেও আশ্রয়দাতার গৃহখানি আনন্দমুখর করিয়াছে। এবং ইন্দিরাকে কেন্দ্র করিয়া সুভাষিণীর শাশুড়ী, বৃদ্ধা বামন ঠাকুরাণী, ঝি হারাণী, সুভাষিণী ও তাহার পুত্রকন্যা, কামিনী ও উপেন্দ্রবাবু—ইঁহাদের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে হাসির উপকরণ যোগাইয়াছেন। সুভাষিণীর শাশুড়ী ও বামন ঠাকুরাণীর বার্দ্ধক্যে তরুণী সাজিবার সাধ এবং উপেন্দ্রবাবুর রূপোন্মাদ ও অন্ধসংস্কার অতি সহজেই তাঁহাদিগকে হাস্যকৌতুকের লক্ষ্যবস্তু করিয়াছে।

বঙ্কিমের হাসি সর্ব্বদাই সুসংযত ও সুরুচিসঙ্গত। এর হাস্যোদ্দীপক রূপবৈচিত্র্য বর্ণনায় ও অনুরূপ কাহিনীর পরিকল্পনায় তাঁহার দক্ষতা অনন্য-সাধারণ। আলোচ্য উপন্যাসে সুভাষিণীর শাশুড়ীর রূপবর্ণনা উল্লেখযোগ্য এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র গজপতি ও আশমানীর রূপবর্ণনার আতিশয্যের সহিত ইহার স্বাভাবিকত্বের পার্থক্য লক্ষণীয়। 'সুভাষিণীর শাশুড়ী ছাদের উপর অন্ধকারে, একটি পাটি পাতিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়া আছেন।' ইন্দিরার মনে হইল 'একটা লম্বা কালির বোতল গলায় গলায় কালি ভরা, পাটির উপর কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাকা চুলগুলি বোতলটির টিনের ঢাকনির মত শোভা পাইতেছে। অন্ধকারটা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।' বর্ণনায় আড়ম্বরের বাহুল্য নাই, অথচ দু'একটি কথায় একটি কালো কুৎসিত পক্ককেশ বৃদ্ধার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই 'কালির বোতল'টি এবং বামন ঠাকুরাণীর দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ইন্দিরার রঙ্গরসের কাহিনী একদিকে যেমন তাহার চরিত্রের উপর আলোকপাত করে, অন্যদিকে তেমনই খণ্ড খণ্ড স্বয়ং-পূর্ণ কাহিনী হিসাবে এগুলি পিক্‌উইক্ পেপার্সের (Pickwick Papers) খণ্ড খণ্ড কাহিনীর ন্যায় উপভোগ্য।

বঙ্কিমের হাস্যরসের অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ সুভাষিণীর নিকট ইন্দিরার 'একজামিন' দেওয়ার চিত্র। (১৩।-)। শ্রেষ্ঠ রসিক শুধু যে হাসিতে ও

হাসাইতে জানেন তাহা নহে, তিনি জানেন হাসির সহিত কান্নার নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে ; আলো ও ছায়ার ন্যায় ইহারা পরস্পরের নিত্যসঙ্গিনী এবং একের অনুভূতি ব্যতিরেকে অপরের অনুভূতি সম্পূর্ণ হয় না। হাসির তরলতা ভেদ করিয়া কান্নার সুর তাঁহার কানে পৌঁছায়, তাই তাঁহার হাসি কারুণ্যের রসে সিঞ্চিত হইয়া পরিশুদ্ধ হয়। সুভাষিণী ও ইন্দিরার পরস্পরের নিকট হইতে বিদায়কালীন হাসি এইরূপ বেদনায় পরিশুদ্ধ হাসি। অভিসারিকার বেশে হইলেও ইন্দিরা স্বামীসম্ভাষণে যাইতেছে, এতদিনে বুঝি তাহার দুঃখের রাত্রি পোহাইল. ইহা ভাবিতে সুভাষিণীর আনন্দ, ইন্দিরার আনন্দ। তাই দুই সখীতে মিলিয়া হাস্য পরিহাসের অবধি নাই। সুভাষিণী ইন্দিরাকে ফুলের গাছে সাজাইতেছে, তাহাকে পুরুষ কল্পনা করিয়া 'সযত্নে স্বহস্তে সুবাসিত প্রস্তুত' রমণবাবুর জন্য স্বতন্ত্ররক্ষিত পানের খিলি হাতে তুলিয়া দিতেছে, আলবোলার নলটি তাহার মুখের সম্মুখে ধরিতেছে, 'হাসিতে হাসিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, কানবালা দোলাইয়া, সে যে সং সাজিয়াছে, তারই অনুরূপ কথা কহিতেছে।' কখন বা নিজেকে উ—বাবু কল্পনা করিয়া 'জমকাইয়া' বসিয়া পরক্ষণেই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে, আর ইন্দিরা তাহার সম্মুখে হাসি চাহনির পরীক্ষা দিতেছে। কিন্তু এই হাসির উৎসবের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া উভয়েরই মনে হইতেছে, আজিকার রাত্রির পরে আর হয়ত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে না ; অমনি অশ্রু আসিয়া হাসির কণ্ঠরোধ করিতেছে। তাহাদের অধরে হাসি, চক্ষে জল।

দরদী মন ও পরিহাসপ্রবণতা—উভয়দিক দিয়াই সুভাষিণী কমলমণির সহোদরাস্থানীয়া।[১] কমলমণি যেমন এক মুহূর্ত্তে কুড়াইয়া পাওয়া কুন্দকে আপনার করিয়া লইল, সুভাষিণীও তেমনই এক মুহূর্ত্তে সর্ব্বহারা ইন্দিরাকে আপনার করিয়া লইল। সুভাষিণী ও ইন্দিরা সমবয়স্কা, নহিলে ইন্দিরা কুন্দের মত বালিকা হইলে সুভাষিণীও হয়ত তাহাকে 'টবে' ফেলিয়া 'স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপে'র সাহায্যে ধুইয়া মুছিয়া সাজাইয়া দিত। কুন্দ কমলমণির কনিষ্ঠ সহোদরাতুল্য, সুতরাং তাহার প্রতি কমলমণির আচরণ কনিষ্ঠার প্রতি জ্যেষ্ঠার স্নেহব্যঞ্জক ; ইন্দিরা সুভাষিণীর সখীসদৃশা, সুতরাং হাস্যকৌতুকেই তাহাদের ভালবাসার অভিব্যক্তি। কমলমণি ও সুভাষিণী

১। ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন 'বিষবৃক্ষে' যেমন সূর্য্যমুখীর চরিত্রে, 'ইন্দিরা'য় তেমনই সুভাষিণীর 'রূপবর্ণনা ও গুণকীর্ত্তনে' বঙ্কিমের সহধর্ম্মিণী রাজলক্ষ্মী দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। সুভাষিণী যেমন হারাণীকে দিয়া অসময়ে স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রকেও এরূপ ডাকিয়া পাঠান হইত।' বঙ্কিমচন্দ্র : প্রথম খণ্ড, ২২০-২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

উভয়েই অহঙ্কারবর্জ্জিতা, কমলমণি কখনও মনে করেন নাই কুন্দ তাঁহার সহোদরের আশ্রিতা ; সুভাষিণীও কখন মনে করে নাই ইন্দিরার সে আশ্রয়-দাত্রী। মুহূর্ত্তের দর্শনেই সুভাষিণী ইন্দিরাকে নিজের কাছে টানিয়া নিয়া 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার সকল দ্বিধা ও সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়াছে।

শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির দাম্পত্যজীবনের চিত্রের ন্যায় আমরা রমণবাবু ও সুভাষিণীর দাম্পত্যজীবনের কোন চিত্র পাই না। রমণবাবুকে আমরা সুভাষিণীর সম্মুখে দেখিতে পাই মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য, তাহাও তৃতীয় ব্যক্তি ইন্দিরার সম্মুখে। কিন্তু তাহাতেই আমরা যেটুকু আভাস পাই তাহাতে মনে হয় যে, হাস্যকৌতুকে এবং আনন্দের প্রাচুর্য্যে তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির দাম্পত্যজীবনের অনুরূপ ছিল। এইরূপ সুভাষিণীর তিন বৎসরের শিশুপুত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শিশুমন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে একই প্রকারের। সুতরাং শ্রীমান সতীশচন্দ্র যখন এক বৎসরের স্থলে তিন বৎসরের কোঠায় পড়িল, তখন সে যে সুভাষিণীর পুত্রের ন্যায় মায়ের হাসিমুখের নিষেধ অমান্য করিয়া নিজেকে 'বাবু' এবং বাবাকে 'পাজী' প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া কমলমণির জীবনে নূতন আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

ইন্দিরার চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য প্রাণরসের প্রাচুর্য্য। এই কারণেই কোন অবস্থাতেই সে একেবারে নুইয়া পড়ে নাই। বিপদের প্রথম আঘাতে ইন্দিরা মরিতে চাহিয়াছে, রাত্রির অন্ধকারে গভীর বনের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে মৃত্যুকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু প্রভাতে 'রবিরশ্মিপ্রভাসিত' পৃথিবী দেখিয়া, পাখীর হর্ষোৎফুল্ল কলতান শুনিয়া, 'লতায় লতায় পুষ্পরাশি দুলিতে দেখিয়া' আবার তাহার বাঁচিবার সাধ হইল। ইন্দিরা পৃথিবীকে ভালবাসে, পৃথিবীর আনন্দ উৎসব ভালবাসে, ইন্দিরা মরিতে চাহে না। তাহার মরা হইল না।

কৃষ্ণদাসবাবুর পত্নীর মুখে 'দাসীপনা'র প্রস্তাব শুনিয়া ইন্দিরা 'আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে' কাঁদিয়া ফেলিয়াছে (৬।-), সুভাষিণীর শাশুড়ীর কুৎসিত ইঙ্গিতে সে অশ্রুরোধ করিতে পারে নাই (৭।-), কিন্তু সুভাষিণীর গৃহে প্রকৃত আশ্রয়লাভ করিবার পর প্রসঙ্গতঃ অতর্কিতে 'কালাদীঘির ডাকাতি'র উল্লেখ করিয়া পরে এই সূত্রে সুভাষিণীর অনুরোধে তাহার নিকট দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করা ভিন্ন অপর কোন সময় কাহারও নিকট সে নিজের মন্দভাগ্যের উল্লেখ করে নাই। ইন্দিরা কোন অবস্থাতেই দুঃখকে স্বীকার করিতে চাহে না ; আনন্দেই তাহার জীবনের সহজ অভিব্যক্তি। এবং তাহার পরিহাসপ্রবণতা এই আনন্দেরই এক রূপ।

ইন্দিরার অপর এক বৈশিষ্ট্য তাহার অপকট সারল্য। নিজের কথা বলিতে যাইয়া নিজের কোনরূপ দুর্ব্বলতা সে পাঠকের দৃষ্টির আড়ালে রাখে নাই। রমণবাবু ও সুভাষিণীর ষড়যন্ত্রের ফলে 'নিমন্ত্রিতবাবুটি'র আহারের সময় তাহাকেই যখন পরিবেশন করিতে হইল, তখন এই 'বাবুটি'কে দেখিয়া (ইন্দিরা তখন পর্য্যন্ত তাহাকে উ--বাবু বলিয়া চিনিতে পারে নাই বা সেরূপ কোন সন্দেহও তাহার মনে আসে নাই) ইন্দিরা 'বিদ্যুচ্চমকিতের ন্যায় একটু অন্যমনস্ক' হইল। চারিচক্ষে মিলন হইলে হয়ত বা নিজের অজ্ঞাতসারে একটুকু 'কুটিল কটাক্ষ' করিল, অন্ততঃ এরূপ সম্ভাবনা সে জোর করিয়া অস্বীকার করিতে পারে নাই। তাহার তৎকালীন মনের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া ইন্দিরা বলিতেছে, 'আমি একটু লজ্জিতা, একটু অসুখী হইলাম। আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামীসন্দর্শন হইয়াছিল —সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপণীনিক্ষেপে বুঝি তরঙ্গ উঠিল ভাবিয়া বড় অপ্রফুল্ল হইলাম। মনে মনে নারীজন্মে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনে মনে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনের ভিতর মরিয়া গেলাম।' ইন্দিরার এই সারল্য তাহার কাহিনীর অন্যতম আকর্ষণ।

ইন্দিরা দরদী। যেদিন সে 'ভরা যৌবনে' প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিল, সেদিন পাল্কী-বাহকেরা কালাদীঘির[১] ঘাটের সম্মুখে পাল্কী নামাইলে ইন্দিরা বিরক্ত হইল, হয়ত বা তাহার একটু রাগ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, 'কিন্তু ছি! স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে! আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে আমাকে বহিতেছে; আমি যাইতেছি ভরা যৌবনে স্বামীসন্দর্শনে—তারা যাইতেছে খালি পেটে এক মুঠা ভাতের সন্ধানে; তারা একটু ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে বলিয়া কি আমার রাগ হইল! ধিক ভরা যৌবনে!' কথাগুলি ইন্দিরার মুখে বড়ই মধুর।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ী যাত্রাকালে এই দরদী নারীর চক্ষের কোণে পিতামাতা ও প্রিয়জনের জন্য একবিন্দু অশ্রু ঝরিল না কেন? শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিতে 'পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি হইবে', রাত্রিতে স্বামীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে না—এই চিন্তায় যাহার চক্ষে একটু জল আসিয়াছিল, পিতামাতা ও ছোট

১ ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন, যশোহরে 'ঝিঁকারগাছার নিকটবর্ত্তী ডাকাতিয়া দীঘি' স্মরণে এই কালাদীঘি কল্পিত হইয়াছে এবং 'বঙ্কিমের সময়, এই কালীদীঘির যেরূপ যেরূপ খ্যাতি ছিল, ইন্দিরাতে সেইরূপই বর্ণিত হইয়াছে।' বঙ্কিমচন্দ্র—প্রথম খণ্ড, ২০৪-৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ভগিনীর জন্য তাহার ভাণ্ডারে কি এক ফোঁটা অশ্রুও ছিল না? অশ্রু ত দূরের কথা, পিতামাতা বা ছোট ভগিনীর চিন্তা যে তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যমনা করিয়াছে, তাহার 'শ্বশুরবাড়ী যাত্রা'র বর্ণনায় এরূপ কোন আভাস নাই, পরন্তু ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। প্রকৃতপক্ষে, ধনগর্ব্বিত পিতার মিথ্যা অহঙ্কারের ফলে ইন্দিরাকে যে দীর্ঘ বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহার অবসানের কল্পনা এই সময় যে আনন্দের বন্যা আনিয়াছে, তাহার স্রোতের মুখে অপর কোন চিন্তা তাহার মনে স্থান পায় নাই। ইহা শুধু স্বাভাবিক নহে, বিগত দিনের তিক্ততার প্রতিক্রিয়ায় ইহা অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু ইন্দিরার চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে একটি গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া পড়ে: আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীর সাক্ষাৎ পাইলে অনন্যোপায় হইয়াই তাহাকে কুৎসিত ছলনায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং স্বামী তাহাকে পরস্ত্রী মনে করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, ইহা মনে করিতে সাময়িক অস্বস্তি বোধ করিলেও,[১] তাঁহাকে লইয়া খেলা করিবার সুযোগ পাইয়া পরিহাসপ্রিয় ইন্দিরা যদি শেষ পর্য্যন্ত একটুকু কৌতুক অনুভব করিয়া থাকে তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। কিন্তু বঙ্কিম তাহার এই অভিসারিকার আচরণ কি ভাবে বিচার করিয়াছেন? ইন্দিরা নিজেকে বুঝাইয়াছে, 'কিছু দোষ নাই।' অর্থাৎ, তাহার মতে কোন বাঁধাধরা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের বিচার করা চলে না। অবস্থাভেদে আচরণের প্রভেদ হয় এবং এই কারণেই একের পক্ষে যাহা অশোভন, অপরের পক্ষে তাহাই শোভন ও সঙ্গত হইতে পারে।[২] সুভাষিণীও ইন্দিরার কথায় সায় দিয়া বলিয়াছে, 'না, দোষ নাই।' অর্থাৎ, তাহার মতেও যেখানে মনের পাপ নাই এবং উদ্দেশ্য সাধু, সেখানে পাপ স্পর্শ করে না। কিন্তু 'মৃণালিনী'তে মনোরমার আচরণে আমরা ইহার বিপরীত চিত্র দেখিতে পাই। ইন্দিরা স্বামীর দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ লইয়া তাঁহাকে আয়ত্ত্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে

---

১ উপেন্দ্রবাবু হারাণীর মারফত প্রেরিত তাহার ইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত পত্র গ্রহণ করিলে ইন্দিরা সুভাষিণীকে বলিতেছে, 'আমি আহলাদিত হইয়াছি, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে একটু নিন্দা করিতেছি। আমি চিনিয়াছি যে তিনি আমার স্বামী। এই জন্য আমি যাহা করিতেছি, তাহাতে আমার বিবেচনায়, দোষ নাই। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমত কোন মতেই সম্ভবে না।....অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে বড় নিন্দা করিতেছি।....মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখনও দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।' ইন্দিরা ১৩।—৫১ পৃঃ।

২। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই 'বাজিয়ে যাব মল' শীর্ষক পরিচ্ছেদের অবতারণা।

কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে এবং এইরূপে 'হাতীর পায়ে শিকল' পরাইয়া কুলটা পরিচয়েই তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে, মনোরমা স্বামীর দুর্ব্বলতার আভাসমাত্র তাঁহার অশুচি স্পর্শের দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসিত করিয়াছে। (মৃণালিনী ৪।৩, ৯৭ পৃঃ)। অবশ্য ইন্দিরা ও মনোরমার চরিত্রগত পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহাদের আচরণের এই পার্থক্যের অন্যতম প্রধান কারণ তাহাদের অবস্থাগত পার্থক্য। যে কারণে মনোরমা স্বামীর নিকট আত্মগোপন করিয়াছে তাহা ইন্দিরার আত্মগোপনের কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং স্বামীর মন ভুলাইবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করা যেমন তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তেমনই অর্থহীন ও অনাবশ্যক। ইন্দিরার সম্মুখে রঙ্গিন পৃথিবী বিবিধ ভোগের উপকরণ লইয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে, আর মনোরমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে শ্মশানের রুক্ষ বিভীষিকা, সেখানে ভোগের চিহ্নমাত্র নাই। একের দেবতা সেই 'ঠাকুরটি' যাহার 'অঙ্গ নাই, অথচ ধনুর্ব্বাণ আছে,—মা বাপ নাই, অথচ স্ত্রী আছে—ফুলের বাণ, অথচ তাহাতে পর্ব্বতও বিদীর্ণ হয়'; অপরের দেবতা সর্ব্বত্যাগী যোগীশ্বর, যাঁহার নয়নাগ্নিতে একদিন এই অতনু 'ঠাকুরটি'র তনু পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল।

জনৈক অধ্যাপক বন্ধু একদিন প্রসঙ্গতঃ ইন্দিরার বিপরীত চিত্র হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার উল্লেখ করেন। অস্ত্রবিদ্যানিপুণা মনিপুরদুহিতা চিত্রাঙ্গদা নিশ্চিত কৌতুকপ্রিয় বাঙ্গালীগৃহস্থকন্যা ইন্দিরার বিপরীতধর্ম্মী চরিত্র। কিন্তু এস্থলে বিচার্য্য এই: অর্জ্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার আচরণ কি সত্যই বিকৃত প্রতিবেশে স্বামীর প্রতি ইন্দিরার আচরণের বিপরীত চিত্র? সত্য বটে চিত্রাঙ্গদা যেদিন বরলব্ধ অপরূপ শোভা লইয়া ব্রতচারীর ব্রতভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেদিন ইহার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার মনে হইয়াছিল যেন 'ছদ্মরূপিণী' কোন 'মহারাক্ষসী' তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া প্রথম মিলনের যত কিছু মধু সে সকলই নিঃশেষে লুটিয়া নিয়াছে। কিন্তু ইহাও অতি কঠিন সত্য যে এই চিত্রাঙ্গদাকেই অর্জ্জুনের বিদ্রোহী মন জয় করিবার জন্য অতনু ঠাকুরটির নিকট আয়ুধ ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং বর্ষকাল সেই আয়ুধসকল প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ চরিত্রগত বহু বৈষম্য সত্ত্বেও রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া চিত্রাঙ্গদা ও ইন্দিরা উভয়কেই একই দেবতার শরণ লইতে হইয়াছে। এবং ইন্দিরা যদি স্বামীকে আয়ত্তে আনিয়া বিদ্যাধরীর ভূমিকায় কিছুটা কৌতুক অনুভব করিয়াছে, চিত্রাঙ্গদাও 'ছলনার আবরণে' অর্জ্জুনের চিত্ত জয় করিয়া 'নির্দয় বিজয়সুখে...........কৌতুকের হাসি' হাসিয়াছেন।

অর্থাৎ, উভয়ক্ষেত্রেই আদিম নারীত্বের একই প্রকারের আত্মপ্রকাশ। অবশ্য, ইহাই চিত্রাঙ্গদার সত্যকার পরিচয় নহে। বর্ষশেষে অর্জ্জুনের নিকট আত্ম-পরিচয় দিতে যাইয়া চিত্রাঙ্গদা বলিতেছেন, সরোবরতীরে শিবালয়ে যে রূপহীনাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন অথবা যে নারী বর্ষকাল ধারকরা রূপ লইয়া তাঁহাকে 'ছলনার ভারে' শ্রান্ত করিয়াছে—এই উভয়ের কেহই তিনি নহেন। অর্জ্জুন যদি সঙ্কটের পথে তাঁহাকে পার্শ্বে রাখেন, যদি তিনি তাঁহাকে দুরূহ চিন্তার অংশ দান করেন, তবেই তিনি পাইবেন তাঁহার সত্যকার পরিচয়। আর তিনি তাঁহার সত্যকার পরিচয় পাইবেন সেই দিন, যেদিন তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান পুত্র হইলে 'আশৈশব বীরশিক্ষা' দিয়া 'দ্বিতীয় অর্জুন' করিয়া চিত্রাঙ্গদা তাহাকে পিতার চরণে পাঠাইবেন। ইহাই হইবে চিত্রাঙ্গদার সার্থক পরিচয়। ঠিক কথা। কিন্তু ইন্দিরাও স্থান-পাত্রভেদে কিছুটা পরিবর্ত্তিত রূপে এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারে, বিদ্যাধরীর বেশ তাহার বাহিরের খোলসমাত্র।

এ সবই বুঝিলাম। এবং ইহাও মানিলাম যে, বাস্তবের সম্পর্কবর্জ্জিত নীতির বাণী আঁকড়িয়া ধরিয়া ইন্দিরা যদি অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে পরাঙ্‌মুখ হইত, তাহা হইলে আদর্শের আর্ট গ্যালারীতে তাহার স্থান যত উচ্চেই থাকিত না কেন, আমরা তাহাকে মানবী বলিয়া চিনিতে পারিতাম না। কিন্তু ইন্দিরাই কি তাহার আচরণ সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতে পারিয়াছে? যখন সে হারাণীকে দৌত্যকার্য্যের জন্য অনুরোধ করিতে যাইয়া তাহাকে বুঝাইল, "কিছু দোষ নাই", তখন স্পষ্টই তাহার মনে খটকা লাগিয়াছিল। ইন্দিরা বলিতেছে, '"কিছু দোষ নাই" বলিয়া একটু ভাবিলাম। আমারই পক্ষে কিছু দোষ নাই, কিন্তু হারাণীর পক্ষে? দোষ আছে বটে। তবে তাকে কাদা মাখাই কেন? তখন সেই "বাজিয়ে যাব মল" মনে পড়িল। কুতর্কে মনকে বুঝাইলাম। যাহার দুর্দ্দশা ঘটে, সে উদ্ধারের জন্য কুতর্ক অবলম্বন করে। আমি হারাণীকে আবার বুঝাইলাম, "কিছু দোষ নাই।"' হারাণীর কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম; তাহার নিজের পক্ষে কোন দোষ নাই, ইহাই কি সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রাণের কথা? যদি তাহাই হইবে, তাহা হইলে তাহার কার্য্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার জন্য সে এত ব্যগ্র হইল কেন? ইন্দিরা তাহার পুরুষ পাঠকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, 'যেমন মাহুত অঙ্কুশের দ্বারা হাতীকে বশ করে, কোচম্যান্ ঘোড়াকে চাবুকের দ্বারা বশ করে, রাখাল গরুকে পাঁচনবাড়ির দ্বারা বশ করে, ইংরেজ যেমন চোখ রাঙ্গাইয়া বাবুর দল বশ করে, আমরা তেমনই হাসি চাহনিতে তোমাদের বশ করি। আমাদের পতিভক্তি

আমাদের গুণ ; আমাদিগকে যে হাসি চাহনির কদর্য্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়, সে তোমাদের দোষ।' (ইন্দিরা ১৬।–৬০ পৃঃ)। তাহার সঙ্কল্প সম্বন্ধেও সে বলিতেছে, 'জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল আয়ুধ দিয়াছেন, উভয়ের মঙ্গলার্থ তাহা প্রয়োগ করিব। যদি কখন "মল বাজিয়ে" যেতে হয়, তবে সে এখন।' (ইন্দিরা ১৫।-৫৬ পৃঃ)। বঙ্গনারীর পতিভক্তি তাহার গুণ, তাহাকে যে 'হাসি চাহনির কদর্য্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়' তাহা পুরুষের দোষে, নারীর মুখের এই অভিযোগ কতটা পক্ষপাতিত্বদুষ্ট এস্থলে তাহার বিচার অনাবশ্যক।[১] এবং ইন্দিরা যে উপযুক্ত সময়েই 'মল বাজিয়ে' যাবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, সে বিষয়েও কোনরূপ মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু এ সকল যুক্তিতর্ক যে কেবলমাত্র ইন্দিরার পাঠক পাঠিকার জন্য এরূপ মনে হয় না ; মনে হয় এই সকল যুক্তিতর্ক যেন কতকটা তাহারই কাছে তাহার কার্য্যের কৈফিয়ত স্বরূপ। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে ইন্দিরার আচরণ যদি দূষণীয় হইয়া থাকে, শিল্পী বঙ্কিম তাহা মার্জ্জনার চক্ষে দেখিয়াছেন। এমন কি, উপেন্দ্রবাবুর অসংযত আচরণ সম্বন্ধেও তিনি সুভাষিণীর ন্যায়[২] ক্ষমাশীল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই উপন্যাসে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য হালকা গল্পের ভিতর দিয়া পাঠক পাঠিকার চিত্তবিনোদন, নীতিবিদের কঠোর তুলাদণ্ডে নায়ক নায়িকার ত্রুটিবিচ্যুতির পরিমাপ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।[৩]

১ কিন্তু ইন্দিরাকে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিবার প্রলোভন দমন করা কঠিন। উপেন্দ্রবাবুকে চিনিবার পর 'উভয়ের মঙ্গলার্থ' নহে, নিছক নিঃস্বার্থভাবে 'নিমন্ত্রিতবাবুটি'র প্রতি চাহনির কৈফিয়তস্বরূপ ইন্দিরা বলিতেছে, 'আমি ত জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কোন কুটিল কটাক্ষ করি নাই।....তবে সাপও বুঝি, জানিয়া শুনিয়া, ইচ্ছা করিয়া ফণা ধরে না, ফণা ধরিবার সময় উপস্থিত হইলে ফণা আপনি ফাঁপিয়া উঠে। ....বুঝি সেইরূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে।' অর্থাৎ, এস্থলে ইন্দিরা বলিতে চাহে, নারীর চক্ষের কুটিল কটাক্ষ বুঝি বা সাপের ফণা ফাঁপিয়া উঠার মত সহজাত ধর্ম্ম। অবশ্য দোষের ষোল আনা বোঝা পুরুষের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার অত্যধিক আগ্রহে তাহার পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত এরূপ মর্য্যাদাহানিকর উক্তি বিস্মৃত হওয়াই স্বাভাবিক।

২ ইন্দিরা সুভাষিণীর নিকট স্বামীর নিন্দা করিলে, 'সুভাষিণী....বলিল, "তোর মত বাঁদর গাছে নেই, ওঁর যে স্ত্রী নেই।"' ইন্দিরা জবাব দিল, "আমার কি স্বামী আছে নাকি ?" প্রত্যুত্তরে সুভাষিণী বলিল, "আ ম'লো। মেয়ে মানুষে পুরুষ মানুষে সমান।"

৩ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে ইন্দিরার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়।

চন্দ্রশেখর

'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' রোমান্সধর্ম্মী হইলেও গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী। এই দুইখানি উপন্যাসে এবং 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' আখ্যায়িকার সহিত ইতিহাসের কোনরূপ সংশ্রব নাই। 'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিম পুনরায় ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা'র ন্যায় এই উপন্যাসেও মূল কাহিনী গার্হস্থ্যজীবনের কাহিনী, ইহার সমস্যা গার্হস্থ্যজীবনের সমস্যা। চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবনের ধারা ইতিহাসের আবর্ত্তে আসিয়া পড়ায় তাঁহাদের কাহিনী অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে এবং তাঁহাদের চরিত্র অধিকতর স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, এ কথা সত্য ; কিন্তু তাঁহাদের কাহিনীর মূলে যে জীবন-সমস্যা, ভাগীরথীতীরে ক্ষুদ্র পল্লীর ছায়াশীতল আম্রকাননে অঙ্কুরিত হইয়া সহসা তাহা যখন বেদগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণের শান্তিপূর্ণ কুটির আচ্ছন্ন করিল তখন তাহা বিকাশলাভের জন্য ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর অপেক্ষা করে নাই।

'চন্দ্রশেখরে'র 'ঐতিহাসিক বিষয়ে' বঙ্কিম কোথাও কোথাও 'সয়ের মতাক্ষরীণ্' নামক 'পারস্য গ্রন্থের' ইংরেজী অনুবাদের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, উপন্যাসের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। মীরকাসেমের উপর গুর্‌গণ খাঁর অসামান্য প্রভাব, ইহাতে অপরাপর কর্ম্মচারীর অসন্তোষ, ইংরেজ কর্ত্তৃক আজিমাবাদের পথে মুঙ্গেরে অস্ত্র বোঝাই নৌকা প্রেরণ, ইহা লইয়া 'আমিয়টের সঙ্গে নবাবের বাদানুবাদ', নবাবের আদেশমত মুর্শিদাবাদে তকি খাঁ কর্ত্তৃক ছল করিয়া আমিয়টের সহিত বিবাদ এবং নবাবফৌজের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে আমিয়ট ও তাঁহার সহচরবর্গের মৃত্যু, সন্দেহপ্রযুক্ত শেঠভ্রাতৃদ্বয়কে মুঙ্গেরে নজরবন্দী রাখা—এ সকলই ইতিহাসের কথা।[১] আমিয়টের ন্যায় জন্‌সন্, গল্‌ষ্টন্ এবং মীরকাসেমের ইউরোপীয় কর্ম্মচারী সমরু ঐতিহাসিক চরিত্র। ফষ্টর কাল্পনিক হইলেও এই চরিত্রের পরিকল্পনায় যে সত্যের অপলাপ হয় নাই সে যুগের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়।[২]

'সয়ের মুতাক্ষরীণে' লিখিত আছে যে, হে সাহেবকে প্রতিভূ রাখিয়া

১ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

২ বঙ্কিম-যুগের 'model settler' কুখ্যাত মরাল সাহেব স্মরণীয়। বঙ্কিম-জীবনী, ১১৬—২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আমিয়ট নবাবের অনুমতিক্রমে মুঙ্গের ত্যাগ করিয়াছিলেন[১]; উপন্যাসে দেখিতে পাই আমিয়ট গুর্‌গণ খাঁর পরোক্ষ সাহায্য লাভ করিয়া নবাবের বিনা অনুমতিতে এবং তাঁহার অজ্ঞাতে মুঙ্গের ত্যাগ করেন। ইহাতে 'গুর্‌গণ খাঁর দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথম, দলনী মুঙ্গেরের বাহির হইলেই ভাল; দ্বিতীয়, আমিয়ট একটু হস্তগত থাকা ভাল, ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা উপকার ঘটিতে পারিবে।' (৩।৩)। দলনীর চরিত্রের পরিকল্পনায় যে কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ক্রমবিকাশের জন্য, অর্থাৎ উপন্যাসের তাগিদে ইতিহাসের এইরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে। একই কারণে মুর্শিদাবাদে আমিয়টের সহিত নবাবফৌজের সঙ্ঘর্ষের কাহিনীর সহিত দলনীর কাহিনীকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, উপন্যাসে দলনীহরণই এই সঙ্ঘর্ষের প্রত্যক্ষ কারণ।

মীরকাসেমের চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রথমেই মীরকাসেম কর্ত্তৃক দলনীর অদৃষ্টগণনার উল্লেখ করিতেছি। ইহা বঙ্কিমের অসম্ভব কল্পনা নহে। 'সয়ের মতাক্ষরীণে' মীরকাসেমের জ্যোতিষশাস্ত্রচর্চ্চার উল্লেখ রহিয়াছে। বস্তুতঃ, 'সয়ের মতাক্ষরীণে'র মীরকাসেম এই দিক দিয়া অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ঘোর অদৃষ্টবাদী।[২] বঙ্কিমের সৃষ্ট মীরকাসেম অদৃষ্টগণনা করিলেও গণনার ফলকে অনুচিত প্রাধান্য দেন নাই অথবা দলনীর অদৃষ্টগণনা তাঁহার কর্ম্মপন্থাকে কোনরূপ প্রভাবিত করে নাই! ইহা মীরকাসেমের প্রতি বঙ্কিমের শ্রদ্ধার নিদর্শন।

মীরকাসেম 'সুবে বাঙ্গলা বেহার ও উড়িষ্যা'র শেষ স্বাধীন নবাব। বঙ্কিমের সৃষ্ট মীরকাসেম ন্যায়পরায়ণ, প্রজাপালক ও নির্ভীক। দূরদর্শী নবাব বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজের সহিত সংগ্রামে তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে, হয়ত তিনি 'প্রাণে নষ্ট' হইবেন। তথাপি জানিয়া শুনিয়া তিনি কেন এইরূপ সংগ্রামের সঙ্কল্প করিলেন, তাহার কারণ তিনি প্রিয়তমা পত্নীর নিকট এইরূপ ব্যক্ত করিতেছেন: "ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, 'রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী

১-২ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

হইব ?" (১।১)। এই উক্তি মীরকাসেমের চরিত্রের মহত্ত্ব ও নবাবোচিত মর্য্যাদাবোধের পরিচয় দেয়। এবং ইংরেজের সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষের ঐতিহাসিক কারণ (শুল্ক সম্বন্ধে স্বার্থান্ধ ইংরেজের সহিত তাঁহার মতবিরোধ) এই চিত্রের পোষকতা করে।

কিন্তু ইংরেজের সহিত বিরোধের ঐতিহাসিক কারণ উপেক্ষিত না হইলেও উপন্যাসে ব্যক্তিগত কাল্পনিক কারণকেই অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। হয়ত এই কারণেই এবং বিশেষ করিয়া উদয়নালার যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্য যখন আগতপ্রায় তখন মসনদে সমাসীন নিশ্চেষ্ট নবাবের দরবারের প্রহসন স্মরণ করিয়া ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন: 'নব্যবঙ্গের সাহিত্যগুরু তাঁহাকে [মীরকাসেমকে] স্ত্রৈণ কাপুরুষ সাজাইয়া বিদায়দান করিয়াছেন।'[১] কিন্তু বঙ্কিমের মীরকাসেমের বিরুদ্ধে স্ত্রৈণাপবাদ বিচারসহ নহে। মীরকাসেম দলনীর প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল ছিলেন (ইহা নিশ্চয়ই দূষণীয় নহে), কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি তাহার অনুচিত আবদারে কর্ণপাত করেন নাই এবং দলনীহরণ তাঁহার ক্রোধের ইন্ধন জোগাইলেও পূর্ব্ব হইতেই তিনি ইংরেজের সহিত সংগ্রামের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া ইহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, দলনীহরণ প্রত্যক্ষ উপলক্ষ্য মাত্র। আর কাপুরুষতা ? যে মীরকাসেম যুদ্ধের ফলাফল জানিয়া শুনিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের জন্য প্রয়োজন হইলে মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁহার বিরুদ্ধে আর যাহাই হউক, কাপুরুষতার অপবাদ দেওয়া চলে না। বঙ্কিমের মীরকাসেমের চরিত্রের একমাত্র কলঙ্ক স্ত্রৈণতা বা কাপুরুষতা নহে, তাহা এই যে, তিনি অতি সহজেই দলনীর বিরুদ্ধে মিথ্যাপবাদ বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রতি চরম দণ্ডাজ্ঞা লিখিয়া দিলেন। কিন্তু এস্থলেও তাঁহার আচরণের বিচারকালে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি এ সময় প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'মীরকাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুর্‌গণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল।..........নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সম্বাদ পৌঁছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ

১ মীর কাসিম, ১৬০ পৃঃ।

হইতেছে—রাজলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী ?' (৬।২)। অর্থাৎ পরাজয়ের গ্লানির সহিত বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে মীরকাসেম মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হারাইলেন। তাঁহার মনে হইল, বুঝি বা সমগ্র বিশ্ব তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং সেই দুষ্ট ব্যাধির সংক্রামকতা হইতে দলনীও অব্যাহতি পায় নাই। উন্মত্ত নবাব হিতাহিত বিচারবুদ্ধি হারাইয়া আপনার কল্যাণ আপনি পদদলিত করিলেন। দলনীর বিচারকর্ত্তা মীরকাসেম অতীতের কঙ্কালাবশেষ মাত্র।

নবাব যখন আপনার সর্ব্বনাশী ভুল বুঝিতে পারিলেন, তখন আত্মগ্লানিতে তিনি আরও অপ্রকৃতিস্থ হইলেন। উপন্যাসে বর্ণিত উদয়নালার যুদ্ধকালীন দরবারে মীরকাসেমের চিত্রের ইহাই পটভূমিকা। এবং ইতিহাস এই চিত্র অন্ততঃ আংশিক সমর্থন করে। মৈত্রেয় মহাশয় নিজেই লিখিয়াছেন: 'উধূয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মীর কাসিম উন্মত্তের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সরল হৃদয় কুটিল পন্থা অবলম্বন করিল। দুই চারিজন বিশ্বাস-ঘাতকের আচরণে প্রতারিত হইয়া, সকলকেই সন্দেহের পাত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; লোকচরিত্র অনুধাবন করিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল।...........মীর কাসিমের মানসিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া ক্ষমা করিতেই ইচ্ছা হয়।'[১] কিন্তু তাহা হইলেও যদি কোন পাঠক এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, যে মীরকাসেম মসনদে আরোহণকালে মুসলমান রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, স্বীয় কর্ম্মকুশলতায়, বিশেষ করিয়া সামরিক শক্তির পুনর্গঠন করিয়া যিনি একদিন ইংরেজশক্তির দুর্দ্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, উপন্যাসে আমরা আত্মশক্তিতে পূর্ণপ্রত্যয়শীল সেই মীরকাসেমের কোন পরিচয় পাই না, তাহা হইলে সে অভিযোগ নিতান্ত লঘুভাবে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বঙ্কিমের উপন্যাসে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু তিনি আঁকিয়াছেন আত্মশক্তিতে আস্থাহীন উদারপ্রাণ এক ভাগ্যহতের চিত্র, পারিবারিক জীবনের বিপর্য্যয় যাঁহাকে এতই অভিভূত করিয়াছিল যে, শত্রু যখন দ্বারদেশে তখনও তিনি ব্যক্তিগত জীবনের হিসাব-নিকাশ লইয়াই এত ব্যস্ত ছিলেন যে, শত্রুর গতিরোধের কোনরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। বঙ্কিমের সৃষ্ট মীরকাসেম শ্রদ্ধা ও অনুকম্পার পাত্র, কিন্তু ইনি ঠিক ইতিহাসের মীরকাসেম নহেন।

১ মীর কাসিম, ১৮১ পৃঃ।

গুর্‌গণ খাঁ 'অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন', নহিলে সামান্য বস্ত্রবিক্রেতা হইতে[১] তিনি মীরকাসেমের প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না। এই চরিত্রটির ঐতিহাসিক উপকরণ এইরূপ: গুর্‌গণ খাঁ গর্ব্বিত-প্রকৃতি ছিলেন এবং প্রত্যেক পদস্থ ও গুণী ব্যক্তিকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি নবাবের দক্ষিণহস্ত ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের অস্ত্রের নৌকা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহারই পরামর্শে নবাব প্রথমে এই নৌকা আটক করেন। কিন্তু রাজকার্য্য পরিচালনায় নবাব সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার উপর নির্ভর করিলেও ইংরেজের সহিত গুর্‌গণ খাঁর গোপন যোগাযোগ ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহা নবাবের অগোচর ছিল না।[২] সুতরাং ইতিহাসের উপর কল্পনার রং ফলাইয়া গুর্‌গণ খাঁকে সিংহাসনলোলুপ চিত্রিত করিয়া বঙ্কিম তাঁহার প্রতি কোন অবিচার করেন নাই।

গুর্‌গণ খাঁ পশুপতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। উভয়েই প্রতিভাবলে ছোট হইতে বড় হইয়াছেন, উভয়েই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বেদীমূলে মনুষ্যত্ব বলি দিয়াছেন; তফাৎ এই যে, পশুপতি বাহিরের শত্রুর সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া সম্ভব হইলে কার্য্যোদ্ধারের পর তাহাকে বিতাড়িত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; পক্ষান্তরে গুর্‌গণ খাঁর সঙ্কল্প, 'তাঁহার [মীরকাসেমের] সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব।....পশ্চাৎ মীরকাসেমকে বিদায় দিব।' উদ্দেশ্য এক, অবস্থাভেদে ব্যবস্থার যাহা কিছু পার্থক্য। এবং উভয়ের কার্য্যের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত পরিণাম ফলও একই প্রকারের।[৩]

কিন্তু তকি খাঁর প্রতি বঙ্কিম সুবিচার করেন নাই। তাঁহার কল্পনার তকি খাঁ স্বীয় দুষ্কার্য্যের দণ্ডস্বরূপ মীরকাসেমের হস্তে পশুর মত নিহত হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক তকি খাঁ চারিদিকের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত নবাবের পক্ষে সংগ্রাম করিয়া, অপূর্ব্ব শৌর্য্যে শত্রুসৈন্যকে সন্ত্রাসিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবাঞ্ছিত মৃত্যুবরণ করেন।[৪] ঔপন্যাসিক ইতিহাসের ক্রীতদাস নহেন এবং উপন্যাসের প্রয়োজনে তাঁহাকে কখন কখন ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্র কিছু কিছু বিকৃত করিতে হয়। ইহাও সত্য যে এস্থলে দলনীর কাহিনীর পরিণতির জন্য একজন বিবেকহীন লম্পটের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের দ্বারা অন্ততঃ আংশিক সমর্থিত না হইলে,

---

১-২ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

৩ উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে বিদ্রোহী সৈন্য কর্ত্তৃক গুর্‌গণ খাঁর হত্যার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। (পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য)।

৪ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

কোন ঐতিহাসিক চরিত্রকে এতখানি বিকৃত ও মসীলিপ্ত করা ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতার অন্যায় অপব্যবহার, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।)

কিন্তু 'মৃণালিনী'র ন্যায় 'চন্দ্রশেখরে'ও বঙ্কিম ইতিহাসের মূল সত্য মোটের উপর যথাযথ রূপায়িত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে বাংলায় মুসলমান শক্তির অধঃপতনের মূল কারণ পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ক্ষমতাবান রাজপুরুষগণের প্রভুত্বলিপ্সা এবং উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাসাধারণের মনে রাজশক্তিতে আস্থার অভাব। গুর্‌গণ খাঁ নবাবের প্রধান সহায়, অথচ তাঁহার দৃষ্টি সিংহাসনের দিকে, ইংরেজের সহিত নবাবের বিরোধ তাঁহার চক্ষে স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষমাত্রেই গুর্‌গণ খাঁর প্রতিপত্তিতে অসন্তুষ্ট; পক্ষান্তরে প্রতি কার্য্যে তাঁহার উপর নির্ভর করিলেও স্বয়ং নবাবও তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। ধনকুবের শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব মীরকাসেমের অবিদিত নহে, তিনি জানেন তাঁহারা 'তাঁহার অহিতাকাঙ্ক্ষী', সেই কারণেই তিনি তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরে 'বন্দিস্বরূপ' রাখিয়াছেন। তাঁহারাও প্রকাশ্যে নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী না হইলেও, সহজেই গুর্‌গণ খাঁর ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে স্বীকৃত হইলেন (৫।৩), কারণ 'মীরকাসেমের নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য।'[১] রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময় মীরকাসেমকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু আত্মশক্তিতে তাঁহার আস্থা নাই তাঁহার বিশ্বাস 'যে ইংরেজের বিরোধী হইবে, সেই হারিবে।' ইংরেজ অপরাজেয় এ বিশ্বাস শুধু নবাবের নহে; আলি ইব্রাহিম খাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া কুল্‌সম্ পর্য্যন্ত কেহই ইহার সংক্রামকতা হইতে অব্যাহতি পায় নাই।[২] নবাবের পক্ষে একমাত্র প্রতাপ আত্মশক্তিতে আস্থাবান। কিন্তু প্রতাপ ব্যক্তিগত কারণে ইংরেজের বিরুদ্ধে নবাব পক্ষে যোগদান করিয়াছেন, দেশপ্রীতি কখনও তাঁহাকে অনুপ্রেরণা যোগায় নাই। সুতরাং তাঁহার মৃত্যু যতই মহান হউক, দেশের দিক দিয়া ইহার কোনই সার্থকতা নাই।

এই ত গেল দেশীয়দের কথা। অপর পক্ষে আমিয়ট, জন্‌সন্, গলষ্টন্ প্রভৃতি ইংরেজ প্রতিনিধিবর্গ সর্ব্ব অবস্থায় জাতীয় গৌরব রক্ষায় সচেষ্ট,

১ বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার স্বরূপ বর্ণনার দিক দিয়াই শেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়ের অবতারণার একমাত্র সার্থকতা। গল্পাংশের ক্রমবিকাশের দিক দিয়া তাঁহাদের কোন সার্থকতা নাই।

২ ঐতিহাসিক মীরকাসেম আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না হারাইলেও, অধিকাংশ রাজপুরুষের মনেই যে ইংরেজের সহিত সংগ্রাম সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার ভাব ছিল, ইহা অনস্বীকার্য্য।

তাঁহারা ব্যক্তিগত প্রাধান্যের জন্য ব্যগ্র নহেন। তাঁহারা জানেন, ইংরেজ ভয় কাহাকে বলে জানে না--দেশীয়দের এই বিশ্বাস যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের গোলা অপেক্ষাও তাঁহাদের বড় সহায়। তাঁহারা জানেন, তাঁহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তি, তাঁহাদের মৃত্যুতে 'ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে,' তাঁহাদের 'রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।' তাই তাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ, এবং তাই তাঁহাদের মৃত্যু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দিক দিয়া ফলপ্রসূ হইল।

'চন্দ্রশেখরে'র গল্পাংশ দুইটি আখ্যায়িকায় বিভক্ত: এক, প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর কাহিনী; দুই, মীরকাসেম-দলনী কাহিনী। 'বিষবৃক্ষে' বিভিন্ন আখ্যায়িকার সংযোজনায় বঙ্কিম যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, আলোচ্য উপন্যাসেও তাহা সমভাবে লক্ষিত হয়। স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া দলনী কুল্‌সমের মারফত গুর্‌গণ খাঁর নিকট যে গোপন পত্র প্রেরণ করিল, সেই 'পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন,' এবং যে মুহূর্ত্তে চন্দ্রশেখর নিরাশ্রয় নবাবপত্নীকে প্রতাপের গৃহে আশ্রয় দিলেন সেই মুহূর্ত্তে তাহার অদৃষ্ট শৈবলিনীর অদৃষ্টের সহিত জড়িত হইল। চন্দ্রশেখর তাহাদের উভয়ের অদৃষ্ট এক সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য বিধিনির্দ্দিষ্ট মালাকর।

বঙ্কিম উপন্যাসের ঘটনাবলী এরূপ নিপুণ কৌশলে পরিবেশন করিয়াছেন যে, কখন শৈবলিনীর, কখন দলনীর কাহিনী পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শৈবলিনীর অপহরণের পরই দেখিতে পাই নবাবপত্নী গুর্‌গণ খাঁর চক্রান্তে গৃহহারা হইল। আবার প্রতাপ যখন ফষ্টরের হস্ত হইতে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিলেন তাহার অব্যবহিত পরেই দলনী শৈবলিনী ভ্রমে ইংরেজের হস্তে বন্দী হইল এবং একই সময় প্রতাপও ইংরেজের বন্দী হইলেন। শৈবলিনী প্রতাপের মুক্তির জন্য অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইল। চলচ্চিত্রের ছবির ন্যায় একে একে শৈবলিনীর কৃত্রিম উন্মত্ততা, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ-শৈবলিনীর সন্তরণ, ভয়সঙ্কুল গিরিপ্রদেশে শৈবলিনীর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ও কঠোর সাধনা, পরিশেষে তাহার সত্যকার উন্মত্ততার চিত্র আমাদিগকে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও ভীতিবিহ্বল করিয়া তোলে। এই চমকপ্রদ দৃশ্যাবলী একে একে দৃষ্টির অন্তরাল হইতে না হইতেই চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া ওঠে ভাগীরথী-সৈকতে ঝিল্লি-মুখরিত জনহীন প্রান্তর মধ্যে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে আশ্রয়হীনা দলনীর করুণ চিত্র। এবং দলনী যখন তকি খাঁর নিকট নবাবের পরওয়ানার

বিষয় অবগত হইয়া বিষপানে তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া নিজের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করিল, তাহার পরেই প্রতাপের আত্মবলিদান চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর মিলনপথের সম্ভাব্য অন্তরায় দূর করিয়া শৈবলিনীর জীবনের সমস্যার শেষ সমাধান করিয়া দিল।

শৈবলিনী ও দলনীর কাহিনী পরস্পরের উপর আলোকপাত করে। মুঙ্গের দুর্গের অন্তঃপুরে 'রঙ্গমহলে'র সহস্র বিলাসোপকরণের মধ্যেও দলনীর প্রাণে শান্তি নাই। দলনী নবাব মীরকাসেমের প্রিয় পত্নী; কিন্তু নবাবকে সে যতটুকু পাইয়াছে তাহাতেই সে সন্তুষ্ট নহে, সে তাঁহাকে আরও নিবিড়-ভাবে পাইতে চাহে। তাহার সকল আনন্দ ম্লান করিয়া অন্তর হইতে প্রশ্ন ওঠে, "ভাল, ঈশ্বর কেন এমন করেন? এক জন কেন আর এক জনের পথ চেয়ে পড়িয়া থাকে? যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন?" (১।১)। ভিন্ন অবস্থায়, সম্পূর্ণ ভিন্ন আবেষ্টনে শৈবলিনীর মনেও ঠিক একই প্রশ্ন জাগিয়াছে। শৈবলিনীর যখন জ্ঞান জন্মিল, তখন ভাগীরথীর কূলে বসিয়া তাহার বুকে তরঙ্গের খেলা দেখিতে দেখিতে তাহার মনেও নিশ্চয় প্রশ্ন জাগিয়াছে, 'যে যাকে না পায়, তাকে চায় কেন?' বেদগ্রামের দরিদ্র কুটীরাভ্যন্তরে অধ্যয়ন-রত চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া প্রশ্নটি আরও জটিল রূপ ধরিয়াছে; শৈবলিনী ভাবিয়াছে, 'যে যাকে না পায়, তাকে চায় কেন? যাকে পায় তাকেই বা চায় না কেন?' প্রণয়াস্পদের প্রতীক্ষায় বসিয়া প্রেমের বিচিত্র গতির কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রশ্নটি দলনীর মনে জাগিলেও আসলে এ প্রশ্নটি দলনীর নহে, ইহা শৈবলিনীরই অন্তরের প্রশ্ন এবং এই প্রশ্ন হইতেই তাহার জীবনের সমস্যার সৃষ্টি। যাঁহাকে সে চায় এবং যাঁহাকে সে পাইয়াছে, তাঁহাকে অমঙ্গলের স্পর্শ হইতে বাচাইয়া নিবিড়তর করিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে দলনী দুঃসাহসের সহিত যে অবিবেচনার কাজ করিল, তাহাই তাহার সহজ জীবনে জটিলতা ডাকিয়া আনিল এবং তাহাকে বিধিনির্দ্ধারিত পরিণতির পথে টানিয়া নিল। পক্ষান্তরে, যাঁহাকে সে পায় নাই, পঙ্কিল আবর্ত্তে টানিয়া নিয়া তাঁহাকে পাইবার আশায় শৈবলিনী দুঃসাহসের সহিত যে অনিশ্চিতকে বরণ করিয়া লইল, তাহাই তাহার জীবনের জটিল সমস্যা জটিলতর করিল এবং তাহার ভবিষ্যৎ ভাগ্য রচনা করিল।

চন্দ্রশেখর শুধুই কাহিনী দুইটির সংযোগ সাধন করেন নাই, এক হিসাবে তিনি শৈবলিনী ও দলনীর ভাগ্যনিয়ন্তা। প্রতাপ যেদিন শৈবলিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, সেদিন তাঁহার মৃত্যু

হইলে শৈবলিনীর জীবনের সমস্যারও সেইখানেই সমাধান হইত। চন্দ্রশেখর ইহার অন্তরায় হইলেন, তিনি প্রতাপকে বাঁচাইলেন। এবং শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়া তিনি শৈশবের সহচর সহচরীকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। অদর্শনের ফলে শৈবলিনী বাল্যপ্রণয় বিস্মৃত হইল।[১] কিন্তু চন্দ্রশেখর উদ্যোক্তা হইয়া যখন প্রতিবেশীকন্যা রূপসীর সহিত প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন তখন তাঁহার রূপরাশি আবার নূতন করিয়া শৈবলিনীকে আকৃষ্ট করিল, প্রতাপকে পাইবার আশায় শৈবলিনী মরিয়া হইয়া ফষ্টরের সহিত 'গৃহত্যাগিনী' হইল। পরিশেষে বিরুদ্ধ ঘটনাস্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া প্রতাপকে ভুলিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গোপনে তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিলে, দুর্য্যোগময়ী রজনীতে অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্যপ্রদেশে যখন শৈবলিনীর জীবনসংশয় হইল, তখনও (রমানন্দ স্বামীর নির্দ্দেশে) চন্দ্রশেখর অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন এবং চন্দ্রশেখরকে অবলম্বন করিয়া শৈবলিনী নবজীবন লাভ করিল।

শৈবলিনীর ন্যায় দলনীর জীবনেও চন্দ্রশেখরের প্রভাব সামান্য নহে। অসহায়া নবাবপত্নীকে সাহায্য করিতে যাইয়া চন্দ্রশেখর তাহাকে এমন এক স্থানে আশ্রয় দিলেন যেখান হইতে দৈবদুর্ব্বিপাকে শৈবলিনী ভ্রমে সে ইংরেজ কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। আবার ফষ্টর কর্ত্তৃক দলনী যখন নদীতীরে পরিত্যক্ত হইল, তখনও চন্দ্রশেখর তাহাকে এমন এক ব্যক্তির আশ্রয়ে পাঠাইলেন যাহার কর্ত্তব্যাবহেলা, প্রবঞ্চনা এবং কামোন্মত্তার ফলে নবাবের আদেশে বিষপান করিয়া সে পৃথিবীর সকল সমস্যা ও সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিল। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের গল্পাংশে সর্ব্বত্রই চন্দ্রশেখরের প্রভাব লক্ষিত হয়। উপন্যাসের নামকরণ নিরর্থক নহে।

দলনীর জীবনে চন্দ্রশেখরের প্রভাবের আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বভাবতঃই

১ ইহা অনুমানমাত্র নহে। প্রতাপের গৃহে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে শৈবলিনী বলিতেছে, "কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়েছিলে?....যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে?" 'বঙ্গদর্শনে' কথাটা আরও সুস্পষ্ট; বঙ্কিম বলিতেছেন: 'শৈবলিনী প্রতাপকে না দেখিয়া তাহাকে ভুলিয়া গেলেন। রূপসীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইলে কোন গোল ছিল না। জমিদারীতে বসিয়া, প্রতাপ মধ্যে মধ্যে শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখিতে আসিতেন। শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনী দেখিল, তাহার সেই বাল্যসখা প্রতাপ, মহেন্দ্রনিন্দিত বীরকান্তি ধারণ করিয়াছে। শৈবলিনী সৌন্দর্য্যতৃষ্ণায় পুড়িতে লাগিল।
প্রতাপ, চন্দ্রশেখরকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। শৈবলিনীর গতিক দেখিয়া, বেদগ্রাম আসা বন্ধ করিলেন।' বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮০, ৪৬১ পৃঃ।

তাহার জীবনে অদৃষ্টের প্রভাবের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। দলনীর শুভকামনা করিয়া চন্দ্রশেখর যখনই যে কাজ করিয়াছেন, তাহার ভাগ্যদোষে তাহাই তাহার অশুভের কারণ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত পরিণতির পথে টানিয়া নিয়াছে। এই পরিণতির সম্ভাবনা চন্দ্রশেখরের অগোচর ছিল না, কারণ তিনি নিজেই দলনীর অদৃষ্ট গণনা করিয়াছেন; 'মৃণালিনী'তে মনোরমার ন্যায় দলনীর জীবনেও জ্যোতির্গণনার ভিতর দিয়া অদৃষ্টবাদ সূচিত হইয়াছে। কিন্তু জ্যোতির্গণনা মনোরমার আখ্যায়িকার ভিত্তি এবং তাহার কাহিনীকে তাহার অদৃষ্টগণনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, দলনীর অদৃষ্ট যাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে অবগত হইয়াছিলেন তাঁহারা, অর্থাৎ চন্দ্রশেখর এবং আংশিকভাবে মীরকাসেম কোন ক্ষেত্রেই এমন কোন আচরণ করেন নাই যাহা অদৃষ্টগণনার সাহায্যে দলনীর ভবিষ্যৎ জানা না থাকিলে সহজ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সমগ্র কাহিনীটি অদৃষ্টগণনা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে। 'চন্দ্রশেখরে' অদৃষ্ট-গণনার একমাত্র সার্থকতা এই যে, বঙ্কিমের পরিবেশনগুণে ইহা প্রথম হইতেই দলনীর কাহিনীকে প্রহেলিকাচ্ছন্ন করিয়া তাহার প্রতি পাঠকের উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এস্থলে একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ইঙ্গিতের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'যে মুহূর্ত্তে মুরশিদাবাদ হইতে অশ্বারোহী দূত, দলনীবিষয়ক পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল, সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ, প্রথম কথা কহিল।' (৫।৪)। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্য এইরূপ: 'কেহ কেহ বলে, দূরবর্ত্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে পারে। এ কথা যে সত্য, এমত নহে।' 'অমঙ্গল সূচনায়' দলনীর শরীর 'রোমাঞ্চিত' হইয়া থাকিবে, এরূপ সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নাকচ না করিলেও বিকল্প ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি বলিয়াছেন যে, হয়ত সেই মুহূর্ত্তে 'পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ', অর্থাৎ চন্দ্রশেখর প্রথম কথা বলিলেন বলিয়া সহসা তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু যুক্তিবাদী বিচারক যাহাই বলুন, অধিকাংশ পাঠক ইহাকে ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। *তকি খাঁর পত্র লইয়া অশ্বারোহী দূতের মুঙ্গের যাত্রা, চন্দ্রশেখরের প্রথম কথা* বলা ও দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হওয়া বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। তকি খাঁর শঠতা ও চন্দ্রশেখরের পরোপকারব্রত—এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির যোগাযোগ সেই বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে দলনীর অদৃষ্টপটে শেষ রেখা টানিল।

দলনী ভাগ্যহতা; কিন্তু অদৃষ্টবাদ আখ্যায়িকায় কোথাও কোনরূপ জড়তার

সৃষ্টি করে নাই। দেবতা তাহাকে লইয়া যে খেলাই খেলিয়া থাকুন, দলনীর জীবনের পরিণতি প্রত্যেকটি স্তরে প্রতিকূল আবেষ্টনে তাহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। দলনী পতিপ্রাণা, দলনী সাংসারিক-জ্ঞান-বর্জ্জিতা। সে বুঝিয়াছে ইংরেজের সহিত সংগ্রামে নবাবের অমঙ্গলের আশঙ্কা রহিয়াছে, কারণ নবাবের মুখেই সে শুনিয়াছে, ইংরেজ অপরাজেয়। অথচ কোনক্রমেই সে নবাবকে যুদ্ধের সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। এমত অবস্থায় তাহার একমাত্র ভরসা রহিল গুর্‌গণ খাঁ। গুর্‌গণ খাঁ একে নবাবের দক্ষিণ হস্ত, তাহাতে কুল্‌সম্ বলিয়াছে যুদ্ধব্যাপারে গুর্‌গণ খাঁই অগ্রণী; সুতরাং দলনী ভাবিল তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেই তাহার কার্য্য-সিদ্ধি হইবে। ভ্রাতা কি ভগিনীর অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন? সরলা বালিকা আপনার অন্তর দিয়া কূটবুদ্ধি ভ্রাতার অন্তরের বিচার করিল, হিতাহিত-জ্ঞান হারাইয়া একমাত্র বাঁদীকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে দুর্গের বাহিরে যাইয়া গোপনে তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিল। ইহাতে সে যে কতটা বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করিল তাহাও সে বুঝিতে পারিল না, কারণ তাহার বিশ্বাস যদিই নবাব এই নৈশ অভিযানের সংবাদ জানিতে পারেন, তাহা হইলেও গুর্‌গণ খাঁর সহিত তাহার সম্পর্কের কথা জানাইয়া দিলে তাঁহার 'রাগ করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না।'

গুর্‌গণ খাঁ শুধু যে তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন তাহা নহে, তিনি ভাবিলেন, দলনী বুঝি বা তাঁহারই মত স্বার্থের আকর্ষণে নবাবের আশ্রয়ে রহিয়াছে। গুর্‌গণ খাঁ না বুঝিয়া তাহার পতিভক্তির উপর আঘাত করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনায় দলনী ক্ষিপ্ত হইল। দলনী ভুলিয়া গেল, নবাবের বিনা অনুমতিতে দুর্গের বাহিরে যাইয়া সে গুর্‌গণ খাঁর আয়ত্তাধীনে আসিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং পুনরায় দুর্গপ্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। যে পতিভক্তি তাহাকে গোপনে গুর্‌গণ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, তাহাই অবস্থান্তরে অতঃপর নবাবের অন্তঃপুরে সে তাঁহার 'পরম শত্রু'রূপে বাস করিবে—একথা তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতে উত্তেজিত করিল। এবং এই অবিমৃষ্যকারিতার ভিত্তির উপর দলনীর ভবিষ্যৎ ভাগ্য রচিত হইল।

নবাব তাহার প্রতি যেরূপ স্নেহপরায়ণ তাহাতে ঘটনাস্রোত প্রতিকূল না হইলে তিনি হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন। কিন্তু চন্দ্রশেখরের অনুকম্পা, প্রথমে রামচরণ, পরে বকাউল্লার ভুল—এইরূপ বিরুদ্ধ ঘটনার যোগাযোগ নবাবের সহিত তাহার সাক্ষাতের অন্তরায় হইল। ঘটনার

এইরূপ যোগাযোগ যতই দুঃখের হউক, মানবের অদৃষ্টে ইহা বিরল নহে।

দলনী যখন ফষ্টরের বজরায়, তখন দ্বিতীয়বার তাহাকে অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বিপদে পড়িতে হইল। এবার স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় নহে, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনার কল্পনায় সে বিচারবুদ্ধি হারাইল। এ সময়েও চন্দ্রশেখরের অনুকম্পা তাহার কাল হইল। চন্দ্রশেখর যখন তাহাকে প্রতাপের গৃহে আশ্রয় দিয়া নবাবের নিকট তাহার পত্র পেশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তখন তিনি তৎকালীন অবস্থানুযায়ী যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং ঐ দিন অপরাহ্নের মধ্যে নবাব সে পত্র পাইলে দলনীর অদৃষ্ট হয়ত অন্য অক্ষরে লিখিত হইতে পারিত। এক্ষেত্রেও চন্দ্রশেখর দলনীর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া যে উপায়ে তাহার পক্ষে নবাবের সাক্ষাৎলাভ সম্ভব হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন এবং তকি খাঁ নবাবের নিকট পত্র প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে দলনী যদি তাহার আশ্রয়ে আসিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অন্ততঃ আত্মদোষখালনের জন্য দলনীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্কের অভিযোগ আনিবার কারণ ঘটিত না। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। অদৃষ্ট ফলিল, কিন্তু কোথাও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হইল না।

এখানে একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়েঃ কেন এমন হয়? অদৃষ্ট বলিতে যে অদৃশ্য মহাশক্তি বুঝি সে কি কোন আইন বা বিচার মানিয়া চলে না? দলনীর অদৃষ্টে এমন শোচনীয় পরিণাম কেন? ইহাই কি তাহার একনিষ্ঠ পতিভক্তির পুরস্কার? দলনী তাহার প্রথম সঙ্কট সময়ে বলিয়াছে, "ঈশ্বর আমার বিচারকর্ত্তা—আমি অন্য বিচার মানি না।" (২।৩)। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট হইতে সে কি সুবিচার পাইল? দলনী কেন মরিল? মরিল ত সে যে নিরপরাধিনী স্বামীকে সেকথা জানাইয়া যাইবার সুযোগটুকু পর্য্যন্ত পাইল না কেন?

যুগে যুগের মনীষী মানবের অদৃষ্ট আলোচনা করিতে যাইয়া অনুরূপ প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং শিক্ষা ও সংস্কারানুযায়ী ইহার উত্তর দিয়াছেন। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে পাশ্চাত্য মনীষী হার্ডি (Thomas Hardy) কাহিনীর যেরূপ পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বক্তব্য এইরূপঃ বিশ্বস্রষ্টা আর যাহাই হউন, তিনি ন্যায় বিচারক নহেন। শিশু যেমন নিত্য নূতন পুতুল লইয়া খেয়ালমত খেলা করিয়া তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া দেয়, খেলার শেষে আর তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না, মানবের ভাগ্যদেবতাও তেমনই মানব-পুতুল লইয়া চিরকাল তাঁহার নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়া আসিতেছেন। বহু গুণের সমাবেশে মানব-শিশুকে সৃষ্টি করিয়া নির্ম্মম পৃথিবীতে এক বিরুদ্ধ

আবেষ্টনের চাপে ফেলিয়া তাহার সমস্ত জীবনের আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়া তিনি এক উৎকট আনন্দ উপভোগ করেন। ইহা এক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর চরম দৃষ্টান্তস্থল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় ঋষি-ঔপন্যাসিক বঙ্কিম রমানন্দ স্বামীর মুখ দিয়া বলিতেছেন: "দুঃখ বলিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।" (৩।১, ৫৭ পৃঃ)। অর্থাৎ, লৌকিক জগতে আমরা যাহাকে দুঃখ বলিয়া থাকি, বৃহত্তর দৃষ্টিতে দুঃখ বলিয়া তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। সুতরাং লৌকিক জগতের মাপকাঠিতে বিশ্বনিয়ন্তার নিগূঢ় উদ্দেশ্যের বিচার করা চলে না। "ধর্ম্মতত্ত্বে" গুরুর কণ্ঠেও আমবা একই উক্তি শুনিতে পাই সুতরাং ইহাকে নিঃসন্দেহ পরিণত বঙ্কিমের সুচিন্তিত মতবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। হার্ডি ও বঙ্কিমের মতবাদ পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়াই প্রণিধানযোগ্য। তবে সৃষ্টি-কর্ত্তার কার্য্য সু হউক বা কু হউক বা সু-কুর অতীত হউক, সে আলোচনা দার্শনিকের, ঔপন্যাসিকের কার্য্য যাহা ঘটে, কথায় তাহার চিত্রাঙ্কন। দলনীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, মানব-জীবনের ইতিহাসে তাহা বিরল নহে, উপন্যাসের আলোচনায় ইহাই যথেষ্ট।

দলনীর অদৃষ্টগণনার ন্যায় রমানন্দ স্বামীর অলৌকিক কার্য্যকলাপ অতিপ্রাকৃতের আভাস দেয়। ইতিপূর্ব্বে বঙ্কিম যে সকল সন্ন্যাসীচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই অলৌকিক শক্তির অধিকারী নহেন। এই হিসাবে বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যে রমানন্দ স্বামীর একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। এবং এই সময় হইতে বঙ্কিম যে সকল সন্ন্যাসীচরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অলৌকিক শক্তির অধিকারী না হইলেও অনন্যসাধারণ।[১]

অনাহার, শারীরিক অবসাদ, মানসিক ভীতি ও অনুশোচনার প্রতিক্রিয়ায় শৈবলিনী যখন উন্মাদগ্রস্ত, চন্দ্রশেখর তখন রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুযায়ী তৎপ্রদত্ত মন্ত্রপূত ঔষধপ্রয়োগে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। 'ঔষধ আর কিছু নহে, কমণ্ডলুস্থিত জলমাত্র।' ইহার ফলে শৈবলিনী 'যোগবল' পাইল এবং রোগমুক্ত হইল। (৬।৬)। শৈবলিনীর ভিতর সাময়িক যোগবল সঞ্চারিত হওয়ার ফলে রোগমুক্তি ছাড়া আরও দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়: এক, চন্দ্রশেখরের প্রশ্নের উত্তরে শৈবলিনী একে একে তাহার

১ 'কপালকুণ্ডলা'র কাপালিক অনন্যসাধারণ; কিন্তু তিনি হিসাবের বাহিরে। কারণ তাঁহার কার্য্যাবলী নিছক বিতৃষ্ণা জাগাইয়া তোলে।

জীবনের জ্ঞাতব্য গোপন কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়াছে; দুই, রমানন্দ স্বামীর কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া শৈবলিনী পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া দিয়াছে যে, নবাবের আদেশে জনৈক সৈনিক পুরুষ তাহাকে নবাবের দরবারে লইয়া যাইবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু এই দুইটি জিনিষের প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা কতটুকু? শেষোক্ত ব্যাপারটি আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশের দিক দিয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং ইহা দ্বারা যোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইলেও আর্টের বিচারে ইহা উপন্যাসের ত্রুটি। প্রথমোক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, শৈবলিনীর জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায়ের বিবরণী জানিবার ঔৎসুক্য চন্দ্রশেখরের পক্ষে স্বাভাবিক এবং এই উপায়ে তিনি প্রকৃত তথ্য অবগত হইলেন। কিন্তু শৈবলিনী যাহা বলিল তাহা যেমন বাহিরের শক্তি-প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া, তেমনই বিবৃতিকালে শৈবলিনী 'ঘোর নিদ্রাভিভূত' ছিল, সুতরাং তাহার চেতন সত্তার সহিত এই বিবৃতির কোনরূপ সম্পর্ক নাই। চন্দ্রশেখরের ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য এইরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন আর্টের দিক দিয়া সমর্থন করা যায় না।

কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগের এইখানেই শেষ নহে। নবাবের দরবারে আর একবার ইহার শক্তি পরীক্ষিত হইল; এবার ফষ্টর ইহার লক্ষ্যবস্তু। (৬।৭)। এক্ষেত্রেও ফষ্টর যাহা বলিল তাহা স্বতঃপ্রণোদিত স্বীকারোক্তি নহে, রমানন্দ স্বামীর দৃষ্টি দ্বারা তাহার চিত্ত অভিভূত হইয়াছিল বলিয়াই তাহার কণ্ঠ তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। (৬।৭, ১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শৈবলিনীর বিবৃতি সম্বন্ধে যে আপত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, ফষ্টরের উক্তি সম্বন্ধেও তাহা প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ফষ্টর যাহা বলিল তাহা শৈবলিনীর কথার আংশিক পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু এই পুনরুক্তির সার্থকতা কি? চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না বলিয়া ফষ্টরকে প্রশ্ন করিয়া তাহার উক্তির যাথার্থ্য পরীক্ষা করিয়া লইলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে। কারণ যে কথা যোগবলে শৈবলিনীর নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সত্য সম্বন্ধে সন্দেহের অর্থ রমানন্দ স্বামীর যোগবলে তাঁহার বিশ্বাসের অভাব। ইহা অসম্ভব। দেখা যাইতেছে, নবাবের সৈনিক শৈবলিনীকে নিতে আসিতেছে, তাহার মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া চন্দ্রশেখর সমবেত গ্রামবাসীদের বলিলেন, "তোমরা সঙ্গে যাইও।" ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, চন্দ্রশেখর যখন বুঝিলেন শৈবলিনী ফষ্টর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তখন গ্রামবাসীদের নিকট ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি

নবাবের অনুমতি লইয়া ফষ্টরকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। রমানন্দ স্বামী পূর্ব্ব হইতেই প্রিয় শিষ্যের মনের কথা বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং ফষ্টর যখন চন্দ্রশেখরের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃত হইল তখন তিনি তাহাকে যোগবলে অভিভূত করিয়া প্রকৃত ঘটনা যথাযথ ব্যক্ত করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, পাঠক একটি চরিত্রের মুখে যাহা শুনিয়াছেন কতকটা অনুরূপ উপায়ে অপর কোন চরিত্রের মুখে তাহারই আংশিক পুনরাবৃত্তি আর্টের বিচারে শোভন নহে। সমগ্র জিনিষটি পূর্ব্বাপব আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তেই পেঁ ছাইতে হয় যে, যোগের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিবার অত্যধিক আগ্রহ এস্থলে শিল্পী বঙ্কিমকে প্রতারিত কবিয়াছে।

এইরূপ, শৈবলিনীর কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পরিকল্পনার মধ্যেও আমরা অসংযম-অসহিষ্ণু নীতিবিৎ বঙ্কিমকেই বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই। বঙ্কিম শৈবলিনীকে গার্হস্থ্যজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অথচ অনুতাপের আগুনে অগ্নিশুদ্ধা না হইলে সে কখনও স্বামীর গৃহে তাহার সহজ অধিকার ফিরিয়া পাইতে পারে না। এ অবস্থায় তাহার প্রতি প্রায়শ্চিত্ত বিধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলাম। কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্তের রূপনির্ণয়ে বঙ্কিম শৈবলিনীর প্রতি অনাবশ্যক কঠোর হইয়াছেন। অবশ্য ইহা ঠিক যে, এ সম্বন্ধে বিধি দিয়াছেন রমানন্দ স্বামী এবং এই বিধান তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ। কিন্তু বঙ্কিম রমানন্দ স্বামীকে যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য যে সর্ব্বতোভাবে বঙ্কিমের অনুমোদিত এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। শৈবলিনী সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজের উক্তি অনেকটা এই অনুমানের পরিপোষক। তিনি শৈবলিনীকে একাধিকবার 'পাপিষ্ঠা' বলিয়া সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এক স্থলে প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'তাঁহার চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।' (২।৩, ৩৮ পৃঃ)। অর্থাৎ শৈবলিনী এমনই পাপিষ্ঠা যে তাহার ঘৃণ্য জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া বঙ্কিমের লেখনী কলুষিত হইয়াছে; তাঁহার সান্ত্বনা এই যে, এই উপন্যাসে শুধু যে পাপিষ্ঠা শৈবলিনী রহিয়াছে তাহা নহে, ইন্দ্রিয়জয়ী প্রতাপও রহিয়াছেন। এবং একের চরিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া তাঁহার লেখনীতে যে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে, অপরের চরিত্র অঙ্কনে সে কলঙ্ক স্খলিত হইয়া তাঁহার 'লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।' ইহার পর শৈবলিনী তাঁহার স্রষ্টার নিকট হইতে আর যাহাই হউক, তাহার ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য ক্ষমা অথবা তাহার গভীর দুঃখে সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারে না। যে নারী প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রণয়াস্পদকে

লাভ করিবার আশায় তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করিয়া[১] তাহার সহায়তায় কুল-ত্যাগিনী হইয়াছে এবং এইরূপে স্বামীর শান্তির নীড় নির্ম্মম আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, সে যে পাপিষ্ঠা সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাই কি শৈবলিনীর একমাত্র পরিচয়? শৈবলিনীর ভালবাসা লালসার মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে পাপের পঙ্কিল আবর্ত্তে টানিয়া নিয়াছে, ইহা তাহার জীবনে এক অতি ঘৃণ্য সত্য। কিন্তু সেই ভালবাসাই অবস্থান্তরে ত্যাগের পথ দেখাইয়া মুহূর্ত্তে তাহাকে রূপান্তরিত করিল, ইহাও কি তাহার জীবনে তেমনই সত্য নহে? তাছাড়া, সমাজের বিরুদ্ধে, এমন কি তাহার দেবতুল্য স্বামীর বিরুদ্ধে তাহার কি কোন অভিযোগই নাই? তাহার অন্যতমা শুভানুধ্যায়িনী ভগিনীস্বরূপিনী ননদিনী সুন্দরী বড় দুঃখে, ক্রোধে ও অভিমানে তাহাকে বলিতেছে, "জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কি না, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না।....তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা; তাঁহাকে তোমার মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে।" (১।৪)। এ ভর্ৎসনা শৈবলিনীর অবশ্য প্রাপ্য; এবং যে অবস্থায় সুন্দরী তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছে, সে অবস্থায় সুন্দরীর মুখে ইহা শোভন ও স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে, যে রমণীর স্বামী তাহার আবদার রক্ষা করিতে যাইয়া তাহাকে লইয়া ডিঙ্গি বাহিয়া ইংরেজের বজরার অনুসরণ করেন এবং তাহার বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্রের দৃঢ়তায় পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাহার ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে ইংরেজের বজরায় ফেলিয়া রাখিয়া শৈবলিনীকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পরিকল্পনায় সম্মত হন, তিনি শৈবলিনীর যত অন্তরঙ্গই হউন, তাঁহার পক্ষে শৈবলিনীর অন্তরের ব্যথা উপলব্ধি করা

১ ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, 'ফষ্টর বলপ্রয়োগে শৈবলিনীকে লইয়া গেলেও শৈবলিনীর ইচ্ছাশক্তি ফষ্টরের উপর জয়লাভ করিয়াছে।' (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, তৃতীয় সংস্করণ, ৬৬ পৃঃ)। কিন্তু বলপ্রয়োগের ভান করিলেও ফষ্টর প্রকৃতপক্ষে বলপ্রয়োগ করে নাই। শৈবলিনী নিজেই বলিতেছে, ডাকাতির পূর্ব্বে ফষ্টর তাহার নিকট 'লোক প্রেরণ করিয়াছিল।' (৪।১)। শৈবলিনীর নিকট হইতে কোনরূপ ইঙ্গিত পাইয়া না থাকিলে ফষ্টর কখনও তাহার নিকট 'লোক প্রেরণ' করিত না, বলপ্রয়োগেই তাহাকে হরণ করিত।

সম্ভব নহে? আসলে নীতিবিৎ বঙ্কিমের চেতন মন 'পাপিষ্ঠা' বলিয়া শৈবলিনীর প্রতি যত কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুক, শিল্পী বঙ্কিমের অবচেতন মন হয়ত ইহাতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে নাই। হয়ত এই কারণেই যোগবলে অভিভূত শৈবলিনীর মুখে শুনিতে পাই, চন্দ্রশেখরকে সে প্রশ্ন করিতেছে, "এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?" চন্দ্রশেখর এ প্রশ্নের কোনরূপ উত্তর দিলেন না, প্রশ্নটি এড়াইয়া উত্তরের পরিবর্ত্তে তাহাকে পাল্টা এক প্রশ্ন করিলেন, কারণ তাঁহার তরফ হইতে এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। কিন্তু শৈবলিনী যদি তাহার প্রশ্নের সহিত আর একটুকু কথা যোগ করিয়া দিত, যদি বলিত, 'ছিঁড়িয়া পৃথক করিলেন ত যে ফুলটি তুলিয়া লইলেন তাহার যথাযোগ্য আদর করিলেন না কেন?'—তাহা হইলে তাহার সে অভিযোগ নিতান্ত ভিত্তিহীন হইত না।

চন্দ্রশেখর তত্ত্বজিজ্ঞাসু, জ্ঞানপিপাসু গ্রন্থকীট। জ্ঞানার্জ্জনে বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া তিনি স্বভাবতঃই দারপরিগ্রহের বিরোধী ছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর অবস্থার চাপে পড়িয়া মতের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল না; বিবাহ করিলে সংসারের নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট হইতে অব্যাহতি পাইয়া তিনি হয়ত অনন্যমনে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারিবেন, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি শেষ পর্য্যন্ত বিবাহের চিন্তা করিলেন। এবং সেই সঙ্গে তিনি ইহাও স্থির করিলেন যে, বিবাহ করিলে সুন্দরী মনোনীত করিবেন না, কারণ তাহাতে সংসারাসক্তির আশঙ্কা রহিয়াছে। এস্থলে চন্দ্রশেখর পুরাপুরি আত্মকেন্দ্রিক এবং এইরূপ মনোবৃত্তি আদর্শ গার্হস্থ্যজীবনের অনুকূল নহে। এইরূপ মন লইয়া ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় শৈবলিনীকে বিবাহ করা চন্দ্রশেখরের জীবনের এক মস্ত বড় ভুল এবং তাঁহার সহিত শৈবলিনীকেও এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে ভালবাসিতেন না এমন নহে, কিন্তু তাঁহার ভালবাসায় উচ্ছ্বাস বা উন্মাদনা ছিল না অথবা তাহা ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিত না। পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা তিনি তাঁহার চারিদিকে যে কঠিন প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা অতিক্রম করিয়া তাঁহার সত্যকার সান্নিধ্য লাভ করা শৈবলিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়া তিনি তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন, এরূপ চিন্তা যে কখন কখন চন্দ্রশেখরকে মনঃপীড়া দিত না এমত নহে। তাঁহার ভিতরকার যে চিরন্তন সহজ মানুষটি 'সংযমীর ব্রতভঙ্গে'র কারণ হইয়াছিল, জ্ঞানচর্চ্চার অবসরে সেই সুপ্ত মানুষটি জাগ্রত হইয়া কখন কখন তাঁহাকে

বিবৃত করিয়া তুলিত। সহসা গভীর রাত্রে অধ্যয়নান্তে 'শৈবলিনীর সুষুপ্তি-সুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া' চন্দ্রশেখর ভাবিতেন, "হায়। কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ?....আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখ-পরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব?" সহজ মানুষটি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিত, শৈবলিনীকে সুখী কর। তাহাতে যদি 'এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি' জলে ফেলিয়া দিতে হয়—তাহার আর বলা হইত না, জ্ঞানপিপাসু চন্দ্রশেখর তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া বলিত, "ছি, ছি, তাহা পারিব না।" তখন চন্দ্রশেখর ভাবিতেন, "তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?" অনুতপ্ত চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে আহারের কথা ভুলিয়া যাইতেন।[১] কিন্তু বাহিরের দৃষ্টিতে তাঁহার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ধরা পড়িত না। বাহিরের দৃষ্টিতে তিনি শুষ্ক তাপস।

চন্দ্রশেখরের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে শৈবলিনীর জন্য যে বিরাট ভালবাসা সঞ্চিত ছিল, শৈবলিনীর অপহরণের কঠিন আঘাতে তাহা আগ্নেয়-গিরির গৈরিক স্রাবের রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। তাঁহার ভিতরকার যে সহজ মানুষটি তত্ত্বজিজ্ঞাসু চন্দ্রশেখরের ভ্রূকুটির ভয়ে নীরবে আত্মগোপন করিয়াছিল, সুযোগ বুঝিয়া এক্ষণে সে 'পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ....মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর....ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য....কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ্....বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি' পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিযা আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিল। এইরূপে নির্য্যাতিত প্রকৃতি শৈবলিনীর প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ লইল।

১ বঙ্কিম চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর দাম্পত্যজীবনের একটি রজনীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১।২, ১৫—১৭ পৃঃ)। ইহা তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ আট বৎসরের ইতিহাসের প্রতীক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঐদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় শৈবলিনীই এ সম্বন্ধে কথা তুলিয়াছে, এবং এই সময়ের সংক্ষিপ্ত সংলাপ যেমন শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখরের গভীর বিশ্বাস তেমন বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার অনুচিত ঔদাসীন্যের পরিচয় দেয়। চন্দ্রশেখরের অসতর্ক দ্ব্যর্থবাচক 'আর আসিও না'—এই উক্তির মধ্যে যে নাটকীয় শ্লেষ রহিয়াছে তাহা লক্ষণীয়।

কিন্তু বিরাট দুঃখই মানুষকে বিরাট কল্যাণের পথ দেখাইয়া দেয়। শৈবলিনীর অপহরণের পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রশেখরের বৃহত্তর জীবনের আরম্ভ। এতদিন যাঁহার জগৎ গ্রন্থরাজীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এক্ষণে তিনি বাস্তব বহির্জগতে নামিয়া আসিলেন; পরোপকারব্রত গ্রহণান্তর চন্দ্রশেখরের জীবন কর্ম্মমুখী হইল। এবং যেদিন তিনি ফষ্টরকে ক্ষমা করিয়া প্রতাপকে প্রতিহিংসার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, সেই দিন তাঁহার ব্রতগ্রহণ সার্থক হইল।

কিন্তু রমানন্দ স্বামীর আওতায় আসিবার পর হইতে এই চরিত্রটি একেবারেই বর্ণহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রেম ও শাস্ত্রানুরাগের সঙ্ঘাতে প্রেমের পরাজয় বুঝিতে পারি; কিন্তু শৈবলিনীর চরম সঙ্কটকালে তাহার প্রতি আচরণে চন্দ্রশেখরকে রক্তমাংসের মানুষ বলিয়া মনে করা কঠিন, মনে হয় তিনি রমানন্দ স্বামীর নির্দ্দেশচালিত স্বাধীনসত্তাবিহীন যন্ত্রস্বরূপ।

রমানন্দ স্বামী নির্লিপ্ত সিদ্ধপুরুষ। লৌকিক জগতে তাঁহার একমাত্র অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম পরোপকার।[১] শৈবলিনী সম্বন্ধে তিনি যে কঠোর ব্যবস্থা করিলেন তাহার যৌক্তিকতা বিতর্কের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু রমানন্দ স্বামীর দৃষ্টিতে ইহাও পরোপকারের নামান্তর মাত্র, শৈবলিনীর বৃহত্তর কল্যাণ কামনা করিয়া তিনি তাহার প্রতি দৈহিক ও মানসিক শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। এ যেন দক্ষ চিকিৎসকের পক্ষে রোগমুক্তি কামনা করিয়া রোগীর অঙ্গে কঠিন অস্ত্রোপচার।

কিন্তু শৈবলিনীর সম্পর্কে রমানন্দ স্বামীর আচরণ আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিতে যাইয়া আর একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে: পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ প্রতাপকে উদ্ধার করিয়া গঙ্গাবক্ষে সন্তরণান্তর উভয়ে 'ছিপে' উঠিলে শেষ পর্য্যন্ত শৈবলিনী যখন অলক্ষ্যে পলায়ন করিল, তখন, সমগ্র ঘটনা লক্ষ্য করিয়া, তাহার পাপ সম্বন্ধে খানিকটা অনুমান করিয়া লইয়া রমানন্দ স্বামী তাহার প্রতি যেরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন না কেন, প্রতাপ যেদিন ফষ্টরের বজরা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেদিন গৃহত্যাগ ব্যাপারে তাহার অপরাধ কতটুকু সে সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়াই তিনি তাহাকে কাশী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কেন?[২] রমানন্দ স্বামী যাহা জানিতেন তাহা এই: চন্দ্রশেখরের অনুপস্থিতিতে কুটিয়াল সাহেব বন্দুক ও লোকজন লইয়া

১ এই হিসাবে 'বিষবৃক্ষে'র ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রথম খসড়া।

২ "শৈবলিনীকে আমি কাশী পাঠাইব।" ৬।১, ১১০ পৃঃ।

আসিয়া শৈবলিনীকে অপহরণ করিয়াছে। অর্থাৎ, তিনি যাহা জানিতেন তাহাতে এ ব্যাপারে শৈবলিনী সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী।[১] ধরিয়া লইলাম, সে যুগের কঠিন অনুশাসনে শৈবলিনীর দেহ কলুষিত হইয়া থাকিলে সমাজে সে পরিত্যাজ্যা। কিন্তু প্রতাপের চেষ্টায় তাহার মুক্তিলাভের পর রমানন্দ স্বামীর এক তরফা বিচারের পূর্ব্বে কেহ তাহাকে এ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন করে নাই। রমানন্দ স্বামী যে ব্যবস্থা করিলেন তাহার সমর্থনে একমাত্র যুক্তি এই যে, শৈবলিনীর অপরাধ থাকুক বা না থাকুক, এরূপ অবস্থায় সমাজজীবনে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সমাজবিধান মানিতেই হইবে, সে বিধান যত কঠোরই হউক। কিন্তু সে যুগে কাশীতে বা অনুরূপ কোন তীর্থস্থলে নির্ব্বাসনদণ্ডই কি এরূপ ক্ষেত্রে একমাত্র সামাজিক বিধি ছিল? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে 'লোকরঞ্জনার্থ' লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শৈবলিনীকে গ্রহণ করিবেন, —প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া চন্দ্রশেখর এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন কেমন করিয়া? (৬।৮, ১৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। চন্দ্রশেখর শাস্ত্রজ্ঞ এবং তাঁহার এই সঙ্কল্পও গুরুর অনুমোদিত ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যেখানে লঘু শাস্তি অশাস্ত্রীয় হইত না, সেখানে রমানন্দ স্বামী প্রথমে কঠিন শাস্তির বিধান দিয়াছিলেন। কিন্তু কেন? তিনি যখন বিচারকের আসনে বসিয়া শৈবলিনীর প্রতি চরম নির্ব্বাসনদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন তখন সে যে ম্লেচ্ছের সহিত একত্র বাস করিয়াছে, ইহা কি তাঁহার মনের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, এ ব্যাপারে শৈবলিনীর অপরাধ কতটুকু তাহার কোনরূপ অনুসন্ধান করাও তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সংসারত্যাগী মহাপুরুষটিও অনুদার অন্ধসংস্কারের উর্দ্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই।

রমানন্দ স্বামী মানুষের স্বাভাবিক সুখ দুঃখ ও প্রলোভনের অতীত;

---

১ সুন্দরী যে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে নাপিতানীবেশে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল এবং শৈবলিনী যে গৃহে ফিরিতে অস্বীকার করিয়াছিল, চন্দ্রশেখর তাহা জানিতেন না। জানিলে গুহামধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া শৈবলিনী যখন বলিল, "মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? কেন বিশ্বাস করিবে? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি?"—তখন সত্যাশ্রয়ী চন্দ্রশেখর তাহার মনস্তুষ্টির জন্য কখনও বলিতেন না, "তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।" এবং যাহা চন্দ্রশেখরের অজ্ঞাত ছিল, নিশ্চয়ই রমানন্দ স্বামীর তাহা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না।

সুতরাং আমাদের সহানুভূতি অ-সহানুভূতির বাহিরে। প্রতাপ আমাদের ন্যায় পৃথিবীর মানুষ ; প্রলোভনের অতীত না হইয়াও বিরুদ্ধ ঘটনার আবর্ত্তের মধ্যে প্রলোভনের উপর জয়ী হইয়াছেন। এই কারণেই আমরা তাঁহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারি। প্রতাপের দুই মূর্ত্তি : প্রতাপ জমিদার, প্রতাপ শৈবলিনীর বাল্যসহচর। জমিদার প্রতাপ লাঠিয়াল রাখেন, দাঙ্গা করেন, দাঙ্গা করিতে যাইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার করেন না এবং উদ্দেশ্য সাধু হইলে তাহার সাধনকল্পে যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। জমিদার প্রতাপ আত্মশক্তিতে আস্থাবান, হয়ত একটুকু দাম্ভিক প্রকৃতির।[১] কিন্তু ইহাই প্রতাপের সত্যকার পরিচয় নহে। প্রতাপের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার আচরণের ভিতর দিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। এবং আখ্যায়িকার মধ্যে জমিদার প্রতাপের কার্য্যের যতটুকু পরিচয় পাই, তাহাও শৈবলিনীর অদৃষ্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

প্রতাপের চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁহার অনমনীয় মনোবল প্রথম হইতেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে মানসিক শক্তি ও সাহস উত্তরকালে তাঁহাকে একমাত্র অনুচরের সহায়তায় ইংরেজের সুরক্ষিত বজরা হইতে শৈবলিনীকে উদ্ধারের কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিল, যে মানসিক শক্তি ও সাহসগুণে শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইংরেজের যুদ্ধে জানিয়া শুনিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন, শৈবলিনীর সহিত পরামর্শানুযায়ী ভাগীরথীর জলে ডুবিয়া মরার প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা তাহার প্রথম পরিচয় পাই। কিন্তু চরিত্রের এই সহজাত দৃঢ়তা সত্ত্বেও চিত্তসংযমে আপনার শক্তি সম্বন্ধে তিনি আস্থাবান নহেন ; পরন্তু, এ বিষয়ে তাঁহার দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে তিনি যেন অতিমাত্রায় সচেতন। শারীরিক শৌর্য্য সম্বন্ধে অতিমাত্রায় চেতনাবোধের পার্শ্বে বিরুদ্ধধর্ম্মগুণে ইহা বিশেষ করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দুর্ব্বলতাবোধের ফলেই শৈবলিনীকে 'সর্প মনে করিয়া' তাহার 'বিষের ভয়ে' প্রতাপ বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। হয়ত এই কারণেই রূপসীকে বিবাহ করিয়া তিনি সংসারী হইয়াছিলেন। এবং শৈবলিনীর উদ্ধারের পর অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি যে রূঢ় আচরণ করিলেন, শৈবলিনীর বিসদৃশ প্রশ্ন তাহার প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও নিজের

১ শৈবলিনীর উদ্ধারকালে বজরা দখল করিয়া, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়' বলিয়া দাঁড়ীমাঝিদের শাসাইবার (২।৫) কোন প্রয়োজন ছিল না। এ অবস্থায় তাঁহার আদেশই যথেষ্ট ছিল। এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া অন্যত্র বঙ্কিম নিজেই বলিয়াছেন যে, প্রতাপ ইহা 'গর্ব্বভরে' বলিয়াছিলেন। ২।৭, ৫৩ পৃঃ।

দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে চেতনাবোধ হয়ত প্রতাপকে এই সময় অধিকতর কঠোর করিয়াছে।

শৈবলিনী সম্বন্ধে তাঁহার দুর্ব্বলতা প্রতাপ যথাসম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছেন। 'চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত' জানাইতে বিলম্ব করার জন্য সুন্দরীকে ভর্ৎসনা করিতে যাইয়াও তিনি বলিতেছেন, "কেন, তুমি কি জান না—আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে?" (২।৪)। চন্দ্রশেখর হইতে প্রতাপের সর্ব্বস্ব, ইহা অতি বড় সত্য কথা; কিন্তু শৈবলিনীকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্পের পশ্চাতে ইহাই কি একমাত্র, বা এমন কি সর্ব্বপ্রধান যুক্তি? শৈব-লিনীকে শৈবলিনী বলিয়াই উদ্ধার করিতে হইবে, এই সহজ সত্য হয়ত তিনি নিজের কাছেও স্বীকার করিতে চাহেন না। কেবল দু'একটি বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে আমরা তাঁহার অন্তরের সত্যকার পরিচয় পাই। শৈবলিনী তাঁহাকে ইংরেজের কবল হইতে উদ্ধার করিলে ভাগীরথীবক্ষে সন্তরণকালে (৩।৬) দু'একটি কথায় শৈশবসহচরীর নিকট তাঁহার হৃদয়ের ক্ষত যেন নিজের অজ্ঞাতেই অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার তৎকালীন সংযম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা উজ্জ্বলতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। অপর একটি চিত্রের উল্লেখ করিতেছি। প্রায়শ্চিত্তান্তে রমানন্দ স্বামীর কৃপায় শৈবলিনী এক্ষণে সম্পূর্ণ প্রকৃতস্থ। (৬।৮)। প্রতাপের অনুমতিসাপেক্ষ শৈবলিনী আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছে: স্বামী যদি তাহাকে পুনর্গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট কোন কথা লুকাইবে না, পূর্ব্বকথা জানাইয়া তাঁহার ক্ষমাভিক্ষা করিবে। এ সম্বন্ধে অনুমতি চাহিলে 'প্রতাপ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, "বলিও। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।' চিত্রটি ইঙ্গিতপূর্ণ। প্রতাপের নীরব অশ্রুর ভিতর দিয়া বঙ্কিম একটি রেখায় তাঁহার জীবনের রিক্ততা পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং ইহা মানবমনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় দেয়। দুর্দ্দমনীয় প্রলোভনের সম্মুখে শৈবলিনীর ভালবাসার সুযোগ লইয়া প্রতাপ তাহাকে নবজীবনের পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আজ যখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার শিক্ষা নিষ্ফল হয় নাই, শৈবলিনী তাহার শপথের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে, তখন শৈবলিনীবিহীন জীবনের ব্যর্থতার অনুভূতি সহসা তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত করিল। প্রতাপের নীরব অশ্রু এই আত্মবিস্মৃতির অভিব্যক্তি। অবশ্য এই দুর্ব্বলতা ক্ষণিকের; বিদায়কালে প্রতাপের মুখে 'অতি কোমল, অতি মধুর হাসি'। প্রতাপ পথের শেষ দেখিতে পাইয়াছেন; তাঁহার হাসি আসন্ন আত্মাহুতির কল্পনায় পরিতৃপ্তির হাসি।

চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর মঙ্গল কামনা করিয়া আত্মাহুতিতেই প্রতাপের পূর্ণ পরিচয়। মৃত্যুপথযাত্রী প্রতাপ নিজেই শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন: "পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।" শৈবলিনীর কল্যাণে জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রতাপকে শেষযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করিয়াছে; সুতরাং মৃত্যুর মুহূর্ত্তে তাঁহার এই আত্মবিশ্লেষণ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতাপের জীবন প্রকৃতপক্ষে ভালবাসার প্রেরণায় ত্যাগের সাধনা; মৃত্যুতে এই সাধনার সিদ্ধি।[১]

মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় বিভিন্ন সময়ে এ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন এস্থলে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'বঙ্কিম-বরণে' তিনি লিখিয়াছেন: 'এত বড় অন্তর-সংগ্রাম আর কোন বাংলা কাব্যে চিত্রিত হয় নাই; সে সংগ্রামে এতখানি শক্তির পরিচয়—যে শক্তি এমন অবস্থায় এমন করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে, প্রেমের এমন 'রূপান্তর'—আর কোন কাব্যসৃষ্টিতে এমন সার্থক হয় নাই।'[২] ইহা মোহিতলালের বিচারবুদ্ধিপ্রসূত নিরপেক্ষ অভিমত। কিন্তু প্রতাপের প্রণয়লিপ্সু শৈবলিনীর প্রতি গভীর সহানুভূতিবশতঃ প্রতাপের এই আত্মবিসর্জ্জন তিনি অন্তর দিয়া সমর্থন করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তীকালে একই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন: 'প্রতাপ ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিল—তাহাতেও তাহার আত্মার আর্ত্তনাদ স্তব্ধ হয় নাই। সেই আত্মাভিমানের বশে সে ঐ নারীকে এতটুকু মমতা করে নাই। শৈবলিনীর নারীজীবন ব্যর্থ, এমন কি, নিঃশেষে নিহত হওয়ার পর, প্রতাপের ঐ আত্মবিসর্জ্জন পুরুষের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে—শৈবলিনীর তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি আর নাই।'[৩] প্রতাপ 'আত্মাভিমানের বশে' শৈবলিনীকে 'এতটুকু মমতা' করেন নাই, এরূপ অভিযোগ করিলে তাঁহার প্রতি গুরুতর অবিচার করা হইবে—আত্মাভিমান নহে, শৈবলিনীর প্রতি মমত্ববোধই তাঁহাকে পথনির্দ্দেশ করিয়াছে। প্রতাপের হৃদয় মমতায় পূর্ণ ছিল বলিয়াই এতখানি মমতাহীন হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে; 'বঙ্কিম-বরণে'র ভাষায়, এই মমতাহীনতা প্রেমেরই

১ ষষ্ঠ, অর্থাৎ শেষ খণ্ডের নামকরণ লক্ষণীয়। ইহাও লক্ষণীয় যে, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রাকালে প্রথমে প্রতাপের চিত্ত প্রতিশোধবাসনা-মালিন্যদুষ্ট ছিল; পরে চন্দ্রশেখরের আদর্শে মালিন্যমুক্ত হইয়া তিনি আত্মোৎসর্গের পূর্ণ অধিকারী হইলেন।

২ বঙ্কিম-বরণ, ১২০ পৃঃ। প্রথম প্রকাশকাল বাংলা ১৩৫৬ সাল।

৩ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, ৪৫ পৃঃ। প্রথম প্রকাশকাল বাংলা ১৩৬১ সাল।

'রূপান্তর'। দ্বিতীয়তঃ, শৈবলিনীর জীবন ব্যর্থ কি সার্থক হইয়াছে ইহা বিতর্কমূলক প্রশ্ন। প্রতাপ বিশ্বাস করিতেন (এবং তাঁহার এই বিশ্বাস বঙ্কিমের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর দ্যোতক) যে, ভোগাতুরা শৈবলিনী 'নিঃশেষে নিহত' হইলেই তাঁহার শৈশবসহচরী কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং তিনি যে এই কল্যাণময়ী শৈবলিনীকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন এইখানেই তাঁহার নির্ম্মম প্রেমের চরম সার্থকতা। পরিশেষে, 'প্রতাপের ঐ আত্মবিসর্জ্জন পুরুষের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে— শৈবলিনীর তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি আর নাই'—এরূপ উক্তি ক্রোধমিশ্রিত ক্ষোভের অভিব্যক্তি। এখানে 'পুরুষের গৌরব বৃদ্ধি'র প্রশ্ন ওঠে না, কারণ প্রতাপের আত্মবিসর্জ্জন নরনারীনির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির সম্পদ এবং শৈবলিনীর ইহাতে 'ক্ষতিবৃদ্ধি' থাকুক বা না থাকুক, আর্টের বিচারে ইহাই যথেষ্ট যে, প্রতাপের আত্মবিসর্জ্জন তাঁহার চরিত্রানুরূপ এবং শৈবলিনীর যে উক্তি এই আত্মবিসর্জ্জনের প্রত্যক্ষ কারণ ("যতদিন তুমি এই পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না," ইত্যাদি) তাহা শৈবলিনীর তৎকালীন মানসিক অবস্থায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

নারীচরিত্রের মধ্যে দলনীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য: তাহার প্রতিপ্রাণতা ও অবিমৃষ্যকারিতা প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনীর সহিত দলনীর পার্থক্যের উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। দলনী ও শৈবলিনী পরস্পরের বিপরীত গুণসম্পন্না। ইহারা উভয়েই প্রেমিকা। শৈবলিনীর প্রেম বর্ষার বেগবতী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় কূল-প্লাবিনী। ইহা ধর্ম্ম মানে নাই, সমাজ মানে নাই, সকল বাধা ও বন্ধন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রমত্ত বেগে প্রণয়াস্পদের পানে ছুটিয়াছে, তাঁহাকে দলিয়া পিষিয়া নিবিড়ভাবে একান্ত আপনার করিয়া লইতে চাহিয়াছে। ইহা উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল ও লালসাদুষ্ট; ভোগলিপ্সায় ইহার অভিব্যক্তি। এই কারণে প্রেমের প্রথম পরীক্ষায় শৈবলিনীকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং পরে অগ্নিশুদ্ধা হইলেও, অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে না পারায় তাহাকে তাহার প্রণয়াস্পদের মৃত্যুর কারণ হইতে হইয়াছে। দলনীর প্রেম প্রভাত অরুণের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল, ইহা আপনার পক্ষপুটে প্রণয়াস্পদকে সকল অমঙ্গল হইতে আড়াল করিয়া রাখিতে চাহে। প্রণয়াস্পদের সত্তায় আত্মবিলোপ ইহার ধর্ম্ম; মৃত্যুতে ইহার অগ্নিপরীক্ষা।

শুধু প্রেমের অনুভূতিতে নহে, অন্যত্রও আমরা দলনী ও শৈবলিনীর চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করি। শৈবলিনী চতুরা, অসমসাহসিকা ও

প্রত্যুৎপন্নমতি; দলনী সরলা, ভীরুস্বভাবা[১] ও অবিমৃষ্যকারিণী। শৈবলিনী নবাবকে বিভ্রান্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য আদায় করিয়া, চাতুর্য্যে ইংরেজের চক্ষে ধূলি দিয়া প্রতাপকে উদ্ধার করিয়াছে, দলনী স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলে গুর্‌গণ খাঁর জালে পড়িয়া নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে।

দলনী যদি শৈবলিনীর বিপরীতধর্ম্মী, চাতুর্য্য, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সুন্দরী তাহার সমগোত্রীয়া। শৈবলিনীর উদ্ধারকল্পে সুন্দরীর 'নাপিতানীর' ভূমিকা অভিনয় অনেকাংশে প্রতাপের উদ্ধারকল্পে শৈবলিনীর পাগলিনীর ভূমিকা অভিনয়ের সহিত তুলনীয়। এবং ভাগ্যদোষে শৈবলিনী কুলত্যাগিনী হইলেও সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী কতকটা একই প্রকারের। শৈবলিনীর প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যে সংস্কার-বশে সুন্দরী 'একটু তফাৎ রহিল' এবং পরে নিত্য তাহার পরিচর্য্যান্তে স্নান করিয়া শুচি হইত, সেই সংস্কারবশেই শৈবলিনী বুঝিয়াছিল যে, ফষ্টরের সহিত এক নৌকায় বাস করিয়াও সে জাতিভ্রষ্ট হয় নাই, কারণ তাহারা এক নৌকায় বাস করিয়াছে সত্য, 'কিন্তু গঙ্গার উপর।'[২]

সুন্দরী শৈবলিনীর চরিত্রবিকাশের সহায়। ভীমা পুষ্করিণীতে জল-ক্রীড়াকালে সুন্দরীর সহিত রহস্যালাপের ভিতর দিয়া আমরা যেমন শৈবলিনীর স্বাভাবিক পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় পাই (এই দিক দিয়াও সুন্দরী তাহার সহোদরস্থানীয়া), ফষ্টরের বজরায় সুন্দরীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকালে তাহার উক্তির ভিতর দিয়া আমরা তেমনই চন্দ্রশেখরের গৃহে তাহার জীবন কিরূপ দুর্ব্বহ হইয়াছিল কতকটা তাহার আভাস পাই। শৈবলিনী সুন্দরীর ন্যায় নৃত্যচঞ্চল এবং বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতি চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার মিলনের অন্তরায় না হইলেও তাহার পক্ষে এই গ্রন্থকীটের গদ্যময় জীবনের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করা হয়ত সহজ ছিল না। অন্ততঃ, অগ্নিশুদ্ধা হইবার পূর্ব্বে তাহার

১ নবাবের অজ্ঞাতসারে রাত্রিকালে অন্তঃপুরত্যাগ দলনীর সাহসের পরিচয় দেয় না; কারণ গুর্‌গণ খাঁ যে তাহাকে কোনরূপ বিপদে ফেলিতে পারেন দলনী তাহা কল্পনা করে নাই। অবশ্য মরিতে সে ভয় করে না; কিন্তু মরিবার সাহস এবং ছদ্মবেশে শত্রুর ঘাঁটিতে যাইয়া প্রণয়াস্পদকে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় যে সাহসের প্রয়োজন তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। দলনীর এই শেষোক্ত প্রকারের সাহস ছিল না। দলনী স্বামীর 'হুকুমে' বিষপান করিয়াছে; স্বামী ইংরেজের বন্দী হইয়াছেন এরূপ সংবাদ পাইলে দলনী অনশনে বা বিষপানে মরিতে পারিত; কিন্তু স্বয়ং তৎপর হইয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য শৈবলিনীর ন্যায় কোনরূপ দুঃসাহসিক কাজ করিতে পারিত না।

২ একথা শৈবলিনী যোগপ্রভাবে আবিষ্ট অবস্থায় বলিলেও (৬।৬, ১২৭ পৃঃ) ইহা যে তাহার ব্যক্তিগত বিশ্বাস সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই।

পক্ষে চন্দ্রশেখরের 'শ্মশ্রুশোভিত বদনমণ্ডলে' এবং 'চন্দনচর্চ্চিত' ললাটে 'মদনের সুখকুঞ্জ' আবিষ্কার করার নিশ্চয়ই কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না।

সুন্দরীর চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে একটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ এই যে, শৈবলিনীকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প লইয়া ইংরেজের বজরায় উপস্থিত হইলেও এই সুন্দরীই ভীমার তীরে 'তালবৃক্ষতলে' গোরার মুখ দেখিয়া কলসী ফেলিয়া, শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া না তাকাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার আচরণে এই যে সমঞ্জস্যের অভাব, ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সুন্দরী সহজাত সংস্কারবশে গোরা দেখিয়া পলাইয়াছিল ; এবং পরবর্ত্তীকালে শৈবলিনীর প্রতি ভালবাসার প্রেরণায় যখন সে তাহাকে উদ্ধার করিতে গেল তাহার তৎকালীন সাহস্ কর্ত্তব্যবুদ্ধিসঞ্জাত। সহজ ভীরুতা এবং চিন্তাপ্রসূত সাহসের এইরূপ সমাবেশ বাস্তব জীবনেও বিরল নহে। কিন্তু শৈবলিনীর উদ্ধারের পরিকল্পনা শুধু বাঙ্গালী নারী হিসাবেই নহে, সাধারণভাবেই সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সুন্দরী না হয় পরিকল্পনানুযায়ী শৈবলিনীকে উদ্ধার করিল, কিন্তু পরে ইংরেজের হাত হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে সে সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই এরূপ দুঃসাহসিক অভিযান সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব এবং স্বাভাবিক নহে। অবশ্য সুন্দরীর চরিত্রের এমন এক আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে যে, তাহার কার্য্যের অসম্ভাব্যতা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়।

শৈবলিনীর পার্শ্বে সুন্দরীর ন্যায় বঙ্কিম দলনীর পার্শ্বে কুল্‌সম্‌কে সৃষ্টি করিয়াছেন। কুল্‌সম্ ধর্ম্মজ্ঞানরহিতা, কিন্তু দলনীর প্রতি অনুরক্তা। সাময়িক দুর্ব্বলতাবশতঃ দলনীকে ত্যাগ করিয়া সে যে অপরাধ করিয়াছে, বিভীষিকাময় মৃত্যুর সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া মীরকাসেমকে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য যথাযোগ্য তিরস্কৃত করিয়া সে তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিল। কুল্‌সম্ 'ওথেলো' নাটকে এমিলিয়াকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এবং নবাবের প্রতি কুল্‌সমের তিরস্কারবাণী ("শুনুন, সুবে বাঙ্গলা বেহারের, মীরকাসেম নামে, এক মূর্খ নবাব আছে।" ইত্যাদি। ৬।৩) "O gull ! O dolt !"—ওথেলোর প্রতি এমিলিয়ার এই তিরস্কারবাণীর (ওথেলো ৫।২) সহিত তুলনীয়।

এস্থলে অপর একটি অপ্রধান নারীচরিত্রের উল্লেখ না করিলে তাহার প্রতি গুরুতর অবিচার করা হইবে। রূপসীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ক্ষণিকের। কিন্তু এই ক্ষণিকের পরিচয়েই তাহার চরিত্রের মাধুর্য্য আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। পরিচয়টা এইরূপ : 'সুন্দরী কিছুদিন ভগিনীর নিকট থাকিয়া, আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া, শৈবলিনীকে গালি দিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে,

সুন্দরী, রূপসীর নিকট প্রমাণ করিতে বসিত যে, শৈবলিনীর তুল্য পাপিষ্ঠা, হতভাগিনী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। একদিন রূপসী বলিল, "তা ত সত্য, তবে তুমি তার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতেছ কেন?"

সুন্দরী বলিল, "তাঁর মুণ্ডপাত করিব ব'লে—তাঁকে যমের বাড়ী পাঠাব ব'লে—তাঁর মুখে আগুন দিব ব'লে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রূপসী বলিল, "দিদি, তুই বড় কুঁদুলী।" ' (চন্দ্রশেখর ২।৪)। কুঁদুলী না হইলেও সুন্দরী একটুকু ঝাঁজালো, রূপসীর চরিত্রে ঝাঁজ নাই। এই চরিত্রটি স্মরণ করিলেই চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া ওঠে সদাহাস্যময়ী এক তরুণীর চিত্র। বঙ্কিম ইচ্ছা করিয়াই তাহার বিবাহিত জীবনের উপর পর্দা টানিয়া দিয়াছেন। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে, প্রতাপ জ্ঞানতঃ কখনও তাহার প্রতি আচরণে কর্ত্তব্যের ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কর্ত্তব্য কি ভালবাসার স্থান অধিকার করিতে পারে? প্রতাপ শৈবলিনীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আত্মদান করিলেন। ভাল কথা। কিন্তু তাঁহার পরিণীতা পত্নীর কথা একবারও তাঁহার মনে আসিয়াছিল কি? পরোপকার ও চিত্তসংযমের পুরস্কারস্বরূপ তিনি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করুন; কিন্তু সেই স্বর্গলোকে সহসা যদি রূপসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে রূপসী হয়ত কোন অভিযোগই করিবে না, কিন্তু এই ইন্দ্রিয়জয়ী বীরপুরুষ সহজভাবে তাহার দিকে তাকাইতে পারিবেন কি?

শৈবলিনী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র। বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ তাহার জীবন যেন একখানি পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক। প্রতাপের সাহচর্য্যে বাল্য ও কৈশোরে ইহার প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কে শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের বিবাহিত পত্নী, ফষ্টরকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রতাপের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগে তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভ এবং প্রতাপকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গাবক্ষে 'প্রাণান্তকর' শপথে ইহার পরিসমাপ্তি, চতুর্থ অঙ্কে শৈবলিনীর কঠিন প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রায়শ্চিত্তান্তে শৈবলিনী যখন 'মনের পাপ' স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিবার সঙ্কল্প লইয়া এ বিষয়ে প্রতাপের অনুমতি চাহিল (৬।৮, ১৩৬ পৃঃ), সেই সময় তাহার জীবননাট্যে পঞ্চম অঙ্কের সূচনা।

প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।' প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনের ইতিহাস এই অভিসম্পাতের ইতিহাস হইলেও, বঙ্কিমের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে এই অভিসম্পাতই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের জীবনে পরিপূর্ণ সার্থকতা আনিয়াছে। প্রতাপ ও শৈবলিনীর চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহাই বিশেষ করিয়া লক্ষণীয়।

প্রতাপ ও শৈবলিনী পরস্পরের বাল্যক্রীড়ার সহচর সহচরী। ভাগীরথীর ঢেউয়ের বুকে নৌকা গণিতে গণিতে, সন্ধ্যাকাশের তারকা গণিতে গণিতে, ফুলের মালা লইয়া বিবাদ করিতে করিতে কখন যে তাঁহাদের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার ইতিহাস হয়ত উভয়েরই অজ্ঞাত। সান্নিধ্যজনিত এই প্রণয় যদি স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত উভয়েরই জীবন সুখের হইত। কিন্তু সমাজের অনুশাসন তাহাদের মিলনের অন্তরায়; দূরসম্পর্কিত হইলেও তাহারা জ্ঞাতি। প্রতাপ বয়োজ্যেষ্ঠ, জানিত বিবাহ হইবে না। কিন্তু শৈবলিনী না বুঝিয়া স্বপ্নসৌধ রচনা করিল, এবং যেদিন তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিল সেদিন সে সমাজের অনুশাসন প্রতাপের মত নতশিরে মানিয়া লইতে পারিল না। মনে হয় ভাগীরথীর জলতলে রোমান্টিক বাসরশয্যা রচনার পরিকল্পনা শৈবলিনীর মস্তিষ্কপ্রসূত, অন্ততঃ যাহা হউক একটা কিছু করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে জল্পনাকল্পনা যে তাহারই প্ররোচনায় আরম্ভ হইয়াছিল ইহা সুনিশ্চিত। কারণ প্রতাপ এ বিষয়ে অগ্রণী হইলে যখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ব্যর্থতাই তাঁহার প্রণয়ের পুরস্কার তখনই ইহার সূচনা হইত। প্রতাপ ধীর, স্থির, শান্ত, সংযতচরিত্র; শৈবলিনী চঞ্চলপ্রকৃতি ও উচ্ছ্বাসময়ী।

শৈবলিনীর চরিত্রে প্রতাপের চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব। পরিকল্পনানুযায়ী প্রতাপ ডুবিল,[1] শৈবলিনী ডুবিতে পারিল না। শৈবলিনী প্রতাপকে ভাল-

১ ইহা কি বঙ্কিমের অসম্ভব কল্পনা নহে? যাঁহারা সন্তরণপটু তাঁহারা ঢেউ-এর উপর গা ভাসাইয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের পক্ষে হাত পা ছাড়িয়া ডুবিয়া যাওয়া কি সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে (অবশ্য বঙ্কিমের বর্ণনায় এরূপ কোন আভাস নাই) যে, প্রতাপের সঙ্কল্প ছিল যতক্ষণ জ্ঞান থাকিবে প্রাণপণ চেষ্টায় তলাইয়া যাইতে থাকিবেন, পরে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে স্বভাবতঃই ডুবিয়া যাইবেন। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু মিহির সেন মহাশয়কে প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

Any good swimmer, if experienced enough can completely relax in water.... He need not move any of his limbs....If he simply lets himself sink, his body will go down right up to the upper lip and no further..........

As to whether a good and experienced swimmer can drown himself by diving deeper and deeper until he knocks himself out, I am equally sceptical. If he has not drugged himself, he will find it really impossible. But what about the case of one whose mind is unhinged due to great distress/shock etc? Even he will find it tough going, especially in a river to dive beyond 15/20 feet....This is so because the specific gravity of water buoys up the human body and going gets tougher every fathom.

প্রতাপ প্রাণপণ চেষ্টায় তলাইয়া যাইতে থাকিলে শেষ পর্য্যন্ত এই উপায়ে আত্মহত্যা সম্ভব হইত কিনা সে প্রশ্ন এস্থলে অবান্তর। প্রশ্ন এই: প্রতাপের ডুবিয়া যাওয়া ও তাঁহার উদ্ধারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র কয়েক সেকেণ্ড হইলেও চন্দ্রশেখরের পক্ষে 'সন্তরণ করিয়া, প্রতাপকে ধরিয়া' নৌকায় তোলা, অর্থাৎ অতি সহজেই তাঁহাকে উদ্ধার করা কি সম্ভব? এই সময়ের মধ্যে প্রতাপ কি কয়েক ফুট তলাইয়া গিয়াছিলেন না?

বাসে সত্য, কিন্তু তাহার অধিক সে নিজেকে ভালবাসে। তাহার ভোগ-বাসনা প্রতাপকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়াই প্রতাপকে বাদ দিয়া জীবনধারণ করা তাহার কল্পনায় অসহনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার নিকট ভালবাসা অপেক্ষা ভোগের আকর্ষণ অধিকতর প্রবল। এই কারণেই প্রতাপকে ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার মনে প্রশ্ন জাগিল, "কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে?" অর্থাৎ, রক্তমাংসের দেহের প্রতাপ তাহার অতি আপনার হইলেও, মরণপথের যাত্রী প্রতাপের সহিত সে কোন সম্বন্ধই খুঁজিয়া পাইল না। ইহার পর চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার বিবাহ। এবং এই বিবাহের আট বৎসর পরে প্রকৃতপক্ষে আখ্যায়িকার আরম্ভ।

শৈবলিনী আট বৎসর স্বামীর সংসার করিয়াছে; সেখানে সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তবুও স্বামীর সংসার তাহাকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দীর্ঘ আট বৎসর পরে প্রতাপকে আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ফষ্টরকে উপলক্ষ্য করিয়া শৈবলিনী গৃহত্যাগ করিল।

কিন্তু কেন এমন হইল? বাল্যপ্রণয়ের আকর্ষণ কি এতই প্রবল যে শৈবলিনী এতদিনেও তাহার মোহ কাটাইতে পারিল না? অন্ততঃ, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যানুভূতি এতদিনেও তাহাকে কেন্দ্রস্থ করিতে পারিল না কেন? এই প্রসঙ্গে বিরুদ্ধধর্ম্মগুণে আর একটি চরিত্র স্মরণে আসে। লবঙ্গলতাও বাল্যে অমরনাথকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং সে ভালবাসা তিনি কখন বিস্মৃত হন নাই; কিন্তু ইহা কখনও স্বামীর প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যের কোনরূপ ত্রুটি ঘটাইতে পারে নাই। পরন্তু তাঁহার তরল হাস্যপরিহাসে মিত্রজার গৃহ রাত্রি-দিন আনন্দমুখরিত থাকিত। লবঙ্গ যদি বৃদ্ধ স্বামী লইয়া সুখী হইতে পারিলেন, তাহা হইলে শৈবলিনী কেন প্রৌঢ় চন্দ্রশেখরের গৃহে সুখী হইতে পারিল না? ইহার প্রধান কারণ অবশ্য উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্য; কিন্তু প্রতিবেশের পার্থক্যও উপেক্ষণীয় নহে। বৃদ্ধ স্বামীর শুভ্রকেশে কলপ মাখাইয়া, তাঁহাকে 'কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কল্‌কাপেড়ে' কাপড় পরাইয়া, 'নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গ আতর মাখাইয়া' এবং 'নাক ডাকিলে, ছয়গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরময় ঝম্ ঝম্ করিয়া' তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া রসে রঙ্গে লবঙ্গের দিন কাটিত। অতীতের কথা ভাবিবার তাহার অবসর কোথায়? শৈবলিনীর জীবনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন প্রকারের। জ্ঞানযোগী তাপস চন্দ্রশেখরের সহিত নিজের কোনরূপ যোগসূত্র সে খুঁজিয়া পায় নাই। চন্দ্রশেখরের অপরিসীম ভালবাসা, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব শৈবলিনীর অজ্ঞাত; সুতরাং শৈবলিনীর চক্ষে তিনি সুখদুঃখের অনুভূতির অতীত—

পাষাণদেবতাস্বরূপ। শৈবলিনী স্বামীর গৃহে এমন কোন আকর্ষণ খুঁজিয়া পায় নাই যাহা তাহার অন্তরের শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারে। এই কারণেই বাল্যের সহচর প্রতাপ রূপসীর স্বামীরূপ পুনরায় যখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার ভুলিয়া-যাওয়া স্মৃতি নূতন করিয়া তাহাকে অভিভূত করিল। একে শৈবলিনী কখন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে শিক্ষা করে নাই, তাহাতে তাহার ভোগবাসনা অতৃপ্ত, সুতরাং তাহার তৃষিত অন্তর প্রতাপকেই আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিল। শৈবলিনী দুঃসাহসিকা, শৈবলিনী বুভুক্ষু নারী—প্রতাপকে পাইবার লোভে সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার গৃহত্যাগের এক কারণ স্বামীর ভালবাসায় অবিশ্বাস এবং স্বামীর সংসারে আকর্ষণের অভাব ; ইহার অপর কারণ প্রতাপ সম্বন্ধে শৈবলিনীর ভ্রান্ত ধারণা : শৈবলিনী ভাবিয়াছিল প্রতাপকে সে আজিও ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারিবে।

শৈবলিনীর দুর্ভাগ্য তাহার অপহরণের ফলে চন্দ্রশেখরের জীবনে যে প্রতিক্রিয়া আসিল, সে তাহার কোন সংবাদই পাইল না, কারণ সুন্দরী যখন তাহার উদ্ধারকল্পে যাত্রা করে তখন পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই ; নহিলে সুন্দরীর ভর্ৎসনায় চন্দ্রশেখরের শোকোন্মত্ততার উল্লেখ থাকিলে শৈবলিনী অন্ততঃ অত সহজে তাহার আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিত না। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের মর্ম্মব্যথা জানিল না। তিনি যখন তাঁহার প্রিয় গ্রন্থরাজী পোড়াইয়া ফেলিতেছেন, শৈবলিনী হয়ত তখন পুরন্দরপুরের 'কুঠির বাতায়নে বসিয়া কটাক্ষ-জাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষীকে' ধরিবার স্বপ্নে মসগুল হইয়া রহিয়াছে।

রামচরণের ভুলের ফলে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতাপের গৃহে তাঁহার সহিত যখন শৈবলিনীর সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রথম সে তাহার হিসাবের ভুল বুঝিতে পারিল। কিন্তু এই ভুল-ভাঙ্গার পূর্ব্বে তাহার প্রত্যেকটি কথায়, প্রত্যেকটি আচরণে প্রতাপের অন্তরের কথা টানিয়া বাহির করিবার এবং তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে। (২১৬)। যখন সে বুঝিল বজরা আক্রমণকালে সে যে প্রতাপের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল, তৎকালে ভ্রান্তি বলিয়া মনে হইলেও, সত্যই তাহা ভ্রান্তি নহে, পরন্তু প্রতাপই তাহার উদ্ধারকর্ত্তা, তখন তাহার আশা হইল বুঝি বা তাহার অভিসার ব্যর্থ হয় নাই, 'প্রতাপ-পক্ষী' বুঝি বা আপনি আসিয়া পিঞ্জরদ্বারে ধরা দিয়াছে। তাই তাহার তৎকালীন অনুভূতির উল্লেখ করিয়া শৈবলিনী 'দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া', হয়ত প্রতাপের আবেগপূর্ণ সম্ভাষণের প্রত্যাশায় নীরব

রহিল। কিন্তু শৈবলিনী যেরূপ আশা করিয়াছিল, সেরূপ কিছুই ঘটিল না। প্রতাপ তাহাকে সুস্থ দেখিয়া 'বিনাবাক্যব্যয়ে গমনোদ্যত' হইলেন। সুতরাং শৈবলিনী তাঁহাকে ডাকিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতাপ দাঁড়াইলেন এবং যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার প্রশ্নের উত্তর করিলেন। শৈবলিনী দেখিল, প্রতাপ ধরা দিতে চাহিতেছেন না। এইবার সে অভিমানের সুরে ইঙ্গিত-পূর্ণ প্রশ্ন করিল, "কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?" ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল, প্রতাপ রুষ্ট হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। ইহার পরে শৈবলিনীর অভিমান, তাহার 'প্রায় বাষ্পগদগদ' কণ্ঠের অনুযোগ সকলই যখন ব্যর্থ হইল, তখন সে তাহার শতধাদীর্ণ হৃদয়ের দুষ্ট ক্ষত নির্লজ্জার ন্যায় প্রতাপের সম্মুখে অনাবৃত করিল। অপরে যাহাই বলুক, যাহার জন্য সে কুলত্যাগিনী হইয়াছে, তাহার বাল্যের প্রণয়ী সেই প্রতাপ যে আজ স্থির, নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার অপরাধের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, বারংবার তাহাকে 'পাপিষ্ঠা' বলিয়া নির্দ্দয় তিরস্কার করিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহনীয়। ক্রমে দুর্জ্জয় অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিয়া শৈবলিনী ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় বিষোদগীরণ করিল; তাহার কলঙ্কিত আচরণের জন্য বারংবার প্রতাপকেই দায়ী করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপের চরিত্রের দৃঢ়তার সম্মুখে তাহার সকল প্রকার আক্রমণই ব্যর্থ হইল। পরাজিতা শৈবলিনী বুঝিল, প্রতাপ আজ আর সে প্রতাপ নাই, প্রতাপ আজ রূপসীর স্বামী। বুঝিল, কুলত্যাগিনী হইয়া বৃথাই সে কলঙ্কিনী নাম কিনিয়াছে।

এই প্রত্যাখ্যান হইতেই শৈবলিনীর জীবনে প্রতিক্রিয়ার সূচনা। *গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ যখন প্রতাপ ও রামচরণকে বন্দী করিল এবং সেই সঙ্গে দলনী* ও কুল্‌সম্‌কেও অপহরণ করিল, তখন গভীর নিশীথে শূন্য গৃহে শৈবলিনী আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে বসিল। দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সে যে জঘন্য কার্য্য করিয়াছে, এতক্ষণে তাহার হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে। তাহার এই সময়ের চিন্তার ধারা (২।৮) এক-দিকে যেমন তাহার অতীতের কার্য্যাবলীর উপর আলোকপাত করে, অন্যদিকে তেমনই শুধু যে তাহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার পরিচয় দেয় তাহা নহে, তাহার ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্যও পাঠককে পূর্ব্বাহ্ণে প্রস্তুত করে।

শৈবলিনীর পক্ষে প্রতাপের আকর্ষণ দুর্নিবার। এতদিন ফষ্টরের বজরায় প্রতাপকে পাইবার আশায় সে বাঁচিয়া রহিয়াছে; এখন সে বুঝিয়াছে, "আজ মরিবার দিন বটে।" তবুও প্রতাপ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে; 'প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে', তাঁহার কি হয়, না জানিয়া সে মরিতে

পারিবে না। লাঞ্ছিতা শৈবলিনী তাঁহার কথা ভাবিতে চাহে না, নিজেকে বুঝাইতে চাহে, 'প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে?' তাহার অন্তর বলে, 'কে তাহা জানি না—সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু।' নিষ্ফল অভিসারের কথা ভাবিতে আত্মগ্লানি তাহাকে পীড়া দেয়, শৈবলিনী ভাবে, 'আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?' প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তাহার বেদগ্রামের গৃহের কথা মনে পড়ে; স্বহস্তে রোপিত 'করবী বৃক্ষ', বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় 'রক্তপুষ্প', প্রাঙ্গণে 'তুলসী-মঞ্চ', 'গৃহপালিত মার্জ্জার, পিঞ্জরে স্ফুটবাক্ পক্ষী, গৃহপার্শ্বে সুস্বাদু আম্রের উচ্চ বৃক্ষ'—সকলই 'স্মরণপটে চিত্রিত' হইতে থাকে। কিন্তু যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গৃহের শোভা তাঁহাকে ভাবিতে শৈবলিনীর কতটুকু কথা মনে পড়ে? তাহার মনে পড়ে 'কত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত ধবল কুসুম, পরিষ্কার জলসিক্ত করিয়া, চন্দ্রশেখরের পূজার জন্য পুষ্পপাত্র ভরিয়া' রাখিয়া দিত। ইহার অধিক আর কিছুই তাহার মনে পড়ে না। সুতরাং বেদগ্রামের চিন্তা তাহাকে অধিকক্ষণ আকৃষ্ট করিতে পারে না। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার প্রতাপের চিন্তা আসিয়া পড়ে। লালসাতাড়িতা হইলেও শৈবলিনী বিবেকহীনা নহে। শৈবলিনী বুঝিয়াছে, যেদিন সে প্রতাপকে দেখিয়াছে সেই দিনই তাহার পরকাল নষ্ট হইয়াছে, 'যিনি অন্তর্য্যামী, তিনি সেই দিনেই [তাহার] কপালে নরক লিখিয়াছেন।' তাহার দুঃখ পরকালের বিনিময়ে সে ইহকালের সুখ পাইল না; ইহকাল পরকাল দুই-ই হারাইয়া আজ সে একেবারেই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। সহসা তাহার মনে হয়, বুঝি যাহা কিছু তাহার ভাল, 'তাহাতেই অগ্নি লাগে', বুঝি তাহারই জন্য প্রতাপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। ক্ষণেক পূর্ব্বে শৈবলিনী নিজেকে বুঝাইতে চাহিয়াছে, প্রতাপ তাহার কেহ নহে; এক্ষণে নিজেকে তাঁহার বিপদের হেতু মনে করিয়া তাহার মনে হইল, "আমি কেন মরিলাম না?" শৈবলিনী সহসা 'কটি হইতে' সযত্নরক্ষিত তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিল।

কিন্তু ভাগীরথীর জলে মরিতে যাইয়া শৈবলিনী মরিতে পারে নাই, আজিও সে মরিতে পারিল না। 'ছুরিকাগ্রভাগ হৃদয়ে স্থাপিত' করিয়া শৈবলিনী ভাবিতে বসিল। শৈবলিনী ভাবে, "মরিব? না—আজ নহে। মরি, ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব যে, আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তারপর মরিব।" কিন্তু

ইহাই তাহার মরিতে না পারার প্রকৃত কারণ নহে। প্রকৃত কারণ যাহা তাহাও সে নিজেই ব্যক্ত করিতেছে; শৈবলিনী বলিতেছে, "আর এক দিন ছুরি এইরূপে নিদ্রিত ফষ্টরের বুকের উপর ধরিয়াছিলাম। সে দিন তাহাকে মারি নাই, সাহস হয় নাই; আজিও আত্মহত্যায় সাহস হইতেছে না।" ভোগলিপ্সা যাহার প্রবল তাহার মরিবার সাহস কোথায়? কিন্তু তবুও সংস্কার ও প্রতিবেশ ব্যর্থ হয় নাই। নহিলে সে যে 'এক পাপে পাপিষ্ঠা নহে' সুন্দরীকে তাহা জানাইবার আকাঙ্ক্ষা কেন? শুধু তাহাই নহে, শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিতে শেখে নাই সত্য, কিন্তু বিপরীত আকর্ষণ প্রবল বলিয়া সে ইহা বুঝিতে না পারিলেও, চন্দ্রশেখরও অলক্ষ্যে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। শৈবলিনীর বিশ্বাস, তাহার জন্য চন্দ্রশেখরের কোন দুঃখ নাই, 'পুঁতিই তাঁহার সব', শৈবলিনী তাঁহার কেহ নহে; তবুও সে ভাবে, "একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই—কখন ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?" স্বামীর প্রতি এই যে নিগূঢ় আকর্ষণ, ইহাই একদিন কক্ষচ্যুত শৈবলিনীকে কেন্দ্রস্থ করিল। এবং এইখানেই রোহিণীর সহিত তাহার প্রধানতম পার্থক্য। শৈবলিনীর অতীত আছে, তাই একদিন অতীতের ভিত্তির উপর তাহার ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিল; রোহিণীর অতীত বলিয়া কিছুই নাই, কোনদিন যে তাহার স্বামী ছিল তাহার কল্পনায় ইহা তাহার সহিত ভাগ্যদেবতার নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র। সুতরাং গোবিন্দলাল তাহাকে হত্যা না করিলেও গণিকারূপেই তাহার জীবনের অবসান হইত।

কিন্তু এখনও শৈবলিনীর ভোগতৃষ্ণা প্রবল। নবাবের অনুচরগণ যখন তাহাকে বেগম বলিয়া ভুল করিল, শৈবলিনী তখন নূতন আশার স্বপ্ন দেখিল: নবাবের আনুকূল্যে প্রতাপকে উদ্ধার করিতে পারিলে পুনরায় যদি তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে শৈবলিনী মরিবে, মরিয়া রূপসী নামে (৩।২, ৬১ পৃঃ) পুনরুজ্জীবিত হইয়া নবাবের দরবারে তাঁহাকে স্বামীরূপে দাবী করিবে। (৩।৩, ৬৪ পৃঃ)। প্রতাপকে আয়ত্তে আনিবার উদ্দেশ্যে কূটবুদ্ধি শৈবলিনীর ইহাই সর্ব্বশেষ চাল।

শৈবলিনীর চাতুর্য্যে প্রতাপ উদ্ধার পাইলেন; কিন্তু 'রূপসীর সঙ্গে মোকদ্দমায় আরজি পেশ না হইতেই শৈবলিনীর হার হইল।' তাহার এই

পরাজয়ের চিত্র (৩।৬) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভাগীরথীর জলরাশি আনন্দে নৃত্য করিতেছে, তাহার বিশাল বুকে আলোর বন্যা সেই আনন্দে সুর মিলাইয়াছে। তাহারই মাঝে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া দুই হাতে মুঠো মুঠো মুক্তা ছড়াইয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন সন্তরণরত প্রতাপ ও শৈবলিনী। প্রতাপের আজিকার আচরণে পূর্ব্বরাত্রির উষ্মা নাই, আছে শৈশবসহচরীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও অপরিসীম অনুকম্পা। তাঁহার এই পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে, তিনি শৈবলিনীর গৃহত্যাগের কারণ অবগত হইয়াছেন, তিনি তাহার ভালবাসার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন, আজিকার রাত্রে শৈবলিনীর অসমসাহস তাঁহাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছে, এবং সর্ব্বোপরি, আজিকার রাত্রির সন্তরণ অতীতের আর একটি দিনের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া তাঁহাকে দুর্ব্বল না করিলেও, তাঁহার কঠোরতা শমিত করিয়াছে।

আট বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের জীবনে যে সমস্যা ছিল, ভিন্ন প্রতিবেশে হইলেও, আজিও সেই একই সমস্যা। কিন্তু সেদিনের প্রতাপ সমস্যাটির যেরূপ সমাধান করিতে চাহিয়াছিল, প্রয়োজন হইলে সেই উপায়ে ইহার চরম মীমাংসা করিতে পশ্চাৎপদ না হইলেও, প্রতাপ আজ বৃহত্তর কর্ত্তব্য চিনিতে পারিয়াছেন। শৈবলিনী চাহে প্রতাপকে শরবিদ্ধ করিতে, প্রতাপ চাহেন শৈশবসহচরীকে অকল্যাণের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিতে। একের কাম্য ভোগ, অপরের কাম্য ত্যাগ। এই দুই মহাশক্তির সংগ্রামের ফলাফলের উপর দুইটি জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। প্রতাপের সম্মুখে কঠিন পরীক্ষা।

কিন্তু শৈবলিনীর নিকট প্রতাপ যে শপথের উল্লেখ করিলেন, শৈবলিনীর ভালবাসার সুযোগ লইয়া যে শপথের সাহায্যে তিনি তাহাকে মোহমুক্ত করিলেন, তাহার পরিকল্পনা প্রতাপের মনে আসিল কখন? এ প্রশ্নের উত্তর অনুমানসাপেক্ষ। শৈবলিনী যখন তাঁহাকে উদ্ধার করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া প্রতাপের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তাহার চাতুর্য্য ও সাহস স্বভাবতঃই প্রতাপকে মুগ্ধ করিল। হয়ত এই কারণেই এত সহজেই তিনি তাহার সাহায্যে আত্মরক্ষায় সম্মত হইলেন। এই সময় এরূপ কার্য্যের ভবিষ্যৎ গুরুত্ব বিচার করিবার মত অবসর বা মনের অবস্থা তাঁহার ছিল না। সন্তরণকালেও প্রকৃতির যাদু তাঁহাকে স্বভাবতঃই অভিভূত করিল[১] এবং

১ 'সন্তরণে প্রতাপের আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।' (৩।৬,৭১ পৃঃ)। একই প্রকৃতির শৈবলিনীর উপর ভিন্নরূপ প্রভাব লক্ষণীয়: শৈবলিনী ভাবিল, 'এ জলের ত তল আছে, —আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি।' ৩।৬,৭০ পৃঃ।

আজিকার রাত্রির এই প্রতিবেশে বাল্যের সহচরীকে আহ্বান করিতে যাইয়া অতীতের স্মৃতি তাঁহাকে এমনই উন্মনা করিল যে, তাঁহার চেতন মন দূরত্ব রাখিতে চাহিলেও তাঁহার কণ্ঠ তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। প্রতাপ ডাকিলেন, "শৈবলিনী—শৈ।" কতকাল পরে আবার সেই প্রিয় সম্বোধন। 'শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল।........শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশিমধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্র তারকাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"' তাহার কণ্ঠস্বর বিষাদের কারুণ্যমাখানো। বেদনাভরা স্মৃতি রাখিয়া শৈশবেই সুখ যদি তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহা হইলে বৃথাই কেন গঙ্গার জলে আজিকার এই আলোর মেলা! শৈবলিনীর কণ্ঠস্বরে হয়ত বা ক্ষণিকের জন্য প্রতাপের বহিরিন্দ্রিয়ের অনুভূতি লুপ্তপ্রায় হইল, তিনি তরঙ্গের গায়ে আলোর খেলাকে ঊষার অরুণরাগের চঞ্চল নৃত্য বলিয়া ভ্রম করিলেন, বলিলেন, "চাঁদের? না। সূর্য্য উঠিয়াছে।[১] —শৈ। আর ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।" মনে হয় ইংরেজের অনুচরগণের দৃষ্টি এড়াইয়া শৈবলিনীকে লইয়া নিরাপদে তীরে ওঠাই এই সময় প্রতাপের প্রধান বা একমাত্র লক্ষ্য; ইহার অধিক কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তাঁহার মনে আসে নাই। প্রতাপের কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী যখন বলিল, "তবে চল তীরে উঠি", তাহার এই আহ্বানে সহসা প্রতাপ বাস্তবকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া নূতন করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন এবং হয়ত সেই সঙ্গেই শপথের পরিকল্পনা তাঁহার মনে আসিয়া থাকিবে।

প্রতাপ আবার ডাকিলেন, "শৈ!" কণ্ঠ তেমনই কোমল, কিন্তু বাল্যের স্মৃতি-জাগাইয়া-তোলা এই আহ্বান প্রণয়ীর আহ্বান নহে। প্রতাপ এতক্ষণে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন; তাঁহার লক্ষ্য স্থির। ভালবাসার সমুদ্রমন্থনে শৈবলিনীর ভাগ্যে যে হলাহল উদ্গীর্ণ হইয়াছে, আজিকার এই পুণ্যক্ষণে তিনি তাহা অমৃতে রূপান্তরিত করিবেন; আর তাহাই যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে নীলকণ্ঠের ন্যায় সে হলাহল আকণ্ঠ পান করিয়া তিনি

১ শৈবলিনীকে ভীত মনে করিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যেও প্রতাপ এইরূপ বলিতে পারেন। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ শৈবলিনীর মত 'বাঘিনী'কে আশ্বস্ত করিবার জন্য এরূপ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবার যে কোন প্রয়োজন ছিল না প্রতাপ তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে তখনও রাত্রি রহিয়াছে। ইহার অল্প পরেই প্রতাপ নিজেই বলিতেছেন, "চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?" অন্যত্রও বঙ্কিম বলিতেছেন, প্রতাপ ও শৈবলিনী ছিপে উঠিল পর 'শেষরাত্রে ছিপ....তীরে লাগিয়াছিল।' ৩।৮, ৭৫ পৃঃ।

শৈবলিনীর কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়া দিবেন। অতীত দিনের এমনই এক সাঁতারের উল্লেখ করিয়া প্রতাপ বলিলেন, "মনে পড়ে? তুমি পারিলে না—আমি ডুবিলাম?" শৈবলিনী উত্তর করিল, "মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?" ইহা অভিমানের কথা, শৈবলিনী মরিবে বলিয়া প্রতাপকে লইয়া গঙ্গার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে নাই।

এই অনুযোগ প্রতাপকে কর্ত্তব্যবিস্মৃত করিতে পারিল না। প্রতাপ বলিলেন, "তবে মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?" মুহূর্ত্তে শৈবলিনী যেন চক্ষের সম্মুখে আট বৎসরের পূর্ব্বের প্রতাপের নিমজ্জমান দেহ-খানি দেখিতে পাইল। শৈবলিনী শঙ্কিত হইল, বলিল, "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্রতাপ উঠিলেন না, বলিলেন, এক সর্ত্তে, শৈবলিনী যদি এক শপথ করিতে সম্মত হয়, তবেই তিনি উঠিবেন, নতুবা নহে। শপথের নামে শৈবলিনীর চক্ষে 'তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীল জল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। ফষ্টর আসিয়া যেন সম্মুখে তরবারি হস্তে দাঁড়াইল।' বুদ্ধিমতী শৈবলিনী বুঝিয়াছিল, শপথ যাহাই হউক, নিশ্চিত তাহা তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল নহে।

তবু সে শপথে সম্মত হইল। কিন্তু শৈবলিনী যে মহাপাপ করিয়াছে এ কথা সে মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারে নাই, এবং বিস্মৃত হইতে পারে নাই বলিয়াই এ জীবনে নরকভোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি তাহার পক্ষে সম্ভব হইল। শৈবলিনী শপথ করিতে সম্মত হইল, গঙ্গার জল বা ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া নহে, কারণ সে জানে যাহা কিছু পুণ্যের প্রতীক সে সকল হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। শৈবলিনী শপথ করিতে সম্মত হইল—প্রতাপকে স্পর্শ করিয়া, কারণ প্রতাপ তাহার ইহকালের সর্ব্বস্ব। কিন্তু প্রতাপ যে 'প্রাণান্তকর' শপথের কথা বলিলেন, শৈবলিনী সহজে তাহা উচ্চারণ করিতে পারিল না, অনুনয়ের সুরে বলিল, "এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি!" ক্ষুদ্র একটি কথা; কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে শৈবলিনী-বিহীন প্রতাপের জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনার ইতিহাস। বাহিরে প্রতাপ কৃতী, কিন্তু একের অভাব তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্যকে উপহাস করিতেছে। এ কথা প্রতাপ আজ প্রথম জানাইলেন—শৈবলিনীকে।

কিন্তু শৈবলিনীও বুঝি তাঁহার রিক্ততা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না, বলিল, "তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?" প্রতাপ প্রতিবাদ করিলেন না; তিনি শৈবলিনীর রিক্ততা উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং চন্দ্রশেখরের কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন না, বলিলেন, "কিছু না—আইস তবে দুই জনে ডুবি।" প্রতাপ শৈবলিনীকে কলুষমুক্ত দেখিতে চাহেন, তাহাই যদি সম্ভব না হইল, তাহা হইলে আজ এই ভাগীরথীর জলে না হয় আট বৎসরের পূর্ব্বের ভুলিয়া-যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হউক।

'শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল।' জীবনে এই প্রথম সে অন্তর মধ্যে ভোগবাসনা ও ত্যাগের সঙ্ঘর্ষ অনুভব করিল। প্রতাপ যদি পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেন, যদি অশুচি মনে করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত পুনরায় সে নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারিত, প্রতাপ আমার কে? কিন্তু কাল যাহা তাহার চক্ষে ধরা পড়ে নাই, আজ তাহা তাহার অগোচর নহে—শৈবলিনী প্রতাপের হৃদয়ের গভীরতা উপলব্ধি করিয়াছে। সুতরাং প্রতাপের আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা শৈবলিনীর হৃদয়ের অনুরূপ তন্ত্রীতে সুরের ঝঙ্কার তুলিল, 'তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল।' শৈবলিনী ভাবিল, "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?" কিন্তু বাসনা সহজে মরিতে চাহে না; শৈবলিনী 'প্রকাশ্যে বলিল, "তীরে চল।"'

প্রতাপ সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। শৈবলিনীর শেষ অনুরোধ, "আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?"—তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না, কারণ প্রতাপ জানেন, বাসনার সহিত কোনরূপ ঘরোয়া আপোষ-মীমাংসা চলে না। অনন্যোপায় হইয়া শৈবলিনীকে শপথ করিতে হইল, "আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

প্রতাপের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী শৈবলিনী মরিল এবং তাহার মৃত্যুতে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিল চন্দ্রশেখরের পত্নী শৈবলিনী। কিন্তু এই নবজীবন লাভের পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তের ভিতর দিয়া তাহাকে দুঃসহ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। এবং প্রায়শ্চিত্তকালে শৈবলিনীর এই সময়ের অদৃষ্টনিয়ন্তা রমানন্দ স্বামী ও চন্দ্রশেখরকে নেপথ্যে রাখিয়া বঙ্কিম যে প্রহেলিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা প্রথম শ্রেণীর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

ডক্টর সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন, 'রমানন্দ স্বামীর ক্ষমতার অবধি নাই ; তিনি মানুষের মনের গতিও ফিরাইতে পারেন।'[১] শৈবলিনীর উপর রমানন্দ স্বামীর প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়াই তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, 'রমানন্দ স্বামীর শক্তি........অসংযত প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়াছে, বিরূপতাকে অনুরাগে রূপান্তরিত করিয়াছে।'[২] ডক্টর সেনগুপ্তের এই উক্তির অন্তর্নিহিত সত্য স্বীকার করিয়া লইয়াও বলিতে হইবে যে, ইহা আতিশয্যদোষদুষ্ট। প্রশ্নটির আলোচনা প্রয়োজন, কারণ রমানন্দ স্বামী যদি স্বীয় ক্ষমতাবলে শৈবলিনীর 'বিরূপতাকে অনুরাগে রূপান্তরিত' করিয়া থাকেন এবং এইরূপে তাহার মনের গতি ফিরাইয়া থাকেন, অর্থাৎ শৈবলিনীর পরিবর্ত্তন যদি সম্পূর্ণ বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা তাহার চরিত্রাঙ্কনে ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

রমানন্দ স্বামী শৈবলিনীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে এবং তাহার উপর যোগশক্তির প্রয়োগ দ্বারা। কিন্তু এই মহাপুরুষের কৃপায় সাময়িক যোগবল লাভ করিলেও, তাহাকে রোগমুক্ত করা ভিন্ন তৎপ্রদত্ত মন্ত্রপূত বারির অপর কোন স্থায়ী ফল থাকিতে পারে, অথবা ইহা শৈবলিনীর মনের গতি ফিরাইবে রমানন্দ স্বামী বা চন্দ্রশেখরের কথায় এরূপ কোন আভাস নাই অথবা উপন্যাসেও ইহার কোন প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রত গ্রহণ ?—রমানন্দ স্বামীর নিকট ব্রত গ্রহণের ফলে শৈবলিনীর চিত্তশুদ্ধি হইল, শৈবলিনী অনন্যমনে স্বামীদেবতার আরাধনা করিতে শিখিল, ইহা অতি বড় সত্য কথা। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত না হইলে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা (সে ব্যবস্থা যতই সুপরিকল্পিত হউক) ইন্দ্রজালের ন্যায় তাহাকে রূপান্তরিত করিতে পারিত না। শৈবলিনী বিপথগামিনী, কিন্তু ভালবাসার যে তীব্রতা তাহাকে গৃহত্যাগিনী করিয়াছে, পরিবর্ত্তিত প্রতিবেশে তাহাই তাহাকে প্রতাপের নির্দ্দেশানুযায়ী শপথ গ্রহণে সম্মত করাইল এবং তাহাই তাহাকে শপথ রক্ষার জন্য প্রতাপের সান্নিধ্য বর্জ্জন করিয়া অনিশ্চিত বিপদ বরণ করিয়া লইবার সাহস যোগাইল। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দুর্য্যোগময়ী ঘনান্ধকার রাত্রে পর্ব্বতের উপরে তাহার বিবেচনায় অলৌকিক অনুভূতির পূর্ব্বেই (অর্থাৎ রমানন্দ স্বামী তাহাকে কোনরূপ প্রভাবিত করিবার

১-২। বঙ্কিমচন্দ্র, যথাক্রমে ১৪ ও ১৩ পৃঃ।

পূর্ব্বেই) চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর শূন্য মন আকর্ষণ করিয়াছেন।[১] অর্থাৎ, শিল্পী বঙ্কিম যখন বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া পিটিয়া শৈবলিনীকে ব্রত গ্রহণের উপযোগী করিয়া তুলিলেন, নীতিবিৎ বঙ্কিম তখনই কঠোর সাধনার মাধ্যমে তাহাকে অগ্নিশুদ্ধা করিয়া লইলেন।

শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কাহিনীকে দুইটি বিভিন্ন পর্য্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম পর্য্যায়ে প্রধানতঃ শারীরিক দুঃখভোগে এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রধানতঃ মানসিক নরকভোগে ও আনুষঙ্গিক মৃত্যুভীতিতে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত। অবশ্য শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত বলিতে আমরা মুখ্যতঃ তাহার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রোমাঞ্চকর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই বুঝিয়া থাকি এবং ইহাই 'প্রায়শ্চিত্ত' শীর্ষক চতুর্থ খণ্ডের বিষয়বস্তু।

প্রতাপকে এবং সেই সঙ্গে সংসারের সকল সুখের আশা পশ্চাতে ফেলিয়া শৈবলিনী যখন অরণ্যাকীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশে ছুটিয়া আসিল (৩।৮), তখন সে মরিতেই চাহিয়াছে এবং প্রকৃতির বিপ্লবের মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়াও তাহার মনে কোনরূপ ভীতির সঞ্চার হয় নাই। কিন্তু সেই অবস্থায় সহসা 'মনুষ্যহস্তের স্পর্শ' অনুভব করিয়া শৈবলিনীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল, 'শৈবলিনী ভয়বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "তুমি কে? দেবতা না মনুষ্য?" মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে; কেন না, দেবতা দণ্ডবিধাতা।' অনৈসর্গিকের কল্পনা হইতে পাপের শাস্তি সম্বন্ধে এই যে ভীতি, শৈবলিনীর তৎকালীন অবস্থায় ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং এইখানেই তাহার সত্যকার প্রায়শ্চিত্তের সূচনা।

শৈবলিনী জানিল না, এ স্পর্শ তাহার স্বামীর স্পর্শ। রমানন্দ স্বামীর নির্দ্দেশমত এবং তাঁহারই সাহায্যে চন্দ্রশেখর যখন শৈবলিনীকে 'মহান্ধকারময়' পর্ব্বতগুহায় তাঁহার নিকট রাখিয়া আসিলেন (৪।২), তখনও সে এ সকলের কিছুই জানিল না, শুধু অনুভবে বুঝিল সেখানে সে একা নহে, 'আর কোন জীব, মনুষ্য কি পশু—কে জানে?—সেই গুহামধ্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।' সমগ্র ব্যাপারটি স্বভাবতঃই তাহার নিকট দৈব বলিয়া অনুমিত হইল। তাহার দেহমনের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার পর এই

১ শৈবলিনী যখন প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল, 'তখন তাহার গার্হস্থ্যসুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব।' (৩।৮, ৭৮ পৃঃ)। ইহার পূর্ব্বেও প্রতাপ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া শৈবলিনী বেদগ্রামের কথা ভাবিয়াছে। অবশ্য তখনও সে প্রতাপের মোহ কাটাইতে পারে নাই।

নূতন অনুভূতির ফলে তাহার চেতনা লুপ্ত হইল। বিগতচেতনা শৈবলিনী বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখিল; তাহার জীবন্ত নরকভোগ আরম্ভ হইল।

শৈবলিনীর স্বপ্ন পূর্ব্বানুষ্ঠিত পাপকার্য্য সম্বন্ধে তাহার চেতনাবোধের প্রতিক্রিয়া এবং মানুষের সহজ সংস্কার নরকের যে চিত্র গড়িয়া তুলিয়াছে, স্বপ্নে তাহার কল্পিত নরক তাহারই প্রতিচ্ছায়া। সেখানে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়, তাহাতে পারাপারের সেতু নাই। পাপীকে সেই রক্তের নদী সাঁতারিয়া পার হইতে হয়; তখন রুধির স্রোত ও কদর্য্য কীট মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উন্মাদ করিয়া তোলে। সেখানে 'আলোক অতি ক্ষীণ', কিন্তু বিষাক্ত ও জ্বালাময়ী। 'হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিরাটহুঙ্কার, পর্ব্বতবিদারণ, অশনিপতন, শিলাবর্ষণ, জলকল্লোল, অগ্নিগর্জ্জন, মুমূর্ষুর ক্রন্দন'—ইহাদের মিলিতধ্বনি নরককে মুখরিত করিয়া রাখে।

মানবমনের ধর্ম্ম এই যে, সজ্ঞানে হউক নির্জ্ঞানে হউক, যাহা কিছু মনের উপর বড় রকমের দাগ রাখিয়া যায়, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাহাই স্বপ্নের উপাদান যোগায়। শৈবলিনীর স্বপ্ন ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ। যে 'মহাকায় পুরুষ' তাহাকে গুহামধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, স্বপ্নে তিনিই শৈবলিনীর দণ্ড-বিধাতা। 'অনন্তবিস্তৃতা' রুধির নদীর তীরে দাঁড়াইয়া, প্রতাপের প্রতি তাহার আসক্তির ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিতেছেন, "সাঁতার দিয়া পার হ, তুই সাঁতার জানিস—গঙ্গায়, প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্।" রমানন্দ স্বামীর (শৈবলিনীর কল্পনায় ইনি 'পর্ব্বতের দেবতা') নিকট ব্রতগ্রহণের পরবর্ত্তী-কালের স্বপ্নের সহিত এই স্বপ্নের মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু সাত দিন, সাত রাত্র, 'প্রায় অনশনে, সেই বিকটান্ধকারে অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া স্বামীর চিন্তা' করিবার ফলে শৈবলিনী 'অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্য চক্ষু চাহিয়া' চন্দ্রশেখরের অপরূপ রূপ দেখিতে পাইয়াছে। সেই দেবদুর্লভ রূপ ধ্যান করিতে করিতে তাহার কেবলই মনে হইয়াছে, 'কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না।' এইরূপে অতীতের ঘৃণা আচরণের জন্য যতই তাহার আত্মগ্লানি জন্মিয়াছে, ততই শৈবলিনী বুঝিয়াছে ফষ্টর তাহার ভাগ্যাকাশে দুষ্ট রাহুস্বরূপ, তাহার পক্ষে নরকের দূত। এবং সেই সঙ্গে সে ইহাও উপলব্ধি করিয়াছে যে, সে যে মহাপাপ করিয়াছে তাহার পরিণাম হইতে একমাত্র 'সর্ব্বে সর্ব্বমঙ্গল' স্বামী-দেবতা ভিন্ন অপর কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। ফলে, প্রায়শ্চিত্ত-কালীন তাহার প্রথম স্বপ্নের সহিত পরবর্ত্তীকালের অর্থাৎ ব্রতগ্রহণান্তর সপ্তম রাত্রির স্বপ্নের (৪।৩) তুলনা করিলে দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়:

এক, প্রথম স্বপ্নে নরকের বিভীষিকার প্রাধান্য লক্ষিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শেষ স্বপ্নে (বঙ্কিম এই সময়ের এই একটি স্বপ্নেরই বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন) ইহার সহিত অনুশোচনাকেও প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত স্বপ্নের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ জ্ঞান আছে। দেখিলেন, পিশাচে তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শূন্যপথে উড়িতেছে।........নক্ষত্রসুন্দরীগণ নীলাম্বর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—বলিতেছে—"দেখ, ভগিনি, দেখ মনুষ্য-কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে!" কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে; কোন তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে; কোন তারা অসতীর নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে।' এস্থলে প্রকৃতপক্ষে শৈবলিনীর যে সত্তা অনুভব করিতেছে যে, তাহার 'হৃদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন; শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদ-পদ্মে গুণগুণ করিতেছে', তারার ন্যায় শুভ্রোজ্জ্বল তাহার সেই নিষ্কলুষ সত্তা প্রতাপের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী অতীতের শৈবলিনীকে দেখিয়া—'শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে.......লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে; ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে।'

দুই, শেষের স্বপ্নগুলিতে যখনই শৈবলিনী ভয়ার্ত্ত হইয়াছে, যখনই তাহার উত্তেজিত কল্পনায় ফষ্টর হিংস্র জন্তুর রূপ ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে, তখনই চন্দ্রশেখর তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

শৈবলিনীর সপ্তাহব্যাপী তপস্যা সফল হইল, তাহার স্বামীদর্শন হইল। কিন্তু তাহার বিকারগ্রস্ত মন শমতাপ্রাপ্ত হইল না। পরন্তু, রাত্রিদিন সে যে 'নরক-স্বপ্ন' দেখিতেছে, স্বামীর নিকট তাহার উল্লেখমাত্র মানসিক বিপর্য্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় এবং ইহার বহির্লক্ষণস্বরূপ 'তাহার শীর্ণ বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল—চক্ষু বিস্ফারিত, পলকরহিত হইল—নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত, বিস্ফারিত হইতে লাগিল—শরীর কণ্টকিত হইল—কাঁপিতে লাগিল।' (৪।৪)। শৈবলিনী জাগ্রতে নরক দর্শন করিল, তাহার মানসিক বিকার দুঃস্বপ্ন হইতে দৃষ্টিবিভ্রমে (hallucination) পৌঁছিল।

বঙ্কিম শৈবলিনীর জাগ্রতে নরকদর্শনের পর পর দুইটি চিত্র আঁকিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত প্রথমটি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত মাত্র, দ্বিতীয়টি বর্ণনাবহুল। সুন্দরীর সহিত অতীতের তাহার মধুর সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই দ্বিতীয় চিত্রটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। শৈবলিনীর ব্যাধিগ্রস্ত কল্পনায় সুন্দরী আর তাহার স্নেহময়ী ননদিনী নহে, সুন্দরী তাহার পাপের সাক্ষীরূপিণী। তাই চন্দ্রশেখর যখন

তাহাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন যে, বেদগ্রামে প্রায়শ্চিত্তকালে সুন্দরী তাহার তত্ত্বাবধান করিবে, তখন তাঁহার মুখে সুন্দরীর নাম শুনিয়া শৈবলিনীর ভীমা পুষ্করিণীতে জলক্রীড়া মনে পড়িল না। মনে পড়িল বজরা হইতে বিদায়কালীন সুন্দরীর অভিশাপ। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় তাহার দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিল। অর্থাৎ সুন্দরীর স্মৃতি এই দৃষ্টিবিভ্রমের প্রত্যক্ষ কারণ। এই কারণেই ইহাতে সুন্দরী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে: সুন্দরী, 'তালবৃক্ষ-পরিমিতা'[১], 'অতি ভয়ঙ্করী'। সুন্দরী তাহার পাপ স্মরণ করাইয়া নরকের পিশাচদিগকে উত্তেজিত করিতেছে, আর ঐ সকল পিশাচ কণ্টকের রজ্জুতে শৈবলিনীকে বাঁধিয়া 'বৃশ্চিকবেত্রে' প্রহার করিতেছে।

শৈবলিনীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক এইরূপ আঘাত অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না; তাহার দৃষ্টিবিভ্রম উন্মত্ততায় পরিণত হইল। বঙ্কিম নিপুণ কৌশলে শৈবলিনীর মানসিক বিকারের প্রতিটি স্তরের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন: শারীরিক শ্রান্তি, অনশন এবং মানসিক উত্তেজনা ও পাপের অনুভূতির ফলে বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন, তৎপরে জাগ্রতে দৃষ্টিবিভ্রম, সর্ব্বশেষে উন্মত্ততা।

শৈবলিনীর উন্মত্ততার প্রধান লক্ষণ ধারণাশক্তির ক্ষীণতা। এ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'শৈবলিনীর স্মৃতির বিলোপ ঘটে নাই........কিন্তু প্রকৃত কথা মনে পড়ে না—বিকৃত হইয়া, বিপরীতে বিপরীতে সংলগ্ন হইয়া মনে আসে।' (৬।৫, ১২৪ পৃঃ)। শৈবলিনী নিজেও বলিতেছে, "কিছু ঠিক পাইনে পার্ব্বতীদিদি (তাহার ভ্রান্তদৃষ্টিতে সুন্দরীকে সে পার্ব্বতী বলিয়া অনুমান করিয়াছে)—কে যেন নেই—কে যেন ছিল, সে যেন নেই—কে যেন আসবে, সে যেন আসে না—কোথায় যেন এয়েছি, সেখানে যেন আসি নাই—কাকে যেন খুঁজি, তাকে যেন চিনি না।" উন্মাদিনী হইলেও এস্থলে সে তাহার মানসিক অবস্থার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছে। শৈবলিনীর অতীতের স্মৃতি অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন। তাহার দৃষ্টি চন্দ্রশেখরকে ফষ্টর বলিয়া ভ্রম করে,[২] আবার ফষ্টরও তাহার মনে কোনরূপ বিভীষিকা সৃষ্টি করে না। সে যে শৈবলিনী ইহাও সে যেন মনে করিয়া আনিতে পারে না। 'একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ।'—ইহার অধিক সে কোন কথাই গুছাইয়া আনিতে পারে না। তাহার বিকৃত

১ ভীমা পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বে 'ঘন তালগাছের সারি' নিগূঢ়ভাবে শৈবলিনীর মনের উপর কাজ করিয়া হয়ত তাহার কল্পনায় সুন্দরীকে 'তালবৃক্ষপরিমিতা' করিয়া থাকিবে।

২ "হাঁ গা সাহেব। তুমি কি লরেন্স ফষ্টর?" ৪।৪, ৯৪ পৃঃ।

কল্পনায়' এক দিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল; মেয়েটি ব্যাঙ্ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙ্টিকে গিলিয়া ফেলিল।' ইহা সে 'স্বচক্ষে' দেখিয়াছে। কিন্তু উন্মাদ অবস্থায় এই সকল বিসদৃশ উক্তির মধ্যেও কখন কখন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। উন্মাদিনী শৈবলিনীর পক্ষে প্রতাপকে সাপ এবং নিজেকে ব্যাঙ্ বলিয়া কল্পনা করা হয়ত প্রতাপের গৃহে ভর্ৎসিতা শৈবলিনী কর্তৃক প্রতাপকে বহ্নি এবং নিজেকে পতঙ্গের সহিত তুলনার[১] বিকৃত পুনরুক্তি মাত্র। এবং আপাতদৃষ্টিতে তাহার অর্থহীন উক্তির মধ্যে এই সত্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, প্রতাপের অনুসরণ করিতে যাইয়া তাঁহার সংযমের সহিত সঙ্ঘাতে শৈবলিনীর ভোগবাসনা নির্মূল হইয়াছে।

শৈবলিনীর উন্মত্ততার অপর এক লক্ষণীয় জিনিষ এই যে, সাতদিন সাতরাত্রি অনন্যমনে স্বামী-আরাধনার ফলে তাহার হৃদ্‌পদ্মে চন্দ্রশেখরের জন্য যে আসন রচিত হইয়াছে, মানসিক বিপ্লবের মধ্যেও তিনি সেই আসনে অধিষ্ঠিত দেবতা। তাহার অবস্থা দেখিয়া চন্দ্রশেখর যখন 'গদগদকণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে? এ কি করিলে?"' শৈবলিনী তাঁহার শেষ কথাটি কাড়িয়া লইয়া গাহিল:[২]

"কি করিলে প্রাণসখী, মনচোরে ধরিয়ে,
ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে।"

চন্দ্রশেখর ৪।৪, ৯৪ পৃ।

কিন্তু এ সময়েও তাহার কল্পনায় 'মনচোর' চন্দ্রশেখর, ধরিল চন্দ্রশেখরকে এবং ভাসিলও চন্দ্রশেখর। সহসা শৈবলিনী প্রশ্ন করিল, "তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন?" উত্তরে তিনি যখন বলিলেন, "আমিই চন্দ্রশেখর", তখন 'শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল—কোন কথা না বলিয়া কাঁদিতে লাগিল—কত কাঁদিল—তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল।......শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"' উন্মত্ততার মধ্যে এই যে সঙ্গতি ইহাই এই চিত্রটিকে আরও শোকোদ্দীপক করিয়াছে।

শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের আলোচনা করিতে যাইয়া আর একটি প্রশ্নের

---

১ 'প্রতাপ আমার কে?......কে, তাহা জানি না—সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জলন্ত বহ্নি....সে আমার মৃত্যু।' ২।৮, ৫৪ পৃঃ।

২ শৈবলিনী যে সহজ অবস্থায় সঙ্গীতপ্রিয় ছিল ভীমা পুষ্করিণীতে সুন্দরীর সহিত জলক্রীড়ার চিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়। উন্মাদ অবস্থায় তাহার সঙ্গীত সেদিনের কথা স্মরণে আনিয়া তাহার উন্মত্ততার চিত্র আরও করুণ করিয়া তুলিয়াছে।

বিচার হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ডক্টর সেনগুপ্ত মনে করেন, 'প্রতাপের মৃত্যু যেন রমানন্দ স্বামীর যোগবল, Psychic force ও শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের উপর কঠিন পরিহাস।'[১] অর্থাৎ শৈবলিনীর এত কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পরেও যদি তাহারই জন্য প্রতাপকে মরিতে হইল, তাহা হইলে সে প্রায়শ্চিত্তের অথবা তাহার উপর রমানন্দ স্বামীর যোগবল বা Psychic force প্রয়োগের সার্থকতা কতটুকু? যোগবল বা Psychic force-এর প্রয়োগ ও শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ এবং প্রথমোক্ত ব্যাপারের উল্লেখ এস্থলে অবান্তর বলিয়াই মনে হয়, কারণ রমানন্দ স্বামীর কৃপায় শৈবলিনী সাময়িক যোগবল লাভ করিলেও ইহার ফলে তাহার চরিত্রের কোনরূপ স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটিবে রমানন্দ স্বামী অথবা চন্দ্রশেখর কেহই এ কথা বলেন নাই। সুতরাং শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্নটির বিচার করিতে হইবে। এই প্রায়শ্চিত্ত যোগবল বা Psychic force-এর ন্যায় সম্পূর্ণ বাহিরের জিনিষ নহে; প্রতাপের প্রতি ভালবাসা শৈবলিনীকে প্রবৃত্তি-জয়ের যে প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং প্রতাপকে হারাইয়া শৈবলিনী স্বামীর প্রতি যে ক্ষীণ আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে—এই দুইয়ের ভিত্তিতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে অগ্নিশুদ্ধা করিয়াছে। এবং ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রতাপের সহিত শেষ সাক্ষাৎকালে শৈবলিনীর আচরণ দ্বারাই ইহা যাচাই করিতে হইবে। এই সময় শৈবলিনীর আচরণে কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্যের চিহ্ন ছিল না। পক্ষান্তরে, রমানন্দ স্বামী ও চন্দ্রশেখরের সম্মুখে 'হস্তেঙ্গিতের দ্বারা' প্রতাপকে ডাকিয়া সে যে সহজভাবে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিল তাহা হইতে এবং স্বামীর নিকট অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করার অভিপ্রায়ে প্রতাপের নিকট এ সম্বন্ধে অনুমতি প্রার্থনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যর্থ হয় নাই।[২] কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অতীতের উপর জয়ী হইলেও, অতীতের স্মৃতি মুছিয়া

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৫০ পৃঃ।

২ সপ্তাহব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনের পর শৈবলিনী যখন প্রথম স্বামীর সাক্ষাৎ লাভ করিল, তখনই দেখিতে পাই যে, 'তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে তিনি তাহা জানেন,' চন্দ্রশেখর এইরূপ বলিলে শৈবলিনী ইহার প্রতিবাদে স্পষ্টই বলিতেছে, "সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।" (৪।৪, ৯১ পৃঃ)। কিন্তু শুধুমাত্র এই সময়ের উক্তি দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা বিচার করা চলে না। কারণ ইহা শৈবলিনীর বিভীষিকাপূর্ণ অভিজ্ঞতার সাময়িক প্রতিক্রিয়াও হইতে পারে। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী আচরণের সহিত একযোগে বিচার করিলে এই স্বতঃপ্রণোদিত স্বীকারোক্তির যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে।

যায় নাই ; বাসনা নাই, কিন্তু বাসনার স্মৃতি আছে, পাপ বাসনা তাহাকে যে পঙ্কিল আবর্ত্তে টানিয়া নিয়াছিল তাহার স্মৃতি আছে। এই কারণেই শৈবলিনী নিজেকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এই অবিশ্বাসই তাহার চরিত্রের পরিবর্ত্তনের অন্যতম নিদর্শন। শৈবলিনীর আচরণের সহিত তাহার প্রায়শ্চিত্তের কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই, সুতরাং ইহার ফলে প্রতাপের আত্মবলিদান 'রমানন্দ স্বামীর যোগবল, Psychic force ও শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের উপর কঠিন পরিহাস' বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ডক্টর সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন, 'মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থ প্রণয়নে দোটানায় পড়িয়া গিয়াছিলেন।'[১] হয়ত এ কথা ঠিক ; শৈবলিনীর অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হয়ত 'নীতিবেত্তা' বঙ্কিমের পরিকল্পনা এবং প্রতাপের মৃত্যু হয়ত 'সৌন্দর্য্যের উপাসক' বঙ্কিমের পরিকল্পনা। কিন্তু শিল্পী বঙ্কিমের অসামান্য প্রতিভাগুণে এই উভয় প্রকার পরিকল্পনার সংযোজনায় কোনরূপ খুঁত রহিয়া যায় নাই।

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৫০ পৃঃ।

রজনী

'রজনী' বাংলা সাহিত্যে নূতন শ্রেণীর উপন্যাস। 'ইন্দিরা' উপন্যাসেও বঙ্কিম সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু 'ইন্দিরা'য় নায়িকা নিজেই তাহার জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছে এবং এই বর্ণনার ভিতর দিয়াই উপন্যাসের গল্পাংশ গড়িয়া উঠিয়াছে। 'রজনী'তে কোন একটি চরিত্র একমাত্র বক্তা নহেন। উপন্যাসের প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্র আখ্যায়িকার কোন না কোন অংশ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরস্পরের বর্ণনার সংযোজনায় সমগ্র কাহিনীটি রূপায়িত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম এইরূপ রচনার প্রথম প্রবর্ত্তক হইলেও ইহা যে নূতন নহে উপন্যাসের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রণালীতে উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন : 'এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়।' বস্তুতঃ, ইহার ফলে 'ইন্দিরা'র একটি অপরিহার্য্য ত্রুটি দূর হইয়াছে, অর্থাৎ সমগ্র আখ্যায়িকা কোন বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। 'রজনী'র কোন চরিত্রকেই আমরা একমাত্র তাহার অথবা অপর কোন একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে, প্রত্যেকের কাহিনী অপর সকলের কাহিনীর উপর আলোকপাত করিয়া একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র গড়িয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু ভিন্ন প্রকারের হইলেও, এইরূপ রচনাপ্রণালীতেও কিছুটা অসুবিধা রহিয়াছে। ঔপন্যাসিককে এস্থলে বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণিত খণ্ড খণ্ড কাহিনীকে এরূপ ভাবে সাজাইতে হইবে যে, একটির পর একটি কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যেন আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশ হয় অথচ কোথাও কোনরূপ পুনরুক্তিদোষ না ঘটে। ইহার ফলে আখ্যায়িকায় কখন কখন কৃত্রিমতার ছাপ আসিয়া পড়ে। 'রজনী'র কথাই বলিতেছি : এই উপন্যাসে দেখিতে পাই একজন বক্তা তাঁহার কথা শেষ করিলে পরবর্ত্তী বক্তা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া এরূপ ভাবে কাহিনীটির জের টানিয়াছেন এবং একই বক্তার বিভিন্ন সময়ের 'কথা'র মধ্যে কাহিনীর ফাঁক মধ্যবর্ত্তী বক্তার 'কথা' দ্বারা এরূপ ভাবে পূর্ণ করা হইয়াছে যে, উপন্যাসখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে মনে হয় যে, সমগ্র ঘটনার পরিসমাপ্তির পর শচীন্দ্র, অমরনাথ, লবঙ্গ ও রজনী একযোগে পরামর্শ করিয়া পরস্পরের ভিতর কাহিনীটির বিভিন্ন অংশের বর্ণনার

ভার বণ্টন করিয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখনী ধারণ করিয়াছেন। শচীন্দ্রের কথার প্রারম্ভে তাঁহার উক্তি : 'এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবন-চরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।' (৩।১)।—এই ধারণার পরিপোষক। দ্বিতীয়তঃ, এই শ্রেণীর উপন্যাসে প্রত্যেক চরিত্রের কথায় যেমন ভাবগত বৈশিষ্ট্য, তেমন ভাষা সম্বন্ধেও স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব সুরের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। 'রজনী'তে লবঙ্গের ভাব ও ভাষায় একটা নিজস্ব সুর থাকিলেও, অন্যান্য ক্ষেত্রে বঙ্কিম এ সম্বন্ধে যথোচিত সজাগ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। রজনী অশিক্ষিত হইলেও অমরনাথের ন্যায় তাহার দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্থানে স্থানে উভয়ের ভাষাও একই প্রকারের।

যাহা হউক, রচনাপ্রণালীর অভিনবত্বই 'রজনী'র একমাত্র আকর্ষণ নহে। ইহার সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ : 'রজনী' বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস যাহাতে কাহিনী অপেক্ষা মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

উপন্যাসের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিম জানাইয়াছেন, রজনীর চরিত্র লর্ড লিটনের 'লাষ্ট ডেজ্ অব্ পম্পিয়াই'-এর (Last Days of Pompeii) নিদিয়া (Nydia) চরিত্র স্মরণে সূচিত হইয়াছে। নিদিয়ার ন্যায় রজনী জন্মান্ধ ফুলওয়ালী এবং উভয়ের প্রণয়ের অনুভূতি একই প্রকারের। নিদিয়ার হৃদয়ে যেমন শব্দ এবং স্পর্শের অনুভূতির ভিতর দিয়া প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে, রজনীর ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। গ্লকাস্ (Glaucus) নিদিয়ার সর্ব্বস্ব, গ্লকাসের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, গ্লকাসের স্পর্শ তাহাকে বিহ্বল করে। এইরূপ, শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর রজনীর কর্ণে বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় মধুর, শচীন্দ্রের স্পর্শ তাহার অনুভূতিতে পুষ্পময়। নিদিয়ার প্রতি গ্লকাসের এবং রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের আচরণেও কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নিদিয়ার প্রতি স্নেহশীল হইলেও গ্লকাস্ তাহার অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন নাই। দরিদ্র ক্রীত-দাসীকে তিনি হৃদয়হীন প্রভুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আইওনের (Ione) উদ্ধারকর্ত্রী বলিয়া তিনি তাহাকে স্বর্ণহার উপহার দিয়াছেন, ইহার অধিক কোন কিছু নিদিয়ার আকাঙক্ষণীয় থাকিতে পারে, ইহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। এইরূপ, অলৌকিক উপায়ে রজনীর ভালবাসার গোপন রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শচীন্দ্র তাহার হৃদয়ের গভীরতা অনুমান করিতে পারেন নাই এবং গোপালের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া, প্রাপ্ত-যৌবনা অনূঢ়া অন্ধহীনার যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু সাদৃশ্য যাহাই থাকুক, নিদিয়া ও রজনীতে আবেষ্টনগত ও প্রকৃতিগত

পার্থক্যও লক্ষণীয়। নিদিয়া ক্রীতদাসী; বার্‌বো (Burbo) ও তাহার পত্নীর আশ্রয়ে তাহাকে বিভীষিকাপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে, পিতৃমাতৃহীনা হইলেও রজনী যাহাদের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারা তাহার পরম আত্মীয় এবং দরিদ্র হইলেও তাহাকে কন্যার স্নেহে পালন করিয়াছে; রজনীও নিজেকে তাহাদের সন্তান বলিয়াই জানিয়াছে। বস্তুতঃ, এই নিঃসন্তান দম্পতী রজনীকে এতই ভালবাসিত যে, সহসা গোপনে গৃহত্যাগের জন্যও তাহাকে কোনরূপ তিরস্কার বা লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় নাই; পরন্তু, অমরনাথ যখন বলিলেন যে, তিনি জানিয়াছেন রজনী তাহার কন্যা নহে, হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, বৃদ্ধ রাজচন্দ্র তখন বালিকাকে হারাইবার ভয়ে কাতরস্বরে বলিল, "আপনার পায়ে পড়ি, এ কথা রজনীকে বলিবেন না।" (২।৭)।

নিদিয়ার নিষ্ঠুর আবেষ্টন তাহাকে কতকটা কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল এবং বালিকা বয়সেই যে সকল উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছিল সৌভাগ্যক্রমে তাহা তাহার চরিত্রের শুভ্রতা নষ্ট না করিলেও, তাহার চিত্ত-বৃত্তিসকল দুর্দ্দমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল।[১] ফলে নিদিয়ার সহজাত মহত্ত্ব পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারে নাই।[২] নিদিয়া যেমন গ্লকাসের প্রণয়ে আত্মবিহ্বলা, তেমনই আইওনের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণা। গ্লকাসের মুখ চাহিয়া আইওনকে সে নারীর চরম দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার এই কার্য্য সে অন্তরের সহিত সমর্থন করিতে পারে নাই; পরন্তু কখন কখন সে ইহার জন্য অনুশোচনা করিয়াছে।[৩] রজনী ভিন্ন প্রকৃতির; তাহার নিকট কর্ত্তব্যের স্থান অন্য সব বিচার বিবেচনার ঊর্দ্ধে। নিদিয়াকে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, রজনীর জীবনের সমস্যা তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের; কিন্তু শচীন্দ্র যদি গ্লকাসের ন্যায় অন্য রমণীতে আসক্ত হইতেন, তাহা হইলে রজনী কখনও নিদিয়ার ন্যায় কোনরূপ মন্ত্রৌষধির সাহায্যে তাঁহার ভালবাসা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিত না। পক্ষান্তরে, লবঙ্গ উপযাচিকা হইয়া তাহাকে 'শচীন্দ্র দান' করিতে চাহিলে রজনী যেমন প্রাণদাতার প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া

১ The friendless childhood of Nydia had hardened her character; perhaps the heated scenes of debauchery through which she had passed, seemingly unscathed, ripened her passions, though they had not sullied her purity. Last Days of Pompeii. Bk. III, Chap. IV.

২ Nature had sown in the heart of this flower the seeds of virtue never destined to ripen. Ibid, Bk. III, Chap. IX.

৩ Often she bitterly repented the service she had rendered to Ione: often she said inly, "If she had fallen, Glaucus could have loved her no longer;" and then dark and fearful thoughts crept into her breast. Ibid. Bk. III, Chap. IV.

সে 'দান' প্রত্যাখ্যান করিল, অনুরূপ অবস্থায় নিদিয়া কখনও সেরূপ স্বার্থত্যাগ করিতে পারিত না।/ নিদিয়া প্রকাসের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তাঁহাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারে না। নিদিয়ার প্রেম পর্ব্বতগাত্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় বেগবতী ; রজনীর প্রেম অতল-স্পর্শী সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় শান্ত ও নিস্তরঙ্গ।

ব্যর্থপ্রেমিকা নিদিয়ার জীবনের পরিণতি করুণ ; তরুণ বয়সেই সমুদ্রের জলতলে তাহার ঈর্ষ্যার সহিত তাহার সকল আকাঙ্ক্ষার সমাধি রচিত হইল। বঙ্কিম তাঁহার রজনীকে সাংসারিক সুখে সুখী করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে অতিপ্রাকৃতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই সম্পর্কে বঙ্কিম লিখিয়াছেন যে, উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের দ্বারা আখ্যায়িকা পরিবেশন করার ফলে ইহাতে 'যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে' তাঁহাকে 'তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।' (বিজ্ঞাপন)। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বল যুক্তি। কারণ রচনাপ্রণালী যাহাই হউক, চরিত্র বিশেষের কার্য্য তাহার স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে কিনা এবং অন্যান্য দিক দিয়া আর্টের দাবী অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে কিনা, উপন্যাসের আলোচনাকালে প্রকৃতপক্ষে ইহাই বিচার্য্য। লবঙ্গ সন্ন্যাসী ঠাকুরের অলৌকিক শক্তিতে আস্থাবতী ; সুতরাং শচীন্দ্রের মনে যাহাতে রজনীর প্রতি আসক্তি জন্মে তৎকালীন অবস্থায় সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পক্ষেও কতকটা শচীন্দ্রের পিতা ও তাঁহার ছোট মার অনুরোধে, কতকটা তাঁহাকে মন্ত্রশক্তি প্রত্যক্ষ করাইবার অভিপ্রায়ে শচীন্দ্রের উপর মন্ত্রপ্রয়োগ অস্বাভাবিক নহে।[১] কিন্তু এরূপ প্রক্রিয়ার ফলে শচীন্দ্রকে যদি স্বভাববিরুদ্ধ পথে চালিত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা নিঃসন্দেহ আর্টের দিক দিয়া দূষণীয়। এবং সে ক্ষেত্রে লবঙ্গ ও সন্ন্যাসী ঠাকুরের উপর ষোল আনা দায়িত্ব চাপাইয়া বঙ্কিম কখন পাশ কাটাইতে পারেন না।

বলা বাহুল্য, কাব্যে অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃতের সংযোজনামাত্রই দূষণীয় নহে। 'ম্যাক্‌বেথে'র ডাইনিত্রয় ঐ নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। কিন্তু যে স্থলে অতিপ্রাকৃত সহজভাবে চরিত্রস্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটায় সে স্থলে অতিপ্রাকৃতের পরিবেশন নিঃসন্দেহ দূষণীয়। ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও শেক্স-

১ শচীন্দ্রের পিতা যে তাঁহাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিবার জন্য সন্ন্যাসী ঠাকুরকে অনুরোধ করিয়াছেন, মন্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বে তিনি শচীন্দ্রকে স্পষ্টই একথা বলিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্রের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হয় তাহারই ফলে সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার উপর একটি বিশিষ্ট মন্ত্র প্রয়োগ করেন। রজনী, ৩।৬, ৫৮।৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পীগ্নারের ন্যায় বঙ্কিমও তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষে' প্রাকৃতের সহিত অপ্রাকৃতের মিশ্রণ করিয়াছেন, কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে অপ্রাকৃত চরিত্রের স্বচ্ছন্দ বিকাশের পরিপন্থী হয় নাই; ইহা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ চরিত্রের স্বাভাবিক বৃত্তিকে অধিকতর বেগবতী করিয়াছে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই কোন চরিত্রকে অসম্ভাব্য নূতন পথে চালিত করে নাই। প্রশ্ন এই: 'রজনী'তে আর্টের এই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে কি? ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, 'শচীন্দ্রের মনোভাব-পরিবর্ত্তনের যাহা মূল কারণ, তাহা অতিপ্রাকৃতের রাজ্য হইতে আসিতেছে,....উপন্যাসের দিক হইতে ইহাকে গ্রন্থের একটি অপরিহার্য্য ত্রুটি বলিয়াই ধরিতে হইবে।'[১] সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্ত্রশক্তি প্রযোগের পূর্ব্বে শচীন্দ্র ছোট মার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দরিদ্র অন্ধ যুবতীর বিবাহের ঘটকালিতে তৎপর হইলেও স্বয়ং তাহাকে বিবাহ করার কল্পনা করেন নাই। পরন্তু, অবস্থার নাটকীয় পরিবর্ত্তনে বিষয়ের প্রকৃত মালিক রজনীকে সর্ব্বস্ব প্রত্যর্পণ করিয়া নিঃস্ব হইবার আশঙ্কায় বৃদ্ধ রামসদয় মিত্র যখন অন্ধ ফুলওয়ালীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, শচীন্দ্র সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না এবং আত্মরক্ষার জন্য ছোট মার শরণাপন্ন হইলেন। এবং ছোট মার নিকট হইতেও যখন একই অনুরোধ আসিল, তখন তিনি 'দম্ভ করিয়া' বলিলেন, "তোমরা যাহাই বল না কেন, আমি এ বিবাহ করিব না।" (৩।৫)। এ সমস্তই রজনীর প্রতি আসক্তির অভাবের পরিচয় দেয়, সুতরাং ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতের পরিপোষক।

পক্ষান্তরে, ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মোটামুটি একমত হইলেও,[২] সন্ন্যাসী ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেই যে শচীন্দ্রের মন রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, ডক্টর সেনগুপ্ত তাহার 'একটু ক্ষীণ আভাস' লক্ষ্য করিয়াছেন।[৩] শচীন্দ্রের যে উক্তির ভিতর তিনি এই 'ক্ষীণ আভাস' লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা এইরূপ: "তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার [রজনীর] বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ঠিক জানি না। তবে ছোট মার দৌরাত্ম্য বড়, তাহারই উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।" যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে পারি না, তাহার বিবাহ দিবার ইচ্ছার ভিতর

১ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (তৃতীয় সংস্করণ), ১০১ পৃঃ।

২ 'লবঙ্গলতার সন্ন্যাসী যোগবলে শচীন্দ্রকে রজনীতে আসক্ত করিয়াছিলেন।'—বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩ পৃঃ।

৩ ঐ, ১৫৯ পৃঃ।

হয়ত অপরের মাধ্যমে তৃপ্তির আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতে পারে। অন্ততঃ মনের ভিতর কিছু খটকা না থাকিলে একথা এমন করিয়া উল্লেখ করার কারণ ছিল না। এই হিসাবে ইহা হয়ত আসক্তির 'ক্ষীণ আভাস' দেয়। কিন্তু শুধু এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন।[১] কিন্তু শচীন্দ্রের 'কথা'র ভিতর দিয়া বঙ্কিম তাঁহার আসক্তির 'ক্ষীণ' নহে, সুস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। শচীন্দ্র বলিতেছেন, "রজনীকে প্রথম দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে। রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ পাগল হইবে না। তাহার চক্ষের সে মোহিনী গতি নাই। সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে; বোধ হয় সে মূর্ত্তি সহজে ভুলিবেও না; কেন না সে স্থির, গম্ভীর কান্তির একটু অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। কিন্তু সে আকর্ষণ অন্যবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাকে "পঞ্চবাণ" বলে রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।" (৩১২)। কিন্তু এ সমস্তই যে যুক্তির কথা এবং উচ্চশিক্ষিত ধনী যুবকের পক্ষে পুষ্পবিক্রেতার কন্যা অশিক্ষিতা অন্ধ রজনীর প্রেমমুগ্ধ হইবার বিরুদ্ধে বিচারবুদ্ধিপ্রসূত কারণানুসন্ধানের প্রচেষ্টা মাত্র তাহা শচীন্দ্রের পরবর্ত্তী উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। 'যাহাকে "পঞ্চবাণ" বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই'—তাঁহার এই উক্তির সহিত শচীন্দ্রের মন সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিল না, তাই পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন, "নাই কি?" শচীন্দ্রের অগোচরে তাঁহার অবচেতন মনে যে গোপন বাসনা উঁকি মারিতেছিল, এই স্বতঃউচ্চারিত প্রশ্নের ভিতর দিয়া তাহার অনেকখানিই ব্যক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার সংস্কার এই বাসনাকে স্বীকার করিতে চাহে না। এবং এই কারণেই কল্পিত সুন্দরীর কল্পিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন, "রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ; রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং

---

১ প্রসঙ্গতঃ ডক্টর সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন, 'বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রজনী প্রথম প্রকাশিত হয়। সেইখানে এই আভাস আরও সুস্পষ্ট। শচীন্দ্র বলিতেছে, "অন্ধ ফুলওয়ালীর এরূপ বর [অমরনাথ] আমরা কখন স্বপ্নেও ভরসা করি নাই। যদি ঘটে তবে রজনীর বড় সৌভাগ্য বটে।....কিন্তু গুটি দুই তিন কথা মনে পড়িল। প্রথমতঃ গোপালকে কথা দেওয়া হইয়াছে। ....দ্বিতীয়তঃ এ ব্যক্তি অপরিচিত; তৃতীয়তঃ—দূর হৌক্, তৃতীয়টি ছাড়িয়া দাও। (বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮১—পৃঃ ৪২৭)'—বঙ্কিমচন্দ্র, ১৫৯-৬০ পৃঃ পাদটীকা।

এখানে আভাস সুস্পষ্ট ইহা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু শচীন্দ্র একথা বলিয়াছেন, রজনী তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে সন্ন্যাসীর মন্ত্র প্রয়োগের ফলে এই গোপন তথ্য অবগত হইবার পরে, পূর্ব্বে নহে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আসক্তির আভাস তাঁহার স্বাভাবিক মনোবৃত্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশের পরিচয় দেয় না।

রজনী অশিক্ষিতা রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না ; ইচ্ছাও নাই।" শচীন্দ্র অন্ধ ও অশিক্ষিতা পুষ্পনারীকে বিবাহ করিতে পারেন না, অথবা তাঁহার সেরূপ ইচ্ছাও নাই ; বুঝিলাম। কিন্তু এই সহজ কথাটি এত ফলাও করিয়া জানাইবার সার্থকতা কি? "নাই কি?"—এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা তাঁহার দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয়। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ডক্টর সেনগুপ্ত যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

যাহা হউক, তাঁহার অবচেতন মনে যাহাই থাকুক না কেন, শচীন্দ্রের চেতন মন কখনও রজনীকে বিবাহ করার কল্পনাকে কোনরূপ প্রশ্রয় দিতে পারে না। সুতরাং রামসদয় মিত্র যখন সম্পত্তির মোহে না হইলেও, অন্ততঃ দারিদ্র্যের ভয়ে তাঁহাকে অন্ধ পুষ্পনারীর নিকট বিক্রয় করিতে চাহিলেন, তখন তাঁহার উচ্চশিক্ষিত উদার মন ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কিন্তু রজনীকে সুখী করিতে হইলে শচীন্দ্রের বিদ্রোহী মন জয় করিতে হইবে। এই কারণেই মন্ত্রশক্তির অবতারণা। এবং শচীন্দ্রের উপর সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্ত্রশক্তি প্রয়োগের ফলে তাঁহার স্বপ্ন হইতেই তাঁহার চেতন মনের পরিবর্ত্তনের সূচনা। সুতরাং অতিপ্রাকৃত শচীন্দ্রকে ঠিক কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে তাহার বিচার করিতে হইলে সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্ত্রপ্রয়োগের সহিত শচীন্দ্রের স্বপ্নের সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শচীন্দ্রের স্বপ্নের কোনরূপ প্রাকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিয়াছেন, তাঁহার প্রক্রিয়ার ফলে যে নারী শচীন্দ্রকে 'মর্ম্মান্তিক ভালবাসে', স্বপ্নে তিনি তাহাকেই দেখিতে পাইবেন। শচীন্দ্রের অবচেতন মনে রজনীর প্রতি যে আসক্তি সুপ্ত রহিয়াছে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের উক্তি যদি সেই আসক্তিকে জাগ্রত করিয়া তাঁহার স্বপ্নের উপাদান যোগাইত (যুক্তির দিক দিয়া এই সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না) তাহা হইলে তিনি হয়ত দেখিতে পাইতেন 'কানা ফুলওয়ালী' ছোট মাকে ফুল যোগাইতে আসিয়াছে, অথবা ছোট মার ভর্ৎসনায় তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, অথবা তিনি তাহার হাত ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া তাহাকে ছোট মার নিকট লইয়া যাইতেছেন, অথবা ঐ রকমই কোন কিছু। অর্থাৎ, তিনি ব্যক্তিগতভাবে রজনীর যতটুকু পরিচয় পাইয়াছেন স্বপ্নে তাহারই কোন চিত্র দেখিতে পাইতেন। কিন্তু শচীন্দ্র দেখিলেন, 'কল কল গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে সৈকতভূমি ; তাহার প্রান্তভাগে অর্দ্ধজলমগ্না' রজনী। (৩।৬)। এ চিত্র শচীন্দ্রের অভিজ্ঞতা এবং তাঁহার ধারণার বাহিরে ; সুতরাং ইহা অন্তর্মুখী নহে। অথচ শচীন্দ্রের স্বপ্ন অতিপ্রাকৃত হইলে, রজনীর অনুভূতিতে বাহ্যজগৎ

যখন লুপ্তপ্রায়, তাহার অন্তর যখন শচীন্দ্রময়, তাহার সেই জীবনমরণের সন্ধিক্ষণের ছবিই যে শচীন্দ্রের মানসনয়নে প্রতিভাত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। অতএব ইহা নিশ্চিত যে এই স্বপ্ন বহির্মুখী ও অতিপ্রাকৃত[১] এবং ইহার সহিত সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্ত্র প্রয়োগের নিগূঢ় সংযোগ রহিয়াছে। তবুও 'শচীন্দ্রের মনোভাব-পরিবর্ত্তনের যাহা মূল কারণ তাহা অতিপ্রাকৃতের রাজ্য হইতে আসিতেছে'—ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ শচীন্দ্রের মনে পূর্ব্ব হইতে একটুকু আসক্তি না থাকিলে, এই 'অন্ধ পুষ্পনারী' তাঁহাকে 'মর্ম্মান্তিক ভালবাসে' কেবলমাত্র এই অনুভূতি তাঁহার রুচি ও সংস্কারের উপর জয়ী হইয়া তাঁহাকে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিত না। সন্ন্যাসী ঠাকুর অবশ্য বলিয়াছেন, 'স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই।' (৪।৭, ৭৭ পৃঃ)। কিন্তু বাস্তব জগতে কখন কখন ইহার অন্যথাও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং রজনী অন্ধ বলিয়া সহজ অবস্থায় ইহাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এ স্থলে স্বপ্নের ভিতর দিয়া শচীন্দ্র যে শুধু রজনীর মনের পরিচয় পাইলেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে কতকটা নিজের মনেরও পরিচয় পাইলেন; এবং হয়ত এই কারণেই স্বপ্ন সম্বন্ধে সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্তব্য শুনিয়া তিনি 'নীরব' রহিলেন। (৩।৬, ৬০ পৃঃ)। ইহার পর যাহা বাকী রহিল, আকস্মিক ব্যাধি তাহা সম্পূর্ণ করিল। ব্যাধির ফলে যখন মনের স্বাভাবিক দৃঢ়তা রহিল না, তখন যে আসক্তিকে তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কার এযাবৎ অস্বীকার করিয়া আসিতেছিল, তাহাই তাঁহার উপর জয়ী হইল।[২] অতএব দেখা যাইতেছে, সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তি শচীন্দ্রের 'মনোভাব-পরিবর্ত্তনের' প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও, ইহা তাঁহার মনে কোন নূতন আসক্তির সৃষ্টি করে নাই, ক্ষীণ হইলেও যে আসক্তি তাঁহার মনের কোণে আত্মগোপন করিয়াছিল, মন্ত্রশক্তি তাহারই আত্মপ্রকাশের সহায়তা করিয়াছে। তথাপি ইহাও নিশ্চিত যে, বাহির হইতে অতিপ্রাকৃতের সাহায্যে শক্তিসঞ্চয় না করিলে এই আসক্তি কখনও সক্রিয় হইয়া দুর্দ্দমনীয় আকাঙক্ষায়

১ অতিপ্রাকৃত হইলেও শচীন্দ্রের স্বপ্ন কপালকুণ্ডলা বা কুন্দের স্বপ্ন হইতে ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ ইহার ভিতর ভাগ্যদেবতার কোন নিগূঢ় সঙ্কেত নাই এবং স্বপ্নের পরিণাম ফল যাহাই হউক, ইহাতে ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত নাই।

২ লবঙ্গের নিকট শচীন্দ্রের ব্যাধির স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরও তাঁহার মানসিক অবস্থার মূলতঃ এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তফাৎ এই যে, শচীন্দ্রের ক্ষীণ আসক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, স্বপ্নদর্শনের ফলেই 'শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল।' রজনী, ৪।৭, ৭৬-৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পরিণত হইতে পারিত না। অতিপ্রাকৃতের পরিবেশনে ম্যাক্‌বেথের ডাইনি-ত্রয় ও সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্ত্রশক্তির পরিকল্পনায় আসল পার্থক্য এইখানে। ডাইনিত্রয়ের ভবিষ্যৎবাণী ম্যাক্‌বেথের মনে হত্যার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করিয়াছে, কিন্তু ইহারা ভবিষ্যৎবাণী না করিলে তিনি ডান্‌কান্‌কে হত্যা করিতেন না আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু শচীন্দ্রের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রজনীকে সে রাত্রে স্বপ্ন দেখিতে না পাইলে, তাহাকে বিবাহ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হওয়া দূরের কথা, কোন অবস্থাতেই তিনি এ বিবাহে সম্মত হইতেন না। অর্থাৎ এস্থলে প্রাকৃত হইতে অতিপ্রাকৃতকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এবং ইহার ফলে শচীন্দ্রের চরিত্র সহজভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। অতিপ্রাকৃতের পরিবেশনে ইহাকে উপন্যাসের ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ [অর্থাৎ নিদিয়ার চরিত্রের] ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।' (বিজ্ঞাপন)। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতেছে, এই সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব কি এবং রজনীর চরিত্রের পরিকল্পনায় বঙ্কিমের উদ্দেশ্য কিরূপে এবং কতখানি সিদ্ধ হইয়াছে।

অন্ধ রজনীর সাহায্যে বঙ্কিম দেখাইয়াছেন, নারীর দৈহিক গঠনে প্রকৃতি কার্পণ্য করিলেও সে নারী। যে অলঙ্ঘ্য বিধানে বসন্তে কুসুম ফোটে, ভ্রমর গুঞ্জন তোলে, সেই অলঙ্ঘ্য বিধানেই অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, একদিন এক শুভ মুহূর্ত্তে সে আপনার পরিচয় পায় এবং পর্ব্বতকন্দর-নিঃসৃত নির্ঝরিণীর ন্যায় আপনার প্রেমধারা প্রেমাস্পদের চরণে উৎসর্গ করিবার জন্য তাহার দেহমন চঞ্চল হইয়া ওঠে। সাধারণে ইহা বোঝে না, সুতরাং সাধারণের মাপকাঠিতে কেহ তাহার বিচার করে না। তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া যায় এবং সমাজে সে থাকে নিতান্তই অপাঙ্‌ক্তেয়। রজনী জন্মান্ধ; কিন্তু অন্ধ বলিয়া প্রস্তরে খোদিত 'চক্ষুশূন্য মূর্ত্তি'র ন্যায় সে কি শুধু পাষাণ প্রতিমা? সাধারণে হয়ত তাহাই মনে করিবে। শচীন্দ্র প্রশ্ন করিতেছেন, "যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে?" (৩।১)। এ প্রশ্ন শুধু শচীন্দ্রের নহে, শচীন্দ্রের মারফত ইহা সাধারণের মনোভাবের অভিব্যক্তি। কিন্তু হউক রজনী অন্ধ, অন্ধ বলিয়া কাহারও হৃদয়দুয়ার চিরদিনের জন্য অর্গলবদ্ধ থাকে না। রজনী বলিতেছে, "তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার

মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান্ দেখে না কেন? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার মনের সুখ মাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?

শুষ্কভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে? শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে? রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণীহৃদয়ে সুপুরুষসংস্পর্শ হইলে কেন না প্রেম জন্মিবে? দেখ, অন্ধকারেও ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখন যাইবে না, সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে, আমার নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না?" (১।৩)। রজনীর জীবন তাহার উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করে।

বাহিরের জগতের পক্ষে অন্ধ রজনীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা হইতে আর একটি বৃহত্তর প্রশ্ন আসিয়া পড়ে: রজনীর সম্বন্ধে স্বীয় অজ্ঞতা স্বীকার করিতে যাইয়া শচীন্দ্র বলিতেছেন, "কেহ হাসিও না, আমার মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে। আমরা খান দুই তিন বহি পড়িয়া, মনে করি, জগতের চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ় তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেন না, আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে সে বৃহত্তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না।" (৩।১, ৪৩ পৃ:)। ইহা সে যুগের উগ্র জড়বাদীর প্রতি অধ্যাত্মবাদী বঙ্কিমের পরোক্ষ কটাক্ষ। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভূত নহে, তাহাই অমূলক বা ভ্রান্তিমূলক নহে। যাহা অতীন্দ্রিয়, জড় জগতের নিয়ম মানিয়া না চলিলেও, তাহা যে সরাসরি অগ্রাহ্য নহে, শচীন্দ্রের উপর মন্ত্রশক্তি-প্রয়োগের সাহায্যে বঙ্কিম এই সত্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অবশ্য, আর্টের দিক দিয়া ইহাই উপন্যাসের দুর্ব্বলতম অংশ।

'রজনী' উপন্যাসের তৃতীয় প্রশ্ন মানব জীবনে সুখ দুঃখের প্রশ্ন।[১] রজনীর দুঃখমথিত অন্তর হইতে প্রশ্ন উঠিতেছে, 'এ দুঃখময় জীবন কেন?"

১ 'চন্দ্রশেখরে' রমানন্দ স্বামী কর্তৃক সুখ দুঃখের আলোচনা স্মরণীয়। মনে হয় 'চন্দ্রশেখরে'র রচনাকাল হইতেই প্রশ্নটি বিশেষভাবে বঙ্কিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

(১।৮)। এ প্রশ্ন শুধু রজনীর নহে; ভিন্ন প্রতিবেশে হইলেও অমরনাথের মনেও ঠিক একই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এবং রজনীর বিধিদত্ত দুঃখের পার্শ্বে অমরনাথের নিজের হাতে গড়া দুঃখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্কিম রজনীর দুঃখ স্ফুটতর করিয়াছেন। অমরনাথ শুধু নিরাশপ্রণয়ী নহেন, অগ্নির অক্ষরে লবঙ্গ তাঁহার পৃষ্ঠে যে কলঙ্কচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছেন তাহারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি সংসারে কোন আকর্ষণ, কোন লক্ষ্যবস্তু খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তাই তিনি দুঃখী। দার্শনিক অমরনাথ তাঁহার দুঃখের এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন: "দুঃখ কি? অভাব।........আমার কাম্যবস্তুর অভাবই আমার দুঃখ। আমি বুঝিয়াছি যে, সকলই অসার। তাই আমার কেবল দুঃখ সার।" (২।৩)। রজনীর দুঃখ স্বতন্ত্র প্রকারের; তাহার নবজাগ্রত প্রণয়কে কেন্দ্র করিয়া নূতন করিয়া অন্ধত্বের অনুভূতি তাহার দুঃখের কারণ। তাহার দৃষ্টিভঙ্গীও অমরনাথের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের। রজনী বলিতেছে, "জীবন অসার—সুখ নাই বলিয়া অসার, তাহা নহে। শিমুলগাছে শিমুল ফুলই ফুটিবে; তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। দুঃখময় জীবনে দুঃখ আছে বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এই জন্য যে, দুঃখই দুঃখের পরিণাম।" রজনীর দুঃখ তাহাকে একাই ভোগ করিতে হইবে, দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া আর কেহ জানিল না, 'সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া' আর কেহ বুঝিল না—ভাষাহীন, সহানুভূতিহীন এই যে দুঃখ, ইহারই জন্য তাহার চক্ষে জীবন অসার। (১।৮, ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু জীবন দুঃখময় ও অসার, ইহাই কি মানবজীবনের শেষ কথা? রজনী ও অমরনাথ বিভিন্ন পথ দিয়া এই যে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, ইহাই কি মানবজীবনের চরম সত্য? রজনীর জীবনের পরিণতি অন্যরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। শুধু রজনী কেন, অমরনাথের জীবনই কি শুধু দুঃখের ইতিহাস? যেদিন তিনি স্বেচ্ছায় শচীন্দ্র ও রজনীর মিলনের পথ মুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন, সেদিনের তাঁহার অনুভূতি—সে কি শুধু বেদনার? অথবা পরবর্ত্তীকালে শিশু 'অমরপ্রসাদ' তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে যে ঝঙ্কার তুলিল, সে কি শুধু বিষাদের সুরের? মানবজীবনে দুঃখ যেমন সত্য, সুখও তেমনই সত্য। যে সুখ দুঃখলেশশূন্য তাহা অসম্পূর্ণ, দুঃখের ভিতর দিয়াই সুখ পূর্ণতা লাভ করে। কথাটির একটুকু বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' গুরু বলিতেছেন: 'সুখদুঃখ মানসিক অবস্থামাত্র।'[১] কিন্তু যে মানসিক

১ ধর্ম্মতত্ত্ব ২, ৭ পৃঃ।

অবস্থায় সুখের অনুভূতি জন্মে তাহার স্বরূপ কি? এবং সেরূপ মানসিক অবস্থালাভের উপায় কি? গুরুর মুখে বঙ্কিম এ প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন: শারীরিক ও মানসিক 'সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।'[১] ইহার জন্য চাই 'সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ।'[২] ইহাই আদর্শ এবং এই আদর্শকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক মনুষ্যকে জীবনগঠনের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের আগুন পরিশুদ্ধ না হইলে সংসারাসক্ত জীবের মনে ঈশ্বরে আত্মনিবেদনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। এইখানেই দুঃখের সার্থকতা। অমরনাথ যতদিন সুখের সন্ধানে ঘুরিয়াছেন, মরীচিকার ন্যায় সুখ ততদিন তাঁহাকে ফাঁকি দিতে পারিয়াছে, কিন্তু যেদিন কঠিন আঘাত পাইয়া (স্বেচ্ছায় হইলেও রজনীকে ত্যাগ করিয়া তিনি বুক পাতিয়া কঠিন আঘাত সহ্য করিয়াছেন) তিনি 'মনিহারি'র দোকান তুলিয়া দিয়া, যিনি সুখদুঃখের নিয়ন্তা, আপনার ক্ষুদ্র সুখদুঃখ তাঁহারই চরণে নিবেদন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, যেদিন 'অন্ধ পুষ্পনারীকে ত্যাগ করিয়া' যিনি জ্ঞানাতীত, ধ্যানাতীত ও অপ্রমেয় তাঁহারই 'ছায়া' আপনার 'স্ফুটিতোন্মুখ হৃদ্‌পদ্মে' স্থাপন করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন, সেদিন সুখ আপনি আসিয়া তাঁহার নিকট ধরা দিল। সত্যের পরশমণিস্পর্শে যেমন অগ্নির অক্ষরে লেখা তাঁহার কলঙ্কচিহ্ন গৌরবচিহ্নে রূপান্তরিত হইল, ত্যাগের উজ্জ্বল জ্যোতিসম্পাতে তেমনই তাঁহার সকল ব্যর্থতার গ্লানি সার্থকতার শ্রীমণ্ডিত হইল।

মানবজীবনের সুখদুঃখের প্রশ্নের সহিত আর একটি প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; প্রশ্নটি এই: এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে যে শক্তি রহিয়াছে সে কি 'দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য' অন্ধ জড়শক্তি, না বিশ্বনিয়ন্তা পরমপুরুষ যেমন শক্তিমান্ তেমনই দয়ার আধার? আলোচ্য উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষে প্রশ্নটির যেন একটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রজনী একই প্রসঙ্গে একবার বলিতেছে, "ঐশিক নিয়ম বিচিত্র—মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে—আমরা যাহাকে পীড়ন বলি—ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে।" পরমুহূর্ত্তেই সে বলিতেছে, "সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্য-শূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্ষুণ্ণ রেখায় অহরহ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সেই

১ ধর্ম্মতত্ত্ব ৭, ৩০ পৃঃ।
২ ঐ ১১, ৬৬ পৃঃ।

পিষিয়া মরিবে।" (১৬, ২২ পৃঃ)। রজনীর তৎকালীন মানসিক অবস্থায় স্বাভাবিক হইলেও এই উভয় উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষণীয়। প্রথম উক্তি বিশ্বাসের কথা; রজনীর পক্ষে ইহা তাহার সংস্কারসঞ্জাত। দ্বিতীয় উক্তি রজনীর সহজ বিচারবুদ্ধিপ্রসূত। মনে হয় প্রশ্নটি বঙ্কিমের মনে যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য তাহার দ্যোতক। বিশ্ব-স্রষ্টার স্বরূপ যাহাই হউক, বঙ্কিমের শিল্পীর দৃষ্টিতে তিনি 'দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য'। মানবজীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার মধ্যে যদিই সৃষ্টিকর্ত্তার কোনরূপ নিগূঢ় উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে, শিল্পী হিসাবে তাহা তাঁহার বিচারের বিষয় নহে। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, কুন্দ ও দলনীর পরিকল্পনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার ভগবদ্‌ভক্ত মন মানবজীবনে দুঃখ ও আপাতব্যর্থতার মধ্যে ভগবানের ন্যায়বিচার, তাঁহার মঙ্গল বিধান তথা তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিয়াছে। 'চন্দ্রশেখরে' পাশাপাশি এই উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই কারণে বঙ্কিমের ভাবধারার ক্রমবিকাশের দিক দিয়া এই উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। 'চন্দ্রশেখরে' যেমন দলনীর চিত্র রহিয়াছে, তেমন শৈবলিনীর জীবনে দেখিতে পাই তাঁহার দুঃখ যেমন তাহার কৃতকর্ম্মের শাস্তি, তেমন সেই দুঃখের ভিতর দিয়াই সে চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিতে শিখিয়া জীবনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'রজনী'তে অমর-নাথের জীবনেও দেখিতে পাই তাঁহার দুষ্কৃতি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেও দুঃখের আঘাত পাইয়াই তিনি অমৃতের পিয়াসী হইলেন। কিন্তু প্রতাপের সহিত বিবাহ হইলেই শৈবলিনীর পক্ষে ভাল হইত, না এই যে নানা দুঃখের ভিতর দিয়া সে চন্দ্রশেখরকে চিনিয়াছে এবং তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছে, ইহাই তাহার পক্ষে ভাল হইয়াছে? অমরনাথ লবঙ্গকে লইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে পারিলেই তাঁহার পক্ষে সুখের হইত, না বারংবার আঘাত পাইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াই তিনি সুখী হইলেন?—এ সকল প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে; যুক্তি দ্বারা কোনরূপ মীমাংসা সম্ভব নহে। রজনীর ক্ষেত্রে বঙ্কিম সহজবোধ্য এবং সহজগ্রাহ্য, কিন্তু একটুকু কাঁচা পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন; রজনীর জীবনে তিনি সাধারণ মানুষের সাধারণ সুখদুঃখের মাপকাঠিতে ভগবানের ন্যায়বিচার তথা তাঁহার করুণা যাচাই করিয়া নিয়াছেন: রজনী শচীন্দ্রকে পাইয়াছে, তাহার অন্ধ চক্ষেও দৃষ্টি পাইয়াছে। যে উপায়ে বঙ্কিম শচীন্দ্রকে তাহার প্রতি প্রণয়াসক্ত করিয়াছেন তাহাতে আর্টের দাবী যে অক্ষুণ্ণ থাকে নাই পূর্ব্বেই তাহার আলোচনা

করিয়াছি। যে উপায়ে তিনি রজনীর অন্ধ চক্ষে দৃষ্টিদান করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে অনুরূপ কোন অভিযোগের কারণ নাই। ভবানন্দ কর্তৃক কল্যাণীর এবং মহাপুরুষ চিকিৎসক কর্তৃক জীবানন্দের প্রাণরক্ষার ন্যায় ইহা অধুনা-লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি বঙ্কিমের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন। কিন্তু রজনীকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ পন্থা অবলম্বনের মধ্যে যেন কিছুটা কৃত্রিমতার ছাপ রহিয়াছে।

'রজনী'র গল্পাংশ রজনীর কাহিনী ও লবঙ্গের কাহিনী—এই দুইটি আখ্যায়িকা লইয়া গঠিত। উভয় কাহিনীই পরস্পরের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে এবং উভয় কাহিনীতেই অমরনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। অমরনাথের সহিত অতীতের সম্পর্কের পটভূমিকায় বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রকে লইয়া লবঙ্গের দাম্পত্যজীবন যেমন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে, তেমন তাঁহার সংস্পর্শে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া লবঙ্গ ও রজনীর চরিত্র পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছে।

শচীশচন্দ্র বলেন, অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে হীরালাল কোন সমসাময়িক পত্রিকাসম্পাদককে লক্ষ্য করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে।[১] সন্ন্যাসী ঠাকুর যুক্তিবাদী দার্শনিক এবং প্রাচীন আর্য্যবিদ্যা সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতবাদের পরিবেশক। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিম শুধু যে মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে, তিনি নিজেই অন্ততঃ একটি মন্ত্র জানিতেন এবং ইহার শক্তি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।[২]

প্রধান চরিত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে শচীন্দ্রের চরিত্র প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইয়াছে। এই চরিত্রটি সম্বন্ধে অপর এক প্রশ্ন এই যে, শচীন্দ্রের মত উচ্চ-শিক্ষিত, উদারচরিত্র যুবক গোপালের এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে তাহার সহিত রজনীর বিবাহের উদ্যোগ করিলেন কেমন করিয়া? ইহার উত্তর আংশিকভাবে শচীন্দ্র নিজেই দিয়াছেন: রজনী 'ইতরপ্রকৃতিবিশিষ্ট' না হইলেও 'ইতরবৃত্তিপরায়ণ', তাহাতে সে অন্ধ; এমত অবস্থায় কোন্ সুপাত্র তাহাকে বিবাহ করিবে? সুতরাং 'দুশ্ছেদ্য কণ্টক-কাননমধ্যে যত্নপালনীয় উদ্যানপুষ্পের জন্মের ন্যায়' রজনী যখন পুষ্পবিক্রেতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন 'কণ্টকাবৃত হইয়াই ইহাকে মরিতে হইবে।' কিন্তু এ ত গেল একদিকের যুক্তি এবং রজনীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভাল বর সম্ভব নহে,

১ বঙ্কিম-কাহিনী, ৫৬-৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২ ৺কালীনাথ দত্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' দ্রষ্টব্য—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ২৪২-৪৩ পৃঃ।

ইহা বুঝিলাম। কিন্তু নিরাপরাধিনী চাঁপার স্কন্ধে সপত্নীর বোঝা চাপাইবার সঙ্গত বা অসঙ্গত কোনরূপ কৈফিয়তই শচীন্দ্র দিতে পারেন নাই বা দেবার চেষ্টা করেন নাই; হয়ত ইহার জন্য কোন কৈফিয়তের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বহুবিবাহের পক্ষপাতী নহেন (৩।৫, ৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য); কিন্তু তিনি যে প্রতিবেশে গড়িয়া উঠিয়াছেন, সেখানে বহুবিবাহ দূষণীয় বা নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইত না; পক্ষান্তরে তাঁহার মাতা সপত্নীর সংসারে সুখেই দিন কাটাইতেন। এমত অবস্থায় চাঁপার দিক দিয়া যে কোনরূপ আপত্তি উঠিতে পারে হয়ত এরূপ সন্দেহ তাঁহার মনে আসে নাই; আসিলেও তিনি তাহাতে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। দূষণীয় হইলেও ইহা তাঁহার প্রতিবেশের অবশ্যম্ভাবী কুফল।

অমরনাথের চরিত্রের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ এই যে, তাঁহার চিন্তাধারার মধ্যে বঙ্কিমের বিশিষ্ট চিন্তাধারার ছাপ রহিয়াছে। অমরনাথের ন্যায় বঙ্কিম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। অমরনাথের ন্যায় তিনিও 'বকাবকি লেখালেখি'—'সোসাইটি, ক্লব, এসোসিয়েসন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রিজলিউশ্যন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন' প্রভৃতি সম্ভাদরের সমাজসেবা ও দেশসেবার পক্ষপাতী ছিলেন না।[১] অমরনাথের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, "আমি চাই কি? মনুষ্যই চায় কি?" (২।৩, ৩২ পৃঃ)। ইহা বঙ্কিমের অন্তরের প্রশ্নের প্রতিধ্বনি। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' গুরুর ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন: 'অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব?" "লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।' এবং জীবনব্যাপী সাধনার ফলে বঙ্কিম যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা এই: বৃত্তিসমূহের ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। তিনি বলিতেছেন: "জীবন লইয়া কি করিব?" এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই এক মাত্র সুফল।'[২] অমরনাথ এই সত্য পুরাপুরি উপলব্ধি

১ অহিফেনপ্রসাদে কমলাকান্ত ভ্রমরের গুণ গুণ শব্দের মধ্যে যে বাণী শুনিতে পাইলেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি শুনিলেন, ভ্রমর বলিতেছে, "তোমাদের জাতির ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না।...একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।"—বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব: কমলাকান্ত, ৯৫ পৃঃ।

২ ধর্ম্মতত্ত্ব ১১, ৬৮-৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

করিতে না পারিলেও, তিনি ইহার আভাস পাইয়াছেন।[১] যেদিন তিনি 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চারাচরং তস্মৈ নমঃ' বলিয়া তাঁহাকেই নিজের 'কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ' উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, সত্যের আলোকে সেদিন তাঁহার জীবনপথ উদ্ভাসিত হইল, তাঁহার আর কোন সমস্যা রহিল না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিছুদিনের জন্য জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার সহিত বঙ্কিমের মনোমালিন্য ঘটে এবং ইহার ফলে ১২৮৩ সালের প্রথম দিকে তাঁহাকে 'বাটি ত্যাগ করিয়া সপরিবারে চুঁচুড়ায় আসিয়া পৃথক ভাবে' বাস করিতে হয়।'[২] এই পারিবারিক অশান্তি ঠিক কখন হইতে আরম্ভ হয় জানা নাই, তবে 'রজনী'র রচনাকালে হয়ত ইহা 'ধূমায়মান বহ্নিভাবে জ্বলিতেছিল।' এই অনুমান সত্য হইলে মনে হয় অমরনাথের বিষয়-আশয় ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইবার সঙ্কল্পের ভিতর দিয়া পারিবারিক অশান্তিতে বিষয়সম্পত্তিতে বীতশ্রদ্ধ বঙ্কিমের তৎকালীন মনোভাবের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

'রজনী'র 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'রজনী প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে।' প্রধানতঃ অমরনাথের চরিত্রাঙ্কনেই এই পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের অমরনাথ সুপণ্ডিত হইলেও নীচপ্রবৃত্তি, স্বার্থান্বেষী ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ। আমাদের সুপরিচিত অমরনাথ উদারচরিত্র ও পরহিতব্রতী। অমর-নাথের চরিত্রের এই পরিবর্ত্তনের ফলে তাঁহার প্রতি লবঙ্গের এবং বিশেষ করিয়া রজনীর আচরণেও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে এই দুইটি চরিত্রের আচরণের সহিত পার্থক্য লক্ষিত হয়। স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।[৩]

অমরনাথ প্রথম যৌবনে 'দুর্ব্বদ্ধিদোষে' যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহাই

১ 'ধর্ম্মতত্ত্ব' 'রজনী'র অনেক পরবর্ত্তীকালের রচনা। ১২৯১-৯২ বঙ্গাব্দে ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধের আকারে 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়। পরে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে বঙ্কিম ঐ প্রবন্ধগুলিকে 'ভাঙিয়া চুরিয়া এবং কয়েকটি নূতন প্রবন্ধ যোগ করিয়া' 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। মনে হয় 'রজনী'র রচনাকালে বঙ্কিমের মনে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হইলেও, সমগ্র বিষয়টি তখনও দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই।

২ শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী', ১৪৩ পৃঃ ও অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র', ৪৭ পৃঃ ও ২৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩ পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য।

তাঁহার শুভ্র চরিত্রে একমাত্র মসীচিহ্ন। দীর্ঘকাল পরে সংগ্রামের উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে লবঙ্গ তাঁহার সম্মুখীন হইলে উভয় পক্ষে কিছুটা শক্তিপরীক্ষার পর বিজয়ী অমরনাথ যখন স্বেচ্ছায় পথ ছাড়িয়া দিলেন, তখন শেষ বিদায়ক্ষণে তাঁহার সম্বন্ধে লবঙ্গের মনোভাব জানিবার একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইলেও, অমরনাথের আচরণ সর্ব্বত্রই শোভন ও সংযত। কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব পূর্ণতা লাভ করিয়াছে রজনীর প্রতি তাঁহার আচরণের ভিতর দিয়া। অমরনাথ যখন রজনীকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বিষয়ের অধিকারিণী করিলেন, তখন এই 'অন্ধ পুষ্পনারী'র রূপের আকর্ষণেই তিনি তাহাকে বিবাহ করার সঙ্কল্প করিলেন, রজনীর বিষয় তাঁহাকে প্রলুব্ধ করে নাই। পরন্তু, বিষয় পাইয়া রজনী যখন তাঁহারই সম্মুখে লবঙ্গকে তাহার সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল, তখন তাহার চরিত্রের মাধুর্য্য তাঁহাকে চমৎকৃত করিল। এই প্রসঙ্গে অমরনাথ বলিতেছেন, "আহ্লাদে আমার সর্ব্বান্তঃকরণ প্লাবিত হইল......আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, এখন আরও পরিষ্কার বুঝিলাম যে, রমণীকুলে অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন!....আমি ইতিপূর্ব্বেই রজনীর অন্ধ নয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—আজি তাহার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত হইলাম।" (৪।২)।

রজনীর প্রতি অমরনাথের আচরণ সহজ ও সরল। এমন কি, তাঁহার জীবনের মসীলিপ্ত অধ্যায়ের কলঙ্ককাহিনীও তিনি রজনীর নিকট গোপন করিলেন না। সত্য বটে, ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় তিনি লবঙ্গকে রজনীর নিকট ইহা ব্যক্ত না করিতে অনুরোধ করিয়াছেন (৪।২, ৬৬ পৃঃ); কিন্তু পরবর্ত্তী কালে লবঙ্গ তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিলে অনন্যোপায় হইয়াই তিনি রজনীকে এই কাহিনী শুনাইলেন এরূপ অনুমান করিলে তাঁহার প্রতি অন্যায় অবিচার করা হইবে। তিনি লবঙ্গকে স্পষ্টই বলিতেছেন, "তুমি শুনাও বা না শুনাও, আমি স্বয়ং আজি তাহাকে সকল শুনাইব। আমার দোষ গুণ সকল শুনিয়া রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, গ্রহণ করিবে, না করিতে হয়, না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিব না।" (৪।৪, ৭২ পৃঃ)। এ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব তিনি অন্যত্র আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, "আমি চোর! আমার পিঠে, আগুনের অক্ষরে লেখা আছে যে, আমি চোর। যে দিন রজনী সেই অক্ষরে হাত দিয়া, জিজ্ঞাসা করিবে, এ কিসের দাগ—আমি তাহাকে কি বলিব। বলিব কি যে, ও কিছু নহে? সে অন্ধ, কিছু জানিতে পারিবে না। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সংসারে সুখী হইতে চাহিতেছি—তাহাকে আবার

প্রবঞ্চনা করিব! যে পারে, সে করুক, আমি যখন পারিয়াছি, তখন ইহার অপেক্ষাও গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়াছি—করিয়া ফলভোগ করিয়াছি—আর কেন? আমি লবঙ্গের কাছে বলিয়াছিলাম, সকল কথা রজনীকে বলিব, কিন্তু বলিতে মুখ ফুটে নাই। এখন বলিব।" (৫।১, ৭৯ পৃঃ)। অমরনাথ রজনীকে ভালবাসেন বলিয়াই তাহার সহিত প্রতারণা করিতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে, তিনি কোনরূপ দাবী করিলেন না বলিয়াই রজনীর নিকট তাহার দাবী হইল সকল দাবীর ঊর্দ্ধে।

কিন্তু অমরনাথ যে অন্ধ রজনীর প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহাকে লইয়া সংসারী হইবার সঙ্কল্প করিলেন, ইহা কি স্বাভাবিক? শচীন্দ্র পরোক্ষে রজনীর কটাক্ষহীন চক্ষুর মোহিনী শক্তি স্বীকার করিলেও, সুস্থ অবস্থায় তাহাকে বিবাহ করার কল্পনা করেন নাই, বরং এরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন। যাহা সাধারণ অবস্থার সহজ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, অমরনাথের সেরূপ অদ্ভুত খেয়াল হইল কেন? ইহার উত্তর হয়ত এই যে, তিনি নিজেই নিতান্ত খেয়ালী মানুষ এবং ভাবপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এমত অবস্থায় পুষ্পধনু যখন এই 'অন্ধ পুষ্পনারী'র অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিল, তখন তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে ছন্নছাড়া জীবনের গ্রন্থিগুলি একত্র করিয়া রজনীকে কেন্দ্র করিয়া নূতন করিয়া জীবনযাত্রা সুরু করিবার স্বপ্ন দেখিলেন। কিন্তু এরূপ কৈফিয়তের দুর্ব্বলতা অনস্বীকার্য্য; কারণ অমরনাথের সঙ্কল্প সুস্থ মনের পরিচয় দেয় না।

কিন্তু রজনীর রূপে আকৃষ্ট হইলেও সংসার কখনও তাঁহাকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে নাই। সুতরাং তিনি যখন বুঝিলেন, শচীন্দ্র ও রজনী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, তখন রজনীর ক্রন্দন, শচীন্দ্রের ব্যাধি এবং ধূল্যবলুণ্ঠিত লবঙ্গের কাতরতায় তাঁহার অন্তরে এই প্রশ্নই জাগিয়া উঠিল, "রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর; মাঝখানে আমি কে?" (৫।১, ৮১ পৃঃ)। অমরনাথ সহজেই কর্ত্তব্য বাছিয়া লইলেন। যৌবনের প্রথম উন্মাদনার দিনে যে প্রেম লালসার কদর্য রূপে তাঁহার পৃষ্ঠে নিদারুণ কলঙ্কচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল, তাহাই এক শুভ লগ্নে ত্যাগের মহিমাময়ী মূর্ত্তিতে তাঁহার ললাটে বিজয়টিকা পরাইয়া দিল।

রজনী দুঃখী, কারণ রজনী জন্মান্ধ। তাহার জগৎ শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধময়; রূপ যাহা চক্ষে ধরা দেয়, তাহা তাহার কাছে অর্থহীন। কিন্তু রজনী হাসি দিয়া দুঃখ ভুলিবার যাদু জানে; রজনী পরিহাসনিপুণা, যদিও নিঃসঙ্গ বলিয়া তাহার পরিহাস তাহার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রামসদয়

মিত্রের 'সাড়ে চারিটা ঘোড়া—আর দেড়খানা গৃহিণী', বিশেষ করিয়া 'যিনি পুরা একখানি গৃহিণী' তাঁহার বর্ণনায় রজনীর পরিহাসপটুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার স্বয়ম্বরকাহিনীও তাহার কৌতুকপ্রিয়তার নিদর্শন, কিন্তু হাসির ভিতর দিয়া ইহা তাহার অন্তরের দৈন্যের উপর তীব্র আলোকপাত করে।

কিন্তু অন্ধ বলিয়া কি রজনীর সুখ নাই? ফুলের স্পর্শের সৌন্দর্য্য, চৈত্রের ভ্রমর গুঞ্জন, বামাচরণের শিশুকণ্ঠের 'জুজি' সম্বোধন তাহাকে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নলোকে লইয়া যায়। তখন রজনী ভুলিয়া যায় যে, সে অন্ধ, ভুলিয়া যায় যে, তাহার জগৎ অন্ধকারময়।

এমনই করিয়া সুখে দুঃখে তাহার দিন কাটে। সহসা শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর, তাঁহার মদির স্পর্শ তাহার একটানা জীবনস্রোতে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করিল। কি সে 'বীণাধ্বনিবৎ' কণ্ঠস্বর। 'যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি' ফুলের গন্ধময় কি সে 'বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ!' সে স্বরে, সে স্পর্শে রজনী নববসন্তের স্নিগ্ধবায়ুস্পর্শে কুসুমকলির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে অপূর্ব্ব শিহরণ অনুভব করিল। যেদিন শচীন্দ্র তাহার অন্ধ চক্ষে অশ্রু দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া ছোট মার কাছে লইয়া গেলেন, সেদিন—সেইক্ষণে তাহার অনুভূতির বর্ণনা প্রসঙ্গে রজনী বলিতেছে, "যেন একটি প্রভাত-প্রফুল্ল পদ্ম দলগুলির দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—যেন গোলাবের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল! আমার আর কিছু মনে নাই।" (১১৪, ১৭ পৃঃ)।

রজনীর নারীত্বের জাগরণের চিত্র (১১২-৩) করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। শুধু শব্দস্পর্শগন্ধময় জগৎ আর তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে না। রজনী দেখিতে চায়। রজনী দেখিতে চায়, বহুমূর্ত্তিময়ী বসুন্ধরা দেখিতে কেমন? বসুন্ধরার বুকে 'অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট জড় পদার্থসকল' দেখিতে কেমন? সৃষ্টির 'সারভূত, পুরুষজাতি' দেখিতে কেমন? 'তাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন?' 'এই ভূমণ্ডলে রজনীনামে ক্ষুদ্র বিন্দু' তাহাই বা দেখিতে কেমন? রজনী অন্তরমধ্যে বসন্তের পিককাকলি শুনিতে পাইয়াছে, তাহার 'অন্তর বিদীর্ণ করিয়া' বাসনা জাগে, "কে দেখাবি দেখা গো—আমায় রূপ দেখা।" শুধু মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইলেও সে দেখিয়া লয়, "এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার কি—আমি কি—শচীন্দ্র কি?" তাহার আর্ত্ত হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা বিধাতার রুদ্ধ দ্বারপ্রান্ত হইতে বারংবার ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। রজনী ভাবে, "অনন্ত দুষ্কৃতকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্মপূর্ব্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে, আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না?" তাহার

বিদ্রোহী অন্তর বলে, "এ সংসারে বিধাতা নাই, বিধান নাই, পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার নাই।" এইখানেই রজনীর পূর্ব্বরাগের চিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিলোত্তমা ও কুন্দ স্বভাবী (normal) চরিত্র, সুতরাং তাহাদের অন্তরে প্রণয়সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে অপর সকল অনুভূতি ছাপাইয়া প্রেমাস্পদের চিন্তা তাহাদিগকে বিহ্বল করিয়াছে। কিন্তু রজনী জন্মান্ধ, তাই প্রেমাস্পদকে দেখিবার বাসনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজেকে দেখিবার, এই রূপময় জগৎকে দেখিবার বাসনা জাগিয়াছে, তাই অভ্যাসবশে যে দুঃখকে সে এতদিন নীরবে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, সেই অন্ধত্বের দুঃখকে সে আর তেমনই নীরবে স্বীকার করিতে পারিতেছে না।

রজনীর চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। এবং তাহার আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্ত্তনের পর হইতেই আমরা তাহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। 'অন্ধ পুষ্পনারী' বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে, কিন্তু বিষয়ে তাহার স্পৃহা নাই। রজনী ভোলে নাই, তাহার দুঃখের দিনে লবঙ্গ 'চারি আনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত'; রজনী লবঙ্গকে বিষয় দানপত্র লিখিয়া দিতে চাহে। শচীন্দ্রের প্রতি ভালবাসা তাহার এই সঙ্কল্পকে পরোক্ষে প্রভাবিত করিয়াছে, এরূপ সম্ভাবনা একেবারে নাকচ করা চলে না; কিন্তু ইহার আসল কারণ লবঙ্গের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা।

বিষয়প্রাপ্তির পর লবঙ্গ ও রজনীর সাক্ষাৎকারের চিত্র (৪।২-৩) এই উভয় চরিত্রের উপর আলোকপাত করে। রজনী তাহার নিজের দৃষ্টিতে লবঙ্গের নিকট আজিও সেই 'কাণা ফুলওয়ালী', তাই সে 'ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণ বস্ত্র পরিয়াছিল, লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না।' আর লবঙ্গ? অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তন তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ম্লান করিতে পারে নাই। লবঙ্গলতা 'হাসিতে উছলিয়া' পড়িতেছিলেন, রজনীই তাঁহাদের অবস্থাবিপর্য্যয়ের মূলে, এই অনুভূতির ফলে 'রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।' তাঁহাদের অদৃষ্টচক্র যে একেবারেই ঘুরিয়া গিয়াছে এ সত্য যেন উভয়ের কেহই স্বীকার করিতে চাহেন না।

প্রণয় ও কর্ত্তব্যের সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়াই রজনীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার চরম পরীক্ষা। যে সৌভাগ্য তাহার স্বপ্নের অতীত, লবঙ্গ যখন সেই সৌভাগ্য তাহার হাতে তুলিয়া দিতে চাহিলেন, 'রজনী দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল, অন্ধ নয়ন মুদিল। তারপর তাহার মুদিত নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল—চক্ষের জল আর ফুরায় না।' লবঙ্গের স্নেহার্দ্র

কণ্ঠের প্রশ্নের উত্তরে রজনী 'কাঁদিতে কাঁদিতে' তাঁহার নিকট শচীন্দ্রের প্রতি তাহার প্রণয়কাহিনী জ্ঞাপন করিল। কিন্তু প্রণয়ের আকর্ষণ তাহাকে আত্মবিস্মৃত করিল না; প্রাণদাতার প্রতি কর্তব্য স্মরণ করিয়া রজনী লবঙ্গের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। যুক্তির দিক দিয়া এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী হয়ত সমর্থনযোগ্য নহে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে ত্যাগস্বীকার রহিয়াছে তাহা সকল যুক্তিতর্কের ঊর্দ্ধে।

অমরনাথ যখন তাহার নিকট স্বীয় কলঙ্ককাহিনী ব্যক্ত করিলেন (৫।১), তখনও তাহার কোন দ্বিধা নাই। রজনী বলিতেছে, "আপনি যদি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন—আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি আপনার দাসী হইব।" কিন্তু রজনী প্রবঞ্চনা জানে না, অমরনাথকে সে প্রতারিত করিল না। যে কথা সে তাঁহার নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, তাহারই ইঙ্গিত করিয়া রজনী তাঁহাকে লবঙ্গের নিকট হইতে সকল কথা জানিয়া লইতে অনুরোধ করিল। এক্ষেত্রে রজনীর কার্য্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দুইটি জিনিষ স্মরণ রাখিতে হইবে: এক, অমরনাথের স্বীকারোক্তির ফলে রজনীর স্বীকারোক্তি অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও, ইহাই তাহার কার্য্যের প্রেরণা যোগায় নাই, কারণ অমরনাথ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই স্বীয় স্বীকারোক্তির ভণিতাস্বরূপ রজনী বলিয়াছে, "আপনি এত অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আমি তাহার যোগ্য নহি।" দুই, অমরনাথ তাহার দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইলে হয়ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন এবং তাহা হইলে শচীন্দ্রকে গ্রহণ করার কোনরূপ নৈতিক প্রতিবন্ধক থাকিবে না, এরূপ আশা অন্ততঃ রজনীর চেতন মনকে প্রলুব্ধ করে নাই। লবঙ্গ ও অমরনাথের প্রতি তাহার আচরণে, বিশেষ করিয়া লবঙ্গের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকালে তাহার আচরণে এমন এক সহজ সারল্য ও আন্তরিকতা রহিয়াছে যে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এরূপ কোন চাল রজনীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

প্রধানতঃ রজনীর চরিত্রবিকাশের জন্যই লবঙ্গের চরিত্রের পরিকল্পনা। কিন্তু রজনীকে বাদ দিলেও এই রহস্যনিপুণা, সদাহাস্যময়ী নারীর আখ্যায়িকার একটি নিজস্ব সৌন্দর্য্য রহিয়াছে। লবঙ্গ বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের 'দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গরবিনী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী।' তরুণী ভার্য্যার প্রতি বৃদ্ধ স্বামীর আসক্তির আতিশয্য বুঝিলাম। কিন্তু লবঙ্গের পক্ষে বৃদ্ধ স্বামীর গৃহে, বিশেষ করিয়া

যেখানে রুগ্না ও অবহেলিতা হইলেও বয়োজ্যেষ্ঠা সপত্নী বর্ত্তমান সেখানে, নিজেকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া সম্ভব হইল কেমন করিয়া? হয়ত পারিপার্শ্বিকের শিক্ষা তাঁহাকে কিছুটা সাহায্য করিয়া থাকিবে, কিন্তু ইহা প্রশ্নটির সদুত্তর নহে। আসল কথা, লবঙ্গ জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাঁহার সরসতা নষ্ট করিতে পারে নাই।[১] স্বামীর সহিত তাঁহার বয়সের তারতম্য এত বেশী যে এক্ষেত্রে দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য্যের প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু লবঙ্গ বৃদ্ধ স্বামীর সহিত সম্পর্ক সহজ করিবার যাদু জানেন—নিত্য তাঁহাকে ফুলের সাজে সাজাইয়া রসে রঙ্গে বিচিত্র প্রেমাভিনয়ে তাঁহার দিন কাটে। সপত্নীপুত্রের প্রতিও তাঁহার অপরিসীম স্নেহ। একথা সত্য যে, দুঃখে পড়িয়া অপর সকলের ন্যায় লবঙ্গও শচীন্দ্রকে অন্ধ রজনীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং শচীন্দ্র অমত করিলে তাঁহার মত করাইবার জন্য সন্ন্যাসী ঠাকুরের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে লবঙ্গ নিজের সুখদুঃখের কথা ভাবেন নাই; সমগ্র পরিবারের সুখদুঃখের চিন্তা করিয়াছেন। তাছাড়া রজনীর প্রতি তিনি যতই সহানুভূতিশীলা হউন, শচীন্দ্র তাহাকে বিবাহ করিয়া যদি পুনরায় কোন চক্ষুষ্মতীর পাণিপীড়ন করেন, তাহা হইলে তাহা যে কোনরূপ গর্হিত কার্য্য হইবে, তিনি এরূপ মনে করেন নাই। লবঙ্গ শচীন্দ্রকে স্পষ্টই বলিতেছেন, "বাবা—যদি পদ্মচক্ষুই খোঁজ, তবে তোমার আর একটা বিবাহ করিতে কতক্ষণ?" (৩।৫)। এরূপ মনোবৃত্তি যতই দূষণীয় হউক, ইহা লবঙ্গের প্রতিবেশের কুফল। এবং শিক্ষিত শচীন্দ্রও যে ইহার সংক্রামকতা সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু তাই বলিয়া দারিদ্র্যের আশঙ্কা তাঁহার আভিজাত্য নষ্ট করিতে পারে নাই। রজনী যখন উপযাচিকা হইয়া তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি দান

---

১ বিষয় হারাইবার পর রজনীকে সঙ্গে লইয়া লবঙ্গ যখন প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে অমরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন তখনকার ঘটনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে অমরনাথের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি লিখিতেছেন: 'লবঙ্গ হাসিতে উথলিয়া পড়িতেছিল—রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।...আমি অবাক্ হইয়া নিস্পন্দ শরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্রচরিত্রা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম। ললিতলবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান্ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি। আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি। অথচ আমি জানি, লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই।' (৪।২)।

করিতে চাহিল তখন সেই সঙ্গে শচীন্দ্রকে বিবাহ করিতে সম্মত না হওয়ায়, লবঙ্গ সে দান গ্রহণ করিলেন না। রজনী শচীন্দ্রকে স্বামীত্বে বরণ করিলে তাহার দত্ত সম্পত্তি তাহারই থাকিবে, সুতরাং সে দান গ্রহণে অমর্য্যাদা নাই; নহিলে—লবঙ্গ ভাবিল, "রজনীর দান লইব? ভিক্ষা মাগিয়া খাইব সেও ভাল।" (৪।৩, ৬৯ পৃঃ)। ✓

এ পর্য্যন্ত লবঙ্গের চরিত্রে কোন প্রকার জটিলতা নাই এবং অমরনাথের সহিত আকস্মিক সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার এই পরিচয়েই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কিন্তু ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। অমরনাথ আসিয়া তাঁহার গোপন হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিলে তাহাতে যে করুণ সুর বাজিয়া উঠিল, তাহারই ভিতর দিয়া আমরা লবঙ্গের সত্যকার পরিচয় পাই। অমরনাথ লবঙ্গের বাল্যপরিচিত, তাহাতে একদিন তাঁহাদের বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এমত অবস্থায় যাহাকে তিনি ভাবী স্বামী বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচিত মুখখানি যে সে সময় তাঁহার মনের উপর কিছুটা ছাপ রাখিয়া থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক। সহজ অবস্থায় তিনি তাহাকে ভুলিতে পারিতেন কিনা জানি না, কারণ মানব মন সামাজিক বা নৈতিক অনুশাসনের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। কিন্তু ইহার পর এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে অমরনাথকে ভুলিয়া যাওয়া লবঙ্গের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইল। 'বালিকাবুদ্ধিতে' তিনি অমরনাথের প্রতি যে শাস্তি বিধান করিলেন (৪।৪ দ্রষ্টব্য), প্রতিক্রিয়ায় অনুশোচনার ভিতর দিয়া তাহাই তাঁহার অন্তরে এই প্রেমোন্মত্ত যুবকের স্মৃতি সজীব রাখিল। অমরনাথের প্রতি কঠোর হওয়া তৎকালে লবঙ্গের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও, তিনি 'স্বহস্তে' তাঁহার প্রতি যে শাস্তি বিধান করিলেন, পরিহাসপ্রিয়া বালিকা[১] লবঙ্গের পক্ষে অমরনাথকে লইয়া তাহা এক অতি বড় নির্ম্মম পরিহাস, এবং অবিবেচনার

'কালের শীতল প্রলেপে' যখন তাঁহার 'হৃদয়ক্ষত ক্রমে পুরিয়া উঠিতে লাগিল' এমন সময়, অর্থাৎ গৃহত্যাগের বেশ কিছুদিন পরে অমরনাথ রজনীর সন্ধান পাইলেন। আর একদিক দিয়াও ইহার হিসাব পাওয়া যায়। অমরনাথ বলিতেছেন, 'কয় বৎসর হইতে', তিনি 'আপনা আপনি' প্রশ্ন করিতেছিলেন, তিনি কি খোঁজেন—এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই গৃহত্যাগের পরই প্রথম তাঁহার মনে উঠিয়া থাকিবে। অতএব অমরনাথের গৃহত্যাগের অন্ততঃ ৩।৪ বৎসর পরে তিনি রজনীর সন্ধান পাইয়াছেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। ইহা রজনী যে সময় হইতে তাহার 'কথা' আরম্ভ করিয়াছে তাহার অল্প পরের কথা এবং ঐ সময় রজনীর হিসাব মত লবঙ্গের বয়স ১৯ বৎসর। (রজনী ১।২, ৭ পৃঃ)। অতএব অমরনাথের প্রতি শাস্তিবিধানকালে লবঙ্গের বয়স বড়জোর ১৫।১৬ বৎসর।

নিদর্শন হইলেও ইহা নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য দেয় না। পক্ষান্তরে, লবঙ্গ যে 'দয়া করিয়া' অমরনাথের মুখের কাপড় খুলিলেন না,[১] তাঁহার সেই দয়াও অর্থহীন নহে। লবঙ্গ অমরনাথকে আশু লজ্জার হাত হইতে রক্ষা করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পৃষ্ঠে যে কি অনপনেয় কলঙ্কচিহ্ন চিরদিনের জন্য আঁকিয়া দিলেন, সেদিন তিনি তাহা না বুঝিলেও তাহার স্মৃতি ভুলিবার নহে। আখ্যায়িকায় অমরনাথ ও লবঙ্গের সাক্ষাৎকারের ইহাই পটভূমিকা।

অমরনাথ রজনীর বিষয় উদ্ধার করিয়া তাহাকে বিবাহ করার সঙ্কল্প করিলে লবঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপেই আসরে অবতীর্ণ হইলেন। লবঙ্গ বলিতেছেন, "আমার ছেলের বৌ করিব বলিয়া আমি যে কন্যার সম্বন্ধ করিতেছি, অমর-নাথ কি না তাহাকে বিবাহ করিতে চায়? অমরনাথের এ বড় স্পর্দ্ধা! আমি একবার অমরনাথকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি--আর একবার না হয় কিছু দিব। আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে অমরনাথের নিকট হইতে এই রজনীকে কাড়িয়া লইয়া, আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব।" (৪।১)। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প যাহাই হউক, বালিকা বয়সে তাঁহার অদ্ভুত 'দয়া'র ভিতর অমরনাথের প্রতি আকর্ষণের যে ক্ষীণ আভাস রহিয়াছে, তাঁহার সহিত এই সময়ের প্রথম সাক্ষাতেই (৪।২-৪) তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। লবঙ্গ পরিহাসচ্ছলে পাহারাওয়ালার ভয় দেখাইলে অমরনাথ যখন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "বিষয় রজনীর; আমাকে ধরাইয়া দিলে কি হইবে? যাহার বিষয়, সে ভোগ করিতে থাকিবে।"--তখন লবঙ্গ বলিলেন, "তুমি কস্মিন্ কালে স্ত্রীলোক চিনিলে না।" অমরনাথ না বুঝুন, লবঙ্গের এই একটুকু কথার ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তরের অনেক কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহারই কিছু পরে দরদী লবঙ্গের নিকট 'কাঁদিতে কাঁদিতে....অন্ধের রূপোন্মাদ' বর্ণনা করিয়া রজনী যখন সহসা প্রশ্ন করিল, "ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি?"—তখন বাহিরে সে প্রশ্ন পরিহাসচ্ছলে উড়াইয়া দিলেও, রজনীর উদ্বেলিত হৃদয়ের তরঙ্গের আঘাত লবঙ্গের হৃদয়ে অনুরূপ তরঙ্গ তুলিল। প্রকাশ্যে তিনি যাহাই বলুন, মনে মনে বলিলেন, "কাণি! তুই ভালবাসার কি জানিস্! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।" (৪।৩, ৬৯ পৃঃ)। এইরূপ ছোটখাটো স্বগতোক্তির ভিতর দিয়াই দক্ষ শিল্পী বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেন।

১ পিতৃগৃহে লবঙ্গ নিশ্চয়ই অত্যধিক আদরে ছিলেন, নহিলে তিনি যে শাস্তি দিন না কেন, অপরে তাঁহার কথায় চোরের মুখের কাপড় না খুলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিত না।

কিন্তু অন্তরের কথা যাহাই হউক, বাহিরে লবঙ্গ অমরনাথের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই তিনি যখন দেখিলেন, রজনী তাঁহাকে বিষয় ছাড়িয়া দিতে চাহে, তখন তাঁহার মনে হইল অতি সহজেই বুঝি জয়লাভ হইল, কারণ তাঁহার ধারণা (এবং এরূপ ধারণা খুবই স্বাভাবিক) যে, বিষয়ের লোভেই অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার চক্ষে বিত্তহীন অন্ধ রজনীর কোন আকর্ষণ থাকিতে পারে না। কিন্তু অমরনাথ যখন রজনীর প্রস্তাবে রুষ্ট বা দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, 'বরং প্রফুল্ল' হইলেন এবং কোনক্রমেই তাহাকে বিবাহ করার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন অগত্যা লবঙ্গকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের ভয় দেখাইতে হইল। কিছু পূর্ব্বেও অমরনাথ যখন অনুরোধ করিয়াছেন, "যাহা জান, তাহা যদি অন্যের কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না।",—তখন 'দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রূভঙ্গী' করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি কি ঠক! যে তোমার স্ত্রী হইবে, তাহার কাছে তোমার নামে ঠকাম করিবার জন্য কি আমি তাহার বাড়ীতে আসিয়াছি?" এক্ষণে দর্পিতার দর্প চূর্ণ হইল, পুনরায় অমরনাথকে তাঁহার কুকীর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে বলিতে হইল, "লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আমি রজনীকে ডাকিয়া এই গল্প শুনাইয়া যাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনাইব না। তুমি রজনীর যোগ্য নহ, রজনীকে বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইও না। যদি ক্ষান্ত না হও, তবে সুতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব।" বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা একটুকু জেদী প্রকৃতির[১] এবং লবঙ্গলতার এই মূর্ত্তি রামসদয় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী গর্ব্বিণী 'ললিতলবঙ্গলতা'র পাত্রভেদে রূপান্তর মাত্র।

কিন্তু অমরনাথের চরিত্রের তেজের নিকট যখন লবঙ্গের ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ ম্লান হইল, যখন ভীত না হইয়া অমরনাথ বলিলেন, তিনি নিজেই রজনীকে সকল কথা জানাইবেন, তখন লবঙ্গকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। রাম-সদয় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যা পরাজয়ে অভ্যস্ত নহেন, কিন্তু আজ তিনি 'হারিয়া, মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ করিতে করিতে, হর্ষবিষাদে' গৃহে ফিরিলেন। অমরনাথ যেমন লবঙ্গের শুধু নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইয়াছেন, লবঙ্গও তেমনই অমরনাথের শুধু দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়াছেন। আজ লবঙ্গ

১ অমরনাথের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্কল্প, 'আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে অমরনাথের নিকট হইতে এই রজনীকে কাড়িয়া লইয়া, আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব।' (৪।১) এবং শচীন্দ্র রজনীকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলে তাঁহার দম্ভোক্তি, "তুমিও যাই বল না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়েহই, তবে তোমায় এ বিবাহ দিবই দিব।" (৩।৫) স্মরণীয়।

প্রথম বুঝিলেন, অমরনাথকে তিনি যে রূপে কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার যথার্থ রূপ নহে। তাই পরাজয়েও তাঁহার আনন্দ।

লবঙ্গের চরিত্রবল যতই দৃঢ় হউক, অমরনাথের শেষ বিদায়ক্ষণে (৫।৩) তাঁহাকে একটুকু বিচলিত দেখিতে পাই। ইহার কারণ এই যে, একে অমরনাথের উদারতা তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে, তাহাতে এই উদারতার অনুভূতির সহিত, তাঁহারই জন্য অমরনাথ দ্বিতীয়বার সংসার করিবার আশায় নিরাশ হইলেন, এই অনুভূতির মিশ্রণের ফলে, তাঁহাকে তাঁহার ক্ষণিকের ভুলের জন্য শাস্তি দিতে যাইয়া তিনি অমরনাথের প্রতি কতখানি অবিচার করিয়াছেন তাহার চেতনাবোধ আজ লবঙ্গকে নূতন করিয়া পীড়া দিতেছে। এ অবস্থায় তিনি যদি সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত পাষাণে খোদিত দেবতার ন্যায় পূজা পাইতে পারিতেন, কিন্তু মানবী বলিয়া শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন না।

অমরনাথ তাঁহার নিকট বিদায় লইতে আসিলে লবঙ্গ তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগের সঙ্কল্পের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমরনাথ আজ নিঃস্ব, তাছাড়া লবঙ্গের উপর হয়ত তাঁহার একটুকু অভিমান রহিয়াছে। তিনি উত্তর করিলেন, "যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত কেহ নাই।" একথা, বিশেষ করিয়া এই সময়ে, লবঙ্গকে স্পর্শ করিল, তাঁহাকে একটুকু অসতর্ক করিল, লবঙ্গ বলিলেন, "যদি আমি বারণ করি?" এ প্রশ্নে অমরনাথের পুঞ্জীভূত অভিমান উথলিয়া উঠিল; তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, "আমি তোমার কে যে বারণ করিবে?" লবঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলেন। যে কথা তিনি মনের কোণে সঙ্গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাই সহসা আত্মপ্রকাশ করিল, তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—।" ইহাই লবঙ্গের প্রথম ও শেষ আত্মবিস্মৃতি।

অমরনাথ সংসারের হিসাবনিকাশ চুকাইয়া দিবার সঙ্কল্প লইয়া 'শিষ্যা'-জ্ঞানে লবঙ্গকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেও এতক্ষণ তাঁহার কথায় যদি অভিমানের ঝাঁজ ছিল, এক্ষণে লবঙ্গের দুর্ব্বলতার ইঙ্গিত তাঁহার মনের অনুরূপ দুর্ব্বলতন্ত্রীতে আঘাত করিয়া তাঁহার অভিমান দূর করিল। 'ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি লোকান্তর থাকে, তবে?" লবঙ্গের

মনের গোপন রহস্য টানিয়া বাহির করিবার এই যে প্রয়াস, ইহা ক্ষমার্হ দুর্ব্বলতা।'[১]

কিন্তু লবঙ্গ এতক্ষণে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করিয়াছেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

অমরনাথ একথা বিশ্বাস করেন; বিশ্বাস করেন বলিয়াই একটি সমস্যার তিনি মীমাংসা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। লবঙ্গ যদি সত্যই তাঁহার 'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী', তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গে চিরদিনের জন্য কলঙ্কচিহ্ন আঁকিয়া দিলেন কেন? প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্ন শুধু অমরনাথের নহে, এ প্রশ্ন বঙ্কিমের পাঠকবর্গের। সুকৌশলী শিল্পী অমরনাথের মুখে স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন তুলিয়া লবঙ্গের উত্তরের ভিতর দিয়া ("তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকাবুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম।") আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার অসমঞ্জস আচরণের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

অতীতের সম্বন্ধে উভয়ের বোঝাপড়া হইল। কিন্তু অমরনাথের একটি দুঃখ রহিয়া গেল। লবঙ্গ তাঁহাকে চরিত্রহীন লম্পট বলিয়া জানিয়াছেন, ইহাই কি তাঁহার একমাত্র সত্য পরিচয়? তিনি বড় দুঃখেই বলিতেছেন, "আমি আর আসিব না—আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু তুমি যদি কখন ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র —স্নেহ করিবে?"

এই সময়ের প্রশ্নোত্তর একটুকু বিস্তারিত উদ্ধৃত করিতেছি:

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

আমি [অমরনাথ]। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু

১ লবঙ্গের বাহিরের আচরণ যেরূপ হউক, তিনি যে তাঁহাকে ভালবাসেন, মনে হয় এ সন্দেহ অমরনাথের বরাবরই রহিয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্যহীন জীবনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে অমরনাথ বলিতেছেন, "প্রণয়? স্নেহ? ভালবাসা? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ—ভালবাসাই দুঃখ। সাক্ষী লবঙ্গলতা।" (২।৩, ৩৩ পৃঃ)। অবশ্য এই উক্তির এরূপ ব্যাখ্যা করা চলে যে, ভালবাসা যে দুঃখ এবং ইহার অভাবই সুখ অমরনাথের জীবনেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং লবঙ্গ তাহার সাক্ষী। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়।

স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।'[৮]

এস্থলে ক্ষণপূর্ব্বের দুর্ব্বলতার পার্শ্বে আপাতদৃষ্টিতে লবঙ্গের হৃদয়-হীনতা লক্ষণীয়। নিজের দুর্বলতাকে লবঙ্গ কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না। এই কারণেই অমরনাথের যে অপরাধ সম্বন্ধে কিছুপূর্ব্বেই উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে তাহারই উল্লেখপূর্ব্বক লবঙ্গের এই অনাবশ্যক রূঢ় আচরণ। এবং মনে হয় লবঙ্গের পক্ষে ইহা আত্মরক্ষার বর্ম্মস্বরূপ; যতদিন তিনি অমরনাথকে কুচরিত্র বলিয়া জানিতেন, ততদিন আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই; কিন্তু অমরনাথের চরিত্রহীনতা অপেক্ষা তাঁহার মহত্ত্ব লবঙ্গের পক্ষে অধিকতর ভয়ের কারণ।[১] কিন্তু এ শাস্তি প্রকৃতপক্ষে অমরনাথকে নহে, এ শাস্তি তাঁহার নিজেকে। এবং পাষাণের কাঠিন্য ভেদ করিয়া যেমন প্রস্রবণের শীতল বারিধারা নির্গত হয়, লবঙ্গের হৃদয়হীন উক্তির মধ্যেও 'ইহলোকে' এই একটি কথা সকল নিষেধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অন্তরের পরিচয় দেয়।[২]

নিজেকে শাস্তি দিতে যাইয়া লবঙ্গকে যে অমরনাথের প্রতি এতখানি কঠোর হইতে হইয়াছে, এ ব্যথা লবঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। অমরনাথ লক্ষ্য করিলেন, 'লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।' তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না।" কিন্তু সুপণ্ডিত অমরনাথ সত্যই যদি লবঙ্গের অকথিত কথা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে লবঙ্গ তাঁহার কথা বুঝিলেন না তাঁহার এরূপ ক্ষোভের কারণ থাকিত না।[৮]

---

১ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে লবঙ্গের এক উক্তি এই ধারণার পরিপোষক। তখনও লবঙ্গ অমরনাথের পূর্ণ পরিচয় পান নাই; তিনি অবিশ্বাসী নহেন, তাঁহার এইটুকু পরিচয় পাইয়াই লবঙ্গ মনে মনে বলিতেছেন, "অমরনাথ অবিশ্বাসী থাকিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত? কোন্ মূর্খে একথা বলিবে?" (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮২, ২৯৪ পৃঃ)। কোন মুর্খে একথা না বলিলেও তাঁহার নিজের মনেই যে এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইহাই তাঁহার দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয়।

২ লবঙ্গের পতিনিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। কিন্তু উপরোদ্ধৃত সংলাপে বিশেষ করিয়া ইহলোকের উল্লেখ এবং 'যদি লোকান্তর থাকে—' এই তাৎপর্য্যপূর্ণ অর্দ্ধোক্তি বৈপরীত্যগুণে জীবানন্দের প্রতি শান্তির উক্তি: 'বিবাহ ইহকালের জন্য, এবং বিবাহ পরকালের জন্য।' (আনন্দমঠ (৩।৩) স্মরণ করাইয়া দেয়। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কারগত পার্থক্যের দ্যোতক।

কৃষ্ণকান্তের উইল

'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষে'র ন্যায় খাঁটি পারিবারিক উপন্যাস। ইহার আখ্যানবস্তু: গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের জীবনের ট্র্যাজেডি শাশ্বত মানব-জীবনের ট্র্যাজেডি হইলেও বাঙ্গালীজীবনের বাস্তব ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং হরলালের বিধবাবিবাহের হুমকি, রোহিণী কর্ত্তৃক উইলচুরির সংবাদে চাকরানী মহলে চাঞ্চল্য, কৃষ্ণকান্তের কাছারিবাড়ী ও রোহিণীর বিচারপর্ব্ব, বারুণীর ঘাটে পল্লীরমণীগণের জটলা ও কুৎসাপ্রচারে তাহাদের উৎকট আনন্দ, কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, হরিদ্রাগ্রামের পোষ্ট অফিস, তত্রত্য ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারবাবু ও তাহার পিওন, ইন্‌স্পেক্‌টর ফিচেল খাঁ ও সরকারী সাক্ষীবৃন্দ, সোণা ও রূপো—এ সমস্তই সেকালের বাস্তব সমাজচিত্রের যোগান দিয়াছে।

বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া 'বিষবৃক্ষে'র সহিত আলোচ্য উপন্যাসের সাদৃশ্যের কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু অঙ্কনরীতি ও চরিত্রের পরিকল্পনায় উভয় উপন্যাসে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দ-লাল, সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর, কুন্দ ও রোহিণীর চরিত্রগত পার্থক্য যথাকালে আলোচনা করিব। এস্থলে অঙ্কনরীতি ও ঘটনার ব্যঞ্জনায় পার্থক্যের উল্লেখ করিতেছি: 'বিষবৃক্ষে'র আখ্যায়িকা দুইটি এবং দেবেন্দ্র-হীরা কাহিনী অপ্রধান হইলেও উপন্যাসের অনেকটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গল্পাংশ সরল, গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণী কাহিনী ভিন্ন ইহাতে অপর কোন আখ্যা-য়িকা নাই; হরলাল-রোহিণী ব্যাপারটি নিতান্তই গৌণ এবং ইহা মূল কাহিনীর উপক্রমণিকাস্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ, 'বিষবৃক্ষে' প্রাকৃতের সহিত অতি-প্রাকৃতের মিশ্রণ রহিয়াছে; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অতিপ্রাকৃতবর্জ্জিত।[১] তৃতীয়তঃ,

---

১ অতিপ্রাকৃত না থাকিলেও এই উপন্যাসে এমন একটি নিমিত্তের উল্লেখ রহিয়াছে যাহা মনে হয় অতিপ্রাকৃতের গা ঘেষিয়া গিয়াছে। নিমিত্তটি এইরূপ: নিশাকর যখন প্রসাদ-পুরের প্রমোদগৃহের দ্বারে প্রবেশ করিলেন, তখন 'অকস্মাৎ রোহিণীর তব্‌লা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজির তম্বুরাব তার ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল; গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল।' নিশাকরের আগমনে প্রমোদগৃহে যে বিপ্লব আসিল, ইহা তাহারই পূর্ব্বাভাস। ঠিক একই সময়ে তিন তিন জনের আচরণে এরূপ দুর্লক্ষণের প্রকাশ নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রের পক্ষে কুন্দের রূপের আকর্ষণ বাহিরের ঘটনা-নিরপেক্ষ। পক্ষান্তরে, রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আকর্ষণ এবং ইহার ফলে তাঁহার অধঃপতন প্রত্যেকটি স্তরে বাহিরের ঘটনা-সাপেক্ষ।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র আখ্যানবস্তু জমিদার কৃষ্ণকান্তের উইলকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। উইল উপলক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্তের সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্র হরলালের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল এবং শেষ পর্যন্ত যে উইল রচিত হইল তাহাতে হরলাল বিষয় হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইল। এইখানেই প্রকৃতপক্ষে আখ্যায়িকার আরম্ভ।

চতুর হরলাল যখন ভয় দেখাইয়া বৃদ্ধ পিতাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিল না, তখন সে কর্ম্মপন্থা পরিবর্ত্তন করিল। কৃষ্ণকান্ত যেরূপ খুশি ব্যবস্থা করুন, হরলাল তাঁহার অজ্ঞাতসারে আসল উইল সরাইয়া তাহার স্থলে নিজের ইচ্ছামত জাল উইল রাখিয়া দিবে এবং পিতার অবর্ত্তমানে এই জাল উইলই আসল উইল বলিয়া গৃহীত হইবে। হরলাল এই উদ্দেশ্য লইয়া আসরে নামিলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল তাহাই গোবিন্দলাল ও রোহিণীকে পরস্পরের সান্নিধ্যে টানিয়া আনিল এবং গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মাঝখানে বিচ্ছেদের প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিল। ভ্রাতুষ্পুত্রের চরিত্রের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণকান্ত মৃত্যুকালে পুনরায় উইল পরিবর্ত্তন করিলেন। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মনোমালিন্য কায়েমী করার সহায় হইল। এইরূপে আখ্যায়িকার প্রত্যেকটি স্তরে কৃষ্ণকান্তের উইল ইহার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। এইখানেই উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা।

কৃষ্ণকান্তের উইলের ন্যায় বারুণী পুষ্করিণীও[১] নায়ক, নায়িকা ও প্রতিনায়িকার জীবনে তাহার রহস্যময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহা যেন উপন্যাসের একটি অশরীরী চরিত্র। বসন্তের বিচিত্র শোভায় সজ্জিত বারুণীর ঐন্দ্রজালিক আবেষ্টনের মধ্যে গোবিন্দলালকে রোহিণী নূতন রূপে দেখিতে পাইয়াছে; বারুণীর সোপানোপরি ক্রন্দনরতা রোহিণীকে দেখিয়া পরদুঃখকাতর গোবিন্দলাল প্রথম তাহার দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়াছেন। স্বামী-প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণীনারী-অসহিষ্ণু ভ্রমর বারুণীর জলে রোহিণীকে মরিতে উপদেশ দিয়াছে এবং নৈরাশ্যে ও লজ্জায় রোহিণীও তাঁহার উপদেশানুযায়ী বারুণীর

১ শচীশচন্দ্র বলেন, বারুণী পুষ্করিণী কাঁটালপাড়ার অর্জ্জুনাদীঘি স্মরণ করাইয়া দেয়। অর্জ্জুনার পাড়ের নীচে বঙ্কিম একটি মনোরম উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনার পাড়ে তিনি একখানি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম-জীবনী, ৩১—৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

জলেই জীবনের জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছে। তারপর—বসন্তের ম্লান সন্ধ্যায় রোহিণীর সংজ্ঞাহীন দেহ যখন বারুণীর জলতল আলো করিয়া শোভা পাইল, তখন 'স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায়' তাহার দেহসৌন্দর্য্য নবরূপে গোবিন্দলালের রূপপিপাসু দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এবং 'বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত' সুগঠিত দেহখানি বারুণীতীরস্থ প্রমোদগৃহে তুলিয়া আনিয়া মুমূর্ষুকে বাঁচাইয়া তুলিবার প্রয়াসে গোবিন্দলাল যখন 'সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন' তখন সেই প্রথম তাঁহার দুর্ব্বলতা তাঁহার চক্ষে ধরা পড়িল।

হয়ত শেষ রক্ষা হইতে পারিত। কিন্তু পল্লীরমণীর মিলনকেন্দ্র বারুণীর ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া হরমণি ঠাকুরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া 'রামের মা, শ্যামের মা, গরী, তারী, পারী'র নিকট গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর নাম সংযুক্ত করিয়া ক্ষীরি চাকরাণী যে কুৎসা রটনা করিল তাহা সঙ্কটমুহূর্ত্তে ভ্রমরের সহিত মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়া গোবিন্দলালের অধঃপতনের পথ সুগম করিল। এবং মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার সন্ধ্যায় বারুণীতীরস্থ মণ্ডপমধ্যে রোহিণীর সহিত পুনবার যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তখন চতুরা রোহিণী বুঝিয়া গেল গোবিন্দলাল তাহার রূপমুগ্ধ। বারুণী রোহিণীর নৈরাশ্যের সাক্ষী, বারুণীর তীরেই রোহিণী বিজয়িনী। বসন্তের রূপগর্ব্বিতা বারুণী যৌবনচঞ্চল রোহিণীর রিক্ততাকে উপহাস করিয়া তাহাকে উন্মাদ করিয়াছে; বাদলের বারিধারায় কুহেলিকাময়ী বারুণী বাদলের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত অভিমান-ভাবাক্রান্ত গোবিন্দলালের মনের সুরে সুর মিলাইয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। বহু বৎসরের বহু দুঃখের পর সংসারে একান্ত নিঃসম্বল, সর্ব্বহারা গোবিন্দলাল যখন পুনরায় বারুণীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বারুণী তখন তাঁহারই ন্যায় হৃতগৌরবা, তাঁহারই ন্যায় অতীত দিনের কঙ্কাল। তবুও বারুণীই বেদনাতুর গোবিন্দলালের একমাত্র ব্যথার ব্যথী। এবং চরম দুঃখে বারুণীর তীরে তিনি যে অনুপ্রেরণা পাইলেন, তাহাই তাঁহাকে দুঃখজয়ী অমৃতের সন্ধান দিল। বারুণীর তীরে ভোগী গোবিন্দলালকে লইয়া যে খেলার আরম্ভ, তাহারই তীরে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের চিত্রের সূচনায় সেই খেলার পরিসমাপ্তির পূর্ব্বাভাস।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র আখ্যায়িকার পরিবেশনে কোথাও কোনরূপ বাহুল্য নাই। বিশেষ করিয়া গোবিন্দলালের অধঃপতনের চিত্র সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিত-পূর্ণ। ইহার গোড়ার দিকের বর্ণনা এইরূপ: 'এক দিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।' (১।২৬)। ইহার পর মাতাকে

লইয়া ৺কাশীধামে যাত্রার পর আমরা তাঁহাকে পুনরায় দেখিতে পাই একেবারে প্রসাদপুরে 'চুনিলাল দত্ত'রূপে। তৎপূর্ব্বে, দুরারোগ্য শূলরোগে আক্রান্ত হইয়া তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইয়া রোহিণীর ফিরিয়া না আসা এবং গোবিন্দলালের মাতার পত্রে তাঁহার নিরুদ্দেশ (২।১)—অতি সাধারণভাবে এই দুইটি সংবাদ পরিবেশন করিয়া বঙ্কিম তাহাদের মিলনের ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রসাদপুরে যখন উভয়কে একত্র দেখিতে পাই সেই সময়ের চিত্র এইরূপ: রোহিণী 'ওস্তাদজির নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে, গোবিন্দলাল পাশের ঘরে নবেল পড়িতেছেন। অবশ্য নবেল পড়া অছিলা মাত্র: প্রকৃতপক্ষে তিনি 'মুক্ত দ্বারপথে' 'নিবিষ্টমনে' রোহিণীর 'চঞ্চল কটাক্ষ' লক্ষ্য করিতেছেন। বিবরণ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মাঝখানে 'ওস্তাদজিকে টানিয়া আনিয়া বঙ্কিম কৌশলে ইঁহাদের জীবনের কুৎসিত দিকটা এড়াইয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, রোহিণীর এই যে সঙ্গীত-শিক্ষা—মনে হয় রূপমোহের প্রথম উন্মাদনা কাটিবার পর রোহিণীর সহিত নিজের জীবনের কোনরূপ জোড়াতালি দিবার উদ্দেশ্যেই গোবিন্দলাল এই সঙ্গীতশিক্ষার ভিতর দিয়া কৃত্রিম উন্মাদনা সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন। গোবিন্দলাল সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজের উক্তি: 'রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরী-ভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে।' (২।১৫, ১১৬ পৃ:)—এই ধারণার পরিপোষক। যাহা হউক, এরূপ বর্ণনা পাপের চিত্র প্রদর্শনে বঙ্কিমের স্বাভাবিক সঙ্কোচের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।' (২।৫, ৯০ পৃ:)।

শুধু পাপের চিত্র প্রদর্শনে নহে, এই উপন্যাসে সর্ব্বত্রই বাহুল্য বর্জ্জনের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। রোহিণীর হত্যার পর আমরা গোবিন্দলালের সাক্ষাৎ পাই একেবারেই আদালতগৃহে 'কাঠগড়ার' ভিতর; 'গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিল' (২।১২)—এই একটি কথায় তাঁহার দীর্ঘ তিন বৎসরের[১] পলাতক জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিচারে মুক্তিলাভের

১ গোবিন্দলালের গৃহত্যাগের এক বৎসর পরে মাধবীনাথ তাঁহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ইহার অল্প পরেই গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিলেন। এই গেল একদিকের হিসাব। অন্যদিকে, তাঁহার গৃহত্যাগের পর পঞ্চম বৎসরে পলাতক গোবিন্দলাল ধরা পড়িলেন। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে যে রোহিণীকে হত্যা করার তিন বৎসর পরে গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছেন।

পর ভ্রমরের সহিত শেষ সাক্ষাতের পূর্ব্বে বৎসরাধিক কালের ইতিহাসের ইঙ্গিত রহিয়াছে ভ্রমরের নিকট লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পত্রের ভিতর। (২।১৩)। অবশ্য গোবিন্দলালের কাহিনীকে যথাসম্ভব আড়ালে রাখিয়া ভ্রমরের দুঃখের চিত্রের উপর আলোকপাত করাই হয়ত শিল্পকলার দিক দিয়া তাঁহার কাহিনীকে সংক্ষেপ করার অন্যতম কারণ; কিন্তু জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে হইতেছে,[১] তাঁহার চরম দুর্দ্দশার নিদর্শন হিসাবে ইহাই যথেষ্ট এবং পত্নীর অন্নদাস হইবেন না, এই অজুহাতে যিনি গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, এ শাস্তি তাঁহার অবশ্য প্রাপ্য এবং এই অবস্থায় অন্নের জন্য পত্নীর করুণাভিক্ষা প্রকৃতির বিধানে অলঙ্ঘনীয় প্রতিশোধবিধি। অবশ্য এক্ষেত্রে ইহাও লক্ষণীয় যে, গোবিন্দলাল যে বলিয়াছিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।" (১।১৮)—অতি বড় দুর্ভাগ্যের মধ্যেও তিনি ইহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি ভ্রমরের নিকট অন্নভিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু ভ্রমর তাঁহাকে সম্পত্তি লিখিয়া দিলেও তিনি সে সম্পত্তি দাবী করেন নাই।

গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী উপন্যাসের প্রধান চরিত্রত্রয়। ইহাদের অদৃষ্ট বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন কৃষ্ণকান্ত, মাধবীনাথ ও হরলাল। শেষোক্ত চরিত্র আখ্যায়িকার প্রথম গতিবেগ যোগাইয়াছে। হরলাল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে জাল বিস্তার করিল তাহা একদিকে যেমন উইলঘটিত জটিলতার সৃষ্টি করিল, অন্যদিকে তেমনই রোহিণীর অবচেতন মনের সুপ্ত বাসনা জাগাইয়া তুলিল। এবং এই উভয়ের যোগাযোগে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল তাহাই ট্র্যাজেডির উত্তেজক শক্তি।

হরলাল চতুর, স্বার্থান্ধ, বিবেকহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবক। সম্পত্তির লোভে সে জাল উইল তৈয়ার করিল, রোহিণীর দ্বারা স্বকার্য্যোদ্ধারের অভিপ্রায়ে সে তাহাকে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করিল। কিন্তু ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয় নহে। শেষ পর্যন্ত রোহিণীর চাতুর্য্যের নিকট যখন তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল, তখন সম্পত্তির প্রলোভন তাহার আভিজাত্য ম্লান করিতে পারিল না, রোহিণী তাহার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ যে মূল্য চাহিল, সে মূল্যে সম্পত্তি

[১] কিন্তু ইহা কি স্বাভাবিক? গোবিন্দলাল যখন ছদ্মবেশে পলাতক জীবন যাপন করিয়াছেন, সে সময়ের অবস্থা বুঝিতে পারি। কিন্তু আদালতে মুক্তি পাইবার পর কলিকাতা মহানগরীতে তাঁহাকে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে হইবে কেন? আর কিছু না হউক, তিনি যে গানবাজনা শিখিয়াছিলেন, তাহাতেও সেযুগে তাঁহার অন্নসংস্থান হইতে পারিত।

ক্রয় করিতে হরলাল অস্বীকৃত হইল। নীতির দিক দিয়া তাহার আচরণ যতই গর্হিত হউক, ইহা তাহার আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। হরলাল স্পষ্টই বলিতেছে, "আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

কৃষ্ণকান্ত ও মাধবীনাথ সেকালের জমিদার গোষ্ঠীর প্রতীক; স্ব স্ব এলাকায় ইঁহারাই ছিলেন থানা, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ। উভয়েই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ী লোক। কৃষ্ণকান্ত ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ, কতকটা একগুঁয়ে; তাঁহার প্রথম উইল ও বিভিন্ন অবস্থায় উইলের পরিবর্ত্তন ইহার প্রমাণ। মাধবীনাথের চরিত্রের এই দিকটা বিচার করিবার মত উপকরণের অভাববশতঃ কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, প্রয়োজন হইলে ন্যায়পরায়ণ কৃষ্ণকান্ত বা মাধবীনাথ কেহই কূটনীতি অবলম্বনে পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। মাধবীনাথের পক্ষে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হরিদ্রাগ্রামের পোষ্টমাষ্টার ও ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাঁহার আচরণ এবং গোবিন্দলালকে আইনের কবল হইতে উদ্ধারকল্পে তাঁহার কূট-কৌশল ইহার প্রমাণ। কৃষ্ণকান্তের চরিত্রের এই দিকটা আখ্যায়িকায় তাঁহার কোন কার্য্য হইতে জানিবার উপায় না থাকিলেও, বঙ্কিম কৌশলে যতটুকু ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কমলাকান্তের ন্যায় বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্তও অহিফেনের মর্য্যাদা বুঝিতেন এবং অহিফেন-প্রসাদাৎ যখন তিনি ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন তখন কখন কখন অবচেতন মনের চিন্তার ধারা তাঁহাকে অভিভূত করিত। কমলাকান্ত মৌতাতে মসগুল হইলে নসীরাম-বাবুর বৈঠকখানায় ঝিমাইতে ঝিমাইতে অপূর্ব্ব দপ্তর রচনা করিতেন; কৃষ্ণকান্ত তাহার মত নিকর্ম্মা নহেন, তিনি বিষয়ী লোক, মৌতাতের ঝোঁকে তাঁহার চিন্তার ধারাও বিষয়মুখী। তিনি কখন দেখিতেন, তাঁহার উইল 'হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া গিয়াছে। যেন হরলাল তিন টাকা তের আনা দুকড়া দুক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে।' কখন দেখিতেন, 'ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম কর্জ্জ লইয়া, এই দলিল লিখিয়া দিয়া, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন।' কখন দেখিতেন, 'তিনি হরি ঘোষের মোকদ্দমায় জাল দলিল দাখিল করায়, জেলখানায় গিয়াছেন। জেলখানা ঘোরান্ধকার।' হরি ঘোষের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই এবং কৃষ্ণকান্তের সহিত তাহার মোকদ্দমার বিষয়বস্তুও আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এই মামলায় জমিদার কৃষ্ণকান্ত আদালতে এমন একখানি জাল দলিল দাখিল করিয়াছিলেন যাহার জন্য তাঁহাকে মান

মনে যথেষ্ট শঙ্কিত হইতে হইয়াছে। এবং পারিবারিক জীবনে তাঁহার ন্যায়-পরায়ণতার সহিত এরূপ আচরণের যতই অসঙ্গতি থাকুক, ইহা আদৌ অস্বাভাবিক নহে। মানুষমাত্রই জটিল মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং তাহার বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে ঐক্য বা সামঞ্জস্য খুঁজিতে যাওয়া অনেক সময় সম্পূর্ণ অর্থহীন। গৃহস্থ কৃষ্ণকান্ত ও জমিদার কৃষ্ণকান্তের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। গৃহস্থ কৃষ্ণকান্ত পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি কোনরূপ অবিচার কল্পনা করিতে পারেন নাই, কিন্তু মনে হয় জমিদার কৃষ্ণকান্ত জমিদারী রক্ষা ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে জাল জুয়াচুরির আশ্রয় গ্রহণ করা অন্যায় বিবেচনা করেন নাই। সুতরাং কৃষ্ণকান্তের আদর্শানুযায়ী হরলাল ইহার অপপ্রয়োগ করিলেও তাহার জালিয়াতি বুদ্ধি উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত, এইরূপ অনুমান করিলে হয়ত এই ন্যায়পরায়ণ বৃদ্ধের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

গোবিন্দলালের চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বতঃই 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্র-নাথকে মনে পড়ে। উভয়েই সুশ্রী, মার্জ্জিতরুচি ও দয়ার্দ্রচিত্ত। এবং উভয় ক্ষেত্রেই পরোপকারবৃত্তির সূত্র ধরিয়া রূপমোহ তাঁহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইল। নগেন্দ্রের পত্নী নিঃসন্তান, নহিলে তাহার পক্ষে সন্তান নাই, অন্ততঃ এই অজুহাতে আত্মপ্রবঞ্চনা সম্ভব হইত না; ভ্রমর কয়েকদিনের জন্য মাতৃত্বের গৌরব লাভ করিলেও সঙ্কট সময়ে সে রিক্তা, নহিলে রূপের মোহে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিলেও গোবিন্দলালের পক্ষে অপত্যস্নেহ কাটাইয়া দেশত্যাগী হওয়া সহজ হইত না।[১]

এই দুইটি চরিত্রের সহিত 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অন্তর্ব্বর্ত্তী-কালের রচনা 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপের চরিত্রের পার্থক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল উভয়েই সাধ্বী পত্নীর একনিষ্ঠ প্রণয় উপেক্ষা করিয়া রূপের মোহে পথভ্রষ্ট হইলেন। পক্ষান্তরে, প্রতাপ বাল্যাবধি শৈবলিনীকে ভালবাসিয়াছেন, শৈবলিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া একদিন তিনি ভাগীরথীর জলে ডুবিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ভালবাসা তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়াছে, তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করে নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি শৈবলিনীর শুভ কামনা করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন। চরিত্রের যে দৃঢ়তাবলে প্রতাপ আত্মজয়ী হইলেন এবং শৈবলিনীকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিলেন, নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে সেই দৃঢ়তার একান্ত অভাব। গোবিন্দ-

১ গোবিন্দলাল তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সূতিকাগারে মৃত শিশুপুত্রের জন্য ভ্রমরের শোক এই সত্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইখানেই এই চিত্রের প্রধান সার্থকতা।

লাল অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন, এবং সহজ অবস্থায় রোহিণীর রূপের আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করা হয়ত তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি কতকটা খেয়ালীপ্রকৃতি।[১] প্রথম উন্মাদনা-কালে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি অভিমানবশে স্বেচ্ছায় নিজের ও ভ্রমরের সর্ব্বনাশ করিলেন। এই হিসাবে তাঁহার অপরাধ অধিকতর অমার্জ্জনীয়।

নগেন্দ্রনাথ হিন্দুর অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; গোবিন্দলাল পাশ্চাত্ত্যরুচিসম্পন্ন যুবক। নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষের চিত্রগুলির সহিত বারুণীতীরস্থ উদ্যানমধ্যে শ্বেতপ্রস্তরখোদিত অর্দ্ধাবৃতা স্ত্রীমূর্ত্তির পার্থক্য[২] উভয়ের রুচির পার্থক্যের নিদর্শন হিসাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ। হয়ত অতীতের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার ফলেই নগেন্দ্রনাথ সমাজবিধানের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল। বিধবাবিবাহের সমর্থনে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তিনি আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সমাজের অনুশাসনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন। এবং তাঁহার দৃষ্টিতে যখন কোন অন্তরায় রহিল না, তখন তিনি শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী যথারীতি কুন্দকে বিবাহ করিলেন। ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, গোবিন্দলালের ন্যায় নগেন্দ্রনাথ যদি অবৈধ মিলনের প্রস্তাব করিতেন, 'কুন্দ……বোধ হয়……সম্মত হইত না।'[৩] ঠিক কথা। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ কখনও এরূপ প্রস্তাবের কল্পনা করেন নাই, তিনি পূর্ব্বাপর কুন্দকে বিবাহ করার কথাই চিন্তা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, গোবিন্দলাল খোলাখুলিভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার দুইটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে: এক, গোবিন্দলাল সামাজিক অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহেন; দুই, তিনি রোহিণীকে বিবাহ করার প্রস্তাব করিলে তাঁহার বিধবা মাতা ইহাতে সম্মত হইতেন না এবং সূর্য্যমুখী যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কুন্দের সহিত স্বামীর বিবাহ দিলেন, ভ্রমর কখনও সে আদর্শ অনুসরণ করিত না। হয়ত এই উভয়বিধ কারণই গোবিন্দলালের মনের উপর কমবেশী কাজ করিয়া থাকিবে।

১ ইহা কি হরিদ্রাগ্রামের রায় পরিবারের বংশগত বৈশিষ্ট্য? অন্ততঃ কৃষ্ণকান্ত কম খেয়ালী ছিলেন না। ঘন ঘন উইল পরিবর্ত্তন ইহার প্রমাণ।

২ নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষের চিত্রগুলির বিষয়নির্ব্বাচনে সূর্য্যমুখীর প্রভাব সুস্পষ্ট। ভ্রমর ছেলেমানুষ, কিন্তু কৌতুকছলে হইলেও সে যে প্রস্তরমূর্ত্তিকে 'কালামুখী' বলিয়া গালি দিয়াছে এবং কখন কখন বস্ত্রদ্বারা তাহার নগ্নতা আবৃত করিয়াছে, ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এরূপ 'আর্ট' সে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই।

৩ 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর আলোচনা, ৮ পৃঃ।

গোবিন্দলাল ও রোহিণী বাল্যাবধি পরস্পরকে দেখিয়া আসিয়াছেন। ঘটনার যোগাযোগে তাঁহারা কেমন করিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, কেমন করিয়া ধাপে ধাপে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নামিয়া গেলেন, পাপের নগ্ন চিত্র প্রদর্শনে বিরত থাকিলেও, বঙ্কিম তাহা নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন।

সংসারে গোবিন্দলালের কোন সুখের অভাব নাই। তাঁহার রূপ আছে, অর্থ আছে, ভ্রমরের মত সাধ্বী পত্নী আছে; তিনি সকল সুখে সুখী। পিতৃব্য জমিদারী শাসন করেন, ভ্রমরের সহিত রহস্যালাপে ও কৃত্রিম কলহে গোবিন্দলালের দিন কাটে। বঙ্কিম একদিনের ক্ষণিকের চিত্রে রোহিণী আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের জীবনের একটানা সুখের আভাস দিয়াছেন:

'ঠিক প্রভাত হয় নাই—কিছু বাকি আছে। এখনও গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকুঞ্জে, কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল গীত আরম্ভ করিয়াছে।......গোবিন্দলাল বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই উদ্যানস্থিত মল্লিকা গন্ধরাজ কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবনজন্য তৎসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আবার তুমি এখানে কেন?"

বালিকা বলিল, "তুমি এখানে কেন?" বলিতে হইবে না যে, এই বালিকা গোবিন্দলালের স্ত্রী।

গোবিন্দ। আমি একটু বাতাস খেতে এলেম, তাও কি তোমার সইল না?

বালিকা বলিল, "সবে কেন? এখনই আবার খাই খাই? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন উঠে না, আবার মাঠে মাঠে বাতাস খেতে উঁকি মারেন?"

গো। ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম?

"কেন, এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ?"

গোবিন্দ। জান না ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে, এ দেশের লোক এত দিনে সগোষ্ঠী বদ হজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটি অতি সহজে বাঙ্গালীর পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।

* * * *

ভোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া,

একটা হুকে রাখিয়া, গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল—মনে মনে জ্ঞান, যেন কত বড় একটা কীর্ত্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন।' কৃষ্ণকান্তের উইল, ১।১০।

ইহার অব্যবহিত পরেই চাকরানী সম্প্রদায়ের নিকট রোহিণীর চৌর্য্যাপরাধের কথা শুনিয়া ভ্রমর যখন গোবিন্দলালকে সে সংবাদ জানাইল, তিনি বিশ্বাস করিলেন না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। সুতরাং ভ্রমরও বিশ্বাস করিল না, কারণ 'গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।' গোবিন্দলাল ইহা জানিতেন, জানিতেন বলিয়াই তাহার মনের কথা টানিয়া আনিবার জন্য বারংবার 'পীড়াপীড়ি' করিলেন। 'ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরব রহিল।' এই যে প্রণয়, স্বামীর প্রতি এই যে একান্ত নির্ভরশীলতা, এই যে ব্রীড়া—ইহার পরিপ্রেক্ষিতে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের বিচ্ছেদের চিত্র আরও করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। এই কারণেই রোহিণীকে তাঁহাদের মাঝখানে টানিয়া আনিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নিপুণ শিল্পী গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্যজীবনের এই মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

কিন্তু এত সুখের মধ্যেও গোবিন্দলালের জীবনে একটুকু অপূর্ণতা রহিয়াছে। গোবিন্দলাল সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং এই কারণেই তাঁহার রূপতৃষ্ণা প্রবল। ভ্রমর তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিলেও তাঁহার রূপতৃষ্ণা মিটাইতে পারে নাই; 'ভোমরা কালো।' কিন্তু রোহিণীর উচ্ছলিত যৌবনের রূপরাশি তাঁহার চক্ষে ধরা পড়িবার পূর্ব্বে তিনি কখনও এই অভাব অনুভব করেন নাই। গোবিন্দলালের চিত্ত যখন ভ্রমরময়, তখন তাঁহারই এক সুকোমল বৃত্তির সুযোগ লইয়া রূপমোহ অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

কুঁদুলী বলিয়া রোহিণীর হয়ত একটুকু খ্যাতি থাকিয়া থাকিবে, নহিলে হরলাল কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হইয়া সে যখন বারুণীর জলে কলসী ভাসাইয়া কাঁদিতে বসিল, তখন দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দলাল কখনও মনে করিতে পারিতেন না যে, বুঝি বা সে 'এ পাড়ার কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে।' কিন্তু প্রথমটা তিনি যাহাই ভাবিয়া থাকুন, যখন সূর্য্য ডুবিল, চাঁদ উঠিল, তথাপি রোহিণীর কান্না থামিল না, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। 'ধীরে ধীরে' রোহিণীর নিকটে আসিয়া তিনি তাহাকে ক্রন্দনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। রোহিণী প্রথমে নিরুত্তর থাকিলেও, শেষ পর্য্যন্ত উত্তর করিল, "এক দিন

বলিব। আজ নহে। এক দিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।" (১।৭)। ইহাই গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারের ইতিহাস। এস্থলে আমরা গোবিন্দলালের সহানুভূতিপূর্ণ পরদুঃখকাতর অন্তরের পরিচয় পাই। গোবিন্দলাল অপাপবিদ্ধ; রোহিণীর কথায় যদি কোন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকিয়া থাকে (এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা চলে না) তাহা হইলে সে ইঙ্গিত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। পরবর্তীকালে রোহিণী যখন স্পষ্টই প্রণয়ের ইঙ্গিত করিতেছে, গোবিন্দলালের তৎকালীন প্রশ্ন, "কি সে রোহিণি?"; "কি রোহিণি?" (১।১২, ৩৮ পৃঃ)—ইহার অকাট্য প্রমাণ।

দ্বিতীয়বার যখন তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল (১।১১), রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের দরবারে বিচারাধীন। এক্ষেত্রেও গোবিন্দলাল পরদুঃখকাতর বলিয়াই রোহিণী তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল। এবার রোহিণী 'ক্ষণিক কটাক্ষ' করিল। কিন্তু গোবিন্দলাল ইহা লক্ষ্য করিলেও, ইহার অর্থ বুঝিলেন না। রোহিণী চরম বিপদগ্রস্ত। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, 'এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা।.....আর্ত্তের ভিক্ষা আর কি? বিপদ্ হইতে উদ্ধার।' গোবিন্দলাল 'কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত' ছিলেন বলিয়া কিছুটা অন্যমনস্ক হইলেন সত্য, কিন্তু বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত যাহাই মনে করুন, রোহিণীর 'চাঁদপানা' মুখ এখনও তাঁহার মনে কোনরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে নাই। এ যেন তরুণ বিদ্যার্থীর পক্ষে কোন নূতন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা।

গোবিন্দলালের অনুকম্পায় রোহিণী যখন তৃতীয়বার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল (১।১২), তখন তাঁহাকে একাকী পাইয়া এই সুযোগ সে ব্যর্থ হইতে দিল না। যিনি কটাক্ষের অর্থ বুঝিলেন না, সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া রোহিণী তাঁহার নিকট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহার মনোভাবের ইঙ্গিত করিল। গোবিন্দলাল এতক্ষণে 'কটাক্ষের' অর্থ বুঝিলেন, 'বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।' এই দয়ার মূলে রহিয়াছে গোবিন্দলালের এই অনুভূতি যে রোহিণীর আসক্তি যতই গর্হিত হউক, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই অসহায়া নারী লাঞ্ছনা ও অপমান বরণ করিয়াছে। তথাপি তিনি তাহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন; প্রণয়ের ইঙ্গিত করিতে যাইয়া রোহিণী আত্মহত্যার ইঙ্গিত করিলে ("তার পর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি") ইহারই সূত্র ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি—আপনার আপনার কাজ না

করিয়া মরিব কেন?" অতঃপর একটুকু 'ইতস্ততঃ' করিয়া তিনি তাহাকে দেশত্যাগের উপদেশ দিলেন। রোহিণীর শুভাশুভ চিন্তা করিয়াই তিনি তাহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন, নহিলে নিজের সম্বন্ধে এখনও তাঁহার কোনরূপ শঙ্কা নাই। তিনি যে ইতস্ততঃ করিলেন তাহার কারণ এই যে, রোহিণীকে এরূপ শাস্তিমূলক উপদেশ দেওয়ার তাঁহার কোনরূপ অধিকার নাই।

রোহিণী আপাততঃ গোবিন্দলালের প্রস্তাবে সম্মত হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত যখন তাঁহার উপদেশানুযায়ী দেশত্যাগ করিতে অসম্মত হইল (১।১৪), তখনও গোবিন্দলাল তাহাকে তিরস্কার বা ভীতি প্রদর্শন করিলেন না, শুধু বলিলেন, "জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।" জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র যে দুষ্কৃতকারিণী অতি সাধারণ রমণীরও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিলেন না, ইহা তাঁহার শিক্ষিত মনের পরিচয় দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি যদি একটুকু কঠোর হইতে পারিতেন তাহা হইলে তাহা উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলের হইত।

যাহা হউক, রোহিণীর প্রণয়জ্ঞাপনের ফলে, বিশেষ করিয়া সে যখন জানাইল যে, তাহার হইয়া কোনরূপ অনুরোধ করিতে গেলে তাহার যেমন 'কলঙ্কের উপর কলঙ্ক', গোবিন্দলালেরও 'কিছু কলঙ্ক' তখন, গোবিন্দলালের আচরণে একটুকু পরিবর্ত্তন ঘটিল। পূর্ব্বে রোহিণীর হইয়া পিতৃব্যের নিকট অনুরোধ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ আসে নাই, এখন আসিল। (১।১৩, ৪০ পৃঃ)। তাহা হইলেও এখনও তিনি নিষ্কলঙ্ক; নিষ্কলঙ্ক বলিয়াই রোহিণীর কথা লইয়া ভ্রমরের সহিত তিনি হালকা রহস্যালাপ করিতে পারিলেন এবং রোহিণীর আসক্তির কথা তাহার নিকট সহজভাবে ব্যক্ত করিতে পারিলেন। (১।১৪)।

কিন্তু ঘটনাস্রোত গোবিন্দলালের প্রতিকূল। তাঁহার আদেশ পালনে অসম্মত হইলেও রোহিণী যখন ক্ষীরির মারফত ভ্রমরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল, তখন তাহাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া (১।১৬) গোবিন্দলাল জীবনে প্রথম তাহার রূপের আকর্ষণ অনুভব করিলেন।[১] 'জলতল' হইতে রোহিণীর মৃতকল্প দেহখানি তুলিয়া আনিয়া তিনি যখন উদ্যানস্থ পালঙ্কের উপর শোয়াইলেন, তখন তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও করুণ পরিণতি তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। 'এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল' একথা ভাবিয়া তাঁহার 'চক্ষে জল পড়িল।' ইহার পর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বহাইবার জন্য অনন্যোপায় হইয়া গোবিন্দলাল যখন অধরে অধর স্পর্শ

১ গোবিন্দলালের উড়িয়া মালীর আচরণ এবং ইহার উপর বঙ্কিমের সরস মন্তব্য চারিদিকের করুণ পরিবেশের মধ্যে হালকা হাসির যোগান দিয়া হৃদয়াবেগ শমিত করে।

করিয়া তাহার মুখে ফুৎকার দিলেন, তখন সেইখানেই তাঁহার জীবনে গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। কুশলী শিল্পী একটি নিমিত্তের সাহায্যে ইহার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। নিমিত্তটি এইরূপ: 'সেই সময়ে ভ্রমর, একটি লাঠি লইয়া, একটি বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।' ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস হিসাবে ইহা তাৎপর্য্যপূর্ণ। হয়ত ইহার ভিতর আরও একটুকু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে: রোষপরবশ হইয়া ভ্রমর রোহিণীকে যে আঘাত করিয়াছে, সে আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় তাহারই কপাল ভাঙ্গিল, রোহিণীর প্রতি উদ্যত যষ্ঠি তাহাকেই প্রত্যাঘাত করিল।

নিষ্পাপ হইলেও গোবিন্দলালের মন পূর্ব্ব হইতেই দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে সংসারে সকল সুখে বঞ্চিতা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী এই নারী তাঁহারই জন্য তরুণ বয়সে সংসার হইতে চিরবিদায় লইয়া যাইতেছে, এই অনুভূতির ফলে গোবিন্দলাল তাহার সকল অপরাধ ভুলিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া রহিল শুধুই সর্ব্বহারা, আপাতমৃত্যুতে সমুজ্জ্বল লাবণ্যময়ী নারীমূর্ত্তি। অতঃপর তাঁহার নিপুণ চেষ্টায় যখন রোহিণীর নিস্পন্দ দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল, তখন আজিকার এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁহার রূপপিপাসু চিত্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল।

কিন্তু গোবিন্দলাল আত্মবিস্মৃত হইলেন না। রোহিণীর প্রতি তাঁহার আচরণ সহানুভূতিসূচক. তাহাতে চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু রোহিণী চলিয়া গেলে গোবিন্দলাল যখন একাকী হইলেন, তখন তিনি 'ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন', রোহিণীর জন্য নহে, তিনি 'রোদন করিতে লাগিলেন' নিজের ও ভ্রমরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। তাঁহার ও ভ্রমরের এই বিপদের দিনে তিনি আকুলকণ্ঠে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। (১।১৭)। গোবিন্দলালের এই সময়ের প্রার্থনা তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তির পরিচয় দেয় এবং তাঁহার চরিত্রে ভগবদ্‌ভক্তির এই ভিত রহিয়াছে বলিয়াই অত বড় ভূকম্পনের পরেও তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করা সম্ভব হইল।

কিন্তু গোবিন্দলাল এই সময় এমন এক ভুল করিলেন যাহা এ অবস্থায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; অথচ যাহার পরিণামফল সুদূরপ্রসারী; তিনি ভ্রমরের নিকট হইতে সে রাত্রির ঘটনা গোপন করিলেন। ভ্রমর বালিকা হইলেও পতিপ্রাণা; সে রাত্রে গোবিন্দলালের মুখ দেখিয়া ও তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাহার সন্দেহ হইল, 'আজ কিছু হইয়াছে।' কিন্তু তাহার সনির্ব্বন্ধ প্রশ্নের উত্তরে

গোবিন্দলাল তাহার অশ্রু মুছাইয়া প্রশ্নটি এড়াইয়া গেলেন, কতকটা হেঁয়ালি ভাষায় বলিলেন, "তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।.... দুই বৎসর পরে বলিব।" (১।১৮)। গোবিন্দলাল জীবনে এই প্রথম ভ্রমরের নিকট আত্মগোপন করিলেন। ইহার দুইটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে: এক, তাহারই কথায় এত বড় একটা অনর্থ ঘটিতে যাইতেছিল, ইহা শুনিলে ভ্রমর আঘাত পাইবে; দুই, নিজের মনের দুর্ব্বলতার জন্য গোবিন্দলাল ঘটনাটি বর্ণনা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত কারণ গৌণভাবে তাঁহার মনের মধ্যে কাজ করিলেও, প্রধানতঃ শেষোক্ত কারণেই গোবিন্দলাল কথাটা চাপা দিয়া থাকিবেন। 'দুই বৎসর পরে বলিব।'—তাঁহার এই উক্তি হয়ত অর্থহীন, হয়ত ভ্রমরের মনস্তুষ্টির জন্যই এইরূপ বলিয়া থাকিবেন। আর যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই বৎসর, অর্থাৎ বেশ কিছুদিন সময় লইয়া থাকেন (ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না), তাহা হইলে তাহার কারণ হয়ত এই যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ততদিনে তাঁহার নিজের যেমন কোনরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য থাকিবে না, সুতরাং ভ্রমরের সহিত এ সম্বন্ধে সহজভাবে কথা বলিতে পারিবেন, অতীতের অবিমৃষ্যকারিতার স্মৃতিও তেমনই ভ্রমরের কোনরূপ মনঃপীড়ার কারণ হইবে না। যাহা হউক, যিনি সেইদিন অপরাহ্নে ভ্রমরের সহিত রোহিণীর কথা লইয়া প্রাণখোলা রহস্য করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই গোপনপ্রবণতা তাৎপর্য্যপূর্ণ। এবং গোবিন্দলাল যদি ঘটনাটি যথাযথ বিবৃত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহা নানা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া ভ্রমরের কানে পৌঁছিলে যে সকল অপ্রীতিকর সন্দেহ তাহাকে পীড়া দিল তাহা তাহার মনে স্থান পাইত না। ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলালের এই আত্ম-গোপন হইতেই তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদের গোড়াপত্তন। এবং এই সময় হইতেই ভ্রমরের একটানা সুখের স্রোতে মন্দা পড়িল।

গোবিন্দলাল নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি বুঝিয়াছেন, 'তাঁহার এই পূর্ণযৌবন,....রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই।' তাই 'প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত' তাঁহার মন রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া রোহিণীকে ভুলিবার উদ্দেশ্যে গোবিন্দলাল পিতৃব্যের অনুমতি লইয়া মহাল পরিদর্শনে যাত্রা করিলেন।[১]

গোবিন্দলালের সঙ্কল্প প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইলেন

১ বিপরীত চিত্র হিসাবে কমলমণি কুন্দকে কলিকাতা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলে নগেন্দ্রনাথের আচরণ স্মরণীয়।

প্রধানতঃ ভ্রমরের শুভাশুভ চিন্তা করিয়া। তাঁহার চিন্তার ধারা এইরূপঃ 'মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।' (১।১৯, ৫৩ পৃঃ)। এইখানেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর দুর্ব্বলতা। তিনি যদি চিত্তসংযমের জন্যই চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে ভ্রমরের প্রতি অভিমানের ফলে তাঁহার অধঃপতন অত দ্রুত বা সহজ হইত না।

সহজ অবস্থায় ভ্রমরের একনিষ্ঠ ভালবাসা হয়ত রক্ষাকবচের ন্যায় তাঁহাকে সকল অমঙ্গলের স্পর্শ হইতে বাঁচাইতে পারিত। কিন্তু গোবিন্দলাল যখন রোহিণীকে এড়াইবার জন্য নিজে দূরে সরিয়া গেলেন, ঠিক সেই সময় গ্রাম্য-রমণীগণের কুৎসার রন্ধ্রপথে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনে অনর্থ প্রবেশ করিল। এবং রোহিণীর রূপের আকর্ষণের সহিত ভ্রমরের ভুলের যোগাযোগ গোবিন্দ-লালের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার অধঃপতনের পথ সুগম করিল।

ভ্রমরের প্রথম ভুল গ্রাম্যরমণীগণের কুৎসা ও রোহিণীর স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রবাসী স্বামীর নিকট অভিযোগপূর্ণ মর্ম্মান্তিক পত্রপ্রেরণ। কিন্তু এই পত্র এবং একই ডাকে ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে ভ্রমরের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগপূর্ণ পত্র পাইয়া বিস্মিত ও 'স্তম্ভিত' হইলেও, গোবিন্দলাল ভ্রমরের ন্যায় কোনরূপ একতরফা বিচার করিলেন না; পরন্তু প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য তিনি পরদিবস দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি এখনও অমলিন; সুতরাং ভ্রমর যদি পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইত, তাহা হইলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে বোঝাপড়ার ফলে ক্ষণিকের মেঘ সহজেই কাটিয়া যাইত। কিন্তু ভ্রমর পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইল না, পত্রে যাহা লিখিল কার্য্যতঃ সে তাহাই করিল, স্বামী দেশে ফিরিতেছেন সংবাদ পাইয়া কৌশলে পিত্রালয়ে গমন করিল।

এই সময় হইতেই গোবিন্দলালের অধঃপতনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ; অথবা, প্রকৃতপক্ষে ইহাকেই তাঁহার অধঃপতনের আরম্ভ বলা যাইতে পারে। কারণ রোহিণীর রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিলেও গোবিন্দলাল ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন এবং আত্মরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। কিন্তু এক্ষণে ভ্রমরের উপর দারুণ অভিমান জন্মিল এবং সেই সঙ্গে যে শক্তি পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাকে সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইয়াছে ক্রমে তাহার উৎস শুকাইয়া গেল। গোবিন্দলালের অভিমান, অভিমানবশে ভ্রমরকে আনি বার জন্য লোক পাঠাইতে নিষেধ করা তাঁহার পক্ষে শুধু যে স্বাভাবিক তাহা নহে, এ পর্য্যন্ত তাঁহার আচরণের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগের কারণ নাই।

ভ্রমরহীন জীবন যখন নিতান্ত অসহনীয় হইল, তখন কুবুদ্ধি তাঁহাকে

পাইয়া বসিল, গোবিন্দলাল 'মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা।...যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি—নহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না,' এবং এই অজুহাতে তিনি প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে ভ্রমরের প্রতি অভিমানের সুযোগ লইয়া তাঁহার গোপন লালসা তাঁহার চেতন মনকে অভিভূত করিল। ক্রমে ব্যবধান ঘুচিল, গোবিন্দলালের সহৃদয়তার সুযোগ লইয়া অভিযোগের ছলে চতুরা রোহিণী যেদিন বুঝিয়া গেল তাহার 'ক্ষণিকের কটাক্ষ' ব্যর্থ হয় নাই (১।২৫, ৬৪-৬৫ পৃঃ),—সেই দিন হইতে গোবিন্দলালের অধঃপতনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর যখন পিত্রালয় হইতে ফিরিল তখন ব্যাধি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল ব্যাপারটিকে আরও ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমরের এই সময়ের আচরণে অভিমানের ঝাঁঝ নাই। কতকটা সময়ের ব্যবধানজনিত প্রাকৃতিক নিয়মে, কতকটা কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুজনিত শোকে ভ্রমরের উত্তেজনা কাটিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভ্রমর নিজের ভুল বুঝিয়াছে। এই কারণেই ভ্রমর রোহিণী সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিল না। গোবিন্দলালও রোহিণীর প্রসঙ্গ তুলিলেন না, কিন্তু তাহা অন্য কারণে। গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রসঙ্গ তুলিলেন না, কারণ তিনি আর রোহিণী সম্বন্ধে নিরপরাধী নহেন। অথচ গোবিন্দলাল বা ভ্রমর যে কোন পক্ষ হইতে রোহিণীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আর যাহাই হউক, কুৎসারটনা ব্যাপারে ভ্রমর যে সম্পূর্ণ নির্দোষ গোবিন্দলাল তাহা জানিতে পারিতেন এবং সেই সঙ্গে তিনি রোহিণীর কুৎসিত কারসাজির তথ্যও অবগত হইতেন, সুতরাং ভ্রমরের বিসদৃশ আচরণের একটা সঙ্গত কৈফিয়ত পাইতেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। পিতৃব্যের শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া গেলে অবসরমত রোহিণীর সম্পর্কে তাহার সহিত বোঝাপড়া করিবেন, ভ্রমরের নিকট এইরূপ ইঙ্গিত করিলেও, শেষ পর্য্যন্ত গোবিন্দলাল উইলের কথাই তুলিলেন। (১।২৮)। তাঁহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট; গোবিন্দলাল ভ্রমরের সহিত আপোষ-মীমাংসার জন্য আগ্রহান্বিত নহেন, তিনি চাহেন উইল উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের মনো-মালিন্য কায়েমী করিতে। ভ্রমর যখন সাশ্রুনয়নে নিজের অপরাধের জন্য গোবিন্দলালের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল, গোবিন্দলাল উইলের কথা তুলিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিলেন; ভ্রমরের কাতরতা, উইল সম্বন্ধে তাহার যুক্তি তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল না। ভ্রমরের অপরাধ বা কৃষ্ণকান্তের উইল এখন আসল কথা নহে, আসল কথা রোহিণীর রূপের মোহ। রোহিণীর রূপ গোবিন্দলালের

মনে বাসনার আগুন জ্বালাইয়াছে, ইহার পরিণামে যে ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল, ভ্রমরের অপরাধ বা কৃষ্ণকান্তের উইল তাহাতে ইন্ধন মাত্র। 'আলুলায়িত-কুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা....সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা' যখন তাঁহার পদতলে পড়িয়া, গোবিন্দলালের চক্ষের সম্মুখে তখন ভাসিতেছে 'তীব্র-জ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী, প্রভাতশুক্রতারারূপিণী, রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা' রোহিণার মূর্ত্তি। যিনি একদিন মনে মনে শপথ করিয়াছিলেন, 'মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না', তিনি এক্ষণে ভাবিতেছেন, 'এ কালো। রোহিণী কত সুন্দরী। এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।—আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা, সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।' ভ্রমরের কাতর প্রার্থনার উত্তরে প্রকাশ্যে গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

বঙ্কিম কুমতি ও সুমতির কলহের ভিতর দিয়া (১।২৯) গোবিন্দলালের এই সময়ের মানসিক অবস্থা পরিস্ফুট করিয়াছেন। মানব মনের একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা এই যে, আগে হইতে ইচ্ছানুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পরে তাহার অনুকূল যুক্তি খুঁজিয়া বেড়ায়। গোবিন্দলালের তাহাই হইল। তিনি স্থির করিলেন, ভ্রমর গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, নহিলে তাহার প্রতি নিজের আচরণ সমর্থন করা চলে না। তাঁহার বিচারবুদ্ধি, তাঁহার মনুষ্যত্ব, তাঁহার সুমতি বলিল, তুমি অবিশ্বাসের যোগ্য, যে দোষ করিতে সক্ষম তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া ভ্রমর কোন গুরুতর অপরাধ করে নাই। তাঁহার কুমতি আত্মসমর্থন করিতে যাইয়া বলিল, ভ্রমর তাঁহাকে দোষী করিয়াছে বলিয়াই তিনি দোষী হইয়াছেন, নহিলে পূর্ব্বে তিনি কখনও অবিশ্বাসের কাজ করেন নাই। এইরূপ অর্দ্ধসত্য দ্বারাই মানুষ আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া থাকে।

গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের এই দুর্দ্দিনে একজন ছিলেন যিনি তৎপর হইলে হয়ত তাঁহাদিগকে সকল অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। ইনি গোবিন্দলালের মাতা। বঙ্কিম দু'একটি রেখায় এই চরিত্রটিকে জীবন্ত রূপ দিয়াছেন। গোবিন্দলালের মাতা বুঝিয়াছিলেন, 'বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে।' কিন্তু হিন্দুর ঘরের বিধবা স্বভাবতঃই স্পর্শকাতর, তাহাতে তিনি 'পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপর একটু বিদ্বেষাপন্নাও হইয়াছিলেন।' সুতরাং যাহাতে ভ্রমর-গোবিন্দলালের মনোমালিন্য দূর হইতে পারে তিনি

সে চেষ্টা করিলেন না, পরন্তু অভিমানবশে কাশীবাসের সঙ্কল্প করিলেন। (১।৩০)। গোবিন্দলাল যদি ভ্রমরের সঙ্গ এড়াইতে চাহেন, এইরূপে তাহার সুযোগ জুটিল। তিনি মাতাকে ৺কাশীধামে পৌঁছাইয়া দিবার অজুহাতে হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করিলেন। একদিন যিনি ভ্রমরের মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া দেশান্তরে গিয়াছিলেন রোহিণীকে ভুলিবার উদ্দেশ্যে, আজ তিনি মূর্ত্ত কল্যাণকে পায়ে দলিয়া চলিলেন রূপের পূজা করিতে। ইহার পরে আমরা পুনরায় যখন তাঁহাকে দেখিতে পাই তখন তিনি আর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রমরের স্বামী গোবিন্দলাল নহেন, তাঁহার পরিচয় তিনি অজ্ঞাতকুলশীল চুনিলাল দত্ত।

নগেন্দ্রের জীবনে কুন্দের ন্যায়, গোবিন্দলালের জীবনে রোহিণী অভিশাপ-রূপিণী এবং কুন্দ ও রোহিণীর মধ্যে ভাসাভাসাভাবে কিছুটা সাদৃশ্যও রহিয়াছে। উভয়েই বালবিধবা। কুন্দ যেমন নগেন্দ্রের, রোহিণীও তেমনই গোবিন্দলালের প্রণয়াকৃষ্ট হইয়াছে। উভয়েই কলিকাতা যাইতে আদিষ্ট হইয়াছে; ঘটনাচক্রে কুন্দের যাওয়া হইল না, রোহিণী যাইতে অস্বীকৃত হইল। গভীর নৈরাশ্যে কুন্দ পুষ্করিণীর জলে মরিতে চাহিয়াছে, নগেন্দ্র আসিয়া পড়ায় তাহার মরা হইল না; গভীর নৈরাশ্যে, কতকটা ভ্রমরের ভর্ৎসনার[১] ফলে রোহিণী শুধু যে মরিতে চাহিয়াছে তাহা নহে, সত্যই সে জলতলে ডুবিয়াছিল, গোবিন্দলাল তাহাকে মরিতে দিলেন না।

কিন্তু এই সকল সাদৃশ্য সত্ত্বেও কুন্দ ও রোহিণী বিপরীতধর্ম্মী চরিত্র। কুন্দ মূর্ত্ত সরলতা, নিজের রূপগুণ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অচেতন এবং কখনও সে নিজের স্বার্থ খোঁজে নাই; রোহিণী চতুরা, নিজের রূপগুণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং মোটের উপর সে আত্মস্বার্থানুেষিণী। কুন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর জীবনে যত দুঃখই আসুক, জানিয়া শুনিয়া সে কখনও তাঁহাদের অনিষ্ট চিন্তা করে নাই, পরন্তু সূর্য্যমুখীর কথা ভাবিয়া একদিন সে নগেন্দ্রের প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; রোহিণী গোবিন্দলালের দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের সুখের নীড়ে আগুন জ্বালাইয়াছে, ভ্রমরের শুভাশুভ কখনও তাহার চিন্তার বিষয় হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, চরিত্রের দিক দিয়া 'বিষবৃক্ষে'র হীরার সহিত রোহিণীর কতকটা সাদৃশ্য-মূলক তুলনা করা চলে। উভয়েই তুল্য চতুরা, উভয়েই লালসাপীড়িতা ও ঈর্ষ্যাপরায়ণা। হীরা সূর্য্যমুখীর সৌভাগ্যকে ঈর্ষ্যা করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ

১ রোহিণীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভ্রমরের ভর্ৎসনা এবং ক্ষীরির মারফত রোহিণীর প্রতি তাহার নির্দ্দেশ, হরিদাসী বৈষ্ণবীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া কুন্দের প্রতি সূর্য্যমুখীর ভর্ৎসনা স্মরণ করাইয়া দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই পরিণামফল তুল্য করুণ।

খুঁজিয়াছে, রোহিণী নিজের দুর্ভাগ্যের সহিত ভ্রমরের সৌভাগ্যের তুলনা করিয়া তাহার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়াছে। অবশ্য হীরার তুলনায় রোহিণীর ঈর্ষ্যার অপরাধ ক্ষমার্হ। রোহিণী ভ্রমরের সহিত নিজের অদৃষ্টের তুলনা করিয়া মুহূর্ত্ত পরেই নিজেকে সংযত করিয়া বলিতেছে, "দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন?" (১।৭)। এবং পরবর্ত্তীকালে সে যখন বানারসী শাড়ী ও গিল্‌টির গহনা দেখাইয়া ভ্রমরকে 'হাড়ে হাড়ে' জ্বালাইল (১।২২) তখন তাহার অবচেতন মনে যদিই কিছুটা পরশ্রীকাতরতা থাকিয়া থাকে, ইহার প্রত্যক্ষ কারণ প্রতিশোধবাসনা। রোহিণী ভাবিয়াছিল, ভ্রমরই গোবিন্দলালের সহিত তাহার নাম জড়াইয়া কুৎসা রটনা করিয়াছে; তাহার কুৎসিত চাল ইহার পাল্টা জবাব।

রোহিণীর রূপ আছে, যৌবন আছে, রূপযৌবনের উন্মাদনা আছে। কিন্তু রোহিণী বালবিধবা। স্বামীর স্মৃতি অনেক সময় দুর্ভাগিনী স্বামীহারাকে পৃথিবীর সকল প্রলোভন হইতে শক্তি দেয়; কিন্তু রোহিণী অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে বলিয়া হউক বা যে কারণেই হউক, স্বামীর স্মৃতি কখনও তাহাকে কোনরূপ উন্মনা করিয়াছে আখ্যায়িকায় এরূপ কোন নিদর্শন নাই। রোহিণীর বর্ত্তমান নাই, তাহার অতীতের স্মৃতির সম্বল নাই যে তাহা লইয়া সে বর্ত্তমানের রিক্ততার দৈন্য ভুলিবে। অতীতের কথা ভাবিতে হয়ত একদিনের স্মৃতি কখন কখন তাহার মনে পড়ে, মনে পড়ে রাত্রিকালে যেদিন সে একলাটি মাঠের মাঝে পথ হারাইয়াছিল, সেদিন যদি জমিদারপুত্র হঠাৎ আসিয়া তাহাকে রক্ষা না করিতেন!—সেদিনের কথা স্মরণ করিতে রোহিণীর চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া ওঠে। এইরূপে কখন যে হরলাল তাহার মনের অনেকটা স্থান জুড়িয়া বসিল, হয়ত রোহিণী নিজেই তাহা জানিতে পারে নাই।

হরলাল যে পূর্ব্ব হইতেই, অর্থাৎ আখ্যায়িকায় তাহার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই রোহিণীকে আকর্ষণ করিয়াছে বঙ্কিম কৌশলে তাহার সুস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। চতুর হরলাল যখন স্বার্থসিদ্ধির আশায় তাহার দ্বারস্থ হইয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।" (১।৩), বিকারশূন্য হইলে রোহিণী কখন সে কথায় শিহরিয়া উঠিত না। এবং পূর্ব্ব হইতে দুর্ব্বলতা ছিল বলিয়াই হরলাল কর্ত্তৃক বিধবাবিবাহের অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের ফলে যে বাসনা তাহার অবচেতন মনে উঁকিঝুঁকি মারিত, তাহাই তাহার চেতন মনকে চঞ্চল করিল। রোহিণী ধর্ম্মজ্ঞানবিরহিতা নহে, কিন্তু হরলালকে পাইবার আশায় হিতাহিতজ্ঞান হারাইল। ক্ষণিক পূর্ব্বেও (হরলাল কর্ত্তৃক বিধবা বিবাহের

দেশত্যাগের আদেশ দিলেন, তখন শেষ পর্য্যন্ত সে আদেশ পালনে অসম্মত হইলেও, রোহিণী ইহা স্পষ্টই বুঝিয়া গেল যে, নৈরাশ্যের অশ্রুই তাহার প্রেমের সওদাগরির লভ্যাংশ। তাহার মনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন ক্ষীরির মারফত ভ্রমরের নিকট হইতে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরার নির্দ্দেশ আসিল। অপরের কথায় কেহ কখন মরিতে পারে না; রোহিণী যে আত্ম-হত্যার চেষ্টা করিল তাহার মূলে প্রধানতঃ তাহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা, ভ্রমরের ভর্ৎসনা উপলক্ষ্য মাত্র। গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়াই রোহিণী মরিতে চাহিয়াছে, 'রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা' করিয়াছে। (১।৯, ২৫ পৃঃ)। ঘটনাচক্রে তাঁহার নিকট দুর্ব্বলতা জানাইতে পারিয়া সাময়িক সুখী হইলেও (১।১২), তিনি যে ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, ইহাতে রোহিণীর নৈরাশ্য বাড়িল, সুতরাং মৃত্যুর আকাঙক্ষাও বাড়িল। এক্ষণে ব্যর্থতার উপর কলঙ্কের বোঝা চাপিয়াছে। ভ্রমর যখন মরিতে বলিয়াছে তখন নিশ্চয় সে সকল কথা শুনিয়াছে, হয়ত ক্ষীরিও শুনিয়া থাকিবে। রোহিণী এতখানি সহ্য করিতে পারিবে না; রোহিণী মরিবে, মরিয়া সকল ব্যথা জুড়াইবে, সকল লাঞ্ছনার উপর জয়ী হইবে।

কিন্তু গোবিন্দলাল মৃত্যুর অন্তরায় হইলেন। এবং এই উপলক্ষ্যে রোহিণী তাঁহার নিকট দ্বিতীয়বার প্রাণের জ্বালা জানাইবার সুযোগ পাইল। এবার উত্তেজনার মুখে তাহার উক্তি আরও সুস্পষ্ট, একটুকু ঝাঁঝালো। কিন্তু এখনও রোহিণীর পাপের পথে দুইটি অন্তরায়: এক, গোবিন্দলাল অপ্রাপনীয়; দুই, এখনও কলঙ্কভয় রহিয়াছে; নহিলে সে রাত্রে গোবিন্দলাল তাহাকে কাছে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিলে রোহিণী কোনরূপ আপত্তি করিত না, পরন্তু হয়তো ইহাতে সম্মত হইত।

একশ্রেণীর লোক আছে যাহারা কলঙ্ককে ভয় করে, কিন্তু একবার কলঙ্ক রটিলে আর তাহাদের ভয় বা লজ্জা থাকে না। রোহিণী সেই শ্রেণীর। ক্ষীরির কৃপায় যখন তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটিল, রোহিণী স্বভাবতঃই সিদ্ধান্ত করিল, ইহা ভ্রমরের কাজ। পূর্ব্ব হইতেই তাহার মন ভ্রমরের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রবল হইল। একদিন যে রোহিণী কলঙ্কের ভয়ে দুর্ব্বল শরীরে একাই গৃহে ফিরিয়াছে, পরিবর্ত্তিত প্রতিবেশে স্বেচ্ছায় সে মিথ্যা কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইল এবং ইহাতে কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। (১।২২)। অতঃপর গোবিন্দলালের সহিত যখন তাহার সাক্ষাৎ হইল (১।২৫), রোহিণী তখন বিজয়িনী, অন্তরের সঞ্চিত বাসনা-তৃপ্তির পথে তাহার আর কোন অন্তরায় নাই।

এ পর্য্যন্ত রোহিণীর চরিত্রাঙ্কনে কোনরূপ বিতর্কের সৃষ্টি হয় নাই। প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহার জীবনের পরিণতি লইয়া। বাংলার অন্যতম অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র একাধিক স্থলে এই পরিণতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।[১] শরৎচন্দ্রের অভিযোগ সংক্ষেপতঃ এইরূপ: রোহিণী গোবিন্দলালকে 'অকৃত্রিম এবং অকপটেই' ভালবাসিয়াছিল, 'উইল বদলাইতে সে কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল—গোবিন্দলালের ভাল করিতে, 'বারুণী'র জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল সে এমনই প্রিয়তমের জন্য....।' কিন্তু 'সমাজের ও নীতির convention' অনুসারে সে পাপিষ্ঠা, সুতরাং 'পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট নীতির আইনে' তাহাকে বিশ্বাসঘাতিনী হইতে হইল; নহিলে তাহার চরিত্রের সহিত 'মিনিট পাঁচেকের দেখায়' নিশাকরের প্রতি আসক্তির কোন সামঞ্জস্য নাই। পাপের শাস্তিবিধানের জন্য এই যে 'অদ্ভুত উপায়' অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাতে শুধু রোহিণীই মরিল না, তাহার সঙ্গে মরিল 'সত্য, সুন্দর art।' কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ও রোহিণীর হত্যার বিরুদ্ধে একাধিক আপত্তি তুলিয়াছেন। তিনি বলেন:

'রোহিণীর পরিণতির জন্য তিনি (বঙ্কিম) পিস্তলের প্রয়োগ করিয়াছেন। গোবিন্দলালকে চরমতম পাপী করিয়া তোলা ও রোহিণীকে অপসারণ ঐ দুই পাখী তিনি এক ঢিলে মারিয়াছেন।

যাহাদের জীবনে শিল্পী ট্র্যাজেডি ঘটান, তাহারা একেবারে পাঠকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলে রস জমে না বলিয়াই মনে করি। 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল' এই নীতির সার্থকতায় আমাদের ন্যায়-তৃষ্ণার তৃপ্তি হয়, ইহা অভাবমোচন মাত্র, ইহা নূতন একটা লাভ নয়। সেজন্য মনে হয় গোবিন্দলালকে খুনী বানাইয়া তাহাকে পাঠকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত না করিলেই ভাল হইত—অনেকে ইহাই মনে করেন। পক্ষান্তরে রোহিণীর জীবনেও পাঠক একটা ট্র্যাজেডি প্রত্যাশা করিতেছিল। বলা বাহুল্য, এ ট্র্যাজেডির অর্থ মৃত্যু নয়। পাপের স্বাভাবিক পরিণতিই এই ট্র্যাজেডি, অন্ততঃ জীবনের গতির একটা পরিবর্ত্তন—তাহাই প্রকৃতি-সম্মত। কিন্তু রোহিণীর হত্যায় দুইএর একটাও হইল না।'[২] অর্থাৎ গোবিন্দলাল এবং রোহিণী, উভয়ের চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়াই তিনি রোহিণীর হত্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছেন। তিনি

১ স্বদেশ ও সাহিত্য: 'সাহিত্য ও নীতি', ৭৮-৭৯ পৃঃ এবং 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ', ১০৮-০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, প্রথম খণ্ড (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ), ২৪৭ পৃঃ।

মনে করেন গোবিন্দলালকে হত্যাকারী বানাইবার ফলে উপন্যাসের রসহানি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, নিশাকরের আগমনে রোহিণীর আচরণ তাহার চরিত্র-বিরুদ্ধ এরূপ অভিযোগ না করিলেও তিনিও 'নীতির convention' ও আর্টের দাবীর প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং তাঁহার মতে রোহিণীর শোচনীয় জীবনাবসান 'পাপের স্বাভাবিক পরিণতি' নহে। দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও এই শেষোক্ত অভিযোগ শরৎচন্দ্রের অভিযোগের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; সুতরাং একযোগে উভয় অভিযোগের আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে কবিশেখরের অপর অভিযোগের আলোচনা করিতেছি:

বিয়োগান্ত কাহিনীর নায়ক হিসাবে হত্যাকারী গোবিন্দলাল (বর্ত্তমান আলোচনায় 'পরিশিষ্টে'র সন্ন্যাসী গোবিন্দলালকে স্বভাবতঃই গণনার বাহিরে রাখা হইয়াছে) নিঃসঙ্গ নহেন। শেক্‌স্‌পীয়ারের একাধিক ট্র্যাজেডির নায়ক হত্যাকরী। ওথেলো ইয়াগোর প্ররোচনায় বুদ্ধিভ্রমে সাধ্বী পত্নীকে শ্বাসরোধে হত্যা করিয়াছেন; কিন্তু কোন অবস্থাতেই (এমন কি তিনি যখন ডেস্‌ডেমোনাকে হত্যা করেন তখনও) তাঁহার সহজাত মহত্ত্ব নষ্ট হয় নাই এবং কোন অবস্থাতেই তিনি পাঠকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হন নাই। ম্যাক্‌বেথ্ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। সিংহাসনের লোভে তিনি একান্ত বিশ্বাসপরায়ণ রাজ-অতিথিকে নিদ্রিতাবস্থায় হত্যা করিয়াছেন, সিংহাসন লাভ করিয়া নিরাপত্তার জন্য ব্যাঙ্কো'কে (Banquo) অপসারিত করিয়াছেন এবং ফ্লিয়ান্সের (Fleance) অপসারণের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে ঘাতকের দল ম্যাক্‌ডাফ্-পত্নী (Lady Macduff) ও তাঁহার শিশুপুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। তথাপি বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শেষ জীবনে সকল দিক দিয়া ব্যর্থতার অনুভূতির ফলে তিনি পাঠকের সহানুভূতি না হইলেও তাঁহার অনুকম্পা আকর্ষণ করিয়াছেন। ম্যাক্‌বেথ্ হত্যাকারী বলিয়া ট্র্যাজেডির রসহানি হয় নাই। গোবিন্দলাল সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে, তিনি রোহিণীকে হত্যা করিয়াছেন এবং তিনি ভ্রমরের মৃত্যুর কারণ; ইহার ফলে পাঠকের সহানুভূতি হারাইলেও ভ্রমরের মৃত্যুর পর আত্মগ্লানির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার অনুকম্পা আকর্ষণ করিয়াছেন। গোবিন্দলালকে হত্যাকারী বানাইবার ফলে উপন্যাসের রসহানি হইয়াছে এরূপ অভিযোগ বিচারসহ নহে। তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থায় রোহিণীকে হত্যা করা স্বাভাবিক কিনা ইহাই আসল প্রশ্ন। রোহিণীর দিক দিয়া যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নের বিচার করিব।

হরলালের প্রলোভনে পড়িয়া রোহিণী গোবিন্দলালের যে অনিষ্ট করিয়াছে,

প্রতিদানের কামনা বা আশা না করিয়া তাহার প্রতিবিধানকল্পে সে যে পুনরায় 'কৃষ্ণকান্তের ন্যায় বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল' তাহা নিঃসন্দেহ প্রশংসনীয়। এবং ইহাতে শুধু গোবিন্দলালের প্রতি নহে, পিতৃব্য ব্রহ্মানন্দের প্রতিও তাহার কর্ত্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং প্রণয়ে নৈরাশ্য আত্মহত্যার প্রেরণা যোগাইয়াছিল, এই হিসাবে 'প্রিয়তমের জন্য' সে প্রাণ দিতে গিয়াছিল, ইহাও মানিলাম। কিন্তু রোহিণীর চরিত্রে আসঙ্গলিপ্সার প্রাবল্যের ফলে তাহার ভালবাসায় তীব্রতা থাকিলেও তাহাতে লালসার খাদ এত বেশী যে সে ভালবাসা কতটা 'অকৃত্রিম ও অকপট' তাহা সন্দেহাতীত নহে। অন্ততঃ রোহিণীর ভালবাসায় গভীরতার অভাব রহিয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এইখানেই শরৎচন্দ্রের সাবিত্রীর মত চরিত্রের সহিত তাহার মৌলিক পার্থক্য। সাবিত্রী সর্ব্ব অবস্থাতেই প্রণয়াস্পদকে সকল প্রকার অকল্যাণ ও সামাজিক গ্লানি হইতে যথাসম্ভব আগুলিয়া রাখিয়াছে। পক্ষান্তরে, রোহিণী স্বীয় লালসাতৃপ্তির জন্য গোবিন্দলালকে কলঙ্কের পঙ্কিল আবর্ত্তে টানিয়া নিয়াছে। এইখানেই রোহিণীর চরিত্রের আসল দুর্ব্বলতা। রোহিণী হরলালকে চাহিয়াছিল ভালবাসিয়া নহে, লালসাতৃপ্তির উপকরণ হিসাবে। গোবিন্দলালের জন্য তাহার ত্যাগস্বীকার কতটা ভালবাসাপ্রণোদিত, কতটা হরলাল কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইবার ফলে অনুশোচনার প্রতিক্রিয়া সে প্রশ্ন না তুলিয়াও মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, গোবিন্দলালের নিকটও সে মুখ্যতঃ আত্মসুখ খুঁজিয়াছে। এই কারণেই গোবিন্দলালের শুভাশুভ চিন্তা করিয়া সাবিত্রীর ন্যায় সে তাঁহাকে দূরে রাখিতে পারে নাই। এই কারণেই ব্রহ্মানন্দের শুভাশুভ চিন্তা করিয়া জাল উইল সম্বন্ধে কৃষ্ণকান্তকে সোজাসুজি কিছু না জানাইয়া গোপনে পুনরায় উইল পাল্টাইতে যাইয়া নিজের উপর বিপদের ঝুঁকি টানিয়া আনিলেও, ভ্রমরের নিকট হইতে গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই।

রোহিণী রূপগর্ব্বিতা, বিলাসপ্রিয় ও আসঙ্গলিপ্সু। এই শ্রেণীর নারী সাধারণতঃ ফ্লার্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। বিড়ালের প্রতি 'বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষে', কোকিলের প্রতি 'উর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষে', 'হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে' বারুণীর ঘাটে জল আনিতে যাইবার কালে তাহার চলনভঙ্গীতে বঙ্কিম আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই রোহিণীর এই বিশিষ্ট মনোবৃত্তির ইঙ্গিত করিয়াছেন। হরলালের প্রতি আচরণে এবং পরবর্ত্তীকালে গোবিন্দলালের প্রতি আচরণে রোহিণী এই সর্ব্বনাশা খেলা খেলিবার সুযোগ পায় নাই, কারণ তাহার বুভুক্ষু

অন্তর ইঁহাদের উভয়কেই একান্ত নিবিড়ভাবে পাইতে চাহিয়াছে। তাহা হইলেও হরলালের প্রতি তাহার ইঙ্গিতপুর্ণ উক্তি : 'তা বিধবাই হৌক, সধবাই হৌক—বলি বিধবাই হৌক, কুমারীই হৌক—একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেই ভাল হয়।' (১৩); গোবিন্দলালের প্রতি তাহার কটাক্ষের আক্রমণ এবং গোবিন্দলাল যখন তাহাকে হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বসবাস সম্বন্ধে বলিলেন, 'গেলে ভাল হইত', তৎকালীন তাহার প্রশ্ন, "কিসে ভাল হইত?" (১১৪, ৪৩ পৃঃ)—এ সকলের সহিত ফ্লার্টের আচরণের ব্যবধান অতি ক্ষীণ। সুতরাং নিশাকরকে দেখিয়া তাঁহার সুশ্রী চেহারা এবং বেশ-ভূষার পারিপাট্য, হয়ত 'একটু তাকাতাকি, আঁচাআঁচি'র ফলে রোহিণীর সুপ্ত ফ্লার্টমনোবৃত্তি জাগিয়া ওঠা, এবং এই কারণে খুল্লতাতের সংবাদ লইবার অজুহাতে চিত্রার বাঁধাঘাটে তাঁহার সহিত একাকিনী সাক্ষাৎ করার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। এবং রোহিণীর নৈতিক আদর্শ অনুসারে সে ইহাকে গোবিন্দলালের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা বলিয়াও মনে করে নাই। এ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন : 'রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা—আর এ আর এক কথা।' (২১৭)। অবশ্য নিশাকর যদি সত্যই তাহার রূপমুগ্ধ হইতেন এবং গোবিন্দলাল যদি এই গোপন অভিসারের সংবাদ না পাইতেন, তাহা হইলে রোহিণী শেষ পর্য্যন্ত তাহার আদর্শের মানদণ্ডেও গোবিন্দলালের প্রতি 'বিশ্বাসহন্ত্রী' না হইবার 'দৃঢ় সঙ্কল্প' অটুট রাখিতে পারিত কিনা, সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে; কারণ আসঙ্গলিপ্সা যেখানে প্রবল, নূতনের মোহ সেখানে দুর্দ্দমনীয়। অবশ্য এস্থলে সে প্রশ্ন অবান্তর। নিশাকরের সহিত ফ্লার্টের আচরণ রোহিণীর চরিত্রবিরুদ্ধ নহে, আমাদের আলোচনার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

(রোহিণীর জীবনের পরিণতির আলোচনাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ভ্রমর না বুঝিয়া উত্তেজনাবশে রোহিণীর প্রাণে যে কঠিন আঘাত করিল, তাহাই পরোক্ষে তাহার মৃত্যুর কারণ হইল। ইহাই হয়ত প্রকৃতির বিধানে অলঙ্ঘনীয় প্রতিশোধবিধি। কিন্তু রোহিণী যে ভ্রমরের বুক হইতে তাহার জীবনসর্ব্বস্ব গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া তাহার সুখের নীড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ইহার প্রতিক্রিয়ায় গোবিন্দলালের হাতেই তাহার মৃত্যু—এ কি শুধু 'সমাজের বিধি ও নীতির convention' অনুসারে 'পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আইনে'র বিধান? সাহিত্যের আইন, 'সত্য, সুন্দর art' কি এক্ষেত্রে একই বিধান দেয় না? সতীর অশ্রু-অভিশপ্ত

ভিত্তির উপর যে সুখ-সৌধ গড়িয়া ওঠে, এইরূপ ভূকম্পনেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহা শাশ্বত সত্য।

এইবার গোবিন্দলালের দিক দিয়া প্রশ্নটির বিচার করিতে চেষ্টা করিব। গোবিন্দলাল গুণ ছাড়িয়া রূপের পূজায় ব্রতী হইলেন, কিন্তু সুখী হইলেন কি? নিশাকরের মুখে বহুদিন পরে তিনি যখন ভ্রমরের নাম শুনিলেন, তৎকালীন তাঁহার মানসিক অবস্থা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়। এবং নিশাকরকে বিদায় দিবার পর গোবিন্দলালের আচরণ হইতেও আমরা তাঁহার মানসিক অবস্থা অনুমান করিয়া লইতে পারি। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ বর্ণনা এইরূপ: নিশাকরকে বিদায় দিয়া গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে গাহিতে বলিলেন এবং নিজে তবলা লইলেন। 'কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল।....তখন গোবিন্দলাল একটি সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৎ সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেতার ফেলিয়া নবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থবোধ হইল না। তখন বহি ফেলিয়া গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন।....শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন।' তারপর 'দুই হাত মুখে দিয়া' কাঁদিতে বসিলেন। (২।৬)।

গোবিন্দলাল রূপের নেশায় কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় রোহিণীর পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন। যেদিন রোহিণীকে পাইলেন, সেই দিনই বুঝিলেন, ভোগে তৃপ্তি নাই, রূপ গুণের স্থান অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, যাহা হারাইয়াছেন তাহা আর ফিরিয়া পাইবার নহে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যে পথে চলিয়াছেন তাঁহাকে সেই পথেই চলিতে হইবে। তাই কৃত্রিম আনন্দে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া গোবিন্দ-লাল স্মৃতির জ্বালা ভুলিতে চাহিয়াছিলেন। নিশাকরের আগমনে যখন সহসা ইহাতে বাধা পড়িল, অতীতের স্মৃতি যখন নূতন করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল, তখন যে পরিমাণে আত্মগ্লানি জন্মিল, ঠিক সেই পরিমাণে রোহিণীর প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল। মনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন রোহিণী অবিশ্বাসিনী এই প্রতীতির ফলে গোবিন্দলালের প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। যাহার জন্য তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন সে যে এমন করিয়া তাঁহার ভালবাসার অবমাননা করিল, ইহার শাস্তি তাহাকে পাইতেই হইবে, রোহিণীকে মরিতে হইবে। গোবিন্দলালকে 'চরমতম পাপী করিয়া তোলা ও রোহিণীর অপসারণে'র উদ্দেশ্যে বঙ্কিম তাঁহাকে হত্যাকারী সাজান নাই; রোহিণীর হত্যার পশ্চাতে রহিয়াছে ভ্রমরের প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া আত্মগ্লানি

এবং রোহিণীই সকল সর্ব্বনাশের মূলে এই অনুভূতির ফলে তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা, যাহা রোহিণী অবিশ্বাসিনী এই প্রতীতির ফলে সহজেই ক্রোধে রূপান্তরিত হইল। দিনে দিনে অলক্ষ্যে ইন্ধন সঞ্চিত হইতেছিল, নিশাকরের ষড়যন্ত্র তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যোগাইল। রোহিণীর পরিণতিতে আর্টের দাবী ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহা গোবিন্দলাল ও রোহিণীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সহিত ঘটনার যোগাযোগের 'স্বাভাবিক পরিণতি'।

তাহা হইলেও শরৎচন্দ্রের উল্লিখিত তীক্ষ্ণ সমালোচনা তাৎপর্য্যহীন নহে। 'মিনিট পাঁচেকের দেখায়' নিশাকরের প্রতি আসক্ত না হইলেও তাঁহাকে লইয়া খেলা করিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে বঙ্কিম রোহিণীর চরিত্রগত দুর্ব্বলতা, তাহার ফ্লার্টি মনোবৃত্তি ভিন্ন অপর কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। ইহার কারণও সুস্পষ্ট : বঙ্কিম হয়ত মনে করিয়াছিলেন, যে নারী প্রবৃত্তির তাড়নায় সামাজিক অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া গোবিন্দলালকে লইয়া বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়াছে, তাহার পক্ষে নূতন করিয়া চিত্তচাঞ্চল্যের ইহার অধিক কারণ নির্দ্দেশের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কৈফিয়ত বর্ত্তমানের পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করে না। এখানে স্বাভাবিক ভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে : যখন 'ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে' তখন গোবিন্দলালের আচরণে কি রোহিণীর প্রতি কোনরূপ বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ পায় নাই ? যদি পাইয়া থাকে (ইহাই স্বাভাবিক) তাহা হইলে রোহিণীর মত বুদ্ধিমতী নারী কি তাহা লক্ষ্য করে নাই ? যদি লক্ষ্য করিয়া থাকে তাহা হইলে কতকটা তাহার প্রতিক্রিয়ায়, কতকটা গোবিন্দলাল বিজিত এবং পুরাতন এই অনুভূতির ফলে গোবিন্দলালের প্রতি তাহার আচরণে কি দূরত্ব, অন্ততঃ আকর্ষণের তীব্রতাহ্রাসের কোন আভাস থাকে নাই ? উপন্যাসে এই সকল প্রশ্নের কোনরূপ উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ফলে রোহিণীর কাল অভিসার তাহার স্বভাববিরুদ্ধ না হইলেও, ইহা পূর্ণ প্রত্যয় সঞ্চার করিতে পারে না।

ভ্রমরের চরিত্রের মূল সুর পতিপ্রাণতা এবং সূর্য্যমুখীর সহিত ইহাই তাহার একমাত্র মিলন সূত্র। অন্যথা উভয় চরিত্রে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যই অধিকতর প্রকট। সূর্য্যমুখী রাসভারী মানুষ, সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। পরিজনবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দাস দাসী সকলেই তাঁহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাঁহাকে ভয় করে। পক্ষান্তরে, ভ্রমর নিতান্ত ছেলেমানুষ (বয়সে সূর্য্যমুখী ষড়বিংশতি, ভ্রমর সতের), 'নিজে হাসিতে যত পটু',

শাসনে তত পটু নহে; তাহাতে মাথার উপর শাশুড়ী ননদ রহিয়াছেন, পরিচারিকা সম্প্রদায় তাহাকে বড় মানিয়া চলে না। ক্ষীরি হইতে আরম্ভ করিয়া বিনোদিনী, সুরধুনী, রামী, বামী প্রভৃতি গ্রাম্যরমণীগণ গোবিন্দ-লালের সহিত রোহিণীর নাম জড়িত করিয়া ভ্রমরের সম্মুখে অসঙ্কোচে যে সকল কুৎসিত মন্তব্য করিল সূর্য্যমুখীর সম্মুখে কেহ কোন দিন কোন কারণে নগেন্দ্রের সম্বন্ধে সেরূপ ভাষা প্রয়োগের কল্পনা করিতে পারে নাই। হীরা কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রনাথের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সূর্য্যমুখীর সম্মুখে দূরের কথা, তাঁহার অসাক্ষাতেও এ সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করার দুঃসাহস তাহার হয় নাই।

সূর্য্যমুখী নিরভিমানিনী; ভ্রমরের দুর্জ্জয় অভিমান। সূর্য্যমুখী যখন বুঝিতে পারিলেন, স্বামী কুন্দের প্রণয়াকৃষ্ট হইয়াছেন তখন তিনি ব্যথিত হইলেন, ভগ্নীসমা ননদিনীর নিকট পত্রে তাঁহার মনের আশঙ্কা জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কখন স্বামীর উপর অভিমান করিতে দেখিতে পাই না। পরন্তু, শেষ পর্য্যন্ত তিনি স্বামীর সুখের জন্য নিজেই উদ্যোগী হইয়া তাঁহার সহিত কুন্দের পরিণয় ঘটাইলেন। সত্য বটে, ইহার পর তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাহা স্বামীর প্রতি অভিমানবশতঃ নহে, স্বামী কুন্দের হইলেন, এ দৃশ্য তাঁহার অসহনীয় বলিয়াই তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। ভ্রমর ভিন্ন উপাদানে গঠিত। উভয়েই তুল্য পতিপ্রাণা; কিন্তু ভ্রমর সূর্য্যমুখীর ন্যায় স্বামীর ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। স্বামী কুন্দের হইলেন, ইহার পরেও গৃহত্যাগের প্রাক্কালে সূর্য্যমুখী কমলমণিকে লিখিতেছেন, 'তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহলাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল, যত দিন না মাটিতে এ মাটি মিশে ততদিন থাকিবে। কেন না, তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।' (বিষবৃক্ষ, ২৮)। পক্ষান্তরে, স্বামী রোহিণীতে অনুরক্ত এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রমর তাঁহাকে লিখিতেছে, 'যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।' (১।২৭)। ভ্রমরের পত্র উত্তেজনার মুহূর্ত্তে লিখিত এবং সে যাহাই বলুক, আঘাতের পর আঘাতেও তাহার পতিভক্তি অচলা রহিয়াছে। তাহা হইলেও

এই দুইখানি পত্রের ভিতর দিয়া আমরা নিরভিমানিনী সূর্য্যমুখী ও অভিমানিনী ভ্রমরের চরিত্রগত পার্থক্যের পরিচয় পাই। সূর্য্যমুখী যদি ভ্রমরের ন্যায় স্বামীর নিকট নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনের পরিণতি যাহাই হউক, কুন্দকে বিবাহ করা নগেন্দ্রের পক্ষে অত সহজ হইত না। পক্ষান্তরে, ভ্রমর যদি একটুকু কম অভিমানিনী হইত, অন্ততঃ পত্নীর অধিকার সম্বন্ধে তাহার যদি এতখানি উগ্র চেতনাবোধ না থাকিত, তাহা হইলে গোবিন্দলাল-ভ্রমরেব, সুতরাং রোহিণীর জীবনের ইতিহাস হয়ত অন্য অক্ষরে লিখিত হইতে পারিত।

ভ্রমর পতিপ্রাণা, স্বামীর বিশ্বাসেই তাহার বিশ্বাস, তাহার নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা নাই—ভ্রমরের চরিত্রের এই এক দিক। কিন্তু আঘাত পাইলে ভ্রমর পূর্ণব্যক্তিত্বশালিনী, তেজোদৃপ্তা ও স্পষ্টবাদিনী। যেদিন হইতে স্বামীর প্রতি তাহার বিশ্বাসের ভিত নড়িল, সেই দিন হইতে আমরা তাহার এই রূপের পরিচয় পাই।

এই সময় ভ্রমর যে সকল ভুল করিল পূর্ব্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি। যখন সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, অনুতপ্ত ভ্রমর স্বামীর ত্রুটিবিচ্যুতি ভুলিয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিল, প্রসঙ্গতঃ ইহারও উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া নির্ম্মম দণ্ড-দাতার সম্মুখে সে নুইয়া পড়িল না। কাশীযাত্রার প্রাক্কালে গোবিন্দলাল নিতান্ত মামুলী ধরনের বিদায় লইতে আসিলে (১।৩০) ভ্রমরের আচরণে যেমন কাতরতা নাই, তেমন অভিমান বা উষ্মা নাই; তাহার আচরণ সংযত ও চিত্তের দৃঢ়তাব্যঞ্জক। ভ্রমর বুঝিয়াছে, স্বামীর সহিত বোঝাপড়ার এই শেষ মুহূর্ত্ত। গোবিন্দলাল যখন রেজেষ্টারী করা দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, যখন ভ্রমরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নির্ম্মম কণ্ঠে জানাইলেন, হরিদ্রাগ্রামে তিনি আর ফিরিবেন না, ভ্রমর তখন শেষবারের মত প্রশ্ন করিল, "ধর্ম্ম নাই কি?" গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "বুঝি আমার তাও নাই।" ভ্রমরের এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল।' অশ্রু যেখানে অনাদৃত, ধর্ম্ম যেখানে উপেক্ষিত, নিষ্ফল ক্রন্দনে ভ্রমর সেখানে তাহার নারীত্বের অবমাননা করিবে না। ভ্রমর বুঝিয়াছে, গোবিন্দলাল রূপান্ধ, কিন্তু তাহার এ বিশ্বাসও রহিয়াছে যে পাপ যতই আপাতজয় লাভ করুক, পুণ্যের উপর সে কখনও চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। ভ্রমর মানস নয়নে যেন সেই দিনটি প্রত্যক্ষ করিল যেদিন গোবিন্দলাল তাঁহার ভুল বুঝিবেন, যেদিন তিনি

'অকৃত্রিম আন্তরিক' স্নেহের জন্য আবার তাহার কাছে ছুটিয়া আসিবেন। ভ্রমর যেন সেই দিনের, সেই ভবিষ্যতের নিজেকেও প্রত্যক্ষ করিল। সেদিন গোবিন্দলালকে তাহারই জন্য কাঁদিতে হইবে। ভ্রমর সকল দুঃখের মধ্যে সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকিবে। ধর্ম্মের উপর একান্ত নির্ভরশীলা সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা 'যোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিতকণ্ঠে' বলিল, "তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও—...একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায় ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিবে না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি একথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।" ভ্রমরের এই উক্তির প্রতি ছত্রে তাহার নির্ভীক ব্যক্তিত্ব, ধর্ম্মে তাহার প্রবল আস্থা এবং সেই সঙ্গে তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার পাতিব্রত্য প্রকাশ পাইতেছে। অনুরূপ অবস্থায় সূর্য্যমুখী হয়ত বলিতেন, 'তুমি বড়, না "পাপ সূর্য্যমুখী" বড়? তুমি কেন "পাপ সূর্য্যমুখী"র জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি যাহাকে পাইলে সুখী হও, তাহাকেই গ্রহণ কর। আমি তোমার সুখের পথে কণ্টক হইব না।' সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর—পাতিব্রত্যে উভয়েই আদর্শ-স্থানীয়া। একজন যদি আত্মবিলোপ করিয়া, অপর আত্মপ্রতিষ্ঠা দ্বারা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

স্বামীপরিত্যক্তা ভ্রমরের চিত্র পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহার পার্শ্বে জ্যেষ্ঠ সহোদরা যামিনীর পরিকল্পনায়।[১] গোবিন্দলাল হত্যাকারী, এই সংবাদে ভ্রমরের মনের প্রতিক্রিয়া যামিনীর সহিত দু'একটি কথায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। (২।১১)। ভ্রমর তখন পিত্রালয়ে। সকল দিক বিচার করিয়া যামিনী তাহাকে হরিদ্রাগ্রামে যাইয়া বাস করিতে উপদেশ দিল। ভ্রমর সম্মত হইল, কিন্তু বলিল,

---

১ গ্রন্থমধ্যে ভ্রমরের একজন 'বড় ননদে'র উল্লেখ রহিয়াছে। (১।৩০)। কিন্তু যে কারণে ভ্রমরের প্রতি শাশুড়ী বিরূপ, সেই একই কারণে ননদিনীর পক্ষেও তাহার প্রতি বিরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। এই কারণেই সখিসমা সহোদরার পরিকল্পনা। 'বড় ননদে'র উল্লেখের সার্থকতা এই যে, এই উপায়ে গোবিন্দলালের মাতার পক্ষে কাশীযাত্রা সহজ হইয়াছে। নহিলে বালিকা ভ্রমরকে একা রাখিয়া কাশীবাস তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না।

এই 'বড় ননদ' কি কৃষ্ণকান্ত রায়ের কন্যা শৈলবতী?

"কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।" যামিনী বুঝিল না, প্রশ্ন করিল, "কি বিপদ ভ্রমর ?"

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তিনি আসেন ?"

যা। সে আবার বিপদ্ কি ভ্রমর ? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে--আহ্লাদের কথা আর কি আছে ?

ভ্র। "আহ্লাদ দিদি! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে!"

ভ্রমর আর কিছু বলিল না, কারণ বলিবার তাহার আর কিছুই নাই। যামিনী সাধারণ হিন্দু রমণী। তাহার সংস্কার তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে, স্বামী দেবতা সুতরাং দোষগুণের অতীত; পূজারিণী পূজার অধিকার পাইয়াই সার্থকজন্মা। সুতরাং ভগিনী হইয়াও যামিনী ভ্রমরের মনের কথা বুঝিল না, বুঝিল না স্বামী হত্যাকারী এ বেদনা ভ্রমরের কাছে বিচ্ছেদের বেদনা হইতেও মর্ম্মান্তিক এবং গোবিন্দলাল ফিরিলেও ইহজীবনে ভ্রমরের সহিত তাঁহার মিলনের পথ রুদ্ধ।

স্বামী হত্যাকারী এ কথা ভ্রমর কোনক্রমে ভুলিতে পারে নাই বলিয়াই ছয় বৎসরের অদর্শনের পর গোবিন্দলাল যখন আশ্রয়ভিক্ষা চাহিয়া পত্র লিখিলেন, ভ্রমর তাহার উত্তরে লিখিল, 'আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। ....আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।' ইত্যাদি। (২।১৩)। ভ্রমরের পক্ষে ইহা অভিমানের কথা নহে; তাহার জীবনে মান অভিমানের পালা অনেকদিনই শেষ হইয়াছে। ইহা মর্ম্মান্তিক যাতনার অভিব্যক্তি! গোবিন্দলাল এই পত্র পাইয়া ভাবিলেন, 'কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই।' দুর্ভাগা গোবিন্দলাল বুঝিলেন না যে, ইহার প্রত্যেকটি অক্ষর ভ্রমরের হৃদয়রক্ত দিয়া লেখা, বুঝিলেন না যে, ইহা স্বীয় মহৎ আদর্শের বেদীমূলে ভ্রমরের আত্মাহুতিদান। ভ্রমর জীবনে ক্ষুদ্র সুখ কামনা করে নাই, সুতরাং ক্ষুদ্র সুখের মোহ তাহাকে বিড়ম্বিত করিতে পারিল না।

ভ্রমরের পত্রের বিষয়বস্তু ছাড়াও দুইটি জিনিষ লক্ষণীয়: ভ্রমর স্বামীকে 'আপনি' সম্বোধন করিয়াছে, ইহা দূরত্বব্যঞ্জক; দ্বিতীয়তঃ, ভ্রমর "সেবিকা" পাঠ লেখে নাই। এই শেষোক্ত জিনিষটি গোবিন্দলাল বন্দরখালী থাকাকালীন তাঁহার নিকট লিখিত পত্রের বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়: 'যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি।' অবশ্য, ভ্রমরের এই উক্তির সহিত সর্ব্বত্র তাহার আচরণের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। এবং পত্রে সে যাহাই লিখিয়া থাকুক, গোবিন্দলালের বিদায়ের প্রাক্কালে সে তাঁহাকে বলিতেছে, "যদি....

কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে ভক্তি থাকে...." ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে তাহার কথায়, অথবা কথায় এবং আচরণে এই যে সামঞ্জস্যের অভাব ইহার কারণ এই যে, নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে সর্ব্ব অবস্থাতেই তাহার অবচেতন মনে গোবিন্দলালের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা অটুট রহিয়াছে, যদিও তাহার ব্যক্তিত্ব তাহার চেতন মনে সকল সময় ইহা স্বীকার করিতে চাহে না।

ভ্রমরের অবচেতন মনের অনুভূতি ও আকাঙক্ষা পূর্ণ অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মৃত্যু যখন আসন্ন সেই সময়ের তাহার আচরণে। হত্যাকারী স্বামীর সহিত যদি পুনরায় সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে সেই দিনকে তাহার 'বিপদের দিন' বলিয়া গণ্য করিলেও মৃত্যুকালে ভ্রমর এই সাক্ষাতের জন্যই ব্যাকুল হইল এবং স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার 'চরণযুগল স্পর্শ করিয়া' পদরেণু মাথায় লইয়া ভ্রমর তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিল। তাহার আচরণে এই যে অসঙ্গতি ইহা শুধু স্বাভাবিক নহে, ইহাই তাহার চরিত্রকে অধিকতর প্রাণবন্ত, সুতরাং অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়াছে। এবং এই অসঙ্গতির অভাবেই মৃণালিনীর চরিত্র অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রাণ।

ভ্রমর মরিল, কারণ হত্যাকারী স্বামীর সহিত ইহজগতে তাহার মিলন সম্ভব নহে এবং ভ্রমরের সহিত মিলন-সুখ গোবিন্দলালেরও প্রাপ্য নহে। কিন্তু ভ্রমরের আত্মত্যাগ নিষ্ফল হইল না। স্বামীর বিষাদক্লিষ্ট মুখমণ্ডল, তাঁহার অশ্রুপূর্ণ আঁখিদ্বয় মৃত্যুর পূর্ব্বে ভ্রমরকে জানাইয়া দিল, সতীর বাক্য নিষ্ফল হয় নাই; গোবিন্দলাল তাহারই, রোহিণীর নহেন। দুঃখপণ্যে ভ্রমর এই যে সম্পদ ক্রয় করিল, ইহাই তাহার মৃত্যুকে মহিমামণ্ডিত করিল। যুগে যুগে বাংলার পাঠক ভ্রমরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অশ্রুতর্পণ করিবে। কিন্তু যে মৃত্যু পথভ্রষ্ট প্রিয়তমকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া দেয় তাহা শুধু অবিমিশ্র দুঃখই জাগাইয়া তোলে না। সে মৃত্যু পরম দুঃখের সহিত লইয়া আসে পরম সান্ত্বনা।

বর্ত্তমানের পাঠক গোবিন্দলালের যে পরিণতির সহিত পরিচিত, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথম সংস্করণে তাঁহার পরিণতি তাহা হইতে অন্যরূপ ছিল। প্রথম সংস্করণে (এবং বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসে) তাঁহার পরিণতি এইরূপ: ভ্রমরের মৃত্যুর পর বারুণীর তীরে 'ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে' বসিয়া (ইহা হয়ত সেই প্রস্তরমূর্ত্তি একদিন ভ্রমর যাহাকে 'কালামুখী' বলিয়া গালি দিয়াছে) ভ্রমর-রোহিণীর কথা ভাবিতে ভাবিতে চিত্তবিকার ঘটিলে রোহিণীর কণ্ঠের আদেশবাণী ("হঁ্যা, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে,

তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।'') শুনিল।

'গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া, স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।'[১]

গোবিন্দলালের পরিণতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণে, অর্থাৎ 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'র পরবর্ত্তীকালে প্রসঙ্গতঃ ইহার উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্কিমের তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গী এই পরিবর্ত্তনের প্রেরণা যোগাইয়াছে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু আর্টের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলেও এই পরিবর্ত্তিত পাঠই অধিকতর শোভন বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দলাল যেদিন রূপের মোহে ভ্রমরকে ত্যাগ করিলেন, লাঞ্ছিতা সতী সেদিন অত বড় দুঃখের মধ্যেও গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল, ''তুমি আমারই—রোহিণীর নও।'' গোবিন্দলাল যদি বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিলেন, তাহা হইলে সতীর বাক্যের সার্থকতা রহিল কোথায় ? গোবিন্দলালের আত্মহত্যা তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থায় অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে ; কিন্তু এরূপ আত্মহত্যা পাপের শাস্তি হইলেও, 'প্রায়শ্চিত্ত' নহে এবং ডুবিবার পূর্ব্বে গোবিন্দলাল 'স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা' করিলেও, ইহা প্রকৃতপক্ষে রোহিণীরই বিজয় ঘোষণা করে। সুতরাং এরূপ পরিণতি আপাতদৃষ্টিতে যতই চমকপ্রদ হউক, আর্টের বিচারে ইহা দোষশূন্য নহে।

ভ্রমর রোহিণীকে প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে স্বীকার না করিলেও গোবিন্দলালকে লইয়া তাহাদের দ্বন্দ্বই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র আখ্যানবস্তু। রোহিণী মরিল, ভ্রমর মরিল। ভ্রমরের শোকে গোবিন্দলাল যখন উন্মাদপ্রায়, যখন তাঁহার শরীর ও মন দুই-ই অবসন্ন, তখন ইন্দ্রিয়বিভ্রমবশতঃ রোহিণীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ এবং পরে 'মুর্চ্ছাবস্থায়....জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি' দর্শন ও তাহার বাণী শ্রবণ গোবিন্দলালের মানসরাজ্যে রোহিণী ও ভ্রমরের প্রভাবের প্রতীক। রোহিণীর

১ বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১২৮৪, ৪৬৯ পৃঃ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল (শতবার্ষিক সংস্করণ)—পাঠভেদ, ১৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

স্মৃতি, একদিন এই বারুণীর স্বচ্ছ জলে রোহিণীর জীবনের বোঝা নামাইতে চাহিয়াছিল, এই অনুভূতি গোবিন্দলালকে আত্মহত্যায় উত্তেজিত করিলেও, ভ্রমরের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার জাগ্রত বিবেক ভ্রমরের জ্যোতির্ময়ী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিল, রোহিণীর প্রদর্শিত পথ মুক্তির পথ নহে, আত্মহত্যায় প্রায়শ্চিত্ত হয় না, ভ্রমরের কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে আশার বাণী শুনাইল, "মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।" গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রভাবমুক্ত হইলেন।

রোহিণী পৃথিবীর সম্পদ অতুল রূপরাশি লইয়া আসিয়াছিল, তাই পার্থিব জগতে সাময়িক তাহারই জয় হইয়াছিল। কিন্তু রূপ ক্ষণিকের, রূপের আকর্ষণ আরও ক্ষণিকের। তাই রোহিণীর বিজয়গৌরব পরাজয়ের লাঞ্ছনায় পর্যবসিত হইল। পক্ষান্তরে, ভ্রমরের ঐশ্বর্য্য অপার্থিব; মৃত্যুতে ভ্রমর তাই রোহিণীর উপর জয়ী হইল। ভ্রমরের মৃত্যুকালে গোবিন্দলালের অশ্রুতে যে জয়ের সূচনা, তাহার অশরীরী আত্মার প্রেরণায় গোবিন্দলাল যেদিন 'ভ্রমরাধিক ভ্রমরে'র সন্ধান পাইলেন সেদিন সে জয় সম্পূর্ণ হইল।

রাজসিংহ

(বঙ্কিমের মতে 'রাজসিংহ'ই তাঁহার একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস, পূর্ব্বেই ইহার উল্লেখ করিয়াছি। এই উপন্যাসের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন, 'স্থূল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব্-উন্নিসা,[১] উদিপুরী,[২] ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে সকলই ঐতিহাসিক নহে।...

ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার পক্ষে বিচার আবশ্যক। আমি সে বিচার বড় করি নাই। দুই একটা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। রূপনগরের রাজকন্যা সম্বন্ধে যে স্থূল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা টডের গ্রন্থে আছে[৩], কিন্তু অর্মের গ্রন্থে নাই। আর উদিপুরী সম্বন্ধে যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা অর্মের গ্রন্থে আছে[৪], কিন্তু টডের গ্রন্থে নাই। আমি উভয় ঘটনাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। রন্ধ্রমধ্যে ঔরঙ্গজেব যে অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা লিখিয়াছি, অর্ম ঐরূপ লেখেন।[৫] কিন্তু টডের গ্রন্থে শাহজাদা সম্বন্ধে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি এখানে অর্মের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। এইরূপ অনেক আছে।

কথিত আছে, নৃত্যগীত কেহ না করিতে পারে, এমন আদেশ ঔরঙ্গজেব প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অন্তঃপুরেই সে আদেশের অবমাননা ঘটিয়াছিল, এ উপন্যাসে এইরূপ লিখিয়াছি। আমার স্থির বিশ্বাস, ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে।[৬]

ঔরঙ্গজেব নিজে মদ্যপান করিতেন না, কিন্তু ইঁহার পিতা ও পিতামহ, খুল্লতাত এবং সহোদর প্রভৃতি অতিশয় মদ্যপ ছিলেন। তাঁহার পৌরাঙ্গনাগণও যে মদ্যপায়িনী ছিল, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।'[৭] (চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন)।)

এইত গেল বঙ্কিমের নিজের কথা। পক্ষান্তরে, ইতিহাসের দিক দিয়া এই উপন্যাসের আলোচনা করিতে যাইয়া ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

১—৭ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

ঐতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ ও কৃতী সমালোচক ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত যে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করিয়াছেন দুইটি চরম অভিমত বলিয়া তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আচার্য্য যদুনাথের মন্তব্য এইরূপ: যদিও বঙ্কিমের যুগে বাদশাহের সহিত রাজসিংহের মহাযুদ্ধের কোন 'পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস' রচিত হয় নাই বা রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না, তাহা হইলেও বর্ত্তমানে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে 'বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।'[১] তিনি ছোটখাটো ঐতিহাসিক ভুলের উল্লেখ করিয়া উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এই দিক দিয়াও বঙ্কিম 'প্রকৃত ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেন নাই।'[২] পক্ষান্তরে, ডক্টর সেনগুপ্ত বলেন, 'শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখিতে পাই যে গ্রন্থকার কল্পনার সাহায্যে সত্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন; কাল্পনিক চরিত্র ও কাল্পনিক ঘটনার সাহায্যে অতীতকালের যে চিত্র আঁকা হয় ইতিহাস তাহার মধ্যে সজীব হইয়া উঠে। এইখানে সেই উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।'[৩]

ডক্টর সেনগুপ্তের অভিযোগ মূলতঃ ঔরঙ্গজেবের চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে। এবং তাঁহার সবগুলি অভিযোগই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। তিনি বলেন:

^'ঔরংজেব অনুদার, "ধর্ম্মশূন্য" হইতে পারেন, কিন্তু....বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন এক স্ত্রীবুদ্ধিচালিত, শিথিলশাসন, অক্ষম, কামুক কাপুরুষের চরিত্র। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঔরংজেব প্রত্যেক ব্যাপারে নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যা বা ভগিনীর মধ্যে কেহ তাঁহার নির্দ্দেশের অন্যথাচরণ করিলে তিনি সমুচিত দণ্ড দিতে বিরত হইতেন না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে অতি সহজে জেবউন্নিসা বা উদিপুরী তাঁহাকে চালিত করিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, জেবউন্নিসা একজন প্রধান politician; মোগল সাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল এক প্রকার তাঁহার হাতে। এইরূপ কল্পনা ইতিহাসের বিকৃতি; সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসে অগ্রাহ্য। নির্ম্মলকুমারী ও ঔরংজেব সংবাদও ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার বিরোধী। ঔরংজেব অতিশয় মিতাচারী ছিলেন। তিনি চারবার বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চার বেগম

১—২ রাজসিংহ (শতবার্ষিক সংস্করণ), আচার্য্য যদুনাথ লিখিত ভূমিকা।
৩ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৭ পৃঃ।

কখনও এক সময়ে তাঁহার কাছে থাকে নাই। রাজত্বের শেষার্দ্ধে উদিপুরী বেগমই তাঁহার একমাত্র সহচরী ছিলেন। কিন্তু এই উপন্যাসে দেখি নির্ম্মল-কুমারী ঔরংজেবকে যত অপমানই করুক বাদ্‌শাহ তাহার "বশীভূত" হইয়াছেন। ঔরংজেব কখন কোন নারীর কটাক্ষে মোহিত হইয়া তাহার দ্বারা চালিত হইবেন ইহা উপন্যাসেও বিশ্বাস করা শক্ত। নির্ম্মলকুমারীর সঙ্গে বাদশাহের যে কথোপকথন হইয়াছে তাহাতে দেখি নির্ম্মলের বাক্‌পটুতার কাছে বাদ্‌শাহ প্রতিপদে হার মানিতেছেন। মনে হয় নির্ম্মলের প্রত্যুত্তর-গুলি পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা ছিল, এবং সেই প্রত্যুত্তরের তীক্ষ্ণতা যাহাতে সহজে প্রমাণিত হইতে পারে সেই জন্য বাদ্‌শাহের কথাগুলিকে যথাসম্ভব দুর্ব্বল ও তাৎপর্য্যহীন করা হইয়াছে।....

আরও একটি ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। তিনি চতুর্দ্দিক হইতে ঔরংজেবের অক্ষমতা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঔরংজেব শুধু যে বাহিরের শত্রুর কাছেই পরাজিত হইযাছেন তাহা নহে, পৌত্তলিকতার শত্রু নিজের রঙমহালেই পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম হিন্দু আচার পালন ও হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতেন। ঔরংজেব বিখ্যাত দেবদ্বেষী; তিনি এইরূপ কাজে অনুমতি দিলে তাঁহার স্ত্রৈণতাই প্রমাণিত হয়।..যোধপুরী বেগমের যে চিত্র বঙ্কিম আঁকিয়াছেন ইতিহাস তাহা সমর্থন করে না। তিনি কাশ্মীরী রাজপুতের কন্যা ছিলেন বটে। কিন্তু তিনি মুসলমানী। তাঁহার নাম প্রথমে ছিল রহমতুন্নেছা এবং পরে ঔরংজেব তাঁহাকে নবাব-বাঈ আখ্যা দিয়াছিলেন।

যুদ্ধাদির বর্ণনায়ও বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে নাই। প্রথমতঃ, তিনি মেবার যুদ্ধকে অতিশয় বড় করিয়া দেখিয়াছেন। রাজপুত যুদ্ধের মূল কারণ যোধপুরের শিশুকুমার অজিত সিংহ এবং ইহার প্রধান নায়ক দুর্গাদাস রাঠোর। এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিলে মাড়বারে, শেষ হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে। অজিতসিংহকে আশ্রয় দিয়া এবং জিজিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে যাইয়া রাণা রাজসিংহ এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রভূত বিক্রমের পরিচয় দেন। ঔপন্যাসিক সর্ব্ববিষয়ে ইতিহাসকে মানিয়া চলিবেন এরূপ দাবী করা অসঙ্গত....। কিন্তু যে যুদ্ধের বা যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হইবে পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঙ্গে তাহার সংযোগ সম্পর্কে গ্রন্থকার অচেতন হইলে তাহা তাহার উপযুক্ত মূল্য পাইবে না। যাহা বড় তাহা ছোট হইয়া যাইবে, যাহা গৌণ তাহা প্রধান দেখাইবে।....বঙ্কিমচন্দ্র মেবারকে মাড়বার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, মারাঠার সঙ্গে রাজপুতের মিলন তাঁহার উপন্যাসে

খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। কোন একজন হিন্দুকে বড় করিতে যাইয়া তিনি সমগ্র হিন্দুস্থানকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন। যুদ্ধের ফল যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অসত্য ও অবিশ্বাস্য। রন্ধ্রপথে ঔরংজেবকে আবদ্ধ করার কথা বঙ্কিমচন্দ্র অর্ম ও মানুষীর গ্রন্থে পাইয়াছিলেন এবং তিনি ইহাকে তাঁহার উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু ঔরংজেবের চরিত্র ও যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে যে ধারণা আমরা ইতিহাসে পাই তাহার সঙ্গে এই পরাভবের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বেমানান হইয়া পড়ে। প্রায় সকল দিক দিয়া বিচার করিলেই দেখা যায় যে ঔরংজেবের চিত্রে এবং রাজপুত যুদ্ধের কাহিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের দাবী মিটাইতে পারেন নাই; ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশ রূপকথার মত মনে হয়।'[১]

এই উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ডক্টর সেনগুপ্তের প্রধান অভিযোগ পাঁচটি। একে একে সে সকলের আলোচনা করিতেছি:

(১) ঔরঙ্গজেবের উপর জেব-উন্নিসা ও উদিপুরীর প্রভাব

'ঔরঙ্গজেব শিথিলশাসন ছিলেন না এবং তাঁহার পুত্রকন্যা বা ভগিনী কেহ কোন কারণে তাঁহার বিরাগভাজন হইলে কোনক্রমেই তাহার নিষ্কৃতি ছিল না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। 'রাজসিংহে' বঙ্কিম নিজেও এই সত্যের অমর্য্যাদা করেন নাই; জেব-উন্নিসা মবারককে বিবাহ করিলে ঔরঙ্গজেব যে এই বিবাহ প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই শুধু তাহাই নহে, পরন্তু তিনি এমন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, দরিয়ার হাতে তাহার মৃত্যু না হইলেও শাহজাদীকে বিবাহ করার পুরস্কারস্বরূপ মবারককে মরিতেই হইত। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের শাসন যতই কঠোর হউক, ইহাও অতি রূঢ় সত্য যে, অন্তঃপুরে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব থাকিলে রঙ্মহালের যে সকল উচ্ছৃঙ্খলতার কাহিনী তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছে তাহা কোন প্রকারেই সম্ভব হইত না।'

কিন্তু জেব-উন্নিসা এবং উদিপুরী কি শাসন ব্যাপারে ঔরঙ্গজেবকে প্রভাবিত করিয়াছেন? এই প্রসঙ্গে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন: 'জেব-উন্নিসা যে একজন প্রধান politician ছিলেন এ বিষয়ে ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। পরবর্তী ঐতিহাসিক Pringle Kennedy বলিয়াছেন যে মোগল সাম্রাজ্যের অনেক কাজ জেব-উন্নিসা এবং উদিপুরী কর্তৃক পরিচালিত হইত।'[২] তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে ডক্টর দাশগুপ্ত প্রিঙ্গেল কেনেডির 'এ হিস্ট্রি

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৩-৯৭ পৃঃ।
২ 'রাজসিংহের ভূমিকা'—বঙ্গশ্রী, মাঘ ১৩৪৮, ২৮০ পৃঃ।

অব্ দি গ্রেট মোগল্‌স্' (A History of the Great Moghuls) হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহা এইরূপ: 'Other women of the harem whose names are mentioned as having influenced affairs are Fakhrun Nissa, Aurangzeb's eldest daughter and Udaipuri.' (Vol II. p. 68)। অর্থাৎ, কার্য্যপরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া অপর যে মহিলাদের নামোল্লেখ রহিয়াছে তাঁহারা হইতেছেন ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা ফকর-উন্নিসা [এই ফকর-উন্নিসাই জেব-উন্নিসা[১]] এবং উদিপুরী। কিন্তু প্রিঙ্গেল কেনেডি ইহার পরই লিখিয়াছেন: 'Neither of them seem really to have had much influence over Aurangzeb, who throughout his reign really ruled throughout as King alone.' (Vol II. p. 86)। অর্থাৎ, তাঁহার রাজত্বকালে ঔরঙ্গজেব আগাগোড়া নিজেই রাজ্য পরিচালনা করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের কাহারও তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সমগ্রভাবে পাঠ করিলে প্রিঙ্গেল কেনেডি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ডক্টর সেনগুপ্তের অভিযোগই সমর্থন করে। শেষোক্ত এই বিশিষ্ট অংশ বাদ দিয়া প্রিঙ্গেল কেনেডি হইতে উদ্ধৃতি পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকর এবং ডক্টর দাশগুপ্তের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখায় এরূপ অর্দ্ধসত্যের পরিবেশন আরও বিপজ্জনক।

'মোগলসাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল, এক প্রকার তাঁর [জেব-উন্নিসার] হাতে' বঙ্কিমের এই উক্তিতে (২।২) আতিশয্য রহিয়াছে। কিন্তু উপন্যাসের আলোচনাকালে তাঁহার এই মন্তব্য বিচারের বিষয় নহে। প্রশ্ন এই: তিনি উপন্যাসে জেব-উন্নিসার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কতখানি ইতিহাস-সম্মত? জেব-উন্নিসা পিতার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ছিলেন এবং শাহজাদা আকবর যখন সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, জেব-উন্নিসা সেই ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।[২] এ অবস্থায় ঔরঙ্গজেব-চঞ্চলকুমারী-রাজসিংহ আখ্যায়িকার পশ্চাতে বঙ্কিম যে কাল্পনিক কাহিনী জুড়িয়া দিয়াছেন তাহাতে জেব-উন্নিসার ভূমিকা, অর্থাৎ স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে (২।৭, ৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) উদিপুরীর নিকট চঞ্চলকুমারী কর্ত্তৃক চিত্রদলনের কাহিনী পরিবেশন এবং ইহার উল্লেখপূর্ব্বক বাদশাহের নিকট অদ্ভুত আবদারের উপদেশ, তাঁহার চরিত্রবিরোধী নহে। দ্বিতীয়তঃ,

১ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

২ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

ঔরঙ্গজেবের উপর জেব-উন্নিসার প্রভাবের প্রশ্ন ? জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন উপন্যাসে ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত এই যে, জেব-উন্নিসার অভিযোগক্রমে বাদশাহ মবারকের মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে কন্যার ইচ্ছানুরূপ কাজ করিলেও ঔরঙ্গজেবের আদেশ প্রকৃতপক্ষে কন্যার অনুগ্রহভাজনকে বিশ্বাসঘাতকতার অজুহাতে পৃথিবী হইতে অপসারণের কৌশল মাত্র। (৬।৭, ১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ, ঔরঙ্গজেবের আচরণ 'অতি সহজে জেব-উন্নিসা তাঁহাকে চালিত করিতে পারেন' এরূপ সাক্ষ্য দেয় না। আসলে উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব উদিপুরীর। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের নিকট উদিপুরীর বায়নার রাজনৈতিক পরিণাম ফল সুদূরপ্রসারী হইলেও, এই বায়না প্রকৃতপক্ষে রূপমুগ্ধ প্রণয়ীর নিকট রূপগর্ব্বিতা প্রণয়িনীর আবদার মাত্র এবং ঔরঙ্গজেবের উপর উদিপুরীর প্রভাব সম্বন্ধে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এমন কাহিনী স্থান পাইয়াছে[১] যাহার পর 'রাজসিংহে' যতটুকু কল্পনার প্রয়োগ রহিয়াছে তাহা কোনক্রমেই 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে অগ্রাহ্য' বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আচার্য্য যদুনাথ তাঁহার 'হিস্ট্রি অব্ ঔরঙ্গজেবে' হীরাবাঈ সংক্রান্ত যে কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন[২] সাময়িক দুর্ব্বলতা হইলেও, তাহাও এই 'মিতাচারী' সম্রাটের স্ত্রৈণতার সাক্ষ্য দেয়। মানুষীও অনুরূপ একটি কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন।[৩]

(২) ঔরঙ্গজেব-নির্ম্মলকুমারী সংবাদ

এই কাহিনী উপন্যাসের অনেকটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে এবং আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশে ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। অথচ ইহাতে যে রোমান্স্ রহিয়াছে তাহা 'ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার বিরোধী'—এই অভিযোগের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য্য। ঔরঙ্গজেবের পক্ষে 'কটাক্ষে' মোহিত হইয়া নির্ম্মলকুমারীর 'বশীভূত' হওয়া যে কতখানি অস্বাভাবিক বঙ্কিম নিজেই হয়ত তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি তাঁহাকে যে অবস্থায় টানিয়া নিয়াছেন তাহার কৈফিয়তস্বরূপ ঔরঙ্গজেবের মুখে শুনিতে পাই, কিসে সে তাঁহার ভালবাসার যোগ্য—নির্ম্মলকুমারীর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাহাকে বলিতেছেন, "তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার আর নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরী অপেক্ষা নও। বোধ করি, আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কথা কখন পাই নাই, সেই জন্য। বোধ

১—৩ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

করি, তোমার বুদ্ধি, চতুরতা, আর সাহস দেখিয়া তোমাকেই আমার উপযুক্ত মহিষী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে।" (৭।২, ১৪১ পৃঃ)। অর্থাৎ, নির্ম্মল-কুমারীর দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার চরিত্রের মাধুর্য্য বাদশাহকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে এবং তাঁহার চক্ষে নূতন বলিয়াই ইহার আকর্ষণ দুর্দ্দমনীয়। অবশ্য এই কৈফিয়তের দুর্ব্বলতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে নির্ম্মলকুমারীর প্রতি আকর্ষণ ঔরঙ্গজেবের চরিত্রবিরোধী হইলেও, তাঁহার স্বাভাবিক মিতাচারের সহিত ইহার কোন অসঙ্গতি নাই। বাদশাহ যখন নির্ম্মলকুমারীর নিকট প্রণয়জ্ঞাপন করিলেন, তখন তাহা 'কন্দর্পের অত্যাচারে'র নিদর্শন হইলেও তাঁহার আচরণ সুসংযত ও সুমার্জ্জিত।[১] নির্ম্মলকুমারী তাঁহার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিলে ঔরঙ্গজেব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "দুনিয়ার বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না—কাহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভালবাসিয়াছি—কিন্তু তোমাকে পাইলাম না। তোমাকে ভালবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না—ছাড়িয়া দিব। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই করিব। যাহাতে তোমার দুঃখ হয়, তাহা করিব না। তুমি যাও। আমাকে স্মরণ রাখিও। যদি কখনও আমা হইতে তোমার উপকার হয়, আমাকে জানাইও। আমি তাহা করিব।" ঔরঙ্গজেবের পক্ষে এরূপ সরল অকপট উক্তি সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে; কিন্তু রঙ্মহালে অবরুদ্ধা অসহায় বালিকার নিকট 'দুনিয়ার বাদশাহে'র এই পরাজয় অগৌরবের নহে এবং ইহা নিশ্চিত কামুকের উক্তি নহে। নির্ম্মলকুমারীর 'বাক্‌পটুতার কাছে' বাদশাহকে 'প্রতিপদে' হার মানিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার একমাত্র কারণ নির্ম্মলকুমারীর চতুরতা নহে; চাতুর্য্যে ঔরঙ্গজেব কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কিন্তু সত্য যখন নির্ভয়ে আত্মপ্রকাশ করে, 'দুনিয়ার বাদশাহ'কেও তখন তাহার নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়, ইহা কিছু নূতন কথা নহে।

(৩) যোধপুরী বেগম ও রঙ্মহালে পৌত্তলিকতা

আচার্য্য যদুনাথ এই উপন্যাসে যে 'কয়েকটি ঐতিহাসিক ভুলে'র উল্লেখ করিয়াছেন যোধপুরী বেগমের পরিকল্পনা তাহাদের অন্যতম।[২] 'ঔরঙ্গজেব 'কোন যোধপুর-রাজকন্যাকে বিবাহ করেন নাই' এবং উপন্যাসের যোধপুরী বেগম আসলে ঔরঙ্গজেবের একমাত্র হিন্দু স্ত্রী নবাব-বাঈ। আচার্য্য যদুনাথ লিখিয়াছেন: 'নবাব-বাঈকে মুসলমান করিয়া তাহার পর আওরংজীবের সঙ্গে

১ দারার হিন্দু পত্নীর প্রতি প্রত্যাখ্যাত ঔরঙ্গজেবের আচরণ স্মরণীয়।—পুনশ্চ

২ রাজসিংহ, শতবার্ষিক সংস্করণ—আচার্য্য যদুনাথ লিখিত ভূমিকা, ।৫

বিবাহ দেওয়া হয়। আকবরের পর বাদশাহী মহলে কোন হিন্দু মহিষী হিন্দু আচার-ব্যবহার রক্ষা করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের মুসলমান হইয়া থাকিতে এবং মৃত্যুর পর কবরে আশ্রয় পাইতে হইত।[১] সুতরাং যোধপুরী বেগম (ইতিহাসের নবাব-বাঈ) যে ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে হিন্দু আচার বজায় রাখিয়াছিলেন, এরূপ চিত্র ইতিহাসসম্মত নহে। কিন্তু ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এ সম্বন্ধে আচার্য্য যদুনাথের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, 'এই বেগম [নবাব-বাঈ] যে হিন্দু আচার রক্ষা করিয়াছিলেন—(এবং যে হিন্দু আচার রক্ষা করায় উপন্যাসের ঘটনা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে)—সেই ঘটনা ইতিহাস অনুমোদিত।'[২] তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি মানুষী (Manucci's Storia do Mogor Vol II. p. 57) হইতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দিয়াছেন: 'Muhammad...and Sultan Mu'azzam...were the sons of one mother, a Rajput by race, who offered sacrifices to idols that Sultan Mu'azzam, her son, might be king, seeing that the eldest was a captive.'[৩] অর্থাৎ, মহম্মদ এবং সুলতান মৌজাম একই মায়ের সন্তান। ইনি জাতিতে রাজপুতনী এবং জ্যেষ্ঠ [মহম্মদ] বন্দী ছিলেন বলিয়া, যাহাতে তাঁহার পুত্র সুলতান মৌজাম সম্রাট হন, এই কামনা করিয়া দেবদেবীর নিকট পূজা দিয়াছিলেন। যে সময় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া মানুষী উল্লেখ করিয়াছেন, সে সময় ঔরঙ্গজেব কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনসংশয় হইয়াছিল। (১৬৬২ সালের ২২শে মে হইতে ঐ সালের ২৭শে জুলাই পর্য্যন্ত)। ইহাই মানুষীবর্ণিত নবাব-বাঈ কর্তৃক দেবদেবীর পূজার পশ্চাতের ইতিহাস। ইহার ভিত্তিতে ডক্টর দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন, 'এই অবস্থায় নবাব-বাঈ যে সর্ব্বদা বাদশাহের অন্তঃপুরেও হিন্দু আচার ব্যবহারাদিই মানিয়া চলিতেন ও আপন প্রকোষ্ঠে দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।'[৪] কিন্তু একটি বিশিষ্ট সময়ের বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে এরূপ ব্যাপক সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। বাদশাহের অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে দেবমন্দিরে পূজা পাঠান হয়ত অসম্ভব না

১ রাজসিংহ, শতবার্ষিক সংস্করণ—আচার্য যদুনাথ লিখিত ভূমিকা, ।০-।১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২ 'রাজসিংহের ভূমিকা'—বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৪৮, ১৩৩ পৃঃ।

৩ মহম্মদ এবং সুলতান মৌজামের মাতা ঔরঙ্গজেবের এই রাজপুতমহিষীই নবাব-বাঈ: 'The [redacted] of Sultan Muhammad, Sultan Mu'azzam (Sha Alam), and [redacted], was Nawab-Bai, daughter of the Rajah of Rajauri in [redacted] do Mogor Vol. II, Foot note on p. 57.

—বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৪৮, ১৩৩ পৃঃ।

হইতে পারে, কিন্তু সহজ অবস্থায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে অন্তঃপুরে হিন্দুয়ানি বজায় রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নহে এবং ঔরঙ্গজেব যে এ বিষয়ে কোনরূপ প্রশ্রয় দিতে পারেন না, আচার্য্য যদুনাথের উপরোদ্ধৃত উক্তির পর সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তবে আচার্য্য যদুনাথ মনে করেন এই প্রকারের ভুল 'উপন্যাসের পক্ষে মারাত্মক নহে।' কিন্তু এ বিষয়ে মতদ্বৈধতা স্বাভাবিক এবং নবাব-বাঈএর যোধপুরী বেগম নামকরণ উপন্যাসের পক্ষে 'মারাত্মক' ভুল না হইলেও, যোধপুরী বেগমকে পুরাপুরি হিন্দু আচারনিষ্ঠ করিয়া বঙ্কিম ঔরঙ্গজেবের চরিত্র বিকৃত করিয়াছেন, এরূপ অভিযোগ নিশ্চয়ই হাল্কাভাবে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

(৪) কোন একজন হিন্দুকে, অর্থাৎ রাজসিংহকে বড় করিতে যাইয়া বঙ্কিম কি সমগ্র হিন্দুস্থানকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন?

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সেনগুপ্ত যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন ইতিহাসের দিক দিয়া তাহা অভ্রান্ত এবং ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনাকালে ঐতিহাসিক যদি অপেক্ষাকৃত ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখেন বা বড় জিনিষকে ছোট করিয়া দেখেন বা একেবারেই অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাহা গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু ঔপন্যাসিকের এ সম্বন্ধে কিছুটা স্বাধীনতা রহিয়াছে। বঙ্কিম যদি দুর্গাদাস রাঠোরকে উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিতেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ অভিযোগের যথেষ্ট কারণ থাকিত। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরূপ কিছু ঘটে নাই। বঙ্কিম তাঁহার নায়ক রাজসিংহের কাহিনীর উপর আলোকপাত করিতে যাইয়া প্রকৃতপক্ষে মাড়বার ও দুর্গাদাস রাঠোরকে বাদ দিয়াছেন[১] এবং একটি মহাযুদ্ধের অংশবিশেষকে উপন্যাসের প্রয়োজনানুযায়ী প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহা দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না এবং ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন হইবে না যে, বঙ্কিম এস্থলে 'কোন একজন হিন্দুকে বড় করিতে যাইয়া সমগ্র হিন্দুস্থানকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন।'

(৫) রন্ধ্রমধ্যে ঔরঙ্গজেবকে আবদ্ধ করার কাহিনী

আধুনিক ইতিহাস এই কাহিনী অগ্রাহ্য করিয়াছে। কিন্তু এস্থলে ইহাই বড় কথা নহে। আসল কথা এই যে, এই কাহিনী বিশ্বাস করিলে ঔরঙ্গজেবের-

১ উপন্যাসে দুর্গাদাস রাঠোরের উল্লেখ এইরূপ: 'রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন। ঔরঙ্গজেব পুনশ্চ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া....পলায়ন করিলেন। ৮।১৬, ১৮৯ পৃঃ।

রণনৈপুণ্য খাটো করিয়া দেখা হয়। এ অবস্থায় ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে যেখানে মতবিরোধ রহিয়াছে সেখানে এই বিশিষ্ট কাহিনী বাছিয়া লইয়া বঙ্কিম ঔরঙ্গজেবের প্রতি অবিচার করিয়াছেন, কোন সমালোচক এইরূপ অভিযোগ করিলে সহসা সে অভিযোগ অগ্রাহ্য করা চলে না। তবে এই ব্যাপারে মোগল সওদাগরের ছদ্মবেশে মবারক যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে (ইহা বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত) তাহাতে এই কাহিনীর অসম্ভাব্যতা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে।

মোটকথা, বঙ্কিম তাঁহার কাহিনীর পরিবেশনে সর্বত্র 'ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা'র প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। এবং কোন কোন স্থলে তিনি ঔরঙ্গজেবের চরিত্র বিকৃত করিয়াছেন, এ অভিযোগও অনস্বীকার্য। কিন্তু ঔরঙ্গজেব 'অক্ষম' না হইলেও তাঁহার কুশাসন পারদর্শিতা বা দূরদর্শিতার পরিচয় দেয় না। পরন্তু রঙ্গমহালের ব্যভিচার, এই ব্যভিচার দমনে ঔরঙ্গজেবের অক্ষমতা বা ঔদাসীন্য, ঔরঙ্গজেবের কূটনীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ এবং ইহার ফলে তাঁহার রাজত্বকালে মুসলমান সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা ঐতিহাসিক সত্য। এবং মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, আচার্য্য যদুনাথের উক্তিতে আতিশয্য থাকিলেও, ডক্টর সেনগুপ্তের বিরুদ্ধ মন্তব্যেও বিপরীত দিকে অনুরূপ আতিশয্য রহিয়াছে।

'রাজসিংহ' রচনায় বঙ্কিমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, 'হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য।' কিন্তু তাঁহার সৃজনী-প্রতিভা তাঁহাকে এই সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে দেয় নাই। চঞ্চলকুমারীকে উপলক্ষ্য করিয়া ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহের সংগ্রাম মূল আখ্যায়িকা হইলেও ইহাই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নহে। উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ শাশ্বত মানবমনের ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র, উপন্যাসের গৌণ আখ্যায়িকা জেব-উন্নিসা-মবারক-দরিয়ার কাহিনীর ভিতর দিয়া যাহা রূপায়িত হইয়াছে। রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী-ঔরঙ্গজেব কাহিনীতে উপন্যাসের ঐতিহাসিকত্ব; জেব-উন্নিসা-মবারক-দরিয়া কাহিনীতে ইহার ঔপন্যাসিকত্ব।

উপন্যাসের প্রধান ও গৌণ আখ্যায়িকা পরস্পরের সহিত নিবিড়-ভাবে জড়িত রহিয়াছে, এবং কখনও একটি, কখনও অপরটি কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জেব-উন্নিসা রাজনৈতিক জুয়ারী। চঞ্চলকুমারীর অবিমৃষ্যকারিতার সুযোগ লইয়া বাদশাহের উপর একাধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি যে রাজনৈতিক চাল চালিলেন তাহা শুধু প্রধান আখ্যায়িকার নহে, উপন্যাসের গৌণ আখ্যায়িকারও গতিনির্দেশ করিয়াছে। রূপনগরের

রাজকুমারীকে আনিবার জন্য যে ফৌজ প্রেরিত হইল, ঔরঙ্গজেবের আদেশে মবারককে তাহার সঙ্গে যাইতে হইল। এই অভিযানে মবারক তাহার পরিণীতা পত্নী দরিয়ার মূল্য বুঝিল, তাহার রূপের নেশা কাটিল। ফলে সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে যাইয়া জেব-উন্নিসা মবারকের উপর আধিপত্য হারাইলেন। কিন্তু দরিয়ার জয় ক্ষণিকের। (মবারককে হারাইয়া রূপনগর অভিযানে তাহার মহানুভবতার সূত্র ধরিয়া বাদশাহজাদী যে ঈর্ষ্যার বিষ উদ্গীরণ করিলেন তাহাতে দরিয়া জ্বলিল, মবারক মরিল, মরিয়া নূতন করিয়া নূতন রূপে রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী-ঔরঙ্গজেব কাহিনীর সহিত জড়িত হইল। প্রাণদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা মবারকের কৃতঘ্নতার কারণ হইল এবং তাহারই কৌশলে 'দুনিয়ার বাদশাহ' রন্ধ্রমধ্যে আবদ্ধ হইলেন। ফলে, একদিকে যেমন চঞ্চলকুমারীর পণরক্ষা হইল, অন্যদিকে তেমনই মবারককে হত্যা করিয়া জেব-উন্নিসার অন্তরে যে অনুশোচনা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। অনুতাপের আগুনে 'শাহজাদী ভস্ম হইল' এবং সেই ভস্মাবশেষ হইতে মবারকের পত্নী জেব-উন্নিসা জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু মবারক ও জেব-উন্নিসার মিলনের মাঝখানে সহসা দরিয়ার ছায়া পড়িল; বাদশাহের নির্দ্দেশে মবারক যখন পুনরায় মেবার-অভিযানে যোগ দিল, তখন ব্যর্থপ্রেমিকা, প্রতি-হিংসাপরায়ণা দরিয়া, সর্ব্বগ্রাসিনী দরিয়ার ন্যায় তাহাকে গ্রাস করিল। 'চিত্র-দলন' উপলক্ষ্য করিয়া যে ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা, উপন্যাসের দিক দিয়া মবারকের মৃত্যুতে তাহাতে পূর্ণাহুতি পড়িল।)

উপন্যাসের প্রধান আখ্যায়িকাদ্বয়ের সহিত একটি ছোট শাখাকাহিনী সংযোজিত হইয়াছে। ইহার নায়ক মাণিকলাল, নায়িকা নির্ম্মলকুমারী। উপন্যাসের কাহিনীর ক্রমবিকাশের দিক দিয়া এই দুইটি চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষণীয় নহে। মাণিকলাল রাজসিংহের বিশ্বস্ত অনুচর এবং রূপনগরের রাজকুমারীকে উদ্ধার করিতে যাইয়া তাহারই চাতুর্য্যে মহারাণা শেষ পর্য্যন্ত মোগল ফৌজকে পরাজিত করিতে পারিলেন। আবার মবারক যখন বিষধর সর্পের দংশনে বিগতচেতন, মাণিকলালই তখন তাহার মৃতকল্প দেহে চেতনার সঞ্চার করিয়া তাহার সাহায্যে মহারাণার কার্য্যোদ্ধার করিল। এইরূপে, নির্ম্মলকুমারী যে শুধু সহচরী হিসাবে চঞ্চলকুমারীর চরিত্রবিকাশের সহায় তাহা নহে, মাণিকলাল যেমন ঔরঙ্গজেবের দরবারে রাজসিংহের পত্র পেশ করিল, নির্ম্মলকুমারীও তেমনি উদিপুরীর নিকট চঞ্চলকুমারীর 'নিমন্ত্রণ পত্র' পৌঁছাইয়া দিল এবং জেব-উন্নিসার নিকট মবারকের মহত্ত্বের পরিচয় দিতে যাইয়া, আপনার অজ্ঞাতসারে সে মবারকের সর্ব্বনাশের কারণ হইল। আবার

মাণিকলাল এবং মবারকের কৌশলে ঔরঙ্গজেব যখন রন্ধ্রমধ্যে আবদ্ধ হইলেন, তখন নির্ম্মলকুমারীর আনুকূল্যেই তিনি সসৈন্যে মুক্তিলাভ করিলেন। মাণিকলাল ও নির্ম্মলকুমারীকে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করিতে হইয়াছে। ইহাই তাহাদের বিবাহের পরিকল্পনার অন্যতম কারণ। এইরূপ, ঔরঙ্গজেবকে রন্ধ্রমধ্যে আবদ্ধ করার ফলে আখ্যায়িকায় যে জটিলতার গ্রন্থি পড়িল, নির্ম্মলকুমারীর সাহায্যে তাহা উন্মোচন করিতে হইয়াছে বলিয়াই বাদশাহকে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরূপে চিত্রিত করিতে হইয়াছে—নির্ম্মলকুমারী বাদশাহের 'ইম্‌লি বেগম', রঙ্মহালের বিলাসিনীদের তুলনায় বাদশাহের নিকট বুঝি বা 'ইম্‌লি'র ন্যায় অম্লমধুর।)

'রাজসিংহে'র উভয় আখ্যায়িকাতেই বঙ্কিম ফলিত জ্যোতিষের অবতারণা করিয়াছেন। মবারক নিজের এবং নির্ম্মলকুমারী সখী চঞ্চলের অদৃষ্ট গণনা করাইয়াছে। কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে'র ন্যায় আলোচ্য উপন্যাসেও দেখিতে পাই অদৃষ্টগণনা আখ্যায়িকার গতি নিয়ন্ত্রিত করে নাই। দলনীর কাহিনীর ন্যায় মবারকের কাহিনী অদৃষ্টগণনা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে। মবারক অদৃষ্টগণনার পর জেব-উন্নিসার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই প্রস্তাবের সহিত গণেশ জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণীর কোন সম্পর্ক নাই ; পরবর্ত্তীকালে এ সম্বন্ধে জেব-উন্নিসার প্রশ্নের উত্তরে মবারক বলিতেছে, "আমি কেবল ধর্ম্ম ভাবিয়াই সে কথা বলিয়াছিলাম। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি গণনার পূর্ব্ব হইতে এ কথা বলিতেছি।" (২।৭, ৪০ পৃঃ)। বাদশাহজাদীর অবশ্য ইহা স্মরণ হইল না ; তাহা হইলেও মবারকের কথা অসত্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। এবং পরিশেষে সত্যই যখন তাঁহাদের বিবাহ হইল, তখন এই বিবাহের ফলে মবারকের 'পদবৃদ্ধি' হইলেও, বিবাহ ব্যাপারটি ঘটনাপরম্পরার স্বাভাবিক পরিণতি এবং বিবাহকালে গণনার কথা জেব-উন্নিসা বা মবারক কাহারও মনে আসে নাই। এমন কি, জেব-উন্নিসার নিকট হইতে শেষ বিদায়ের প্রাক্কালে সহসা দরিয়াকে দেখিতে পাইয়া মবারক যখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল যে, তাহাকে মরিতেই হইবে (৮।১৩, ১৮৪ পৃঃ), তখনও গণনা শুনিয়া দরিয়ার উক্তি : "আর মৃত্যু" এবং এই সম্পর্কে জ্যোতিষীর মন্তব্য (২।১, ২২ পৃঃ) তাহার স্মরণে আসে নাই। এইরূপ, উন্মাদিনী দরিয়ার জিঘাংসাবৃত্তি গণেশ জ্যোতিষীর গণনাকে সফল করিলেও এই গণনা তাহার প্রতিহিংসার প্রেরণা যোগায় নাই।

চঞ্চলকুমারীর ক্ষেত্রে অদৃষ্টগণনা একেবারেই উপেক্ষণীয়। বঙ্কিম অপরাপর যে সকল ক্ষেত্রে জ্যোতির্গণনা পরিবেশন করিয়াছেন, সে সকল

ক্ষেত্রে ভাগ্যহত নরনারী যেন অদৃষ্টদেবতার হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। দলনী ও মবারকের ভাগ্য অদৃষ্টগণনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলেও তাহারাও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু চঞ্চলকুমারীর ক্ষেত্রে দেখিতে পাই জ্যোতিষীর গণনায় অন্ধ বিশ্বাসের ফলে চঞ্চল ও নির্ম্মল স্বাধীন ইচ্ছায় যেন একরূপ জোর করিয়াই অদৃষ্টগণনা সফল করিয়াছে। অদৃষ্টগণনার পরিবেশনে এক্ষেত্রে এই মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়। বিষয়টির একটুকু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি :

রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে উদ্ধার করিলে বিক্রম সোলাঙ্কি তাঁহাদের মিলনের অন্তরায় হইলেন সত্য ; কিন্তু তাঁহার অসম্মতি সত্ত্বেও রাজসিংহ যাহাতে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ না করেন, এই উদ্দেশ্যে অভিসম্পাতের ভয় দেখাইয়া তিনি যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে তিনি ইহাও জানাইলেন যে, যদি কখনও রাজসিংহকে তিনি উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিবার কারণ পান, তাহা হইলে স্বেচ্ছায় তিনি তাঁহাকে কন্যা দান করিবেন। ঔরঙ্গজেবকে পরাজিত করিয়া এবং তাঁহাকে নিজ সর্ত্তমত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াই রাজসিংহ এই যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এবং ইহাই বিক্রম সোলাঙ্কির মহারাণার পক্ষাবলম্বনের কারণ। যুদ্ধের পর চঞ্চলকুমারী পিতার নিকট যে পত্র লিখিলেন তাহাতে তিনি স্বভাবতঃই উদিপুরীর লাঞ্ছনার উল্লেখ করেন নাই এবং রাজসিংহের পত্রেও যে ইহার উল্লেখ ছিল না তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। সুতরাং 'সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া' চঞ্চলের পরিচর্য্যা করিবার পর তাঁহার বিবাহ হইলেও, অন্যথা এই বিবাহ আটক থাকিত এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে উদিপুরীর প্রতি চঞ্চলকুমারীর আচরণের কৈফিয়ত হিসাবেই তাঁহার অদৃষ্টগণনার যাহা কিছু প্রযোজনীয়তা। চঞ্চলকুমারী 'কিছু গর্ব্বিতা' এবং ঔরঙ্গজেবের চিত্রদলনে যাঁহার আনন্দ, যোধপুরী বেগমের নিকট হইতে ইঙ্গিত পাইয়া (২।৬, ৩৮ পৃঃ ও ৩।১, ৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ঔরঙ্গজেবের গর্ব্বিত শপথের প্রত্যুত্তর হিসাবে উদিপুরীর নিকট তামাকু সাজিবার নিমন্ত্রণ প্রেরণ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক এবং ইহার জন্য অদৃষ্টগণনার পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু উদিপুরী যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আয়ত্তাধীন তখন তাঁহার 'পরুষ বাক্যে তেজস্বিনী চঞ্চল-কুমারীর গর্ব্ব উদ্রিক্ত' হইলেও সত্য সত্যই তাঁহাকে দিয়া তামাকু সাজাইয়া লওয়া শোভন নহে। অথচ সহজ অবস্থায় যাহা অশোভন, অদৃষ্টগণনার ফলে তাহাই অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহা বুঝিলাম। কিন্তু চঞ্চল-কুমারী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পরিচারিকা তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিতে গেলে

উদিপুরী যখন অপমানভয়ে ছিলিম তুলিতে পা বাড়াইতেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন (৮।৩), তখনই কি তাঁহার অপমানের মাত্রা পূর্ণ হয় নাই? এবং উদিপুরীর প্ররোচনায় রূপনগরের রাজকুমারীর সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবের গর্ব্বিত শপথের ইহাই কি যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর নহে? উদিপুরীর লাঞ্ছনা ব্যাপারে এতখানি বাড়াবাড়ি এবং ইহারই জন্য অদৃষ্টগণনার পরিবেশন আর্টের দিক দিয়া নিশ্চয়ই শোভন হয় নাই।

'রাজসিংহে'র প্রধান বৈশিষ্ট্য আখ্যায়িকার ক্ষিপ্র গতি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: 'রাজসিংহ' প্রথম হইতে উল্‌টাইয়া গেলে এই কথাটি বারম্বার মনে হয় যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না, সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে, এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

... ...

'রাজসিংহে'র গল্পটা সৈন্যদের চলার মতো; ঘটনাগুলা বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমানবেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থাকিতে পারিতেছেন না।[১]

সহজ অবস্থায় যাহা হয়ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারিত, এই অবাধ ক্ষিপ্রগতির ফলে উপন্যাসে তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ চঞ্চলকুমারী ও নির্ম্মলকুমারীর বিবাহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। চঞ্চলকুমারী উপযাচিকা হইয়া রাজসিংহের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, মহারাণা তাঁহাকে উদ্ধার করিলে তাঁহার সহিত বিবাহের যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতার বিচার করিয়াছেন। সহজ অবস্থায় নায়িকার পক্ষে ইহা অশোভন হইতে পারিত, কিন্তু চঞ্চলকুমারীর তৎকালীন অবস্থায় ইহা যে শুধু স্বাভাবিক তাহা নহে, অন্যরূপ আচরণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায় 'ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সংকীর্ণ গিরিপথে বজ্রস্তনিতরবে ফেনাইয়া চলিতেছে; তাহারই উপর দিয়া 'সামাল্‌ সামাল্' তরী। তখন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্রেমাভিনয় করিবার সময় নহে।'[২]

১ রাজসিংহ—আধুনিক সাহিত্য, ৯১ ও ৯৪ পৃঃ।
২ রাজসিংহ—আধুনিক সাহিত্য, ৯৪ পৃঃ।

নির্ম্মলকুমারীর বিবাহের ভূমিকা এইরূপ : মাণিকলাল চলিয়াছে কৌশলে রূপনগরের সহস্র সৈনিক হস্তগত করিয়া তাহাদের লইয়া বিপন্ন রাণার সাহায্য-কল্পে। পথিমধ্যে শ্রান্ত ও অসহায় নির্ম্মলকুমারীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ। মাণিকলাল দেখিল এ অবস্থায় স্ত্রীলোকটিকে বাঁচাইতে হইলে তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইতে হয়। কিন্তু নির্ম্মলের ইহাতে আপত্তি, কারণ তাহারা নিঃসম্পর্কীয়। উপস্থিতবুদ্ধিতে মাণিকলাল অদ্বিতীয়, সহজেই ইহার মীমাংসা করিয়া ফেলিল। মাণিকলাল দেখিল, নির্ম্মল 'বড় সুন্দরী', তাহাতে তাহার মাতৃহারা কন্যার জন্য 'একটি মা' চাই। সে সোজাসুজি নির্ম্মলের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল। নির্ম্মল দেখিল, রাজকুমারীর নিকট পৌঁছিতে হইলে মাণিকলাল একমাত্র কাণ্ডারী, সুতরাং সম্মত হইল। 'কোর্টশিপটা' পাঠকের ভাল লাগুক বা না লাগুক, বেচারা মাণিকলাল ও নির্ম্মলকুমারীর তখন ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র (?) ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : 'ইতিহাস ও উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে ; কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয়, ঐ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখ দুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি-একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।'[১] তাহা হইলেও 'রাজসিংহে'র দু'একটি চরিত্র, বিশেষ করিয়া জেব-উন্নিসা, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে স্থায়ী সম্পদ।

রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেব বিপরীতধর্ম্মী চরিত্র। রাজসিংহ উদারচেতা, ক্ষমাশীল ও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ; ঔরঙ্গজেব সঙ্কীর্ণচেতা, কোপনস্বভাব, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং নারীকে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শেখেন নাই। রাজসিংহের মহত্ত্বের পরশপাথর স্পর্শে দস্যু মাণিকলাল প্রভুভক্ত হইল ; ঔরঙ্গজেবের রোষদৃষ্টিতে পড়িয়া প্রভুভক্ত মবারক বিশ্বাসঘাতক হইল। রাজসিংহ আর্ত্ত নারীর সম্মানরক্ষার্থ ক্ষুদ্র রাজ্যের মুষ্টিমেয় সেনাদল লইয়া 'সসাগরা

১ রাজসিংহ—আধুনিক সাহিত্য, ৯৯ পৃঃ।

পৃথিবীর অধীশ্বরে'র বিরোধিতা করিলেন ; ঔরঙ্গজেব ক্ষুদ্র বালিকাকে তাঁহার চপলতার শাস্তি দিবার জন্য বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তির সমাবেশ করিলেন। চঞ্চলকুমারীকে উদ্ধার করিতে যাইয়া মবারকের রণকৌশলে রন্ধ্রমধ্যে আবদ্ধ হইয়া রাজসিংহ যখন বুঝিলেন, মৃত্যু সুনিশ্চিত তখন 'সৈনিকগণকে একত্রিত করিয়া' তাঁহারই দোষে বিপদ ঘটিয়াছে, 'সরলান্তঃকরণে' একথা স্বীকার করিয়া তিনি তাহাদের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। কিন্তু মৃত্যুতে তাঁহার দুঃখ নাই : সৈনিকগণের 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি' দেখিয়া তিনি যখন বুঝিলেন যে 'প্রাণরক্ষা না হউক—একটি রাজপুতও হটিবে না', তখন 'আসন্ন-মৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত' হইলেন। (৪।৪)। পক্ষান্তরে, স্বীয় দুষ্টবুদ্ধির পরিণামস্বরূপ ঔরঙ্গজেব যখন রাজসিংহের রণকৌশলে বিরাট বাহিনী লইয়া রন্ধ্রপথে আবদ্ধ হইলেন, তখন তাঁহার মরণোন্মুখ সেনাদলের জন্য যে তাঁহার প্রাণে কোনরূপ সমবেদনার সঞ্চার হইয়াছিল অথবা কৃতকর্ম্মের জন্য যে কোনরূপ অনুশোচনা হইয়াছিল, তাঁহার আচরণে এরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় না। পরন্তু দিল্লীর বাদশাহ তখন আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণরক্ষার জন্য 'ক্ষুদ্রা রাজপুতকুলবালাকে উদ্ধারকারিণী মনে করিয়া তাহার পারাবত উড়াইয়া দিলেন।' (৮।২)। রাজসিংহ যুদ্ধকালে চঞ্চলকুমারীর আচরণে 'প্রীত' হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে রাজকুমারী প্রকৃতই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কিংবা 'কেবল বিপদে পড়িয়া' তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিয়া লইলেন (৫।২, ৯৬-১০০ পৃঃ) এবং তাঁহাকে অনুরক্ত জানিয়াও তাঁহার পিতার বিনানুমতিতে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন না।[১] পক্ষান্তরে, ঔরঙ্গজেব চঞ্চলকুমারীকে রাজসিংহের পরিণীতা পত্নী মনে করিয়াও (৬।৭, ১২৬ পৃঃ) তাঁহাকে কাড়িয়া লইবার জন্য শুধু যে যুদ্ধোদ্যম করিয়াছেন তাহা নহে, যখন নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইল তখনও 'চঞ্চলকুমারীকে দিতে হইবে' নির্লজ্জের মত এই 'বায়না' ধরিলেন এবং পরে নিতান্ত প্রাণের দায়ে 'সে বায়না ছাড়িতে হইল।' (৮।১০, ১৭৬-৭৭ পৃঃ)।

১ রাজসিংহ অবশ্য এ সম্পর্কে চঞ্চলকুমারীকে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতার বিনানুমতিতে তাঁহাকে বিবাহ করিলে তিনি তাহার 'শত্রু হইতে পারেন। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে....।' কিন্তু যিনি মোগল সম্রাটের বিরোধিতা করিতে ভয় করেন নাই, তিনি যে কেবলমাত্র এই কারণে চঞ্চলকুমারীর পিতার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন এবং অনুমতি না পাইয়া একই কারণে বিবাহ স্থগিত রাখিলেন, এরূপ অনুমান করা কঠিন। বস্তুতঃ চঞ্চলকুমারীর প্রতি মহারাণার আচরণে সর্ব্বত্রই একটা সহজ সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের তারতম্যের জন্য পাছে তাঁহাকে কেহ ভুল বোঝেন এই আশঙ্কায় উপন্যাসের 'উপসংহারে' বঙ্কিম তাঁহার পাঠক-পাঠিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন: 'গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।' বঙ্কিমের দৃষ্টিতে ঔরঙ্গজেবের পরাজয়ের কারণ, তিনি 'ধর্ম্মশূন্য'। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের কলঙ্ক, ইহার সহিত মুসলমান জাতি বা ধর্ম্মের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ যিনি তরুণ বয়সে আয়েষার পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং চাঁদশাহ ফাকর যাঁহার শেষ উপন্যাস অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন ওঠে না।

একই প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'রাজা যেরূপ হয়েন রাজানুচর এবং রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদিপুরী ও চঞ্চলকুমারীর তুলনায়, জেব-উন্নিসা ও নির্ম্মলকুমারীর তুলনায়, মাণিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়।' এই সকল চরিত্রের পরিকল্পনার ইহাই গোড়ার কথা।

মাণিকলালকে যখন প্রথম দেখিতে পাই তখন তাহার পরিচয়, সে দস্যু। দস্যু মাণিকলাল সমাজ-শৃঙ্খলার বাহিরে ও সমাজের শত্রু। কিন্তু সমাজের সহিত তাহার একটুকু বন্ধন রহিয়াছে, মাণিকলাল মাতৃহীনা কন্যার জনক। এই ক্ষুদ্র বন্ধনই তাহাকে মানব-সমাজের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মানুষ করিল। মাণিকলাল নির্ভীক; শারীরিক ক্লেশ বা মৃত্যু তাহার নিকট তুচ্ছ কথা। মহারাণা তাহাকে মার্জ্জনা করিয়া যখন ব্রহ্মস্বহরণের দণ্ডের প্রশ্ন তুলিলেন, মাণিকলাল স্বেচ্ছায় গুরু দণ্ড গ্রহণ করিল—অবলীলাক্রমে স্বহস্তে স্বীয় তর্জ্জনী ছেদন করিল।[১] (৩১৪)। কিন্তু মরিলে তাহার কন্যা অনাহারে মরিবে, এই কারণেই মহারাণা প্রথম তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে মাণিকলাল কাতরস্বরে ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছে এবং মহারাণার চরণ স্পর্শ করিয়া জীবনের বিনিময়ে দাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছে। এইরূপে তাহার জীবনের কলঙ্কিত অধ্যায়ের উপর যবনিকা পড়িল। প্রভুভক্তির দীপ্তরশ্মি তাহাকে নূতন জীবন-পথ দেখাইয়া দিল।

মাণিকলালের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহার চাতুর্য্য ও প্রভুভক্তি; প্রভুভক্তি জীবনদাতার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন, চাতুর্য্য তাহার জন্মগত সম্পদ।

১ পরবর্ত্তীকালে এই স্বেচ্ছাকৃত শাস্তিই প্রভুর কার্য্যে মাণিকলালের সহায় হইল। সুতরাং মাণিকলালের চরিত্রবিকাশের দিক দিয়াই নহে, কাহিনীর ক্রমবিকাশের দিক দিয়াও ইহা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রতিকূল অবস্থায় মাণিকলালের যে চাতুর্য্য হয়ত মানব-সমাজের প্রভূত অকল্যাণ সাধন করিত, অনুকূল আবেষ্টনে তাহাই প্রভুর কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া তাহার জীবন সার্থক করিল। রাজসিংহের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষাকালে মাণিকলাল বলিতেছে, "যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।" ইহা যে মিথ্যা স্তোকবাক্য নহে, অল্পকালের মধ্যেই সে ইহা প্রমাণ করিয়া দিল. রূপনগরীর রাজকুমারীর উদ্ধারকালে রাজসিংহের প্রধান সহায় মাণিকলাল এবং মাণিকলালের চাতুর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই সেদিন মহারাণাকে নিশ্চিত পরাজয়ের গ্লানি হইতে রক্ষা করিল। যে উপায়ে মাণিকলাল রূপনগর হইতে দিল্লীর পথে পর্ব্বতোপরি মহারাণার সন্ধান করিয়া লইল (৩।১), যে উপায়ে মোগল সৈনিকের পরিচ্ছদ, হাতিয়ার ও অশ্ব (চুরি করিয়া নহে) 'ঠকাইয়া' লইয়া[১] (৩।১০) মোগল সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া মহারাণার নির্দ্দেশমত রাজকুমারীকে মোগলের হস্ত হইতে উদ্ধার করিল (৪।৩), যে উপায়ে বাদশাহের দরবারে মহারাণার পত্র পেশ করিয়া সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া বাদশাহের রোষ হইতে আত্মরক্ষা করিল এবং নির্ম্মল-কুমারীর নিরাপত্তার সংবাদ জানিয়া লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিল (৬।২-৩, ৬।৬ ও ৬।৯)—সে সমস্তই তাহার অসামান্য চাতুর্য্যের পরিচয় দেয়।

মাণিকলালের সূক্ষ্ম বিবেকবোধ নাই। প্রভুর কার্য্য করিতে যাইয়া সে কখনও ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে প্রবৃত্ত হয় নাই। নুর মহম্মদকে বঞ্চনা করিতে তাহার যেমন কোন সঙ্কোচ বোধ হয় নাই, মবারককে পুনর্জীবিত করিয়া প্রতিদানে তাহার কৃতজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তাহাকে দিয়া তাহার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর কার্য্য, তাহার প্রভু বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করিয়া লইতেও সে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করে নাই। (৭।৩, ২৪৫-৪৬ পৃঃ ও ৭।৪, ২৫০-৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মাণিকলালের প্রভুভক্তি তাহার সকল কার্য্যই সুন্দর ও শোভন করিয়া তুলিয়াছে।

মবারক ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, মহানুভব, নির্ভীক বীরপুরুষ। রূপনগরের রাজকুমারীর প্রতি বীরোচিত আচরণ (৪।৪, ৮৫-৮৬ পৃঃ) তাহার চরিত্রগত মহত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু বাদশাহের অনুদার মন তাহার মহত্ত্বের মর্য্যাদা বুঝিল না। সহজ অবস্থায় প্রভুভক্তিতে মবারক মাণিকলাল হইতে ন্যূন হইত না, কিন্তু রাজসিংহের মহানুভবতার ফলে জীবনদাতার প্রতি

১ মাণিকলাল-মহারাজিয়া-নুরমহম্মদ সংবাদ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলীর মাঝখানে কৌতুকপূর্ণ রঙ্গচিত্র (comic interlude)।

কৃতজ্ঞতা মাণিকলালকে প্রভুভক্ত করিল ; পক্ষান্তরে ঔরঙ্গজেবের 'কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে না' নীতির পরিণামে জীবনদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা মবারককে বিশ্বাসঘাতক করিল। রাজসিংহের উদার নীতি অনুতপ্ত পাপীকে মার্জ্জনা করিয়া শত্রুকে মিত্র করিল এবং পরিণামে রন্ধ্রমুখে মবারকের হস্তে নিশ্চিত পরাজয়কে জয়শ্রীমণ্ডিত করিল ; ঔরঙ্গজেবের কুটিল নীতি পুণ্যকে দণ্ডিত করিয়া মিত্রকে শত্রু করিল এবং পরিণামে রন্ধ্রপথে তাঁহার লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্যতম কারণ হইল।)

কিন্তু মবারকের বিশ্বাসঘাতকতা তাহার পক্ষে অগৌরবের নহে ; বিপরীত ঘটনার আবর্ত্তে ইহা তাহার মহত্ত্বেরই রূপান্তর মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, বাদশাহ তাহার মৃত্যুদণ্ড বিধান করিয়াছেন বলিয়া মবারক কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করে নাই। পরন্তু তাহারই প্রবঞ্চনার ফলে বাদশাহ রন্ধ্রমধ্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা ভাবিতে সে মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছে। রাজসিংহ যখন তাহার কর্ম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন, তখন মবারক বলিতেছে, "মহারাজ! বে আদবী মাফ হৌক। আমি মোগল হইয়া মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কার্য্য করিয়াছি। আমি সত্যবাদী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছি। আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমকহারামী করিয়াছি। আমি মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাইতেছি। আমার আর কোন পুরস্কারে সাধ নাই। আমি কেবল এক পুরস্কার আপনার নিকট ভিক্ষা করি। আমাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন। ....অথবা আমাকে বাঁধিয়া বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দিন, অথবা অনুমতি দিন যে, আমি যে প্রকারে পারি, মোগল সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করি।" মবারকের এই আত্মগ্লানিপূর্ণ উক্তির মধ্য দিয়া তাহার স্বজাতিপ্রীতি, সত্যনিষ্ঠা ও বাদশাহের প্রতি তাহার কর্ত্তব্যবোধ পরিস্ফুট হইয়াছে। জীবনদাতার প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া তাহাকে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে বলিয়াই ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার কৃতঘ্নতাও তাহার চরিত্রকে গৌরবময় করিয়াছে।

কিন্তু বহু গুণের অধিকারী হইয়াও মবারক দিল্লীর তৎকালীন দুর্নীতির সংক্রমণ এড়াইতে পারে নাই। তাহার সহজ ধর্ম্মানুভূতি তাহার অবৈধ প্রণয়কে তিরস্কৃত করিলেও জেব-উন্নিসার রূপের আকর্ষণে বীর মবারক তস্করের ন্যায় রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিয়াছে। বস্তুতঃ, জেব-উন্নিসার আকর্ষণ তাহার পক্ষে এমনই দুর্নিবার যে, প্রত্যাখ্যাতা জেব-উন্নিসার রোষদৃষ্টিতে পড়িয়া সম্রাটের

আদেশে তাহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইলেও, মাণিকলালের কৃপায় যখন সে পুনর্জীবন লাভ করিল তখনও সে এই আকর্ষণের প্রভাবমুক্ত হইতে পারিল না। ইহা সত্য যে, এই সময় জেব-উন্নিসার জীবনেও গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং মবারক তাঁহাকে যথারীতি বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, জেব-উন্নিসার আকর্ষণে মবারক পুনরায় দরিয়াকে বিস্মৃত হইল। মাণিকলাল তাহার প্রাণদাতা বলিয়া তাহার অনুরোধে মবারক বাদশাহের প্রতি কৃতঘ্নতা করিয়াছে, কিন্তু যে দরিয়া একদিন তাহার প্রাণদান করিয়াছে (৫।১), আসক্তির স্রোতের মুখে তাহার স্মৃতি মুহূর্ত্তে ধুইয়া মুছিয়া গেল। দরিয়ার ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া জেব-উন্নিসার প্রতি আসক্তি মবারকের শুভ্র চরিত্রে একমাত্র কলঙ্কচিহ্ন।

চঞ্চলকুমারী ও উদিপুরী, রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের ন্যায় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী চরিত্র। রূপনগরের অন্তঃপুরের অবরোধে রাজসিংহের চিত্র সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার বীরজনোচিত মূর্ত্তি কল্পনা করিতে করিতে ধ্যানমগ্না চঞ্চলকুমারী ভাবেন

গৌরী সম্‌ঝে ভসমভার,
পিয়ারী সম্‌ঝে কালা।
শচী সম্‌ঝে সহস্রলোচন,
বীর সম্‌ঝে বীরবালা ।।

গঙ্গাগর্জ্জন শম্ভুজটাপর,
ধরণী বৈঠত ত বাসুকীফণ্‌মে।
পবন হোয়ত অগুন-সখা,
বীর ভজত যুবতী মন্‌মে ।।

রাজসিংহ, ১।৩

আর দিল্লীর রঙ্‌মহালের সজ্জিত বিলাসকক্ষে সরাবের পিয়ালা মুখে তুলিয়া অর্দ্ধচেতনা উদিপুরী ভাবেন তাঁহার কল্পিত প্রণয়ী 'ফার্স মুলুকের বাদশাহ'কে যিনি তাঁহার 'সুরৎ ও দৌলৎ শুনিয়া একেবারেই বেহোস্ ও দেওয়ানা' হইয়াছেন। (৬।৪, ১১৬ পৃঃ)। চঞ্চলকুমারী আত্মসমর্পণ করিয়াছেন শৌর্য্য ও কীর্ত্তির পাদমূলে; উদিপুরী ডুবিয়া মরিয়াছেন বিলাস ও লালসার পূতিগন্ধময় নরককুণ্ডে। চঞ্চলকুমারী উদয়পুরের রাজলক্ষ্মী; উদিপুরী রঙ্‌মহালের মূর্ত্ত ব্যভিচার।

চঞ্চলকুমারীর প্রণয় তিলোত্তমার প্রণয়ের ন্যায় প্রথমদর্শন সঞ্জাত।

আপাতদৃষ্টিতে দুইয়ের তফাৎ এই যে তিলোত্তমা আকৃষ্ট হইয়াছেন আসল মানুষ দেখিয়া, চঞ্চলকুমারীর প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে প্রতিকৃতি দেখিয়া। কিন্তু ইঁহাদের প্রণয়ের গভীরতর মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। তিলোত্তমার প্রণয় রূপজ ; চঞ্চলকুমারীর প্রণয় গুণজ। জ্ঞান হওয়া অবধি সংগ্রাম ও প্রতাপের বংশধর রাজসিংহের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া, মনে মনে সেই সকল কাহিনী আলোচনা করিতে করিতে আপনার অজ্ঞাতসারে চঞ্চলকুমারী মহারাণার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন। তারপর এক শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার চিত্র দর্শন করিয়া সহসা তিনি আপনার অন্তরের পরিচয় পাইলেন, বীরবালা বীরত্বের চরণে আত্মনিবেদন করিলেন।

চঞ্চলকুমারীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহার দৃঢ় তেজস্বিতা ও একান্ত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা। তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাঁহার পিতার নিকট বাদশাহকে কন্যাদানের আদেশপত্র জারি হইবার পর হইতে রাজসিংহের আনুকূল্যে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যেকটি আচরণ— বিশেষ করিয়া রাজসিংহের সঙ্কটকালে 'ভৈরবী মূর্ত্তি'তে যখন তিনি উভয় সেনার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন (৪।৪) তৎকালীন তাঁহার আচরণ—তাঁহার বলিষ্ঠ মন ও তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যবোধের পরিচয় দেয়। মবারক তাঁহার চক্ষে সয়তানের দূত ; কিন্তু এই মবারক যখন (রাজসিংহের নিকট নহে) তাঁহার মহত্ত্বের নিকট নতি স্বীকার করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল, চঞ্চল সে অবস্থায় তাহার জন্যও 'চিন্তিত' হইলেন, তিনি তাহাকে বাদশাহের আদেশ অমান্য করার বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্দ্ধে এই যে তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যানুভূতি, ইহারই জন্য চঞ্চলকুমারী শেষ পর্য্যন্ত প্রেমের দাবীর সহিত সন্তানের কর্ত্তব্যের সমন্বয় সাধন করিতে পারিলেন। এই দিক দিয়া ডেস্‌ডেমোনার সহিত চঞ্চলকুমারীর পার্থক্য স্মরণীয়। ডেস্‌ডেমোনা ও চঞ্চলকুমারী উভয়েই বীরত্বের পূজারিণী; কিন্তু ডেস্‌ডেমোনা প্রেমের জন্য পিতার অভিসম্পাত কুড়াইলেন, চঞ্চলকুমারী মনে মনে মহারাণাকে পতিত্বে বরণ করিলেও, পিতার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত অনূঢ়া রহিলেন।

নির্ম্মলকুমারী চঞ্চলের যোগ্য সহচরী এবং বাদশাহজাদী জেব-উন্নিসার বিপরীতধর্ম্মী চরিত্র। নির্ম্মলের আদর্শ ত্যাগ ; জেব-উন্নিসার আদর্শ ভোগ। নির্ম্মলের প্রত্যেকটি কার্য্য চঞ্চলকুমারীর প্রতি তাহার আত্মভোলা ভালবাসা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ; জেব-উন্নিসার কার্য্যের উৎস নিছক আত্মপ্রীতি।

নির্ম্মলকুমারী সুন্দরীর ন্যায় সাহসিকা ও সুচতুরা এবং গিরিজায়ার ন্যায় রঙ্গপ্রিয়। একটি ছোটখাটো ঘটনার ভিতর দিয়া আমরা প্রথমেই তাহার

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও চাতুর্য্যের পরিচয় পাই। চঞ্চলকুমারী যখন তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য 'আর পাঁচখানা চিত্রের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে করস্থ চিত্রখানি মিশাইয়া' ফেলিলেন, নির্ম্মল 'তাহার উল্‌টা পিঠে একটা কালো দাগ লক্ষ্য করিয়া তাহারই সাহায্যে রাজসিংহের তস্‌বীর এবং সেই সঙ্গে রাজকুমারীর মনের কথা বাহির করিয়া লইল। (১।৩)। যে নির্ম্মল উত্তরকালে কোতোয়ালের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহারই সাহায্যে রঙ্‌মহালে যোধপুরী বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আনুকূল্যে উদিপুরীর নিকট রাজকুমারীর 'নিমন্ত্রণপত্র' পৌঁছাইয়া দিল (৬।৩-৪), ক্ষীণ হইলেও এইখানে আমরা তাহার প্রথম পরিচয় পাই।

কিন্তু তীক্ষ্ণ হইলেও নির্ম্মলের দৃষ্টির প্রসারতা নাই। চঞ্চলের প্রিয় সখী হইয়াও সে তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। রাজকুমারী যখন তাহার নিকট বাদশাহের ফৌজের সহিত দিল্লীযাত্রার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্কল্প বুঝাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত, এমন কি ভর্ৎসিত হইয়াও, নির্ম্মল তাঁহার কথার গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিল না। নির্ম্মল নিজে কোন প্রকার মৃত্যুকে ভয় করে না, ঔরঙ্গজেবের সহিত নিঃশঙ্ক আচরণ ইহার সাক্ষ্য দেয়। এমত অবস্থায় চঞ্চল সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা বিস্ময়কর। এ হিসাবে রাজসিংহের সহিত তাহার পার্থক্য লক্ষণীয়। মহারাণা শুধুমাত্র একখানি পত্রের ভিতর দিয়া চঞ্চলের যে পরিচয় পাইলেন, রাত্রিদিন ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইলেও তাঁহার চরিত্রের সেই দিকটা সহসা নির্ম্মলের দৃষ্টিতে ধরা পড়িল না।

নির্ম্মল যে রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিয়া উদিপুরীর 'নিমন্ত্রণপত্র' পৌঁছাইয়া দিবার মত কঠিন ও বিপজ্জনক কার্য্যভার গ্রহণ করিল, তাহা প্রিয় সখী চঞ্চলের আদেশে একথা সত্য; কিন্তু মনে হয় এরূপ অসাধ্যসাধনে স্বভাবতঃই সে আনন্দ অনুভব করিত। একদিন সে বাঘ পুষিয়াছিল (১।৩, ১৩ পৃঃ) এবং যৌবনে তাহার যেমন ঔরঙ্গজেবকে বশে আনিবার উৎকট সাধ হইয়াছিল (ঐ)—কথাটা চঞ্চলকে পরিহাসচ্ছলে বলিলেও, ঔরঙ্গজেবের নিকটেও নির্ম্মল ইহার উল্লেখ করিয়াছে (৭।২)—তেমন ঘটনাচক্রে যখন সুযোগ জুটিল তখন রাজপুতনীর সম্মান পুরাপুরি বজায় রাখিয়াই সে সাধ সে মিটাইয়া লইল। ঔরঙ্গজেবের সহিত আচরণে তাহার সাহস, তাহার চাতুর্য্য, তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহার নারীসুলভ কোমলতা—এক কথায় তাহার চরিত্রের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হইয়াছে।

'রাজসিংহে'র গৌণ আখ্যায়িকার নায়িকা ও প্রতিনায়িকা: জেব-উন্নিসা ও দরিয়া উভয়েই প্রেমিকা। দরিয়ার প্রেম দরিয়ার ন্যায় উচ্ছ্বাসময়ী ও

অনিশ্চিত ; কখনও গড়ে, কখনও ভাঙ্গে ; কখনও প্রেমাস্পদকে অমঙ্গলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, আবার অবস্থান্তরে প্রলয়ঙ্কর রূপ ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করে। (জেব-উন্নিসার প্রেম তাঁহার সুখের দিনে খনিগর্ভের অন্তরালে হীরকখণ্ডের ন্যায় অনাবিষ্কৃত সম্পদ, সুতরাং অবজ্ঞেয়। গর্ব্বিতা জেব-উন্নিসা তাই মবারককে তাঁহার বিলাসের উপকরণ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করিলে মবারককে হত্যা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কিন্তু ইহারই প্রতিক্রিয়ায় যখন তিনি প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন, তখন বাদশাহজাদীর খোলস ছাড়িয়া তিনি নবজীবন লাভ করিলেন।) (দরিয়ার প্রেম প্রতিহিংসার রূপ ধরিয়া আত্মঘাতী হইল ; জেব-উন্নিসার প্রেম প্রতি-হিংসার চিতাভস্মের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া সার্থক হইল।)

দরিয়া মবারকের পরিত্যক্তা পত্নী। মবারক জেব-উন্নিসাকে বলিতেছে, দরিয়া পাগল বলিয়া অনেকদিন হইল সে তাহাকে 'তাল্লাক্ দিয়া' পরিত্যাগ করিয়াছে। (২১৭, ৩৮ পৃঃ)। জ্যোতিষীর নিকটেও সে তাহাকে পাগল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। (২১১, ২২ পৃঃ)। কিন্তু জেব-উন্নিসার নিকট দরিয়ার আচরণ পাগলের আচরণ বলিয়া মনে হয় নাই। এবং রাজদণ্ডে মবারকের মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে তাহার কথাবার্ত্তায় বা কার্য্য-কলাপে কোনরূপ উন্মাদলক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। তবে কি মবারকের পক্ষে দরিয়াকে পাগল বলা তাহাকে তাল্লাক্ দেওয়ার অজুহাতস্বরূপ এবং এই তাল্লাকের প্রকৃত কারণ কি জেব-উন্নিসার রূপের আকর্ষণ ?

হয়ত জেব-উন্নিসার আকর্ষণের সহিত দরিয়াকে তাল্লাক্ দেওয়ার পরোক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে ; অন্ততঃ এরূপ সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নাকচ করা চলে না। কিন্তু দরিয়াকে প্রকৃতিস্থ জানিয়াও নিজের কার্য্যের কৈফিয়তস্বরূপ অথবা আত্মরক্ষার তাগিদে মবারক জেব-উন্নিসার নিকট তাহাকে পাগল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিবে, এরূপ অনুমান করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, জেব-উন্নিসার নিকট দরিয়াকে পাগল বলায় মবারকের স্বার্থ থাকিলেও, তাহাকে সত্যই পাগল মনে না করিলে জ্যোতিষীর নিকট তাহাকে পাগল বলার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। (আসলে পাগল না হইলেও, দরিয়া অত্যন্ত খেয়ালীপ্রকৃতি এবং যেভাবে জনবহুল রাজপথে সে 'মবারকের হাত ধরিয়া টানিয়া' তাহাকে জ্যোতিষীর নিকট লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল তাহাতে মনে হয় এইরূপ ভালবাসার অত্যাচারই মবারকের চক্ষে পাগলামির লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিবে। এবং দরিয়ার জীবনের পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে তাহার খেয়ালী আচরণ সত্যই উন্মাদ-প্রবণতার ইঙ্গিত করে।)

দরিয়া মবারকগতপ্রাণা। যে প্রণয়াবেগে দরিয়া মবারককে জ্যোতিষীর নিকট টানিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই প্রণয়াবেগেই সে রূপনগর অভিযানকালে ছদ্মবেশে ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। (৫।১)। দরিয়ার ঈর্ষ্যাও তাহার প্রণয়াবেগের রূপান্তরিত অভিব্যক্তি। প্রণয়ে ঈর্ষ্যা মানব মনের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। এবং প্রণয় যত তীব্র ও আবেগময়ী হয়, ঈর্ষ্যাও তত প্রবল হয় এবং ব্যর্থ প্রেমিকার প্রতিহিংসাও তত ভয়ঙ্করী হয়। দরিয়ার ঈর্য্যার লক্ষ্যবস্তু জেব-উন্নিসা। জেব-উন্নিসা তাহার স্বামীকে কাড়িয়া লইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে জ্বালাইবার উদ্দেশ্যে দরিয়া সংবাদ বিক্রয়ের ছলে তাঁহার নিকট মবারকের সহিত নিজের বিবাহের কথা বলিয়াছে, বলিয়া মার খাইয়াছে। দরিয়া মার খাইয়া, পুরস্কার লইয়া মনে মনে বলিয়াছে, "আবার আসিব—আবার জ্বালাইব—আবার মার খাইব—আবার টাকা নিব। তোমার সর্ব্বনাশ করিব।" (২।৪, ৩৩ পৃঃ)।

কিন্তু জেব-উন্নিসার উপর প্রতিহিংসা লইতে যাইয়া দরিয়ার প্রতিহিংসাবৃত্তি মবারককেও অব্যাহতি দেয় নাই। জ্যোতিষী দ্বারা ভাগ্যগণনাকালে ভীড়ের মধ্য হইতে দরিয়ার সর্ব্বনাশী উক্তিঃ "আর মৃত্যু।" মবারকের নিকট পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে হইলেও ইহা তাঁহার ঈর্য্যামথিত অন্তরের স্বতোচ্চারিত ভবিষ্যৎবাণী। অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনীর উপর প্রতিহিংসা লইতে যাইয়া দরিয়া যখন মবারককে হত্যা করিল তখন সে ঘোর উন্মাদিনী। এবং ইহার পূর্ব্বে যখন 'শিবিরের পাঁচিলের তলায়' লুকাইয়া জেব-উন্নিসা ও মবারককে লক্ষ্য করিয়াছে তখনও সে প্রকৃতিস্থ ছিল না। (৮।১৩, ১৮৪ পৃঃ)। কিন্তু সহজ অবস্থায় যে বিজাতীয় প্রতিহিংসার কল্পনা কখন কখন তাহার মনের কোণে উঁকি মারিত, উন্মাদ অবস্থায় তাহাই তাহার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। উন্মাদের আচরণে কোন কোন ক্ষেত্রে সুসংলগ্ন পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। এবং যাহারা বিশেষ কোন কারণে উন্মাদ হয়, অনেক সময় সেই বিশেষ কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট বিশেষ চিন্তাধারা অথবা কোন বিশেষ কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগকে ভূতের মত পাইয়া বসে। দরিয়া সেই শ্রেণীর উন্মাদিনী। মবারকের মৃত্যুসংবাদে যখন সে বুদ্ধি হারাইল তখন হইতে প্রতিহিংসাই তাহার একমাত্র চিন্তা হইল। প্রতিহিংসাপ্রণোদিত হইয়া জেব-উন্নিসাকে হত্যার উদ্দেশ্যে দরিয়া রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিল। কিন্তু জেব-উন্নিসার অশ্রু দেখিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হওয়ায় তাঁহার শোকে আপনার শোক ভুলিয়া পরি-তৃপ্তির আনন্দে 'সহসা তরবারি ফেলিয়া' দরিয়া 'জেব-উন্নিসার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল।' (৬।৯)। মবারক ও জেব-উন্নিসার পুনর্মিলনের দিনে

জেব-উন্নিসার মুখের হাসি পুনর্বার তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগাইয়া তুলিল এবং জেব-উন্নিসাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিবার পর মাণিকলালের লোক তাহাকে ধরিতে আসিলে উন্মাদিনী দরিয়া চরিতার্থতার আত্মতৃপ্তিতে 'হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গেল।' (৮।১৫)। অপরকে শাস্তি দিতে যাইয়া সে নিজে কি হারাইল, হতভাগিনী দরিয়ার তখন তাহা বুঝিবার শক্তি নাই।

(জেব-উন্নিসার পরিচয় তিনি বাদশাহজাদী। রংমহালের রঙিন নেশায় আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকিয়া জেব-উন্নিসা ভাবেন, বিধাতা বাদশাহজাদীকে সাধারণ মানুষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সাধারণের সুখদুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে না, সাধারণের পাপপুণ্যের আদর্শ তাহার জন্য নহে। জেব-উন্নিসার লক্ষ্য ও আদর্শ তাঁহার প্রণয়পিপাসু মবারকের সহিত তাহার সংলাপের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে

'মবা। এই কি উচিত, শাহজাদী?

জেব। এই কি?

মবা। এই মহাপাপ।

জেব। কে মহাপাপ করিতেছে?

মবারক মাথা হেঁট করিল। শেষে বলিল, 'তুমি কি বুঝিতেছ না?''

জেব-উন্নিসা। যদি ইহা পাপ বলিয়া বোধ হয়, আর আসিও না।

মবারক সকাতরে বলিল, "আমার যদি সে সাধ্য থাকিত, তবে আমি আর আসিতাম না। কিন্তু আমি ঐ রূপরাশিতে বিক্রীত।"

জেব। যদি বিক্রীত—যদি তুমি আমার কেনা—তবে যা বলি, তাই কর। চুপ করিয়া থাক।

মবা। যদি আমি একাই এ পাপের দায়ী হইতাম, না হয় চুপ করিয়া থাকিতাম। কিন্তু আমি তোমাকে আপনার অধিক ভালবাসি।

জেব-উন্নিসা উচ্চ হাসি হাসিল। বলিল, "বাদশাহজাদীর পাপ!"

মবারক বলিল, "পাপপুণ্য আল্লার হুকুম।"

জেব। আল্লা ঐ সকল হুকুম ছোটলোকের জন্য করিয়াছেন—কাফেরের জন্য। আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে, যে এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষে আগুনে পুড়িয়া মরিব? আল্লা যদি আমার জন্য সেই বিধি করিতেন, তবে আমাকে কখনও শাহজাদী করিতেন না।' রাজসিংহ, ২।৩, ২৬-২৭ পৃঃ।

রূপনগর-অভিযানের প্রাক্কালে মবারক যখন তাঁহার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছে, তখনও জেব-উন্নিসা একই সুরে কথা বলিতেছেন:

'মবা। অধমের প্রতি কি আপনার একটু ভালবাসাও নাই?

জেব। বাদশাহজাদীদের আবার ভালবাসা।

মবা। আল্লা তবে বাদশাহজাদীদের কি জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন?

জেব। সুখের জন্য। ভালবাসা দুঃখ মাত্র।

... ...

মবা। ....কিন্তু এ গরীবকে একটু ভালবাসিতে হইবে।

জেব। বলিলাম না যে, তুমি আমার প্রাণাধিক?

মবা। ভালবাসিয়া বলিয়াছেন কি?

জেব। বলিয়াছি, ভালবাসা গরীব দুঃখীর দুঃখ। শাহজাদীরা সে দুঃখ স্বীকার করে না।' রাজসিংহ, ২।৭, ৪১ পৃঃ।

(বিকৃত শিক্ষা ও অশুচি আবেষ্টনের ফলে জেব-উন্নিসার চক্ষে ভোগ-বিলাসই জীবনে একমাত্র কাম্য। মবারক তাঁহার হুকুমের গোলাম, তাঁহার বাসনাতৃপ্তির উপকরণ মাত্র; মবারকের ধর্ম্মজ্ঞান তাঁহার নিকট উপহাস্য ও অবজ্ঞেয়।[১] 'ঐশ্বর্য্যমদে' ও 'রূপের গর্ব্বে' জেব-উন্নিসা বুঝিতে পারেন নাই যে, 'খোদা বাদশাহজাদীকে ও চাষার মেয়েকে একই ছাঁচে ঢালিয়াছেন; —ধন দৌলত, তক্তে তাউস, সকলই কর্ম্মভোগ মাত্র, আর কোন প্রভেদ নাই।' বুঝিতে পারেন নাই যে, বিবাহ ও ভালবাসা দুঃখের হইতে পারে, কিন্তু এই দুঃখের ভিতর দিয়াই নারী তাহার চরম সার্থকতায় পৌঁছায়। জেব-উন্নিসার পরবর্ত্তী জীবনের ইতিহাস তাঁহার ভুল-ভাঙ্গার ইতিহাস।)

(দরিয়ার ভালবাসার অনুভূতির ফলে মবারক যখন সাময়িক জেব-উন্নিসার রূপের মোহের বেড়াজাল হইতে মুক্ত হইল, তখন বাদশাহজাদীর অন্তরালে জেব-উন্নিসার চিরন্তন নারীত্ব চঞ্চল হইয়া উঠিল। রূপনগর-অভিযানে তাহার খ্যাতির সংবাদ পাইয়া জেব-উন্নিসা প্রথমে ভাবিলেন, 'মবারক নিজে উপযাচক হইয়া তাঁহার নিকট হাজির হইয়া সকল পরিচয় দিবে। কিন্তু মবারক আসিল না।' সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত জেব-উন্নিসা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 'তথাপি মবারক আসিল না। জেব-উন্নিসার বড় রাগ হইল। বড় হেমাকৎ —বাদশাহজাদী মেহেরবানি ফরমাইয়া ইয়াদ্ করিতেছেন—তবু নফর হাজির হয় না—বড় গোস্তাকী।'

রাগ করিয়া জেব-উন্নিসা ভাবিলেন, 'আমার ত সকলই সমান।' কিন্তু

১ মবারক যখন পর্দার আড়ালে থাকিয়া উদিপুরীকে দেখিবার প্রস্তাবের উত্তরে বলিল, "ছি!", জেব-উন্নিসা হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "দিল্লীতে তোমার মত কয়টা বানর আছে?" ২।৭, ৪১ পৃঃ।

তাঁহার নারীত্ব এ যুক্তি মানিতে চাহিল না। সুতরাং 'কিছুদিন রাগের উপর থাকিয়া, জেব-উন্নিসা মবারকের জন্য একটু কাতর হইলেন। মান খোওয়াইয়া —শাহজাদীর মান, নায়িকার মান, দুই খোওয়াইয়া, আবার সেই মবারককে ডাকিয়া পাঠাইলেন।' এবার মবারক তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, বলিয়া পাঠাইল যে, সে দরিয়াকে ঘরে আনিয়াছে, আর রঙ্গমহালে প্রবেশ করিবে না।

এ উত্তর শুধু অপ্রত্যাশিত নহে, বাদশাহজাদী এরূপ উত্তরে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। 'জেব-উন্নিসা রাগে ফুলিয়া আটখানা হইল।' তাঁহার ক্রুদ্ধ ভ্রকুটির সম্মুখে তাঁহার নারীত্ব ভয়ে মুখ লুকাইল। বাদশাহজাদীর ভোগের খোরাক যোগাইতে অসম্মত হওয়ার দণ্ডস্বরূপ মবারক মরিল। (৬১৭)।

মবারক মরিল। কিন্তু তাহাকে হত্যা করিয়া জেব-উন্নিসা বুঝিলেন যে, তিনি কি হারাইলেন। বুঝিলেন যে, 'সকলই সমান' নহে। বুঝিলেন যে, খোদা জেব-উন্নিসার জন্য একজন মবারকই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবং ভালবাসার এই নূতন অনুভূতির ফলে তাঁহার চিরাভ্যস্ত জীবনের ভিত্তিতে ফাটল ধরিল, তাঁহার মনে হইল, 'ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি আছে', সুতরাং দণ্ড ও দণ্ড-বিধাতাকে স্মরণ করিয়া জেব-উন্নিসার 'ভয়ও হইল'। (৬১৮)।

'দুঃখে, শোকে, ভয়ে' জেব-উন্নিসা মবারককে বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, অর্থাৎ তিনি যখন সংবাদ পাইলেন, তাঁহাকে 'কিছুতেই বাঁচান গেল না', তখন বাদশাহজাদী বাদশাহজাদীত্ব ভুলিয়া 'পাথরে লুটাইয়া পড়িয়া, চাষার মেয়ের মত' মাথা কুটিতে কুটিতে ভাবিলেন, "যদি চাষার মেয়ে হইতাম!" (৬১৯)। প্রকৃতির বিধানে ইহাই অলঙ্ঘনীয় প্রতিশোধবিধি।

বাদশাহজাদীর জীবনে যখন এইরূপ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, তখন বাহির হইতেও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার মর্য্যাদায় আঘাত লাগিল ; দুনিয়ার বাদশাহের কন্যা উদয়পুরের বন্দিনী হইলেন। ভিতরে ও বাহিরে এই আলোড়নের ফলে, বিশেষ করিয়া উদয়পুরে তাঁহার প্রথম রাত্রির বিচিত্র এবং তাঁহার দৃষ্টিতে অলৌকিক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায় বাদশাহজাদী মরিল ; জেব-উন্নিসা নবজীবন লাভ করিলেন।

আর্টের দিক দিয়া নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর পুনর্মিলনের চিত্র অনেক উচ্চ স্তরের হইলেও মবারকের সহিত অনুতপ্ত জেব-উন্নিসার পুনর্মিলনের চিত্র কতকটা ঐ চিত্রের অনুরূপ। এবং এক্ষেত্রেও জেব-উন্নিসার অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য বঙ্কিম বহিঃপ্রকৃতিকে পটভূমিকারূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্য-

মুখী যে জীবিত নগেন্দ্রের ন্যায় পাঠকেরও তাহা অজ্ঞাত থাকায় নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর মিলনের চিত্রে যে চমৎকারিত্ব রহিয়াছে, এই চিত্রে সে চমৎকারিত্ব নাই। পরন্তু জেব-উন্নিসা ও মবারকের সাক্ষাৎকারের জন্য পাঠক পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত রহিয়াছেন।

এই দুইটি চিত্রে অপর এক পার্থক্য এই যে, নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী উভয়েই পূর্ব্ব হইতে অনুতপ্ত, সুতরাং সহজেই তাঁহাদের মিলন ঘটিল। পক্ষান্তরে, প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতার পূর্ব্বে জেব-উন্নিসার অনুতাপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই, তিনি বাদশাহজাদীর গর্ব্ব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। মবারক সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, তাহার মনে জেব-উন্নিসার প্রতি কিছুটা আকর্ষণ থাকিলেও (মবারক যাহাই বলুক, তাহার অবচেতন মনে কিছুটা আকর্ষণ না থাকিলে, তাহাকে দেখিয়া জেব-উন্নিসা কি বলেন বা কি করেন তাহা জানিবার জন্য তাহার কোনরূপ ঔৎসুক্য থাকিত না), তাঁহার আচরণে তাঁহার প্রতি যে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, মিলনের পূর্ব্বে মবারকের মনের সে বিতৃষ্ণাও দূর করিতে হইবে। এই কারণেই মবারক তাহার মৃত্যুদণ্ডবিধান-কারিণী বাদশাহজাদীর নিকট প্রথম রাত্রিতে ছায়ামূর্ত্তিই রহিয়া গেল। (৮।৪)।

কিন্তু প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতার ফলে জেব-উন্নিসার গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। পূর্ব্বদিবস চঞ্চলকুমারীর আহ্বানে যখন তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন, "আমি যে আলমগীর বাদশাহের কন্যা, তাহা কিছুতেই ভুলিব না।" (৮।৪, ১৫৯ পৃঃ)। আর এক্ষণে তিনি মবারককে নহে (মবারক তাঁহার চক্ষে মৃত), তাহার ছায়ামূর্ত্তি পুনরায় দর্শনা-কাঙ্ক্ষায় এমনই ব্যাকুল হইলেন যে, উপযাচিকা হইয়া শুধু যে চঞ্চলকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তাহা নহে, তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া এই অনুগ্রহ লাভের জন্য করুণা ভিক্ষা করিলেন। জেব-উন্নিসা আর বাদশাহজাদী নহেন, তাঁহার পরিচয় তিনি প্রিয়বিয়োগবিধুরা আর্ত্ত নারী। তাই তাঁহার দ্বিতীয় রাত্রির অভিসার ব্যর্থ হইল না, মবারকের ছায়ামূর্ত্তি-দর্শনাভিলাষিণী জেব-উন্নিসা তাহার পত্নীত্বের সৌভাগ্য লাভ করিলেন।)

কিন্তু দরিয়ার অশ্রু-অভিশপ্ত তাঁহাদের এই মিলন ক্ষণিকের। বাদশাহ-জাদীর সহিত পরিণয়ের ফলে 'পদবৃদ্ধি' হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন মেবারযুদ্ধে শাহজাদা আক্‌ব্বরের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার জন্য তাহার প্রতি বাদশাহের আদেশ হইল, মবারক এই সম্মানের মধ্যে তাহার মৃত্যুর আহ্বান শুনিতে পাইল এবং মেবারযুদ্ধাভিযানের প্রাক্কালে জেব-উন্নিসার নিকট হইতে তাহার বিদায়-

মুহূর্ত্তকেও তিক্ত করিয়া দিল উন্মাদিনী দরিয়ার মূক অভিযোগ। (৮।১৩, ১৮৪ পৃঃ)।

ইহার পরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। মবারক ও জেব-উন্নিসা—একজন রূপের নেশায়, অপর ঐশ্বর্য্যের মোহে ভালবাসার উপর যে অত্যাচার করিয়াছেন, দলিত, লাঞ্ছিত ভালবাসাই তাহার প্রতিশোধ লইল।

আনন্দমঠ

'আনন্দমঠে'র আখ্যানভাগ বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের দুইটি স্মরণীয় ঘটনা : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং মন্বন্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলায় মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়াছে অথচ ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই—পলাশীযুদ্ধের পরের সেই ঘনান্ধকারময় দুর্দ্দিনে 'সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা' বঙ্গমাতা সন্তানের প্রতি বিরূপ হইলেন। '১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল।' ১১৭৬ সালে সে এক সন্ধ্যা আহারও জুটিল না, বাংলায় মন্বন্তর উপস্থিত হইল।[১] একে দেবতার অভিশাপ, তাহাতে রেজা খাঁর কর্ম্মকুশলতা,[২] 'বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।' সেদিনের বাংলার দুর্দ্দশা বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছেন, 'তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর।....মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ্ লেখে।[৩] বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।' (১।৭)। অল্প কয়েকটি কথা ; কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া তৎকালীন বাংলার মসীলিপ্ত ইতিহাসের স্বরূপ প্রকট হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে একটি ঐতিহাসিক ভুলের উল্লেখ প্রয়োজন। মীরজাফর 'মনুষ্যকুলকলঙ্ক', এ বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না ; কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ের অরাজকতার সহিত তাহার কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। কারণ তাহার মৃত্যু হয় মন্বন্তরের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এবং মন্বন্তরের সময় মুর্শিদাবাদের মসনদে আসীন ছিল তাহার পুত্র সৈয়েফুদ্দৌলা। সৈয়েফুদ্দৌলার মৃত্যু হয় মন্বন্তরের বৎসরেই (১০ই মার্চ্চ, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তাহার মৃত্যুর পর মসনদে আরোহণ করে তাহার নাবালক ভ্রাতা মুবারেকুদ্দৌলা।[৪] মীরজাফরের কুশাসনের সহিত বাংলার পাঠক সুপরিচিত বলিয়াই বঙ্কিম হয়ত মন্বন্তরের সহিত অখ্যাত পুত্রের পরিবর্ত্তে কুখ্যাত পিতার নাম জড়িত করিয়া থাকিবেন এবং ইহাতে আর যাহাই হউক, মীরজাফরের খ্যাতির বোঝা অধিকতর ভারাক্রান্ত হয় নাই।

১—৪ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য

একদিকে রাজশক্তির অক্ষমতা ও অব্যবস্থা, অন্যদিকে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ --এই উভয় কারণে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল তাহাই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পটভূমিকা। বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসের প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদে এই বিশৃঙ্খলতার নিখুঁত চিত্র দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত, 'শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ' দস্যুদলের পরিকল্পনা যতই বীভৎস হউক, ইহা দেশের তৎকালীন অবস্থার উপর তীব্র আলোকপাত করে।

আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—বাংলার এই দ্বিবিধ দুর্যোগের সুযোগ লইয়া বিদ্রোহী সন্ন্যাসীসম্প্রদায় সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য এবং কাপ্তেন টমাস ও মেজর এড্ওয়ার্ডস্ ঐতিহাসিক চরিত্র।[১] কাপ্তেন টমাসের মৃত্যুর যে চিত্র বঙ্কিম কল্পনা করিয়াছেন, (৩।১১) তাহাতেও ইতিহাসের বৃহত্তর সত্য রক্ষিত হইয়াছে। কারণ চরিত্রের যে শক্তিবলে ইংরেজ জাতি সুদূর পশ্চিম হইতে প্রাচীতে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে, এই চিত্রে সেই বিশিষ্ট চরিত্রবলকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাসে সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের চরিত্র যে বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে তাহা ইতিহাসসম্মত নহে। বিদ্রোহীরা কর্ম্মঠ, সাহসী ও সুনিপুণ ছিল, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু তাহারা অ-বাঙ্গালী এবং তাহারা শিক্ষিত ছিল না। এবং সত্যানন্দ ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে যে দেশপ্রাণতার উন্মাদনা রহিয়াছে, তাঁহারা হিন্দুরাজ্য পুনঃসংস্থাপনের যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত। এই প্রসঙ্গে আচার্য্য যদুনাথ লিখিয়াছেন: 'সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, একেবারে লুটেড়া ছিল,....মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 'আনন্দমঠে' বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য্য ও কথা (ইংরেজ সৈন্যের সহিত দুইটা খণ্ডযুদ্ধ বাদে) অনেকাংশে অসত্য।'[২]

প্রকৃতপক্ষে 'আনন্দমঠ' এবং ইহার পরবর্তী রচনা 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা বঙ্কিমের উদ্দেশ্য নহে, এবং শেষোক্ত উপন্যাসদ্বয়ের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি ইহা স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। এই তিনখানি

---

১ 'আনন্দমঠে'র Appendix I এ Gleig's Memoirs হইতে উদ্ধৃত Warren Hastings -এর পত্রাবলী এবং Appendix II এ Hunter's Annals of Rural Bengal হইতে উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য।

২ শতবার্ষিক সংস্করণে আচার্য্য যদুনাথ লিখিত ভূমিকা, ।৶০—।।০ পৃঃ।

উপন্যাসের ঐতিহাসিক কাঠামোকে বঙ্কিম প্রধানতঃ অনুশীলনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্ট মতবাদ প্রচারের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন এবং আচার্য্য যদুনাথের ভাষায় ইহাই 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'র 'অমৃত রস'।

'আনন্দমঠে'র একটি বিশিষ্ট সুর দেশপ্রীতি এবং ইহার অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত। এই সঙ্গীত 'আনন্দমঠে'র অনেক পূর্ব্বের রচনা[১] এবং সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় "আনন্দমঠে" যে সকল বিভিন্ন মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাঁহাদের পরিকল্পনার সহিত ইহাতে যে মাতৃমূর্ত্তির পরিকল্পনা রহিয়াছে তাঁহার পার্থক্য লক্ষণীয়। "আনন্দমঠে" প্রতিষ্ঠিত অতীতের মাতৃমূর্ত্তি 'সর্ব্বাভরণভূষিতা' জগদ্ধাত্রীরূপিণী। এই রূপে সোনার বাংলাকে একদিন তিনি সর্বৈশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছিলেন। আজ মায়ের সে ঐশ্বর্য্য নাই, তাঁহার অধরে সে দিব্য হাসি নাই ; দেশব্যাপী মন্বন্তরের মধ্যে বর্ত্তমানের মাতৃমূর্ত্তি 'অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী' কালীরূপিণী, 'হৃত-সর্ব্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কাল-মালিনী।' আর ভবিষ্যতের মাতৃমূর্ত্তি? 'সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা.... দিগ্‌ভুজা।—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।' শারদীয়া সপ্তমী তিথিতে এই রূপেই দেবী ক্ষণিকের জন্য কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ইঁহাকেই কমলাকান্ত মুহূর্ত্তে 'জননী জন্মভূমি' বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন। অতীতের, বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যতের এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি ভিন্ন "আনন্দমঠে" আর এক মাতৃমূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিতে তিনি সন্তানসম্প্রদায়ের প্রাণে নব প্রেরণার সঞ্চার করেন। মনে হয় মায়ের এই মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে সত্যানন্দ ঠাকুরের নিজস্ব পরিকল্পনা। ইনি বিষ্ণুর অঙ্কোপবিষ্টা এবং ইঁহার বামে লক্ষ্মী ও দক্ষিণে সরস্বতী। ইনি 'লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী। লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা।' মাতৃভক্ত সন্তান ইচ্ছানুরূপ মায়ের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইবেন হয়ত এই উদ্দেশ্যেই বঙ্কিম এই বিশিষ্ট মাতৃমূর্ত্তির ইহার অধিক রূপবর্ণনা করেন নাই। কিন্তু জগদ্ধাত্রী, কালী ও দশভূজার ন্যায় ইঁনিও 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মাতৃমূর্ত্তি হইতে স্বতন্ত্ররূপে পবিকল্পিত। কারণ ইঁহার বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে সরস্বতী, অর্থাৎ ইঁনি এই উভয় দেবী হইতে স্বতন্ত্র ; পক্ষান্তরে 'বন্দে মাতরম্'

১ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা'—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীতে মায়ের যে মূর্ত্তি রূপায়িত হইয়াছে তাহা সকল দেবীর সমন্বয়ে গঠিত রূপ-রস-গন্ধময়ী সজীব মাতৃমূর্ত্তি। ভক্ত সন্তান মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন; বাংলার জলে, বাংলার ফলে, বাংলার স্নিগ্ধ বায়ুতে, বাংলার শ্যামল শস্যক্ষেত্রে তিনি দেদীপ্যমানা। পূর্ণিমা রজনীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে তিনি হাস্যময়ী, কাননের কুসুমশোভায় তিনি শোভাময়ী, বনের মর্ম্মরে, পাখীর কলতানে তাঁহার কণ্ঠের আভাস পাওয়া যায়। মায়ের এই এক রূপ; এই রূপে তিনি সুখদা, বরদা, সর্ব্বকল্যাণময়ী। কিন্তু সাধক যখন দেবতার ধ্যানে তন্ময় হইয়া পড়েন, তখন উপাসক ও উপাস্য দেবতায় ভেদজ্ঞান রহিত হইয়া যায় এবং ভক্ত তখন নিজের মধ্যে দেবতাকে উপলব্ধি করেন। মায়ের অপর রূপে তাই তিনি সন্তান হইতে অভিন্না। সপ্তকোটি কণ্ঠের কলনিনাদে তিনি ভয়ঙ্করী, দ্বিসপ্তকোটিহস্তধৃত শাণিত অস্ত্রে তিনি শক্তিময়ী। এই রূপে তিনি শত্রুমর্দ্দিনী, সর্ব্বাপদে সন্তানের ত্রাণকর্ত্রী। মাতৃভক্ত সন্তানের তিনিই সকল প্রেরণার উৎস, তিনিই তাঁহার ধ্যানের দেবতা, তাঁহার একমাত্র দেবতা। তিনি বিদ্যা, তিনি ধর্ম্ম, তিনি হৃদি, তিনি মর্ম্ম, তিনিই শরীরে প্রাণরূপিণী। বাহুতে তিনিই শক্তির সঞ্চার করেন, হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য তাঁহাতেই নিবেদিত হয়। মন্দিরে মন্দিরে সকল বিগ্রহের মধ্যে মাতৃভক্ত সন্তান মায়ের অপরূপ রূপ দেখিতে পান। তিনিই দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, তিনিই কমলদলবিহারিণী কমলা, তিনিই বিদ্যাদায়িনী বাণী। সন্তানের জীবনের সাধনা মাতৃপূজা আর এই মাতৃপূজার মন্ত্র ''বন্দে মাতরম্''।

এই সঙ্গীত সম্বন্ধে বঙ্কিম ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, একদিন আসিবে --সেদিন হয়ত তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন না--যেদিন 'এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।'[১] মহাপুরুষের বাণী ব্যর্থ হয় নাই। অগ্নিযুগের বিপ্লবী বাংলা এই সঙ্গীত হইতে নূতন উদ্দীপনা লাভ করিয়াছে। সেদিন এই সঙ্গীত একদিকে যেমন অত্যাচারী রাজশক্তিকে সন্ত্রস্ত করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই বাংলার বিপ্লবী সন্তানকে মৃত্যুর সম্মুখে মরণজয়ী করিয়াছে। এবং আজিকার স্বাধীন ভারতে 'বন্দে মাতরম্' আমাদের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত।

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানসম্প্রদায় বিপ্লববাদী। ক্ষীণশক্তি মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর তাঁহারা নূতন করিয়া হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছেন এবং এই স্বপ্নকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। অথচ সত্যানন্দ নিজেকে ও তাঁহার অনুচরবর্গকে বৈষ্ণব

১ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা' ও ললিতচন্দ্র মিত্রের 'বন্দেমাতরম্' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ৫৩ পৃঃ ও ২৮৭ পৃঃ।

বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসৃত অভিনব বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মহেন্দ্র সিংহের প্রশ্নের উত্তরে সত্যানন্দ বলিতেছেন, "প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা। ....তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। ....চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়--কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়--সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।"[১] (২।৪)। সত্যানন্দ ঠাকুরের এই উক্তি তাঁহার আদর্শের অসম্পূর্ণতার পরিচয় দেয়। তিনি শক্তির সাধনা করিয়াছেন, কিন্তু শক্তি ও প্রেমের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন নাই। এমন কি, তিনি যে এ সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করিয়াছেন উপন্যাসে সেরূপ আভাস নাই।

সন্তানসম্প্রদায়ের ত্যাগ অনন্যসাধারণ, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ও অপরিসর। তাঁহাদের দেশপ্রীতির মধ্য দিয়া বঙ্কিমের দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্কিমের মতবাদ ও আদর্শ এই বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের মতবাদ ও আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানবমনের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় দেশপ্রীতিকে বঙ্কিম ধর্ম্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইয়াছেন। তিনি বিপ্লবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নাই,[২] কিন্তু বিপ্লববাদীদিগের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক, তাঁহারা অনেক সময় ইহাকে এতখানি প্রাধান্য দিয়া থাকেন যে,উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়ের সৎ অসৎ বিচার করেন না। ইহার ফলে অনেক সময় তাঁহারা 'আত্মঘাতী' হইয়া থাকেন। মহাপুরুষ চিকিৎসক সন্তানসম্প্রদায়ের এই দুষ্ট-ক্ষতের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সত্যানন্দকে বলিতেছেন, "তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না, অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না।"[৩] (৪।৮)।

---

১ প্রকৃত বৈষ্ণবের লক্ষণ কি ?—এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (বিবিধ প্রবন্ধ, ১৭০-২০০ পৃঃ)। বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বাবাজী বলিতেছেন : 'সমত্ব, অর্থাৎ সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা। ....এই যে সমদর্শিতা, ইহাই সেই অহিংসা-ধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য। সমদর্শী হইলে আর হিংসা থাকে না। এই সমদর্শিতা থাকিলেই মনুষ্য, বিষ্ণু নাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষ্ণব হইল।' বিবিধ প্রবন্ধ, ১৯৯-২০০ পৃঃ। গৌরদাস বাবাজী এস্থলে বঙ্কিমের মতবাদের বাহক।

২ ধর্ম্মতত্ত্ব, ১০, ৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩ অনুরূপ কারণে 'দেবী চৌধুরাণী'তে ভবানী পাঠকের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছে।

বিপ্লবীরা স্বাধীনতাকে স্বাধীনতার জন্যই কাম্য বিবেচনা করেন। কিন্তু স্বাধীনতা যত বড় সম্পদ হউক, বঙ্কিমের দৃষ্টিতে ইহা মুখ্য বলিয়া গণ্য হয় নাই। স্বাধীনতা স্বাধীনতার জন্যই কাম্য নহে, ইহা ধর্ম্মের অনুকূল বলিয়া কাম্য। প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীনতা বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, বঙ্কিম স্বাধীনতার তাহা হইতে স্বতন্ত্র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানী। লিবার্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র।'[১] স্বাধীনতার এই ব্যাখ্যা কতখানি গ্রহণযোগ্য সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং 'স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু' হইলেও 'বিদেশীয় রাজা' যে স্বাধীনতার মিত্র নহেন সাম্রাজ্যবাদীর ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এস্থলে বঙ্কিম যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহাই আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। সন্তান-সম্প্রদায়ের আদর্শ দেশপ্রীতি; বঙ্কিম দেশপ্রীতিকে অতি উচ্চ স্থান দিলেও তাঁহার আদর্শ মনুষ্যত্ব বা মানব-ধর্ম্ম, ভক্তিতে যাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি।[২] সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ব্যর্থতা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম 'আনন্দমঠে' অনুশীলনতত্ত্বের সারকথা এই ভক্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন। এবং উপন্যাসের স্বল্পায়তন 'উপক্রমণিকা'র পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদিগকে সত্যানন্দের সাধনার বিচার করিতে হইবে, স্থানান্তরে ইহার

১ ধর্ম্মতত্ত্ব, ৮, ৪৫-৪৬ পৃঃ।

২ এই প্রসঙ্গে দেশপ্রীতি এবং জাগতিক প্রীতি সম্বন্ধে বঙ্কিমের বাণী বর্ত্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, দেশপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি উভয়ই মহৎ বৃত্তি; কিন্তু এই উভয় বৃত্তির সামঞ্জস্য চাই। প্রথমোক্ত বৃত্তির অনুচিত অনুশীলনের ফলে 'ইউরোপীয় patriotism' এর জন্ম, যাহার প্রভাব মানবজাতিকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নিতেছে। পক্ষান্তরে, বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতবর্ষীয়েরা 'দেশপ্রীতি সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।' ইহাই ভারতবর্ষের অবনতির মূলে। 'জাগতিক প্রীতি এবং সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য তখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না।....আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্টসাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন করিব। ....পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।' ধর্ম্মতত্ত্ব, ২৪, ১৩৪-১৩৫ পৃঃ।

উল্লেখ করিয়াছি। এই 'উপক্রমণিকা' একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ইহা একদিকে যেমন আখ্যায়িকার উপযোগী গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অতীন্দ্রিয় আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই প্রারম্ভেই উপন্যাসের মূল তত্ত্বের (ভক্তি, অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণের প্রয়োজনীয়তার) আভাস দিয়াছে। আখ্যায়িকার সূত্র অনুসরণ করিতে করিতে পাঠক যখন এই মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তখন মহাপুরুষ চিকিৎসকের কৃপায় জীবানন্দ পুনর্জীবন লাভ করিলে শান্তির নির্দ্দেশমত তাঁহার অপূর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তের সঙ্কল্পের ভিতর দিয়া (৪।৭) এই সত্যের প্রতি পুনরায় তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, এবং ইহার অব্যবহিত পরেই সত্যানন্দের নিকট যখন প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জনের আহ্বান আসিল, তখন 'উপক্রমণিকা'র সহিত আখ্যায়িকার যোগসূত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিলেন।

বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা বঙ্কিমের জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক, ভারতে ইংরেজশাসন ঐতিহাসিক সত্য, সুতরাং 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমকেও এই সত্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই কারণেই তাঁহাকে জয়ের মুহূর্ত্তে সন্তানসম্প্রদায়ের কর্ম্মমুখর জীবনের উপর যবনিকা টানিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা যত বড় ট্র্যাজেডি হউক,[১] ঋষি বঙ্কিম ভারতে ইংরেজ-শাসনের পশ্চাতে বিধাতার মঙ্গল বিধান লক্ষ্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সত্যানন্দের প্রতি মহাপুরুষ চিকিৎসকের সান্ত্বনাবাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন, "প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতনধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেকদিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; ....ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্বে

১ 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীসম্প্রদায় বঙ্গজননীর লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম স্বীয় অপরিসীম প্রবৃত্তি সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে বিজয়-গৌরব দিতে পারেন নাই! 'আনন্দমঠের ট্র্যাজেডি ইহাই।' আনন্দমঠ (শতবার্ষিক সংস্করণ)—ভূমিকা (সম্পাদকীয়), ।০-পৃঃ।

বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।'' (৪।৮)। চরিত্রবিশেষকে যত প্রাধান্য দেওয়া হউক না কেন, তাঁহাব মতবাদের মধ্যে চরিত্রস্রষ্টার মতবাদ খুঁজিতে হইলে—বিশেষ করিয়া যেখানে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক জড়িত রহিয়াছে সেরূপ ক্ষেত্রে—বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে চরিত্রস্রষ্টা যদি কোন প্রবন্ধাদিতে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিযা থাকেন তাহা হইলে তাহাব সহিত এই মতবাদের সামঞ্জস্য রহিয়াছে কিনা তাহার বিচার প্রয়োজন। ইহা একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতি। সৌভাগ্যবশতঃ 'ধর্ম্মতত্ত্বে' বঙ্কিম এ সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে ইহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্ব্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্ব্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই—Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্‌ঞা করিবে। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১০, ৮২ পৃঃ।

ইহার পরিপ্রেক্ষিতে 'আনন্দমঠে' মহাপুরুষের উল্লিখিত উক্তি বঙ্কিমের মতবাদের প্রতিধ্বনি, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। ইংরেজ শাসনের কুফল সম্বন্ধে বঙ্কিম কাহারও অপেক্ষা কম সচেতন ছিলেন না এবং কর্ম্মজীবনে তিনি কখনও উদ্ধত রাজপুরুষের নিকট নতি স্বীকার করেন নাই। কিন্তু বঙ্কিমের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের শুভ স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন: 'সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য।'[১] মহাপুরুষ চিকিৎসকের তথা বঙ্কিমের দৃষ্টিতে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় নাই। এই বিদ্রোহের ফলে এবং ইহারই প্রতিক্রিয়ায় অরাজকতার অবসান হইয়াছে এবং ইংরেজরাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতীয় চিন্তাধারার

১ ধর্ম্মতত্ত্ব, ৬, ২৭ পৃঃ।

সহিত পাশ্চাত্ত্য বহির্বিজ্ঞানচর্চ্চার সমন্বয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। এইখানেই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের সার্থকতা। আশাবাদী বঙ্কিম ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, 'যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।'[১]

'আনন্দমঠে'র বৈশিষ্ট্য ইহার ভাবগাম্ভীর্য্য। কিন্তু শিল্পী বঙ্কিম তাঁহার গুরুগম্ভীর কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে যে সকল লঘু (এবং স্থানে স্থানে হাস্যো-দ্দীপক) কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন তাহা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। ভবানন্দের উদাত্ত কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অপূর্ব্ব ভাবাবেশে চক্ষু যখন অশ্রুসিক্ত হয় (১।১০), মহেন্দ্রের সহিত ''আনন্দমঠে''র বিভিন্ন মাতৃমূর্ত্তিদর্শনে এবং সত্যানন্দের অনুপ্রাণিত কণ্ঠে তাঁহাদের স্বরূপ বর্ণনায় সমগ্র দেহে যখন অপূর্ব্ব বিদ্যুৎ শিহরণ অনুভূত হয় (১।১১), আপাত-দৃষ্টিতে মৃত কল্যাণীর পার্শ্বে বসিয়া সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রের মিলিতকণ্ঠের 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' সঙ্গীতে মন যখন স্বতঃই অনন্তের পানে ছুটিতে চায় (১।১২), তখন একে একে এই সকল বিচিত্র প্রায়-অপার্থিব অনুভূতির পর জীবানন্দ ও নিমাইয়ের সহজ সংলাপ এবং জীবানন্দের ভোজনপর্ব্ব (১।১৫), দুঃখের মধ্যেও নিমাই ও শান্তির রহস্যালাপ (ঐ) পুনরায় আমাদের নিকট রূপ-রস-গন্ধময়ী ধরিত্রীর বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। এইরূপ, জীবানন্দ বিদায় লইলে শান্তির অপূর্ব্ব বেশধারণ (২।২) এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রতিবেশে মহেন্দ্র সিংহ ও শান্তির দীক্ষা গ্রহণের (২।৫) পর জীবানন্দ এবং নবীনানন্দরূপী শান্তির অভিনব বাক্‌যুদ্ধ (২।৮) এবং পরবর্ত্তীকালে কাপ্তেন টমাস-শান্তি কাহিনী (৩।২) এবং এড্‌ওয়ার্ডস্-লিণ্ডলে-শান্তি কাহিনী (৪।৫) শুধু যে বৈপরীত্যগুণে উপভোগ্য তাহা নহে, প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত কাহিনী, অর্থাৎ জীবানন্দ ও শান্তির বাক্‌যুদ্ধ ও এড্‌ওয়ার্ডস্-লিণ্ডসে-শান্তি কাহিনী বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে হৃদয়াবেগ শমিত করে। আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশের দিক দিয়াও শেষোক্ত কাহিনীর যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। ইংরেজ-শিবিরে বৈষ্ণবীবেশে শান্তির চাতুর্য্য অতর্কিতে পদচিহ্ন আক্রমণের কূট ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া ইংরেজদিগকে মেলা আক্রমণে বাধ্য করিল এবং শেষ যুদ্ধে সন্তানসেনার জয়লাভের ইহাই অন্যতম প্রধান কারণ। চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া শান্তিকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল কৌতুককাহিনীর সার্থকতা এই যে বিরুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যেও শান্তির ক্রীড়াচঞ্চল মূর্ত্তি স্বাভাবিক

---

১ ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৩, ৮৭ পৃঃ।

অবস্থায় জীবানন্দ ও শান্তির জীবন কিরূপ হইতে পারিত কতকটা তাহার আভাস দেয়।

'আনন্দমঠে'র হাস্যোদ্দীপক চিত্রগুলি শুধুই অবিমিশ্র হাসির যোগান দেয় না ; হাসিতে হাসিতে সহসা পাঠকের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া ওঠে। জীবানন্দ ও নবীনানন্দরূপী শান্তির বাক্‌যুদ্ধ ইহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল। ইহা হাস্যোদ্দীপক, কিন্তু জীবানন্দ ও শান্তির উৎসর্গীকৃত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষতঃ জীবানন্দের ব্রতভঙ্গের পরিণামের চিন্তা করিলে এই কৌতুকচিত্র করুণ ট্র্যাজেডিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এইরূপ, কাপ্তেন টমাসের প্রতি রহস্যপ্রিয় শান্তির বিদ্রূপবাণীতে পাঠকের মনে যখন তরল হাসির জোয়ার আসিয়াছে, ঠিক তখনই কাপ্তেন সাহেবের জঘন্য প্রস্তাবের উত্তরে "যদি তুমি জেত, তবে আমি তোমার উপপত্নী হইয়া থাকিব স্বীকার করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি" —শান্তির এই উক্তির সর্ত্তমূলক শেষের কথা কয়েকটিতে (বেচারা কাপ্তেন ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে নাই) অনাগত ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া ওঠে। কিন্তু এই আতঙ্কের শিহরণও ক্ষণিকের, পরক্ষণেই মুখরা শান্তির পাল্টা প্রস্তাব ও সাহেবের প্রত্যুত্তরে অবরুদ্ধ হাসির প্রস্রবণ মুক্তিলাভ করে।

কিন্তু 'আনন্দমঠে'র গল্পাংশে ঠাসা বাঁধুনি নাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিল, তাহার এক বিরাট ঢেউ পদচিহ্নগ্রামে মহেন্দ্র সিংহ ও কল্যাণীর সুখের নীড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক আবর্ত্তের মধ্যে টানিয়া আনিল এবং কল্যাণীকে কেন্দ্র করিয়া যেমন ভবানন্দের, বালিকা সুকুমারীর সূত্র ধরিয়া তেমনই জীবানন্দের জীবনে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইল। কিন্তু ইঁহাদের কাহিনীদ্বয় আগাগোড়াই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়া গিয়াছে ; উভয় কাহিনীই "আনন্দমঠে"র সহিত সংশ্লিষ্ট এবং উভয় কাহিনীই এই প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করিয়াছে ইহাই ইহাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে উপন্যাসের কাহিনীগুলি যেমন "আনন্দমঠ"কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, "আনন্দমঠ" তেমনই সন্তানসম্প্রদায়ের প্রেরণার উৎস। এইখানেই উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা।

'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ' ও 'রজনী'র ন্যায় আলোচ্য উপন্যাসেও স্বপ্নের ভিতর দিয়া অতিপ্রাকৃতের আভাস পাওয়া যায়। কল্যাণীর মুখে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া 'বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত' হইলেও মহেন্দ্র কল্যাণীকে (হয়ত নিজেকেও) বুঝাইতে চাহিয়াছেন, 'স্বপ্ন কেবল বিভীষিকামাত্র, আপনার মনে

জন্মিয়া আপনি লয় পায়, জীবনের জলবিম্ব....'। (১।১২)। স্বপ্নের এই প্রাকৃত ব্যাখ্যা সাধারণভাবে অনেক স্বপ্ন সম্বন্ধেই প্রযোজ্য এবং স্বাচ্ছন্দ জীবনে অভ্যস্ত গৃহস্থের কুলবধূ কল্যাণীকে প্রতিকূল অবস্থায় যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহাতে তাঁহার পক্ষে স্বপ্নে বিভীষিকা দর্শন আদৌ অসম্ভব নহে, অথবা তৎকালীন মানসিক অবস্থায় নিজেকে স্বামীর বোঝা মনে করিয়া মৃত্যু কামনা করাও তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু মহেন্দ্র সিংহের নাটকীয় অভিজ্ঞতার সহিত কল্যাণীর স্বপ্নের এমন এক নিগূঢ় যোগাযোগ রহিয়াছে যে, এই স্বপ্নকে নিছক বিভীষিকা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না, অথবা ইহা আত্মমুখ এরূপ ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কল্যাণী না চিনিলেও মহেন্দ্র সিংহ "আনন্দমঠে" যে 'শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়' বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, স্বপ্নে দৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সেই পরমপুরুষ, এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বস্থিতা রূপময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, সৌরভময়ী স্ত্রীমূর্ত্তিদ্বয় "আনন্দমঠে"র বিষ্ণুমূর্ত্তির পার্শ্ববর্ত্তিনী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। "আনন্দমঠে" প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সহিত কল্যাণীর স্বপ্নের মূর্ত্তির পার্থক্য এই যে, "আনন্দমঠে"র 'মোহিনী' মাতৃমূর্ত্তি বিষ্ণুর অঙ্কোপবিষ্টা, 'গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ' তাঁহার পূজা করিতেছেন; পক্ষান্তরে, কল্যাণীর স্বপ্নের মাতৃমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ী হইলেও মেঘাবৃতা, রূপবতী হইলেও শীর্ণা ও রোরুদ্যমানা; বিষ্ণুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার নিকট মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। প্রশ্ন এই: বাস্তব প্রতিমামূর্ত্তি এবং স্বপ্নের ছায়াছবির মোটামুটি এই যে সাদৃশ্য, বিশেষ করিয়া সাদৃশ্যের মধ্যেও এই যে বৈসাদৃশ্য—ইহা কি তাৎপর্য্যপূর্ণ নহে? মায়ের কাজে মহেন্দ্রসিংহের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাঁহার প্রাণে মাতৃসেবার আকাঙক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহার নবসাধনার যাত্রাপথে কল্যাণীই অন্তরায়—এ সকল তথ্য কল্যাণীর অজ্ঞাত, অথচ তাঁহার স্বপ্নে এই সকল জিনিষই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে; দেশমাতৃকা (কল্যাণী ইঁহাকে চিনিতে পারেন নাই) তাঁহারই প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন, "এই সে—ইহারই জন্য মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।" কোন প্রাকৃতিক নিয়মে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। কিন্তু মানব মনে যখন সকল আকাঙক্ষা ছাপাইয়া কোন বৈপ্লবিক ভাবধারার আলোড়ন জাগে, কোন্ সে অজ্ঞাত নিয়ম অনুসারে জানি না, কখন কখন তাহা নিকটতম প্রিয়জনের প্রাণে অননুভূতপূর্ব্ব স্পন্দন তোলে। কল্যাণীর স্বপ্নের ইহাই একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা।

কিন্তু অতিপ্রাকৃতকে ব্যবহার করিলেও বঙ্কিম এস্থলে 'রজনী'র ন্যায়

অতিপ্রাকৃতকে কোনরূপ অনুচিত প্রাধান্য দেন নাই। স্বামীর নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে যাইয়া কল্যাণী দেবতার নির্দ্দেশানুযায়ী আত্মহত্যার বাসনা ব্যক্ত করিলেও ইহা ক্ষণিকের সঙ্কল্প; পরমুহূর্ত্তেই স্বামী ও কন্যার আকর্ষণের টানে তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র যখন প্রশ্ন করিলেন, "সে কি? বিষ খাইবে?" কল্যাণী উত্তর করিলেন, "খাইব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া—বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।" অর্থাৎ, স্বপ্নাদেশ যাহাই হউক, সহজ অবস্থায় কল্যাণী কখনও আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার আত্মহত্যার প্রয়াস ঘটনা-পরম্পরার স্বাভাবিক পরিণতি। স্বপ্নের সহিত ইহার সম্পর্ক এই যে, মায়ের স্নেহদুর্ব্বল আতঙ্কগ্রস্ত দৃষ্টিতে কন্যার মৃত্যু যখন আসন্ন বলিয়া মনে হইল, স্বপ্নদর্শনের ফলে তখন সেই মৃত্যুকে দেববাক্য অবহেলার দণ্ডস্বরূপ মনে হওয়ায় সে অবস্থায় কল্যাণীর পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, তাঁহার সেই আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষাই অধিকতর বেগবতী হইল। এই হিসাবে কল্যাণীর স্বপ্ন কুন্দের স্বপ্নের সহিত তুলনীয়।

কল্যাণীর স্বপ্ন একটি বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে আখ্যায়িকার উপযোগী অতীন্দ্রিয় আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই: মহেন্দ্রের চরিত্রে এমন কি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহার জন্য দেশমাতৃকা বিশেষ করিয়া তাঁহাকে কোলে পাইবার জন্য এমন কাতর হইলেন? মহেন্দ্র চরিত্রবান ও ধর্ম্মভীরু এবং অসহায় অবস্থায় ভবানন্দ কর্ত্তৃক উপকৃত হইলেও সন্তানসেনার দস্যুজনোচিত কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতি ভর্ৎসনা (১৯, ২১ পৃ:) মহেন্দ্রের তেজস্বী মনের পরিচয় দেয়। ইহাও সত্য যে মুখ্যতঃ দেশপ্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন[১] এবং ব্রত গ্রহণান্তর অনন্যমনে মাতৃসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ অসাধারণত্ব নাই। সন্তান মহেন্দ্র সম্বন্ধে ভবানন্দ বলিতেছেন, "তাঁহারই নির্ম্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে।...সন্তানমধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগকে মহৎ উপকার করিতেছেন। তিনি আমাদিগের দক্ষিণ বাহু।" (৩।৪)। মহেন্দ্রের উদ্যোগে ও আনুকূল্যে পদচিহ্ন সন্তানসেনার কেল্লায় পরিণত হইয়াছে,

১ মহেন্দ্র যখন দীক্ষাগ্রহণ করেন তখন একদিকে তাঁহার চক্ষে স্ত্রী মৃত, কন্যা নিরুদ্দেশ, সুতরাং সংসারে তিনি আকর্ষণশূণ্য, অন্যদিকে আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক কার্য্যাবলীর জন্য সত্যানন্দ ঠাকুর তাঁহার চক্ষে সিদ্ধপুরুষ, সুতরাং তাঁহার আকর্ষণ দুর্নিবার। কিন্তু ঘটনার এরূপ যোগাযোগের পূর্ব্বেই মহেন্দ্র সত্যানন্দের নিকট ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। (আনন্দমঠ ১।১১, ৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

তাঁহার তত্ত্বাবধানে সেখানে আগ্নেয়াস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইতেছে—এ হিসাবে তিনি এই বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের 'দক্ষিণ বাহু' এবং তাঁহার নির্বাচন সত্যানন্দের দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। কিন্তু সন্তানমধ্যে তাঁহার আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা কঠিন; বরং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের দিক দিয়া জীবানন্দ ও ভবানন্দের সম্মুখে তিনি যেন কতকটা ম্লান হইয়া পড়িয়াছেন।[১] একথা সত্য যে, তিন জন শ্রেষ্ঠ সন্তানের মধ্যে একা মহেন্দ্রই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু জীবানন্দের আক্ষরিক ব্রতভঙ্গ হইলেও, তাহারই ভিতর দিয়া তিনি যে আত্ম-সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ব্রতচ্যুত হইয়াও তিনি প্রকৃত ব্রতরক্ষা করিয়াছেন। জীবানন্দের মত সন্তান লাভ করিয়াও প্রধানতঃ 'কামান, বন্দুক, গুলি, বারুদের' প্রত্যাশায় দেশমাতৃকার পক্ষে কাতর হইয়া বিষ্ণুর নিকট কল্যাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ শোভন বলিয়া মনে হয় না। এবং 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত শ্রবণ এবং ''আনন্দমঠে''র বিভিন্ন মাতৃমূর্ত্তি দর্শনের পর এই চিত্র যেন কতকটা বেমানানসই।

দেশপ্রাণতার দিক দিয়া বিশিষ্ট সন্তানগণ একই ছাঁচে ঢালা। কিন্তু একদিকে স্বেচ্ছাবৃত শুষ্ক ও কঠোর কর্ত্তব্যের আহ্বান, অন্যদিকে নারীর প্রতি পুরুষচিত্তের আদিম আকর্ষণ—এই দুই বিরুদ্ধ-শক্তির সংগ্রাম ভবানন্দ ও জীবানন্দের জীবনে বৈচিত্র্য আনিয়াছে। এই দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে মূলতঃ একই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু ঘটনার যে সমাবেশ জীবানন্দের ক্ষেত্রে নিমাইয়ের গৃহে শান্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাতের হেতু হইল, ভবানন্দের দুর্ভাগ্য, তাহাই তাঁহাকে কল্যাণীর সম্মুখে টানিয়া নিয়া রূপমুগ্ধ করিল। শান্তির সহিত সাক্ষাৎ জীবানন্দের চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায় হইল এবং আক্ষরিক ব্রতভঙ্গ হইলেও চরিত্রের দৃঢ়তাগুণে এবং প্রধানতঃ শান্তির সহায়তায় জীবানন্দ প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষায় জয়ী হইলেন। পক্ষান্তরে, ভবানন্দের সহজাত চরিত্রবল যাহাই হউক, প্রত্যক্ষে কল্যাণীর রূপের আকর্ষণ এবং পরোক্ষে শান্তির ন্যায় শক্তিস্বরূপিণী সহধর্ম্মিণীর অভাব—এই উভয় কারণে তাঁহার মন কলুষিত হইল। মৃতকল্প কল্যাণীর প্রাণরক্ষা করিতে যাইয়া ভবানন্দের ব্রতচ্যুতি গোবিন্দলালের অধঃপতনের চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ভবানন্দ যেখানে প্রবৃত্তির মুখে কৃত্রিম বাঁধ দিয়াছেন, গোবিন্দলালের জীবনে সেখানে সহজ প্রেমের প্রবাহ অব্যাহত রহিয়াছে। এই কারণেই রোহিণীর

১ অবশ্য জীবানন্দ ও ভবানন্দের পক্ষে মরিবার যে তাগিদ ছিল, মহেন্দ্রের পক্ষে সেরূপ তাগিদ ছিল না।

নিকট গোবিন্দলালের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে আরও অনেক ঘটনার যোগাযোগের প্রয়োজন হইয়াছে, ভবানন্দের ক্ষেত্রে যাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

কল্যাণীর প্রাণরক্ষার পর ভবানন্দকে আমরা তাঁহার নিকট দেখিতে পাই দীর্ঘ 'চারি বৎসর' পরে। (৩।৪, ৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তখন ভবানন্দের 'চিত্ত অবশ'; তিনি কল্যাণীর নিকট প্রণয় নিবেদন করিতেছেন। কিন্তু কল্যাণীর আচরণে মনে হয় পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাঁহার কলুষিত মনের আভাস পাইয়াছেন। ভবানন্দ তাঁহার শারীরিক মঙ্গলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে (এই প্রশ্নের ভিতর অন্যায় বা আপত্তিজনক কিছুই নাই), কল্যাণী কতকটা বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন, "এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না? আমার শারীরিক মঙ্গলে আপনারই কি ইষ্ট, আর আমারই বা কি ইষ্ট?" প্রাণদাতার প্রতি এই অসৌজন্য সহজ অবস্থায় কল্যাণীর স্বভাবসঙ্গত নহে। ইহার পরে বিরক্তি ও উষ্মা একেবারেই সুস্পষ্ট। ভবানন্দ যখন বিদ্যার্জ্জনে তাঁহার সাম্প্রতিক অশ্রদ্ধার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কল্যাণী তখন স্পষ্টই বলিতেছেন, "আপনার মত পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ, তখন লেখাপড়া না করাই ভাল।" কিছু পূর্ব্বেই ভবানন্দের কথায় (সত্য কল্যাণি, আমার জীবন বিষময়। যে দিন অবধি—তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে?) যে দুর্ব্বলতার আভাস রহিয়াছে, কল্যাণীর স্পষ্টোক্তির তাহাই প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু তাঁহার প্রথমোদ্ধৃত উক্তির সহিত একযোগে পাঠ করিলে মনে হয় ইহা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে, পরন্তু তিলে তিলে সঞ্চিত তাঁহার পুঞ্জীভূত বিরক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি।

বস্তুতঃ কল্যাণীর পুনর্জ্জীবন লাভের পরদিবসেই ভবানন্দের আচরণে তাঁহার চিত্তবৈকল্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। সত্যানন্দ ঠাকুরের কথায় তিনি যখন বুঝিলেন, যে রমণীকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তিনিই মহেন্দ্রের স্ত্রী তখন 'ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন।....কিন্তু এক্ষণে কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।' (২।৩, ৬৩ পৃঃ)। পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিল, ভবানন্দ কেন চমকিয়া উঠিলেন? কেনই বা গুরুর নিকট তাঁহার এই গোপনপ্রবণতা?

তাঁহার এই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতেও অধিক বিলম্ব হইল না। দীক্ষান্তে নবীনানন্দরূপে শান্তি যখন শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের ঘরগুলি দেখিতে যাইয়া ভবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল (২।৮, ৭৪ পৃঃ), ভবানন্দের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিতেছেন: 'ভবানন্দ তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতে-ছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর....।' কিন্তু 'কাহার মুখ তাহা জানি না',—এই বলিয়া আরম্ভ করিলেও এবং তাঁহার বর্ণনা-

গুণে এ সম্বন্ধে পাঠকের মনে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ না থাকিলেও, বঙ্কিম শেষ পর্য্যন্ত স্পষ্টই বলিতেছেন (আর্টের দিক দিয়া ইহা শুধু অপ্রয়োজনীয় নহে, অবাঞ্ছনীয়), 'কল্যাণীর রূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল, শান্তির রূপের উপর সে দৃষ্টিপাত করিল না।' ইহার পর কল্যাণীর নিকট ভবানন্দের প্রণয়জ্ঞাপন পাঠকের নিকট আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নহে। কিন্তু ভবানন্দের ন্যায় ত্যাগী পুরুষ কি বিনা সংগ্রামে প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ? ইহা কোনরূপেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। "আনন্দমঠে"র সন্তানসম্প্রদায় মানবমনের সহজাত আদিম বৃত্তিকে ঘিরিয়া শপথের যে কৃত্রিম বেষ্টনী দিয়াছেন, ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় সে বেষ্টনী যে মুহূর্ত্তে উড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে ভবানন্দ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। হয়ত এই কারণেই তাঁহার মনে বাসনার বীজ উপ্ত হওয়া এবং তাঁহার প্রণয়জ্ঞাপনের মধ্যে দীর্ঘ চারি বৎসরের ব্যবধান রাখিয়া বঙ্কিম যেমন তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস দিয়াছেন তেমনই এই অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র অন্তরালে রাখিয়া তিনি পরাজয়ের অনিবার্য্যতার উপর জোর দিয়াছেন।

ভবানন্দের মন কলুষিত হইলেও তাঁহার সহজাত মহত্ত্ব কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। অতি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেও কল্যাণীর তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন, তিনি তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করুন বা না করুন, উভয় অবস্থাতেই মৃত্যুই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত, কারণ তাঁহার 'চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।' সত্যানন্দ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধীরানন্দ যখন তাঁহার মাতৃভক্তি পরীক্ষা করিতে আসিলেন (৩।৫), তখনও প্রথমে লোকাপবাদ ভয়ে[১] তাঁহাকে অসিযুদ্ধে আহ্বান করিলেও, বিশ্বাসহন্তা হইবার প্রস্তাবের উত্তরে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলিতেছেন, "ধীরানন্দ, যুদ্ধ কর, তোমায় বধ করিব। আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাসহন্তা নই। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে পরামর্শ দিয়াছ। নিজেও বিশ্বাসঘাতক, তোমাকে মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় না। তোমাকে মারিব।" অর্থাৎ এখন আর ব্যক্তিগত স্বার্থে নহে, ধীরানন্দকে সন্তানের শত্রু মনে করিয়া সন্তানসম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে ভবানন্দ তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিতেছেন। চরম অধঃপতনের মধ্যেও তাঁহার গুরুভক্তি এবং সন্তানধর্ম্মের প্রতি তাঁহার

---

১ লোকাপবাদ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা জীবানন্দের চরিত্রেও লক্ষিত হয়। সত্যানন্দের মুখে সম্ভাব্য প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে তাঁহার আদেশবাণী শুনিয়া ভবানন্দ যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ কি ?" জীবানন্দ তখন তাঁহার প্রশ্নের সরল উত্তর না দিয়া বলিলেন, "বোধ হয় গুরুদেব তাই মনে করেন।" (আনন্দমঠ ২।৩, ৬৪ পৃঃ)। এইরূপ সত্যগোপন মিথ্যার নামান্তর মাত্র।

নিষ্ঠা ও আনুগত্য অমলিন রহিয়াছে। এই কারণেই 'ঘোর তমোময়ী' রজনীতে গভীর অরণ্যমধ্যে ভবানন্দ যখন আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমায় ধর্ম্মে মতি দাও, আমায় পাপ হইতে নিরত কর। ধর্ম্মে,—হে গুরুদেব! ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে!"—সত্যানন্দ তখন অন্তরাল হইতে এই 'ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী'কে অকুণ্ঠিত চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ধর্ম্মে তোমার মতি থাকিবে—আশীর্ব্বাদ করিলাম।" (৩।৬, ৯৪ পৃঃ)। ভবানন্দের প্রায়শ্চিত্তও তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ। রণজয়ী বীর শত্রুশূন্য রণক্ষেত্রে 'মুখে "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।' (৩।১১)। হৃদয়শোণিতে তাঁহার সকল গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া গেল।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভবানন্দের মৃত্যুর পর সত্যানন্দ তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে মহাত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (৩।১২, ১০৭ পৃঃ) এবং ভবানন্দ নিঃসন্দেহ এই সম্মানের যোগ্য। কিন্তু এই মৃত মহাত্মা সম্বন্ধে এক জায়গায় এমন হাল্কাভাবে বিদ্রূপের সহিত উল্লেখ রহিয়াছে যে তাহা সত্যই বেদনাদায়ক। সুকুমারীকে বিদায় দিতে যাইয়া নিমাইয়ের করুণ চিত্রের অব্যবহিত পরেই মনের সমতা ফিরিয়া পাইয়া পাঠক যাহাতে স্ত্রী ও কন্যার সহিত মহেন্দ্রের মিলনের আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারেন হয়ত এই উদ্দেশ্যেই বঙ্কিম এই মিলনের ক্ষণে নবীনানন্দরূপী শান্তিকে কেন্দ্র করিয়া একটুকু লঘু হাস্য আমদানি করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহ উপভোগ্য। কিন্তু কল্যাণী ও নবীনানন্দরূপী শান্তির আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ আচরণে 'অতিশয় রুষ্ট' হইয়া, বিশেষতঃ প্রগল্ভা শান্তির প্রশ্নে কোণঠেসা হইয়া মহেন্দ্র যখন বলিলেন, "ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?" (৪।৩, ১১৬ পৃঃ), তখন সে অবস্থায় এরূপ উক্তি তাঁহার মুখে স্বাভাবিক হইলেও, ভবানন্দের প্রায়শ্চিত্ত পাঠকের মনে এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছে যে, পুনরায় তাঁহার দুর্ব্বলতার উল্লেখ তাঁহার স্মৃতির অবমাননা, সুতরাং অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে হয়।

ভবানন্দের চরিত্র কোথাও দুর্ব্বোধ্য নহে; দুর্ব্বলতায় ও মহত্ত্বে এই চরিত্রটি পুরাপুরি মানবীয় গুণসম্পন্ন। কিন্তু কতকটা ইহার বিপরীত চিত্র হিসাবে জীবানন্দ ও শান্তির চরিত্রাঙ্কন কি স্বাভাবিক? এ সম্বন্ধে ডক্টর সেনগুপ্ত প্রশ্ন করিয়াছেন: 'শান্তিকে দেখিয়া জীবানন্দ মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহার পর শান্তি আসিয়া আনন্দমঠের সদস্য হইল, জীবানন্দের গৃহে পৃথক্ শয্যা রচনা করিয়া বসবাস করিতে লাগিল। এই সুদীর্ঘ পৃথক্ সহবাসে ইহাদের আর কখনও আত্মবিস্মৃতি আসিয়াছিল এমন কোন প্রমাণ

নাই। ইহা কি সম্ভব ও স্বাভাবিক?'[১] প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং ইহার বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

সন্তান জীবানন্দের সহিত শান্তির প্রথম সাক্ষাৎ হয় নিমাইয়ের মধ্যবর্তিতায় এবং এইখানেই এই চরিত্রটির পরিকল্পনার প্রধান সার্থকতা। কিন্তু ইঁহাদের উভয়েরই অবচেতন মনে যদি সাক্ষাতের আকাঙক্ষা না থাকিত তাহা হইলে শুধু নিমাইয়ের আবদার জীবানন্দের ব্রতচ্যুতি ঘটাইতে পারিত না। এ ক্ষেত্রে নিমাই উপলক্ষ্য মাত্র; আসল দুর্ব্বলতা জীবানন্দ ও শান্তির মনে। এইখানে প্রথমেই শান্তির সম্বন্ধে দু'একটি প্রশ্ন ওঠে: নিমাই যখন জানাইল যে জীবানন্দ তাহাকে ডাকিয়াছেন তখন শান্তির আচরণে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় নাই। ইহা কি স্বাভাবিক? জীবানন্দ ও শান্তির জীবনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রশ্নটি আরও ঘোরালো আকার ধারণ করিয়াছে। সন্তানধর্ম্মের কঠোর অনুশাসন অনুসারে সন্তানের পক্ষে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ এবং ব্রতচ্যুতি ঘটিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু, শান্তির পক্ষে ইহা না জানার কথা নহে। কিন্তু জীবানন্দের আহ্বানে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে এ কথা কি শান্তির মনে আসে নাই? যদি না আসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা কি স্বাভাবিক? স্বামীসন্দর্শনের আগ্রহাতিশয্যে শান্তি ব্রতভঙ্গজনিত প্রায়শ্চিত্তের কথা সাময়িক বিস্মৃত হইয়াছিল, ইহা সম্ভব নহে; কারণ তাহার আচরণে আগ্রহাতিশয্যের কোন নিদর্শনই ছিল না। কিন্তু ইহা স্মরণ থাকিলে স্বামীর সহিত সাক্ষাতের স্বাভাবিক আকাঙক্ষা এবং ব্রতভঙ্গজনিত প্রায়শ্চিত্তের ভীতি --শান্তির মনে এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সংগ্রাম খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। অথচ তাহার আচরণে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন আভাসই নাই। শান্তির চরিত্রাঙ্কনে ইহাকে ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শান্তি পূর্ব্ব হইতেই সন্তানসম্প্রদায়ে যোগদানের কথা চিন্তা করিয়াছিল এবং জীবানন্দের নিকট হইতে আহ্বানও তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল না।[২] এই কারণেই জীবানন্দের আহ্বান সে অত সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বল যুক্তি।

যাহা হউক, জীবানন্দের আক্ষরিক ব্রতভঙ্গ হইলেও একমাত্র শান্তির আনুকূল্যে তিনি বৃহত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শান্তিকে নিকটে পাইয়া এক অতি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তিনি যখন সন্তানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিবার

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ২২০ পৃঃ।

২ জীবানন্দের বিদায়ের পর গৃহে ফিরিয়া শান্তির স্বগতোক্তি দ্রষ্টব্য। (২।২, ৬০ পৃঃ)।

প্রস্তাব করিলেন (শান্তির সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার সময় নিশ্চয় তিনি এতখানি দুর্ব্বলতার সম্ভাবনা কল্পনা করেন নাই). তখন তাঁহার প্রস্তাবে 'কিছুকাল কথা কহিতে ' না পারিলেও (১।১৬, ৪৯ পৃঃ) কিছু পরেই শান্তি নিজেকে শক্ত করিয়া লইয়া মৃদু ভর্ৎসনার সুরে স্বামীকে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া প্রকৃতিস্থ করিল। শান্তির মনের মধ্যে যে ঝড় বহিতেছিল, তাহার 'কিছুকালে'র নীরবতা তাহার নীরব সাক্ষী। কিন্তু এই ঝড়ের আলোড়নকে সে কোন মতেই বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিল না। স্বামীপ্রীতির সহিত চরিত্রের দৃঢ়তা ও সহজ সংযম শান্তির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এবং পরবর্ত্তীকালে জীবানন্দের চরিত্রে যে পুনরায় দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় নাই তাহার কারণ এই যে, শান্তির দৃঢ়তা ও সংযম তাহার চারিদিকে এমন এক অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছিল যে, স্বামী হইয়াও জীবানন্দ সেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন নাই এবং নিকটে থাকিয়াও দূর হইতেই তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে হইয়াছে, সেখানে কোনরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশের সুযোগ ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ "আনন্দমঠে" জীবানন্দের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শান্তির সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাতের উল্লেখ করা চলে। জীবানন্দ যদি তাহাকে আপনার ব্রাহ্মণী বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য কি, শান্তি এ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি কোনরূপ দ্বিধা না করিয়াই উত্তর করিলেন, "আপনার গাত্রাবরণখানি বলপূর্ব্বক গ্রহণান্তর অধরসুধা পান।"—কথাটা পরিহাসচ্ছলে বলিলেও এস্থলে আমরা শান্তির দেহলুব্ধ জীবানন্দের আভাস পাই ; এবং পরিহাসচ্ছলে হইলেও শান্তি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দীক্ষাকালে তাঁহার শপথের কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহার কর্ত্তব্যের উল্লেখপূর্ব্বক, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ উত্তরের সুযোগ না দিয়া, 'পুনরপি পুস্তকে মন দিল।' সুতরাং 'পরাস্ত হইয়া' জীবানন্দকে পৃথক শয্যা রচনা করিতে হইল।

আর একদিনের কথা বলিতেছি। এই দিন জীবানন্দের দুর্ব্বলতা এবং প্রতিক্রিয়ায় শান্তির প্রভাব আরও সুস্পষ্ট : গভীর বনমধ্যে শান্তি গাহিল, "এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?" দূর হইতে সারঙ্গে সুর তুলিয়া, শান্তির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া জীবানন্দ গাহিলেন,

"এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে 'জীবানন্দ শান্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিনের পর জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে কি ?"

শান্তিও হাসিয়া উত্তর করিল, "নালা ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে ?"

শান্তির সঙ্গীত জীবানন্দের মনে কি তরঙ্গ তুলিয়াছে তাহা তাঁহার অন্তর্যামীই জানেন। তিনি 'বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "দেখ শান্তি! একদিন আমার ব্রতভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণ ত উৎসর্গই হইয়াছে। যে পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে।...আমার মরিবার দিন--"'

আত্মবিস্মৃতি না হইলেও ইহা আত্মবিস্মৃতির পূর্ব্বাভাস। শান্তি জানে জীবানন্দের ক্ষত কোথায়, নিজে যে গুরুদায়িত্ব লইয়া সন্তানসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে সে সম্বন্ধেও সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন; সুতরাং জীবানন্দকে বাধা দিয়া বলিল, "আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।..তোমার ধর্ম্মবৃদ্ধি করিব। ধর্ম্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য, এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য।....আরও দেখ গোঁসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে? বল 'বন্দে মাতরম্'।" মাতৃমন্ত্রের উদাত্ত আহ্বানে ক্ষণিকের বিহ্বলতা দূর হইল, জীবানন্দ আত্মস্থ হইলেন। দুইজনে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিলেন, 'বন্দে মাতরম্'। (৩।৩)। অর্থাৎ জীবানন্দের চরিত্রবলকে কোনরূপ খাটো না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, প্রধানতঃ শান্তির সাহায্যেই তিনি আত্মবিস্মৃতি হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু ইহা ডক্টর সেনগুপ্তের প্রশ্নের আংশিক উত্তর মাত্র, কারণ একথা স্বীকার করিয়া লইলেও প্রশ্ন রহিয়া যায়: শান্তির চরিত্রে কি কোনরূপ দুর্ব্বলতাই স্থান পায় নাই? ডক্টর সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন: 'শান্তি গাহিয়াছে, "এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?" কিন্তু তাহার ব্যবহারে যৌবনের বিশিষ্ট তরঙ্গের ক্ষীণতম উচ্ছ্বাসেরও পরিচয় নাই। শান্তির বাহুতে বল আছে, মনে শক্তি ও সাহসের অভাব নাই, কিন্তু ইহাদের সঙ্গে যে প্রণয়ভীরু, স্বামীসঙ্গলোলুপ, আর্ত্ত রমণীহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়া থাকিবে তাহার পরিচয় উপন্যাসে কোথাও নাই।'[১] ডক্টর সেনগুপ্তের এই অভিযোগের বিচার করিতে যাইয়া

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ২২০ পৃঃ।

আমাদিগকে শান্তির জীবন দুইটি সুনির্দ্দিষ্ট স্তরে ভাগ করিয়া দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বের ও তাহার পরের চিত্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। সন্তানসম্প্রদায়ে যোগদানের পরে জীবানন্দের সহিত 'সুদীর্ঘ পৃথক্ সহবাসে' আমরা কখনও শান্তিকে আত্মবিস্মৃত হইতে দেখিতে পাই না। ইহার কারণ এই যে, শান্তি জানিয়া শুনিয়া গুরুদায়িত্ব লইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার এই দায়িত্ববোধই উজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় তাহার কর্ত্তব্যপথ আলোকিত করিয়াছে এবং তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মবিস্মৃত হইতে দেয় নাই। অবশ্য এই যুক্তি কতটা বিচারসহ সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে, কারণ শান্তির পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছে তাহার জন্য অতিমানবীয় শক্তির প্রয়োজন।

এইবার দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বের অবস্থা আলোচনা করিতেছি এবং এই-খানেই আমরা তাহার স্বাভাবিক নারীপ্রকৃতির পরিচয় প্রত্যাশা করিতে পারি। জীবানন্দের সহিত সাক্ষাৎকালে শান্তি সহধর্ম্মিণীরূপে তাঁহাকে কর্ত্তব্যে উৎসাহিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার পরেই আমরা তাহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে দেখিতে পাই। শান্তি গৃহে ফিরিয়া নিজের জন্য রাঁধা ভাত ছাই-এর উপর ফেলিয়া দিল, 'তার পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা' করিয়া নিজের মনেই বলিল, "এত দিন যাহা মনে করিয়াছিলাম, আজি তাহা করিব। যে আশায় এত দিন করি নাই, তাহা সফল হইয়াছে।" স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও এস্থলে স্বামী নিজে আসিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহাকেই যে শান্তি আশার সফলতা বলিয়া গণ্য করিয়াছে, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পরক্ষণেই বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা তাহাকে পীড়া দিতেছে, শান্তি বলিতেছে, "সফল কি নিষ্ফল—নিষ্ফল! এ জীবনই নিষ্ফল।" (২।২)। শান্তি কখনও সাধারণ রমণীর ন্যায় ধৈর্য্যহারা হয় নাই, কিন্তু তাহার এই স্বগতোক্তির মধ্যে কি যৌবন-জলতরঙ্গাভিঘাতে উদ্বেলিত অন্তরের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না? ডক্টর সেনগুপ্ত যাহাই বলুন, ইহাই স্বামী-বিরহবিধুরা, 'স্বামীসঙ্গলোলুপ' শান্তির সহজ রূপ। শান্তির এই সময়ের চিন্তাধারার সহিত দীক্ষাগ্রহণান্তর সত্যানন্দ ঠাকুরের নিকট তাহার দৃপ্ত কণ্ঠের উক্তির ("আমি কেবল ধর্ম্মা-চরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামী সন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতর নই।" ২।৭, ৭৩ পৃঃ) কোন সামঞ্জস্য নাই। এবং ইহার কারণও সুস্পষ্ট। **স্বামীর সহিত সাক্ষাতের পরে এবং ইহারই প্রতিক্রিয়ায় শান্তির মনে যে দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল, সত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎকালে শুধু সে যে তাহার প্রভাবমুক্ত হইয়াছে তাহা নহে, নূতন সঙ্কল্পগ্রহণের ফলে তাহার মন**

তখন অতি উচ্চ সুরে বাঁধা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় শান্তির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এই যে সামঞ্জস্যের অভাব, ইহাও তাহার মানবীয় দুর্ব্বলতার নিদর্শন। এবং স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় হইলেও তাহার পরিহাস-প্রবণতার মধ্যেও হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারেই 'যৌবন জল-তরঙ্গ'কে শমিত করার পরোক্ষ চেষ্টা রহিয়াছে।

'যৌবনের বিশিষ্ট তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের' পরিচয় (সুতরাং ডক্টর সেনগুপ্তের প্রশ্নের সহিত সম্পর্কিত) না হইলেও এস্থলে শান্তির মানবীয় দুর্ব্বলতার অপর এক দৃষ্টান্তের উল্লেখ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্বামীর ব্রতচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে শান্তি সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু জীবানন্দ যখন বলিলেন, সম্মুখে ঘোরতর যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধেই তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তখন শান্তি বলিতেছে, "....প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ, কোন দিন ত একাসনে বসো নাই; প্রায়শ্চিত্ত কেন?" (৩।৩, ৮৪ পৃঃ)। জীবানন্দ নিশ্চয়ই কোন পাপ করেন নাই; কিন্তু একাসনে না বসিলেও তিনি যে তাহাকে 'গাঢ় আলিঙ্গন' করিয়াছেন, শান্তির পক্ষে তাহা ভুলিয়া যাওয়ার কথা নহে। এবং ইহার কিছু পরেই সত্যানন্দ ঠাকুরের সহিত সংলাপকালে দেখিতে পাই তাহার সুর সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। জীবানন্দকে প্রায়শ্চিত্ত হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিতে বলায় শান্তি তাঁহাকে বলিতেছে, "আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়।....মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।" (৩।৭, ৯৬ পৃঃ)। এই উক্তির তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, শান্তির দুর্ব্বলতা কোথায়। তাহার মন বলে, স্বামী বাঁচিয়া থাকুন, তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলে, ধর্ম্মের জন্য তিনি মরিতে হয় মরিবেন, সহধর্ম্মিণী হইয়া সে কখনও তাঁহার ধর্ম্মাচরণে প্রতিবন্ধক হইবে না। তাহার পরস্পরবিরোধী উক্তির মধ্যে ক্ষীণ হইলেও, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়।

জীবানন্দকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া শান্তি যে বলিতেছে, "ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই।"—তাহার এই উক্তি উল্লেখ-পূর্ব্বক ডক্টর সেনগুপ্ত প্রশ্ন করিতেছেন, 'নরনারীর আকর্ষণ—ইহা কি মনে

করা না করার উপর নির্ভর করে? ইহকালের সম্পদ্ যদি এত তুচ্ছই হয় তাহা হইলে তাহাকে অবলম্বন করিয়া পরকালকে বাঁধিয়া রাখিবার এই ঐকান্তিক চেষ্টা কেন?'[১] নরনারীর আকর্ষণ নিশ্চয়ই মনে করা না করার উপর নির্ভর করে না, নহিলে প্রায়শ্চিত্তের কথা জানিয়াও জীবানন্দ কখনও ব্রতচ্যুত হইতেন না, অথবা শান্তি তাঁহার এই ব্রতচ্যুতি ঘটিতে দিত না। কিন্তু তাহা হইলেও ইহকালকে পরকালের সোপানস্বরূপ মনে করাই কি ভারতীয় চিন্তা-ধারার বৈশিষ্ট্য নহে? বিশেষতঃ যে পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছে (পূর্ব্বেই তাহা আলোচিত হইয়াছে) তাহা স্মরণ করিলে শান্তির উক্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

অতঃপর ডক্টর সেনগুপ্ত বলিতেছেন: 'শান্তি যে যুক্তির সাহায্যে জীবানন্দকে লইয়া হিমালয়ে চলিয়া গেল তাহা আরও কৌতুকজনক। পুনরুজ্জীবিত হইয়া জীবানন্দ মাতৃসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে চাহিলে শান্তি বলিল, "তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেননা, তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মা'র সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল?....আমরা আর গৃহী নহি। এমনই দু'জনে সন্ন্যাসী থাকিয়া চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিব।" যদি চিরব্রহ্মচর্য্য পালনই ইহাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে পরস্পরের সান্নিধ্যের প্রয়োজন কি? স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের প্রায়শ্চিত্ত হইল স্ত্রীর সঙ্গে চিরকাল একত্র বসবাস! এই প্রকারের যুক্তি আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র।'[২] সন্তান সম্প্রদায়ের অনুশাসন অনুসারে দেহত্যাগই জীবানন্দের ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করিয়া তিনি সেই প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। অতঃপর মহাপুরুষের চিকিৎসাগুণে পুনরুজ্জীবিত হইলে তাঁহার আর মাতৃসেবার অধিকার রহিল কিনা এবং মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই এক্ষেত্রে ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয়ই মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে। তাহা হইলেও শান্তি যে পথ নির্দ্দেশ করিল তাহা তাহার স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দেয় এবং তাহার সহিত এক মত হইতে না পারিলেও অন্ততঃ একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মাতৃসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সন্তানের পক্ষে মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়া মৃত্যুর অধিক শাস্তি। তবে এমনও হইতে পারে (এবং ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়) যে, স্বামীর আপাতমৃত্যুতে শান্তি যে আঘাত পাইয়াছে তাহাই পরোক্ষে তাহার চিন্তার ধারা প্রভাবিত করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে নিজের অজ্ঞাতসারে হইলেও,

---

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ২২০-২১ পৃঃ।
২ বঙ্কিমচন্দ্র, ২২১ পৃঃ।

ইহার ভিতর কিছুটা আত্মপ্রবঞ্চনা রহিয়াছে। কিন্তু এ সকল কথা স্বীকার করিয়া লইলেও, মনে হয় এস্থলে ডক্টর সেনগুপ্ত শান্তির প্রতি সুবিচার করেন নাই। প্রধানতঃ যৌন আকর্ষণেই পতি-পত্নী পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করিলেও, দাম্পত্যজীবনে ইহাই একমাত্র আকর্ষণ নহে ; এবং শান্তির চরিত্রও ঠিক সাধারণের মাপকাঠিতে বিচার্য্য নহে। সুতরাং মহাপুরুষের কৃপায় মৃত স্বামীকে পুনরায় ফিরিয়া পাইয়া ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কল্প লইয়াই সে যদি স্বামীর সান্নিধ্য কামনা করে তাহা হইলে সে অবস্থায় তাহার আচরণে কোনরূপ অসঙ্গতি রহিয়াছে এরূপ মনে করিবার কারণ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, 'স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রায়শ্চিত্ত হইল স্ত্রীর সঙ্গে চিরকাল একত্র বসবাস!'—ডক্টর সেনগুপ্তের এই উক্তির মধ্যে যে শ্লেষ রহিয়াছে, নিশ্চিত শান্তির তাহা প্রাপ্য নহে। কারণ ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষায় শান্তি স্বামীর সহিত একত্র বসবাস করে নাই এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলেও "আনন্দমঠে" উভয়ের 'একত্র বসবাস'কে সে জীবানন্দের পক্ষে ব্রতচ্যুতি বলিয়াই মনে করিয়াছে, নহিলে "একবারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শতবারেও তাই" (২।২, ৬০ পৃঃ)—জীবানন্দের সহিত সাক্ষাতের পর তাহার এই উক্তি সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, শান্তির প্রস্তাবের যৌক্তিকতা আলোচনাকালে আমাদিগকে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার বিচার করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তান্তে জীবানন্দ যখন পুনর্জীবন লাভ করিলেন, সন্তানের দৃষ্টিতে তখন 'মা'র কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে', ব্রত পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং সে অবস্থায় জীবানন্দ ও শান্তি সংসারী হইয়া গৃহাশ্রমে বাস করিলে জীবানন্দের পক্ষে পুনরায় ব্রতভঙ্গজনিত পাপের প্রশ্ন ওঠে না। সাধারণ অবস্থায় তাঁহারা মহেন্দ্র ও কল্যাণীর ন্যায় সংসারী হইতে পারিতেন। কিন্তু মৃত্যুই যেখানে প্রায়শ্চিত্ত, সেখানে সাংসারিক সুখভোগ ধারণার অতীত। এমন কি সন্তানসেনা যাহা বাহুবলে কাড়িয়া লইয়াছে তাহার রক্ষাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেও তাহাতে লোকাপবাদভীতি রহিয়াছে। (৪।৭, ১২৯ পৃঃ)। ইহাই হইল শান্তির প্রস্তাবের পটভূমিকা। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তাহার আচরণ সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

বিশিষ্ট সন্তানগণের চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে (শান্তির চরিত্র প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইলেও নবীনানন্দরূপে শান্তিও একজন বিশিষ্ট সন্তান) সত্যানন্দ ঠাকুরের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, 'সত্যানন্দকে স্থানে স্থানে একটু ছায়াময় বা মায়াময় পুরুষ বলিয়া মনে হয়।'[১] কিন্তু তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের চক্ষে তিনি 'ছায়াময় বা মায়াময়'

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ৩৩১ পৃঃ।

বলিয়া গণ্য হইলেও (ইহাই হয়ত তাঁহার আকর্ষণীশক্তির প্রধান উৎস) প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কার্য্যাবলীতে কোনরূপ অলৌকিকত্ব বা যোগবলের আভাস নাই। অবশ্য এক জায়গায় এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। জীবানন্দ যখন নিমাইয়ের গৃহে শান্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ভবানন্দ যখন কল্যাণীকে গৌরীদেবীর আশ্রয়ে রাখিয়া আসিলেন, সত্যানন্দ তখন কারাগারে বন্দী। অথচ পরদিন প্রাতেই তিনি এই দুই প্রিয়শিষ্যকে বলিতেছেন, "তোমরা দুইজনে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কর, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না।" (২।৩, ৬৪ পৃঃ)। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইল? জীবানন্দের ব্রতভঙ্গের সংবাদ তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন, ইহা সুনিশ্চিত। কারণ শান্তি যখন নবীনানন্দরূপে দীক্ষাগ্রহণ করিল, তখন দেখিতে পাই জীবানন্দের সহিত সাক্ষাতের কথা সে প্রকাশ না করিলেও (অবশ্য সত্যানন্দ প্রশ্ন করিলে শান্তি নিশ্চয় ইহা গোপন করিত না) তাহার পরিচয় পাইয়া 'দিন কত পরীক্ষা করিয়া দেখি' বলিয়া সত্যানন্দ তাহাকে সে রাত্রির জন্য "আনন্দমঠে" বাস করিবার অনুমতি দিলেন, অথচ ইহার ফলে যে আক্ষরিক হইলেও জীবানন্দের ব্রতভঙ্গ হইতে পারে, ইহা তাঁহার না বুঝিবার কথা নহে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই ব্রতভঙ্গের কথা অবগত না হইলে তিনি জানিয়া শুনিয়া শান্তিকে এরূপ অনুমতি দিতেন না। ভবানন্দ সম্বন্ধেও ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, সত্যানন্দের মনে অন্ততঃ কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত না হইলে এস্থলে তিনি কখনও জীবানন্দের সহিত তাঁহার নাম জড়িত করিতেন না। কিন্তু শান্তির সহিত জীবানন্দের সাক্ষাতের সংবাদ এবং ভবানন্দের মনের পাপ সত্যানন্দ অবগত হইলেন কেমন করিয়া? এই প্রশ্নের উত্তরে দত্তগুপ্ত মহাশয় সংক্ষেপে বলিয়াছেন, 'হয়ত তাহার বহু চর ছিল।'[১] ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয় এবং যেভাবে তিনি ধীরানন্দের দ্বারা ভবানন্দের আনুগত্য পরীক্ষা করিয়া লইলেন (৩।৫) তাহাও এই ধারণার পরিপোষক। কিন্তু গুপ্তচরের পক্ষে ভবানন্দের মনের পাপ জানা সম্ভব নহে; সুতরাং বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

'ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিলেন।' হয়ত ইঁহাদেরই কেহ সুকুমারীকে লইয়া জীবানন্দকে নিমাইয়ের বাড়ী যাইতে দেখিয়া থাকিবেন এবং নিমাই যে শান্তিকে ডাকিয়া লইয়া গেল তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। এবং হয়ত তাঁহার মারফত সত্যানন্দ এই সংবাদ পাইয়া থাকিবেন। সেক্ষেত্রে

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ৩৩২ পৃঃ।

জীবানন্দের ব্রতভঙ্গ হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। এইরূপ, অপর কেহ হয়ত কল্যাণীকে লইয়া ভবানন্দকে গৌরীদেবীর গৃহে যাইতে দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু সহজ অবস্থায় ইহা হইতেই ভবানন্দের ব্রতভঙ্গের প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং আমাদিগকে আর একটুকু তলাইয়া দেখিতে হইবে। ভবানন্দের চারিত্রিক দুর্ব্বলতার আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সত্যানন্দ ঠাকুরের কথায় তিনি যখন বুঝিলেন, যে রমণীকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন তিনিই মহেন্দ্রের স্ত্রী তখন 'ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন।' তাঁহার এই ক্ষণিকের ভাবান্তর সত্যানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইবার কথা নহে। অন্ততঃ ভবানন্দ যে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা চাপিয়া গেলেন ইহা হইতেও তাঁহার মনের পাপ অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন নহে। অবশ্য এ সকলই অনুমান মাত্র। কিন্তু ইহার অপর যে ব্যাখ্যা সম্ভব (অর্থাৎ সত্যানন্দ যোগবলে এ সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন) তাহা যে শুধু অতিপ্রাকৃত, সুতরাং নিছক অনুমানের উপর গ্রহণযোগ্য নহে তাহা নহে ; তিনি যদি সত্যই দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ছদ্মবেশী শান্তিকে দেখিয়া তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া বুঝিতে পারিলেও জেবার পূর্ব্বে তিনি তাহাকে জীবানন্দের পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না কেন? (২।৭, ৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, বিরাট বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের অধিনায়কত্বের জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন সত্যানন্দের চরিত্রে সে সকলই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি ভূয়োদর্শী, স্থিরধী, লোকচরিত্রাভিজ্ঞ, কৌশলী, নির্ভীক, দেশপ্রাণ কর্ম্মবীর। কিন্তু সন্তান সম্প্রদায়ের বাঁধন শক্ত করিতে যাইয়া তিনি মানব-প্রকৃতিকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। তাই তাঁহাকে জীবানন্দ ও ভবানন্দের ন্যায় কর্ম্মীকে হারাইতে হইয়াছে এবং জীবানন্দের প্রাণরক্ষার অনুরোধ করিতে যাইয়া শান্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। (৩।৭)।

অপ্রধান হইলেও নারীচরিত্রের মধ্যে নিমাইয়ের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। নিমাই সম্পূর্ণরূপে বাস্তব তুলিতে আঁকা বাংলার সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের গৃহলক্ষ্মীর চিত্র। চারিদিকে দুর্ভিক্ষের মধ্যে অরণ্যঘেরা ভরুইপুর গ্রামখানি যেন মরুভূমিতে মরূদ্যানের ন্যায় রমণীয় ; নিমাই ভরুইপুরের বন-লক্ষ্মীরূপিণী। নিমাইয়ের নিরাড়ম্বর সংসার, 'দুটি মানুষ', ঘরে যাহা আছে, লোককে 'দেয় থোয়' ও আপনারা খায়।

নিমাই স্নেহশীলা ভগিনী ও রঙ্গপ্রিয় ননদিনী। তাহার কর্ম্মক্ষেত্র অপরিসর। সন্তানধর্ম্মের দায়িত্ব, ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত—এ সকল কথা সে বড় বোঝে না, বুঝিলে 'বউয়ের' সহিত সাক্ষাতের জন্য দাদার নিকট বায়না ধরিত

না। কিন্তু নিমাইয়ের চরিত্রের বিশিষ্ট সুর তাহার বুভুক্ষু মাতৃত্ব। জীবানন্দ মাতৃহারা সুকুমারীকে লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে মৃত পুত্রের ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে যাইয়া নিমাইয়ের চক্ষের জল, নূতন সাধ লইয়া শিশুটিকে ভিক্ষা চাহিতে যাইয়া হাত দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহার হাসি তাহার ক্ষুধিত মাতৃহৃদয়ের পরিচয় দেয়।

নিমাইয়ের বুভুক্ষু মাতৃত্বের করুণ চিত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে সুকুমারীকে ফিরাইয়া দিবার মুহূর্ত্তে।[১] (৪।২)। সুকুমারীকে ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাবের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় 'ঠোঁট নাক' ফুলাইয়া নিমাইয়ের কান্না, মেয়ে ফিরাইয়া দিতে তাহার অসম্মতি, জীবানন্দ তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলে 'সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া' কাঁদিতে বসা, অভিমানে সুকুমারীর ব্যবহার্য্য যাবতীয় জিনিষ 'ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে' ফেলিয়া দেওয়া এবং পরিশেষে যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এত কাণ্ড তাহার শিশুমুখের "হাঁ মা—কোথায় যাব মা ?"—এই প্রশ্নে 'সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে' নিমাইয়ের চলিয়া যাওয়া অতীব বাস্তব চিত্র। এবং দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সন্তানসম্প্রদায়ের একটানা জীবনের পার্শ্বে জীবানন্দের বৈধ ও ভবানন্দের অবৈধ প্রণয়াকর্ষণের ন্যায় ইহা উপন্যাসে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

'আনন্দমঠে'র প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লিখিয়াছেন : 'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়।' কল্যাণী ও শান্তি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। উভয়েই পতিপ্রাণা হইলেও এই দুইটি চরিত্র অনেকাংশে বিপরীতধর্ম্মী। কল্যাণী ধীর, স্থির, অচঞ্চল, গাম্ভীর্য্যময়ী ; শান্তি রহস্যপ্রিয় এবং বায়ু-আন্দোলিত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় নৃত্য-চঞ্চল। কষ্টসহিষ্ণু হইলেও কল্যাণী অপরের উপর নির্ভরশীলা ; শান্তি তেজোদৃপ্তা এবং আত্ম-শক্তিতে প্রত্যয়শালিনী। একজন চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল, অপর সূর্য্যের ন্যায় প্রখরদীপ্তিশালিনী। কল্যাণীর জীবন গৃহস্থালিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহার জগৎ স্বামী ও কন্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ; শান্তি প্রথম জীবনে বিকেন্দ্রীয় গ্রহের ন্যায় বহির্জগতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল এবং পরবর্ত্তী ঘটনাবলী যখন তাহাকে কেন্দ্রমুখী করিল তখনও স্বামীর সহিত বৃহত্তর জগৎকেই সে

১ শান্তি হাজার হউক মেয়েমানুষ। মহেন্দ্রের নিকট কল্যাণীকে পৌঁছাইয়া দিবার পর যখন সুকুমারীর কথা উঠিল, তখন ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে অনুমান করিয়া লইয়া শান্তি ঘুমের অজুহাতে সুকুমারীকে ফিরাইয়া আনার কাজটা কৌশলে জীবানন্দের স্কন্ধে চাপাইয়া দিল।—৪।২, ১১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তাহার কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইল। কল্যাণীর দৃষ্টিতে স্ত্রীজাতি স্বামীর বুকে 'কাদাপোরা কলসী', স্বামীর পায়ে 'লোহার শিকল', স্ত্রী সহধর্ম্মিণী কেবল 'ছোট ছোট ধর্ম্মে। বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক।' সুতরাং স্বামীর চক্ষে কল্যাণী যখন মৃত, তখন পতিপ্রাণা হইয়াও তিনি তাঁহার সান্নিধ্য কামনা করেন নাই; পরন্তু ভবানন্দকে বলিয়াছেন, তিনি 'বিষকণ্টকের দ্বারা' স্বামীর 'অধর্ম্মকণ্টক উদ্ধৃত' করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার স্বামী শ্রেষ্ঠ সন্তান। শান্তির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। স্বামীর ন্যায় নিজেও সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শান্তি স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তাহাকে চিনিতে পারিয়া সত্যানন্দ যখন ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, "জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ।"—শান্তি দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি।" ইহা যে শূন্যগর্ভ দাম্ভিকতা নহে, শান্তির পরবর্ত্তী জীবন তাহার সাক্ষ্য দেয়।

শান্তির চরিত্র পূর্ব্বেই আলোচিত হইলেও এই চরিত্রটি সম্বন্ধে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। শান্তির চরিত্রে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা বাঙ্গালী রমণীতে সম্ভব নহে, একসময় কেহ কেহ এইরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন। এবং উপন্যাসের পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিম যে 'শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত' করিয়াছেন এবং তাহার আচরণের কৈফিয়তস্বরূপ তাহার বাল্যজীবনের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন, ইহা হয়ত এক হিসাবে এই অভিযোগের পরোক্ষ আংশিক স্বীকৃতি। কিন্তু এক্ষেত্রে সূর্য্যমুখী বা কমলমণি বা ভ্রমর বা কল্যাণীর ন্যায় নিছক বাঙ্গালীর ঘরের নারীর চিত্র অঙ্কিত করা বঙ্কিমের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং বাঙ্গালী নারীর সাধারণ মাপকাঠিতে তাহাকে বিচার করিতে যাওয়া অযৌক্তিক। শান্তির চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই হিন্দু নারীর কাঠামোর উপর তাহার অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার অনুলেপ। এবং তাহার চরিত্রে এই উভয় জিনিষের সামঞ্জস্য রহিয়াছে কিনা ইহাই আমাদের বিচার্য্য। ছদ্মবেশে সন্তানসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তি যে ইংরেজ ফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জীবানন্দের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সে যে রসকলি কাটিয়া বৈষ্ণবীবেশে ইংরেজ শিবিরে প্রবেশ করিয়া চতুর ইংরেজের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহাদের গোপন পরামর্শের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মহেন্দ্র সিংহকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে পদচিহ্নাভিমুখে ছুটিল, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ে থাকাকালীন ছদ্মবেশী শান্তির শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা; কিন্তু এই সকল কার্য্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীর সহায় হইবার তাহার স্বাভাবিক স্পৃহা।

কল্যাণীর চরিত্রে কোনরূপ জটিলতা বা অসাধারণত্ব নাই। বিরুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে পড়িলেও কল্যাণী নিমাইয়ের ন্যায় আদর্শ গৃহস্থবধূ। তাঁহার জীবন স্বামী ও কন্যার জন্য উৎসর্গীকৃত। অন্তঃপুরচারিণী কুলবধূ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বহির্জগতে আসিয়া পড়িলে যে কতখানি অসহায় হইয়া পড়ে, কল্যাণী তাহার দৃষ্টান্তস্থল। যেখানেই তাঁহাকে অভিভাবকহীন অবস্থায় দেখিতে পাই, সেখানেই তিনি বিড়ম্বিত হইয়াছেন। এবং স্বামীর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে একাকিনী পদচিহ্ন যাত্রা করিয়া উচ্ছৃঙ্খল দুর্ব্বৃত্তের হাতে পড়িলে, সেই সময় তাঁহার পার্শ্বে শান্তিকে দাঁড় করাইয়া বঙ্কিম বাংলার নারী-সমাজের পক্ষে শারীরিক ব্যায়ামশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বাঙ্গালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করিলে ভুল করা হইবে না। বস্তুতঃ বঙ্কিম ভবিষ্যতের বাঙ্গালী নারীকে কি রূপে দেখিতে চাহেন, শান্তি কতকটা তাহারই প্রতীক। নারীর পক্ষে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতবাদ সুস্পষ্ট। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' তিনি লিখিয়াছেন : 'ইউরোপে যে অশ্বারোহণ করিতে পারে না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাসাস্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও এ সকল শক্তি হইয়া থাকে। আমাদের কি দুর্দ্দশা।'[১] একই পৃষ্ঠায় পাদটিকা এইরূপ : 'লেখক-প্রণীত দেবী চৌধুরাণী নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।' অন্ধ রজনীও প্রধানতঃ শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াই হীরালালের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু কল্যাণীর পক্ষে গৌরীদেবীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রাত্রিকালে অরক্ষিত অবস্থায় অচেনা পথে পদচিহ্নযাত্রা কি স্বাভাবিক? তিনি যখন বুঝিয়াছিলেন যে, সন্তানের ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, সুতরাং স্বামীর সহিত সাক্ষাতের আর কোন প্রতিবন্ধক নাই, তখন নিশ্চয় ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, সত্যানন্দ ঠাকুর নিজেই যথাসময়ে ইহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্ততঃ সে রাত্রির দুর্য্যোগের কথা অন্যের ন্যায় কল্যাণীরও অবিদিত ছিল না এবং নগরের ঘাঁটিতে উপস্থিত হইলে পাহারাওয়ালাও তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। (৪।১, ১১২ পৃঃ)। এমত অবস্থায় তাঁহার ন্যায় ধীরপ্রকৃতি নারীর পক্ষে এরূপ চপলমতি-বালিকাজনোচিত আচরণ শুধু অশোভন নহে, ইহা সম্ভব ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা কঠিন।

১ ধর্ম্মতত্ত্ব ৮, ৪৭ পৃঃ।

কিন্তু 'আনন্দমঠে'র বিচারকালে আখ্যায়িকার পরিবেশন বা চরিত্রাঙ্কনে এইরূপ দু'একটি ত্রুটিবিচ্যুতিই বড় কথা নহে; 'আনন্দমঠে'র আকর্ষণ ইহার সামগ্রিক অনুভূতিতে। এবং গত অর্দ্ধ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসখানি বিচার করিলে ঋষি বঙ্কিমের দিব্যদৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। 'আনন্দমঠ' বিপ্লবীসম্প্রদায়ের কার্য্যাবলীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বিপ্লব ইহার শেষ কথা নহে। এবং বিপ্লবীনেতা সত্যানন্দ ঠাকুরের প্রাধান্য যাহাই হউক, শেষ মুহূর্ত্তে তিনি মহাপুরুষ চিকিৎসকের সম্মুখে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছেন। এই মহাপুরুষ চিকিৎসকই 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমের বাণীর ধারক ও বাহক। এবং ইঁহারই আহ্বানে (ভক্তির সোপানস্বরূপ) জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে[১] সত্যানন্দ ঠাকুরের হিমালয়প্রয়াণ বিপ্লবী-বীর শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারীপ্রয়াণ স্মরণ করাইয়া দেয়। সত্যানন্দের বৈপ্লবিক অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সাধনা ব্যর্থ হইতে পারে না। বাংলার বিপ্লবীসন্তানগণ বিপ্লবের ভিতর দিয়া তাঁহাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারেন নাই; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই, তাঁহার সাধনা ব্যর্থ হইতে পারে না। আজিকার স্বাধীন ভারত জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে এবং পাশ্চাত্য শিল্প ও বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় নিষ্কাম সাধনার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভারত তাহার পররাষ্ট্রনীতির ভিতর দিয়া যুদ্ধশ্রান্ত ও যুদ্ধ-সন্ত্রস্ত জগৎকে যে নূতন পথের সন্ধান দিতেছে, তাহাই হয়ত একদিন ঋষি বঙ্কিমের স্বপ্নকে সফল করিবে, বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগের ভিতর দিয়া ভারতবাসী জগতের 'কর্ত্তা ও নেতা' হইবে।'[২]

'আনন্দমঠে'র পরিসমাপ্তি এইরূপ:

'মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন।....কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।'

কয়েকটি স্থানে ইহার বিশ্লেষণ ও বিচার প্রয়োজন:

প্রথমতঃ 'জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে'—মহাপুরুষ ও সত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি কতখানি সমর্থনযোগ্য? মহাপুরুষকে আমরা যতটুকু

---

১ 'জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না।... মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই।' ধর্ম্মতত্ত্ব ৯, ৫১ পৃঃ।
২ ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬, ৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দেখিয়াছি তাহাতে ধরিয়া লইলাম তিনি মূর্ত্ত জ্ঞান. কিন্তু সত্যানন্দ কি ভক্তির প্রতীক? 'ধর্ম্মতত্ত্বে' বঙ্কিম ভক্তির যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই আদর্শ অনুসারে সত্যানন্দ নিঃসন্দেহ পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন এবং 'উপক্রমণিকা'র পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসের পরিসমাপ্তির বিচার করিলে বলিতে হইবে যে, ভক্তির অভাবই তাঁহার 'মনস্কাম' সিদ্ধ না হওয়ার কারণ। তবে আরাধ্য দেবতা এবং গুরুর প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ভক্তির এই সাধারণ ব্যাপক অর্থে তিনি ভক্ত; সত্যানন্দ দেশভক্তি ও গুরুভক্তির প্রতীক।

দ্বিতীয়তঃ 'কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী'—এই উক্তির তাৎপর্য্য কি? এস্থলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠেঃ বঙ্কিম কি 'শান্তি' ও 'কল্যাণী' শব্দ দুইটি প্রচলিত আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সত্যানন্দকে শান্তি ও মহাপুরুষকে কল্যাণী বলিয়া অভিহিত করার সার্থকতা কি? সত্যানন্দ শেষ পর্য্যন্ত বলিতেছেন, "শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।" নিশ্চিত ইহা শান্তিবাদীর উক্তি নহে। সুতরাং জিনিষটি একটু তলাইয়া দেখা প্রয়োজন। সত্যানন্দকে 'নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে' নিযুক্ত করিয়াছেন মহাপুরুষ, অর্থাৎ তিনি মহাপুরুষের উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ। এবং মহাপুরুষের উদ্দেশ্য সন্তানবিদ্রোহের মাধ্যমে ইংরেজকে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়া দেশে শান্তিস্থাপন। তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি যাহাই হউক, এই হিসাবে সত্যানন্দ শান্তির অগ্রদূত। কিন্তু শান্তি উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য কল্যাণ। জ্ঞান ভিন্ন কল্যাণ নাই। মহাপুরুষ জ্ঞানী। সুতরাং তিনি 'কল্যাণী'। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যার একাধিক অসুবিধা রহিয়াছে। প্রথমতঃ যে যুক্তির দ্বারা সত্যানন্দকে শান্তির অগ্রদূত বলা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল যুক্তি। দ্বিতীয়তঃ মহাপুরুষ কল্যাণের প্রতীক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া 'কল্যাণী' শব্দের ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগ বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে করা কঠিন। সুতরাং হেঁয়ালি ভাষায় বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত উক্তির ব্যাখ্যার সূত্র আমাদিগকে অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

মনে হয় মহাপুরুষ ও কল্যাণী, সত্যানন্দ ও শান্তির নাম একত্র জড়িত করিয়া বঙ্কিম ইঁহাদের আত্মিক যোগাযোগের ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথমে মহাপুরুষ ও কল্যাণীর কথা ধরা যাক। ইঁহারা উভয়েই কর্ম্মকে ঈশ্বরমুখী করিয়াছেন। মহাপুরুষের সম্বন্ধে এ বিষয় কোন প্রশ্ন ওঠে না। কল্যাণীর সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ইহা হইতেই সত্যানন্দের সহিত তাঁহার দৃষ্টির পার্থক্য এবং মহাপুরুষের সহিত তাঁহার মিলনসূত্র উপলব্ধি করা

যাইবে। মহাপুরুষের আহ্বানে সত্যানন্দ যখন বলিলেন, মায়ের উদ্ধারকার্য্য যদি তাঁহার দ্বারা সম্ভব না হয় তাহা হইলে তিনি 'এই মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহ-ত্যাগ' করিবেন, তখন তাঁহার উক্তির পশ্চাতে রহিয়াছে কর্ম্মাসক্ত মনের দুর্জ্জয় অভিমান। কল্যাণীও একদিন বিষের সাহায্যে মরিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে অভিমান ছিল না। কল্যাণীর মৃত্যুর চেষ্টার পশ্চাতে ছিল তাঁহার এই বিশ্বাস যে, তাঁহার মৃত্যু ঈশ্বরাভিপ্রেত এবং ঈশ্বরাদিষ্ট। তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর দিয়াই আমরা তাঁহার সহিত মহাপুরুষের আত্মিক যোগাযোগ লক্ষ্য করি।

সত্যানন্দ ও শান্তির আত্মিক যোগাযোগ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, উভয়েই অক্লান্ত কর্ম্মী এবং উভয়েই দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। মহাপুরুষ যেমন সত্যানন্দকে, শান্তি সেইরূপ জীবানন্দকে লইয়া হিমালয়প্রয়াণ করিলেও উভয়ের উদ্দেশ্যের তারতম্যের ভিতর দিয়া মহাপুরুষের সহিত শান্তির পার্থক্য এবং সত্যানন্দের সহিত তাহার সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাপুরুষ চাহিয়াছেন যাহাতে জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছেদনান্তে তাঁহার প্রিয় শিষ্যের সন্ন্যাস ভক্ত্যাত্মক হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার মূলমন্ত্র বিসর্জ্জন। শান্তির সাধনার পরিধি অপেক্ষাকৃত অপরিসর ; যাহাতে মা'র মঙ্গল হয় ইহাই তাহার কামনা ও সাধনা। যদিও তাহার ক্ষেত্রে স্বামীপ্রীতিই মাতৃভক্তির প্রেরণা যোগাইয়াছে, তাহা হইলেও এই মাতৃভক্তিই সত্যানন্দ ও শান্তির যোগসূত্র। এবং সত্যানন্দের ন্যায়, সন্তান হিসাবে শান্তির সাধনার মূলমন্ত্র প্রতিষ্ঠা। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে যে শান্তির সত্তা সত্যানন্দে প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়া সত্যানন্দ শান্তি এবং কল্যাণীর সত্তা মহাপুরুষে প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়া মহাপুরুষ কল্যাণী।

কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যাও ত্রুটিশূন্য নহে। মহাপুরুষ ও সত্যানন্দ সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী। সুতরাং তাঁহাদিগকে 'প্রতিষ্ঠা' বা 'বিসর্জ্জনে'র প্রতীক বলিয়া ধরিয়া লইলে কোনরূপ গোল বাধে না। কিন্তু কল্যাণী বা শান্তির সম্বন্ধে একথা খাটে না। কল্যাণী ভগবদ্‌বিষ্ণুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন একথা সত্য হইলেও ইহাও তুল্য সত্য যে, ঘটনা প্রতিকূল না হইলে কেবল প্রত্যাদেশ তাঁহাকে আত্মহত্যায় প্রণোদিত করিতে পারিত না। এইরূপ, নবীনানন্দরূপী শান্তির কর্ম্ম প্রতিষ্ঠামূলক হইলেও তাহার হিমালয়প্রয়াণের সঙ্কল্পের মধ্যে যে সুর বিশেষভাবে ধ্বনিত হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠার নহে, বিসর্জ্জনের। অধ্যাত্মবাদী বঙ্কিম যাহাই বলুন, শিল্পী বঙ্কিম এই দুইটি চরিত্রকে বিভিন্ন বৃত্তির সমাবেশে মানবী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রতিষ্ঠা বা বিসর্জ্জনের

প্রতীক করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, করিলে সে সৃষ্টি নিতান্তই প্রাণহীন হইয়া পড়িত।

যাহা হউক, মোটের উপর 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমের বাণী সংক্ষেপতঃ এইরূপ: প্রতিষ্ঠা কর্ম্মমূলক, কিন্তু কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট না হইলে তাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। কর্ম্মের সন্ন্যাস বা ঈশ্বরার্পণের মূলমন্ত্র বিসর্জ্জন। কর্ম্ম ও কর্ম্ম-সন্ন্যাস, প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জনের সংযোগে ও সমন্বয়ে ধর্ম্মের পূর্ণতা। ইহাই ভক্তিতত্ত্বের সারকথা।

দেবী চৌধুরাণী

'আনন্দমঠে'র ন্যায় 'দেবী চৌধুরাণী'তেও বঙ্কিম আখ্যায়িকার পশ্চাতে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা জুড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক ভিত্তি আরও দুর্ব্বল এবং এ সম্বন্ধে বঙ্কিম পূর্ব্বাহ্লেই পাঠকবর্গকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ''দেবী চৌধুরাণী'' গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব, লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ব্রেনান্‌, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ, সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্য্যন্ত।' (বিজ্ঞাপন)। ঐতিহাসিক ভবানী পাঠক অ-বাঙ্গালী ভোজপুরী এবং তাহার অনুচরবর্গ রাজপুত।[১] এবং এই ডাকাতের সর্দ্দার সহসা প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া স্বেচ্ছায় ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই, ইংরেজ সিপাহীদের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। উপন্যাসে তাহার পাণ্ডিত্য ও আদর্শবাদ নিছক কল্পনার সৃষ্টি। এইরূপ, দেবী চৌধুরাণী নামে ঐতিহাসিক চরিত্র হইলেও উপন্যাসে তাহার যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত।

কিন্তু উপন্যাসের ঐতিহাসিক পরিবেশ ইতিহাসসম্মত। 'আনন্দমঠে' বর্ণিত সন্ন্যাসীবিদ্রোহের অব্যবহিত পরের কথা। ইংরেজ রাজত্ব তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দেশের সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া সীমান্ত অঞ্চলে, অরাজকতার রাজত্ব। দেশব্যাপী অরাজকতার সুযোগ লইয়া ডাকাতি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিল এবং মন্বন্তরের ফলে গ্রাম্য চাষীরাও ডাকাতের দলে যোগ দিতে লাগিল। ভবানী পাঠক অ-বাঙ্গালী হইলেও বাঙ্গালীর মধ্যেও ডাকাতের সর্দ্দারের অভাব রহিল না। একদিকে এই সকল পেশাদার ডাকাতের বে-আইনী কার্য্যকলাপ, অন্যদিকে ইজারাদার দেবী সিংহের আইনের আশ্রয়ে অত্যাচার[২]—উপন্যাসে বর্ণিত দেবী চৌধুরাণীর জীবন-কাহিনী বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে এই দুই ঐতিহাসিক সত্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে। অবস্থাবিপর্য্যয়ে

১ দেবী চৌধুরাণী (শতবার্ষিক সংস্করণ), আচার্য্য যদুনাথ লিখিত ভূমিকা, ৴০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যতটুকু জানা যায় তাহার জন্য 'পরিশিষ্ট খ' দ্রষ্টব্য।

২ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

আশ্রয়হীনা গৃহস্থকন্যা প্রফুল্ল ডাকাতের সর্দার ভবানী পাঠকের আশ্রয় লাভ করিয়া দেবী চৌধুরাণীতে রূপান্তরিত হইল, আবার দেবী সিংহের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত শ্বশুরকে রক্ষা করিতে যাইয়া দেবী চৌধুরাণী মরিল এবং পুরাতন প্রফুল্ল নূতন রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল।

'আনন্দমঠে'র ন্যায় 'দেবী চৌধুরাণী'তেও বঙ্কিম আখ্যায়িকার মাধ্যমে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। 'আনন্দমঠে'র সত্যানন্দ সন্ন্যাসী, জীবানন্দ ও শান্তি গৃহী হইয়াও গৃহাশ্রমের বাহিরে। কিন্তু বঙ্কিমের মতে গৃহাশ্রমই নিষ্কাম সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্র এবং তাঁহার 'আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী।'[১] আলোচ্য উপন্যাসে প্রফুল্লের চরিত্রে গৃহাশ্রমে নিষ্কাম সাধনার চরমোৎকর্ষের রূপায়ণ বঙ্কিমের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু অধ্যাত্মবাদের বাহন হইলেও 'দেবী চৌধুরাণী'তে তৎকালীন বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে চিত্র রহিয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন কি, কোন কোন সমালোচকের মতে উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য অপেক্ষা ইহা অধিকতর আকর্ষণীয়।[২] প্রফুল্লের বিধবা মাতার প্রতিবেশীরা ভালোয় মন্দয় আজিও বাংলার পল্লীনেতার প্রতীক। ইহারা সামাজিক ব্যাপারে কথায় কথায় দল পাকাইতে অভ্যস্ত, প্রতিশোধ লইতে যাইয়া নিরীহ, অসহায়, এমন কি বিধবা প্রতিবেশীর নামেও কুৎসা রটাইতে ক্ষুরধাররসনা; আবার ইহারাই জীবিতাবস্থায় হয়ত যাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহারই মৃত্যুতে সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অগ্রণী। এইরূপ, মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী শুনিয়া শ্বশুর কর্তৃক প্রফুল্লকে ত্যাগ, বেহানের সহিত প্রফুল্লের শাশুড়ীর কোন্দল, নয়ান বৌ ও সাগরকে লইয়া কুলীনপুত্র ব্রজেশ্বরের সংসার, ব্রহ্মঠাকুরাণীর অতিথিপরায়ণতা এবং নাতি নাতবৌ লইয়া তাহার রঙ্গরস, জামাতা হিসাবে ব্রজেশ্বরের শুভাগমনে পাড়া-প্রতিবেশীর চাঞ্চল্য, 'নূতনবৌ'কে দেখিতে আসিয়া ফিরিবার পথে পল্লীমহিলাদের টিকাটিপ্পনী সেকালের পল্লীজীবনের আভাস দেয়। বস্তুতঃ, 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিম রোমান্স, বাস্তবতা ও অধ্যাত্মবাদের মিলিত পরিবেশন করিয়াছেন।

'দেবী চৌধুরাণী'র গল্পাংশ নিখুঁত নহে। একটি উদাহরণ দিতেছি: ফুলমণি নিজের দোষস্খালনের জন্য প্রফুল্লের তিরোধানের যে আজব গল্প রচনা

---

১ ধর্ম্মতত্ত্ব ২৩, ১৩১-৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২ 'এই উপন্যাসের সর্ব্বাপেক্ষা সার্থক চিত্র—ধর্ম্মতত্ত্বের বা ইজারাদারের অত্যাচারের নহে, হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের।' ডক্টর সেনগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র', ২২৮-২৯ পৃঃ।

করিল সেরূপ গল্প আমদানি করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক এবং তাহার দিদির পক্ষে তাহা বিশ্বাস করাও হয়ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সমগ্র গ্রামবাসীর পক্ষে ইহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা সম্ভব নহে ; এবং সত্যই যে তাহারা ইহাকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে নাই তাহার প্রমাণ এই যে, গল্পটি যখন প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিল (নিশ্চয় প্রফুল্লের প্রতিবেশীদের দ্বারা) তখন তাহা রূপান্তরিত হইয়া সম্ভাব্য আকার ধারণ করিল। কিন্তু প্রশ্ন এই : গল্পটির এইরূপ রূপান্তরণ কি স্বাভাবিক ? প্রফুল্লের মৃতদেহ কেহ দেখে নাই, কেহ তাহাকে সৎকার করে নাই, অথচ তাহার প্রতিবেশীরা জানিয়া শুনিয়া একটা মিথ্যা মৃত্যুর কাহিনী তাহার শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল। কিন্তু কেন ? প্রফুল্ল গ্রামে থাকিতে তাহার মাতার মৃত্যুর পর তাহার প্রতি সহানুভূতি বুঝিতে পারা যায় ; কিন্তু যাহারা একদিন অসহায়া বিধবা প্রতিবেশিনীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, আজ গৃহত্যাগিনী (এই গৃহত্যাগের পশ্চাতে ফুলমণি ও দুর্লভ চক্রবর্ত্তীর চক্রান্তের কথা তাহারা অবগত নহে) প্রফুল্লের প্রতি তাহাদের এত কি দরদ যে এরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহা না করিয়া তাহারা একটা কল্পিত স্বাভাবিক মৃত্যুর গুজব রটনা করিল ? গৃহ-ত্যাগিনী প্রফুল্ল সম্বন্ধে কোনরূপ কুৎসা ব্রজেশ্বরের কানে পৌঁছিলে আখ্যায়িকায় জটিলতার সৃষ্টি হইত একথা সত্য ; কিন্তু এই জটিলতা এড়াইবার জন্য বঙ্কিম যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা একেবারেই সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও দু'একটি প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন। 'দেবী চৌধুরাণী'র ঐতিহাসিকত্ব বিচার করিতে যাইয়া আচার্য্য যদুনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন : 'ঐ [দেবী চৌধুরাণীর] নিরস্ত্র বজরাটা যেরূপে ইংরেজ সিপাইদের ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্রেনান্‌কে বন্দী করিল, তাহা অসম্ভব মনে হইবে কি ?' প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়া তিনি নিজেই ইহার উত্তর দিয়াছেন। 'ভারতের সত্য ইতিহাস' হইতে অনুরূপ দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, 'ডাঙ্গা ও জলের সন্ধিক্ষণে, যেমন নদীর ঘাটে শিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য বড় অসুবিধায় পড়ে, সেরূপ কুস্থানে অল্পক্ষণ দ্রুতগামী যুদ্ধে লাঠি শড়কিই বিজয়ী হয়।'[১] সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্কিমের কল্পনা এস্থলে সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করে নাই।

কিন্তু ঝড়ের সাহায্য লইয়া প্রফুল্ল যে স্বামী ও শ্বশুরকে রক্ষা করিল

১ বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণে আচার্য্য যদুনাথ লিখিত ভূমিকা, ✓০—।০ পৃঃ।

এবং আপনি রক্ষা পাইল, ঘটনার এই পরিবেশনকে ডক্টর সেনগুপ্ত উপন্যাসের ক্রটি বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি বলেন : 'বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের বুদ্ধি ও প্রকৃতির লীলার মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয়ের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক লীলা বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরেরই লীলা। প্রফুল্ল যে রক্ষা পাইয়াছে তাহার প্রধান কারণ সময়ে মেঘোদয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে চাহেন যে ইহা ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ ; যে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অনুশীলন করিয়াছে ঈশ্বর তাহার উদ্ধারের পন্থা রচনা করেন। ভগবানের কার্য্য ও তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। এই বিষয়ে মানুষের মনে যে ধারণা আছে তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, কারণ মানবহৃদয়ের নানা প্রবৃত্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উপন্যাসের মূল বিষয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মানবমনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অনুমানের বর্ণনা দেন নাই। তিনি ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মপদ্ধতির সরল, ন্যায়সঙ্গত বিবরণ দিতে চাহিয়াছেন। এই বিবরণ রূপকথা অপেক্ষাও অলীক। অবশ্য ভগবান্ সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় হইলেও প্রকৃতির লীলা আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি এবং তাহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ। তবু মনে রাখিতে হইবে প্রকৃতি জড়, আমাদের মত চেতনা তাহার নাই। সুতরাং প্রকৃতির সহিত মানবের সম্পর্ক ও সংঘর্ষ আকস্মিক ; সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্টের দমনের দিকে লক্ষ্য করিয়া ঝড় উঠে না, বৃষ্টি পড়ে না বা সূর্য্য আলো দেয় না। বরং প্রকৃতিকে নিরপেক্ষ বলিয়া মনে হয়—ভূমিকম্প ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক বিচার করে না ; ফুলের গন্ধ ও পাখীর গান সকলকেই মুগ্ধ করে। এই কারণে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক চেতনের সঙ্গে অচেতনের সম্পর্ক —জটিল ও রহস্যময়। বঙ্কিমচন্দ্র যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার মধ্যে অনির্দ্দেশ্য, অস্পষ্ট, সঙ্কেতময় কিছুই নাই। প্রকৃতি যেন পূর্ব্ব হইতেই এমনভাবে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যে প্রত্যেকপদে প্রফুল্লের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। প্রফুল্লের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যেন প্রকৃতি তাহার কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এইরূপ কল্পনা ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাসের পরিচয় দেয় কিন্তু মানবজীবনের গতিবিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রমাণ দেয় না।'[১]

যিনি ভক্ত তাঁহার 'সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত', সুতরাং তিনি দক্ষ। তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত, সুতরাং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি 'নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যেই, অতিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে' সমর্থ হন। এই সত্য গল্পের সাহায্যে পরিস্ফুট করিবার জন্যই বঙ্কিম 'সিপাহী

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ২৩৪—৩৫ পৃঃ।

হস্ত' হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধারের পরিকল্পনা করিয়াছেন, 'ধর্ম্মতত্ত্বে' তিনি নিজেই ইহা স্পষ্টতঃ বলিয়া গিয়াছেন।[১] সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ডক্টর সেনগুপ্তের অভিযোগের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য্য। 'সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ'—ইহা অনুভূতি ও বিশ্বাসের কথা। সুতরাং যুক্তিবাদীর দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্ম্মোপদেষ্টা বঙ্কিম ঘটনাটির যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, শেষ বয়সে তাঁহার চিন্তাধারার নিদর্শন হিসাবে তাহার যথেষ্ট মূল্য থাকিলেও, তিনি উপন্যাসে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন মুখ্যতঃ তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। যে কালবৈশাখীর সাহায্যে প্রফুল্ল স্বামী ও শ্বশুরের সহিত নিজের প্রাণ রক্ষা করিল তাহা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে এবং তাহাকে কোনক্রমেই প্রকৃতির পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা চলে না। এবং প্রফুল্ল এই ঝড়কে যে ভাবে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছে তাহা তাহার দক্ষতার পরিচয় দেয়, কিন্তু কোথাও সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করে নাই। সুতরাং 'প্রকৃতি যেন পূর্ব্ব হইতেই এমনভাবে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যে প্রত্যেকপদে প্রফুল্লের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। প্রফুল্লের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যেন প্রকৃতি তাহার কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে'—শুধুমাত্র উপন্যাসপাঠে এরূপ অভিযোগের কারণ নাই। বস্তুতঃ, প্রকৃতির খেয়াল যেদিন নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় দুইটি অমূল্য জীবন ধ্বংসের কারণ হইল, সেদিন সে তাঁহাদের ভাগ্য সম্বন্ধে যেমন উদাসীন ছিল, প্রফুল্ল তাহার কার্য্যকলাপ পুরাপুরি নিজের কাজে লাগাইলেও এক্ষেত্রেও প্রকৃতি তেমনই উদাসীন। এবং মানুষের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে এই যে ঔদাসীন্য, এই কারণেই 'মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক চেতনের সঙ্গে অচেতনের সম্পর্ক—জটিল ও রহস্যময়।' মনে হয় 'ধর্ম্মতত্ত্বে' বঙ্কিম যে ভাবে ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন প্রধানতঃ তাহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই ডক্টর সেনগুপ্ত প্রতিকূল মন্তব্য করিয়া থাকিবেন। তথাপি কোন সমালোচক যদি এইরূপ অভিযোগ করেন যে, অধ্যাত্মবাদের তাগিদে বঙ্কিম এস্থলে কালবৈশাখীকে আহ্বান করিয়া সুন্দর এক ট্র্যাজেডির উপাদানকে দুর্ব্বল পরিণতির দিকে টানিয়া নিয়াছেন, তাহা হইলে সে অভিযোগ নিতান্ত হাল্কাভাবে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ডক্টর সেনগুপ্তের বিরুদ্ধ সমালোচনার পরোক্ষ যৌক্তিকতা এইখানে।

ডক্টর সেনগুপ্ত প্রসঙ্গতঃ প্রফুল্লের পঞ্চবর্ষব্যাপী শিক্ষার ব্যর্থতার ইঙ্গিত

১ ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৯ ও ৯৭ পৃঃ এবং ঐ, পাদটীকা।

করিয়াছেন।[১] বস্তুতঃ, অনুশীলনতত্ত্বের উপর টিপ্পনী হিসাবে এই শিক্ষার যে মূল্যই থাকুক না কেন, ইহার দীর্ঘ বর্ণনা উপন্যাসখানিকে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত করিয়াছে এবং কাহিনীর গতি মন্থর করিয়াছে। অথচ প্রফুল্লের চরিত্রের ক্রমবিকাশের দিক দিয়া এই শিক্ষার সার্থকতা কি এবং তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উপর ইহার কতটুকু প্রভাব? ঘটনাচক্রে কেন্দ্রচ্যুত হইলেও প্রফুল্লের মন সকল অবস্থাতেই কেন্দ্রমুখী। ঠিক এই কারণেই অন্যান্য বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের বাধ্য হইলেও এক বিষয়ে সে তাঁহার অবাধ্য হইত; একাদশীর দিন প্রফুল্ল জোর করিয়া মাছ খাইত। এমন কি, যখন সে পাকা দেবী চৌধুরাণী তখনও প্রফুল্ল নিশি ঠাকুরাণীকে স্পষ্টই বলিতেছে, "সে পথ [অর্থাৎ ঘরে ফিরিবার পথ] খোলা থাকিলে আমি এ পথে আসিতাম না।" (২।৮, ৮৮ পৃঃ)। সুতরাং অবস্থা যখনই অনুকূল হইল, তখনই বাহিরের খোলসের ন্যায় রাণাগিরি ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে তাহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র গৃহাশ্রমে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল। এবং এই সময় তাহার নারীত্বই তাহার পথনির্দ্দেশ করিল এবং তাহা ভবানী ঠাকুরের শিক্ষার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। কথাটির একটুকু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। পাঠক ঠাকুর তাহাকে সর্ব্বকর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে 'ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতি-ভক্তি'—তাঁহার শিক্ষায় কোথাও এই সহজ সত্যের কোনরূপ আভাস নাই। অবশ্য পাঠক ঠাকুরের আচরণ সহজবোধ্য। তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রফুল্লকে যে ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন সেখানে গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শের উল্লেখ শুধু যে অপ্রয়োজনীয় তাহা নহে, অবাঞ্ছনীয়ও। তাঁহার অন্যতম শিষ্যা নিশি ঠাকুরাণীও প্রথম সাক্ষাতেই প্রফুল্লকে বলিতেছে, "ঈশ্বরই পরমস্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন, ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে?" (১।১৩)। তাহার এই উক্তি ভবানী ঠাকুরের শিক্ষার প্রতিধ্বনি মাত্র। এই শিক্ষা যে প্রফুল্লকেও প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই, প্রফুল্লের মুখেই তাহা শুনিতে পাই: প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে বলিতেছে, "আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম —শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা।" (৩।২, ১০৯ পৃঃ)। প্রকৃতপক্ষে, ভবানী পাঠকের শিক্ষার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়াই আমরা শেষ পর্য্যন্ত প্রফুল্লকে আদর্শ

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ২৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

গৃহলক্ষ্মীরূপে দেখিতে পাই। তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে নিয়মানুবর্ত্তিতার মাধ্যমে এবং জ্ঞানের অনুলেপ দ্বারা ইহা তাহার সহজাত গুণাবলীকে পরিমার্জ্জিত করিয়াছে।[১] কিন্তু জীবনের এক বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে অনুকূল প্রতিবেশে তাহার সহজপ্রবৃত্তি (instinct) যেমন ভবানী পাঠকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া তাহাকে কেন্দ্রস্থ করিল, তেমন বাহিরের কোন শিক্ষা লাভ না করিলেও প্রফুল্ল যে স্বভাবগুণে ব্রজেশ্বরের সংসারে শ্বশুরশাশুড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া এমন কি নয়ান বৌকেও বশে আনিতে পারিত ইহা সুনিশ্চিত। ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে আর্টের দিক দিয়া এই শিক্ষার বিস্তারিত বর্ণনার সার্থকতা কি ?

অধ্যাত্মবাদী বঙ্কিম প্রফুল্লের চরিত্রে একটি বিশেষ আদর্শ রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন। এই কারণেই এই চরিত্রটির রূপায়ণে মাঝে মাঝে শিল্পী বঙ্কিমের সহিত অধ্যাত্মবাদী বঙ্কিমের বিরোধ লক্ষিত হয় এবং এই বিরোধ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে ব্রজেশ্বরের সহিত দেবী চৌধুরাণীরূপিণী প্রফুল্লের প্রথম সাক্ষাতের চিত্রে।(২।৮)।

ব্রজেশ্বরকে তাঁহার প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিবার উদ্দেশ্যে এবং এই সূত্রে সাগরের পণরক্ষার জন্য প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরের ছিপে ডাকাতির ভান করিয়া তাঁহাকে নিজের বজরায় আনিয়া সাগরের পণরক্ষা করিল এবং কুলীন কুটুম্বের মর্য্যাদাস্বরূপ তাঁহাকে প্রয়োজনীয় অর্থসমেত রূপার কলসী দান করিল। কিন্তু এক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্ম্মসাধনাই যদি তাহার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে এইখানেই এই কাহিনীর উপর যবনিকা পড়িত। কিন্তু ইহাও সত্য যে, তাহা হইলে প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বরের চিত্র নিতান্ত বর্ণহীন হইয়া পড়িত। শিল্পী বঙ্কিম ইহাতে সম্মত হইলেন না। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি একটি ছোটখাটো রোমান্স সৃষ্টি করিলেন। ব্রজেশ্বর মোহর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে দেবী বলিল, উহা দেবতার সম্পত্তি, সে কর্জ্জ দিতেছে মাত্র। ব্রজেশ্বর যখন এই সর্ত্তে অর্থ গ্রহণ করিলেন, দেবী পুনরায় উপযুক্ত মর্য্যাদা দিবার অজুহাতে 'আপনার আঙ্গুল হইতে একটি আঙ্গটি খুলিল।' ব্রজেশ্বর হাসিমুখে হাত পাতিলেন। কিন্তু আজ দেবীর অন্তরালে বুভুক্ষু প্রফুল্ল জাগ্রত হইয়াছে; প্রফুল্ল দেবীকে 'হাতের উপর আঙ্গটি ফেলিয়া' দিতে দিল না, ব্রজেশ্বরের হাত-খানি ধরিয়া স্বহস্তে আঙ্গটি পরাইতে গেল। দেবীকে দেখিয়াই ব্রজেশ্বরের

১ শিল্পী বঙ্কিমের হাতে 'নূতন বৌ'এর ভাষার উপর এই শিক্ষার প্রভাব লক্ষণীয়: নূতন বৌ দার্শনিকের ভাষায় সাগর ও নয়ান বৌ সম্বন্ধে ব্রজেশ্বরকে বলিতেছে, "ওরাও আমি।" (৩।১৪, ১৪৮ পৃঃ)।

এক রাত্রির দেখা আর একখানি মুখ মনে পড়িয়াছিল, এক্ষণে তাহার স্পর্শে বুঝি বা সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিল। 'সেই সময়ে ফোঁটা দুই তপ্ত জল ব্রজেশ্বরের হাতের উপর পড়িল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, দেবীর মুখ চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে।' বুঝি বা সেই রাত্রে সেই ক্ষণিকের দেখা মুখখানিও এমনই চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। 'দেবীর কাঁধে হাত' রাখিয়া অপর হাতে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন, দেখিলেন 'মুখখানা প্রফুল্লের মত'; বিহ্বল ব্রজেশ্বর 'মর্য্যাদা'র বিনিময়ে সহসা তাহার 'অশ্রুনিষিক্ত বিম্বাধরে' প্রণয়ের উপহার আঁকিয়া দিলেন। এবং পর মুহূর্ত্তেই লজ্জা ও অনুশোচনায় 'ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া, একেবারে ছিপে গিয়া' উঠিলেন। আর প্রফুল্ল? ব্যর্থ তৃপ্তির জ্বালায় 'নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া' প্রফুল্ল কাঁদিতে লাগিল। আর্টের বিচারে চিত্রটি নিখুঁত। প্রফুল্লের প্রতিটি কার্য্য, বিশেষ করিয়া ব্রজেশ্বরের দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে তাহার নিষ্ক্রিয়তা জানাইয়া দেয়, তাহার পরিচয় এ নয় যে সে ভবানী পাঠকের শিষ্যা, তাহার সত্যকার পরিচয় এই যে, সে স্বামীর প্রণয়ভিখারিণী নারী। কিন্তু তাহার আচরণের সহিত নিষ্কাম কর্ম্মসাধনার সামঞ্জস্য কোথায়? এস্থলে স্বভাবতঃই কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে:

এক, প্রফুল্ল যে ব্রজেশ্বরকে পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক মূল্যের মোহর দিয়া সাহায্য করিল, ইহা কি নিছক পরহিতব্রতের নিদর্শন? দেবী চৌধুরাণী দীনদুঃখীকে সাহায্য করিয়াছে সত্য, কিন্তু অপর কোন জমিদারপুত্র তাহার নিকট অনুরূপ অর্থসাহায্য পাইয়াছে উপন্যাসে এরূপ আভাস নাই। অবশ্য, দেবী ব্রজেশ্বরকে বলিতেছে, "টাকা আমার নহে, আমার দান করিবার অধিকার নাই। টাকা দেবতার, দেবত্র আমার জিম্মা। আমি আমার দেবত্র সম্পত্তি হইতে আপনাকে এই টাকা কর্জ্জ দিতেছি।" কিন্তু দেবত্র তহবিল হইতে কখনও অপর কাহাকেও এরূপ কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে কি? এবং কর্জ্জ দেওয়াই যদি দেবীর উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমেই ব্রজেশ্বরকে সে ইহা বলিল না কেন? দেবী ত মোহরসমেত কলসী মর্য্যাদা হিসাবে দান করিয়াছিল এবং ব্রজেশ্বর প্রশ্ন না তুলিলে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন কথা উঠিত না। কর্জ্জের কথা কি তাহা হইলে দানগ্রহণে ব্রজেশ্বরের সঙ্কোচ দূর করিবার উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী-চিন্তাপ্রসূত ব্যবস্থা নহে?

দুই, নিষ্কাম কর্ম্মসাধনই যদি প্রফুল্লের জীবনের ব্রত হয়, তাহা হইলে নিজের নামাঙ্কিত যে আঙ্গটি ব্রজেশ্বর একদিন তাহাকে দান করিয়াছিলেন, বাছিয়া বাছিয়া সেই আঙ্গটিটিই সে কেন মর্য্যাদাদানের অছিলায় প্রত্যর্পণ

করিল? ব্রজেশ্বর তাহাকে বলিয়াছেন, টাকা পরিশোধ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং প্রফুল্লও সে কথায় আস্থা স্থাপন করিয়াছে; নহিলে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়াও ব্রজেশ্বরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সে নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকিত না। প্রফুল্ল বুঝিয়াছে আজিকার বিদায়ের পর সাগরের মুখে না শুনিলেও এই আঙ্গটিই ব্রজেশ্বরের নিকট তাহার পরিচয় দিবে, অথবা সাগরের মুখে পরিচয় পাইলেও আঙ্গটি তাহার উক্তির পোষকতা করিবে। সুতরাং ইহার পর নির্দ্ধারিত দিবসে যখন পুনরায় তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবে, তখন ব্রজেশ্বর দেবী চৌধুরাণীর নিকট আসিবেন না, ঋণ পরিশোধ করিতে আসিলেও আসিবেন তাঁহার পরিণীতা পত্নী প্রফুল্লের নিকট। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান নিশ্চয়ই অসঙ্গত হইবে না যে, কৌশলে আঙ্গটি প্রত্যর্পণ করিয়া দেবী চৌধুরাণী পরোক্ষে ব্রজেশ্বরের পত্নী প্রফুল্লরূপেই পুনর্ব্বার তাঁহার সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছে। ইহার কারণও প্রফুল্লের মুখেই শুনিতে পাই; সাক্ষাৎকালে প্রফুল্ল স্বামীকে বলিতেছে, "আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখনও ডাকাইতি করি নাই। কখনও ডাকাইতির এক কড়া লই নাই।....তবে জানি, লোকে আমাকে ডাকাইত বলে। কেন বলে, তাও জানি। সেই কথা তোমাকে আমার কাছে শুনিতে হইবে। সেই কথা শুনাইব বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। আজ না শুনিলে, আর শুনা হইবে না। শোন, আমি বলি।" (৩।২)। সাগরের সহিত সাক্ষাতের পর ঘটনার গতি যেদিকে চলিয়াছে তাহাতে প্রফুল্ল বুঝিয়াছে, একদিন হয়ত ব্রজেশ্বর দেবী চৌধুরাণীর প্রকৃত পরিচয় পাইবেন। সেদিন তিনি যদি ডাকাত বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করেন? এ চিন্তা তাহার অসহনীয়। মরিবার পূর্ব্বে প্রফুল্ল তাই স্বামীকে জানাইতে চাহে, দেবী চৌধুরাণী মিথ্যা, প্রফুল্ল ডাকাত নহে। কিন্তু দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের দিনেও—হয়ত ইহাই হইবে তাঁহাদের শেষ সাক্ষাৎ—তিনি যদি তাহাকে চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে উপযাচিকা হইয়া সে কেমন করিয়া নিজের পরিচয় দিবে? মনে হয় প্রফুল্ল আঙ্গটির সাহায্যে পরিচয়ের পথ সহজ করিয়া লইতে চাহিয়াছে। অন্ততঃ, প্রফুল্ল যে ব্রজেশ্বরের নিকট কলঙ্কস্খালনের জন্য উদ্‌গ্রীব এ কথা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু যিনি সর্ব্বকর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার বাসনার উর্দ্ধে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মেই তাঁহার আনন্দ, তাঁহার অপর কিছুই কাম্য নাই এবং তিনি সুখদুঃখের অতীত। প্রফুল্ল যদি পুরাপুরি সেই শিক্ষাই লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রজেশ্বরের বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিত, তিনি তাহাকে ডাকাত মনে করিলেও তাহাতে

তাহার দুঃখ বা ক্ষোভের কারণ থাকিত না।

তিনি, দেবী চৌধুরাণীর ছদ্মবেশের অন্তরালে প্রফুল্লকে ব্রজেশ্বর চিনিতে পারেন নাই, ইহা প্রফুল্ল স্পষ্টই বুঝিয়াছে। এমত অবস্থায় ব্রজেশ্বরের আত্ম-বিস্মৃতির মুহূর্তে তাহার নিষ্ক্রিয়তা কি নিষ্কাম সাধনার সাক্ষ্য দেয়?

এই প্রসঙ্গে রাণীগিরি ত্যাগ করিয়া বিদায়ের মুহূর্তে (৩।১১) রঙ্গরাজের প্রতি তাহার উপদেশবাণীও উল্লেখযোগ্য। প্রফুল্ল বলিতেছে, "আর কখনও লাঠি ধরিও না। তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ন। ঠেঙ্গা লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর করিবেন —তুমি আমি কে? শিষ্টের পালনের ভার লইও—কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও।" ভাল কথা। কিন্তু এই সত্য কি প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী যাত্রার প্রাক্কালে উপলব্ধি করিয়াছে? যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতেই যদি তাহার মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষে সে তাহাদের ডাকাতির সহায়তা করিয়াছে কেন? প্রফুল্ল নিজে কখন ডাকাতি করে নাই, এ কথা সত্য; কিন্তু দেবী চৌধুরাণীর নামের যাদু যে ভবানী পাঠকের ডাকাতের দলের মনে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে, ইহা তাহার অজানা থাকিবার কথা নহে। প্রফুল্ল ভবানী পাঠককেও বলিতেছে, "আমি আপনার কথায় এত দিন ভুলিয়াছিলাম —আর ভুলিব না। পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয় ত মহাপাতক কি? আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখিব না।" (২।১০, ৯২ পৃঃ)। কিন্তু ইহাও ব্রজেশ্বরের সহিত দেবী চৌধুরাণীর প্রথম সাক্ষাতের পরের কথা। এ অবস্থায় সহসা তাহার মতের পরিবর্ত্তন কি অর্থপূর্ণ নহে? মোট কথা, অধ্যাত্মবাদী বঙ্কিম প্রফুল্লকে নিষ্কাম সাধনার আদর্শ হিসাবে একটি বিশিষ্ট ছাঁচে ঢালিতে চাহিলেও, শিল্পী বঙ্কিমের হাতে এই বিরাট আদর্শের সহিত স্থানে স্থানে তাহার আচরণের অসঙ্গতি তাহাকে রক্তমাংসে গড়া মানবীর রূপ দিয়াছে। অবশ্য ইহাতে উপন্যাসের মূল্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

'দেবী চৌধুরাণী'র চরিত্রসৃষ্টি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর: ফুলমণি, দুর্লভচন্দ্র, বুড়াঠাকুরাণী, সাগর, নয়ান বৌ, হরবল্লভ, ব্রজেশ্বর, গোবরার মা ও রঙ্গরাজ বাস্তব চিত্র; ভবানী পাঠক ও তাঁহার শিষ্যা নিশি ও দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রে বঙ্কিমের আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ রূপায়িত হইয়াছে।

ফুলমণি ও দুর্লভচন্দ্র প্রফুল্লের ভাগ্যাকাশে অশুভ গ্রহস্বরূপ। ইহাদের চক্রান্তে প্রফুল্লের দুর্দ্দশা ও বৃদ্ধ কৃষ্ণগোবিন্দ দাসের ভগ্ন অট্টালিকায় তাহার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার পরে মুক্তকচ্ছ দুর্লভচন্দ্র ও গলাবাজিতে দুষ্টা-সরস্বতী-

রূপিণী শ্রীমতী ফুলমণির পলায়নের চিত্র[১] পাঠকের ভারাক্রান্ত মন শমিত করে। এইখানেই এই চিত্রের সার্থকতা।

ব্রহ্মঠাকুরাণী সেকালের সরলচেতা দরিদ্র গ্রাম্য বৃদ্ধা। ইঁহার আপনার বলিতে কেহ নাই ; দূরসম্পর্কীয় বড়লোক আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া, তাঁহারই গৃহে রাঁধিয়া বাড়িয়া অন্নসংস্থান করেন। কিন্তু বেতনভোগী রাঁধুনী হইতে ইনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর ; সুখে দুঃখে ব্রহ্মঠাকুরাণী রায় পরিবারেরই একজন। অবসর সময়ে চরকা কাটেন, নাতিনাত্‌বৌ : ব্রজেশ্বর ও সাগরকে লইয়া রঙ্গরস করেন, সময়ে অসময়ে সাগরের আবদারে রূপকথার ঝুলি খুলিয়া আসর জমান, সাগর হয়ত শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়ে বৃদ্ধার সেদিকে খেয়াল থাকে না, পরে যখন বুঝিতে পারেন 'শ্রোত্রী' ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন তাঁহাকে ক্ষুণ্ণমনে অর্দ্ধপথেই গল্পের সমাপ্তি করিতে হয়।

ব্রহ্মঠাকুরাণী দরদী ও সুচতুরা। প্রফুল্লের বিরহে তাঁহার হৃদয়ের ক্ষত অপর সকলের নিকট লুকাইতে পারিলেও ব্রজেশ্বর এই বৃদ্ধাকে ফাঁকি দিতে পারেন নাই (১।১৪, ৫০-৫১ পৃঃ) এবং তিনি যেদিন নূতন বৌকে লইয়া ঘরে ফিরিলেন, সেদিনও এই নূতন বৌ-এর পরিচয় ব্রহ্মঠাকুরাণীর নিকট অজ্ঞাত রহিল না এবং ইহা লইয়া তিনি ব্রজেশ্বরের সহিত একটুকু রঙ্গ করিতে ছাড়িলেন না। (৩।১৩)। একদিন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ ব্রহ্মঠাকুরাণী বাস করিতেন এবং এঁরাই ছিলেন পল্লীবাংলার এক বিশিষ্ট সম্পদ।

সাগর ও নয়ান বৌ পরস্পরবিরোধী চরিত্র : একজন পূর্ণিমা, অপর অমাবস্যা। সাগর হাস্যময়ী, সুরসিকা ও উদারচেতা ; নয়নতারা সন্দিগ্ধচেতা, ঈর্ষাপরায়ণা ও কলহপ্রিয়। সাগর সপত্নী প্রফুল্লকে সাদরে ডাকিয়া আনিয়া স্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিল ; নয়ান শ্বশুরগৃহে প্রফুল্লের স্থান নাই, একথা জানিয়া শুনিয়াও বিদায়কালে তাহাকে কঠিন আঘাত করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। নয়নতারা কুরূপা বলিয়া তাহার সপত্নীবিদ্বেষের পশ্চাতে হয়ত কিছুটা হীনতাভাব (inferiority complex) রহিয়াছে। পক্ষান্তরে সাগর স্বভাবতঃই উদারচেতা হইলেও প্রফুল্লের প্রতি তাহার অত্যধিক প্রীতি কিছুটা নয়নতারার প্রতি বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া, এরূপ মনে করিলেও হয়ত তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে না। প্রকৃতপক্ষে সাগর প্রথম দর্শনেই

[১] যাজপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে (১৮৮২ সালের ডিসেম্বর অথবা ১২৮৩ সালের জানুয়ারী) রাত্রিকালে শিবিকারোহণে অরণ্যপথ অতিক্রম করিবার সময় বঙ্কিমকে সহসা ডাকাতের দলের সম্মুখীন হইতে হয়। শচীশচন্দ্র মনে করেন, সেই সময় শিবিকাবাহকবৃন্দের "সদর্পে ...পলায়নের বৃত্তান্ত রূপান্তরিত অবস্থায় 'দেবী চৌধুরাণী'তে লিপিবদ্ধ হয়।"

বঙ্কিম-জীবনী, ১৭৭-৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রফুল্লকে স্পষ্টই বলিতেছে, "তুমি এয়েছ, যেমন করে পার, থাক। আমরা কেউ সেই কালপেঁচাটাকে দেখিতে পারি না।" (১৩, ১৪ পৃঃ)।

সাগরের নয়ানবিদ্বেষ স্বাভাবিক, কারণ কুরূপা হইলেও নয়নতারা 'ঘরণী গৃহিণী'; পক্ষান্তরে, সাগর পিত্রালয়েই বাস করে, ধনীর দুলালী কচিৎ 'কাজে কর্ম্মে' শ্বশুরবাড়ী আসে। নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া সাগর প্রফুল্লকে বলিতেছে, "আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মত—তাকে তোলা থাক্‌ব, দেবতার ভোগে কখন লাগিব না।" (১৩)। তাহার বালিকাসুলভ হাসির অন্তরালে সাগরের মনে কি যে গভীর দুঃখ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, এই একটুকু কথার ভিতর দিয়া তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। স্থানান্তরে ভিন্ন প্রতিবেশে এই বেদনার সুর আরও সুস্পষ্ট। চৌদ্দ বৎসরের বালিকা তখন পূর্ণযৌবনা। স্বামী পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, এই সংবাদে (সাগর তখনও নূতন বৌএর পরিচয় পায় নাই) তাহার মনে হইল, "হায়! বিধাতা কেন আমায় দুঃখীর মেয়ে করেন নাই—আমি কাছে থাকিতে পারিলে, তিনি হয়ত আর বিয়ে করিতেন না।" (৩।১৩, ১৪৪ পৃঃ)।

আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশের দিক দিয়া সাগরের বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। সাগরের আনুকূল্যে প্রফুল্লের 'তীর্থ' করা। আবার সাগরের নিকট প্রতিশ্রুতি-মত তাহার পিত্রালয়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া প্রফুল্ল যে জটিলতার সৃষ্টি করিল তাহারই সুমীমাংসা করিতে যাইয়া শেষ পর্যন্ত সে শ্বশুরগৃহে তাহার ন্যায্য অধিকার লাভ করিল, তাহার 'তীর্থ'-করা সার্থক হইল।

ব্যঙ্গচিত্র হইলেও গোবরার মা সম্পূর্ণ বাস্তব চরিত্র। গোবরার মা 'একটু কালা', কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণ কথা তাহার কানে না পৌঁছিলেও কোন প্রকার গালমন্দ শুনিলে তাহার 'শ্রুতি জাগরিত' হয়। ('মৃণালিনী'র বৃদ্ধ জনার্দ্দন শর্ম্মার সহিত পার্থক্য স্মরণীয়।) 'আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরস' তাহার চরিত্রের অপর বৈশিষ্ট্য। বাস্তব জগতে তাহার সমধর্ম্মীগার অভাব নাই।

হরবল্লভ বিবেকহীন, স্বার্থান্ধ ও ভীরুস্বভাব। সমাজভয়ে পুত্রবধূ প্রফুল্লের প্রতি হৃদয়হীনতা, স্বার্থলোভে উপকারিকা দেবী চৌধুরাণীর প্রতি কৃতঘ্নতা, শাসক শ্বেতাঙ্গপ্রভুর প্রতি আচরণে দাসসুলভ হীনতাভাব; পক্ষান্তরে পুত্র ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির সুযোগ লইয়া তাঁহার প্রতি আচরণে ক্ষমতার অপব্যবহার —এক কথায় হরবল্লভের প্রত্যেকটি কার্য্য স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগাইয়া তোলে। তাঁহার একমাত্র সৎকার্য্য প্রফুল্লকে পুনর্গ্রহণ, কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়াই তাঁহাকে ইহাতে সম্মত হইতে হইয়াছে এবং প্রফুল্লকেও

বাহিরে 'নূতন বৌ'রূপেই নিজের পরিচয় দিতে হইয়াছে, এমনই তাঁহার সমাজভীতি ও কর্তৃত্বাভিমান! কিন্তু এত দোষ সত্ত্বেও হরবল্লভ যে অতি সহজেই অব্যাহতি পাইলেন ইহার কারণ এই যে, তাঁহার কার্য্যের অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিলে প্রফুল্লের সহিত মিলনের দিনে ব্রজেশ্বরের সংসারে একটুকু অপূর্ণতা থাকিয়া যাইত। এবং কাব্যিক সুবিচার এরূপ ক্ষেত্রে যে শাস্তি বিধান করুক না কেন (কাব্যিক সুবিচার লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে নীতিবিদের নিচক কল্পনার সৃষ্টি), দাম্ভিক হরবল্লভকে যে শেষ পর্যন্ত 'বাগ্দী বৌ'কেই 'নূতন বৌ'রূপে ঘরে আনিতে হইল, শিল্পীর বিচারে ইহাই তাঁহার চরম পরাজয় এবং প্রকৃতির বিধানে ইহাই অলঙ্ঘনীয় প্রতিশোধবিধি।

ব্রজেশ্বর নির্ভীক ও তেজস্বী (যদিও বজরায় ডাকাত পড়িলে তাঁহার আচরণ স্থানে স্থানে অতিনাটকীয় ও অবিশ্বাস্য), ব্রজেশ্বর পরিহাসপ্রিয়। কিন্তু প্রকৃত রসবোধের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ পরিমাণবোধ; ব্রজেশ্বরের আচরণে এই পরিমাণবোধের অভাব লক্ষিত হয়। রঙ্গরাজ বজরা দখল করিলে (২।৪) তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন, "তোমাদের রাজরাণী একটা দেখবার জিনিষ শুনিয়াছি। তিনি না কি যুবতী?" এরূপ প্রশ্ন সুরুচির সীমা অতিক্রম করিয়াছে। অবশ্য দোষস্খালন না হইলেও এ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ইহা তাঁহার পারিপার্শ্বিকের কুফল; তিনি যে সমাজের লোক সে সমাজ নারীকে শ্রদ্ধা করিতে শেখে নাই। কিন্তু রঙ্গরাজ যখন উত্তর করিল, "তিনি আমাদের মা—সন্তানে মার বয়সের হিসাব রাখে না", তখন এই যোগ্য জবাব পাইয়াও তিনি যে পুনরায় মন্তব্য করিলেন, "শুনিয়াছি বড় রূপবতী", ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে স্থূল রসিকতায় তাঁহার নৈপুণ্য যাহাই হউক (সেকালের বুড়া-ঠাকুরাণীদের আসরে ইহারই আদর ছিল), ব্রজেশ্বরের চরিত্রে প্রকৃত রসবোধের অভাব রহিয়াছে।

কিন্তু ব্রজেশ্বরের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার পিতৃভক্তি।[১] ইহাই একাধারে তাঁহার মহত্ত্ব ও তাঁহার দুর্ব্বলতার উৎস। পিতৃভক্তি অতি মহৎ বৃত্তি, কিন্তু অন্যান্য বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্যের অভাবে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি তাঁহার বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। এই কারণেই ব্রজেশ্বরের দুই রূপ: যেখানে পিতার নির্দ্দিষ্ট অনুশাসন নাই, সেখানে তিনি নির্ভীক ও তেজস্বী, কিন্তু যেখানে পিতার অনুশাসন তাঁহাকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়াছে সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি পিতার হস্তের ক্রীড়নক মাত্র।

১ বঙ্কিমের পিতৃভক্তি স্মরণীয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিম-জীবনী, ১৫৯-৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্রেনানের প্রতি আচরণ (৩১৭-৮, ১২৮-৩০ পৃঃ) এতদুভয় রূপের দৃষ্টান্তস্থল। অবশ্য এস্থলে পিতার আদেশে লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্রেনানের নিকট মার্জ্জনাভিক্ষা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় দেয় এবং মার্জ্জনাভিক্ষাকালেও তিনি পুরাপুরি স্বীয় মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু পিতার আদেশ পালন করিতে যাইয়া প্রফুল্লের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুর নিষ্ক্রিয়তা কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। পিতার হুকুমে তিনি প্রফুল্লকে ত্যাগ করিয়াছেন; এবং যেদিন সে উপযাচিকা হইয়া আশ্রয়ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে সেদিনও পিতার নিষ্ঠুর আদেশবাণী শুনাইবার উদ্দেশ্যেই ব্রজেশ্বর বুদ্ধাঠাকুরাণীর নিকট তাহার সন্ধান লইয়াছেন এবং এই সময় তিনি যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে বিদ্রূপের ঝাঁজ রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা পত্নীর প্রতি করুণা বা কর্তব্যবোধের ক্ষীণতম আভাসও নাই। (১৫, ২০-২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ব্রজেশ্বরের আচরণে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহার কারণ সম্ভবতঃ প্রফুল্লের চরিত্রের মাধুর্য্য এবং বিশেষ করিয়া তাহার রূপের আকর্ষণ। এই সময় প্রফুল্লই তাঁহাকে তাহার হইয়া পিতার সহিত বিবাদ না করিতে অনুরোধ করিয়াছে। অবশ্য প্রফুল্ল কোনরূপ অনুরোধ না করিলেও ব্রজেশ্বর নিশ্চয়ই পিতার সহিত বিবাদ করিতেন না; কিন্তু বিবাদ না করিয়াও কি তিনি পিতার অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না, অন্ততঃ তিনি যে অন্যায় করিতেছেন তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারিতেন না? পিতার সহিত অশিষ্টাচরণ কোনকালেই কেহ সমর্থন করিবে না। কিন্তু পিতৃভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পিতার অন্যায়ের ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ কি একেবারেই অসম্ভব? লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্রেনানের সহিত কলহকালে ব্রজেশ্বর পিতার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি ইংরেজের গায়ে হাত তুলেছি, না ইংরেজ আমার গায়ে হাত তুলিতেছে?" কিন্তু প্রফুল্লের সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে এইরূপ নীরবতার অন্যতম কারণ তাহার সম্বন্ধে ব্রজেশ্বরের ঔদাসীন্য; কিন্তু তাহাকে চিনিবার পরেও যে তিনি নিষ্ক্রিয় রহিলেন পিতার সম্মুখে পত্নীর হইয়া ওকালতি করিতে পুত্রের স্বাভাবিক সঙ্কোচ ইহার সহজবোধ্য কারণ। কিন্তু প্রশ্ন এই: পিতৃভক্তির যূপকাষ্ঠে পত্নীকে বলি দিবার তাঁহার কোন নৈতিক অধিকার রহিয়াছে কি?

ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির জন্য স্বয়ং বঙ্কিমের তাঁহার প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। এবং যাহাকে এই পিতৃভক্তির আতিশয্যের ফল ভোগ করিতে হইয়াছে সে প্রফুল্লেরও তাঁহার প্রতি অগাধ বিশ্বাস। প্রফুল্ল যখন দেখিল, তাহাকে পুনর্গ্রহণে পিতাকে সম্মত করার দায়িত্ব ব্রজেশ্বর নিজেই গ্রহণ করিলেন,

তখন সে 'সন্তুষ্ট হইল', কারণ সে 'বুঝিয়াছিল যে, ব্রজেশ্বরের ভার বহিবার ক্ষমতা না থাকিলে, সে ভার লইবার লোক নহে।' (৩।১০, ১৪০ পৃঃ)। কিন্তু প্রফুল্লের এই বিশ্বাসের বাস্তব ভিত্তি কতটুকু? ব্রজেশ্বর যেদিন শাস্ত্রোক্ত বিধিমত প্রফুল্লকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেদিন কি ধর্ম্মতঃ তিনি তাহার ভার গ্রহণ করেন নাই? পিতৃভক্ত পুত্র পিতার আদেশে তিনবার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন (অবশ্য কুলীন পরিবারে তৎকালে বহুবিবাহ দূষণীয় বা নিন্দনীয় ছিল না), পিতার আদেশ পাইলে চতুর্থবার অপর কোন ভাগ্যবতীর পাণিপীড়নেও তাহার আপত্তি বা অসম্মতি ছিল না (২।১২, ১০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য); কিন্তু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার যে কোনরূপ চেতনাবোধ ছিল, ইংরেজচালিত পল্টন যখন দেবী চৌধুরাণীর বজরা আক্রমণ করিতে আসিল, তখন প্রফুল্লকে বিপদের মুখে ফেলিয়া আত্মরক্ষায় অসম্মতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নাই।[১] এবং এস্থলে আমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ব্রজেশ্বরের কার্য্য তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাঁহার বিবেকের রক্ষক তাঁহার পিতৃদেব এ সময় তাঁহার সম্মুখে ছিলেন না।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন, 'বঙ্কিম ব্রজেশ্বরের চরিত্রে....প্রেম ও পিতৃভক্তির একটি সুন্দর সামঞ্জস্য-সাধন করিয়াছেন।'[২] পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে ব্রজেশ্বরের আচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তির পরিপোষক। এই সময় তিনি যেমন প্রফুল্লের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত মরিতে প্রস্তুত হইলেন, তেমন তাহার পিতা গোইন্দা একথা জানিয়াও প্রফুল্লকে বলিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পিতার প্রাণরক্ষা করিতে হইবে। ইহা নিশ্চিত 'প্রেম ও পিতৃভক্তির' অতি সুন্দর সামঞ্জস্যের নিদর্শন। কিন্তু একদিনের একটি আচরণ পুঞ্জীভূত অন্যায়ের ইতিহাস মুছিয়া

১ ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিয়াছেন, যাহাতে তিনি 'দু'পয়সা রোজগার' করিতে পারেন, সেই চেষ্টা করিবেন এবং যেমন করিয়া পারেন তাহার 'ভরণপোষণ' করিবেন। (১।৬, ২৪ পৃঃ)। কিন্তু ইহা সাধু ইচ্ছা মাত্র। প্রফুল্লের মায়ের মৃত্যুর পর ব্রজেশ্বর রাত্রির অন্ধকারে তাহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাহার কুটীরে গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি যে 'দু'পয়সা রোজগারে'র কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছেন উপন্যাসে এরূপ কোন উল্লেখ নাই। অবশ্য প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাহার মায়ের মৃত্যুর মাঝখানে ব্যবধান খুব দীর্ঘ দিনের নহে। তাহা হইলেও প্রফুল্লের কথা স্মরণ করিয়া ব্রজেশ্বরের ইহার মধ্যেই তৎপর হওয়া উচিত ছিল। তা'ছাড়া 'ভরণপোষণে'র ব্যবস্থাই কি স্বামীর একমাত্র কর্ত্তব্য?

২ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (তৃতীয় সংস্করণ), ৭৯ পৃঃ।

ফেলিতে পারে না। এবং এ ক্ষেত্রে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, প্রফুল্ল বিপদের দিনে ব্রজেশ্বরের পিতার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছে এবং তাঁহার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া তাঁহারই চক্রান্তে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয় হইলেও, ব্রজেশ্বরের পক্ষে অন্যরূপ আচরণ মনুষ্যোচিত হইত না। অবশ্য ব্রজেশ্বরের সম্বন্ধে প্রফুল্লের দুর্ব্বলতা স্বাভাবিক এবং এই সময় তাঁহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া সে যে তাঁহার আশ্বাসবাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় করিবে, ইহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ব্রজেশ্বরের মাতা মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীর মনের দুর্ব্বলস্থানে আঘাত করিয়া (আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশের দিক দিয়া প্রফুল্লের শোকে ব্রজেশ্বরের কঠিন পীড়ার সার্থকতা এইখানে) তাঁহার সম্মতি আদায় না করিলে পিতৃভক্ত পুত্র কেমন করিয়া প্রতিশ্রুতি মত ভার বহন করিতেন তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন।

প্রফুল্লের প্রতি ব্রজেশ্বরের আচরণ প্রধানতঃ পিতৃভক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও, তৎকালীন সামাজিক প্রতিবেশও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করিয়াছে। ব্রজেশ্বর যে প্রতিবেশে মানুষ হইয়াছেন তাহা তাঁহাকে শিখাইয়াছে, 'মেয়েমানুষ ত পুরুষের বাঁদী।'[১] সুতরাং নিরপরাধিনী পত্নীকে ত্যাগ করার তাঁহার যে কোনরূপ নৈতিক অধিকার নাই, ইহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। প্রফুল্লের সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে ব্রজেশ্বরের ঔদাসীন্যের ইহাই প্রধান কারণ। পরে, প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নিষ্ক্রিয় হইলেও, তাঁহার বিবেকের ক্ষীণ জাগরণের পশ্চাতে রহিয়াছে ব্যক্তিগতভাবে প্রফুল্লের নিজের আকর্ষণ, পূর্ব্বেই ইহার উল্লেখ করিয়াছি। আসলে ব্রজেশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গীর মূলতঃ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এমন কি ব্রজেশ্বর যখন প্রফুল্লের মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছেন, যখন তিনি তাহার নিকট ঋণী এবং পরোক্ষে হইলেও, তাহার বিপদের জন্য দায়ী তখনও, প্রফুল্লকে বিপদের মুখে ফেলিয়া আত্ম-রক্ষায় অসম্মত হইলেও, তিনি তাহাকে বলিতেছেন, "তুমি আমার স্ত্রী— আমি তোমায় শত বার ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার স্বামী— বিপদে আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। / আমি রক্ষা করিতে পারিব না— তাই বলিয়া কি বিপদ্‌কালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?" (৩।৩, ১১২ পৃঃ)। তাঁহার এই উক্তি একদিকে যেমন তাঁহার মহত্ত্ব, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার শিক্ষার সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেয়।

ভবানী পাঠক ডাকাতের দলের সর্দ্দার এবং রঙ্গরাজ তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর।

১ এমন কি ডাকাত দেবী চৌধুরাণীর সহিত সাক্ষাৎকালেও ঠিক এই কথাই তাঁহার মনে হইয়াছে। (২।৫, ৭৩ পৃঃ)।

ইঁহাদের কার্য্যাবলী রবিন হুড্ (Robin Hood) এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রবিন হুডের ন্যায় ভবানী পাঠকের আদর্শ 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন।' এই দিক দিয়া ঐতিহাসিক ভবানী পাঠকের সহিত তাঁহার কতটা সাদৃশ্য রহিয়াছে জানি না ; তবে সে যুগের এইরূপ দু'একজন ডাকাতের কাহিনী অন্ততঃ কিংবদন্তী হিসাবে প্রচলিত আছে। অবশ্য তাঁহাদের কেহই ভবানী পাঠকের মত পণ্ডিত ছিলেন না।

নিশি ঠাকুরাণী ভবানী পাঠকের অন্যতম শিষ্যা এবং দেবী চৌধুরাণীর নিত্য সহচরী। দুঃখের দিনে প্রথম পরিচয়েই প্রফুল্ল সাগরের ন্যায় তাহাকেও আপনার বলিয়া চিনিয়াছে। এবং সাগরের ন্যায় নিশি ঠাকুরাণীও প্রফুল্লের চরিত্রবিকাশের সহায়। বিশিষ্ট বিশিষ্ট মুহূর্তে তাহাদের সংলাপ উভয়ের চরিত্রের উপর আলোকপাত করে।

নিশি নিষ্কাম ধর্মের সাধিকা, শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণ। তাহাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই, তাহার ব্রজেশ্বর ও বৈকুণ্ঠেশ্বর একই। কিন্তু ভাগ্য তাহার জন্য যে পথ নির্দ্ধারিত করিয়াছে, নারীজীবনে তাহা সত্যকার পথ নহে। নিশির জীবনের অপূর্ণতার সংবাদ সে প্রথম জানিল প্রফুল্লের সংস্পর্শে আসিয়া ; প্রফুল্লের অশ্রু মুছাইতে যাইয়া সে প্রথম বুঝিল, 'ঈশ্বরভক্তির প্রথম সোপান পতি-ভক্তি।' (১।১১)। নিশি কখনও তাহার নিজের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নাই, কিন্তু দুইটি বিশিষ্ট মুহূর্তে তাহার উক্তি তাৎপর্য্য-পূর্ণ। ব্রজেশ্বরকে বিদায় দিয়া প্রফুল্ল যখন নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, নিশি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "ওসব ব্রত মেয়ে মানুষের নহে।" (২।৮)। ইহার অব্যবহিত পরেই যদিও সে প্রফুল্লের সহিত তাহার নিজের পার্থক্যের উল্লেখ করিয়াছে তাহা হইলেও প্রশ্ন আসে ; তাহার এই উক্তি কি কেবলমাত্র প্রফুল্লের সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত, না তাহার নিজের জীবনের রিক্ততাও এ সম্বন্ধে তাহার ধারণা দৃঢ়তর করিয়াছে? ইহার উত্তর সম্বন্ধেও বঙ্কিম কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখেন নাই। প্রফুল্লের জীবনে 'সুপ্রভাতে'র সূচনায় নিশি বলিতেছে, "যেদিন আমার অবসান হইবে সেই দিনই আমি সুপ্রভাত বলিব। এ অন্ধকারের অবসান নাই। আজ বুঝিলাম, দেবী চৌধুরাণীর সুপ্রভাত—কেন না, আজ দেবী চৌধুরাণীর অবসান।" (৩।৯)। ব্যাখ্যা বা টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

প্রফুল্ল উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাহার ঘটনাবহুল জীবন যেন একখানি বিচিত্র ত্রিঅঙ্ক নাটক। প্রথম অঙ্কে দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য তাহার নিত্য সহচর। কিন্তু ইহার মধ্যেও তাহার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রফুল্লের

সবই আছে, কিন্তু ভাগ্যদোষে সে সকল সুখে বঞ্চিত, দরিদ্র বিধবা মাতার ভারস্বরূপ। উদরান্নের জন্য তাহাদিগকে প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হইতে হয়। প্রফুল্লের অভিজাত মন ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। সে আর ভিক্ষা চাহিতে যাইবে না। কিন্তু শ্বশুরগৃহে তাহার ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে। সেখানে 'অন্নের ভিক্ষা'র অপমান নাই, সেখানে 'আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইবে', তাহাতে লজ্জা নাই। প্রফুল্ল সেখানেই ভাগ্যপরীক্ষা করিবে। ইহাই তাহার শ্বশুরগৃহযাত্রার ভূমিকা।

অবজ্ঞাত হইয়া প্রফুল্ল শ্বশুরগৃহে ভিখারিণীর ন্যায় আচরণ করিল না, অথবা ন্যায্য অধিকার লইয়া কাহারও সহিত কলহ করিল না। প্রত্যাখ্যাত হইয়াও সে নুইয়া পড়িল না। শাশুড়ীর মারফত শ্বশুরের নিকট তাহার নির্ভীক প্রশ্ন (১৩, ১৫ পৃঃ) তাহার তেজস্বী মনের এবং বিদায়কালে নয়ান বৌ-এর অশিষ্ট আঘাতের সংযত উত্তর (১৬, ২৫ পৃঃ) তাহার সম্ভ্রান্ত মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দেয়। ব্রজেশ্বরের সহিত তাহার আচরণও তাহার আভিজাত্য ও আত্মমর্য্যাদাবোধের পরিচয় দেয়। প্রফুল্লকে ফিরিতে হইল, কিন্তু সে রিক্ত মনে ফিরিল না, এক রাত্রির জন্য হইলেও সে যে স্বামীর আদর পাইয়াছে, ইহাই তাহার নিঃস্ব জীবনের অমূল্য সম্পদ। এবং তাহার সুসংযত আচরণে সে যে শাশুড়ীর বিদ্রোহী মন আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও ইহাই তাহার নৈতিক জয়।

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণী। দরিদ্র পল্লীবালা এক্ষণে বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী; সমগ্র উত্তরবঙ্গের ত্রাস। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাহাকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আমি এস্থলে তাহার পঞ্চবর্ষব্যাপী শিক্ষার উল্লেখ করিতেছি না। কারণ সে শিক্ষা যতই কঠোর হউক, মায়ের সংসারে দুঃখদৈন্যের সহিত তাহার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে তাহার পর কৃচ্ছ্রসাধনের দিক দিয়া প্রফুল্লের নিকট ইহা নূতন নহে। তবে মাতৃগৃহে প্রফুল্ল ছিল দরিদ্র বিধবার কন্যা; ভবানী পাঠকের অভিভাবকত্বে শিক্ষাকালে সে রাজার সম্পদের অধিকারিণী হইয়াও সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখে বঞ্চিতা; এই হিসাবে এ শিক্ষা সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার শিক্ষা। কিন্তু ফুলমণি ও দুর্লভ চক্রবর্ত্তীর চক্রান্তে গৃহহারা হইবার পর হইতে ভবানী পাঠকের আশ্রয়লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে যে রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে অসহায় গৃহস্থকন্যার পক্ষে তাহা এক নিদারুণ পরীক্ষা এবং এই সময় প্রফুল্ল যে সাহস ও স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে তাহাতে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। তবে প্রফুল্লের এই সাহসের সহিত কিছুটা ভাগ্যহতার বেপরোয়াভাবের মিশ্রণ

রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয় এবং এই চিত্র কতটা স্বাভাবিক তাহাও প্রশ্নাতীত নহে।

প্রফুল্লের রাণীগিরি বাহিরের খোলস মাত্র। দেবী চৌধুরাণীর অন্তরালে যে শাশ্বত নারীপ্রকৃতি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, প্রসঙ্গতঃ তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে ইহার সহিত সম্পর্কিত একটি ছোটখাটো ঘটনার উল্লেখ করিব। ইহা শ্বশুরের নিকট লাঞ্ছিত ব্রজেশ্বরের সাগরের প্রতি আচরণের জের। (২।২)।

সাগর ধনীর দুলালী অপরিণতবুদ্ধি বালিকা, তাহাতে সাগর ব্রজেশ্বরের রুক্ষ আচরণে আঘাত পাইয়াছে। এ অবস্থায় রাগের মাথায় স্বামীর প্রতি সহসা কোনরূপ অসম্মানসূচক বাক্যপ্রয়োগ তাহার পক্ষে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। তথাপি "আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—" এইটুকু বলিয়াই সাগর অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছে এবং পিছন হইতে প্রফুল্ল তাহার অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত না করিলে তাহা অসমাপ্তই থাকিয়া যাইত। সাগর শেষ পর্য্যন্ত যাহা বলিল তাহা প্রফুল্লের উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র এবং প্রফুল্লের সাহায্যে অভিনব উপায়ে পণরক্ষা ইহার পরিণতি। সাগরের পণরক্ষা লঘু হাস্যের সৃষ্টি করিয়া শুধু যে স্বামীর সহিত তাহার পুনর্মিলন সহজ করিয়া দিয়াছে তাহা নহে, ইহা ভবিষ্যতে তাহাদের হাসির খোরাক যোগাইবে ইহা ভাবিয়াও সাগর নিশ্চয়ই কৌতুক অনুভব করিয়া থাকিবে। এই কারণেই নিতান্ত কৌতূহলবশতঃ প্রফুল্লের ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া সাগরের পক্ষে শুধু স্বাভাবিক নহে, লোভনীয়ও বটে।

কিন্তু এ সকল যুক্তির কতটুকু প্রফুল্লের সম্বন্ধে প্রযোজ্য? ব্রজেশ্বরের সহিত কলহকালে সাগরের পক্ষে যে উত্তেজনার কারণ রহিয়াছে, প্রফুল্লের পক্ষে সেরূপ উত্তেজনার কারণ নাই। প্রফুল্ল এই অবাঞ্ছনীয় দাম্পত্য কলহের দর্শক মাত্র এবং 'দাম্পত্য কলহে চৈব' এই প্রবাদবাক্য স্মরণ করিয়া সে ইহাকে লঘু করিয়াই দেখিয়া থাকিবে। সুতরাং কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রফুল্ল সাগরের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তাহার অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত করিয়া থাকিবে এবং পরে সাগরের পণরক্ষা উপলক্ষ্য করিয়া ব্রজেশ্বরকে তাঁহার প্রয়োজনীয় অর্থ দান (অবশ্য ব্রজেশ্বরের প্রয়োজনের কথা পূর্ব্বে জানিয়া থাকিলে প্রফুল্ল নিঃসন্দেহ পূর্ব্ব হইতেই অর্থসাহায্যের সঙ্কল্প করিয়াছিল) এবং ছদ্মবেশে হইলেও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রলোভন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ব্রজেশ্বরকে দিয়া সাগরের পা টেপান ব্যাপারে প্রফুল্ল যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া জনৈক অধ্যাপক বন্ধু একদিন

বড়ই বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত গীতগোবিন্দের বিখ্যাত শ্লোকের নজির দেখাইয়া তিনি প্রফুল্লের আচরণ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি নিতান্তই লঘুহাস্যের জিনিষ এবং এই সময় ব্রজেশ্বরকে লইয়া রঙ্গরসে প্রফুল্ল যে পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা একদিকে যেমন প্রতিকূল আবেষ্টনে তাহার চরিত্রের যে বিশিষ্ট দিক প্রকাশের সুযোগ পায় নাই তাহার সেই রঙ্গপ্রিয়তার আভাস দেয়, অন্যদিকে তেমনই তাহার হৃদয়াবেগ শনিত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তবুও ব্যাপারটিতে যদিই কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিতে হয় (মনে হয় বঙ্কিমের সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না) তাহা হইলেও বলা যাইতে পারে যে যাঁহার নীতিশাস্ত্রে মেয়েমানুষ 'পুরুষের বাঁদী', এ শিক্ষা তাঁহার অনুচিত দম্ভের যোগ্য উত্তর।

সাগরের পণরক্ষার সহিত ব্রজেশ্বরকে তাঁহার প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হইল এবং এই উপলক্ষ্যে ছদ্মবেশে হইলেও স্বামীর সহিত প্রফুল্লের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু ইহার ফলে প্রফুল্লের মনে নূতন আকাঙক্ষার সৃষ্টি হইল। স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিবেন প্রফুল্ল এমন দুরাশা পোষণ করে না, অথবা এরূপ প্রস্তাব করিয়া সে তাঁহাকে বিব্রত করিতে চাহে না। তাহার আকাঙক্ষা ক্ষুদ্র ও পরিমিত; প্রফুল্ল স্বামীকে শুধু জানাইতে চাহে, দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে লোকাপবাদ মিথ্যা, প্রফুল্ল ডাকাত নহে। তাই তাহাকে ধরিবার জন্য ইংরেজ পল্টনের সুপরিকল্পিত আয়োজনের সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণে অবগত হইয়াও প্রফুল্ল স্বামীর সহিত শেষ সাক্ষাতের আশায় নির্দ্ধারিত দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। আজ তাহার বরকন্দাজ প্রভৃতি লোকলস্কর নাই, কারণ আজ তাহার মরিবার দিন। তাহার সঙ্গে রহিয়াছে শুধু দিবা ও নিশি; তাহাদের সম্বন্ধেও সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছে, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে তাহাদিগকে তাঁহার সহিত নিরাপদ স্থানে যাইতে অনুরোধ করিবে।[১]

প্রফুল্ল স্বামীদর্শন করিবে, 'স্বামীর অনুমতি লইয়া জন্মান্তরে তাঁহাকে কামনা করিয়া প্রাণ সমর্পণ' করিবে। কিন্তু ইংরেজের সিপাহী যখন তাহাকে আক্রমণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে, তখন দেখিতে পাই প্রফুল্ল তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেও দিবা ও নিশির সহিত আধ্যাত্মিক আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং দিবা তাহাতে মাঝে মাঝে ছিটাফোঁটা হালকা রসের যোগান দিতেছে। (৩।২)। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এই চিত্র তাৎপর্য্যপূর্ণ।

১ অবশ্য স্বামীর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে ইংরেজ পল্টনের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার সময় দিবা ও নিশির নিকট এই প্রস্তাব করিলে ইহা যে অসম্ভব নিশি তাহা জানাইয়া দিয়াছে। ৩।২, ১০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুতে প্রফুল্লের ভয় নাই, সেদিক দিয়া সে নির্ব্বিকার। স্বামী আসিবেন এ বিষয়েও তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি বিলম্ব ঘটে? যদি দেখা না হয়? তাহার অন্তরের কথা তাহা হইলে এ জীবনে নিবেদন করা হইবে না, স্বামীর চক্ষে সে ডাকাতই রহিয়া যাইবে। মনের এরূপ অবস্থা কোন-ক্রমেই আধ্যাত্মিক আলোচনার অনুকূল নহে। আসলে এই সময় বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রফুল্ল মনের উত্তেজনা শমিত করিতে চাহিয়াছে এবং এই দিক দিয়া বিচার করিলে এই সংলাপ 'জুলিয়াস্ সীজারে' (Julius Caesar) গভীর রাত্রে ব্রুটাসের (Brutus) উদ্যানে ষড়যন্ত্রকারীদের মিলনকালে কোনটি ঠিক পূর্ব্বদিক সে সম্বন্ধে তাঁহাদের অতি সাধারণ সংলাপ ('Here lies the east' ইত্যাদি। Act II Sc. I.) স্মরণ করাইয়া দেয়। চরিত্রগত পার্থক্যহেতু বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকিলেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া এই উভয় সংলাপে কোন মূলগত পার্থক্য নাই।

প্রফুল্লের চরিত্রের মহত্ত্ব পূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছে ব্রজেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকালে তাহার আচরণের ভিতর দিয়া। (৩।২-৩)। ব্রজেশ্বর তাহাকে ডাকাত বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। প্রফুল্ল আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করিল না। যে কথাটি জানাইবার জন্য তাহার মন উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, প্রফুল্ল স্বামীকে শান্তভাবে তাহাই জানাইয়া দিল, জানাইয়া দিল সে ডাকাত নহে, কোনদিন ডাকাতি করে নাই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'আজ ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ডাকাইত বলিয়া এই ভর্ৎসনা করিল,....প্রফুল্লের এই উত্তর ছিল, "আমি ডাকাইত বটে—তা এখন এত ভর্ৎসনা কেন? তোমরাই ত চুরি-ডাকাইতি করিয়া খাইতে বলিয়াছিলে। আমি গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিতেছি।" এ উত্তর সম্বরণ করাই যথার্থ পুণ্য। প্রফুল্ল সে পুণ্য সঞ্চয় করিল,—সে কথা মুখে আনিল না।' প্রফুল্লের পুণ্য সঞ্চয় আমাদের আলোচনার বিষয় নহে, আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে তৎকালীন প্রতিবেশে তাহার পক্ষে অন্য কোনরূপ আচরণ সম্ভব ছিল না। প্রফুল্ল তর্কযুদ্ধে জয় চাহে নাই, চাহিয়াছে বিদায়বেলায় স্বামীর নিকট কলঙ্কস্খালন এবং নূতন যাত্রাপথের পাথেয়স্বরূপ স্বামীর আশীর্ব্বাদ।

উভয়ের মধ্যে সহজেই বোঝাপড়া হইল, কিন্তু ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লের মিলন মুহূর্ত্তকে অভিনন্দন করিবার জন্য মঙ্গল শঙ্খ বাজিল না; তাহার পরিবর্ত্তে ধ্বনিত হইল ইংরেজ ফৌজের সাঙ্কেতিক বন্দুকের আওয়াজ। প্রফুল্ল মরিতেই চাহিয়াছে, কিন্তু বিদায়ের ক্ষণে প্রফুল্ল এ কি কথা শুনিল! ব্রজেশ্বর তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন, "বাঁচিয়া, আমার ঘরে গিয়া,

আমার ঘর করিবে।......আমি তোমাকে আমার ঘরণী গৃহিণী করিব।........ আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করিব।'' তাহার দুর্ভাগ্য, প্রফুল্ল এ আহ্বানে সাড়া দিতে পারিল না, বলিল, ''হায়! একথা কাল শুনি নাই কেন?'' ক্ষুদ্র কয়েকটি কথা; কিন্তু ইহার ভিতর তাহার সমগ্র অন্তর—তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার নৈরাশ্যের বেদনা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

স্বামীকে পাইয়াও তাঁহাকে হারাইতে হইবে, তথাপি প্রফুল্লের কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নাই। এমন কি, আকাশপ্রান্তে চাহিয়া যখন আত্মরক্ষা সম্বন্ধে 'কিছু ভরসা হইল' তখনও নিজে রক্ষা পাইলে হয়ত বা শ্বশুরের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রফুল্ল নির্ভরসা হইল। তাহার শ্বশুরই যে গোইন্দা ইহাও সে স্বামীকে জানাইতে চাহে নাই; নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত ইহা জানাইতে হইল। এবং ব্রজেশ্বর যখন সকল শুনিয়া তাহাকে সর্ব্বাগ্রে পিতাকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন, প্রফুল্ল শান্তকণ্ঠে উত্তর করিল, ''সে জন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হইবে না, অতএব তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি তোমায় রক্ষা করিলে করিতে পারিবেন। তবে ইহাও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য স্বীকার করিতেছি যে, তাঁর অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিতে, আমি আত্মরক্ষার উপায় করিব না। তুমি বলিলেও করিতাম না, না বলিলেও করিতাম না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।'' বঙ্কিম নিজেই ইহার উপর চূড়ান্ত মন্তব্য করিয়াছেন: 'হরবল্লভ প্রফুল্লের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, হরবল্লভ এখন দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত। তবু দেবী তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম। যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।' (৩১৩, ১১৩ পৃঃ)। বঙ্কিমের মন্তব্যে ভাবাবেগের মিশ্রণ রহিয়াছে। হরবল্লভ তাহার যত অনিষ্ট করিয়া থাকুন, তাঁহার কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিলে স্বামীর প্রাণে আঘাত লাগিবে এই চিন্তা যে প্রফুল্লকে অন্ততঃ কিছুটা প্রভাবিত করিয়াছে, ব্রজেশ্বরের বজরায় অভিনব ডাকাতি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার আচরণ লক্ষ্য করিলে এরূপ সম্ভাবনা নাকচ করা চলে না। অবশ্য ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার মহত্ত্ব অনস্বীকার্য্য এবং নিঃসম্পর্কিত পরম শত্রু লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্রেনানের প্রতি আচরণেও তাহার মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রফুল্লের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা হইল তখনই যখন অপরের প্রাণের বিনিময়ে (প্রফুল্লের উদার দৃষ্টিতে এ সময় তাহার নিজের বর্‌কন্দাজ ও ইংরেজ সিপাহীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই) সে শুধু নিজের প্রাণ নহে, এমন কি তাহার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করিতেও অসম্মত হইল। তাহার

বিপদের সংবাদ পাইয়া ভবানী পাঠক ও রঙ্গরাজ বর্‌কন্দাজ লইয়া ইংরেজ সিপাহীদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য অগ্রসর হইলে প্রফুল্ল রঙ্গরাজকে ভর্ৎসনা করিয়া তাহার মারফত পাঠক ঠাকুরকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইল। অতঃপর নিশি যখন তাহাকে তাহার স্বামীর কথা স্মরণ করাইয়া দিল, তখনও প্রফুল্ল অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের--তাদের কে?" (৩।৪, ১১৬ পৃঃ)। অবশ্য এস্থলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিছক পরোপকারের উদ্দেশ্যে নহে, অন্ততঃ আংশিক ব্যক্তিগত তাগিদে প্রফুল্ল যখন ব্রজেশ্বরের বজরায় ডাকাতির ভান করিয়াছে তখন যাহাতে কোন খুন না হয় রঙ্গরাজকে সে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিলেও, এরূপ ক্ষেত্রে খুন যে অসম্ভব নহে, প্রফুল্লের তাহা না জানার কথা নহে এবং যদি খুন হইত তাহা হইলে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত স্বার্থেই প্রফুল্লকে তাহার নিমিত্তরূপিণী হইতে হইত। মনে হয় এক্ষণে স্বামীর ভালবাসার পরিচয় পাইয়া (৩।৩) তাহার মন এত উঁচু সুরে বাঁধা রহিয়াছে যে, তাহার দ্বারা কাহারও কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে এমন কি স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্যও সে ইহা চাহে না। কিন্তু স্বামীর ভালবাসার অনুভূতি তাহাকে পরোক্ষে প্রভাবিত করিলেও প্রফুল্লের সহজাত মহত্ত্বই তাহাকে এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং ইহাই প্রীতিবৃত্তির চরমোৎকর্ষের সার্থক নিদর্শন।

তবুও প্রফুল্লের 'দেবী চৌধুরাণী'-রূপ নিয়মের ব্যতিক্রম। এই কারণেই বঙ্কিম তাঁহার আদর্শ নারীকে শেষ পর্য্যন্ত গৃহাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এইখানেই প্রফুল্লের জীবনের তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভ। গৃহাশ্রমে প্রফুল্ল তাহার চরিত্রগুণে সকলকেই সুখী করিতে পারিবে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বঙ্কিম এই চরিত্রটিকে যে রূপ দিতে চাহিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি যাহাই বলুন, প্রফুল্লের সাধনা কেমন করিয়া নিষ্কাম হইল এবং তাহার পক্ষে 'সংসারগ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন' করা কি করিয়া সম্ভব হইল, ব্রজেশ্বরের সহিত দেবী চৌধুরাণীরূপে তাহার সাক্ষাতের পর হইতে 'নূতন বৌ'রূপে তাঁহার সংসারে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

কিন্তু অধ্যাত্মবাদী বঙ্কিম এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার আদর্শ নারীকে অবতারের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতেছেন, 'এখন এসো, প্রফুল্ল!....একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি

নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম--

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

এই প্রশস্তির মধ্যে যথেষ্ট ভাবাবেগ রহিয়াছে, কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে। প্রফুল্ল দরিদ্রকে অর্থসাহায্য করিয়াছে, কিন্তু যুগাবতার যে অর্থে পরিত্রাণ করেন তাহার তুলনায় অর্থসাহায্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং যাহারা তাহার সাহায্য লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই সাধু এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই; পরন্তু প্রফুল্ল দুষ্কৃতকারী হরবল্লভের মান ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছে এবং তাহাও নিঃস্বার্থভাবে নহে। এবং সনাতন ধর্ম্মের আদর্শানুযায়ী জীবনগঠনের চেষ্টা করিলেও তাহার দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রশ্ন অবান্তর। এস্থলে বঙ্কিমের অধ্যাত্মবাদ তাঁহার শিল্পীর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। তবে সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই মন্তব্য প্রফুল্লের চরিত্রের উপর বঙ্কিমের টিপ্পনী মাত্র এবং উপন্যাসে তাহার চরিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমের অধ্যাত্মবাদ অনুচিত প্রাধান্য লাভ করে নাই।

সীতারাম

'সীতারাম' বঙ্কিমের সর্ব্বশেষ উপন্যাস। 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্ল বঙ্কিমের দৃষ্টিতে নিষ্কাম কর্ম্মসাধনার আদর্শ। প্রফুল্ল কর্ম্মত্যাগ করে নাই, মানুষ কখনও কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। নিষ্কাম সাধনার অর্থ কর্ম্মত্যাগ নহে, কামনাহীন হইয়া নিরাসক্ত মনে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সম্পাদনই প্রকৃত নিষ্কাম সাধনা। প্রফুল্ল ইহাতে কতখানি কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহা প্রশ্নাতীত না হইলেও, ইহাই তাহার আদর্শ। ইহার একদিকে ভোগাসক্তি, অন্যদিকে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিষ্কাম সাধনার নামে কর্ম্মত্যাগের ভান বা অভিমান। ভোগাসক্তির পরিণতিতে 'দুষ্কর্ম্ম' এবং কর্ম্মত্যাগের নামে 'অকর্ম্ম' মানবজীবনে যে কত বড় বিপর্য্যয় আনিতে পারে আলোচ্য উপন্যাসে সীতারাম ও শ্রীর চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ ত গেল 'সীতারামে'র অধ্যাত্মবাদ। ইহার অপর প্রতিপাদ্য বিষয় বাঙ্গালীর বাহুবল। বঙ্কিম তাঁহার 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: 'মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, ...বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।...বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাই।'[১] রাজা সীতারাম রায় বাঙ্গালীর বাহুবল ও তেজস্বিতার অন্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে 'প্রচারে'র যে সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১২৯১) 'বাঙ্গালীর কলঙ্ক' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেই সংখ্যা হইতেই 'সীতারাম' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে।

সীতারাম, মৃণ্ময় (মেনাহাতি; ইঁহার আসল নাম রঘুরাম—'পক্ষান্তরে রামরূপ'—ঘোষ), তোরাব্ খাঁ (আবু তোরাব) ঐতিহাসিক চরিত্র। এবং দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সীতারামের 'রাজা' উপাধিপ্রাপ্তি এবং বাদশাহের অনুগ্রহে বারভূঁইয়ার উপর তাঁহার প্রভুত্বস্থাপন, নবাবের সহিত কলহ এবং যুদ্ধে জয় পরাজয় ঐতিহাসিক ঘটনা।[২] তথাপি বঙ্কিম পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহার

---

১ বিবিধ প্রবন্ধ, ৩১৪-১৫ পৃঃ।
২ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

পাঠকবর্গকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন: 'এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।' (বিজ্ঞাপন)। কিন্তু গ্রন্থের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, ইহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে প্রথিতযশা ঐতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ বঙ্কিমের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন: '...বঙ্গদেশের সত্য ইতিহাস পড়িবার পর বঙ্কিমের এই অস্বীকার-বাণী গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার 'সীতারাম' উপন্যাস হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস, ...বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক রাজার জীবনের ঘটনাগুলির ও সেই যুগের বাঙ্গলার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য; ইহার কোন স্থানেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রচণ্ড অপলাপ করেন নাই; ইতিহাসে পরিচিত কোন বিখ্যাত সাধুকে উপন্যাসের পাতায় ঠগ্ বলিয়া অঙ্কিত করিলে যে দূষিত কল্পনা হইত, সীতারামে কোথাও তাহা হয় নাই। এর উপর সেই যুগে প্রজা ও শাসকের সম্বন্ধ, দেশের দশা, যুদ্ধ-বিগ্রহ-প্রণালী বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন, অর্থাৎ উপন্যাসখানির দৃশ্যপট একেবারে সত্য।'[১]

কিন্তু বঙ্কিম সীতারামের রাজ্যধ্বংসের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস' প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, 'রমণীবর্গের সংশ্রবই যে রাজার পতনের একমাত্র কারণ, তাহা নহে। হয়ত সীতারামের পতনেরও অন্য কারণ ছিল। তাঁহার কয়েকটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল,...ইহা ভিন্ন তাঁহার উপপত্নী ছিল কিনা বা কতগুলি ছিল, তাহা বলিতে পারি না। অন্ততঃ ছিল বলিয়া পরিচয় পাই নাই। স্ত্রীলোক সংগ্রহের দিকে যে তাঁহার লালসা ছিল, রাজ্য দখল করিবার সময় তিনি কাহাকেও জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছেন বা রাজবলের অপব্যয়ে কোন পরস্ত্রীকে করায়ত্ত করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরেও বন্দী পরিবারের মধ্যে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক ছিল না। সুতরাং পঞ্চাশ বৎসরের রণক্লান্ত বীর শত যুবতীর সঙ্গে আমোদ প্রমোদে দিনক্ষয় বা দেহক্ষয় করিতেন, এমন 'রচা' গল্প আমি বিশ্বাস করি না।'[২] তাঁহার এই অবিশ্বাসের অন্যতম প্রধান কারণ সীতারামের ধর্ম্ম-প্রাণতা। এই প্রসঙ্গে তিনি 'ভক্তচূড়ামণি গোঁসাই গোরাচাঁদের উক্তি' উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, 'যে রাজা গৃহী হইয়াও বৈরাগ্য-গৌরবে রাজর্ষির মত

১ বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫১শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৫১ সাল।

২ যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৭৫-৭৬ পৃঃ।

অনাসক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া এই ভক্তের সাক্ষ্য পাইতেছি, তাঁহাকে কেমন করিয়া বিলাসী বা ঘৃণিত কামুক বলিয়া ধরিয়া লইব?'[১] কিন্তু বঙ্কিম কাহিনীর যেরূপ পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে সীতারামের সাময়িক ইন্দ্রিয়বশ্যতার সহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রাণতার কোনরূপ অসঙ্গতি নাই। দ্বিতীয়তঃ, সীতারামের ইন্দ্রিয়বশ্যতা নিছক বঙ্কিমের 'রচা গল্প' নহে; পরন্তু জনশ্রুতি ইহা সমর্থন করে, মিত্র মহাশয় নিজেই এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।[২] বঙ্কিম যখন মাগুরায় মহকুমা হাকিম ছিলেন, সেই সময় তাঁহার পক্ষে এই জনশ্রুতি শুনিয়া থাকাই স্বাভাবিক।[৩] এবং ইহাকে উপন্যাসের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া তিনি আর যাহাই হউক, ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার স্বাধীনতার কোনরূপ অপব্যবহার করেন নাই। পরন্তু সীতারামের ইন্দ্রিয়বশ্যতার পশ্চাতে যে ব্যর্থ প্রণয়কাহিনী পরিকল্পনা করিয়া বঙ্কিম ইতিহাসের (অথবা কিংবদন্তীর) শুষ্ক অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ সৃজনী-প্রতিভার সাক্ষ্য দেয়। কল্পনা শক্তির এইরূপ প্রয়োগকুশলতাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ।

সীতারাম ও শ্রীর প্রণয়কাহিনী উপন্যাসের মূল আখ্যায়িকা এবং এই কাল্পনিক কাহিনীর সহিত ঐতিহাসিক সীতারামের উত্থান পতনের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। শ্রীর অনুরোধ রক্ষা করিতে যাইয়াই ফৌজদারের সিপাহীর সহিত সীতারামের প্রথম সংঘর্ষ এবং ইহাই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার কথা। সীতারাম শ্রীর নিকট হইতেই হিন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রেরণা পাইয়াছেন এবং শ্রীকে ভুলিবার চেষ্টা হইতেই রাজ্যস্থাপনে তাঁহার আত্মনিয়োগ, অর্থাৎ যেরূপেই হউক, শ্রীকে উপলক্ষ্য করিয়াই সীতারামের জীবনের উন্নতি। আবার সন্ন্যাসিনী শ্রীর পুনরাগমনে যে অবস্থার উদ্ভব হইল তাহা হইতেই সীতারামের অধঃপতনের সূচনা। শ্রীর রূপের মোহে সীতারামের রাজ্যনাশ ক্লিওপেট্রার রূপের মোহে অ্যাণ্টনির পরাজয় কাহিনী

১ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৭৭ পৃঃ।

২ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

৩ সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন: 'যশোহর জেলায় মাগুরা মহকুমায় মহম্মদপুরে সীতারাম রাজত্ব করিতেন। বঙ্কিমবাবু কিছুকাল মাগুরার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখনই তিনি একদা সীতারামের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিবার জন্য মহম্মদপুর যান।...তিনি তথাকার ৺নাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্প-রসিক কর্ম্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক গল্পগুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন, নাইচরণবাবু ২।৩ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বেতনভুক হইয়া মাগুরায় থাকেন এবং তাঁহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন।' যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫১৪ পৃঃ পাদটীকা।

স্মরণ করাইয়া দেয় ; তফাৎ এই যে, ক্লিওপেট্রার ভূমিকা সক্রিয়, শ্রীর ভূমিকা নিষ্ক্রিয়।

সীতারাম ও শ্রীর প্রণয়কাহিনীর সহিত বঙ্কিম একটি গৌণ আখ্যায়িকা : গঙ্গারামের পঙ্কিল প্রণয়কাহিনী জুড়িয়া দিয়াছেন। এই গৌণ আখ্যায়িকা শুধু যে সীতারামের রাজনৈতিক জীবন প্রভাবিত করিয়াছে তাহা নহে, ইহা প্রকৃতপক্ষে সীতারাম ও শ্রীর প্রণয়কাহিনীর উপরেও আলোকপাত করে এবং আর্টের দিক দিয়া এইখানেই ইহার বিশিষ্ট সার্থকতা। সীতারামের প্রণয় বৈধ, গঙ্গারামের প্রণয় অবৈধ ; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই প্রণযের পরিণতি ধ্বংসে, কারণ উভয়েই অসংযতচরিত্র এবং উভযের প্রণয়ই লালসাদুষ্ট।

সমগ্র উপন্যাসখানি বঙ্কিম তিন খণ্ডে ভাগ করিয়াছেন এবং যথাক্রমে ইহাদের নাম দিয়াছেন : 'দিবা-গৃহিণী', 'সন্ধ্যা-জয়ন্তী' ও 'রাত্রি-ডাকিনী'। এই খণ্ডবিভাগ ও নামকরণ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ; ইহা উপন্যাসে শ্রীর বিভিন্ন রূপ এবং সীতারামের জীবনে তাহার প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত করে। প্রথম খণ্ডে শ্রী প্রথমে সীতারাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং পরে সে নিজেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু সীতারামের সম্মুখে অথবা তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে—সর্ব্ব অবস্থাতেই শ্রী সুগৃহিণী। গঙ্গারামকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে যাইয়া শ্রী সীতারামকে হিন্দুর প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে এবং শ্রীর অনুপস্থিতিতে তাহার সিংহবাহিনী মূর্ত্তিই তাঁহাকে রাজ্যস্থাপনের প্রেরণা যোগাইয়াছে। সীতারামের জীবনের এই অধ্যায় তাঁহার 'দিবা' এবং তাঁহার কর্ম্মশক্তির উৎস সুগৃহিণী শ্রী।

দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রী সম্পূর্ণরূপে জয়ন্তীর দ্বারা প্রভাবিত ; জয়ন্তীর মধ্যে সে আপনার স্বাধীন সত্তা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং সীতারামের সঙ্কটকালে জয়ন্তীই তাঁহার রাজ্যরক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছে, শ্রী উপলক্ষ্য মাত্র। সীতারামের জীবনে বাহিরের দৃষ্টিতে এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ই প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার জীবনের 'সন্ধ্যা', এইখানেই শ্রীর সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ-কারের গোড়াপত্তন এবং 'সিংহবাহিনী' শ্রীর বিপরীতধর্ম্মী জয়ন্তীর শিষ্যা এই শ্রী তাঁহার জীবনের অভিশাপ। সীতারামের অজ্ঞাতসারে তাঁহার জীবনে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়া আসিয়াছে এবং অজ্ঞাতসারে হইলেও জয়ন্তী ইহার নিমিত্তরূপিণী।

তৃতীয় খণ্ডে সীতারামের কীর্ত্তির অবসান, তাঁহার চারিদিকে রাত্রির ঘনান্ধকার। শ্রী শুধুই জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণায় ডাকিনী নহে, ডাকিনীর ন্যায় সত্যই সে সীতারামের মনুষ্যত্ব গ্রাস করিয়াছে।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় মনে করেন যে, 'সীতারামে'র গোড়ার দিকের কয়েকটি দৃশ্য স্কটের 'হার্ট অব্ মিড্‌লোথিয়ান্' হইতে গৃহীত হইয়াছে।[১] বস্তুতঃ উইলসন্ (Wilson) কর্ত্তৃক রবার্টসনের (Robertson) উদ্ধার এবং জনতার পরোক্ষ সাহায্যে রবার্টসনের পলায়ন এবং পরে উন্মত্ত জনতা কর্ত্তৃক ক্যাপ্টেন জন পর্‌টিয়ুসের (Captain John Porteous) হত্যার সহিত সীতারামের সাহায্যে গঙ্গারামের পলায়ন এবং বিক্ষুব্ধ জনতা কর্ত্তৃক শাহ সাহেবের মুণ্ডচ্ছেদের সাদৃশ্য এতই প্রকট যে হয়ত ইহা আকস্মিক নহে। কিন্তু স্কটের নিকট বঙ্কিমের ঋণ যাহাই হউক, এই কাহিনীর পশ্চাতে শ্রীর ভূমিকা এবং শ্রীর 'সিংহ-বাহিনী' মূর্ত্তির পরিকল্পনা বঙ্কিমের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।

শাহ সাহেবের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা হইতেই আখ্যায়িকার সূচনা। শাহ সাহেব একে শাসকগোষ্ঠীর একজন, তাহাতে স্বসম্প্রদায়ে তাহার অগাধ প্রতিপত্তি ; সুতরাং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন। নিরীহ গঙ্গারামের উপর অযথা নির্ম্মম অত্যাচার এই ব্যাধিগ্রস্ত মনোবৃত্তির পরিণাম ফল। এবং ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ফৌজদারের সিপাহীর সহিত অশিক্ষিত, অসংহত হিন্দু জনতার যে ছোটখাটো লড়াই হইল, সেইখানেই নবাবের ফৌজের সহিত হিন্দু রাজা সীতারাম রায়ের সংঘর্ষের গোড়াপত্তন। শুধু তাহাই নহে, সীতারামের রাজনৈতিক জীবনের ন্যায় তাঁহার পারিবারিক জীবনেও এই ক্ষুদ্র ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রহিয়াছে। গঙ্গারামকে উপলক্ষ্য করিয়াই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সীতারাম ও শ্রীর পুনঃসাক্ষাৎকার এবং এই সাক্ষাতের ফলেই তাঁহাদের জীবনে নূতন সমস্যার সৃষ্টি। সীতারাম ও শ্রীর প্রণয়কাহিনী এই সমস্যা ও তাহার নিদারুণ পরিণতির করুণ ইতিহাস।

শাহ সাহেব সমাজ-জীবনে দুষ্টক্ষত ; কিন্তু তাহার চরিত্র যতই কুৎসিত হউক, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে যে অনুরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন উন্মাদের অভাব হয় না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়।[২] এবং বঙ্কিম যেমন সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট শাহ সাহেবের চিত্র আঁকিয়াছেন, তেমন তাহারই পার্শ্বে আঁকিয়াছেন চাঁদ শাহ ফকিরকে[৩], যিনি তাঁহার উদার সমদৃষ্টির জন্য তোরাব্

১ "Some of the scenes in the beginning of the Sitaram are taken from Scott's The Heart of Midlothian.—Western influence in Bengali Literature, p. 317.

২ আচার্য্য যদুনাথ তৎকালীন বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

৩ পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

খাঁ ও সীতারাম উভয়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন এবং চরিত্রগুণে যিনি হিন্দু মুসলমান উভয়েরই নমস্য।

'সীতারামে' অদৃষ্টবাদের পরিবেশনে একটুকু জটিলতা রহিয়াছে। ইহার আলোচনা প্রয়োজন। শ্রীর অদৃষ্টগণনা স্বভাবতঃই 'মৃণালিনী'তে কেশবের কন্যা হৈমবতীর অদৃষ্টগণনা স্মরণ করাইয়া দেয়। হৈমবতীর পিতা কেশবের ন্যায় সীতারামের পিতা অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বিধিলিপিকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে সীতারামের সহিত শ্রীর বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। ইহা হইতেই তাঁহাদের জীবনে জটিলতার সৃষ্টি: জ্যোতির্গণনা পতিপত্নীর স্বাভাবিক মিলনের পথে যে কৃত্রিম প্রাচীর গাঁথিয়া দিল, তাহাই সীতারাম ও শ্রীর জীবনের অভিশাপ। অথচ, অদৃষ্টদেবতা অচিন্তনীয়রূপে, অপ্রত্যাশিত পথে আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, শ্রী স্বামীর জীবন নাশ করিল না সত্য, কিন্তু সহোদরের মৃত্যুর কারণ হইয়া 'প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী' হইল। ইহা বুঝিলাম। কিন্তু এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসিয়া পড়ে: গঙ্গারাম কি শ্রীর চক্ষে সীতারাম অপেক্ষা প্রিয়তর? জয়ন্তীর নিকট শিক্ষার ফলে শ্রী সীতারামের প্রতি আসক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছিল এ কথা সত্য; পক্ষান্তরে জয়ন্তীর মধ্যবর্ত্তিতায় সীতারামের নিকট গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা ও গঙ্গারামের মৃত্যুতে তাহার অশ্রু-বিসর্জ্জন হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সন্ন্যাসিনী হইয়াও শ্রী সহোদরের প্রতি স্বভাবজাত স্নেহ বিসর্জ্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় যে শ্রী স্বেচ্ছায় নিজেকে স্বামীসঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সেই শ্রীই যখন সন্ন্যাস অবলম্বনের পর চিত্তের দৃঢ়তা অর্জ্জন করিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহার অনুরোধে 'চিত্তবিশ্রামে' বাস করিতে লাগিল, তখন অনাসক্ত হইলেও সে কি সত্যই স্বামীর প্রতি প্রেমহীন হইয়াছিল? আপাতদৃষ্টিতে যাহাই মনে হউক, এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। পক্ষান্তরে, গঙ্গাধর স্বামী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও, সীতারাম তাহাকে সন্ন্যাসিনীরূপে পাইয়া সুখী হইবেন কিনা, এই চিন্তা করিয়া শ্রী যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছে (২।৮, ৬৫-৬৬ পৃঃ), ইহা হইতেই সীতারামের প্রতি তাহার অবচেতন মনের দুর্ব্বলতার আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, অদৃষ্টলিপি জানিয়া শুনিয়াও শ্রী যে এক্ষণে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করিয়াছে, ইহার কারণ এ নয় যে স্বামী আর তাহার প্রিয় নহেন, সুতরাং 'প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী' হইলেও স্বামীহন্ত্রী হইবার তাহার আর কোনরূপ আশঙ্কার কারণ নাই; তাহার সাহসের কারণ এই যে, তাহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, যিনি 'সর্ব্বকর্ত্তা' তাঁহার বিধান অলঙ্ঘনীয়, সুতরাং সে বিধানের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষুদ্র প্রয়াস সম্পূর্ণ অর্থহীন।

শ্রী এই প্রসঙ্গে জয়ন্তীকে বলিতেছে, "কে কাকে মারে বহিন্? মারিবার কর্ত্তা একজন--যে মরিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি একদিন মৃত্যুকে পাইবেন। আমি কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিব না ইহা বলাই বাহুল্য; তবে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, তিনি যদি ঠিক করিয়া থাকেন যে, আমারই হাতে তাঁহার সংসারযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, তবে কাহার সাধ্য অন্যথা করে? আমি বনে বনেই বেড়াই, আর সমুদ্রপারেই যাই, তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত হইতেই হইবে।" অর্থাৎ, তাহার দ্বারা স্বামীহত্যার আশঙ্কাকে শ্রী অস্বীকার করিতেছে না, কিন্তু বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়, এই জ্ঞানলাভের ফলে সে আর এইরূপ চিন্তা করিয়া বিচলিত হইতেছে না। অবশ্য, শ্রী এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই, একই প্রসঙ্গে সে জয়ন্তীকে আরও বলিতেছে, "আপনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মমত আচরণ করিব--তাহাতে তাঁহার বিপদ্ ঘটে, আমার তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।" তাহার এই উক্তি যে কত বড় আত্মপ্রতারণা শ্রীর পরবর্ত্তী আচরণ তাহার সাক্ষ্য দেয়।

গঙ্গারামের মুক্তির মূল্যস্বরূপ শ্রীকে যখন সীতারামের নিকট ধরা দিতে হইল, তখন তাহার আদর্শ যাহাই হউক, 'চিত্তবিশ্রামে' তাহার অনাসক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই এবং অন্ততঃ আংশিক আত্মরক্ষার জন্যই[১] যখন সে জয়ন্তীর সহিত পরামর্শ করিয়া পলায়ন করিল, তখনও পাছে তাহার অদর্শনে সীতারাম আত্মঘাতী হন, এই আশঙ্কা তাহাকে চিন্তান্বিত করিয়াছে এবং জয়ন্তীর কথায় এ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইতে না পারিলে হয়ত পলায়নও তাহার পক্ষে সহজ হইত না। ইহার পরের আচরণ আরও সুস্পষ্ট। যে সহজ প্রেমধারা সন্ন্যাসিনীর শুষ্ক তপস্যার চোরাবালিতে আত্মবিলোপ করিতে বসিয়াছিল, তাহারই দুর্নিবার আকর্ষণ পুনরায় শ্রীকে সীতারামের নিকট টানিয়া আনিল এবং সম্পদের দিনে উদাসীন থাকিলেও, বিপদের দিনে স্বামীর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া শ্রী তাঁহার নিকট আপনার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়া চাহিল, স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রী তাঁহার সহিত মরিবার সৌভাগ্য যাচ্ঞা করিল। (৩।২১, ১৪৪-৪৫ পৃঃ)। সুতরাং আকর্ষণের গতিবেগের হ্রাসবৃদ্ধি থাকিলেও, আপাত-দৃষ্টিতে তাহার নিঃস্পৃহতার মধ্যেও শ্রী কখনও সীতারামের প্রতি প্রেমশূন্য হয়

১ শ্রী জয়ন্তীকে বলিতেছে, "পলায়ন ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বলিতেছি। রাজাকে রাত্রিদিন দেখিতে দেখিতে অনেক সময়ে মনে হয় যে, আমি গৃহিণী, উঁহার ধর্ম্মপত্নী"। (৩।১৬, ১২৫ পৃঃ)।

নাই। এবং শেষ পর্য্যন্ত এই সর্ব্বজয়ী প্রেমই পথভ্রষ্ট শ্রীকে তাহার কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু তাহা হইলে বিধাতাপুরুষ শ্রীকে 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' করিতে যাইয়া তাহাকে স্বামীর মৃত্যুর কারণ না করিয়া ভ্রাতার মৃত্যুর নিমিত্তরূপিণী করিলেন কেন? এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন: 'উপন্যাসে জ্যোতিষবচনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে কিনা জানি না। ভ্রাতা ভগিনীর প্রিয়, স্বামী কি স্ত্রীর প্রিয় ছিল না? স্বামীর সহিত আলাপ পরিচয়ের পূর্ব্বে শ্রী যে মনে মনে স্বামীকে দেবতার মত পূজা করিত তাহা ত বঙ্কিমই বলিয়াছেন। সেই মনোরম প্রীতিবন্ধনকে শ্রী উচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিল। কেন? প্রীতিরই প্ররোচনায়। শ্রী প্রিয় ভ্রাতার প্রাণহন্ত্রী হইয়াছে, বঙ্কিম বুঝি পাঠককে বুঝাইতে চান, শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে, জ্যোতিষ বাক্যের অক্ষরার্থ ফলিয়াছে।'[১] কিন্তু ইহাই প্রশ্নটির সদুত্তর বলিয়া মনে হয় না; পরন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই দত্তগুপ্ত মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার মধ্যেই প্রশ্নটির সুমীমাংসার ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিতেছেন: 'কিন্তু স্বামী ত সতী স্ত্রীর কেবল প্রিয় নহে, প্রিয়তম; শ্রী প্রিয়তমের প্রাণহন্ত্রী হয় নাই বটে, কিন্তু প্রাণ অপেক্ষাও যাহা বড় তাহা হনন করিয়াছে—তার কীর্ত্তিনাশ করিয়াছে, তার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে; একটা যথার্থ মনুষ্যত্বশালী পুরুষকে পশুতে পরিণত করিয়াছে।'[২] অর্থাৎ, শ্রী গঙ্গারামের জীবননাশের নিমিত্তরূপিণী হইলেও, অদৃষ্টদেবতার উদ্যত খড়্গ্ সীতারামকেও অব্যাহতি দেয় নাই। সীতারামের পিতা অদৃষ্টদেবতার গতিবেগকে তাহার সহজ পথ ছাড়িয়া ভিন্ন পথে চালিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং শ্রী প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার এই কার্য্যের সহায় হইয়াছে, কারণ সীতারামের মঙ্গল উভয়েরই তুল্য কাম্য। কিন্তু ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, সহজ অবস্থায় অদৃষ্টদেবতা যদি সীতারামের জীবন লইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন, বাধা পাইয়া শ্রীর সাহায্যে তিনি সীতারামের প্রাণের চেয়ে বড় জিনিষ, তাঁহার মনুষ্যত্ব হনন করিলেন এবং দ্বিতীয় বলিরূপে গঙ্গারামকে গ্রহণ করিলেন। অদৃষ্টবাদী বঙ্কিম হয়ত ইহাই বলিতে চাহেন যে, অদৃষ্টের নাগপাশ হইতে উদ্ধার লাভের কোন উপায় নাই এবং ক্ষুদ্রশক্তি মানবের পক্ষে অদৃষ্টের মোড় ফিরাইবার উন্মাদ প্রয়াস শেষ পর্য্যন্ত অধিকতর বিপত্তির কারণ হয়। নিজেকে গঙ্গারামের মৃত্যুর নিমিত্তরূপিণী মনে করিয়া

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ৩৪৯-৫০ পৃঃ।

২ বঙ্কিমচন্দ্র, ৩৫০ পৃঃ।

শ্রীর উক্তিঃ "মহারাজ আমাকে বৃথা ভর্ৎসনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই--আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি।"--আংশিক সত্য হইলেও এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ সত্য নহে। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পশুপতি-মনোরমা কাহিনীর বিচার করিলে বলা যাইতে পারে যে, সহজ অবস্থায় মনোরমাকে অনুমৃতা হইতে হইলেও তাহার পক্ষে হয়ত পশুপতিকে বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। শ্রী যখন গঙ্গাধর স্বামী কর্তৃক তাহার অদৃষ্টগণনা করাইল তখন সে যে 'প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে' তিনি তাহার উল্লেখ করিলেও তাহাকে ইহাও জানাইলেন যে তাহার অদৃষ্টে 'এক পরম পুণ্য' আছে। এই পুণ্যের সময় কখন তাহা জানিবার জন্য গঙ্গাধর স্বামী শ্রীকে সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন এবং তিনি উপদেশ দিলেন যে 'সময় উপস্থিত হইলে' সে যেন 'স্বামীসন্দর্শনে' গমন করে। (১।১৩, ৪২ পৃঃ)। ইহার বৎসরেক পরে তাঁহারই নির্দেশ মত তৎপ্রদত্ত ত্রিশূলহস্তে জয়ন্তী ও শ্রী ভৈরবীবেশে সীতারামের রাজধানীতে উপস্থিত হইল। ইহাই শ্রীর অদৃষ্টে 'পরম পুণ্যে'র সময় এবং এই সময় জয়ন্তীর আনুকূল্যে সীতারামের রাজ্যরক্ষায় শ্রী যে পরোক্ষ সাহায্য করিল তাহাই তাহার জীবনে মহাপুরুষোক্ত 'পরম পুণ্য'। কিন্তু পতি-পত্নীর সাক্ষাতের ফলে পরবর্তীকালে সীতারামের যে মহৎ অকল্যাণ সাধিত হইল তাহার তুলনায় এই 'পরম পুণ্য' তুচ্ছ কথা। এমত অবস্থায় সীতারামের শুভ হইবে বলিয়াই গঙ্গাধর স্বামী যখন জয়ন্তীর মারফত শ্রীর প্রতি স্বামীসন্দর্শনের অনুজ্ঞা দিয়াছেন (২।৮, ৬৪ পৃঃ--শ্রী ও জয়ন্তীর সংলাপ দ্রষ্টব্য), তখন বুঝিতে হইবে যে, অভিরাম স্বামীর ন্যায় এই সিদ্ধ পুরুষের গণনাতেও ভবিতব্য সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে নাই। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল্য যাহাই হউক, ব্যবহারিক জগতে অদৃষ্টগণনার মূল্য কতটুকু?[১]

অদৃষ্টগণনার মাধ্যমে অতিপ্রাকৃতের আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বভাবতঃই যোগবলের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, কারণ 'চন্দ্রশেখরে'র ন্যায় আলোচ্য উপন্যাসেও গঙ্গারামের বিচারকালে তাহার স্বীকারোক্তির পশ্চাতে যোগবলের নিগূঢ় প্রভাব রহিয়াছে। অবশ্য আত্মদোষস্খালনার্থ গঙ্গারাম যখন রমার চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করিল, ঠিক সেই মুহূর্তে জয়ন্তীর আকস্মিক আবির্ভাবে বিশেষ করিয়া জয়ন্তী যখন ত্রিশূলাগ্রভাগ তাহার বক্ষে স্থাপন করিল তখন,

১ এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ৪১-৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তোরাব্ খাঁ কর্ত্তৃক মহম্মদপুর আক্রমণের পূর্ব্বরাত্রির তাহার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া 'গঙ্গারামের শরীর হঠাৎ অবসন্ন' হইয়া আসা এবং মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া তাহার পক্ষে স্বীকারোক্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অর্থাৎ যোগবলের প্রশ্ন না তুলিয়াও সমগ্র জিনিষটির প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রশ্নটির বিচারকালে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্রিশূলটি মন্ত্রপূত এবং জয়ন্তী যে ত্রিশূলাগ্রভাগ গঙ্গারামের বক্ষে স্থাপন করিয়া 'কথার মধ্যে কেবল বলিল "এখন বল"--এস্থলে "এখন বল" কথাটিও তাৎপর্য্যপূর্ণ। অর্থাৎ, বঙ্কিম ঘটনাটি যেরূপ পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে ত্রিশূল তাহার দেহ স্পর্শ করার সহিত গঙ্গারামের স্বীকারোক্তির এমন একটা নিগূঢ় যোগাযোগ রহিয়াছে যে, ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে, এস্থলে কোনরূপ প্রাকৃত ব্যাখ্যা বঙ্কিমের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু প্রশ্ন এই : যেখানে জয়ন্তীর আদেশ-বাণীই গঙ্গারামের স্বীকারোক্তির পক্ষে যথেষ্ট সেখানে আর্টের দিক দিয়া যোগশক্তিপ্রয়োগের সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা কি ?

অবশ্য ইহার অপর একটি দিক রহিয়াছে: গঙ্গারামের বিচারকালে যে জনতা বিচার দেখিতে আসিয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তীকালে জয়ন্তীর বেত্রাঘাত-দণ্ড দেখিবার জন্য উপস্থিত হইল। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই জয়ন্তীর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া যে জনতা তাহাকে দেবী বলিয়া ভ্রম করিয়াছে, তাহার শাস্তিবিধানকালে তাহাই তাহাকে রাজলক্ষ্মী বলিয়া অনুমান করিয়া লইল এবং রাজার পাপে তাঁহাকে 'ছলনা করিয়া, এক্ষণে ছল পাইয়া' তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন, জয়ন্তীর 'অন্তর্দ্ধানে' তাহার এই সংস্কার বদ্ধমূল হইল। এবং এই সংস্কারের সহিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির যোগাযোগে নাগরিকগণের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল ; ফলে মুসলমানের আগমনের পূর্ব্বেই আতঙ্ক-গ্রস্ত হইয়া তাহারা দলে দলে সীতারামের রাজ্য পরিত্যাগ করিল। ইহা মানিলাম। কিন্তু জনতার দৃষ্টিতে জয়ন্তীতে দেবীত্ব আরোপের জন্য অতি-প্রাকৃতের পরিকল্পনার কোন প্রয়োজন ছিল না ; ভৈরবীরূপিণী জয়ন্তীর আদেশমাত্র তাহাকে দণ্ডবিধায়িনী দেবীভ্রমে গঙ্গারাম যদি ভীতিবিহ্বল হইয়া স্বীকারোক্তি করিত তাহা হইলেও এই দিক দিয়া ফল একই দাঁড়াইত। 'চন্দ্রশেখরে'র ন্যায় আলোচ্য উপন্যাসেও যোগশক্তির পরিকল্পনা আর্টের বিচারে সমর্থনযোগ্য নহে। তবে ত্রিশূল মন্ত্রপূত করা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ইহার ফলে হয়ত জয়ন্তীর মনোবল বাড়িয়া থাকিবে।

'সীতারামে' জনতার চিত্র শেক্সপীয়ারের জনতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। উভয় জনতাই অশিক্ষিত ও উত্তেজনাপ্রবণ। কিন্তু শেক্সপীয়ারের

ন্যায় বঙ্কিম জনতাকে অতখানি অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই, অথবা দরিদ্র জনতার নোংরা প্রতিবেশের জন্য তাহাকে উপহাস করেন নাই। এবং শেক্সপীয়ারের জনতার ন্যায় বঙ্কিমের জনতা জানিয়া শুনিয়া রামের অপরাধে নিরপরাধী শ্যামকে হত্যা করে নাই। ('জুলিয়াস্ সীজারে' উন্মত্ত জনতা কর্তৃক কবি সিনার হত্যা স্মরণীয়)। বঙ্কিমের জনতার প্রধান দোষ মর্য্যাদানুভূতি ও ঔচিত্যানৌচিত্য বোধের অভাব। এই কারণেই বিরাট শক্তি সত্ত্বেও বাহির হইতে প্রেরণা না পাইলে ইহা কর্ম্মক্ষেত্রে একেবারেই পঙ্গু ও শক্তিহীন। সীতারাম ও চন্দ্রচূড় ঠাকুরের নির্দ্দেশমত যাহারা মাঠে উপস্থিত হইয়াছে তাহাদিগকে বাদ দিলে জনতার এক বৃহৎ অংশ গঙ্গারামের জীবন্ত কবর দেখিতে আসিয়াছে। বিচারের নামে এই যে নগ্ন বীভৎসতা, ইহা কাহারও মর্ম্মস্পর্শ করে নাই; গঙ্গারামের জীবন্ত কবর ইহাদের দৃষ্টিতে তামাসা মাত্র। অথচ 'সিংহবাহিনী' শ্রীর কণ্ঠের প্রেরণা পাইয়া ইহাদেরই অনেকে সীতারামের লাঠিয়ালদের সহিত মিলিয়া মুসলমান সিপাহীদিগকে বিপর্য্যস্ত করিল এবং শাহ সাহেবের নির্ম্মম অত্যাচারের যথাযোগ্য শাস্তিবিধান করিল। জয়ন্তীর লাঞ্ছনার সময়েও দেখিতে পাই সম্মিলিত জনতা তাহাকে 'জয় লছ্‌মী মায়িকি জয়' বলিয়া সম্বর্দ্ধিত করিলেও, এই জনতা তাহার বেত্রাঘাতদণ্ড দেখিবার জন্যই জড় হইয়াছিল এবং রাজাজ্ঞায় দুর্ব্বৃত্ত কসাই যখন তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিল তখন নারীত্বের এই চরম লাঞ্ছনাকালে 'সমস্ত জনমণ্ডলী এক-কণ্ঠে হাহাকার' করিয়া উঠিলেও ইহাদের কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল না। জনতার প্রাণে কর্ম্মের প্রেরণা জাগাইবার জন্য এস্থলে নন্দার প্রয়োজন হইল; নন্দার একটি কথায় নিষ্ক্রিয় জনতা কর্ম্মশক্তি পাইল এবং মুহূর্ত্তে রাজশক্তি অগ্রাহ্য করিয়া কসাইকে প্রহার করিতে করিতে দুর্গের বাহির করিয়া দিল। (৩।১৮)।

উপন্যাসের অন্যান্য ছোট বড় প্রত্যেকটি চরিত্রের আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশে সুনির্দ্দিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে, কিন্তু রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ বাহিরের দর্শক মাত্র। দর্শক হিসাবে ইহারা মোহাবিষ্ট সীতারামের উপর সন্ন্যাসিনী শ্রীর প্রভাব এবং রাজ্যশাসনে ইহার প্রতিক্রিয়া এবং সহসা শ্রীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে জনগণের মতামত ব্যক্ত করিয়াছে। ইহাদের সংলাপের ভিতর দিয়া সীতারামের কুশাসনে তাঁহার রাজ্য কিরূপে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই হিসাবে ইহারা কতকটা গ্রীক নাটকের কোরাসের সমশ্রেণীয়।

এবং এই বন্ধুযুগলকে উপলক্ষ্য করিয়া উপন্যাসের 'পরিশিষ্ট' নিরর্থক

নহে। বঙ্কিমের যুগে সীতারামের মৃত্যু সম্বন্ধে দুইটি কাহিনী প্রচলিত ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন যে, নবাব সীতারাম ও তাঁহার অনুচরবর্গকে বন্দী করিয়া তাঁহাদিগকে শূলে চড়াইয়া হত্যা করেন এবং সীতারামের অন্তঃপুরস্থ নারী ও শিশুদিগকে দাসদাসীরূপে বিক্রয় করেন। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব (J. Westland) এই কাহিনী অবিশ্বাস করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, ষ্টুয়ার্ট এস্থলে যে কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহাতে সীতারামকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সত্যকে বিকৃত করা হইয়াছে। তাঁহার মতে সীতারাম বন্দী অবস্থায় অপমানজনক মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আত্মহত্যা করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করেন।[১] রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের সংলাপে এই উভয় কাহিনীর এবং সেই সঙ্গে উপন্যাসের কল্পিত কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে এবং এই সংলাপ এক হিসাবে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কাহিনীর উপর পরোক্ষ টিপ্পনী। বঙ্কিমের কাহিনী না হয় 'রচা কথা, উপন্যাস মাত্র'; কিন্তু সহানুভূতির তারতম্য হেতু তথাকথিত ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিতে যেরূপ বৈষম্য লক্ষিত হয় তাহাতে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসের উপাদানের মূল্যই বা কতটুকু? শ্যামচাঁদ বলিতেছে, "এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি?" নিরপেক্ষ পাঠক বলিবেন, দুই-ই উপন্যাস। তফাৎ এই যে, একটিকে ইতিহাস বলিয়া দাবী করা হইয়াছে, অপরটি সম্পর্কে কেহ সেরূপ দাবী উত্থাপন করে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদকে মহম্মদপুরের সাধারণ নাগরিকের প্রতীক বলিয়া ধরিয়া লইলে হয়ত কোনরূপ ভুল করা হইবে না। মহম্মদপুর ধ্বংস হইয়া গেল, আর ইহারা নলডাঙ্গায় পলাইয়া 'আপনার, আপনার প্রাণ নিয়ে' যে বাঁচিয়া রহিয়াছে, ইহাতেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া তামাকু সেবন করিতেছে! সীতারামের রাজ্যধ্বংসের কারণ যাহাই হউক, এইরূপ নাগরিক লইয়া রাজ্যস্থাপনের পরিকল্পনা কি নিতান্তই অলীক স্বপ্ন নহে?

অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে মুরলা ও যমুনা উভয়েই উল্লেখযোগ্য। মুরলা সুচতুরা এবং বিবেকবর্জ্জিতা; বাস্তবজগতে তাহার সমধর্ম্মীয়ার অভাব নাই। যমুনা একটুকু স্বতন্ত্র প্রকৃতির; যমুনা বিবেককে অস্বীকার করে নাই, কিন্তু রমার ঔষধ ক্রয় করার প্রস্তাবে সে তাহার বিষয়বুদ্ধি ও বিবেকের মধ্যে যেরূপে নিজের স্বার্থের অনুকূলে একটা কাজচলা-গোছের সমন্বয় করিয়া লইল (৩।১১, ১১২-১৩ পৃঃ) তাহা সত্যই কৌতুকাবহ।

১ আধুনিক যুগে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই উভয় কাহিনীই অবিশ্বাস করিয়াছেন। পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

রমার চিকিৎসা ব্যাপারে বঙ্কিম প্রাচীন কবিরাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপন্যাস ও নাট্যসাহিত্যে আমরা সচরাচর দেশীয় কবিরাজের যে চিত্র পাই তাহা প্রধানতঃ ব্যঙ্গচিত্র; বঙ্কিমের কবিরাজ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং আত্মশক্তিতে প্রত্যয়শীল। এই চিত্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, তথা প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি বঙ্কিমের গভীর শ্রদ্ধার অন্যতম নিদর্শন। একই প্রসঙ্গে উদয়গিরি ও ললিতাগিরির স্থাপত্যের বর্ণনা এবং প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্য স্মরণীয়। (১।১৩, ৩৯-৪০ পৃঃ)।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার[১] সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'আমরা আজিকার দিনেও এমন দুই একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, টোলে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড় সেই শ্রেণীর লোক।' কিন্তু ইহাও চন্দ্রচূড়ের সম্যক পরিচয় নহে। যেমন গঙ্গারামকে রক্ষা করার ব্যাপারে দাঙ্গা-হাঙ্গামায়, তেমনই রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ও রাজ্যশাসনে চন্দ্রচূড় সীতারামের দক্ষিণহস্ত। চন্দ্রচূড় কূটনীতি-বিশারদ; গঙ্গারাম বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে তাঁহার কূটনীতির নিকট তোরাব্ খাঁকে নিশ্চিত পরাজয় স্বীকার করিতে হইত।

গঙ্গারাম বিপরীতধর্ম্মী চরিত্র। চন্দ্রচূড়ের মনে কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন ওঠে নাই, জাতির কল্যাণ তাঁহার একমাত্র কাম্য। চন্দ্রচূড় নিজের কল্যাণ চাহেন নাই; তিনি সীতারামের কল্যাণ চাহিয়াছেন, কারণ সীতারাম জাতির ভরসাস্থল, তাঁহার কল্যাণে জাতির কল্যাণ। পক্ষান্তরে, গঙ্গারাম জাতিকে জানে না, উপকারককে চেনে না; তাহার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি তাহার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য স্বার্থচিন্তা মানব মনের মৌলিক বৃত্তি, কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তাবলে মানুষ এই সহজাত বৃত্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে। গঙ্গারামের চরিত্রে এই দৃঢ়তার একান্ত অভাব। এই কারণেই নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকিলেও কর্ত্তব্যবুদ্ধি কোন ক্ষেত্রেই তাহার কার্য্যের প্রেরণা যোগায় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে গঙ্গারাম সম্পূর্ণ-রূপে প্রবৃত্তির দাস।

সীতারাম যখন কাজি সাহেবের নিকট নিজের জীবনের বিনিময়ে গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন (১।৪), ইহার জবাবস্বরূপ গঙ্গারামের উক্তি

১ আচার্য্য যদুনাথ মনে করেন, 'তাঁহার [সীতারামের] দেওয়ান যদুনাথ গাঙ্গুলী (উপাধি মজুমদার) বোধ হয় বঙ্কিমের চন্দ্রচূড় হইবেন।'
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫১ (৫১শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা), ৮৮ পৃঃ।

যতই মহৎ হউক, তাহা তাহার মহত্ত্বের পরিচয় দেয় না। প্রথমতঃ, গঙ্গারামের কথার সহিত তাহার কার্য্যের কোনরূপ সঙ্গতি নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহা কি স্বতঃপ্রণোদিত উক্তি, না শিখানো বুলি? সীতারাম সম্ভব হইলে হাঙ্গামা এড়াইতে চাহিয়াছেন। এই কারণেই তিনি গঙ্গারামের মুক্তির মূল্যস্বরূপ দশহাজার আসরফি দিতে চাহিয়াছেন! কিন্তু কাজি সাহেব যদি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, সে ক্ষেত্রে সীতারাম হাঙ্গামার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন। এবং তাঁহার শেষ প্রস্তাব (নিজের জীবনের বিনিময়ে গঙ্গা-রামের প্রাণভিক্ষা) প্রকৃতপক্ষে উদারতার আবরণে ঘটনার গতি হাঙ্গামার দিকেই অগ্রসর করিয়াছে। মনে হয় ইহা পূর্ব্ব-পরিকল্পিত। সীতারাম যতই মহৎ হউন, তিনি মরিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হন নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার প্রস্তাবের সূত্র ধরিয়া গঙ্গারামের উক্তির শেষ অংশ: 'এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব' এবং ভীড়ের মধ্য হইতে ইহার উপর চন্দ্রচূড় ঠাকুরের মন্তব্য: 'হাতকড়ি মাথায় মারিয়াই মর। মুসলমানের হাত এড়াইবে।'—বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একযোগে দেখিলে সীতারামের শেষ প্রস্তাব হইতে আরম্ভ করিয়া কামার কর্ত্তৃক গঙ্গারামের বেড়ি-মুক্তি ও তাহার পলায়ন পর্য্যন্ত সমগ্র জিনিষটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত করে। এইরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, গঙ্গারামের বিচার শেষ করিয়া যখন তাহাকে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া কারাগারে পাঠান হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে এবং শ্রীর নিকট হইতে সীতারাম এই সংবাদ পাইলেন আরও পরে। পর দিবস প্রত্যুষেই গঙ্গারামের 'জীয়ন্তে কবরে'র ব্যবস্থা। এই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে তাহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া যথাযথ নির্দ্দেশ দেওয়া কি সম্ভব? কিন্তু সীতারামের মত বিত্তশালী ও প্রতিপত্তি-শালী লোকের পক্ষে চতুর চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সহায়তায় ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়ও মনে করেন, 'কামারকে ঘুষ দিয়া গঙ্গারামের হাত-পা বেড়ি-মুক্ত করিয়া লওয়াতে গঙ্গারামের সহিত পূর্ব্ব-পরামর্শের একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।' কিন্তু তাঁহার মতে 'গঙ্গারাম যে এরূপ অতর্কিতভাবে ও অপরকে বিপদে ফেলিয়া নিজ পলায়নের উপায় নিজেই করিয়া লইবে, কোন উপদেশের অপেক্ষা রাখিবে না, ইহার জন্য বোধ হয় কেহই প্রস্তুত ছিলেন না।'[১] কিন্তু 'অতর্কিতভাবে' প্রথম সুযোগ গ্রহণ না করিয়া উপদেশের

১ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (তৃতীয় সংস্করণ), ৮৮ পৃঃ।

অপেক্ষায় থাকিলে পলায়ন সহজ হইত কি? গঙ্গারামের প্রতি কোনরূপ গোপন নির্দেশ থাকিয়া থাকিলে অনুকূল মুহূর্তে 'অতর্কিতভাবে' পলায়নের নির্দেশই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে, পুনরায় তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে গঙ্গারামের প্রতি সীতারামের আচরণ হইতে মনে হয় তিনি তাহার কার্য্যে রুষ্ট হন নাই, বরং সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল। তাহা হইলেও আত্মরক্ষার তাগিদে এই যে বেপরোয়াভাবে পলায়ন গঙ্গারামের পরবর্ত্তী কার্য্যাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখিলে এইখানেই আমরা তাহার চরিত্রের মৌলিক দুর্ব্বলতার প্রথম পরিচয় পাই।

রমার আহ্বানে গঙ্গারাম যখন রাত্রিকালে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল (২।৫), তখন তাহার কার্য্য যতই গর্হিত হউক, তাহার আচরণে প্রভুভক্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। বালিকা রমা যখন পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর হইয়া মুসলমানের নিকট নগর ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিল, 'গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল' এবং রমার দুর্ব্বলতা কোথায় জানিতে পারিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় লইল। কিন্তু প্রবৃত্তির বাত্যাতাড়নায় কর্ত্তব্যের ক্ষীণ দীপশিখা সহজেই নিবিয়া গেল, রমার রূপের মোহে গঙ্গারাম সীতারামের প্রতি কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইল এবং নগররক্ষকের কর্ত্তব্য ভুলিয়া হীন সর্ত্তে মুসলমানের নিকট রাজ্য সঁপিয়া দিবার গোপন ব্যবস্থা করিল। (২।১০)। বিচারকালেও গঙ্গারাম নিজেকে বাঁচাইবার জন্য রমার চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিল না। এবং শেষ পর্য্যন্ত যখন তাহাকে পূর্ব্বাপর দোষ স্বীকার করিতে হইল, তখনও এই স্বীকারোক্তির পশ্চাতে রহিয়াছে জয়ন্তীর ভীতি ও যোগশক্তির ক্রিয়া। এমন কি, কারাগারে যখন সে নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল (৩।৫), তখনও মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিতে দেখি না। গঙ্গারামের 'মনের মধ্যে কেবল দুটি ভাব....—ভৈরবীকে ভয় আর রমার উপর রাগ।' অনুশোচনা দূরে থাকুক, গঙ্গারামের চিন্তা কি উপায়ে মরিবার আগে রমার সর্ব্বনাশ করিয়া মরিতে পারিবে।' শ্রীর কথা মনে আসিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা স্বার্থ চিন্তা করিয়া। শ্রী বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাহার চেষ্টায় এ যাত্রাও রক্ষা পাইতে পারিত—ইহার অধিক শ্রীর কোন প্রয়োজন নাই।

গঙ্গারাম পুরাপুরি আত্মকেন্দ্রিক। শেষ যুদ্ধকালে শ্রী যখন কামানের মুখে বুক পাতিয়া দিল তখন গঙ্গারামের বিমূঢ়ভাব তাহার মৃত্যুর কারণ হইলেও এই সময় সে শ্রীকে চিনিতে পারে নাই; সন্ন্যাসিনীদ্বয়কে দেখিয়া অতীতের

স্মৃতি জাগরূক হওয়ায় সে 'হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল।' তাহার আচরণ ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমের পরিচয় দেয়, ইহাতে ভালবাসার নিদর্শন নাই।

'দেবী চৌধুরাণী'তে ব্রজেশ্বরের ন্যায় সীতারামের তিন পত্নী[১]: শ্রী, নন্দা ও রমা। নন্দা ও রমার কর্ম্মের পরিধি মুখ্যতঃ রাজ-অন্তঃপুরমধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাহারা উভয়েই বাস্তব চিত্র। কিন্তু শ্রীর অদৃষ্টদেবতা তাহাকে গৃহহীন ও আশ্রয়চ্যুত করিয়া অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাহাকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিল; সীতারামের মহিষীর যোগ্য সহজাত গুণের অধিকারিণী হইয়াও শ্রী সন্ন্যাসিনী হইল। শ্রী নন্দা ও রমা হইতে স্বতন্ত্র পর্য্যায়ের এবং শ্রীকে কেন্দ্র করিয়াই উপন্যাসের অধ্যাত্মবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

নন্দা ও রমার মধ্যে নন্দা বয়োজ্যেষ্ঠা—ধীর, স্থির ও গম্ভীরপ্রকৃতি। নন্দা আপনার কর্ত্তব্যের গণ্ডির মধ্যে আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহে। সীতারামের প্রতি তাহার অগাধ বিশ্বাস; 'রাজার কাজ রাজাই বুঝেন', সেখানে সে অনধিকার চর্চ্চা করিতে চাহে না। কিন্তু নিজের সীমাবদ্ধ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। দিল্লী গমনকালে সীতারাম তাহার উপর অন্তঃপুরের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে মুহূর্ত্তের জন্যও নন্দা এ কথা বিস্মৃত হয় নাই। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় রমা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলে নন্দা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, তাহাকে 'অন্যমনা করিবার জন্য' তাহার সহিত পাশা খেলিয়াছে, খেলায় ইচ্ছা করিয়া হার মানিয়াছে। (২।২)। মুসলমান ফৌজ নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে এই সংবাদে রমা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পুরস্ত্রী যখন সন্ত্রস্ত, একা নন্দা তখন ভয়শূন্য। নন্দা তখন পুরস্ত্রীদের সান্ত্বনা দিয়াছে, রমা ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইলে তাহার সেবা করিয়াছে। রমার সম্বন্ধে তাহার চিন্তার ধারা এইরূপ: 'সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি--কিন্তু প্রভু যখন আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে হইবে।' (২।৩)।

কতকটা একই কারণে, কতকটা রাজার অপমানে নিজের অপমান এই অনুভূতির ফলে রমার কলঙ্কের কথা শুনিয়া নন্দা তাহাকে বুঝাইল, "এখন আমাকে সতীন ভাবিস্ না—কালি চূন তোর গালে পড়ুক না পড়ুক, রাজারই বড় মাথা হেঁট হয়েছে। তিনি তোরও প্রভু—আমারও প্রভু, এ লজ্জা আমার চেয়ে তোর যে বেশী, তা মনে করিস্ না। আর মহারাজা আমাকে

১ ইহা ইতিহাসসম্মত। পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য।

অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁর কানে এ কথা উঠিলে আমি কি জবাব দিব ?" ইহা ভূমিকা মাত্র। নন্দা পাকা গৃহিণীর মত কাজ করিল ; আগে রমাকে বুঝাইয়া, পরে স্বামীকে বলিয়া দরবারের ব্যবস্থা করিয়া (৩।১) রমার সম্মানের সহিত নিজের ও রাজার সম্মান রক্ষা করিল। নন্দার প্রতিটি কার্য্য তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ আত্মমর্য্যাদাবোধের পরিচয় দেয়। এবং শেষোক্ত স্থলে প্রধানতঃ আত্মমর্য্যাদাবোধই তাহাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু নন্দা স্বীকার করুক বা না করুক, রমার জন্য সে যাহা করিয়াছে তাহা যে নিছক কর্ত্তব্যের প্রেরণায় করিয়াছে তাহা নহে। রমার প্রতি তাহার স্নেহ থাকুক বা না থাকুক, অন্ততঃ করুণার অভাব নাই। রমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া যখন সে তাহার শেষ বাসনা পূর্ণ করিল (৩।১২), তখন একমাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধিই তাহার কার্য্যের প্রেরণা যোগায় নাই, তাহার কার্য্যের পশ্চাতে রহিয়াছে কর্ত্তব্যবোধের সহিত অনুকম্পার মিশ্রণ। বস্তুতঃ, নন্দা মুখে যাহাই বলুক, সে কখনও এই স্বল্পপ্রাণ, কুসুম-কোমল বালিকাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে ভাবিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে, রাজপরিবারের কল্যাণ চিন্তা করিয়া নন্দা নিজের প্রতি স্বামীর অবহেলা নীরবে সহ্য করিলেও[১], স্বামীর অবহেলায় রমার মৃত্যু তাহার পক্ষে অসহনীয় হইল এবং জীবনে সেই প্রথম আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বামীকে সে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিল, তিনিই রমার মৃত্যুর কারণ। (৩।১৩, ২১৭ পৃঃ)। অবশ্য রমার মৃত্যুই নন্দার রাগের একমাত্র কারণ নহে, তাহার রাগ অভিযোগ-পরম্পরার মিলিত প্রতিক্রিয়া। তাহা হইলেও রমার মৃত্যু যে বারুদের স্তূপের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কাজ করিয়াছে, আমাদের আলোচনার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

নন্দার সহজ কর্ম্মক্ষেত্র রাজঅন্তঃপুরে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে রাজার ও রাজ্যের কল্যাণে বাহিরের জগতেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে জানে। রাজার অত্যাচার হইতে জয়ন্তীর উদ্ধার (৩।১৪) ইহার সাক্ষ্য দেয়। এই সময় অতিবড় উত্তেজনার মধ্যেও নন্দার আচরণ শান্ত, সংযত ও মহিমান্বিত। সভাস্থলে রাজাকে ভর্ৎসনা করিতে যাইয়া সে কোনরূপ বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি

১ এ সম্পর্কে বঙ্কিম লিখিয়াছেন : 'নন্দা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, কিছুতেই সে সীতারামের উপর রাগ করিবে না। ভাবিল, রাজাকে ত ডাকিনীতে পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাই ব'লে আমায় যেন ভূতে না পায়। আমার ঘাড়ে রাগ ভূত চাপিলে—এ সংসার এখন আর রাখিবে কে ?' ৩।১২, ২১৪-১৫ পৃঃ।

করিল না। এমন কি, ক্রুদ্ধ রাজা যখন তাহাকে অন্তঃপুরে যাইতে আদেশ করিলেন, নন্দা সে কথার কোনরূপ উত্তর দিল না, উত্তর না দিয়া রাজার আত্মসম্মানজ্ঞান জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে বলিল, "মহারাজ! আমি যে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াছি, এই কসাইটা সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া থাকে কোন্ সাহসে? উহাকে নামিতে আজ্ঞা দিন।" ইহাতেও যখন সীতারামের চৈতন্যোদয় হইল না, তখন সম্মিলিত জনতার উদ্দেশ্যে নন্দা বলিল, "এই রাজপুরীমধ্যে আমার কি এমন কেহ নাই যে, এটাকে নামাইয়া দেয়?" সীতারামের আত্মসম্মান উদ্বুদ্ধ না হইলেও জনতা এ আহ্বানে সাড়া দিল। তারপর—বিজয়িনী নন্দা জয়ন্তীর নিকট রাজ্যের কল্যাণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া তাহাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিল। সীতারাম 'সিংহবাহিনী' খুঁজিয়াছিলেন; তিনি মোহান্ধ, তাই তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার অন্তঃপুরে যে জগদ্ধাত্রী বিরাজ করেন, স্বেচ্ছায় তাহার বাহনটিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিলেও, তিনি সিংহবাহিনী।

নন্দার পতিভক্তি, তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, আত্মমর্য্যাদাবোধ ও তেজস্বিতা—এক কথায় যাহা কিছু তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সে সকলই সীতারামের চরম দুর্ভাগ্যের দিনে, যেদিন নিজহাতে-গড়া রাজ্য মুসলমানের হাতে সঁপিয়া দিয়া তাঁহাকে স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ নিরুদ্দেশযাত্রা করিতে হইল, সেদিনের সঙ্কটকালে তাহার আচরণে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। (৩।২১)। রাজধানীতে রাজকর্ম্মচারী নাই, নাগরিক নাই, রাজ-অন্তঃপুর আত্মীয়স্বজন-শূন্য—একা নন্দা তাহার পুত্রকন্যা ও রমার পুত্রকে লইয়া সেই অন্ধকার পুরী আগুলাইয়া রহিয়াছে। সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দা! এত লোক পলাইল—তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত।" নন্দা উত্তর করিল, "তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ? তোমার পুত্রকন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্য। আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইব?" আজীবন পতির মঙ্গল যাহার ধ্যান, রাজপুরীর কল্যাণ যাহার কামনা, রাজার সম্মান যাহার লক্ষ্য, এ উত্তর তাহার কণ্ঠের উপযুক্ত। রমা সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় নগররক্ষককে আহ্বান করিয়া মুসলমানের নিকট গোপনে কেল্লাসমর্পণের প্রস্তাব করিয়াছিল এবং এই সময় তাহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, মহারাজ সুদূর দিল্লীতে নিরাপদ স্থানে রহিয়াছেন। নন্দার চিন্তা ভিন্নমুখী। চরম পরীক্ষার মুহূর্ত্তে নন্দা সীতারামকে বলিতেছে, "মহারাজ, রাজার ঔরসে

ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ্ বিপদ্ উভয়ই আছে—তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে, আমার সেই বড় ভাবনা।" নন্দার শেষ সান্ত্বনা, স্বামী কাপুরুষের ন্যায় শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন না। বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যাকে শত্রুহস্তে বন্দী হইবার চরম দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করিলেন।

রমা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যুঁইফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা কিছু, সকলই দুর্জ্ঞেয় বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়।' এই 'ছোট মেয়েটি' তিলোত্তমা ও কুন্দের সমগোত্রীয়া। ইহারা সেই শ্রেণীর মানুষ যাহারা অপরের আশ্রয় ছাড়া বাঁচিতে পারে না এবং সর্ব্ব ব্যাপারে ইহারা পরনির্ভরশীল। তিলোত্তমার বিমলা ছিল, পক্ষী যেমন আপন পক্ষপুটে শাবককে সকল বিপদ হইতে আড়াল করিয়া রাখে, বিমলাও তেমনই তিলোত্তমাকে সংসারের সকল অমঙ্গল হইতে আগুলিয়া রাখিয়াছেন। কুন্দ সূর্য্যমুখীকে পাইয়াছিল; কিন্তু তাহার মন্দভাগ্য তাহাকে সূর্য্যমুখীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিল এবং শেষ পর্য্যন্ত সংসারের কঠিন আঘাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অভিমানিনী কুন্দকে মৃত্যুবরণ করিতে হইল। রমাও নন্দাকে পাইয়াছিল, তাহার দুর্ভাগ্য প্রধানতঃ সতীন বলিয়াই সে নন্দার উপর নির্ভর করিতে পারিল না। ফলে নিজের অজ্ঞাতসারে রমা সীতারামের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিল এবং সেই সঙ্গে আপনার চিতাসজ্জা রচনা করিল।

রমা নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত, এবং এই কারণে সীতারামের সহধর্ম্মিণী হইবার অযোগ্য। সীতারাম রাজপ্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিলেন, রমা তাঁহারই সম্মুখে রাত্রিদিন ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইল, "হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারেখারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্বিঘ্নে দিনপাত করি। এ মহাভয় হইতে আমাদের উদ্ধার কর।" (২।১০)। সীতারাম দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সনন্দ লাভের ব্যবস্থা করিতে গেলেন, রমা ঘরে বসিয়া বুদ্ধির দোষে শুধু যে তাঁহার রাজ্য মুসলমানের হাতে তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্রের নিমিত্তরূপিণী হইল তাহা নহে, উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এই হেয় প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম তাহার মুখেই উচ্চারিত হইল। (২।৫, ৫৬ পৃঃ)। তথাপি রমার উপর রাগ করা চলে না, কারণ তাহার সকল দুর্ব্বলতার মূলে তাহার পতিপ্রেম ও সন্তানবাৎসল্য। রমা কখনও নিজের জন্য চিন্তা করে নাই, তাহার যাহা কিছু ভাবনা স্বামীপুত্রকে লইয়া। এবং নিতান্ত সংসারানভিজ্ঞ বলিয়াই সে ইঁহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া যাহা কিছু করিয়াছে

তাহাই কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ডাকিয়া আনিয়াছে। রমার ভাগ্য-দেবতা তাহাকে কঠিন মর্ত্ত্যের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাই মালীর অভাবে উদ্যানলতার ন্যায় বালিকা রমা অকালে শুকাইল।

জয়ন্তী, শ্রী ও সীতারাম—এই তিনটি চরিত্র উপন্যাসে অধ্যাত্মবাদের বাহন। জয়ন্তী সংসারবন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসিনী, কিন্তু তাহার হৃদয় শুষ্ক নহে; শ্রীর প্রতি তাহার সহোদরার স্নেহ, এমন কি, শ্রীর ভাই বলিয়া গঙ্গারামের প্রতি তাহার অনুকম্পাও[১] তাহার নারীহৃদয়ের পরিচয় দেয়।

জয়ন্তী শ্রীর উপদেষ্টা; শ্রীর মনের গতিকে তাহার সহজ পথ হইতে ভিন্ন মুখে প্রবাহিত করিয়া তাহাকে অন্তরে বাহিরে সন্ন্যাসিনী করিয়া গড়িয়া তোলাই উপন্যাসে জয়ন্তীর মুখ্য কার্য্য। এই হিসাবে তাহার স্থান অনেকটা ভবানী পাঠকের পার্শ্বে। কিন্তু আখ্যায়িকার উপর তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাবও উপেক্ষণীয় নহে। জয়ন্তীর সাহায্যে গঙ্গারামের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল এবং তোরাব্ খাঁর আক্রমণ হইতে সীতারামের রাজ্য রক্ষা পাইল। জয়ন্তীর মন্ত্রপূত ত্রিশূল প্রকাশ্য দরবারে গঙ্গারামের স্বীকারোক্তির কারণ হইল এবং এইরূপে জয়ন্তীর সাহায্যে রমার কলঙ্কস্খালন হইল। জয়ন্তীর অনুরোধে গঙ্গারাম মুক্তি লাভ করিল। জয়ন্তীর মধ্যবর্ত্তিতায় সীতারাম শ্রীকে পাইলেন; আবার তাহারই আনুকূল্যে শ্রী 'চিত্তবিশ্রাম' হইতে পলায়ন করিল। জয়ন্তীর দণ্ডবিধান উপলক্ষ্য করিয়াই সীতারামের ভিতরকার হিংস্র পশু নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিল; আবার শেষ মুহূর্ত্তে কঠিন আঘাতে যখন তাহার পৌরুষ পুনরুদ্দীপিত হইল, তখন জয়ন্তীর উপদেশেই সীতারাম ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন, তাঁহার দুঃখের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করিল।

জয়ন্তীর চরিত্র পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহার বিচারের চিত্রে। (৩।১৮)। সন্ন্যাসিনীজীবনের শিক্ষায় জয়ন্তী শারীরিক সুখদুঃখ জয় করিয়াছে। চরম পরীক্ষাকালে চণ্ডাল যখন সীতারামের আদেশ পালনে

১ জয়ন্তী যখন সীতারামের নিকট গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা চাহিল, তাহার তৎকালীন আচরণ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তাহারই ভয়ে স্বীকারোক্তির ফলে এই হতভাগ্যের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, এই কারণেই জয়ন্তী তাহার মুক্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, জয়ন্তী নিজেও সীতারামকে এই কথাই বলিয়াছে। (৩।৪, ৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহাই যদি তাহার একমাত্র যুক্তি হইত তাহা হইলে সীতারাম যখন ছদ্মবেশী গঙ্গারামকে হত্যা করিলেন, তখন সে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে কেন? (৩।২৩ দ্রষ্টব্য)। শ্রীর ভাই বলিয়াই গঙ্গারামের প্রতি জয়ন্তীর যে একটুকু দুর্ব্বলতা রহিয়াছে, তাহার আচরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ইতস্ততঃ করিয়া রাজরোষে পড়িল, জয়ন্তী নিজের হাতে বেত লইয়া 'আপনার প্রফুল্লপদ্মসন্নিভ রক্তপ্রভ ক্ষুদ্র করপল্লব পাতিয়া' তাহাতে আঘাত করিল। রক্তের স্রোত সন্ন্যাসিনীর গৈরিক বসন প্লাবিত করিল ; জয়ন্তী হাসিমুখ। কিন্তু নারীর নারীত্বের সহিত নারীসুলভ লজ্জার এমনই এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, নারীত্বকে বিসর্জ্জন না দিয়া কোন নারী এই লজ্জার সীমা পুরাপুরি অতিক্রম করিতে পারে না। জয়ন্তী পৃথিবীর সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছে বলিয়া এই সহজ সত্য বিস্মৃত হইয়াছিল। এবং এই কারণেই সীতারামের পৈশাচিক আদেশ শুনিয়া বলিতে পারিয়াছিল, "সন্ন্যাসীর পক্ষে সবস্ত্র বিবস্ত্র সমান।" তাহার এই উক্তির অন্তরালে তাহার অবচেতন মনে হয়ত একটুকু গর্ব্বের ভাবও রহিয়াছিল।[১] 'দর্পহারী' ভগবান তাই তাহাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়া তাহার গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। দুরন্ত কসাই যখন রাজাদেশে তাহার অঞ্চল আকর্ষণ করিল, জয়ন্তী তখন কল্পনালোক ছাড়িয়া বাস্তব মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিল, মুহূর্ত্তে সে বুঝিল, সন্ন্যাসিনীও নারী। লজ্জা আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিল, জয়ন্তী মনে মনে লজ্জানিবারণ জগন্নাথকে স্মরণ করিয়া, আপন অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। দৈহিক কষ্ট যে হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে, এক্ষণে তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

এই চিত্র যেমন জয়ন্তীর নারীত্বের দিক দিয়া মর্ম্মস্পর্শী, তেমন এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই আমরা তাহার মহত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় পাই। এত বড় লাঞ্ছনার পরেও জয়ন্তীর মনে সীতারামের প্রতি ক্রোধ নাই। নারী যখন নারীর সম্মান রক্ষা করিল, নন্দা যখন জয়ন্তীকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে সসম্মানে অন্তঃপুরে লইয়া গেল, জয়ন্তী তখন হাসিমুখে, প্রশান্ত মনে তাহাকে বলিতেছে, "মা ! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। ক্ষণমাত্র জন্য মনে করিও না যে, আমি কোন প্রকার রাগ বা দুঃখ করিয়াছি। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও তোমার বিপদ্ পড়ে, জানিতে পারিলে, আমি আসিয়া, আমার যথাসাধ্য উপকার করিব।" ইহা শুধু মুখের কথা নহে। বিপথগামী সীতারামের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া জয়ন্তী এতই ব্যাকুল হইল যে, শেষ পর্য্যন্ত সে শুধু তাঁহার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা

[১] জয়ন্তীর নিজের উক্তি এই মতের পরিপোষক। তাহার চরম পরীক্ষার পর জয়ন্তী বলিতেছে, "আমি এতদিন এমন করিয়া বুঝিতে পারি নাই যে, আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা ; কেন না, আমি বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বৃথা অভিমানে অভিমানিনী, অহঙ্কারবিমূঢ়া।" এবং নিজের এই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই সীতারামের হস্তে লাঞ্ছনাকে সে ভগবানের দেওয়া 'পরম সম্পদ্' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। (৩।২০, ১৩৮ পৃঃ)।

জানাইয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না, কারণ 'যে নিশ্চেষ্ট, তাহার ডাক ভগবান্ শুনেন না।' জয়ন্তী স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া শ্রীকে লইয়া পুনরায় মহম্মদপুরে ফিরিয়া আসিল এবং মুসলমান যখন পুরী আক্রমণ করিল, তখন যে দুইজন সন্ন্যাসিনী মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া সীতারামের রচিত সূচিব্যূহের পুরোভাগ রক্ষা করিল, তাহাদের একজন জয়ন্তী, অপর জয়ন্তীর অনুগামিনী, তাহার প্রিয় শিষ্যা শ্রী।

শ্রীর চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমেই প্রফুল্লকে মনে পড়ে। শ্রী ও প্রফুল্ল উভয়েই তুল্য পতিপ্রাণা ; অথচ বিভিন্ন কারণে হইলেও উভয়েই স্বামীসঙ্গসুখে বঞ্চিত। উভয়েই তীক্ষ্ণ আত্মমর্য্যাদাবোধসম্পন্ন। প্রফুল্লের শ্বশুর তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'খোরপোষ' সম্বন্ধে স্বামীর প্রস্তাবে সে অসম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছে। এইরূপ, গঙ্গারামের মুক্তির পর সীতারাম যখন শ্রীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, শ্রী তখন তাঁহাকে বলিতেছে, "যখন তুমি ত্যাগ করিয়াছ, তখন আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব কেন?...আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী,—আমি তোমার শুধু দয়া লইব কেন? যাহার আর কিছুতেই অধিকার নাই, সেই দয়া চায়। না প্রভু, তুমি যাও,—আমি যাইব না। এতকাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজিও কাটিবে।" (১।৬)। অবশ্য এস্থলে শ্রীর উক্তিতে আত্মমর্য্যাদাবোধের সহিত যে অভিমানের সুর রহিয়াছে, ব্রজেশ্বরের প্রতি প্রফুল্লের আচরণে সে অভিমান নাই ; প্রফুল্ল শ্বশুরের দান গ্রহণে অসম্মতি জানাইলেও স্বামীর দেওয়া তাঁহার নিজের হাতের অঙ্গুরীয় সে সাগ্রহে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছে। উভয়ের আচরণে এই পার্থক্যের কারণও সুস্পষ্ট : প্রফুল্লের শ্বশুর তাহাকে ত্যাগ করিলেও সে জানিয়াছে স্বামীর ভালবাসা হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই ; পক্ষান্তরে সীতারাম কি কারণে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন তাহা এখনও শ্রীর অজ্ঞাত, বিশেষতঃ শ্রী জানে পিতার অবর্ত্তমানে এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এমত অবস্থায় স্বামীর প্রতি অভিমান তাহার পক্ষে শুধু স্বাভাবিক নহে, অবশ্যম্ভাবী। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, স্বামীর মুখে শ্রী যখন তাহাকে ত্যাগ করার প্রকৃত কারণ অবগত হইল, তখন তাহার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু স্বামীর প্রতি ভালবাসা যদি গৃহহারা প্রফুল্লকে শেষ পর্য্যন্ত গৃহে টানিয়া আনিল, অবস্থার তারতম্য হেতু এই ভালবাসার প্রেরণাতেই শ্রী স্বামীর আহ্বান উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল।

পুরুষোত্তমের পথে শ্রী ও জয়ন্তীর সংলাপ (১।১৪) নিশি ঠাকুরাণীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে তাহার সহিত প্রফুল্লের সংলাপ স্মরণ করাইয়া দেয়। এবং ভবানী পাঠক ও জয়ন্তীর উদ্দেশ্যের তারতম্য হেতু প্রফুল্ল ও শ্রীর শিক্ষার যে পার্থক্য থাকুক না কেন, অন্ততঃ আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া এই উভয় শিক্ষায় কোনরূপ পার্থক্য থাকিবার কথা নহে। সম্ভবতঃ এই কারণেই বঙ্কিম শ্রীর শিক্ষার কাহিনী সম্পূর্ণরূপে অন্তরালে রাখিয়াছেন।

কিন্তু শিক্ষা একরূপ হইলেও ক্ষেত্রভেদে ফল ভিন্নরূপ হইল। প্রফুল্লের শিক্ষা স্বামীর প্রতি তাহার আকর্ষণের কোনরূপ পরিবর্তন আনিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীর শিক্ষা তাহাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিল। অবশ্য এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রফুল্ল স্বামীকে পাইবে বলিয়া আশা না করিলেও তাহার পক্ষে স্বামীকে এড়াইয়া চলিবার কোনরূপ তাগিদ ছিল না; পক্ষান্তরে শ্রী স্বামীকে এড়াইতেই চাহিয়াছে, সুতরাং তাহার শিক্ষা সহজেই তাহাকে পুরাপুরি প্রভাবিত করিয়াছে।

জয়ন্তীর শিক্ষা ও সাহচর্যে শ্রীর মনে যে গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, দুইটি বিশিষ্ট সংলাপের ভিতর দিয়া বঙ্কিম তাহার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন: এক বৎসর পূর্বে পুরুষোত্তমের পথে শ্রী জয়ন্তীকে বলিতেছে, "স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামীবিরহদুঃখই আমি ভালবাসি।" (১।১৪, ৪৪ পৃঃ)। আর এক বৎসর পরে শ্রী জয়ন্তীর প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছে, "অনেকদিন স্বামীর কণ্ঠ শুনি নাই—বড় আর মনে নাই।" (২।৮, ৬৪ পৃঃ)। শ্রী যাহাই বলুক, 'অনেক দিন স্বামীর কণ্ঠ' শোনে নাই, ইহাই আসল কথা নহে, কারণ স্বামীর কণ্ঠ শুনিবার সৌভাগ্য শ্রীর জীবনে খুব বেশী দিন ঘটে নাই, তথাপি স্বামীই ছিল তাহার 'চির প্রিয়'। আসল কথা জয়ন্তীর শিক্ষা; স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ শুনিয়া শ্রী স্পষ্টই বলিতেছে, তাহার স্বামী যে শ্রীকে চাহিয়াছিলেন, 'সে শ্রী আর নাই', তাহার দেহ আশ্রয় করিয়া যে শ্রী আজ বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহার পরিচয় সে জয়ন্তীর শিষ্যা একজন সন্ন্যাসিনী মাত্র।

প্রশ্ন এই: শ্রীর এই যে পরিবর্তন ইহা কি সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করে নাই? অবশ্য শ্রী যাহাই বলুক, মৃতকল্প হইলেও সীতারামের স্ত্রী শ্রী মরে নাই; মরিলে মহম্মদপুর আসিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাতের পূর্বে আত্মপরীক্ষার জন্য সময় লইবার প্রয়োজন হইত না। (২।১৭, ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এবং রাজা ও রাজ্যের কল্যাণে 'চিত্তবিশ্রাম' হইতে পলায়নের প্রয়োজন হইলেও ইহার সহিত আত্মরক্ষার প্রশ্ন জড়িত থাকিত না। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার ভিতরে সত্য সত্যই যতখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাই কি স্বাভাবিক? শ্রী আর কোষ্ঠীর ফলাফল ভাবিয়া চিন্তিত নহে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। সে যে সীতারামকে বলিতেছে, সে যখন কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে তখন পতিসেবাও তাহার কর্ম্ম নহে, ইহাও বুঝিতে পারা যায়; বিকৃতশিক্ষার ফলে ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। বস্তুতঃ সীতারামের জেরার উত্তরে তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, গঙ্গারামের জীবন রক্ষা করিয়া এবং সীতারামকে 'দেখা দিয়া' সে কর্ম্ম করিয়াছে। (৩।৭, ১০৩ পৃঃ)। কিন্তু কর্ম্মত্যাগের নামে 'চিত্তবিশ্রামে' তাহার নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতা কি স্বাভাবিক? জীবানন্দ ও শান্তি "আনন্দমঠে" একত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মের উদ্দীপনা ও আদর্শের আত্মিক যোগ রহিয়াছে। সীতারাম ও শ্রীর ক্ষেত্রে এই উভয় জিনিষেরই একান্ত অভাব। একের অন্তরে অনির্ব্বাণ বাসনা, অপর বাসনাহীন তুষার-শীতল-প্রাণ। ইহা কি সম্ভব এবং স্বাভাবিক?

ইহা সত্য যে শ্রীর সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারভাব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। 'চিত্তবিশ্রামে' জয়ন্তীর সহিত সাক্ষাৎকালে শ্রী তাহাকে বলিতেছে, "শত্রু, বাড়া লইয়া বার জন", অর্থাৎ বাকী এগার জন তাহার দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীর বাচনিক স্বীকৃতি ভিন্ন তাহার আচরণে এই এগার জনের অস্তিত্বের ক্ষীণতম আভাসও পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বঙ্কিম শ্রীর চরিত্রে নিষ্কামধর্ম্মের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া কর্ম্মত্যাগের অভিমানের কুফল দর্শাইতে যাইয়া তাহাকে নিতান্তই প্রাণহীন করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রফুল্ল কোন অবস্থাতেই ভবানী পাঠকের নিকট নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাইয়া দেয় নাই, সুতরাং প্রফুল্ল সজীব চিত্র। জয়ন্তীর সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে শ্রীকেও আমরা প্রাণের স্পন্দনপূর্ণ পূর্ণায়তন নারীরূপেই দেখিতে পাই। শ্রীর ভ্রাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহকে কেন্দ্র করিয়া অত্যাচার-উৎপীড়িত স্বজাতির প্রতি মমত্ববোধ, তাহার নির্ভীক তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণ আত্মমর্য্যাদাবোধ, সীতারামের প্রতি তাহার স্বাভাবিক অভিমান, কোষ্ঠীর ফল অবগত হইয়া সীতারামের নিকট হইতে তাহার পলায়ন—এই সকল মিলিয়া শ্রীর প্রথম জীবনের ছবি পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। কিন্তু জয়ন্তীর আওতায় আসিবার পর হইতে শ্রী একেবারেই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, জয়ন্তীর নিকট ব্যক্তিত্ব বিকাইয়া সে যেন একেবারেই দেউলিয়া হইয়াছে। অবশ্য তাহার নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়িত্ব

মুখ্যতঃ শ্রীর নিজের; জয়ন্তী রাজা সীতারামকে রাজর্ষির পর্য্যায়ে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তাহাকে স্বামীর সহিত সাক্ষাতের উপদেশ দিয়াছে এবং পরবর্ত্তীকালে তাহার অযোগ্যতার জন্যই তাহাকে পলায়নের উপদেশ দিয়াছে। শ্রীর প্রতি জয়ন্তীর ভর্ৎসনা হইতেই তাহার শিক্ষার আদর্শ সুস্পষ্ট হইয়াছে; জয়ন্তী শ্রীকে বলিতেছে, "আমি কি শিখাই নাই যে, অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগপূর্ব্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্ম-ত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না? স্বামীসেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে?" কিন্তু শিক্ষা যাহাই হউক শ্রীর জীবনে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। এবং জয়ন্তীর এই ভর্ৎসনার অব্যবহিত পূর্ব্বে নিজের আচরণ সমর্থন করিতে যাইয়া সে যে দুর্ব্বল কৈফিয়ত দিয়াছে ("যেমন শিখাইয়াছ।"—৩।২০, ১৩৯ পৃঃ) তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে নিজের সত্তাকে সে জয়ন্তীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছে। শ্রী যে পুনরায় সীতারামের নিকট ধরা দিল, তাহাও জয়ন্তীর সহিত পরামর্শের ফলে, অর্থাৎ তাহার অনুশোচনাও যেন তাহার বিবেকের রক্ষিকা জয়ন্তীর নির্দ্দেশসাপেক্ষ। শ্রী যেন জয়ন্তীর হাতের খেলার পুতুল মাত্র, জয়ন্তী তাহাকে যে পথে চালাইবে, সে ঠিক সে পথেই চলিতে থাকিবে। জয়ন্তী ও শ্রী যে ভাবে শেষ বিদায় লইল তাহার আলোচনা করিলে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। জয়ন্তী কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া শ্রী যখন দ্বিতীয়বার সীতারামের সম্মুখীন হইল, শত্রু তখন দ্বারদেশে। সীতারাম মৃত্যুর আহ্বান শুনিয়াছেন; শ্রী তাহার সম্মুখীন হইলে স্বভাবতঃই তাঁহার অভিমান জন্মিল। কিন্তু শ্রী যখন তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া তাঁহার সহিত মরিবার অধিকার যাচ্ঞা করিল, সীতারাম তখন পুনরায় তাহাকে 'মহিষী' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এবং সীতারাম ও শ্রীর পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণী জয়ন্তী তাঁহাদের মিলনকে আশীর্ব্বাদ করিল। (৩।২২, ১৪৫ পৃঃ)। কিন্তু তারপর? জয়ন্তী ও শ্রী মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া রাজা ও রাজপরিবারের সম্মান রক্ষার সহায় হইল সত্য; কিন্তু সীতারাম যখন নন্দা ও পুত্রকন্যাদের লইয়া 'বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন', তখন তাহারা গঙ্গারামের মৃতদেহ সৎকার করিয়া আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। 'সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।' (৩।২৪)। এস্থলে কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিক: এক, স্বামী যাহাতে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে পারেন, যথাসাধ্য তাহার সাহায্য করাতেই কি শ্রীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের শেষ হইল? সর্ব্ব অবস্থায় তাঁহার অনুগামিনী হওয়া কি তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে? দুই, শ্রী যখন সীতারামের নিকট পুনরায় ফিরিয়া গেল না, তখন

বুঝিতে হইবে জয়ন্তীর ইহাতে সম্মতি রহিয়াছে। তাহা হইলে কি দ্বিতীয়-বারের পরীক্ষাতেও তাহার 'ভাব' সহিল না? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহার সাময়িক অনুশোচনার মূল্য কতটুকু? অথবা, তিন, গঙ্গারামের মৃত্যু কি শ্রীকে এতই অভিভূত করিল যে, ইহার পর তাহার আর সীতারামের নিকট ফিরিয়া যাইবার স্পৃহা রহিল না? সেরূপ ক্ষেত্রে ভ্রাতৃস্নেহের এই তীব্রতার সহিত স্বামীর এত বড় দুঃসময়ে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততার সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য কোথায়? সমগ্র জিনিষটি যেন নিতান্তই হেঁয়ালিপূর্ণ। শ্রী জয়ন্তীকে বলিতেছে, "সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে।" (৩।২৪, ১০২ পৃঃ)। কথাটি গঙ্গারাম সম্বন্ধে তাহার উৎকণ্ঠা উপলক্ষ করিয়া বলিলেও, ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহা তাহার ঘটনাবহুল জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্যের অভিব্যক্তি। প্রত্যেকটি বিশিষ্ট মুহূর্তে তাহার আচরণের ভিতর দিয়া বঙ্কিম যদি এই সত্যকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই চরিত্রটি তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হইতে পারিত। কিন্তু বঙ্কিমের অধ্যাত্মবাদ ইহার অন্তরায় হইল। শ্রীর চরিত্র অধ্যাত্মবাদী বঙ্কিমের নিকট শিল্পী বঙ্কিমের শোচনীয় পরাজয়ের নিদর্শন।

শ্রী বিকৃত নিষ্কাম সাধনার মোহে কর্ম্মত্যাগের নামে অকর্ম্ম করিয়াছে; পক্ষান্তরে সীতারাম আসক্তিবশতঃ মোহান্ধ হইয়া সকল দিক দিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু শ্রীর ন্যায় সীতারামের চরিত্র উদ্দেশ্য-মূলক হইলেও এই চরিত্রটির অঙ্কনে কোথাও কোনরূপ জড়তা বা দুর্ব্বলতা নাই।

সীতারামের চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রথমেই বর্ত্তমান বাংলার দুইজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মতের উল্লেখ করিতেছি; কারণ ইঁহারা পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সীতারামের অধঃপতনের চিত্র সম্বন্ধে ডক্টর সেনগুপ্ত বলেন, উপন্যাসে 'এই পতনের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহাতে গীতার বাণীর "উদাহরণ" পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা আর্টের দাবী মিটাইতে পারে নাই—তাহা জীবন্ত নহে।'[১] পক্ষান্তরে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'সীতারামের এই অধঃপতনের চিত্র সর্ব্বতোভাবে বীর ম্যাক্‌বেথের রক্তপিপাসু পশুতে পরিণতির সহিত তুলনীয় এবং এই চরিত্র-বিশ্লেষণে বঙ্কিম সগৌরবে ধর্ম্মতত্ত্বের ক্ষীণতম প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছেন।'[২] ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিতে আতিশয্য রহিয়াছে, কারণ শেক্সপীয়ারের

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ২৪১ পৃঃ।

২ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (তৃতীয় সংস্করণ), ৮৬ পৃঃ।

নাটকে প্রতি পদক্ষেপে ম্যাক্‌বেথের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং চিত্তবিক্ষোভের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রহিয়াছে, বঙ্কিমের উপন্যাসে তাহার অনুরূপ কিছু নাই। তাহা হইলেও সীতারামের অধঃপতনের প্রতিটি পর্য্যায় নিপুণ তুলিতে অঙ্কিত হইয়াছে এবং এই চিত্রে শিল্পী বঙ্কিম ও অধ্যাত্মবাদী বঙ্কিমের সমন্বয় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেয়। চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া সীতারাম ম্যাক্‌বেথের পার্শ্বে স্থান পাইতে পারে কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু এই চিত্র অবাস্তব নহে এরূপ অভিযোগ বিচারসহ নহে। এবং প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যে প্রতিভা পশুতে পরিণত সীতারামকে পুনরায় দেবতায় রূপান্তরিত করিল তাহা শেক্সপীয়ারের প্রতিভা স্মরণ করাইয়া দেয়।

সীতারাম উদারহৃদয়, ন্যায়পরায়ণ, শরণাগতবৎসল, স্বজাতি-অনুরক্ত, নির্ভীক ও তেজস্বী। কিন্তু তাঁহার প্রথম দর্শনেই আমরা যেমন তাঁহার এই সকল মহৎ গুণের পরিচয় পাই, তেমনই তাঁহার অধঃপতনের মূল কারণ, তাঁহার চরিত্রগত দুর্ব্বলতার আভাস পাই। সীতারাম গঙ্গারামকে উদ্ধার করিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যের পশ্চাতে কি শুধুই স্বজাতিপ্রীতি ও শরণাগতের প্রতি কর্ত্তব্যের প্রেরণা রহিয়াছে? বঙ্কিম লিখিয়াছেন, শ্রীর প্রার্থনা শুনিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় দিবার পরে সীতারাম মনে মনে একবার আবার ভাবিলেন 'শ্রী এমন শ্রী? তা ত জানি না। আগে শ্রীর কাজ করিব তারপর অন্য কথা।' ভাবিলেন, 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' (১২, ১১ পৃ)। সীতারামের চিন্তার ধারা লক্ষ্য করিও। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গঙ্গারাম শ্রীর ভাই, এস্থলে ইহাই প্রধান কথা। গঙ্গারাম হিন্দু ও শরণাগত, ইহা গৌণ। শ্রীর একটি কথাঃ হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?—সীতারামের মনে দাগ রাখিয়া গিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু গঙ্গারাম হিন্দু বলিয়াই সীতারাম যদি তাহাকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে গঙ্গারাম যে শ্রীর ভাই ইহা তাঁহার সঙ্কল্পকে জোরালো করিলেও ইহাকেই তিনি মনে মনে প্রাধান্য দিতেন না। কিন্তু প্রাধান্য যখন দিয়াছেন, তখন প্রশ্ন এইঃ যে শ্রীকে তিনি বহুদিন ত্যাগ করিয়াছেন সহসা তাহার প্রতি এতখানি আকৃষ্ট হইবার কি কারণ ঘটিয়াছে যে, প্রধানতঃ তাহারই মনস্তুষ্টির জন্য তিনি গঙ্গারামকে রক্ষা করার ঝুঁকি গ্রহণ করিলেন? শ্রীর গুণ আছে সত্য, কিন্তু "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"—এই উক্তির ভিতর দিয়া তাহার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, এখন পর্য্যন্ত ইহার অধিক শ্রীর কোন পরিচয় সীতারাম পান নাই; তাহার 'সিংহবাহিনী মূর্ত্তি' এখনও অপ্রকাশ। এমত

অবস্থায় সীতারাম প্রধানতঃ শ্রীর গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছেন এরূপ অনুমান করা চলে না। আমাদিগকে অন্যত্র ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সীতারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া শ্রী যখন তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় দিল, সীতারাম নির্ব্বিকারভাবে উত্তর করিলেন, "শ্রী! তুমি তবে কি আমাকে চেন না? না চিনিয়া আমার কাছে আসিয়াছ? আমি সীতারাম রায়।" এই উক্তির মধ্যে আকর্ষণ ত দূরের কথা, ক্ষীণতম করুণাবোধেরও আভাস নাই। যত গোল বাধিল শ্রীর অবগুণ্ঠন উন্মোচনের পরে। তখন তাহার 'বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায়, অনিন্দ্যসুন্দর' মুখখানি দেখিয়া সীতারাম উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিলেন, "তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!" ইহা রূপের মন্দিরে রূপের পূজারীর অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। এবং এই রূপের মোহই শ্রীর প্রতি সীতারামের আকর্ষণের গোড়ার কথা।

সীতারাম যাহাই বলুন, তিনি যে এতদিন পরে সহসা শ্রীর প্রতি তাঁহাব কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইলেন, ইহারও অন্যতম কারণ শ্রীর রূপের আকর্ষণ। পিতার আদেশে হইলেও, বিনাপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম', ইহা খুবই সত্য কথা; কিন্তু সীতারাম যে এই সত্য এতদিন পরে শ্রীর সহিত সাক্ষাতের (পূর্ব্বে নহে) পরে উপলব্ধি করিলেন, ইহা তাৎপর্য্যপূর্ণ। সীতারামের এই সময়ের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া রূপের মোহের উল্লেখমাত্র 'আ ছি! ছি!' বলিলেও বঙ্কিম ইহাকে পুরাপুরি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন, 'সে দিন রাত্রিতে শ্রীর চাঁদপানা মুখখানা, ঢল ঢল ঢল ঢল জলভরা বলহারা চোক দুটো, বড় গোল করিয়া গিয়াছে। রূপের মোহ? আ ছি! ছি! তা না! তবে তার রূপেতে তার দুঃখেতে, আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল।' (১।৮, ২৬ পৃঃ)। অর্থাৎ, অন্যান্য কারণের সহিত রূপের মোহও রহিয়াছে। শ্রীর রূপ সীতারামের প্রাণে বাসনার আগুন জ্বালাইয়াছে, শ্রীর দুঃখ, সীতারামের স্বকৃত অপরাধের চেতনাবোধ এবং সর্ব্বোপরি শ্রীর 'সিংহবাহিনী মূর্ত্তি' অনুকূল মুহূর্ত্তে তাহাতে ইন্ধন যোগাইল।

শ্রী যদি সীতারামের নিকট ধরা দিত, তাহা হইলে রূপের মোহ হয়ত দু'দিনেই কাটিয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইল না। একদিন যদি সীতারাম শ্রীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে একই কারণে শ্রী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সেদিনের শ্রী ছিল বালিকা, সুতরাং নন্দা ও রমাকে পাইয়া সীতারাম শ্রীকে ভুলিয়াছিলেন। কিন্তু আজ যৌবনশ্রীমণ্ডিত

ক্ষণিকের-দেখা শ্রীর শূন্য স্থান নন্দা বা রমা পূর্ণ করিতে পারিল না। কারণ তাহারা পুরাতন, শ্রী নূতন ও অপ্রাপনীয়া।

কিন্তু শুধু যে পুরাতন বলিয়াই নন্দা বা রমা সীতারামের অন্তরে শ্রীর জন্য নবরচিত আসন অধিকার করিতে পারিল না তাহা নহে, তাহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যও ইহার অন্তরায় হইল। সীতারাম যখন রাজ্য স্থাপনে ব্যস্ত, রমা তখন, কারণ যাহাই হউক, তাঁহারই সম্মুখে দেবতার নিকট রাজ্যের ধ্বংস কামনা করিতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম যাহা খুঁজিতে-ছিলেন: 'একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা'—যাহাই প্রকৃত দাম্পত্যসুখ—রমার নিকট তিনি তাহা পাইলেন না। পরন্তু রমার ভালবাসা তাঁহার নিকট কণ্টকের ন্যায় জ্বালাময়ী হইল, সীতারাম ভাবিলেন, "গুরুদেব! রমার ভালবাসা হইতে আমায় উদ্ধার কর।" (১।১০, ৩২ পৃঃ)। নন্দা ভিন্ন প্রকৃতির। মুসলমানকে নন্দার ভয় নাই, কিন্তু বাহিরের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। নন্দা 'প্রাণপাত করিয়া' স্বামীর সেবা করে, ইহাতেই তাহার সুখ; সীতারাম তাহার নিকট হইতে রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে কোনরূপ উৎসাহ বা প্রেরণা পাইলেন না, নন্দাতে তিনি 'সহধর্ম্মিণী' পাইলেন না। শ্রীর আসন পূর্ণ হইল না।

শ্রীর যখন সন্ধান মিলিল না, সীতারাম তখন রাজ্যস্থাপনে মনোনিবেশ করিয়া তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেন এবং ইহারই ফলে সনন্দ লাভের আশায় তাহার দিল্লীযাত্রা। ইহা আসক্তির প্রতিষেধক হিসাবে নূতন আসক্তির সৃষ্টি।

দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনান্তর সীতারাম অভাবনীয় উপায়ে তোরাব্ খাঁর আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় মুহূর্ত্ত এবং 'সমবেত সৈনিক ও নাগরিকমণ্ডলী' যখন 'কালিমাখা বারুদমাখা' সীতারামকে সম্বর্দ্ধনা জানাইল, চন্দ্রচূড় ঠাকুর যখন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, সেইখানেই উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স্ (climax)। ইহার পর শ্রীর সহিত পুনরায় যদি তাঁহার সাক্ষাৎ না হইত, অথবা ফিরিয়া আসিয়া শ্রী যদি সীতারামের পার্শ্বে তাহার ন্যায্য আসন গ্রহণ করিত, তাহা হইলে কোন অনর্থ ঘটিত না। কিন্তু ভাগ্যদেবতার ইচ্ছা অন্যরূপ। শ্রী আসিল, কিন্তু সীতারাম রাত্রিদিন যে শ্রীর ধ্যান করিয়াছেন এ সে শ্রী নহে, যে আসিল সে জয়ন্তীর শিষ্যা সন্ন্যাসিনী শ্রী এবং এই সন্ন্যাসিনী শ্রীর সহিত আপোষ-মীমাংসা করিতে যাইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি হইল তাহাতেই সীতারামের সর্ব্বনাশ ঘটিল। শ্রী এখন নিকটে থাকিয়াও দূরে, চক্ষের সম্মুখে থাকিয়াও

অন্তরালে। সুতরাং বাসনার যে প্রবাহকে সীতারাম রাজ্যলিপ্সার নূতন খাতে চালিত করিয়াছিলেন, তাহাই নূতন প্রতিবেশে দুর্ব্বার গতি সঞ্চয় করিয়া যুগপৎ নূতন ও পুরাতন উভয় খাত ধরিল, রাজ্যলিপ্সা ও শ্রীর সঙ্গলিপ্সা উভয়ই সমান প্রবল হইল। সীতারাম শ্রীর জন্য রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইলেন, ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল; অথচ শ্রী যখন উপযুক্ত লোকের হস্তে রাজ্যভার অর্পণান্তর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া তাহার অনুগামী হইবার প্রস্তাব করিল, তখন আসক্তিবশে সীতারাম তাহাতেও সম্মত হইতে পারিলেন না। তাঁহার উভয়-সঙ্কট। (৩।১০)।

পৃথকাসনে বসিয়া দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি শ্রীর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত তাহাই ঘটিল। সীতারামের ভালবাসায় পূর্ব্ব হইতেই বাসনার খাদ মিশ্রিত ছিল, এক্ষণে তাহা ইন্দ্রিয়বশ্যতায় পরিণত হইল। সীতারামের মনের ভিতর তাঁহার মনুষ্যত্ব ও পশুবৃত্তির সংগ্রাম বাধিল। 'আগে আগুন লাগিয়াছিল মাত্র—এখন ঘর পুড়িল!' দেবাসুরের সংগ্রামে অসুরের জয় হইল। সীতারাম শ্রীর উপর বলপ্রয়োগের সঙ্কল্প করিলেন। (৩।১৫)।

শ্রীর অতর্কিত পলায়নে তাঁহার এই কুৎসিত সঙ্কল্প ব্যর্থ হইলে সীতা-রামের অতৃপ্ত লালসা ক্রোধে রূপান্তরিত হইল এবং শ্রীর অনুপস্থিতিতে তাহার পলায়নের সাহায্যকারিণী জয়ন্তী তাঁহার ক্রোধের লক্ষ্যবস্তু হইল। সীতারামের ভিতরকার নবজাগ্রত পশু, যাহা তাঁহাকে প্রিয়জনের উপর বল-প্রয়োগে উত্তেজিত করিয়াছিল, অবস্থান্তরে তাহাই তাঁহাকে জয়ন্তীকে বিবস্ত্র করিয়া তাহাকে বেত্রাঘাতে দণ্ডিত করিতে প্ররোচিত করিল। ইহাই সীতা-রামের অধঃপতনের চরম পর্য্যায়। 'চিত্তবিশ্রামে' অসহায় নারীবৃন্দের সতীত্বনাশ ইহারই জের এবং লালসার এই যে বীভৎস পরিতৃপ্তি ইহাও প্রকৃতপক্ষে ক্রোধের রূপান্তরিত অভিব্যক্তি। ডক্টর সেনগুপ্ত বলেন, 'যে সীতারাম গঙ্গারামকে রক্ষা করিয়াছিলেন আর যে সীতারাম জয়ন্তীকে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন—ইঁহারা যে একই ব্যক্তি তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।'[১] কিন্তু বঙ্কিম কাহিনীর যেরূপ পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে সীতারামের অধঃপতন যতই শোচনীয় হউক, ইহা অসম্ভাব্য বা অবিশ্বাস্য নহে। গঙ্গারামকে রক্ষা করা যত বড় জিনিষ হউক, প্রধানতঃ সীতারামের রূপতৃষা ইহার গোড়ার কথা এবং রূপতৃষা হইতে ইন্দ্রিয়বশ্যতা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির

১ বঙ্কিমচন্দ্র, ২৪২ পৃঃ।

ব্যর্থতায় ক্রোধোন্মত্ততা, ইহাই জয়ন্তীর প্রতি বেত্রাঘাতের আদেশের পশ্চাতের ইতিহাস।

কিন্তু রূপতৃষ্ণা শেষ পর্যন্ত কুৎসিত রূপ ধরিয়া দুষ্ট রাহুর ন্যায় তাঁহার মহৎ বৃত্তিগুলিকে আচ্ছন্ন করিলেও, ইহাই সীতারামের চরিত্রের একমাত্র সত্য নহে। ক্রমে রমা গেল, চন্দ্রচূড় ঠাকুর ও চাঁদ শাহ ফকির তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিলে তাহাদের হস্তে মৃণ্ময়ের মৃত্যু হইল। সৈন্য নাই, রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা নাই। কঠিন আঘাতে সীতারামের চৈতন্যোদয় হইল। মৃত্যুর আহ্বানে তাঁহার মনুষ্যত্ব পুনঃসঞ্জীবিত হইল। সীতারাম যখন তোপের মুখে মুসলমান সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া সূচিব্যূহের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, তাঁহার তৎকালীন রুদ্রমূর্তি দেখিয়া আমরা জয়ন্তীর প্রতি অত্যাচারকারী হিংস্র পশুবৎ সীতারামকে ভুলিলাম, মনে পড়িল সেই 'বারুদমাখা মহাপুরুষ'কে যিনি একক তোরাব্ খাঁর সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে, সীতারাম পুনরায় আমাদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার রাজ্য রক্ষা পাইল না, পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সীতারাম পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন জয়ন্তীর অশ্রু-অভিশপ্ত রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। তবুও তাঁহার সান্ত্বনা এই যে, জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহার নূতন যাত্রাপথের অবলম্বন তাঁহার ফিরিয়া-পাওয়া মনুষ্যত্ব।

পরিশিষ্ট ক

১। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের প্রথম সংস্করণ এবং তাঁহার জীবিতকালের শেষ সংস্করণের প্রকাশকাল[1] :

উপন্যাসের নাম	প্রথম সংস্করণের তারিখ	বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের তারিখ
দুর্গেশনন্দিনী	১৮৬৫ খ্রীঃ [ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে উপন্যাসখানি রচিত হয়। বঙ্কিমের বয়স তখন আনুমানিক ২৫ বৎসর।]	ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৮৯৩ খ্রীঃ
কপালকুণ্ডলা	১৮৬৬ খ্রীঃ	অষ্টম সংস্করণ, ১৮৯২ খ্রীঃ
মৃণালিনী	১০ই নবেম্বর, ১৮৬৯ খ্রীঃ	দশম সংস্করণ, ১৮৯৩ খ্রীঃ
বিষবৃক্ষ	১লা জুন, ১৮৭৩ খ্রীঃ	অষ্টম সংস্করণ, ১৮৯২ খ্রীঃ
ইন্দিরা	১৮৭৩ খ্রীঃ	পঞ্চম সংস্করণ, ৩০শে জুলাই ১৮৯৩ খ্রীঃ
যুগলাঙ্গুরীয়	১৮৭৪ খ্রীঃ	ঐ, ২৬শে মে, ১৮৯৩ খ্রীঃ
রাধারাণী	১৮৭৫ খ্রীঃ	চতুর্থ সংস্করণ, ঐ ঐ
চন্দ্রশেখর	১লা জুন, ১৮৭৫ খ্রীঃ	তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৮৯ খ্রীঃ
রজনী	২রা জুন, ১৮৭৭ খ্রীঃ	ঐ, ১৮৮৭ খ্রীঃ
কৃষ্ণকান্তের উইল	২৯শে আগষ্ট, ১৮৭৮ খ্রীঃ	চতুর্থ সংস্করণ, ৩০শে নবেম্বর ১৮৯২ খ্রীঃ
রাজসিংহ	৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ খ্রীঃ	ঐ, ১০ই আগষ্ট, ১৮৯৩ খ্রীঃ
আনন্দমঠ	১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খ্রীঃ	পঞ্চম সংস্করণ, ১১শে নবেম্বর, ১৮৯২ খ্রীঃ
দেবী চৌধুরাণী	২০শে মে, ১৮৮৪ খ্রীঃ	ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৮৯১ খ্রীঃ

---

[1] বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ ও শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী' (২৬৪-৭১ পৃঃ) দৃষ্টে সঙ্কলিত। 'বঙ্কিম-জীবনী'র তালিকা অনুযায়ী 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু এক্ষেত্রে শতবার্ষিক সংস্করণ প্রামাণ্য, কারণ ইহার সম্পাদকদ্বয় প্রথম সংস্করণের সহিত বঙ্কিমের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের 'পাঠভেদ' তৈয়ারী করিয়াছেন।

উপন্যাসের নাম	প্রথম সংস্করণের তারিখ	বঙ্কিমের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের তারিখ
সীতারাম	৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৮৭ খ্রীঃ	তৃতীয় সংস্করণ, ২৬শে মে, ১৮৯৪ খ্রীঃ[১]

২। মাসিক পত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠের সহিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণের (ইহাতে বঙ্কিমের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইয়াছে) পাঠের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ও তাহার সম্ভাব্য কারণঃ

নব্যলেখকদের প্রতি বঙ্কিমের উপদেশ এইরূপঃ 'যাহা লিখিবেন, ...কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন।'[২] বঙ্কিম নিজে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার এই উপদেশানুযায়ী কাজ করিয়াছেন। প্রবন্ধ ও উপন্যাসাদি ছাপা হইবার পরেও তিনি একাধিকবার তাহাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; ফলে পরিবর্ত্তিত আকারে কোন কোন গ্রন্থ সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। 'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহ' ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ অপ্রাপ্য না হইলেও দুষ্প্রাপ্য এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণের সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় যেখানে 'রাধারাণী'র প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই (সম্পাদকীয় ভূমিকা দ্রষ্টব্য), সেখানে তাহা অপ্রাপ্য ইহাই বুঝিতে হইবে। এমত অবস্থায় তাঁহারা 'রাধারাণী' বাদে প্রত্যেকখানি উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ ও শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠভেদ স্বতন্ত্ররূপে দেখাইয়া দিয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল উপন্যাস প্রথমে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও মাসিক পত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের সহিত প্রথম সংস্করণের উপন্যাসের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। 'রজনী' ইহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল। এস্থলে আমি মাসিকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের সহিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের উল্লেখপূর্ব্বক ইহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিব। যে সকল স্থলে হয়ত কোথাও দু'একটি শব্দের অদলবদল ভিন্ন

---

১ 'সীতারামে'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর সাতচল্লিশ দিন পরে ১৩০১ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। কিন্তু ইহার মুদ্রণকার্য্য তাঁহার জীবিতকালেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই কারণে ইহাকে তাঁহার জীবিতকালের শেষ সংস্করণ বলিয়া ধরা হইল। শতবার্ষিক সংস্করণেও এই সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

২ 'বাঙ্গলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন।'—বিবিধ প্রবন্ধ, ২০৬ পৃঃ।

মাসিক পত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠের সহিত প্রথম সংস্করণের পাঠের মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই, সে সকল স্থলে মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রসঙ্গের উল্লেখের পর 'প্রঃ সং' লেখা থাকিবে।

'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' প্রথমেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এই তিনখানি উপন্যাস বর্ত্তমান আলোচনার বাহিরে।

বিষবৃক্ষ

এই উপন্যাসখানি ১২৭৯ সালে 'বঙ্গদর্শনে' বৈশাখ হইতে ফাল্গুন এই এগার সংখ্যায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পুনর্মুদ্রণ। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠের সহিত শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। সুরার সাহায্যে অকৃত্রিম সুহৃদ সুরেন্দ্রের সহিত বিচ্ছেদজনিত বিমর্ষভাব কাটাইয়া উঠিয়া দেবেন্দ্র যখন গান ধরিলেন, 'আমার নাম হীরে মালিনী' ইত্যাদি, তখন 'আব একজন কোথা হতে গায়িল :

আমার নাম হীরা মালিনী।
মাতাল হয়ে বাচাল হলো, দেখতে নারি আমি ধনী।

দেবেন্দ্র জড়ীভূত কণ্ঠে বলিলেন, "বা! তুমি ধনী কে? ভূত না প্রেতিনী?"

তখন ঠুন! ঠুন! ঝনাৎ! প্রেতিনী আসিয়া বাবুর কাছে বসিল। প্রেতিনী ঢাকাই সাড়ী পরা,....গায়ে আতর গোলাবের গন্ধ ভুরভুর করিতেছে। দেবেন্দ্র প্রেতিনীর মুখের কাছে আলো ধরিলেন। চিনিতে পারিলেন না। চুপি চুপি মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবাঃ, কোন্ গাছ থেকে?" আবার আর এক দিগে আলো ধরিয়া দেখিয়া সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "তুমি কাদের পেতিনী গা?"' বিষবৃক্ষ ১৭—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৭৯, ২২৩—২৪ পৃঃ। প্রঃ সং

২। 'অতঃপর দেবেন্দ্র যখন নেশার ঝোঁকে স্ত্রীলোকটির মুখের কাছে

মদের গেলাস ধরিলেন, 'স্ত্রীলোকটা তাহা গ্রহণ না করিয়া নামাইয়া রাখিল, মৃদু হাসি হাসিয়া স্বচ্ছন্দে দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"ভাল আছ বৈষ্ণবী দিদি ?"

তখন মাতাল বলিল, "বৈষ্ণবী দিদি! ও বাবা! ও গাঁয়ের দত্ত বাড়ীর পেত্নী নাকি ?" '

বিষবৃক্ষ ১৭—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৭৯, ২২৪ পৃঃ। প্রঃ সং

৩। দেবেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "তারপর—মালিনী মাসি—কি মনে কোরে ?"

'হীরা বলিল, "মনে কোরে আর কি ? দত্তের বাড়ী এক ডাকাতে দিনে ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ডাকাত ধরতে এয়েছি।"

শুনিয়া বাবু গান ধরিলেন।

"আমার আঁটা ঘরে সিঁদ মেরেছে,
কোন ডাকাতের এ ডাকাতি।
যৌবনের জেলখানাতে রাখ্‌বো তারে দিবারাতি।
মন বাক্‌শ তার লজ্জা তালা,
কল কোরে তার ভাঙ্গলো ডালা,
লুটে নিলে প্রেমনিধি তার,
ভাঙ্গা বাক্‌শে মেরে নাতি।

তা, ডাকাতি করতে গিয়ে থাকি, গিয়াছি বাপ—কিন্তু হীরা মতির জন্যে নয়, কেবল ফুলটী খুঁজি।"

হীরা। কি ফুল—কুন্দ ?

দে। Hurrah! কুন্দকলি!—Three cheers for কুন্দনন্দিনী! বন্দাতে মন্দজাতিকং। কুন্দনন্দি—ন্দি—ন্দি—নী! বলিয়াই গীত!—

কুন্দ কলি মন্দ বলি নিন্দে করে কাল ভ্রমরা—

তবে—যৌবনের মেঠো মালিনী মাসি, কি মনে কোরে ?

হী। কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে।

দে। Hurrah! Hurrah! for কুন্দনন্দিনী, বল, বলত, বলত কি বলিয়া পাঠিয়েছে ? মনে পড়েছে ? না হবে কেন ? আজ তিন বৎসরের পীরিত!

হীরা বিস্মিত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিল ;—' এতদিনের পীরিত, তাহা জানিতেন না। প্রথম পীরিত হলো কেমন কোরে ?"

দে। আরে, ভারি নাকি শক্ত কথা! তারার সহিত বন্ধুত্ব থাকাতে তাকে বলিলাম, বউ দেখা—তা সে বউ দেখালে। সেই অবধি পীরিত। কিন্তু এক গেলাস খাও বাপ। শুধু মুখে আর ভাল লাগে না।

দেবেন্দ্র তখন একপাত্র ব্রাণ্ডি হীরার হাতে দিল। হীরা তাহা হাতে করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর?"

দে। তারপর তোমাদের গিন্নীর জ্বালায় দিন কত দেখা শুনা হয় নাই। তারপর এখন বৈষ্ণবী হয়ে যাতায়াত করিতেছি। ছুঁড়ি বড় ভয় তরাসে, কিছুতে কথা হয় না। তবে আজি যে রকম ফুশ্‌লে এয়েছি, তাতে ছাড়ায় না—না হবে কেন—আমি দেবেন্দ্র! অহং দেবেন্দ্রবাবু—হেউ! শিখে হো চল ভেলা নটনাগর—তারপর মালিনী মাসি! কি বলিয়া পাঠিয়েছে? ভাল আছ ত, মালিনী মাসি? প্রাতঃপ্রণাম।

হীরা প্রাযাবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে দেবেন্দ্রের এই সকল কথা বাহির হইতে শুনিয়া হাসিয়া গড়াইল পড়িল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিল, "রাত্রি ঢের হইল, এখন প্রণাম হই।" এই বলিয়া হীরা মৃদু হাসি হাসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রস্থান করিল।'

বিষবৃক্ষ ১৭—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৭৯, ২২৫-২৬ পৃঃ। প্রঃ সং

৪। হীরা 'পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট, দেবেন্দ্রের কথিত মত, তাহার সহিত কুন্দনন্দিনীর তিন বৎসর অবধি প্রণয়ের বৃত্তান্ত বিবৃত করিল এবং ইহাও প্রতিপন্ন করিল, যে এক্ষণে দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর জার স্বরূপ বৈষ্ণবীবেশে যাতায়াত করিতেছে।'

বিষবৃক্ষ ১৭—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৭৯, ২২৬ পৃঃ। প্রঃ সং

৫। কুন্দকে তিরস্কার করিতে যাইয়া সূর্য্যমুখী বলিলেন, "কুন্দ! হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, আমরা চিনিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, সে তোর উপপতি।"

বিষবৃক্ষ ১৭—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৭৯, ২২৬ পৃঃ। প্রঃ সং

৬। দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া হীরা যখন দ্বিতীয়বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, তখন দেবেন্দ্র বলিলেন, ' "হীরে, সেদিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে? সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। [তুমি বলিয়াছিলে, কুন্দনন্দিনী তোমাকে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সে কি বলিয়াছিল, তাহা কিছুই বলিয়া যাও নাই। বোধ হয়, আমাকে বিবশ দেখিয়া সে কথা বল নাই। আজি বলিতে পার।"

হী। কুন্দনন্দিনী কিছুই বলিয়া পাঠান নাই।

দে। তবে তুমি কেন আসিয়াছিলে?]

হী। কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।

দেবেন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। ভাগ্যক্রমে নগেন্দ্রবাবু তোমার মত দাসী পেয়েছিল। [বুঝিলাম কুন্দনন্দিনীর কথা ছল মাত্র।"]'

বিষবৃক্ষ ১৯—বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৭৯, ২৫৮ পৃঃ। প্রঃ সং

৭। 'সূর্য্যমুখী....কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। বিশেষ কমলমণি বুঝাইয়া দিলেন যে, দেবেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেননা দেবেন্দ্রের সহিত [তিন বৎসর পর্য্যন্ত] গুপ্ত প্রণয় হইলে কখন অপ্রচার থাকিত না। আর কুন্দের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কদাচ ইহা সম্ভব বোধ হয় না। দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে।'

বিষবৃক্ষ ২০—বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৭৯, ২৫৯-৬০ পৃঃ। প্রঃ সং

৮। সূর্য্যমুখীর তিরস্কারের ফলে কুন্দনন্দিনী গৃহত্যাগ করিয়াছে, সূর্য্যমুখীর মুখে ইহার বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই। তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না? [তুমি তারাচরণের কোন্ দিনের ঘরের খবর না জানিতে? কুন্দের সঙ্গে যে প্রকারে দেবেন্দ্রের যেরূপ তিন বৎসরের আলাপ তাই কোন্ না শুনিয়াছ? তবে মাতালের কথায় বিশ্বাস করিলে কেন?"]

বিষবৃক্ষ ২১—বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৭৯, ২৬৫ পৃঃ। প্রঃ সং

শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। দেবেন্দ্র যখন গান ধরিলেন, 'এমন সময়ে জানালার দিকে কি একটা খড় খড় শব্দ হইল—কে যেন খড়খড়ি তুলিয়া দেখিতেছিল—হঠাৎ ফেলিয়া দিল। দেবেন্দ্র....বলিলেন, "কে খড়খড়ি চুরি করে?" কোন উত্তর না পাইয়া জানেলা দিয়া দেখিলেন—দেখিতে পাইলেন, একজন স্ত্রীলোক পালায়।....দেবেন্দ্র জানেলা খুলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ টলিতে টলিতে ছুটিলেন।

স্ত্রীলোক অনায়াসে পলাইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইল না, কি অন্ধকারে ফুলবাগানের মাঝে পথ হারাইল, তাহা বলা যায় না। দেবেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া অন্ধকারে তাহার মুখপানে চাহিয়া চিনিতে পারিলেন না। চুপি চুপি মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবা! কোন্ গাছ থেকে?" পরে তাহাকে ঘরেব ভিতর টানিয়া একবাব এক দিকে, আবার আর এক দিকে ধরিয়া দেখিয়া, সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "তুমি কাদের পেত্নী গা?"'

বিষবৃক্ষ ১৭, ৫৫-৫৬ পৃঃ।

হীরা যতই দুঃসাহসিকা হউক, মদ্যপ দেবেন্দ্রের গানের পদের সঙ্গে পদ মিলাইয়া গাহিয়া সহসা তাঁহার কাছে আসিয়া বসা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। হয়ত এই কারণেই এই অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

২। স্ত্রীলোকটি মদের গেলাস নামাইয়া রাখিল, কিন্তু দেবেন্দ্রকে কোনরূপ প্রশ্ন করিল না।

বিষবৃক্ষ ১৭, ৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে যে কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে হয়ত অনুরূপ কারণেই এই অংশও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

৩। দেবেন্দ্রের সহিত হীরার সংলাপ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

আলোচ্য সংস্করণে দেবেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া 'হীরা পলাইবার জন্য ব্যস্ত।' সুতরাং দেবেন্দ্র যখন পুনরায় তাহার হাতে মদের গেলাস দিলেন 'হীরা বলিল, "আপনি খান।" বলিবামাত্র দেবেন্দ্র তাহা গলাধঃকরণ করিলেন। সেই গেলাস দেবেন্দ্রের পূর্ণ মাত্রা হইল—দুই একবার ঢুলিয়া—দেবেন্দ্র শুইয়া পড়িলেন। হীরা তখন উঠিয়া পলাইল।'

আসল কথা এই: 'উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া, জানেলার কাছে দাঁড়াইয়া' সুরেন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া 'হীরা সিদ্ধমনস্কাম হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, যাইবার সময় অসাবধানে খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়াছিল—ইহাতেই গোল বাধিল।'

বিষবৃক্ষ ১৭, ৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বলা বাহুল্য এই চিত্র অধিকতর স্বাভাবিক। এবং দেবেন্দ্রের চরিত্র যতই মসীলিপ্ত হউক, এই পরিবর্ত্তনের ফলে অন্ততঃ নিরপরাধিনী কুন্দের সম্বন্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইবার অপরাধ হইতে তিনি অব্যাহতি পাইয়াছেন। বস্তুতঃ, যে মানুষটি কিছু পূর্ব্বেই একমাত্র অকৃত্রিম সুহৃদের নিকট মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, কুন্দনন্দিনী 'অত্যন্ত সাধ্বী' (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৭৯, ২২৩ পৃঃ;

শতবার্ষিক সংস্করণ, ৫৫ পৃঃ) মদের ঝোঁকে হইলেও তাঁহার পক্ষে সেই 'অত্যন্ত সাধ্বী' সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

৪। হীরা পরদিন সূর্য্যমুখীকে জানাইল যে, 'দেবেন্দ্র কুন্দের জন্য বৈষ্ণবী সাজিয়া যাতায়াত করে।' দেবেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের কথোপকথন হইতে হীরা জানিয়াছে যে, কুন্দ নির্দ্দোষী ; কিন্তু একথা সে সূর্য্যমুখীকে বলিল না, সুতরাং সূর্য্যমুখী ইহা বুঝিলেন না।

বিষবৃক্ষ ১৭, ৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আনুপূর্ব্বিক এই পরিবর্ত্তনের ফলে একদিকে যেমন দেবেন্দ্রের চরিত্র কম মসীলিপ্ত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই হীরার চরিত্র অধিকতর কলঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ সত্যগোপন যেমন হীরার চরিত্রের অনুরূপ, তেমন ইহা এক বিরাট ষড়যন্ত্রের ভূমিকাস্বরূপ। বঙ্কিম এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 'হীরা কেন সে কথা লুকাইল—পাঠক ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিবেন।'

৫। সূর্য্যমুখী বলিলেন, "কুন্দ! হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, আমরা চিনিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, সে তোর কে।" বিষবৃক্ষ, ১৭, ৫৮ পৃঃ।

সূর্য্যমুখীর মত রাশভারি মহিলার পক্ষে খোলাখুলিভাবে 'উপপতি' শব্দ ব্যবহার করা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

৬। বন্ধনী মধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

কুন্দনন্দিনী তাহাকে পাঠাইয়াছে, পরিবর্ত্তিত পাঠে হীরা এমন কথা বলে নাই ; সুতরাং দেবেন্দ্র এ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন না।

৭। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী 'তিন বৎসর পর্য্যন্ত', এই বাক্যাংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে (বিষবৃক্ষ ২০, ৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য), কারণ পরিবর্ত্তিত পাঠে দেবেন্দ্রের মুখে 'তিন বৎসরের পীরিতে'র উল্লেখ নাই।

কিন্তু এস্থলে আর একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে : কমলমণি যে সূর্য্যমুখীকে বুঝাইলেন, 'দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে।'—পরিবর্ত্তিত পাঠে তাঁহার এই উক্তির যৌক্তিকতা কি? দেবেন্দ্র কোনরূপ 'মিথ্যা বড়াই' করেন নাই এবং হীরাও সূর্য্যমুখীকে যাহা জানাইয়াছে তাহা এই : 'দেবেন্দ্র কুন্দের জন্য বৈষ্ণবী সাজিয়া যাতায়াত করে।' ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা চলে না যে, হীরা সূর্য্যমুখীর নিকট দেবেন্দ্রের নাম করিয়া কুন্দের সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করিয়াছে। অবশ্য এরূপ কুৎসা প্রচার তাহার পক্ষে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে ; কিন্তু হীরা ইহা প্রয়োজন বোধ করে নাই। কারণ সে জানে যে, সে যেরূপ সত্য বলিয়াছে তাহা মিথ্যা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর এবং সূর্য্যমুখীর কানভাঙ্গানোর পক্ষে যথেষ্ট। মনে হয় বঙ্কিম যখন আখ্যায়িকার

স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তখন অনবধানতাবশতঃ এই অংশ বাদ দেওয়া হয় নাই।

৮। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

পরিবর্ত্তিত পাঠে 'তিন বৎসরের আলাপে'র উল্লেখ অর্থহীন এবং মাতালের কথায় বিশ্বাস করার প্রশ্নও ওঠে না।

ইন্দিরা

'ইন্দিরা' উপন্যাসখানি ১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র চৈত্রসংখ্যায় ছোট গল্পের আকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের উপন্যাস ইহার পুনর্মুদ্রণ। পঞ্চম সংস্করণে উপন্যাসখানি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। শতবার্ষিক সংস্করণে এই পাঠ গৃহীত হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'ইন্দিরা'র সহিত ইহার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১-৪। শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠের ১নং হইতে ৪নং চিহ্নিত অংশে যে সকল খুঁটিনাটির উল্লেখ রহিয়াছে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে বা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে সে সকল খুঁটিনাটি পরিবেশিত হয় নাই।

৫। দস্যুগণ অলঙ্কারাদি চাহিলে ইন্দিরা তাহাদিগকে অঙ্গের সকল অলঙ্কার খুলিয়া দিল।

ইন্দিরা ১—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। প্রঃ সং

৬। দস্যুগণ ইন্দিরাকে নিবিড় বনে ফেলিয়া গেলে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। যখন তাহার 'চৈতন্য হইল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে।' ইন্দিরা গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামের অনুসন্ধানে চলিল।

ইন্দিরা ১-২—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬১৬-১৭ পৃঃ। প্রঃ সং

৭-৮। শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠের ৭নং চিহ্নিত অংশে যে সকল খুঁটিনাটির এবং ৮নং চিহ্নিত অংশে যে বর্ণনা ও গানের উল্লেখ রহিয়াছে, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে বা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে সে সকলের কোন কিছুই নাই।

৯। কলিকাতায় ইন্দিরার খুল্লতাতের সন্ধান না পাইয়া কৃষ্ণদাস

বাবু তাহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যখন উপায়ন্তর নাই তখন সে রাঁধুনীর কাজ করিতে সম্মত হইলে তিনি তাঁহার আত্মীয় রামরাম দত্তের বাড়ীতে এরূপ কাজ যোগাড় করিয়া দিতে পারেন। সেখানে থাকিয়া সে খুল্লতাতের সন্ধান করিতে পারিবে।

ইন্দিরা ২—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬১৯ পৃঃ। প্রঃ সং

১০। উপরোক্ত প্রস্তাবে ইন্দিরার প্রাণে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহার কোন বর্ণনা নাই। কৃষ্ণদাসবাবুর প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াই ইন্দিরা বলিতেছে, 'অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইল'। তবে 'রাত্রিদিন ''রূপ! রূপ!'' শুনিয়া' কিছু ভয় হইয়াছিল বলিয়া ইন্দিরা কৃষ্ণদাসবাবুর নিকট হইতে রামরাম দত্তের পরিবারের খুঁটিনাটি খবর জানিয়া লইল।

ইন্দিরা ২—বঙ্গদর্শন চৈত্র, ১২৭৯, ৬১৯-২০ পৃঃ। প্রঃ সং

১১। রামরাম দত্তের সংসারে তাঁহার দুই পরিবার, 'দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র অবিনাশ, বয়স দশ বৎসর। আর একটি অন্ধ ভাগিনেয়।'

ইন্দিরা ২—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬১৯-২০ পৃঃ। প্রঃ সং

আখ্যায়িকায় ইহাদের কাহারও কোন ভূমিকা নাই।

১২। ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্রবাবু রামরাম দত্তের 'মহাজন'; বিষয় উপলক্ষ্যে তিনি তাঁহার গৃহে অতিথি হইলেন।

ইন্দিরা ৩—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬২০ পৃঃ। প্রঃ সং

১৩। অন্তঃপুরে আহারের স্থান হইল বলিয়া ইন্দিরাকেই পরিবেশন করিতে হইল।

ইন্দিরা ৩—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬২০ পৃঃ। প্রঃ সং

১৪। ইন্দিরার সহিত 'নিমন্ত্রিত বাবুটি'র (ইন্দিরা তাঁহাকে স্বামী বলিয়া চিনিতে পারে নাই) প্রথম দৃষ্টিবিনিময়ের প্রসঙ্গে সে বলিতেছে, 'আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহাকে খর দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে আমি ঘোমটার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রতি তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি।'

ইহার পর 'নিমন্ত্রিত বাবুটি' যখন 'একটু মাত্র মৃদু হাসিয়া, মুখ নত করিলেন', তাহার নিজের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া ইন্দিরা বলিতেছে, 'আমি একটু লজ্জিতা, একটু সুখী হইয়া আসিলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে বলিতে হইল—আমি নিতান্ত একটুকু সুখী হইয়া আসিলাম না। আমার নারী জন্মে প্রথম এই হাসি—আর কখন কেহ আমাকে দেখিয়া মধুর হাসি হাসে নাই। আর সকলের হাসি বিষ লাগিয়াছিল।'

এইখানেই শেষ নহে; নির্লজ্জা ইন্দিরা জোর গলায় বলিতেছে, 'এতক্ষণ বোধ হয়, পতিব্রতা মণ্ডলী আমার উপর ভ্রূভঙ্গী করিতেছেন এবং বলিতেছেন, "পাপিষ্ঠে এ যে অনুরাগ।" আমি স্বীকার করিতেছি, এ অনুরাগ।'

অতঃপর কৈফিয়তের পালা: 'কিন্তু আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামীসন্দর্শন হইয়াছিল—সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপণী নিক্ষেপেই যে তরঙ্গ উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?'

ইন্দিরা ৩—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬২০-২১ পৃ:। প্র: সং

১৫। ইন্দিরা স্বামীকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে 'মাথার কাপড় ফেলিয়া' এমন স্থানে দাঁড়াইল যে, ভোজনের স্থান হইতে বহির্বাটিতে গমনকালে সহজেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইতে পারে। এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি 'চাহিবামাত্র' ইন্দিরা 'ইচ্ছাপূর্ব্বক' তাঁহার প্রতি 'একটু অধিক করিয়া বিষ ঢালিয়া' কটাক্ষ করিল।

ইন্দিরা ৪—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬২৩ পৃ:। প্র: সং

১৬। হারানী সহজেই ইন্দিরার দৌত্যগ্রহণে সম্মত হইল; কিন্তু ইহার ভিতর অর্থের প্রলোভন নাই।

ইন্দিরা ৪—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬২৩ পৃ:। প্র: সং

কিন্তু যে শ্রেণীর নারী সহজেই এরূপ কার্য্যভার গ্রহণে সম্মত হয়, অর্থই কি তাহাদের একমাত্র আকর্ষণ নহে?

১৭। বিষয় সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিবার অজুহাতে উপেন্দ্রবাবু রামরামবাবুর বাড়ীতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিলেন।

ইন্দিরা ৪—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬২৪-২৫ পৃ:। প্র: সং

১৮। অভিসারিকা ইন্দিরা যখন কৌশলে জানিয়া লইল, যে উপেন্দ্রবাবু পুনরায় বিবাহ করেন নাই তখন 'সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল।'

ইন্দিরা ৫—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬২৬ পৃ:। প্র: সং

১৯। অষ্টাহ পরীক্ষাকালে ইন্দিরা কিরূপ স্বামীর সেবা করিয়াছে তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে সে বলিতেছে, 'আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে সকলই কৃত্রিম নহে—আমি তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।'

ইন্দিরা ৫—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬২৯ পৃ:। প্র: সং

২০। পরীক্ষার শেষ দিবস ইন্দিরা প্রশ্ন করিল, "তুমি আমায় ত্যাগ করিলে আমার কি দশা হইবে?" উত্তরে উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, তিনি তাহার 'যাবজ্জীবনের সংস্থান' করিয়া দিবেন। ইন্দিরা তখন এক মিথ্যা গল্প বলিল যে, এক ব্যক্তি 'আপন উপপত্নীকে সমুদায় সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল...।' ইহাতে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল ; উপেন্দ্রবাবু তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিলেন। বিজয়িনী ইন্দিরা বলিতেছে, 'মনে বলিলাম, "এইবার সোনার চাঁদ, আর কোথায় যাইবে? তবে নাকি আমাকে গ্রহণ করিবে না?" যে অভিপ্রায়ে, আমার এত জাল পাতা, তাহা সিদ্ধ হইল। এখন আমি তাহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে, তিনি যদি গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে।'

ইন্দিরা ৭-৮—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬২৯-৩০ পৃঃ। প্রঃ সং

২১। ইন্দিরা প্রস্তাব করিল, দিন কয়েকের জন্য সে কালাদীঘিতে তাহার পিতামাতাকে দেখিয়া আসিতে চায়।

ইন্দিরা ৮—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬৩০-৩১ পৃঃ। প্রঃ সং

২২। ইন্দিরা পিতৃগৃহে ফিরিলে তাহার পিতা উইল করিবেন এবং তজ্জন্য জামাতার সহিত পরামর্শের প্রয়োজন, এই অজুহাতে উপেন্দ্রবাবুকে মহেশপুর আনাইলেন। ইন্দিরা ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া উপেন্দ্রবাবু প্রথমে তাহাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। পরে ইন্দিরার সহিত সাক্ষাৎ হইলে যখন দেখিলেন কুমুদিনীই ইন্দিরা তখন গোল মিটিল।

ইন্দিরা ৮—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬৩২-৩৩ পৃঃ। প্রঃ সং

২৩। ইন্দিরা স্বামীর নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিল যে, তাঁহাকে পাইবার জন্য শঠতা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সম্পত্তি দানপত্র লিখিয়া লইয়া সে ভাল কাজ করে নাই। তাঁহার অভিরুচি হয় তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন, নচেৎ সে তাঁহার 'উঠান ঝাট দিয়া' খাইবে। তাহা হইলেও সে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। এই বলিয়া ইন্দিরা দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ইন্দিরা ৮—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, ৬৩৩ পৃঃ। প্রঃ সং

২৪। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসে বা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে 'সেকালে যেমন ছিল' এবং 'উপসংহার'—এই দুইটি পরিচ্ছেদ নাই।

শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। ইন্দিরার স্বামী যখন অভিমানে বিদেশে যাইয়া অর্থোপার্জ্জন

করিতে লাগিলেন এবং ইন্দিরা পিতৃগৃহে রহিয়া গেল, তাহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া ইন্দিরা বলিতেছে, 'রাগে আমার শরীর গরগর করিত।' ইত্যাদি। (ইন্দিরা ১, ৫ পৃঃ)। ইহা নূতন সংযোজনা। শুধু এস্থলে নহে, উপন্যাসে যাহা কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইন্দিরার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়াই তাহার প্রধান সার্থকতা।

২। ইন্দিরার স্বামী যে দীর্ঘকাল পরে বাড়ী ফিরিলেন, তাহার পশ্চাতে ইন্দিরার মায়ের কোনরূপ 'কল কৌশল' রহিয়াছে, ইন্দিরা এইরূপ ইঙ্গিত করিতেছে। (ইন্দিরা ১, ৫ পৃঃ)। ইহা নূতন সংযোজনা। ইন্দিরার মায়ের পক্ষে কোনরূপ 'কল কৌশল' প্রয়োগ খুবই স্বাভাবিক।

৩। পতিগৃহযাত্রার প্রাক্কালে ইন্দিরার পিতা যখন 'হাসিয়া' বলিলেন, "মা ইন্দিরে!....দেখ, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না", ইন্দিরা তখন 'মনে মনে' বলিল, "আমার প্রাণটা বুঝি আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল; তুমি যেন বুঝিতে পারিয়া হাসিও না।" পিতার উক্তিতে ইন্দিরার মনের এই প্রতিক্রিয়া এবং কামিনীর সহিত তাহার রহস্যালাপ (ইন্দিরা ১, ৬ পৃঃ)—উভয় জিনিষই নূতন সংযোজনা এবং এই উভয় জিনিষই ইন্দিরার তৎকালীন মানসিক অবস্থার উপর আলোকপাত করে।

৪। 'শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিতে পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি হইবে', একথা ভাবিতে ইন্দিরার 'চক্ষে একটু একটু জল আসিয়াছিল;' ইন্দিরা ভাবিল, 'রাত্রিতে আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইব না, তিনি কেমন।' ইত্যাদি। (ইন্দিরা ১, ৭ পৃঃ)।

পরে বাহকেরা যখন দীঘির ঘাটে পাল্কী নামাইল, তাহার সেই সময়ের মনের অবস্থা ইন্দিরা এইরূপ বর্ণনা করিতেছে: 'আমি হাড়ে জ্বলিয়া গেলাম। কোথায়, কেবল ঠাকুর দেবতার কাছে মানিতেছি, শীঘ্র পৌঁছি—কোথায়, বেহারা পাল্কী নামাইয়া হাঁটু উঁচু করিয়া ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। কিন্তু ছি! স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে! আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে আমাকে বহিতেছে; আমি যাইতেছি ভরা যৌবনে স্বামীসন্দর্শনে, তারা যাইতেছে খালি পেটে এক মুঠা ভাতের সন্ধানে; তারা একটু ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে বলিয়া কি আমার রাগ হইল! ধিক্ ভরা যৌবনে!' (ইন্দিরা ২, ৭ পৃঃ)।

পাল্কীর দ্বার খুলিয়া ইন্দিরা যখন দেখিল আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী উড়িয়া যাইতেছে, তখন তাহার মনে হইল, 'এমন কোন বিদ্যা নাই কি, যাতে মানুষ পাখী হইতে পারে? পাখী হইতে পারিলে আমি এখনই উড়িয়া চিরবাঞ্ছিতের নিকট পৌঁছিতাম।' (ইন্দিরা ২, ৮ পৃঃ)।

এ সমস্তই নূতন সংযোজনা, এবং ইহার ভিতর দিয়া যেমন স্বামীসন্দর্শনের জন্য ইন্দিরার ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইতেছে, তেমনই বাহকদের প্রতি সহানুভূতির ভিতর দিয়া তাহার দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

৫। ইন্দিরা অপর সকল অলঙ্কার খুলিয়া দিলেও 'হাতের বালা' খুলিয়া দিল না, দস্যুরা তাহা কাড়িয়া লইল। (ইন্দিরা ২, ৯ পৃঃ)।

'হাতের বালা' নিরাভরণা ইন্দিরার নিকট এয়োতির চিহ্নস্বরূপ; সুতরাং ইহা না খুলিয়া দেওয়ার ভিতর দিয়া তাহার চরিত্র সুন্দর বিকাশলাভ করিয়াছে।

৬। ইন্দিরা অজ্ঞান হইয়া পড়ে নাই। হিংস্রজন্তুর মুখে পড়িবার আশায় ইন্দিরা জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, প্রভাতের আলোকে ইন্দিরা প্রথমেই দেখিল তাহার হাতে কিছু নাই। 'বাঁ হাতে এক টুক্‌রা লোহা আছে—কিন্তু দাহিন হাতে কিছু নাই।' ইন্দিরা 'কাঁদিতে কাঁদিতে একটু লতা ছিঁড়িয়া দাহিন হাতে' বাঁধিল। দিনের আলোতে তাহার আবার বাঁচিবার সাধ হইল। কিন্তু দস্যুদের দেওয়া 'ছেঁড়া মুড়া কাপড়টুকু'তে লজ্জা নিবারণ হয় না; ইন্দিরা ভাবিল, লোকালয়ে যাওয়া হইবে না—তাহাকে সেইখানেই মরিতে হইবে। কিন্তু পৃথিবীর আলো, পাখীর কলতান তাহাকে আহ্বান করিল, আবার তাহার 'বাঁচিবার ইচ্ছা প্রবল হইল।' গাছের পাতা দিয়া কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করিয়া ইন্দিরা গ্রাম্য পথ অনুসরণ করিল। (ইন্দিরা ৩-৪, ১০-১২ পৃঃ)।

পথিপার্শ্বে বৃক্ষতলে নিদ্রা—'ইন্দ্রালয়ে শ্বশুরবাড়ী' যাইবার স্বপ্ন—লম্পট যুবকের কঠিন স্পর্শে স্বপ্নভঙ্গ ও কাঠের সাহায্যে আত্মরক্ষা (ইন্দিরা ৪, ১২ পৃঃ) নূতন সংযোজনা। এই প্রকার নূতন ব্যঞ্জনার ফলে ইন্দিরার কাহিনী অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

৭। সহানুভূতিশীল ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পাইলে ব্রাহ্মণ ইন্দিরাকে 'দুইখানা খাটো বহরের চৌড়া রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী' পরিতে দিলেন। 'শাঁকার কড়ও তাঁর ঘরে ছিল', ইন্দিরা 'তাহাও চাহিয়া লইয়া' পরিল। (ইন্দিরা ৪, ১৪ পৃঃ)।

ইহা নূতন সংযোজনা। সামান্য ঘটনা হইলেও ইহার ভিতর দিয়া উভয় চরিত্রই অধিকতর স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে।

৮। কলিকাতার পথে গঙ্গার ঘাটের বর্ণনা এবং অমলা ও নির্ম্মলার গান (ইন্দিরা ৫, ১৫-১৭ পৃঃ) নূতন সংযোজনা। উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে আর্টের দিক দিয়া এই গানের সার্থকতার উল্লেখ করিয়াছি।

৯। কৃষ্ণদাসবাবুর পত্নী ইন্দিরার নিকট 'দাসীপনা'র প্রস্তাব করিলেন। (ইন্দিরা ৬, ১৯ পৃঃ)।

স্ত্রীলোকের নিকট এরূপ প্রস্তাব স্ত্রীলোকের মারফত আসাই সঙ্গত, এবং কৃষ্ণদাসবাবুর পত্নীর মুখে এই প্রস্তাব স্বাভাবিক করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিম পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, তিনি ইন্দিরার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না (ইন্দিরা বলিতেছে, 'বসু মহাশয়ের পরিবার কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়াও, কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।' ইন্দিরা ৪, ১৫ পৃঃ)।

১০। কৃষ্ণদাসবাবুর পত্নীর প্রস্তাব শুনিয়া ইন্দিরা 'আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে' লাগিল। (ইন্দিরা ৬, ১৯ পৃঃ)। বলা বাহুল্য ইহাই স্বাভাবিক।

১১। রামরাম দত্তের সংসারে তাঁহার স্ত্রী—'লম্বা কালির বোতল গলায় গলায় কালিভরা', পুত্র রমণবাবু, পুত্রবধূ সুভাষিণী এবং তাঁহাদের পাঁচ বৎসরের কন্যা হেমা ও তিন বৎসরের শিশুপুত্র, যেন 'একটি আধফুটন্ত ফুল।' আখ্যায়িকায় ইহাদের প্রত্যেকেরই সুনির্দ্দিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। 'বামন ঠাকুরাণী'ও অন্যতম নূতন সৃষ্টি।

সুভাষিণীর সহিত ইন্দিরার বিশ্রম্ভালাপ, ইহার ফাঁকে ফাঁকে সুভাষিণীর শিশুপুত্রের ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুলি, হেমার ছড়া, 'কালির বোতল'কে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দিরার অপূর্ব্ব কৌশল প্রয়োগ (ইন্দিরা ৯, ৩৪-৩৫ পৃঃ), বামন ঠাকুরাণীর দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাকে সং সাজানো (ঐ ৯, ৩৬ পৃঃ), সুভাষিণীর নিকট ইন্দিরার 'একজামিন' (ঐ ১৩, ৫২-৫৩ পৃঃ) উপন্যাসখানিকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দিয়াছে।

১২। ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্রবাবুর সহিত রামরাম দত্তের 'কারবার ঘটিত কিছু সম্বন্ধ' রহিয়াছে এবং তিনি রমণবাবুর 'মোয়াক্কেল'। কিন্তু মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া তাঁহার আগমন হইলেও, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে রমণবাবু ও সুভাষিণীর গোপন ষড়যন্ত্র। (ইন্দিরা ১২, ৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৩। সুভাষিণীর সহৃদয়তায় ইন্দিরা সামান্য রাঁধুনী মাত্র নহে; সুতরাং তাহাকে দিয়া পরিবেশন করাইবার জন্য রমণবাবুকে দস্তুরমত কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। (ইন্দিরা ১১, ৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৪। সহসা 'রমণীমনোহর' বাবুটিকে দেখিয়া ইন্দিরা 'বিদ্যুচ্চমকিতের ন্যায় একটু অন্যমনস্ক' হইলেও 'জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কুটিল কটাক্ষ' করে নাই, অথবা নারীসুলভ ঔৎসুক্যবশতঃ ঘোমটার ভিতর দিয়া আগন্তুক অতিথিকে দেখিয়া লইলেও 'খরদৃষ্টিতে' বা

'তীব্রদৃষ্টিতে' তাঁহার প্রতি তাকায় নাই। ইন্দিরার ভাষায়, "তত পাপ [তাহার] হৃদয়ে ছিল না।'

তথাপি ইন্দিরা নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, 'বুঝি তিনি একটা কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া থাকিবেন।' ইহাতে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, ইন্দিরা অনুতপ্ত হইল। এই প্রসঙ্গে সে বলিতেছে, 'আমি একটু লজ্জিতা, একটু অসুখী হইলাম। আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা, বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামীসন্দর্শন হইয়াছিল- সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপনীনিক্ষেপে বুঝি তরঙ্গ উঠিল ভাবিয়া বড় অপ্রফুল্ল হইলাম। মনে মনে নারীজন্মে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনে মনে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনের ভিতর মরিয়া গেলাম।' (ইন্দিরা ১১, ৪১-৪২ পৃঃ)।

বলা বাহুল্য এই পরিবর্তনের ফলে ইন্দিরার চরিত্র সম্পূর্ণ নূতন রূপ পাইয়াছে এবং অতি সহজেই সে পাঠকের পূর্ণ সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। অন্যথা স্বামীর সহিত তাহার পুনর্মিলনের দিনে একটা বড় রকমের খুঁত থাকিয়া যাইত।

১৫। ইন্দিরা 'একটু অধিক করিয়া বিষ ঢালিয়া' কটাক্ষ করিয়াছে সত্য, কিন্তু 'মাথার কাপড় ফেলিয়া' দাঁড়ায় নাই, 'মাথার কাপড় খাটো করিয়া দিয়া' দাঁড়াইয়াছিল। (ইন্দিরা ১২, ৪৪-৪৫ পৃঃ)। পরিবর্তন সামান্য হইলেও ইন্দিরার চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া উপেক্ষণীয় নহে।

১৬। হারাণী সুভাষিণীর ইঙ্গিত না পাইয়া দৌত্যগ্রহণে সম্মত হইল না। অর্থাৎ, সুভাষিণীর বিশ্বস্ত পরিচারিকা সাধারণ পরিচারিকা হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীয়া।

১৭। রামরামবাবুর বাড়ীতে রাত্রিবাসের উদ্দেশ্যে উপেন্দ্রবাবুর অসুস্থতার ভান (ইন্দিরা ১৪, ৫৪ পৃঃ) নূতন সংযোজনা।

১৮। এস্থলে কোন পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু স্বামীর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই ইন্দিরা সুভাষিণীর নিকট শুনিয়াছে যে, তাঁহার 'স্ত্রী নেই।' (ইন্দিরা ১৩, ৫১ পৃঃ)। ইহা নূতন সংযোজনা। এখানে প্রশ্ন ওঠে: যে কথা সে পূর্ব্বেই সুভাষিণীর নিকট শুনিয়াছে, স্বামীর মুখের কথায় তাহা সমর্থিত হওয়ায় আহ্লাদ হইলেও নূতন করিয়া 'বড় আহ্লাদে'র কারণ কি? তবে কি অনবধানতাবশতঃ এই অংশ অপরিবর্তিত রহিয়াছে? কিংবা সুভাষিণী যখন বলিল, 'ওঁর যে স্ত্রী নেই' তখন তাহার কথায় ইন্দিরা কি ইহাই বুঝিয়াছে যে কলিকাতায় তাঁহার স্ত্রী সঙ্গে নাই? দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়।

১৯। ইন্দিরা বলিতেছে, 'ইনি আমার স্বামী—পতিসেবাতেই আমার আনন্দ—তাই, --কৃত্রিম নহে—সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত, আমি তাহা করিতে-ছিলাম।' (ইন্দিরা ১৬, ৫৯-৬০ পৃঃ)।

হিন্দু নারী যে আবেষ্টনের মধ্যে শিক্ষালাভ করে সেখানে স্বামী স্বামী বলিয়াই মহূর্ত্তে পত্নীর ভালবাসা আকর্ষণ করে। পরস্পরের সাহচর্যো এই ভালবাসার বুনিয়াদ পাকা হইলেও বিবাহক্ষণেই ইহার আরম্ভ বা গোড়াপত্তন। সুতরাং নূতন করিয়া 'আন্তরিক ভালবাসিতে আরম্ভ' করার প্রশ্ন ওঠে না।

২০। এই অংশ সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

স্বামীর ভালবাসা পাইবার জন্য ইন্দিরা গণিকা সাজিয়াছে, স্বামীকে নিকটে পাইবার জন্য প্রয়োজন হইলে আজীবন নিজেকে গণিকা বলিয়া পরিচয় দিতেও সে দ্বিধাবোধ করিবে না ; ইহা তাহার ঐকান্তিক স্বামীভক্তির নিদর্শন। কিন্তু কৌশলে স্বামীর সম্পত্তি নিজের নামে লেখাপড়া করিয়া লইয়া তাঁহাকে আয়ত্তাধীন করিবার মত নীচতা ইন্দিরার চরিত্র কলঙ্কিত করে নাই। কুমুদিনীরূপে হউক বা নিজের পরিচয়ে হউক, ইন্দিরা স্বামীর ভালবাসা চাহিয়াছে, তাঁহাকে দেউলিয়া হইবার ভয় দেখাইয়া হাতের মুঠোয় রাখিতে চাহে নাই।

২১। বাড়ী যাইবার জন্য চিঠি আসায় উপেন্দ্রবাবু ইন্দিরার নিকট কিছু-দিনের জন্য দেশে যাইবার কথা উত্থাপন করেন। (ইন্দিরা ১৭, ৬২ পৃঃ)।

রমণবাবুর নিকট কুমুদিনীরূপিণী ইন্দিরা সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুর প্রশ্নাবলী (ইন্দিরা ১৭, ৬৩-৬৪ পৃঃ), উপেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক ইন্দিরার জেরা (ঐ ১৮, ৬৫-৭০ পৃঃ) এবং তিনি যখন তাহাকে 'মায়াবিনী' বলিয়া সন্দেহ করিলেন তখন সেই সন্দেহের সূত্র ধরিয়া ইন্দিরার নিজেকে বিদ্যাধরী বলিয়া পরিচয় প্রদান (ঐ ১৮-১৯, ৬৮-৭১পৃঃ) নূতন সংযোজনা।

২২। কুমুদিনীরূপিণী ইন্দিরার সহিত পরামর্শমত (ইন্দিরা ১৯, ৭১ পৃঃ) উপেন্দ্রবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মহেশপুর আসিলেন। সেখানে তাঁহাকে লইয়া ইন্দিরা ও কামিনীর রঙ্গ (ইন্দিরা ২০, ৭৩-৭৫ পৃঃ) ইন্দিরার বিদ্যাধরীর ভূমিকা অভিনয়ের জের। বলা বাহুল্য ইহা নূতন সংযোজনা।

২৩। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

ইন্দিরা কোনরূপ দানপত্র লিখিয়া নেয় নাই ; সুতরাং দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলার প্রশ্ন ওঠে না।

২৪। 'সেকালে যেমন ছিল' এবং 'উপসংহার'—এই দুইটি পরিচ্ছেদ নূতন সংযোজনা।

যুগলাঙ্গুরীয়

'যুগলাঙ্গুরীয়' ১২৮০ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহার সহিত শতবার্ষিক সংস্করণের উপন্যাসের কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নাই।

রাধারাণী

'রাধারাণী' ১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহার সহিত শতবার্ষিক সংস্করণের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে রাধারাণীর নিকট বসন্তের লেখা পরিচয়-পত্র দিতে যাইয়া কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিতেছেন যে, তাঁহার ভগিনী বলিয়া দিয়াছেন, 'এই পত্র লইয়া তাঁহাকে রাধারাণীর কাছে যাইতে বলুন। স্বয়ং রাধারাণী সন্ধান দিবেন ও লইবেন।'

বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৪১ পৃঃ।

এবং রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রাজপুরে আসিয়া যখন 'রুক্মিণীকুমারের প্রসাদে'র রক্ষীদের নিকট শুনিলেন যে 'শ্রীমতী রাধারাণী দাসী এই অন্নসত্র দিয়াছেন' তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা বলিতে পার, এই রাধারাণী সধবা না বিধবা ?"

'উত্তর "সধবাও নন্—বিধবাও নন্—উনি বিবাহ করেন নাই। বড় মানুষের মেয়ে—উঁহার কেহ নাই—কে বিবাহ দিবে ?"'

বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮২, ৩৩৬ পৃঃ।

ফলে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ যখন রাধারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তখন তাহাকে চিনিতে না পারিলেও এই মহিলাটির নাম যে রাধারাণী এবং ইনি যে অবিবাহিতা ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

২। কামাখ্যাবাবুর কন্যার পত্র লইয়া কি উদ্দেশ্যে তিনি তাহার

সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখপূর্ব্বক রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ যখন প্রশ্ন করিলেন, ইহাতে তিনি 'কোন অপরাধ' করিয়াছেন কি, তখন রাধারাণী বলিতেছে, ''করিয়াছেন। তাহা পশ্চাৎ বলিব কি? এক্ষণে ইহাই বলি, যে আপনি মতিভ্রমে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন।''

বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৪১ পৃঃ।

৩। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ যখন 'সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন' অথচ তিনি যে অর্থ দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিলেন না, তখন রাধারাণী বলিল, ''এই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, যে যদি আপনি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা সাহস করিয়া বলিব কি? আপনাকে কোন কথা বলিতে সাহস হয় না,'' ইত্যাদি।

বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৪১-৪২ পৃঃ।

৪। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ যখন বলিলেন, কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আর রাধারাণীর কোন খোঁজ পাইলেন না, তখন রাধারাণী বলিতেছে, ''[আপনি রাধারাণীকে যেরূপ ভালবাসেন দেখিতেছি, তাহার কারণ জানিবার জন্য আমার বড় ব্যস্ততা হইতেছে। স্ত্রীলোকে অমন ব্যস্ত হইয়াই থাকে। তাই] একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয়, সে রথের দিন নিরাশ্রয়ে, বৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন?''

বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৪২ পৃঃ।

৫। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ যখন বলিলেন যে, 'একখানা ক্ষুদ্র নোট' বালিকা রাধারাণীর কুটীরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তখন রাধারাণী বলিল, ''আমার অতি সামান্য একটা প্রয়োজন আছে। আসিতেছি। একটু অপেক্ষা করুন।''

'সেই নোটখানি রাধারাণী অদ্যাপি যত্নে রাখিয়াছিল—তাহা বাহির করিয়া আনিল। আসিয়া বলিল,

''নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই—তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন।'' '

রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ কৈফিয়তস্বরূপ বলিলেন যে, তিনি নোটের গায়ে লিখিয়া দিয়াছিলেন, ''রাধারাণীর জন্য'' এবং তাহাতে ''রুক্মিণীকুমার রায়''—এই স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। রাধারাণী বলিল, ''তাই বলিতেছিলাম, আপনি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। যে আপনার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য এত

কাতরা তাহাকে এত দিন দেখা দেন নাই কেন? সেই রাধারাণী সেই রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিতেছিল কিনা, এই দেখুন।"

'এই বলিয়া রাধারাণী সেই নোটখানি রুক্মিণীকুমারের হাতে দিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইয়া বলিলেন, "প্রভু, সেদিন তুমি আমাদিগের জীবন দান করিয়াছিলে, এ পৃথিবীতে তুমি আমার দেবতা।"'

বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৪২-৪৩ পৃঃ।

৬। ভোজনান্তে রাধারাণী রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহুমূল্য হীরক হার প্রদান করিয়া বলিল যে, রাণীজি ইহা ব্যবহার করিলে সে কৃতার্থ হইবে। উত্তরে দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "রাণীজি? রাণীজি কেহ নাই। দশ বৎসর হইল আমার পরিবার গত হইয়াছেন। আর আমি বিবাহ করি নাই।"

বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৪৩ পৃঃ।

৭। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ বিপত্নীক একথা জানিতে পারিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে রাধারাণী সেই হার তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ আপনার কণ্ঠ হইতে তাহা খুলিয়া লইয়া রাধারাণীকে পরাইয়া দিলেন এবং রাধারাণীর নিকট তাহার নিজের গলার হার চাহিলেন।

'রাধারাণী পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "চিত্রে, ওখানে আছিস কি?"

চিত্রা অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। বলিল, "আছি।"

রাধারাণী বলিলেন, "তোর শাঁকটা কোথা?"

চিত্রা বলিল, "এইখানেই আছে।"

রাধা। তবে বাজা।

এই বলিয়া রাধারাণী, আপনার নিজের গলা হইতে হার খুলিয়া, দেবেন্দ্রনারায়ণকে পরাইয়া দিলেন।

চিত্রা, উচ্চরবে শাঁক বাজাইল।' বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৪৪ পৃঃ।

৮। তারপর বিবাহ হইল। বিবাহে 'বসন্ত আসিল, তাহার ভাইয়েরা আসিল, রাজা দেবেন্দ্রের কত লোক আসিল—কিন্তু অত আর তোমাদের শুনে কাজ নাই।'—এইরূপে আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি।

বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮২, ৩৪৪ পৃঃ।

শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। পরিচয়-পত্র দিতে যাইয়া কামাখ্যাবাবুর পুত্র বলিতেছেন, 'আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র

দিলেন, আর বলিলেন যে, এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাজপুরে যাইতে বলুন। রাজপুরে যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন।' (রাধারাণী ৫, ১৯ পৃঃ)।

এবং রাজপুরে আসিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ যখন শুনিলেন যে, 'একজন স্ত্রীলোক এই অন্নসত্র দিয়াছেন' (অন্নসত্রের নাম 'রুক্মিণীকুমারের প্রসাদ' হইতে 'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদে' পরিবর্ত্তিত হইয়াছে) তখন তিনি তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন না। অথবা তিনি সধবা কি বিধবা সে সম্বন্ধেও কোন প্রশ্ন করিলেন না। (রাধারাণী ৪ দ্রষ্টব্য)।

এই সামান্য পরিবর্ত্তনের ফলে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে রুক্মিণীকুমার বলিয়া চিনিবার পর রাধারাণীর পক্ষে কল্পিত এক রাধারাণীর প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহাকে বিবাহিত বলিয়া পরিচয় দিবার এবং এই উপায়ে রাজা দেবেন্দ্র-নারায়ণকে লইয়া কিছুটা চাতুরী খেলিবার সুযোগ জুটিয়াছে। ইহাতে কাহিনীটি অধিকতর সরস হইয়াছে।

২। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের প্রশ্নের উত্তরে রাধারাণী বলিতেছে, "জানি না। বোধ হয় যে, আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়া এখানে আসিয়াছেন।" (রাধারাণী ৫, ২০ পৃঃ)।

রাধারাণী দায়ে পড়িয়া প্রগল্‌ভা হইয়াছে, কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোককে রুক্মিণীকুমার বলিয়া চিনিতে পারিলেও, তিনি কোনরূপ অপরাধ করিয়াছেন সোজাসুজি এরূপ অভিযোগ—সে অভিযোগ যতই কৃত্রিম হউক—তৎকালে তাহার পক্ষে শোভন নহে।

৩। রাধারাণী বলিল, "স্পষ্ট কথা মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে রাধারাণীর কোন কথা বলিতে সাহস হয় না;" ইত্যাদি (রাধারাণী ৫, ২০ পৃঃ)।

রাধারাণীর পূর্ব্বের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এস্থলেও অপরাধ কথাটির উল্লেখ নাই।

৪। বন্ধনীবধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। (রাধারাণী ৫, ২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বস্তুতঃ রাধারাণীর মুখে ইহা খুব শোভন বলিয়া মনে হয় না।

৫। এই অংশ সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে।

রাধারাণী রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে রুক্মিণীকুমার বলিয়া জানিতে পারিয়াও তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছে তাহার মূল উদ্দেশ্য তাঁহাকে ভাল করিয়া পরখ করিয়া লওয়া। যখন তিনি বলিলেন যে তিনি নোটের গায়ে "রাধারাণীর

জন্য" এই কথা ক'টি লিখিয়া "রুক্মিণীকুমার রায়" নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন, তখন আর কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে রাধারাণী সযত্নে রক্ষিত নোটখানি আনিতে যায় নাই। তরুণ বয়সেই যে নারী অত বড় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

আগন্তুক ভদ্রলোকই রুক্মিণীকুমার এবং তিনি রাধারাণীতে আত্ম-বিক্রীত একথা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া রাধারাণীর চাঞ্চল্য, রুক্মিণীকুমারের জাতি কি, তিনি বিবাহিত কিনা--এই সকল চিন্তা করিয়া তাহার উদ্বেগ (রাধারাণী ৬, ২১-২২ পৃঃ) নূতন সংযোজনা।

রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের সহিত বিবাহে কোন প্রতিবন্ধক নাই এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়া 'সতীন সহিতে' হইবে না—একথা নিশ্চয় করিয়া জানিবার পূর্ব্বে রাধারাণী আত্মপরিচয় দেয় নাই। তাহার ন্যায় বুদ্ধিমতী নারীর পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক।

৬। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে এবং সমগ্র জিনিষটি নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রাধারাণীকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন এইরূপ ইঙ্গিত করিলে, "এরূপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি?"--সোজা এই প্রশ্ন করিয়া রাধারাণী জানিয়া নিয়াছে যে তিনি বিপত্নীক এবং তাহা আত্মপরিচয় দিবার পূর্ব্বেই। (রাধারাণী ৭, ২৫ পৃঃ)।

৭। ভোজনান্তে মালাবদলের ব্যাপারটি এইরূপ:

রাধারাণী 'নগদ দুইটা টাকা ও কাপড়ে'র মূল্যস্বরূপ নূতন হার রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইতে গেল। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ বাধা দিয়া 'দেনা পরিশোধ' হিসাবে তাহার গলার হার চাহিয়া লইলেন এবং বলিলেন যে, এইরূপে তিনি 'দুই পয়সার ফুলের মালার মূল্য ত ফেরত পাইলেন'; সুতরাং 'মালা ফেরত দিতে' তিনি বাধ্য—এই অজুহাতে তিনি যে মুক্তাহার পরিয়া আসিয়াছিলেন তাহা রাধারাণীর গলায় পরাইয়া দিলেন। এমন সময় পূর্ব্বের শিক্ষামত চিত্রার শাঁক বাজিল—পোঁ। (রাধারাণী ৮, ২৭ পৃঃ)।

বলা বাহুল্য এই পরিবর্ত্তনের ফলে গল্পের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইয়াছে।

৮। বসন্তের সহিত রাধারাণীর রঙ্গরস এবং যে হার রাধারাণী প্রথমে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইতে গিয়াছিল তাহার সাহায্যে বসন্তের 'গলায় দড়ি' দিবার ব্যবস্থার ভিতর দিয়া আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি নিঃসন্দেহ অধিকতর উপভোগ্য হইয়াছে। এ সমস্তই নূতন সংযোজনা।

চন্দ্রশেখর

'চন্দ্রশেখর' ১২৮০ সালের শ্রাবণ মাস হইতে ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ১২৮১ সালের ভাদ্র মাসে সমাপ্ত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে কয়েকটি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে এবং কোন কোন পরিচ্ছেদ আংশিক পরিবর্জ্জিত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পরিচ্ছেদগুলি নূতনভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং সমগ্র উপন্যাস-খানি উপক্রমণিকা ও ছয় খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের সহিত শতবার্ষিক সংস্করণের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্য প্রণয়ের ইতিহাস ও চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহকথা উপন্যাসের মধ্যভাগে 'পূর্ব্ব কথা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে (ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—মাঘ ১২৮০, ৪৫৮-৬১ পৃঃ) বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে আখ্যায়িকার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হইয়াছে এবং এইরূপ ব্যঞ্জনার ফলে

(ক) ফষ্টরের বজরায় শৈবলিনীর স্বপ্ন (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮০, ৩৬৩ পৃঃ; শতবার্ষিক সংস্করণ : দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) প্রথমে একেবারেই হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়। পরে পাঠক যখন প্রতাপের সহিত তাহার সম্পর্কের বিষয় অবগত হন, তখনই তিনি ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করেন।

(খ) প্রতাপের গৃহে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতাপ ও শৈবলিনীর সাক্ষাৎ হইলে (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮০, ৩৬৬-৬৭ পৃঃ) শৈবলিনীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তির মধ্যে চমৎকারিত্ব থাকিলেও তাঁহার অতীতের ইতিহাস অজ্ঞাত থাকায় ইহাও কতকটা হেঁয়ালি বলিয়াই মনে হয়। ইহা আর্টের বিচারে শোভন নহে।

২। চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক শৈবলিনীকে বিবাহ করা সম্পর্কে বঙ্কিম লিখিয়াছেন : 'চন্দ্রশেখর তাহাকে [শৈবলিনীকে] দেখিলেন। দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, আপনার ব্রতভঙ্গ করিয়া, আপনি ঘটক হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেলেন।' চন্দ্রশেখর ২৩—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮০, ৪৬০ পৃঃ।

৩। দলনী যখন গুরগণ খাঁকে যুদ্ধের সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত

করিতে সক্ষম হইল না, তখন ক্রোধে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেও পর মুহূর্তে ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিল এবং পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধোদ্যম হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিল।

চন্দ্রশেখর ৮।- বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৯০, ২৮৫ পৃঃ। প্রঃ সং

৪। দলনী চলিয়া গেলে গুরগণ খাঁ স্বয়ং প্রহরীকে হুকুম দিয়া আসিলেন যে, যাহাদিগকে তাঁহার অনুমতিক্রমে দুর্গের বাহির হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে যেন পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়। এবং প্রত্যাবর্তনকালে দলনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রহরীকে তিনি যে আদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন তাহার উল্লেখপূর্ব্বক তাহাকে তাঁহার গৃহে ফিরিতে বলিলেন। দলনী তাঁহার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল।

চন্দ্রশেখর ৯।- বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮০, ২৮৫-৮৬ পৃঃ। প্রঃ সং

৫। শৈবলিনীর অপহরণের পর চন্দ্রশেখর শোকসন্তপ্ত চিত্তে মুঙ্গেরে শেঠভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নবাবের আদেশে তাঁহাদের সলিলসমাধি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিয়া তাঁহাদিগকে যেমন নবাবের, তেমনই ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন। চন্দ্রশেখর বুঝাইলেন যে, যখন তাঁহাদিগকে মরিতেই হইবে তখন অত্যাচারী মুসলমান ও ইংরেজ উভয়ের কবল হইতে উৎপীড়িত হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিয়া 'লোকের হিত সাধন করিয়া পুণ্য ধামে যাত্রা' করাই তাঁহাদের কর্তব্য।

চন্দ্রশেখর ৬।- বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮০, ২৭৬-৮০ পৃঃ।

৬। শোকসন্তপ্ত চন্দ্রশেখর রমানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন: (ক) তিনি শৈবলিনীর সন্ধান করেন নাই, কারণ তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন না। (খ) 'এই আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ম্লেচ্ছ কণ্টকের উদ্ধার' তাঁহার কাম্য। কিন্তু (গ) প্রতাপের সাহায্যে ফষ্টরকে দণ্ডিত করা তাঁহার সাধ্যাতীত না হইলেও তিনি তাহা চাহেন না, কারণ "সর্প বধে কি তাহার বিষ শমিত হয়? তবে অনর্থক প্রাণী হত্যা কেন?"

চন্দ্রশেখর ১০।- বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮০, ৩০৯-১২ পৃঃ।

৭। চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর সংবাদ জানাইতে বিলম্ব করার জন্য সুন্দরীকে ভর্ৎসনা করিতে যাইয়া প্রতাপ বলিতেছেন, "কেন তুমি কি জান না—আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে?" উত্তরে সুন্দরী বলিল, "জানি।" (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮০, ৩১৫ পৃঃ।)। কিন্তু চন্দ্রশেখর প্রতাপের কি উপকার করিয়াছেন পাঠক তাহা অবগত হইলেন ইহার অনেক

পরে "পূর্ব্ব কথা"য়। (ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮০, ৪৬১ পৃঃ)। ঘটনার এরূপ ব্যঞ্জনা নির্দ্দোষ নহে।

৮। প্রতাপ মুঙ্গেরে ফষ্টরের সন্ধান পাইয়াও নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চন্দ্রশেখরের নির্দ্দেশের অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি চন্দ্রশেখরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, অনুমতি পাইলে তিনি কলিকাতা দগ্ধ করিয়া শৈবলিনীর অপহরণের প্রতিশোধ লইবেন। চন্দ্রশেখর হাসিয়া বলিলেন, "পরোপরাধে পরস্য দণ্ডং?" প্রতাপ ফষ্টরকে বধ করিবার অনুজ্ঞা চাহিলে চন্দ্রশেখর তাহাতেও উত্তর করিলেন, "যদি ফষ্টরকে দণ্ডিত করিলে, আমার পূর্ব্ব সুখ ফিরিয়া পাইতাম—তবে আমি অগ্রসর না হইতাম, এমত নহে। কিন্তু এক্ষণে ফষ্টরকে দণ্ডিত করিলে আমার উপকার নাই, তবে পরের অনিষ্ট করিব কেন?"

তবে এক বিষয়ে তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন: তিনি পতি ধর্ম্মে বিমুখ হইবেন না। সুতরাং তিনি প্রতাপকে, সম্ভব হইলে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিতে বলিলেন, 'উদ্ধার করিয়া, তাঁহাকে কাশী প্রেরণ করিতে হইবে। তথায়, রমানন্দ স্বামীর কৃপায়, তাঁহার চিরপ্রবাসের ব্যবস্থা হইবে।'

চন্দ্রশেখর ১৩।- বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮০, ৩১৭ পৃঃ।

৯। প্রতাপের গৃহে সহসা শৈবলিনীকে দেখিতে পাইয়া চন্দ্রশেখর জগৎশেঠের গৃহে যাইয়া তাহাকে সেখানে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। পরে 'পথিপার্শ্বে শীতল আম্র বৃক্ষচ্ছায়ায়....ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া' শৈবলিনীর জন্য চীৎকার করিয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেখান হইতে রমানন্দ স্বামীর নিকট যাইয়া বলিলেন, "গুরো! আর সহ্য করিতে পারি না। আমাকে রক্ষা করুন, আমি শৈবলিনীকে গ্রহণ করি।" ইত্যাদি।

চন্দ্রশেখর ১৮।- বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮০, ৩৭৪-৭৫ পৃঃ।

১০। চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক প্রেরিত নবাবের নিকট দলনীর পত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রতাপের গৃহে সন্ধান লইয়া যখন সেখানে তাহাকে পাওয়া গেল না, পরন্তু সংবাদ পাওয়া গেল যে, 'জগৎশেঠের শিবিকা ও দাস দাসী গিয়া' সেখান হইতে একজন স্ত্রীলোককে লইয়া গিয়াছে, তখন ঐ স্ত্রীলোক বেগম ছাড়া অপর কেহ নহেন এইরূপ অনুমান করিয়া মুন্সী রামগোবিন্দ রায় সন্ধান লইবার উদ্দেশ্যে শেঠভ্রাতৃদ্বয়ের গৃহে গমন করিলেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে জেরা করিলেন।

চন্দ্রশেখর ২০।- বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০, ৪১১-১৩ পৃঃ।

১১। নবাবের হুকুমে শৈবলিনী জগৎশেঠের গৃহ হইতে নবাবের অন্তঃপুরে নীত হইল।

চন্দ্রশেখর ২১।- বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০, ৪১৩-১৪ পৃঃ।

১২। গঙ্গাবক্ষে সন্তরণকালে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত্তে প্রতাপ শৈবলিনীকে বলিলেন, "শপথ কর, যে এ জন্মে আমি তোমার ভ্রাতা—তুমি আমার ভগিনী। তুমি আমার কন্যাতুল্যা—আমি তোমার পিতৃতুল্য—তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ নাই। এ জন্মে তুমি আমাকে অন্য চক্ষে দেখিবে না—অন্য চক্ষে ভাবিবে না। শপথ কর।"

শৈবলিনীও শপথকালে বলিতেছে, "প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে [তুমি ভ্রাতা, আমি ভগিনী ; তুমি পিতৃতুল্য—আমি কন্যাতুল্যা।] আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি!" ইত্যাদি।

চন্দ্রশেখর ২৬।- বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮০, ৪৬৮ পৃঃ। প্রঃ সং

১৩। প্রতাপের যুদ্ধোদ্যমে শঙ্কিত হইয়া গুরগণ খাঁ তাঁহাকে মুঙ্গেরে আহ্বান করিয়া অর্থ দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন।

চন্দ্রশেখর ৩২।- বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮১, ৩২ পৃঃ।

১৪। কি কারণে দলনীর সহিত ফষ্টরের আশ্রয় ত্যাগ করে নাই, নবাবের নিকট তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে কুল্‌সম্ বলিতেছে, "আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—মনে করিয়াছিলাম সে আমাকে বিবাহ করিবে।" চন্দ্রশেখর ৩১।- বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮১, ১৩৫ পৃঃ।

১৫। উপন্যাসের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তির পরেও একটি 'পরিশিষ্ট' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পাত্রপাত্রীর মধ্যে যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন তাঁহাদের কাহার অদৃষ্টে কি ঘটিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে।

চন্দ্রশেখর, পরিশিষ্ট—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮১, ২১৮-১৯ পৃঃ। প্রঃ সং

শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের ইতিহাস এবং চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহকথা গ্রন্থারম্ভে 'উপক্রমণিকা'য় তিনটি পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। এই অতীতের কাহিনীকে পটভূমিকা করিয়া আখ্যায়িকার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইয়াছে। এবং এইরূপ পরিবেশনের ফলে আখ্যায়িকার

স্বচ্ছন্দগতি অব্যাহত রহিয়াছে ও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠের (ক) এবং (খ) চিহ্নিত ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে।

২। শৈবলিনীর রূপ দেখিয়া 'সংযমীর ব্রতভঙ্গ' হইলেও চন্দ্রশেখর পূর্ব্ব হইতেই বিবাহের বিষয় চিন্তা করিয়াছেন। (উপক্রমণিকা ৩, ৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

৩। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

দলনী যতই কোমলপ্রাণা হউক, নবাবপত্নীর সম্মান সম্বন্ধে সে পূর্ণ-মাত্রায় সচেতন। রাত্রিকালে দুর্গমধ্যে পুনঃপ্রবেশের পথ বন্ধ হইলেও যে নারী গুরগণ খাঁর আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইতে অসম্মত হইল (বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসে দলনী গুরগণ খাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং শতবার্ষিক সংস্করণে সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এ সম্বন্ধে কুল্সমের প্রস্তাব) তাহার পক্ষে একবার ব্যর্থকাম হইয়া পুনরায় গুরগণ খাঁর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা করা খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ এই পরিবর্ত্তনের ফলে দলনীর চরিত্রের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৪। এই কার্য্যের ভার একজন প্রহরীর উপর অর্পিত হইয়াছে। (চন্দ্রশেখর ২।২, ৩৪ পৃঃ)। এবং গুরগণ খাঁ যেখানে ভৃত্যের দ্বারা হুকুম পাঠাইলেন সেখানে পথিমধ্যে দলনীর সহিত সাক্ষাতের প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং এই সাক্ষাৎকার পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গুরগণ খাঁর পক্ষে সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্ব যাহাই হউক, প্রধান সেনাপতির পক্ষে তাঁহার হুকুম জানাইবার জন্য একজন সাধারণ প্রহরীর সম্মুখীন হওয়া মর্য্যাদাহানিকর এবং গুরগণ খাঁর পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কারণ তিনি নিশ্চিত জানেন কোন প্রহরী তাঁহার আদেশ অবহেলা করিতে পারে না।

৫। এই পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

আখ্যায়িকার দিক দিয়া ইহার কোন মূল্য নাই। আর যদি শোকোন্মাদ চন্দ্রশেখরের চিত্র প্রদর্শন ইহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আজীবন জ্ঞান-ব্রতী তাপসের পক্ষে শৈবলিনীর শোকে 'বহু যত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত অমূল্য গ্রন্থরাশি' ভস্মীভূত করা এবং তৎপরে গঙ্গাতীরে নৈশ-ভ্রমণকালে সহসা দলনী ও কুল্সমের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার বুক-ভাঙ্গা উক্তির ("আমার মত পথে পথে নিশা জাগরণ করে, এমন হতভাগা কে আছে?") পর ইহা যে শুধু অনাবশ্যক তাহা নহে, এরূপ অতিবিস্তার আর্টের বিচারে দূষণীয়।

৬। পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদের ন্যায় এই পরিচ্ছেদও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, কারণ এই পরিচ্ছেদও অপ্রয়োজনীয়। চন্দ্রশেখরের চরিত্রাঙ্কণের দিক দিয়াও ইহা ত্রুটিশূন্য নহে; কারণ

(ক) সংস্কারবশতঃ চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গ্রহণ না করিতে পারেন কিন্তু এই কারণে তিনি তাহার সন্ধান করিবেন না, এরূপ উক্তি যে স্বার্থপরতার পরিচয় দেয় চন্দ্রশেখরের চরিত্রে তাহা শোভন নহে এবং পূর্ব্বাপর তাঁহার আচরণের সহিত ইহার কোন সঙ্গতি নাই।

(খ) চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় উক্তিতে যে দেশপ্রীতির উচ্ছ্বাস রহিয়াছে, শেঠভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বাণীর ন্যায় আসলে তাহা প্রতিশোধ-বাসনার নামান্তর মাত্র। প্রত্যুত্তরে রমানন্দ স্বামীও তাঁহাকে বলিতেছেন, "রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হইয়াই একথা বলিতেছ।" (বঙ্গদর্শন—কার্ত্তিক ১২৮০, ৩১১ পৃঃ)। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রশেখরের দুর্ব্বলতা তাঁহার নিজের দৃষ্টিও এড়াইতে পারে নাই। রমানন্দ স্বামী এ সম্বন্ধে কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছেন, "আমি রাগাদির বশীভূত।" (ঐ, ৩১০ পৃঃ)। অবশ্য চন্দ্রশেখরের পক্ষে তৎকালীন অবস্থায় প্রতিশোধবাসনা অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু

(গ) যেখানে প্রতাপের সাহায্যে ফষ্টরকে দণ্ডিত করা তাঁহার সাধ্যাতীত না হইলেও তিনি তাহা চাহেন না, সেখানে প্রশ্ন ওঠে: যিনি নিজের প্রতি ব্যক্তিবিশেষের উৎপীড়ন স্মরণ করিয়া 'আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ম্লেচ্ছ-কণ্টকের উদ্ধার' কামনা করিয়াছেন (এবং এই উদ্দেশ্যে শেঠভ্রাতৃদ্বয়কে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন), তাঁহার পক্ষে প্রকৃত অত্যাচারী সম্বন্ধে এরূপ উদার সহনশীলতা কি সম্ভব এবং স্বাভাবিক ?

৭। প্রতাপ ও সুন্দরীর সংলাপ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে (শতবার্ষিক সংস্করণ ২।৪, ৩৯-৪০ পৃঃ); কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই পাঠক চন্দ্রশেখরের নিকট প্রতাপের কৃতজ্ঞতার কারণ অবগত হইয়াছেন। (ঐ, ৩৯ পৃঃ)।

৮। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

ফষ্টর ও শৈবলিনীর সন্ধান পাইয়াও প্রতাপ তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চন্দ্রশেখরের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় থাকিবেন, ইহা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের এই সময়ের সাক্ষাৎকার পরিবর্জ্জনের ইহাই হয়ত মূল কারণ। দ্বিতীয়তঃ প্রতাপের (এবং 'বঙ্গদর্শনের উপন্যাসের পাঠের ৬নং-এ উদ্ধৃত রমানন্দ স্বামীর) নিকট উক্তিতে ফষ্টর সম্বন্ধে চন্দ্রশেখরের উদার সহনশীলতার পর প্রতাপের যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহার উক্তির ("ফষ্টরের

বধে কাজ কি ভাই?" ইত্যাদি, চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮১, ২১৫ পৃঃ; শতবার্ষিক সংস্করণ ৬।৮, ১৩৬ পৃঃ) চমৎকারিত্ব অন্ততঃ আংশিক নষ্ট হইয়া যায়। এই দিক দিয়াও এই উভয় জিনিষ পরিবর্জ্জনের সার্থকতা রহিয়াছে।

৯। শৈবলিনী জগৎশেঠের গৃহে স্থানান্তরিত হয় নাই।

আখ্যায়িকায় শেঠভ্রাতৃদ্বয়ের কোন ভূমিকা নাই। এমত অবস্থায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে শৈবলিনীকে শেঠগৃহে স্থানান্তরিত করার ফলে আখ্যায়িকায় অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রতাপের গৃহে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর পরস্পরকে দেখিতে পাওয়ার চিত্র এইরূপঃ প্রতাপের গৃহে নিদ্রাভঙ্গ হইলে শৈবলিনী 'চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইল! দেখিল, চন্দ্রশেখর।' (শতবার্ষিক সংস্করণ ২।৮, ৫৬ পৃঃ)।

বঙ্কিম এইখানেই এই চিত্রের উপর যবনিকা টানিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের মনের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া কল্পনা করিবার ভার পাঠকের উপর। আখ্যায়িকার পরিবেশনে এই সংযম নিঃসন্দেহ উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

১০। শৈবলিনী শেঠগৃহে নীত হয় নাই। সুতরাং এই পরিচ্ছেদ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

১১। শৈবলিনী বেগমভ্রমে প্রতাপের গৃহ হইতে নবাবের অন্তঃপুরে নীত হইল। অবশ্য যে উদ্দেশ্য লইয়া শৈবলিনী বিনা আপত্তিতে নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল সে সম্বন্ধে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। (একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০, ৪১৪-১৬ পৃঃ ও শতবার্ষিক সংস্করণ ৩।২, ৫৯-৬১ দ্রষ্টব্য)।

১২। 'প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ, তাহার পালন অসাধ্য, প্রাণান্তকর।' (শতবার্ষিক সংস্করণ ৩।৬, ৭৩ পৃঃ)। শপথ সম্বন্ধে বঙ্কিম ইহার অধিক কিছু লেখেন নাই। শৈবলিনীর শপথকালীন উক্তিতেও বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে রহিয়াছে, 'তোমাকে ভুলিব।' বলা বাহুল্য সুস্পষ্ট উল্লেখ অপেক্ষা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত অধিকতর শোভন।

১৩। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

আখ্যায়িকার দিক দিয়া ইহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

১৪। কুৎলসম্ বলিতেছে, "আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—মনে করিয়াছিলাম—সে কথা যাউক।" (শতবার্ষিক সংস্করণ ৬।৩, ১২৮ পৃঃ)।

যে কারণে শৈবলিনীর শপথে প্রতাপের সহিত তাহার ভ্রাতাভগ্নী ও পিতাপুত্রীর সম্পর্কের উল্লেখ নাই, সেই কারণেই এস্থলে কুৎলসমের প্রলোভনের স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

১৫। শেষের পরেও শেষ আছে, একথা সত্য এবং ঐতিহাসিক তাহা লইয়া গবেষণা করিতে পারেন। কিন্তু ঔপন্যাসিকের সে সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা শুধু নিষ্প্রয়োজন নহে, অনেক স্থলে অবাঞ্ছনীয়।

রজনী

'রজনী' 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে ১২৮১ সালের আশ্বিন হইতে চৈত্র এবং ১২৮২ সালের বৈশাখ এবং পরে ঐ সালের ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ মোট ১২ মাসে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের সহিত শতবার্ষিক সংস্করণের পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। রজনীর নিরুদ্দেশের কিছুদিন পরে হীরালালের দেখা পাইলে তাহার সহিত যে কথাবার্ত্তা হয় তাহার উল্লেখপ্রসঙ্গে শচীন্দ্র বলিতেছেন, 'আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি রজনীর সংবাদ জান?" সে বলিল, "জানি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় সে?" সে বলিল, "জানিলে আমি বলিব কেন?" সে কিছু সন্ধান বলিল না, কিন্তু এক প্রকার বলিল যে, রজনী তাহার প্রতি অনুরক্তা হইয়া, তাহার সঙ্গে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে।'

রজনী ২।১—বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮১, ৩৭২ পৃঃ।

২। শচীন্দ্রের 'কথা'য় জন্মান্ধ রজনীর বর্ণনায় মন্ত্রপ্রয়োগের ফলে স্বপ্নদর্শনের পূর্ব্বে তাহার প্রতি শচীন্দ্রের আসক্তির কোনরূপ আভাস নাই। শচীন্দ্র বলিতেছেন, 'যাহাকে "পঞ্চবাণ" বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।' রজনী ২।২—বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮১, ৩৭৩ পৃঃ।

ফলে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসে শচীন্দ্রের আসক্তির একমাত্র কারণ বাহির হইতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ।

৩। অমরনাথ যখন হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা রজনীর সন্ধানে ব্রতী হইলেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য, এইরূপে তিনি 'লবঙ্গলতা অপহরণের প্রতিশোধ' গ্রহণ করিবেন।

রজনী ৩।৪—বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮২, ১৭ পৃঃ।

৪। আর্য্যবিদ্যা সম্বন্ধে শচীন্দ্রের সহিত বিতর্ককালে 'কিছু প্রত্যক্ষ' দেখাইবার প্রশ্ন উঠিলে সন্ন্যাসী ঠাকুর সহসা বলিলেন, "পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে।....তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।" এইরূপে কথাপ্রসঙ্গে শচীন্দ্রের উপর একটি বিশিষ্ট মন্ত্রপ্রয়োগের প্রশ্ন উঠিল। (রজনী ২।৩—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮১, ৪২১-২৪ পৃঃ)। কিন্তু আসলে শচীন্দ্র বিবাহে অসম্মত নহেন, তাঁহার প্রশ্ন উপযুক্ত পাত্রী নির্ব্বাচন সম্পর্কে। (ঐ, ৪২৪ পৃঃ)। এ অবস্থায় শচীন্দ্রকে বিবাহে প্রবৃত্তি দেওয়াইবার জন্য তাঁহার পিতার পক্ষে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কোনরূপ অনুরোধ করার যৌক্তিকতা কি? শচীন্দ্র যাহাতে রজনীকে বিবাহ করেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিবার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ তখন পর্য্যন্ত মিত্র পরিবারের কেহই জানিতেন না যে রজনী তাঁহাদের বিষয়ের প্রকৃত অধিকারিণী; তাহাকে যে পাওয়া গিয়াছে ইহাও তাঁহারা জানিতেন না।

৫। শচীন্দ্র যে রাত্রে রজনীকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, তাহার পর দিবস রাজচন্দ্র অমরনাথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। অমরনাথ শচীন্দ্রকে বলিলেন, রজনীকে পাওয়া গেলে তিনি তাহার 'পাণি-গ্রহণে ইচ্ছুক', কিন্তু শচীন্দ্রের মত না পাইলে রাজচন্দ্র কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাহে না। এই কারণেই তাঁহাকে শচীন্দ্রের নিকট আসিতে হইয়াছে। শচীন্দ্রের সন্দেহ হইল ইনি রজনীর সন্ধান জানেন; কিন্তু অমরনাথ ধরা দিবার পাত্র নহেন।

অমরনাথের কথায় শচীন্দ্রের গতরাত্রির স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে পড়িল এবং তাঁহার এই সময়ের চিন্তাধারার মধ্যে রজনীর প্রতি আকর্ষণের সুস্পষ্ট আভাস রহিয়াছে। শচীন্দ্র বলিতেছেন, 'অন্ধ ফুলওয়ালীর এরূপ বর, কেহ কখন স্বপ্নেও ভরসা করি নাই। যদি ঘটে, তবে রজনীর বড় সৌভাগ্য বটে।....কিন্তু গুটি দুই তিন কথা মনে পড়িল। প্রথমতঃ গোপালকে কথা দেওয়া হইয়াছে। ধনাদির লোভে কি বাক্য লঙ্ঘনে পরামর্শ দিব? দ্বিতীয়তঃ

এ ব্যক্তি অপরিচিত; তৃতীয়তঃ—দূর হো'ক, তৃতীয়টি ছাড়িয়া দাও।' শচীন্দ্র মৌখিক 'ছাড়িয়া' দিলেও, এই অকথিত কথা ঠিক ছাড়িয়া দিবার জিনিষ নহে।

যাহা হউক, গোপালকে কথা দেওয়া হইয়াছে, অথচ অমরনাথকে কথা না দিলে রজনীর সন্ধান মিলিবে না—উভয় সঙ্কটে পড়িয়া শচীন্দ্র তখনই গোপালকে ডাকাইয়া অমরনাথের সম্মুখেই তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, সে রজনীর সন্ধান করিতে প্রস্তুত কিনা। গোপাল রজনীর সন্ধান করিতে, অথবা সন্ধান মিলিলে তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইল। অগত্যা শচীন্দ্র অমরনাথকেই রজনীর সন্ধান করিয়া তাহাকে আনিতে বলিলেন। অমরনাথ প্রশ্ন করিলেন, "তাহার পর আপনারা এ বিবাহে আর কোন আপত্তি করিবেন না ?"

'সাত পাঁচ ভাবিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, পূর্ব্বরাত্রের স্বপ্নটি দুই চারিবার স্মরণ করিয়া' শচীন্দ্র বলিলেন, "আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।" অমরনাথ ইহা হইতে যাহাই বুঝিয়া থাকুন, শচীন্দ্রের মনে হইল, তিনি হয়ত ইহাই বুঝিয়া গেলেন যে, এই 'অঙ্গীকার দ্ব্যর্থ।'

অমরনাথ চলিয়া গেলে শচীন্দ্র তাঁহাদের পরিবারে প্রতিপালিত বাদল নামক জনৈক যুবককে তাঁহার খোঁজ লইবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন এবং মার্কণ্ডদেব গাঙ্গুলি নামক তাঁহাদের সরকারকে অমরনাথের পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদি জানিবার জন্য তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান শান্তি-পুরে পাঠাইলেন।

কিন্তু অমরনাথ গোয়েন্দার চক্ষে ধূলি দিয়া বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলেন এবং শচীন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিয়া ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করিলেন।

রজনী ২।৪—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮১, ৪২৫-৩২ পৃঃ।

৬। শচীন্দ্র বিষ্ণুরামবাবুর নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে, রজনী তাঁহাদের বিষয়ের প্রকৃত মালিক। তিনি কাগজপত্রে যে প্রমাণ পাইলেন 'তাহা ভয়ানক।' কিন্তু বিষ্ণুরামবাবু তাঁহাকে রজনীর সন্ধান দিলেন না। সুতরাং শচীন্দ্র বলিয়া পাঠাইলেন যে, রজনী নিরুদ্দেশ, 'সে জীবিত আছে কিনা নিশ্চিত না বুঝিলে' তিনি কাহাকেও বিষয় ছাড়িয়া দিবেন না।

রজনী ২।৫-৬—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১, ৪৫৮-৬০ পৃঃ।

৭। শেষ পর্য্যন্ত রজনীর পক্ষের উকিল গ্রাণ্ডলি এণ্ড বুডসকদিগের কর্ম্মকর্তা বুডসক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শচীন্দ্র তাঁহার নিকট শুনিলেন যে, অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। এবং পুনরায় বাদলচন্দ্রকে নিযুক্ত

করিয়া তাহার চেষ্টায় অমরনাথের বাসার সন্ধান পাইয়া সেখানে যাইয়া রাজচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং তাহার নিকটও এই বিবাহের সংবাদ পাইলেন। অমরনাথের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শচীন্দ্র বুঝিলেন, এবং তাঁহার বিশ্বাস হয়ত অমরনাথও বুঝিলেন, তাঁহারা পরস্পরের পরম শত্রু। রজনী ২।৬—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১, ৪৫৯-৬২ পৃঃ।

৮। রজনী যে বিষয়ের অধিকারিণী অমরনাথের নিকট যে সকল দলিলপত্র রহিয়াছে তাহা হইতে শচীন্দ্র ইহার আরও অকাট্য প্রমাণ পাইলেন। অমরনাথের অনুমতি লইয়া তিনি অন্তঃপুরে রজনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, রজনী কি বলে তাহা তিনি তাহার মুখে শুনিয়া লইবেন এবং সে যদি বিষয় গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করে তাহা হইলে তাহাকে বুঝাইয়া বলিবেন যে, এ ব্যাপারে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, সে কি কারণে পলাইল এবং অমরনাথের সহিত কি প্রকারে তাহার বিবাহ ঘটিল তাহাও তাহার নিকট জানিয়া লইবেন। 'শেষ কথা, আর একটি পরীক্ষা—' কিন্তু সে কথা মনে হইতেই শচীন্দ্র বলিতেছেন, 'কিন্তু সেটি মনে স্থান দিতে পারিলাম না—কেননা এখন রজনীর বিবাহ হইয়াছে।' অমরনাথ রজনীকে ডাকিয়া দিয়া 'বিশ্বাস বা ভদ্রতা দেখাইবার জন্য স্বয়ং কর্ম্মান্তরে গেলেন।' এই সাক্ষাৎকারের কাহিনী শচীন্দ্র যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি। শচীন্দ্র বলিতেছেন:

'আমি বলিলাম, "আমি শচীন্দ্র। একটি কথার জন্য আসিয়াছি।"

রজনী মৃদুস্বরে বলিল, "আজ্ঞা করুন।"

আমি বলিলাম, "তুমি নাকি আমাদিগকে নিঃস্ব করিয়া বিষয় কাড়িয়া লইতেছ?"

রজনী বলিল, "বিষয় আমার।"

হরি বোল!

বিষয় রজনীর হউক, কিন্তু রজনী যে আমার মুখের উপর একথা বলিবে, এমত কখন আমি মনে করি নাই। পুনরপি বলিলাম,

"বিষয় আমার পিতামহের—তুমি আমার পিতামহের কে?"

রজনী বলিল, "কেহ নই। তবে আইনমতে আমি পাই।"

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিব, ইহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম, তবে, এখন রজনীর কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আইনমতে পাইলেই কি লইবে?"

রজনী বলিল, "আমি বিষয় লইব।"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম, "তুমি এমন রাক্ষসী তাহা জানিতাম না।"

এই বলিয়া আমি বাহিরে যাইব বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিলাম। তখন রজনী ছিন্ন কদলীতরুবৎ ভূমিতে পড়িয়া গেল—তাহার কণ্ঠনির্গত চীৎকার আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল—এরূপ কাতর, এরূপ সকরুণ চীৎকার আমি কখন শুনি নাই। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম রজনী মূর্চ্ছিতা।

নিকটস্থ পাত্রে জল ছিল তাহা রজনীর মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম।...

কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। জ্ঞান প্রাপ্তির পর আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া রজনী অতি কষ্টে, রুদ্ধ স্বরে বলিল, "আপনি এখান হইতে যান। কোন কালে যদি আপনাকে ডাকিয়া পাঠাই, তবে আসিবেন, দুই একটা কথা বলিবার আছে। এখন কেন আসিয়াছেন?"

আমি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলাম।'

রজনী ২।৭—বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮১, ৫২২-২৬ পৃঃ।

শচীন্দ্রের প্রতি গোপন আসক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও মিত্র পরিবারকে নিঃস্ব করিয়া রজনী বিষয় উদ্ধার করিতে চাহে না, অথচ অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে বিষয় দাবী করিতে হইয়াছে—এই পরিপ্রেক্ষিতে শচীন্দ্রের প্রতি তাহার বিসদৃশ আচরণ এবং তাহাকে না বুঝিয়া শচীন্দ্র যখন তাহাকে রূঢ় আঘাত করিলেন তখন ইহার প্রতিক্রিয়ায় তাহার মূর্চ্ছা রজনীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় দেয়।

৯। বিষয়োদ্ধারের স্পৃহা না থাকিলেও অমরনাথের অনুরোধে রজনী ইহাতে সম্মত হইয়াছে। এবং তিনি তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া অনেক অনুরোধের পর রজনী তাঁহাকে বিবাহ করিতে, এবং যতদিন বিবাহ না হয় ততদিন পত্নী পরিচয়ে তাঁহার গৃহে বাস করিতে সম্মত হইয়াছে। অবশ্য অমরনাথও স্বীকার করিয়াছেন, যে, যতদিন বিবাহ না হয় ততদিন তিনি তাহাকে পরস্ত্রী বিবেচনা করিবেন।

রজনী ৩।৫—বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮২, ১৮-১৯ পৃঃ।

১০। রজনী অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত না হইলেও, তাহার কৃতজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন তাহাতে স্বভাবতঃই তিনি তাহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই এবং বিষয় উদ্ধারের পর হইতেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

বিষয় উদ্ধার হইলে (অবশ্য শচীন্দ্র ও তাঁহার অগ্রজ ইহা লইয়া মোকদ্দমা করিতে যান নাই), রজনী বিষয় রেজেষ্টারী করিয়া অমরনাথকে

দান করিল, কারণ রজনী বুঝিয়াছে, বিষয়ই তাঁহার কাম্য। অমরনাথ নিজেও বলিতেছেন, "মনে মনে আমারও সেই ইচ্ছা ছিল।"

রজনী ৩।১—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮১, ৫৩৯ পৃঃ।

১১। বিষয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে রজনী লবঙ্গের সহিত দেখা করিতে যাইবে বলিয়া মনস্থ করিল। অমরনাথ ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং মিত্রগৃহে যাইয়া শচীন্দ্রের মারফত লবঙ্গকে নিজের বাড়ীতে আহ্বান করিয়া আসিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তিনি জানিতে চাহেন বিষয় হারাইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য লবঙ্গ তাঁহার কলঙ্ককাহিনী বাহিরে বা রজনীর নিকট প্রকাশ করিতে চাহেন কিনা। লবঙ্গ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া স্পষ্ট বলিলেন যে, আগে জানিলে তিনি কখনও এ বিবাহ হইতে দিতেন না। কিন্তু এখন তিনি 'ঘর ভাঙ্গিয়া রজনীকে কাতর' করিবেন না। অমরনাথের 'যেটি প্রধান ভয় ছিল,....তাহা দূর হইল।' এবং তিনি আশ্বস্ত হইলেন। সেই সঙ্গে 'হঠাৎ এক সন্দেহ —এক আহ্লাদ [তাঁহার] মনে উদয় হইল।' কিন্তু তাঁহার প্রতি লবঙ্গের মনোভাব কিরূপ তাহা জানিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

রজনী ৩।১ —বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮১, ৫৪০-৪৩ পৃঃ।

১২। রজনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অমরনাথের সম্মুখেই রজনী লবঙ্গের নিকট তাহার ভিক্ষা জানাইল: যদি কখনও সে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তিনি যেন অপরাধিনী বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া না দেন। লবঙ্গ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আমার গৃহ, তোমার গৃহ।"

রজনী ৩।১—বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ৫৪৩-৪৪ পৃঃ।

১৩। লবঙ্গ চলিয়া গেলে রজনী অমরনাথকে বলিল, তিনি তাহার মান রক্ষা করিয়াছেন সেই ঋণ পরিশোধের জন্য সে মিত্র পরিবারের জমিদারী কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছে। কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য সে নিজে ভোগ করিতে পারিবে না। অমরনাথের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, সুতরাং সে এখন নিষ্কৃতি চায়। অমরনাথের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাঁহাদের বিষয় সে কাড়িয়া নিয়াছে, রজনী তাঁহাদের 'দাসীত্ব' করিবে। অমরনাথ ইহাতে আপত্তি করিলেন। কিন্তু রজনীর প্রতি মমতাবশতঃ নহে। তিনি আপত্তি করিলেন, কারণ তাঁহাকে বিষয় দিয়া রজনী 'স্বয়ং ভিখারিণী হইয়া পরাশ্রয়ে গেলে' লোকে তাঁহাকে 'অর্থলুব্ধ কুচক্রী' বলিবে এবং তাঁহার 'সম্ভ্রম যাইবে।' অমরনাথ রজনীকে ভয় দেখাইলেন যে এতদিন সে নিজেকে তাঁহার পত্নী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, এখন তিনি স্বামী নহেন, এই বলিয়া অন্যত্র চলিয়া

গেলে লোকে তাহাকে কুলটা বলিবে। 'লজ্জায়, দুঃখে, ক্রোধে রজনীর মুখ নীলবর্ণ হইল।' কিন্তু সে সঙ্কল্পচ্যুত হইল না। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, রজনী শান্তিপুরে অমরনাথের পৈতৃক বাড়ীতে যাইয়া বাস কবিবে। সেখানে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে অনেক অনাথা গ্রাসাচ্ছাদন পায়। রজনী সেখানে তাহাদের মত থাকিবে, কেহ তাহার পরিচয় জানিবে না।

রজনী ৩।২—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮১, ৫৪৪-৪৭ পৃঃ।

১৪। ব্যবস্থামত রজনী শান্তিপুরে বাস করিতে গেল।

রজনী ৩।৬—বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮২, ১৯ পৃঃ।

১৫। অসুস্থ হওয়া অবধি একলা থাকিলেই শচীন্দ্র "ধীরে রজনী"—এই কথা বলে। সুতরাং রজনীকে একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে কি হয় পরীক্ষা করিবার জন্য লবঙ্গ রজনীকে আনিবার উদ্দেশ্যে অমরনাথের গৃহে পরিচারিকা পাঠাইলেন। পরিচারিকা খবর লইয়া আসিল, রজনী সেখানে নাই। সুতরাং অমরনাথের আনুকূল্য ব্যতীত রজনীকে আনা সম্ভব নয় বুঝিয়া রামসদয় মিত্রের অনুমতি লইয়া লবঙ্গ অমরনাথকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অমরনাথ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

রজনী ৫।১—বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮২, ২৮৬-৮৮ পৃঃ।

১৬। অমরনাথকে আহারে বসাইয়া লবঙ্গ পুতনারূপে তাঁহাকে 'বিষ' (বাক্যবিষ) পান করাইতে বসিলেন। অর্থাৎ, অমরনাথের অতীতের কলঙ্কের চিহ্নের উল্লেখ করিয়া ভয় দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে রজনীর ঠিকানা আদায় করিবার চেষ্টা করিলেন। অমরনাথ কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও লবঙ্গের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না।

রজনী ৫।১—বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮২, ২৮৮ পৃঃ ও ঐ ৫।২—বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮২, ২৮৯-৯১ পৃঃ।

১৭। আচমনান্তে অমরনাথ বলিলেন, 'ধমকে চমকে' সত্য কথা বলিবেন, তিনি তত কাপুরুষ নহেন। তিনি সবলভাবে জানিতে চাহিলেন, লবঙ্গ সত্যই তাঁহার অনিষ্ট করিবেন কিনা। লবঙ্গ কুটিল পন্থা ছাড়িয়া সহজভাবে উত্তর করিলেন, অমরনাথ যাহাই করুন, তিনি তাঁহার অনিষ্ট করিবেন না। শুনিয়া 'অমরনাথের চক্ষে জল আসিল।' তিনি 'গদগদস্বরে' বলিলেন, "লবঙ্গলতা, তুমিই জিতিলে। আমি আবার হারিলাম। আমায় বিশ্বাস কর। আমায় কি বিশ্বাস করিতে পার ?" লবঙ্গ অমরনাথের মুখের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন, 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সরল বিশ্বাসভূমি।' লবঙ্গ

বলিলেন, "তোমায় বিশ্বাস করিব।" অতঃপর তিনি অমরনাথের নিকট শচীন্দ্রের রোগের কথা জানাইলেন এবং কি জন্য তিনি রজনীর সন্ধান করিয়াছেন তাহাও ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া অমরনাথ 'অনেকক্ষণ নিরুত্তর' রহিলেন। পরে বলিলেন, "আজ আমি চলিলাম—আবার একদিন আসিতেছি, শীঘ্রই আসিব।" তিনি প্রশ্ন করিলেন, পুনর্ব্বায় আসিলে এইরূপ নির্জ্জন সাক্ষাৎ হইবে কি? লবঙ্গ সম্মতিজ্ঞাপন করিলে তিনি সোজা প্রশ্ন করিলেন, ইহাতে তাঁহার স্বামী কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না ত? লবঙ্গ 'চমকিয়া' উঠিলেন, বলিলেন, "যদি সে কথা মনে করিলে, তবে আমার সঙ্গে, তোমার আর সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। যতদিন তোমাকে অবিশ্বাস করিয়াছি—ততদিন দেখা সাক্ষাতে ক্ষতি ছিল না—আজ তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি—আজি হইতে তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য নহে।"

লবঙ্গ মনে করিযাছিলেন, অমরনাথ হয়ত বলিবেন, "তোমার বিশ্বাস তুমি ফিরাইয়া লও।" কিন্তু অমরনাথ তাহা বলিলেন না। ইহাতে লবঙ্গ সন্তুষ্ট হইলেন। অমরনাথ বলিলেন, "সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য নহে, আমি যেমন করিয়া হয়, তোমার কার্য্যসিদ্ধি করিব।" কিন্তু পরক্ষণেই 'একটি ক্ষুদ্র ভিক্ষা আছে'—এইরূপ উল্লেখ করিয়া আর একবার সাক্ষাৎ কামনা করিয়া তিনি 'প্রসন্নচিত্তে' বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রজনী ৫।৩—বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮২, ২৯১-৯২ পৃঃ।

১৮। পর দিবস অমরনাথ রজনীকে লইয়া মিত্রগৃহে আসিলেন এবং আপনি বহির্বাটীতে থাকিয়া পরিচারিকার সঙ্গে রজনীকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। রজনী আসায় লবঙ্গ বলিতেছেন, 'আমি যে অমরনাথকে বিশ্বাস করিয়া ভুল করি নাই, ইহা বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম।

অমরনাথ অবিশ্বাসী থাকিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত? কোন্ মূর্খে একথা বলিবে? কন্দর্পের রূপ আর হরিশ্চন্দ্রের সত্যপরায়ণতা একত্রিত হইলেও ললিত লবঙ্গলতা ললিত লবঙ্গলতাই থাকিবে। ইহলোকে লবঙ্গলতার এই গর্ব্ব।'

রজনী ৫।৪—বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮২, ২৯২-৯৪ পৃঃ।

১৯। পর পর কয়েক দিবস শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অমরনাথ বুঝিলেন, শচীন্দ্র রজনীতে অনুরক্ত। শচীন্দ্র সুস্থ হইলে একদিন তিনি রজনীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক আনুপূর্ব্বিক তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়া বলিলেন, তিনি বিষয় চাহিয়াছিলেন, বিষয় পাইয়াছেন। এখন তাঁহারই দোষে রজনী যখন আশ্রয়শূন্য হইয়াছে, তখন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কেহ তাহাকে

বিবাহ করিলে তিনি সুখী হইবেন। অমরনাথ বুঝিলেন, তাঁহার কথা সত্য বলিয়া নিশ্চিত বুঝিলে শচীন্দ্র নিজেই রজনীকে বিবাহ করিবেন।

রজনী ৬।১—বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৬২-৬৪ পৃঃ।

২০। পর দিবস লবঙ্গের সহিত শেষ সাক্ষাৎকালে অমরনাথ প্রশ্ন করিলেন, "আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?" লবঙ্গ উত্তর করিলেন, "শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয় পাখণ্ড।"

রজনী ৬।২—বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৬৪ পৃঃ।

লবঙ্গের উক্তি রূঢ় হইলেও সত্য।

২১। একই সময়ে তাঁহার কলিকাতা ত্যাগ করা সম্বন্ধে হালকাভাবে দু'একটি কথা বলিবার পর অমরনাথ প্রশ্ন করিলেন, "আমি এই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তুমি কি যথার্থই সুখী হও?" (এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই তিনি লবঙ্গের সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছিলেন।)

লবঙ্গ উত্তর করিলেন, "....যথার্থই সুখী হই। কেন না, তোমাকে যেমন করিতে চাহি, তুমি সেরূপ হইলে না। অতএব তোমাকে না দেখিলেই আমি ভাল থাকি।" অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে কিরূপ দেখিতে চাও?"

'লবঙ্গ, কয়েকটা কথায় এক ঋষির চিত্র আঁকিল—জিতেন্দ্রিয়, অস্বার্থপর, পরোপকারী, বৈরাগী....।'

অমরনাথ প্রশ্ন করিলেন, "আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল করিতে চাও? আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল না দেখিলে দুঃখিত হও?"

লবঙ্গ বলিলেন, "তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—"

রজনী ৬।২—বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৬৬ পৃঃ।

২২। যে দানপত্রের দ্বারা রজনী অমরনাথকে তাহার সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল, অমরনাথ তাহা লবঙ্গের সম্মুখে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

রজনী ৬।২—বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৬৭ পৃঃ।

শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। হীরালালের নিকট রজনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই জানে না বলিল। (৩।১, ৪৪ পৃঃ)। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ হীরালাল যতই উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র হউক, শচীন্দ্রের সম্মুখে বেপরোয়াভাবে কথা বলিতে যে সাহসের প্রয়োজন সে সাহস তাহার নাই। আসলে সে ভীরুস্বভাব।

২। 'যাহাকে "পঞ্চবাণ" বলে রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।'—এই কথা বলিয়া পর মুহূর্ত্তেই শচীন্দ্র প্রশ্ন করিতেছেন, "নাই কি?" (রজনী ৩।২, ৪৪ পৃঃ)। ইহা তাৎপর্য্যপূর্ণ। উপন্যাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

৩। অমরনাথ যখন রজনীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য রজনীকে সাহায্য করা। তিনি বলিতেছেন, 'রজনী হয়ত নিতান্ত দরিদ্রাবস্থাপন্না। সন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমার আর কোন কাজ নাই।' (রজনী ২।৫, ৩৭ পৃঃ)। এইরূপে গোড়াতেই অমরনাথের চরিত্রাঙ্কনে পরিবর্ত্তনের সূচনা।

৪। রজনীকে পাওয়া গিয়াছে এবং বিষয় দাবী না করিলেও সে যে বিষয়ের প্রকৃত মালিক সন্ন্যাসী ঠাকুর কর্ত্তৃক মন্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বেই এ সংবাদ মিত্র পরিবারের সকলেই অবগত ছিলেন এবং বিষয় হারাইয়া নিঃস্ব হইবার আশঙ্কায় রামসদয় মিত্র নিজেই শচীন্দ্র রজনীকে বিবাহ করেন তাঁহাকে এইরূপ অনুরোধ করিয়াছেন। শচীন্দ্র রাজী না হওয়ায় রামসদয় মিত্র (এবং লবঙ্গ) শেষ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। সন্ন্যাসী ঠাকুর খোলাখুলিভাবে না বলিলেও শচীন্দ্রের পিতা নিশ্চয়ই শচীন্দ্রকে সাধারণভাবে বিবাহে প্রবৃত্তি দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন নাই, শচীন্দ্র যাহাতে রজনীকে বিবাহ করিতে সম্মত হন, তিনি ইহাই চাহিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার দিক দিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরকে অনুরোধ করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

৫। সন্ন্যাসী ঠাকুর কর্ত্তৃক মন্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বের কথা: শচীন্দ্র রাজচন্দ্রের নিকট সংবাদ পাইলেন যে, রজনীকে পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার একমাস পরে অমরনাথ একক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। অমরনাথ তাঁহাকে দুইটি সংবাদ জানাইলেন: এক, তিনি রজনীকে বিবাহ করিতে চাহেন; দুই, রজনী মিত্র পরিবারের জমিদারীর প্রকৃত মালিক। (রজনী ৩।৩, ৪৬-৪৮ পৃঃ)।

অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিতে চাহেন, এ সংবাদে শচীন্দ্র 'অবাক্' হইলেও তাঁহার আচরণে রজনীর প্রতি অনুরাগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা জন্মিল তিনি 'জুয়াচোরের হাতে' পড়িয়াছেন। (৩।৩)।

গোপালকে ডাকিয়া আনিয়া প্রশ্ন করা; অমরনাথের পিছনে গোয়েন্দা নিযুক্ত করা—এ সমস্তই পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, শচীন্দ্র যেখানে পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে রজনীকে পাওয়া গিয়াছে সেখানে গোপালকে

প্রশ্ন করার, অথবা অমরনাথকে জুয়াচোর বলিয়া সন্দেহ করিলেও তাঁহার পিছনে গোয়েন্দা লাগাইবার কোনরূপ সার্থকতা নাই।

৬। অমরনাথের কথায় বিশ্বাস না করিলেও শচীন্দ্র তাঁহারই মুখে প্রথম শুনিলেন যে, রজনী বিষয়ের প্রকৃত মালিক। এবং তৎপূর্ব্বেই তিনি শুনিয়াছেন যে রজনীকে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি যখন নিশ্চিত প্রমাণ পাইলেন যে, বিষয় রজনীর তখন বিষয় ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু কেহ তাহা দখল করিতে আসিল না। (রজনী ৩।৪-৫, ৫১-৫২ পৃঃ)।

৭। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

৮। ঐ।

অমরনাথের আচরণে বিষয়স্পৃহা নাই; সুতরাং শচীন্দ্র যদি রজনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাহা হইলে সে সাক্ষাৎকার যতই করুণ হউক, রজনী কখনও বিষয় ব্যাপার লইয়া কোনরূপ বিসদৃশ আচরণ করিত না।

৯। শচীন্দ্র উপযুক্ত প্রমাণ পাইয়া বিষয় ছাড়িয়া দিলেও রজনী তাহা দখল করে নাই এবং অমরনাথও এ সম্বন্ধে তাহাকে কোনরূপ অনুরোধ করেন নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া রজনী তাহার 'মাসুয়া' রাজচন্দ্রের আশ্রয়েই বাস করে। অমরনাথ তাহাকে পত্নীপরিচয়ে স্বগৃহে রাখা দূরে থাকুক, তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাবের পর হইতে তিনি কদাচিৎ কার্য্যোপলক্ষে রজনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। পক্ষান্তরে, অমরনাথ তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ইহা শুনিয়া রজনী কৃতজ্ঞতাবশতঃ সহজেই তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। ইহার জন্য অমরনাথকে কোনরূপ অনুরোধ করিতে হয় নাই।

১০। অমরনাথ আদ্যন্ত রজনীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তিনি তাহার চক্ষে দেবতা এবং বিচারের ঊর্দ্ধে।

অমরনাথকে বিষয়দানের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ রজনী জানে সে দান করিতে চাহিলেও তিনি বিষয় গ্রহণ করিবেন না। প্রকৃতপক্ষে, লবঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ হইলে রজনী তাঁহাকেই বিষয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল এবং অমরনাথ এই প্রস্তাবে প্রীত হইলেন। (রজনী ৪।২, ৬৭ পৃঃ)।

১১। লবঙ্গ একরূপ উপযাচিকা হইয়াই (৪।১, ৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তাহার 'মাসুয়া'র গৃহে রজনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য শচীন্দ্রকে বিবাহ করিতে রজনীকে রাজী করান। অমরনাথ তাঁহাকে সাক্ষাতের জন্য কোনরূপ অনুরোধ জানান নাই এবং এই সময়ে উভয়ের সাক্ষাৎ নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার।

উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে রজনীর নিকট তাঁহার কলঙ্ককাহিনী ব্যক্ত করিবেন না, অমরনাথের অনুরোধে তাঁহাকে এইরূপ আশ্বাস দিলেও, রজনী যখন অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকেই বিবাহ করার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিল, লবঙ্গ প্রথমে অমরনাথকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল তখন তিনি ভয় দেখাইলেন যে, রজনীকে বিবাহ করার সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলে তিনি এই কলঙ্ককাহিনী শুনাইতে বাধ্য হইবেন। অমরনাথ উত্তর করিলেন, লবঙ্গ শুনান বা না শুনান, তিনি নিজেই রজনীকে এই কাহিনী শুনাইবেন। শুনিয়া ইচ্ছা না হয়, সে তাঁহাকে বিবাহ করিবে না ; কিন্তু তিনি অন্ধ রজনীকে প্রতারণা করিবেন না। (রজনী ৪।২-৪)। এবং সত্যই তিনি রজনীর নিকট অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। (৫।১, ৮০ পৃঃ)।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে লবঙ্গ ভিন্ন অবস্থায় অমরনাথকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। (১৬নং দ্রষ্টব্য)। এবং অমরনাথ তাঁহার কলঙ্ককাহিনী রজনীর নিকট ব্যক্ত করেন নাই। অবশ্য পূর্ব্বে তিনি যাহাই করিয়া থাকুন, অমরনাথের বিবেক জাগ্রত হইবার পর রজনীকে বিবাহ করার কোন পরিকল্পনা না থাকায় এ বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ নৈতিক দায়িত্ব ছিল না।

১২। রজনী কখন লবঙ্গের আশ্রয় প্রার্থনা করে নাই অথবা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলে নাই। একে সে তাহার 'মাসুয়া'র আশ্রয়ে রহিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রতি অমরনাথের আচরণ সরল ও উদার। সুতরাং লবঙ্গের নিকট এরূপ অনুরোধ করার কোন কারণ ঘটে নাই।

১৩। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

১৪। ঐ।

১৫। রজনীকে ডাকিয়া পাঠাইলে শুধু রজনী নহে, শচীন্দ্রের পীড়ার সংবাদে অমরনাথও তাহাকে দেখিতে আসিলেন। (রজনী ৪।৭, ৭৮ পৃঃ)। সুতরাং অমরনাথকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবার অথবা তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না।

১৬। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

রাজচন্দ্রের বাটীতে অমরনাথের সহিত আকস্মিক সাক্ষাৎ হইলে রজনীকে বিবাহ করার সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে অতীতের কলঙ্ককাহিনী উল্লেখপূর্ব্বক লবঙ্গ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছেন। (১১নং দ্রষ্টব্য)।

১৭। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

১৮। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

অমরনাথ লবঙ্গের নিকট প্রতিশ্রুতিরক্ষাকল্পে রজনীকে লইয়া মিত্রগৃহে আসেন নাই। লবঙ্গ রজনীকে ডাকিয়া পাঠাইলে শচীন্দ্রের অসুখের সংবাদ পাইয়া অমরনাথ রজনীকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসেন। (১৫ নং দ্রষ্টব্য)।

১৯। রজনীর নির্দ্দেশমত লবঙ্গের নিকট হইতে রজনীর মনের গোপন রহস্য জানিবার উদ্দেশ্যে মিত্রগৃহে আসিয়া অমরনাথ দেখিলেন, লবঙ্গ শচীন্দ্রের রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছেন। তিনি লবঙ্গের নিকট সন্ন্যাসীর বিদ্যা-পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া শচীন্দ্র সম্বন্ধে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। লবঙ্গের নিকট হইতে তিনি রজনীর মনের কথাও জানিলেন। তাঁহার মনে হইল, 'রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর ; মাঝখানে আমি কে?' তিনি সহজেই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। অতঃপর শচীন্দ্র সুস্থ হইলে একদিন তাঁহাকে বলিলেন, তিনি 'সন্ন্যাসী', সুতরাং রজনীকে বিবাহ করিতে চাহেন না। এ অবস্থায় রজনীর কোন সুপাত্র জুটিলে তিনি সুখী হইবেন। 'শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন, "রজনীর পাত্রের অভাব নাই।"' অমরনাথ বুঝিলেন, 'রজনীর বরপাত্র কে।'

২০। অমরনাথ ঠিক একই প্রশ্ন করিলেন। লবঙ্গ উত্তর করিলেন, "শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও ; আমি তোমার গুণ জানিতাম না।" (রজনী ৫।৩, ৮৪ পৃঃ)।

অমরনাথকে আমরা যে রূপে দেখিতে পাই তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহ অদ্বিতীয় ; কিন্তু তিনি কোনক্রমেই পাষণ্ড নহেন।

২১। এই সংলাপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

অমরনাথকে তিনি যে রূপে দেখিতে চাহেন, তিনি সেরূপ হইলেন না, অন্ততঃ একথা ভাবিয়া লবঙ্গের ক্ষোভের কারণ নাই। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের লবঙ্গ যে ঋষির চিত্র আঁকিয়াছেন: 'জিতেন্দ্রিয়, অস্বার্থপর, পরোপকারী, বৈরাগী' আমাদের পরিচিত, শতবার্ষিক সংস্করণের উপন্যাসের অমরনাথ ঠিক তাঁহারই প্রতীক।

অমরনাথ কেন কলিকাতা হইতে 'উঠিয়া যাইতে' চাহেন, লবঙ্গ সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে উভয়ের সংলাপ এইরূপ :

অ। যাইব না কেন? আমাকে বারণ করিবার ত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি?

অ। আমি তোমার কে যে, বারণ করিবে?

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে— রজনী ৫।৩, ৮৪ পৃঃ।

২২। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

রজনী কোন দানপত্র লিখিয়া দেয় নাই, সুতরাং দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলার প্রশ্ন ওঠে না।

অমরনাথের চরিত্রাঙ্কনে পরিবর্ত্তনের কারণ কি ?

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে অমরনাথের চরিত্র প্রথম দিকে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে: এরূপ চরিত্রের কেমন করিয়া এতটা পরিবর্ত্তন হইল যে তিনি শচীন্দ্র ও রজনীর সুখের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইলেন? বঙ্কিম অবশ্য মোটের উপর একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন: রজনী শান্তিপুর চলিয়া গেলে, কিছুদিন ঐশ্বর্য্যভোগের পর অমরনাথের মনে প্রতি-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। এই সময় অমরনাথ বলিতেছেন, 'কাহারও কিছু কাড়িয়া লইব, কাহাকেও বঞ্চনা করিব, পাকচক্রে বড়লোক হইব—এরূপ অভিসন্ধিতে আমি এ জাল পাতিলাম না। আমি যাহা হই—আমাকে যদি ক্ষুদ্র প্রবঞ্চক মনে করিয়া থাক, তবে ভুলিয়াছ। রজনীর সম্পত্তি, আমি বঞ্চনা করিয়া লই নাই—সে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে দিয়াছে—যেদিন চাহিবে সেইদিন প্রত্যর্পণ করিতে রাজী আছি। শচীন্দ্রের সম্পত্তি ন্যায়ানুসারে রজনীর—তাহাতেও কাহাকেও প্রবঞ্চনা করি নাই।......

তবে কেন এ জালবিস্তার? কেবল লোকালয়ে কি সুখ তাহা দেখিব, এই কামনায়। তাহা দেখিলাম; ইহা অপেক্ষা অরণ্য ভাল। এখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এ বিষয় সংগ্রহ করিলাম? রজনী ইহা পুনর্গ্রহণ করুক—লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করুক।' (রজনী ৩।৬—বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮২, ২০ পৃঃ)।

ইহাই অমরনাথের চরিত্রের পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস। কিন্তু তাঁহার এই কৈফিয়ত অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং একেবারেই বিচারসহ নহে। বিষয় ন্যায়ানুসারে রজনীর এবং রজনী ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছে—উভয় কথাই সত্য। কিন্তু বিষয়ের লোভে রজনীর কৃতজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তিনি যে তাহাকে শুধু বিবাহের প্রস্তাবে নহে, যতদিন বিবাহ না হয় ততদিন পত্নী-পরিচয়ে তাঁহার গৃহে বাস করিতে সম্মত করাইয়াছেন, এই কদর্য্য সত্যকে তিনি একেবারেই হিসাবের বাহিরে রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ, এ ব্যাপারে তিনি যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে এত সহজেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা কঠিন।

যাহা হউক, লবঙ্গের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-

কালে অমরনাথের আচরণে বেশ একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। ('বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠের ১৭নং দ্রষ্টব্য)। এবং লবঙ্গের নিকট তৎকালীন প্রতিশ্রুতিমত পর দিবস তিনি যখন রজনীকে সঙ্গে লইয়া মিত্রগৃহে আসিলেন, তখনই তিনি অনেকটা মনঃস্থির করিয়াছেন। কারণ ইহার পরেই তিনি বলিতেছেন, 'প্রতিজ্ঞা করিযাছি, সব বিসর্জ্জন দিব। একবার ললিতলবঙ্গ-লতার মুখে হাসি দেখিয়া, এ সংসার হইতে যাইব।' (রজনী ৬।১—বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, ৩৬২ পৃঃ)। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিষয়লাভের পর প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনের যে পরিবর্ত্তন আসিতেছিল (পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্কিম এই পরিবর্ত্তনের কোন যুক্তিসহ কারণ দর্শান নাই), এক্ষণে লবঙ্গের প্রতি ভালবাসা তাহা সম্পূর্ণ করিল। কিন্তু প্রথম দিকে লবঙ্গের প্রতি তাঁহার আচরণ স্মরণ করিলে লবঙ্গের প্রতি তাঁহার ভালবাসা যে অমরনাথের চরিত্রে কোনরূপ পরিবর্ত্তন আনিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রামসদয় মিত্রকে নিঃস্ব করিলেন, কিন্তু ইহার ফলে লবঙ্গও যে নিঃস্ব হইলেন, ইহা তাহার না বুঝিবার কথা নহে। অথচ, তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও এ বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা করেন নাই। ইহা নিশ্চিত ভালবাসার পরিচয় দেয় না। অমরনাথের পরবর্ত্তী আচরণ আরও সুস্পষ্ট। তাঁহার 'পরিবার', অর্থাৎ রজনী 'কোন বিশেষ কথা বলিতে চাহেন'—এই অজুহাতে তিনি যখন লবঙ্গকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানাইলেন, তখন, একদিন যে চতুরা নারী বালিকা বয়সেই তাঁহার অপরাধের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল, আজ মিত্র পরিবারের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন বলিয়া মিত্র পরিবারের কুললক্ষ্মী সেই নারী তাঁহার সেই লজ্জাকর শাস্তির কাহিনী জগতের সম্মুখে, অথবা রজনীর সম্মুখে প্রচার করিতে চাহেন কিনা, কৌশলে তাহা জানিয়া লওয়াই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এবং যখন তিনি বুঝিলেন যে, লবঙ্গের সেরূপ কোন সঙ্কল্প নাই তখন তাঁহার প্রধান ভয় দূর হইল। (১১নং দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ যেমন রজনীর প্রতি আচরণে তেমনই লবঙ্গের প্রতি আচরণে অমরনাথ এতাবৎকাল আত্মস্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছেন। আমরা যে অমরনাথের সহিত পরিচিত তাঁহার প্রথম জীবনের অবিমৃষ্যকারিতা ক্ষমার চক্ষে দেখাই স্বাভাবিক ; কিন্তু 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের অমরনাথ পরবর্ত্তীকালেও (তাঁহার চরিত্রের নাটকীয় পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) শুধু রজনীর প্রতি আচরণে নহে, লবঙ্গের প্রতি আচরণেও কোনরূপ শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই এবং এ পর্য্যন্ত লবঙ্গের প্রতি তাঁহার ভালবাসাকেও নিছক লালসা ছাড়া অপর কোন আখ্যা

দেওয়া চলে না। মনে হয় চরিত্রাঙ্কনের এই মৌলিক দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াই বঙ্কিম পরে এই চরিত্রটির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র পৌষ সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। চৈত্র সংখ্যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পর 'বঙ্গদর্শন' সাময়িক বন্ধ থাকে। ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশিত হইলে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অবশিষ্ট অংশ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ঐ বৎসর মাঘ সংখ্যায় উপন্যাস-খানি সমাপ্ত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের সহিত শতবার্ষিক সংস্করণের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। রোহিণীর বয়স সম্বন্ধে বঙ্কিম বলিতেছেন: 'তাহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতি বৎসর মাত্র দেখাইত।'

কৃষ্ণকান্তের উইল ৩—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২, ৪১৫-১৬ পৃঃ।

২। রোহিণীর চালচলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছেন:

(ক) 'সে....নির্জ্জল একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও খাইত।'

(খ) 'যখন পাড়ার বিধবা বিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।'

(গ) 'পল্লীর মেয়েরা যেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মজলিস করিত, রোহিণী সেখানে আখড়াধারী—টপ্পা, শ্যামাবিষয়, কীর্ত্তন, পাঁচালি, কবি, রোহিণীর কণ্ঠাগ্রে। শুনা গিয়াছে, রোহিণী "ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র" অনেক জানিত। সুতরাং মেয়েমহলে রোহিণীর পশারের সীমা ছিল না।'

ঐ ৩—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২, ৪১৬ পৃঃ। প্রঃ সং

৩। হরলাল যখন ব্যর্থকাম হইয়া ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে ফিরিয়া যাইতেছিল, রোহিণী তখন উপযাচিকা হইয়া উইল বদলাইবার ভার গ্রহণ

করিল এবং পারিশ্রমিক হিসাবে ১০০০৲ টাকা অগ্রিম আদায় করিল। অর্থলোভেই রোহিণী এই কার্য্যে ব্রতী হইল। এবং হরলালও বিধবা বিবাহের টোপ ফেলে নাই।

ঐ ৩—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২, ৪১৬-১৭ পৃঃ। প্রঃ সং

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে রোহিণীর চরিত্র প্রথম দিকে যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহার নমুনাস্বরূপ হরলালকে ডাকিয়া রোহিণী কি ভাবে অর্থের বিনিময়ে উইল বদলাইবার প্রস্তাব করিল, তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি :

'দুই চারিটী মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জন্য আসিয়াছিলাম ?"

[রোহিণী হাসিয়া মৃদু মৃদু শ্লোক বলিল,

যাও যাও আর কেলে সোনা, কাজ কি সোহাগ বাড়িয়ে।
শুনেছি সব মনের কথা, বেড়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে।।

হরলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

"বটে। তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। এখন কি একটা নূতন রোজগারের পন্থা হইল ?"

রো। হইল বই কি ?

হর। কার কাছে—কর্ত্তার কাছে এ কথা যাবে না কি ?

রো। রোজগার বড়বাবুর কাছেই হবে।

হর। কিরূপে ?

রো।] তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।' বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২, ৪১৬ পৃঃ।

প্রথম সংস্করণে বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে রহিয়াছে : 'রোহিনী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, "সব শুনেছি।"'

কৃষ্ণকান্তের উইল (শতবার্ষিক সংস্করণ) পাঠভেদ, ১২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে রোহিণী হরলালের সহিত যেরূপ নির্লজ্জ আচরণ করিয়াছে তাহা নিতান্ত ইতর রমণীতেই সম্ভব। কিন্তু তাহার মনে যতই দুর্ব্বলতা থাকুক, পরবর্ত্তীকালে গোবিন্দলালের সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার আচরণ সংযত ও সুমার্জ্জিত। অবশ্য হরলাল ও গোবিন্দলালের চরিত্রগত পার্থক্যের জন্য উভয়ের প্রতি রোহিণীর আচরণে কিছুটা পার্থক্য স্বাভাবিক।

তাহা হইলেও একের সম্মুখে যাহার আচরণ এতখানি কদর্য্য, অপরের সহিত আচরণে নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব এবং স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জনের ইহাই হয়ত প্রধান কারণ। এবং বর্ত্তমানের রূপ পাবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রোহিণীর চরিত্রে যে ক্রমিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, এইখানেই তাহার সূচনা।

৪। হরলালকে হাতে রাখিবার উদ্দেশ্যে নিজের নিকট উইল রাখিতে চাহিলে ইহা হইতে হরলালের সহিত রোহিণীর বিবাদ বাধিল। কিন্তু রোহিণী এইরূপে হরলালকে হাতে রাখিয়া তাহাকে বিবাহ করাব জন্য তাহার উপর চাপ দিতে চায় এরূপ কোন ইঙ্গিত নাই। পরন্তু নিজের নিকট উইলখানি রাখিবার অজুহাতস্বরূপ তাহার উক্তি: [''আমি ত চিরকাল আপনারই আজ্ঞাকারী।'']—তাহার চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যরূপ সাক্ষ্য দেয়; মনে হয় রোহিণী হরলালকে লালসাতৃপ্তির উপকরণস্বরূপ হাতে রাখিতে চায়।

কৃষ্ণকান্তের উইল ৫—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২, ৪১৯-২০ পৃঃ। প্রঃ সং; কিন্তু বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী রোহিণীর উক্তি পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

৫। বঙ্কিম এ পর্য্যন্ত রোহিণীকে যে রূপ দিয়াছেন তাহাতে 'রোহিণী লোভী, রোহিণী চোর,....রোহিণী ব্যাপিকা। প্রসঙ্গতঃ বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'ব্যাপিকা হইলেই আর এক অখ্যাতি, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জোটে। রোহিণীর সে গুরুতর অখ্যাতিও ছিল। সুতরাং কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না। গোবিন্দলাল কুষ্ঠগ্রস্তবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন।'

কৃষ্ণকান্তের উইল ৬—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮২, ৪৫৫ পৃঃ। প্রঃ সং

এস্থলে প্রশ্ন এই: এরূপ চরিত্র সম্বন্ধে চুরির অপবাদ রটিলে, বিশেষতঃ যেখানে সে কৃষ্ণকান্ত রায়ের নিকট হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে সেরূপ ক্ষেত্রে, গোবিন্দলালের পক্ষে তাহার প্রতি সহানুভূতি, অথবা হরলালের টাকা খাইয়া সে জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা ছাড়া রোহিণী যখন অপর কোন বিবৃতি দিতে অস্বীকৃত হইল, তখন 'ইহার ভিতর বদ্‌জাতি ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে'—গোবিন্দলালের পক্ষে এরূপ অনুমান (কৃষ্ণকান্তের উইল ১১—বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৪, ৮ পৃঃ; শতবার্ষিক সংস্করণ ১।১১, ৩৫ পৃঃ) কি স্বাভাবিক?

৬। বারুণীর ঘাটে গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর সাক্ষাতের পর

তাহাকে লইয়া সুমতি ও কুমতির 'ঘোর বিবাদে'র সময় রোহিণী যে হরলালের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিয়াছে, ইহা লইয়াও উভয়ের মধ্যে বচসা হইল।

কৃষ্ণকান্তের উইল ৮—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮২, ৪৫৭ পৃঃ। প্রঃ সং

৭। গোবিন্দলালের জেরার উত্তরে রোহিণী স্বীকার করিল, হরলালের টাকা খাইয়া তাহারই অনুরোধে সে উইল চুরি করিয়াছিল এবং সে টাকা তাহার নিকট রহিয়াছে। গোবিন্দলাল ঐ টাকা তাঁহার নিকট ফিরাইয়া দিতে নির্দ্দেশ দিয়া বলিলেন যে, তিনি উহা হরলালের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল ১২—বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৪, ১১ পৃঃ। প্রঃ সং

৮। গোবিন্দলালের নির্দ্দেশমত রোহিণী টাকা ফিরাইয়া দিল এবং গোবিন্দলাল তাহা হরলালের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল ১৪-১৫—বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪, ৬৯ পৃঃ ও ৭২ পৃঃ। প্রঃ সং

৯। ভ্রমরের মৃত্যুর পর উন্মাদপ্রায় গোবিন্দলাল রোহিণীর কণ্ঠে প্রায়শ্চিত্তের আহ্বান শুনিয়া বারুণীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল ৪৬—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮৪, ৪৬৯ পৃঃ। প্রঃ সং

শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। রোহিণীর বয়সের উল্লেখ নাই। তৎপরিবর্ত্তে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ।' (কৃষ্ণকান্তের উইল ১।৩, ১০ পৃঃ)। ইহার পর প্রয়োজন হইলে তাহার বয়স কল্পনা করিবার ভার পাঠকের উপর।

২। (ক) পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

শাস্ত্রীয় বা লৌকিক বিধান যাহাই হউক, বালবিধবার ক্ষেত্রে এরূপ কটাক্ষ দরদী মনের পরিচয় দেয় না।

(খ) পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

রোহিণীকে আমরা যে রূপে দেখিতে পাই তাহাতে তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটিবার পূর্ব্বে 'পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি'—তাহার পক্ষে খোলাখুলিভাবে এরূপ নির্লজ্জ উক্তি স্বাভাবিক নহে। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তখন সবেমাত্র বিধবা বিবাহ আন্দোলন সুরু হইয়াছে এবং সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের চক্ষে বিধবা বিবাহ ছিল নিন্দনীয়। দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য সংস্করণে রোহিণী যখন হরলালের নিকট হইতে জাল উইল চাহিয়া রাখিল (১।৩), তাহার সেই সময়ের উক্তি ও আচরণে তাহার গোপন আকাঙ্ক্ষার

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। এ অবস্থায় পূর্ব্বাহ্ণে এইরূপ মন্তব্য শুধু অনাবশ্যক নহে, আর্টের বিচারে অবাঞ্ছনীয়।

(গ) পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

কুঁদুলী বলিয়া রোহিণীর হয়ত একটুকু খ্যাতি থাকিতে পারে, উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রাণখোলা মেলামেশা করিয়া আসর জমানো সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

৩। হরলাল নিজেই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া একদিন সে রোহিণীর যে উপকার করিয়াছে তাহার উল্লেখপূর্ব্বক তাহার নিকট উইল পাল্টাইবার প্রস্তাব করিল এবং সেই সঙ্গে কৌশলে বিধবা বিবাহের টোপ ফেলিল। রোহিণীও হরলালকে পাইবার আশায় এই দুরূহ পাপকার্য্যে ব্রতী হইল। ইহার মধ্যে অর্থের প্রলোভন নাই।

৪। হরলাল তাহাকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া এখন কার্য্যোদ্ধারের পর পাছে তাহাকে ফাঁকি দেয়, এই আশঙ্কায় চতুরা রোহিণী উইলখানি নিজের নিকট রাখিতে চাহিল। এবং হরলাল যখন স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র কখন চোরকে গৃহিণী করিতে পারে না, তখন তাহার চৈতন্যোদয় হইল। (১।৫, ১৬-১৭ পৃ:)। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় গোবিন্দলালের প্রতি তাহার নূতন আকর্ষণ।

৫। রোহিণীর চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রোহিণী নির্লোভ এবং সে দুশ্চরিত্রা নহে। এই কারণেই বারুণীর তীরে তাহার সহিত গোবিন্দ-লালের যে সামান্য কথাবার্ত্তা হইল, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার প্রতি গোবিন্দ-লালের সহানুভূতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবুও মনে হয় বঙ্কিম রোহিণীকে প্রথমে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন হয়ত তাহা তাঁহার অবচেতন মনকে কিছুটা প্রভাবিত করিয়া থাকিবে, নহিলে রোহিণীকে 'একা বসিয়া' কাঁদিতে দেখিয়া গোবিন্দলাল যে ভাবিলেন, 'এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক' (১।৭, ২২ পৃ:)—এস্থলে 'দুশ্চরিত্রা' কথাটা তাঁহার মনে উঠিবার কারণ কি?

৬। সুমতি ও কুমতির বাদানুবাদের মধ্যে অর্থগ্রহণের উল্লেখ নাই, কারণ রোহিণী হরলালের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে নাই। সে দিক দিয়া তাহার বিবেক পরিষ্কার।

৭-৮। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

রোহিণী যেখানে অর্থ গ্রহণ করে নাই, সেখানে গোবিন্দলালের নিকট এ সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি অথবা তাঁহার নিকট অর্থ ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

৯। সন্ন্যাসী গোবিন্দলাল ভ্রমরের অশরীরী আত্মার প্রেরণায় 'ভগবৎ-

পাদপদ্মে মনঃস্থাপন' করিয়া প্রকৃত শান্তির অধিকারী হইলেন। উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

রাজসিংহ

'রাজসিংহ' ১২৮৪ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র চৈত্র সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে, কিন্তু ১২৮৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া অসমাপ্ত রহিয়া যায়। ১২৮৮ সালে উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ আকারে ক্ষুদ্র ছিল। চতুর্থ সংস্করণে উপন্যাসখানি বর্ত্তমানের রূপ পায়। 'বঙ্গদর্শনে' উপন্যাসের যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সহিত শতবার্ষিক সংস্করণের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠের ১নং চিহ্নিত অংশে রাজসিংহের চিত্র উপলক্ষ্য করিয়া যে কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে বা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে সে কাহিনী নাই।

২। 'চিত্রবিক্রেত্রী' বুড়ী দেশে ফিরিয়া পুত্রের নিকট রূপনগরের রাজকন্যার দুঃসাহসের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাহাকে এ সম্বন্ধে কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিল। 'পুত্র স্বীকার করিল, কিন্তু দিল্লী ফিরিয়া গিয়াই, আপনার উপপত্নীর কাছে গল্প করিল। বলিয়া দিল জান! কাহারও সাক্ষাতে বলিও না। জান, তখনই আপনার প্রিয় সখীর কাছে গিয়া বলিল। তাহার প্রিয়সখী দুই চারি দিন বাদশাহের অন্তঃপুরে গিয়া বাঁদীস্বরূপ নিযুক্ত হইল। সে অন্তঃপুরে পরিচারিকাগণের নিকট এই রহস্যের গল্প করিল। ক্রমে বাদশাহের বেগমেরা শুনিল। যোধপুরী বেগম বাদশাহের নিকট গল্প করিল।

ঔরঙ্গজেব....অমনি স্থির করিলেন যে, সেই অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাকে ইহার গুরুতর প্রতিফল দিবেন। বেগমকে বলিলেন, "রূপনগরের রাজকুমারী দিল্লীর রাজপুরে আসিয়া বাঁদীদিগের তামাকু সাজিবে।"'

রাজসিংহ ৩—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৪, ৫৭২-৭৩ পৃঃ। প্রঃ সং

৩। ঔরঙ্গজেবের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া 'যোধপুরেশ্বরকুমারী শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "সে কি জাঁহাপনা! যাহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছে এক সামান্য বালিকা কি তাহার ক্রোধের যোগ্য!" '

রাজসিংহ ৩—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৪, ৫৭৩ পৃঃ। প্রঃ সং

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে বা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে যোধপুরী বেগমের ইহার অধিক কোন ভূমিকা নাই।

৪। শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠের ৪নং চিহ্নিত অংশে যে সকল চরিত্রের উল্লেখ রহিয়াছে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে বা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে সেই সকল চরিত্র এবং সংশ্লিষ্ট কাহিনী নাই।

৫। যোধপুরী বেগম চঞ্চলকুমারীর নিকট কোন পরিচারিকা প্রেরণ করেন নাই। সুতরাং মতিওয়ালী বেশে দেবীর উল্লেখ নাই।

৬। বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেব রূপনগরের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে আনিবার জন্য ফৌজ পাঠাইতেছেন, এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে 'নির্ম্মল ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সেদিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিলেন। নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন—কাহার চিত্র, [নির্ম্মল তাহা দেখিতে পাইল না।']

রাজসিংহ ৪—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৪, ৫৭৪ পৃঃ। প্রঃ সং

৭। মহারাণার নিকট চঞ্চলকুমারীর পত্র যে আদ্যন্ত একই হাতের লেখা নহে, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে এরূপ উল্লেখ নাই; সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ইহা আদ্যন্ত রাজকুমারীর হাতে লেখা। উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে পত্রের শেষ দুই অনুচ্ছেদ নির্ম্মলের হাতে লেখা। শতবার্ষিক সংস্করণ—(পাঠভেদ, ২১০ পৃঃ)।

পত্রের শেষ অনুচ্ছেদ এইরূপ :

[আমি মুখরা, কতই বলিতেছি—পাছে বাক্যে আপনাকে না বাঁধিতে পারি—এজন্য] গুরুদেবহস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখি বাঁধিয়া দিবেন—তার পর আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে। আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব।

রাজসিংহ ৮—বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৫, ১১-১২ পৃঃ। প্রঃ সং

৮। বাদশাহের ফৌজ রূপনগরে আসিলে 'নিশীথকালে, নিদ্রার ঘোরে, চঞ্চলকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন, যে রজতগিরিসন্নিভ মহাকায়, বৃষভারূঢ়, স্নিগ্ধমূর্ত্তি, জটাজুটসমন্বিত, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সম্মুখে মূর্ত্তিমান।

তিনি আজ্ঞা করিতেছেন, "তুমি কালি হইতে ভক্তিভাবে আমার পূজা করিবে। বৎসরকাল প্রত্যহ তুমি আমার পূজা করিবে। সেই বৎসর মধ্যে তোমার বিবাহ হইবে না। তাহার পর, উপযুক্ত সময়ে তোমার বিবাহ হইবে। যদি এক বৎসর ভক্তিভরে পূজা কর, তবে অভিপ্সীত স্বামী পাইবে, ভক্তির ত্রুটি হইলে অনভিমত স্বামীর হস্তে পড়িবে।" এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।' রাজসিংহ ১০—বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫, ৫২ পৃঃ।

৯। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে বা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে দরিয়া বিবি নাই, সুতরাং মেহেরজানও নাই; কারণ মেহেরজান অবস্থান্তরে দরিয়া বিবির রূপান্তর মাত্র।

১০। রাজসিংহ মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া মোগলবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইলে চঞ্চলকুমারী যখন সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দিল্লী যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, 'রাজসিংহ বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও—আমার আপত্তি নাই—স্ত্রীলোক চিরকাল অস্থিরচিত্ত। কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পারিবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, মোগল মনে করিবে যে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ হউক—তারপর তুমি যাইও।"' ইত্যাদি।

রাজসিংহ ১৬—বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৫, ১৫১ পৃঃ। প্রঃ সং

১১। শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠের ১১নং চিহ্নিত অংশে যে সকল ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে সে সকল ঘটনা পরিবেশিত হয় নাই।

১২। রাজসিংহ রূপনগরের রাজকুমারীকে কাড়িয়া নিলে মোগল সেনাপতি হাসান আলি খাঁ দিল্লীতে ফিরিয়া বাদশাহের নিকট কি কৈফিয়ত দিবেন, ইহা ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। শেষে 'উপায় স্থির করিয়া আপনার প্রিয়পাত্র হামিদ খাঁকে ডাকিয়া স্বীয় অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন।' ব্যবস্থাটা এইরূপ: হামিদ খাঁ রাত্রির অন্ধকারে নিকটস্থ কোন ধনাঢ্য পরিবারের পুরমহিলাকে কাড়িয়া আনিয়া তাহাকেই রূপনগরের রাজকুমারীরূপে চালাইবে। মেহের সেখ নামক জনৈক সিপাহী জানাইল যে, সে এক বাড়ীর সন্ধান জানে যেখানে সে 'গোলাবের মত মোলায়েম, আফতাব ও সেতাবের মত রোশনাই করনেওয়ালী দুই একজন ষোড়শী রমণী' দেখিয়া আসিয়াছে। তাহার এই উক্তির কারণ এই যে, যখন সে রাজপুতের ভয়ে বনের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, তখন নিকটেই এক বড় মানুষের বাড়ীর জানালায় 'কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূলোদরী—পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্কা' জনৈক পরিচারিকা তাহার নজরে পড়িয়াছিল।

হামিদ খাঁ মেহের সেখের পরামর্শমত 'সেই গৃহমধ্যে ইষ্টসাধনার্থ প্রবেশ করাই' যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া তৎপূর্ব্বে 'ঠুসিয়া খিচুড়ী' ভোজনের উদ্যোগ করিল।

রাজসিংহ ১৮-১৯—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮৫, ২৩৭-৪০ পৃঃ।

'বঙ্গদর্শনে' এইখানেই উপন্যাসখানি অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। চিত্রক্রয়ের পরদিবস যে চিত্রখানি চঞ্চলকুমারী 'মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন' নির্ম্মলার আগমনের পর তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাহা 'আর পাঁচখানা চিত্রের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে....মিশাইয়া' ফেলিলেও চতুরা সহচরীর নিকট তিনি ধরা পড়িলেন; ধরা পড়িয়া বলিলেন:

গৌরী সম্ঝে ভসমভার,
পিয়ারী সম্ঝে কালা।
শচী সম্ঝে সহস্রলোচন,
বীর সম্ঝে বীরবালা॥ ইত্যাদি। ১।৩

ইহা পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণে নূতন সংযোজনা। বঙ্কিম দেখাইতেছেন, বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় হিসাবেই মহারাণার চরণে আত্মনিবেদনের কথা চঞ্চলকুমারীর মনে আসে নাই; পরন্তু 'বীরবালা' পূর্ব্ব হইতেই মহারাণার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। কাহিনীর এইরূপ পরিবেশনের ফলে চঞ্চলকুমারীর চরিত্রের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

অবশ্য, পরবর্ত্তীকালে (ঔরঙ্গজেব তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে চাহেন, এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার পর) নির্ম্মলকে দেখিয়া 'চিত্রখানি উল্টাইয়া' রাখার (রাজসিংহ ৪—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৪, ৫৭৪ পৃঃ; শতবার্ষিক সংস্করণ ৩।১, ৪২ পৃঃ) ভিতর দিয়াও আসক্তির আভাস রহিয়াছে। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের যে চিত্রের উল্লেখ করা হইল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা তাৎপর্য্যপূর্ণ হইলেও, এই চিত্র বাদ দিলে ঐ আভাস ক্ষীণ ও অকিঞ্চিৎকর।

২। 'চিত্রবিক্রেত্রী' বুড়ী পুত্রের নিকট গল্প করিলে পুত্র আপনার বিবি ফতেমার নিকট তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল এবং যাহাতে দরিয়া বিবি এই সংবাদ বেচিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তাহার নিকট ইহা বলিতে বলিল। এইরূপে সংবাদটি জেব্-উন্নিসার নিকট পৌঁছিল। এবং জেব্-উন্নিসার চক্রান্তের ফলে ক্রোধোন্মত্ত ঔরঙ্গজেব রূপনগরের রাজকুমারী আসিয়া যাহাতে বেগম সাহেবার তামাকু সাজে, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে উদিপুরীর

নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে রূপনগরের রাজকুমারীর কাহিনী বাদশাহের অন্তঃপুরের ঈর্ষ্যা ও ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত হইল এবং রাজকুমারী সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবের অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার সম্ভাব্য কারণ প্রদর্শিত হইল। এখানে যোধপুরী বেগম কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ, যোধপুরী বেগম রাজপুতনী, ঔরঙ্গজেবের ক্রূর প্রকৃতিও তাঁহার অবিদিত নহে। এ অবস্থায় একজন রাজপুত বালিকা নিজের কার্য্যের গুরুত্ব না বুঝিয়া হয়ত খেলার ছলে যে অপরাধ করিয়াছে তাহার কাহিনী বাদশাহের নিকট বর্ণনা করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে।

৩। ঔরঙ্গজেব রূপনগরের রাজকুমারীকে আনিবার আয়োজন করিতেছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া যোধপুরী বেগম তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি দেবী নাম্নী নিজের বিশ্বস্ত পরিচারিকার মাবফত রাজকুমারীকে মুসলমানেব অন্তঃপুরে না আসিতে এবং বিপদকালে মহারাণা রাজসিংহের শরণ লইতে উপদেশ দিলেন। (২।৬ ও ৩।১)।

পরবর্ত্তীকালেও যোধপুরী বেগমের আনুকূল্যেই নির্ম্মলের পক্ষে উদিপুরীর হাতে চঞ্চলকুমারীর 'নিমন্ত্রণপত্র' দেওয়া সম্ভব হইল। (৬।৪)।

৪। জেব্-উন্নিসা, উদিপুরী ও দরিয়া বিবি পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণে নূতন সৃষ্টি; সুতরাং বলা বাহুল্য জেব্-উন্নিসা-মবারক-দরিয়া কাহিনী নূতন পরিকল্পনা।

৫। মতিওয়ালী বেশে দেবীর চঞ্চলকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ (৩।১) নূতন পরিকল্পনা।

৬। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশের পরিবর্ত্তে রহিয়াছে: 'নির্ম্মলের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না।' (৩।১, ৪২ পৃঃ)। নির্ম্মল পূর্ব্বেই চঞ্চলকুমারীর মনের কথা জানিতে পারিয়াছে; এই কারণেই এই অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

৭। পত্রের শেষ দুই অনুচ্ছেদ নির্ম্মলকুমারীর হাতে লেখা। যে পর্য্যন্ত চঞ্চলকুমারীর হাতে লেখা তাহাতে বিপন্ন বালিকা হিসাবে, শরণাগত রাজপুত-রমণী হিসাবে তিনি মহারাণার নিকট তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। নির্ম্মলকুমারী কর্ত্তৃক লিখিত অংশের সুর অন্যরূপ। ইহার প্রথম অনুচ্ছেদে বিবাহের প্রস্তাব। ভাষা অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও এই অংশ যে নির্ম্মলকুমারীর লেখা, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসে এই সামান্য পরিবর্ত্তন চঞ্চলকুমারীর চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া অধিকতর শোভন হইয়াছে। পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদ পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদের জের, সুতরাং ইহাও নির্ম্মলের লেখা। এই

অনুচ্ছেদে বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে রহিয়াছে : 'তবে, আমি যে আপনার মহিষী হইবার কামনা করি, ইহা দুরাকাঙ্ক্ষা বটে। যদি আমি আপনার গ্রহণযোগ্যা না হই, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অন্যবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিবারও কি ভরসা করিতে পারি না ? অন্ততঃ যাহাতে সেরূপ অনুগ্রহও অপ্রাপ্য না নয়, এই অভিপ্রায় করিয়া'....

পরিবর্ত্তিত পাঠ অধিকতর মার্জ্জিত ও মর্য্যাদাব্যঞ্জক।

৮। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এরূপ অতিপ্রাকৃতের পরিবেশন আর্টের বিচারে শোভন নহে।

৯। মেহেরজান (৩।৮) নূতন পরিকল্পনা।

১০। চঞ্চলকুমারীর আচরণে 'রাজসিংহ' বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও—আমার আপত্তি নাই—কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পারিবে না। যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, মোগল মনে করিবে যে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক—তার পর তুমি যাইও। আর তোমার মনের কথা যে বুঝি নাই, তাহা মনে করিও না। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে দিল্লী যাইতে হইবে না।" ' ইত্যাদি (৪।৪, ৮২ পৃঃ)।

চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে যে ভাষায় পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে ভুল বোঝা বিস্ময়কর। তাছাড়া উদয়পুরের মহারাণার পক্ষে 'স্ত্রীলোক চিরকাল অস্থিরচিত্ত'—নারীর সম্বন্ধে এরূপ অমর্য্যাদাসূচক উক্তিও শোভন নহে। হয়ত এই উভয় কারণেই এই অংশ আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই পরিবর্ত্তন গুরুত্বপূর্ণ।

১১। মাণিকলাল ও নির্ম্মলকুমারীর সাক্ষাৎকার, কোর্টশিপ ও বিবাহ-কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসে নূতন সংযোজনা।

১২। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

এই ফ্যাকড়ার জের টানিতে গেলে উপন্যাসখানি অবাঞ্ছনীয়রূপে জটিল হইয়া পড়িত। দ্বিতীয়তঃ, কোন ধনাঢ্য পরিবারের পুরমহিলাকে কাড়িয়া আনিয়া তাহাকে রূপনগরের রাজকুমারীরূপে চালাইয়া ঔরঙ্গজেবকে প্রতারিত করার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা তাঁহার সেনাপতির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারের পর উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের পরিসমাপ্তি এইরূপ :

বলা বাহুল্য যে, নির্ম্মলকুমারী পরিণীতা হইয়া স্বামী কর্ত্তৃক উদয়পুরে

আনীতা এবং রাজপুরীমধ্যে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিতা হইলেন। ইহাও বলা বাহুল্য যে চঞ্চলকুমারী উদয়পুরের রাণার রাজমহিষী হইলেন। এবঞ্চ মাণিকলাল রাজদরবারে সম্মানিত হইয়া উচ্চ পদ লাভ করিলেন। তাঁহার কন্যাটি নির্ম্মলকুমারীর জিম্মায় রহিল। পিসীমার সঙ্গে আর বড় সম্বন্ধ রহিল না।

ঔরঙ্গজেব শিশুপালের দশা প্রাপ্ত হইয়া দেবীরের ক্ষেত্রে রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। সেখানেও শিশুপালের দশান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সকল কথা বলা হইল না।

রাজসিংহ (শতবার্ষিক সংস্করণ)—পাঠভেদ, ২৩৬ পৃঃ।

উপন্যাসের পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণে উদিপুরীর নিকট চঞ্চলকুমারীর 'নিমন্ত্রণপত্র', ঔরঙ্গজেব-ইমলিবেগম কাহিনী, চঞ্চলকুমারীর পণরক্ষা, জেব্-উন্নিসা-মবারক-দরিয়া কাহিনী উপন্যাসখানিকে যে অভিনব রূপ দিয়াছে তাহাতে ইহাকে পুরানো কাঠামের উপর একখানি নূতন উপন্যাস বলা যাইতে পারে।

মঠ

'আনন্দমঠ' ১২৮৭ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র চৈত্র সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৮ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইহার পর ছয় মাস 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ থাকে, সুতরাং 'আনন্দমঠে'র প্রকাশও বন্ধ থাকিয়া যায়। ১২৮৯ সালে 'বঙ্গদর্শন' পুনরায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দুই সংখ্যায় উপন্যাসখানির অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত হয়।

'আনন্দমঠে'র তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল। আর Captain Edwards নামের পরিবর্ত্তে Major Wood উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না....।' অনৈক্য মারাত্মক না হইলেও পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিম ইহা সংশোধন করিয়াছেন। অর্থাৎ, বীরভূম বরেন্দ্রভূমিতে, 'রাজনগর' 'নগরে' পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং বীরভূমের 'মহারাজাধিরাজে'র কোন উল্লেখ নাই। এবং যে সকল স্থলে পূর্ব্বে অজয় নদীর উল্লেখ ছিল, সে সকল স্থলে শুধু 'নদী'

শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।[১] এইরূপ, Major Wood নামান্তর গ্রহণ করিয়া ঐতিহাসিক Edwards হইয়াছেন ; তবে Captain-এর স্থলে তাঁহার Major পদই বাহাল রহিয়াছে।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের সহিত শতবার্ষিক সংস্করণের উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। 'অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে....অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত' করিয়া তিনবার প্রশ্ন হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?" এই প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন হইল, "তোমার পণ কি ?"

'প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, ["এ পণে হইবে না।"]

"আর কি আছে ? আর কি দিব ?" তখন উত্তর হইল, ["তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্ব্বস্ব।"]'

আনন্দমঠ, উপক্রমণিকা—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৭, ৫৩৮-৩৯ পৃঃ।

২। জীবানন্দের চরকা কাটার শব্দে আকৃষ্ট হইয়া নিমি বলিতেছে, "এ কি এ, দাদা চরকা কাটো কেন, মেয়ে কোথা পেলে, দাদা তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—কোথায় মেয়ে হলো ?"

আনন্দমঠ ১।১৫—বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮, ৫৪ পৃঃ।

৩। শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠের ৩নং চিহ্নিত অংশে যে কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে বা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে সে কাহিনী নাই।

৪। ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া শান্তি যখন প্রশ্ন করিল, "কেহ কি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই ?" তখন সত্যানন্দ ও শান্তির সংলাপ এইরূপ :

সত্য। দুই জন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে ?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। একজন আমি।

শান্তি। দ্বিতীয় ?

সত্য। জীবানন্দ।

আনন্দমঠ ১।২৪—বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮৮, ১১৫ পৃঃ। প্রঃ সং

১। কেবল একস্থলে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। (৩।১২, ১০৭ পৃঃ প্রথম পংক্তি)। সম্ভবতঃ অনবধানতাবশতঃ এস্থলে যথাযথ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

৫। সত্যানন্দ যখন ভর্ৎসনার সুরে শান্তিকে বলিলেন, "জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ?" তখন তাঁহাদের সংলাপ এইরূপ:

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামীসন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহ যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। [স্বামীব ধর্ম্মচ্যুতির ভয়ে আমি কাতরা। বৃষ্টির অভাবে মহান্ মহীরুহও শুষ্ক হয়, আমি মহান্ মহীরুহতলে বৃষ্টি করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সত্য। সে কি? মহান মহীরুহের অনাবৃষ্টির ভয়? জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতি?

শান্তি। যাহা ঘটিয়াছে তাহা আবার ঘটিতে পারে।

সত্য। কি ঘটিয়াছে? জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে? হিমালয় গহ্বরে ডুবিয়াছে?

শান্তি। কেবল সহধর্ম্মিণী-সাহায্যের অভাবে।

সত্য। কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

শান্তি। কাল মধ্যাহ্নে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে।

এবার সেই পলিতকেশ ব্রহ্মচারী চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে বসিল। সত্যানন্দকে আর কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই।

শান্তি বলিল, "প্রভু, আপনার চক্ষে জল কেন?"

সত্য। প্রায়শ্চিত্ত কি জান?

শান্তি। জানি, আত্মহত্যা।

সত্য। তাই কাঁদিতেছি। জীবানন্দের শোকে কাঁদিতেছি।

শান্তি। আমিও তাই আসিয়াছি; যাহাতে জীবানন্দ না মরে, সেইজন্য আসিয়াছি।

সত্য। বৎসে, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। তুমি সন্তান মধ্যে পরিগণিত হইলে। আমি এতক্ষণ তোমার মর্ম্ম বুঝি নাই, তাই তিরস্কার করিতেছিলাম। আমি কি বুঝিব? বনচারী ব্রহ্মচারী বৈ ত নই। স্ত্রীলোকের তুল্য হইব কি প্রকারে? জীবানন্দ মরিবে, আমিও রাখিতে পারিব না, তুমিও রাখিতে পারিবে না। * আমার এ মহাব্রতের পণ প্রিয়জনের প্রাণ। জীবানন্দ আমার প্রাণাধিক প্রিয়,

কিন্তু দেখ দক্ষিণ হস্ত গেলে দেবতার কার্য্য করিতে পারিব না। যত দিন পার, জীবানন্দকে পৃথিবীতে রাখিও। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রহ্মচর্য্য রাখিও। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য হইলে। সন্তান মাত্রই আমার আনন্দ। এই জন্য সন্তানেরা সকলে আনন্দ নাম ধারণ করে। এ আনন্দমঠ। তুমিও আনন্দ নাম ধারণ কর। তোমার নাম নবীনানন্দই রহিল।]

আনন্দমঠ ১।২৪—বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮৮, ১১৬-১৭ পৃঃ। প্রঃ সং কিন্তু প্রথম সংস্করণেই 'উপক্রমণিকা' বর্ত্তমানের রূপ পাইয়াছে; এই কারণে সত্যানন্দ ঠাকুরের উক্তিতে 'আমার এ মহাব্রতের পণ প্রিয়জনের প্রাণ' তারকা-চিহ্নিত এই বাক্যটি নাই।

৬। আনন্দমঠে জীবানন্দের সহিত পুরুষবেশী শান্তির প্রথম সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিম একটি ছোটখাটো কৌতুকচিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। নবীনানন্দরূপী শান্তি রঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে জীবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় তাঁহাকে রাগাইয়া তুলিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে 'পলায়নে তৎপর' হইল। জীবানন্দ তাহার পিছু ছুটিলেন এবং সহজেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাকে 'কায়দা করিয়া জাপটাইয়া ধরিতে' যাইয়া বুঝিলেন, এ স্ত্রীলোক। তখন জীবানন্দ তাহার হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে শান্তি বাহু দ্বারা তাঁহার গলা জড়াইয়া চীৎকার তুলিল যে, একজন গোঁসাই স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতেছে। চীৎকার শুনিয়া গোঁসাইএর দল লাঠিসোটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। জীবানন্দ যখন লজ্জা ও ভয়ে থর থর কাঁপিতেছেন, শান্তি তখন উল্টা সুরে তাঁহার প্রণয় যাচ্ঞা করিল। নিরুপায় জীবানন্দ অনুনয়ের সুরে বলিলেন, "আমি ব্রহ্মচারী—....তুমি আমার—"। এইবার শান্তি তাড়াতাড়ি নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং গোঁসাইরা আসিয়া পড়িলে নবীনানন্দরূপে তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিল যে, স্ত্রীলোকের চীৎকার তাঁহারাও শুনিয়াছেন, কিন্তু খুঁজিয়া কোন সন্ধান পান নাই। শান্তির পরিহাসস্পৃহা এইবার গোঁসাইদিগকে তাহার লক্ষ্যবস্তু করিল। বনের মধ্য হইতে শব্দ আসিতেছিল, এই বলিয়া শান্তি তাঁহাদিগকে নিবিড় বনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত জীবানন্দের অনুরোধে 'কি জানি ভৌতিক মায়াও হইতে পারে'—এইরূপ বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে মঠে ফিরাইল।

আনন্দমঠ ১।২৫—বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮৮, ১১৮-২২ পৃঃ। প্রঃ সং এই কৌতুক কাহিনীতে ভাঁড়ামি বই উচ্চাঙ্গের আর্ট নাই। বিশেষতঃ

সন্তানসেনার অন্যতম অধিনায়ক জীবানন্দকে শান্তি যে উপায়ে সহজেই রাগাইয়া তুলিল তাহা নিতান্তই হাস্যকর। কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি :

শান্তি। ....লোকে বলে জীবানন্দ ঠাকুর বড় গণ্ডমূর্খ।

জীব। গণ্ডমূর্খ, আর কি বলে?

শান্তি। মোটা বুদ্ধি।

জীব। আর কি বলে?

শান্তি। যুদ্ধে কাপুরুষ।

জীবানন্দের সর্ব্ব শরীর রাগে গর গর করিতে লাগিল...।

বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২২৮, ১২০ পৃঃ। প্রঃ সং

৭। শান্তির কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া জীবানন্দ গাহিলেন, "এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?" ইহার পর প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "....এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন পর্য্যন্তই কি—"

আনন্দমঠ ২।৩—বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৮, ১৫২ পৃঃ।

শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠের ৭নং চিহ্নিত অংশে শান্তির উত্তর হইতে যে উদ্ধৃতি রহিয়াছে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে বা উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে শান্তির উত্তরে সেই অংশ নাই।

৮। গৌরীদেবীর গৃহে কল্যাণীর সহিত ভবানন্দের সাক্ষাৎকালীন সংলাপের একাংশ এইরূপ :

ভব। সত্য কল্যাণি, আমার জীবন বিষময়। যে দিন অবধি—তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে?

[ক। সকলি শেষ হইয়াছে। কেবল স্ত্রীত্ব শেষ হয় নাই।

ভব। অভিধান?

ক। স্বর্গ-বর্গ বুঝিতে পারিলাম না। আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন?

ভব। যাহা আপনি বুঝি না, তাহা বুঝাইতে পারি না। সাহিত্য পূর্ব্বমত পড়া হইতেছে?

ক। পূর্ব্বাপর বুঝি না। কুমারসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া হিতোপদেশ পড়িতেছি।

ভব। কেন কল্যাণি?

ক। কুমারে দেবচরিত্র, হিতোপদেশে পশুচরিত্র।

ভব। দেবচরিত্র ছাড়িয়া পশুচরিত্রে এ অনুরাগ কেন?

ক। চিত্ত বশ নহে বলিয়া।] আমার স্বামীর সংবাদ কি প্রভু?

আনন্দমঠ ২।৪—বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৮, ১৫৫ পৃঃ। প্রঃ সং

৯। সত্যানন্দের নির্দ্দেশমত ব্রতচ্যুত ভবানন্দকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ধীরানন্দ যখন তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিল যে, তিনি কল্যাণীকে বিবাহ করিয়া সন্তানসেনার সাহায্যে সত্যানন্দের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া নিজে রাজা হইয়া বসুন, তখন 'ভবানন্দ ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন। [ধীরানন্দও সরিয়া গেল।] ভবানন্দ কিছুক্ষণ অন্যমনা ছিলেন, যখন খুঁজিলেন তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।'

আনন্দমঠ ২।৫—বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৮, ১৫৯ পৃঃ। প্রঃ সং

ভবানন্দের আচরণে মনে হয় ধীরানন্দের প্রস্তাব তাহার মনে কিছুটা রেখাপাত করিয়াছে।

১০। ইহার অব্যবহিত পরেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে ভগ্ন অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে বসিয়া ভবানন্দের স্বগতোক্তিতে ধীরানন্দের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভবানন্দ মনে মনে বলিতেছেন, "আমি ভাগীরথীতরঙ্গ সমীপে ক্ষুদ্র গজদেহ স্থাপন করিয়া কি করিব? যে লোভী, যে পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয়পরবশ, যে অধর্ম্মী তাহার আবার ধর্ম্ম কি? তাহার আবার সত্য কি? পাপে আমার ভয় কি? অনন্ত নরক আমার কপালে নিশ্চিত। ইহজীবন ধ্বংসের সম্ভাবনা, এই ইহজীবন ধ্বংসে আমার ভয় কি? অতএব যাহাই কপালে ঘটুক, আমি এ দুষ্কর্ম্ম করিব। এদিকেও প্রাণ যায়, সে দিকেও প্রাণ যাইবে। যে বিপদ দূরবর্ত্তী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যে বিপদ নিকটবর্ত্তী তাহা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হয়। আমি ধীরানন্দের পরামর্শ শুনিব।"

অবশ্য পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার বিবেক প্রবৃত্তির উপর জয়ী হইল। একই স্বগতোক্তিতে ভবানন্দ বলিতেছেন, "না! ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু, এ জীবন হয়তো এই মুহূর্ত্তেই সর্পদংশনে শেষ হইতে পারে, কিন্তু জন্মান্তরের তো শেষ নাই। এ জীবনে আমি যদি সুখী হই, সে দুই দিনের জন্য, পরলোকে যদি আমি দুঃখী হই, সে অনন্তকালের জন্য।"

আনন্দমঠ ২।৬—বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৮, ১৬০ পৃঃ। প্রঃ সং

১১। সত্যানন্দ যখন শান্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কুশলই হইবে", তখন তাঁহাদের সংলাপ এইরূপ:

শান্তি। "কিসে ঠাকুর—তোমার তো আজ্ঞা আছে আমার বৈধব্য।"

সত্যা। "তোমাকে আমি চিনিতাম না, [চিনিলে আমি বলিতাম হে জীবানন্দ। আমার নিকট শপথ কর যে তুমি পত্নীসহবাস ত্যাগ করিবে না। মা আমার এক ভিক্ষা আছে, তুমি স্ত্রীবেশ আর গ্রহণ করিও না।

সন্তান বেশ গ্রহণ করিয়া অসি চর্ম্ম বল্লম গ্রহণপূর্ব্বক সন্তানসেনা মধ্যে প্রবেশ কর।"

শান্তি। "প্রভো এ আজ্ঞা আমায় কেন করেন? আপনার আজ্ঞায় শিবের শত্রু জয় করিয়াছি, বিষ্ণুর শত্রুও জয় করিতে হইবে? বলিয়া শান্তি গায়িল,

"মধু মুর নরক বিনাশন—
গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান
অমল কমলদললোচন
ভবমোচন ত্রিভুবন ভবনিধান
জয় জয় দেব হরে।"

বাবা! আপনি চুপ করিয়া রহিয়াছেন কেন, দেখিতেছেন না কি কাণ্ড হইতেছে?

সত্য। কি কাণ্ড হইতেছে?

শান্তি। আপনি কি জানেন না?

সত্য। সকল জানি না।

শান্তি। তবে আমি কাল বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে—আমার স্বামীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণ আমি। মৃত্যুদণ্ড তাঁহার কপালে বিধান। তিনি ধর্ম্মে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাকে মরিতে হইবে। সুতরাং আমাকেও মরিতে হইবে। কিন্তু আপনার কার্য্য উদ্ধার হইবে কি? কে কার্য্যোদ্ধার করিবে?

সত্য। মা! দড়ির জোর না বুঝিয়া......

আনন্দমঠ ২।৭—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮৮, ২১৪ পৃঃ। প্রঃ সং

১২। একই সংলাপকালে শান্তি যখন বলিল, "মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না", 'ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মা, [মনের সকল কথা তোমায় বলি, জীবানন্দ বল, ভবানন্দ বল, মহানন্দ বল, যে কেহ বল আমার মনের কথা বুঝিবার যোগ্য তুমি ছাড়া কেহ নহে।] এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে।"' ইত্যাদি।

আনন্দমঠ ২।৭—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮৮, ২১৫ পৃঃ। প্রঃ সং

১৩। ইংরেজের সহিত সন্তানসেনার সংগ্রামকালে একদল সন্তান লইয়া 'বাঁদরের মত' বৃক্ষোপরি লুক্কায়িত থাকিয়া শান্তি বন্দুকের গুলিতে ওয়াট্‌সন সাহেবের সৈন্যদলকে বিব্রত করিয়া তুলিল এবং তাহারা বন্দুকের পাল্লার

বাহিরে গেলে অন্যান্য সন্তানের সহিত লাফাইয়া পড়িয়া শান্তি তাহাদের পশ্চাতে ছুটিল। কিন্তু সহসা "স্ত্রীলোক হইয়া যুদ্ধে যাই কেন? আমার ধর্ম্ম ত এ নয়! আমি গাছের বাঁদর গাছেই থাকি।"—এই বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বৃক্ষারোহণ করিল। পরে ওয়াট্‌সনের সেনাদল পলায়ন করিলে শান্তির সেনাদল যখন জীবানন্দের সেনাদলের সহিত মিলিত হইল, তখন সে পুনরায় বৃক্ষ হইতে নামিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহাকে কাপ্তেন হের সেনাদল দেখাইয়া দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে নির্দ্দেশ দিয়া 'বিষণ্ণমনে নারীজন্মকে ধিক্কার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া গাছে উঠিয়া "গেছো মেযে" বলিযা আপনার নিন্দা' কবিতে লাগিল।

আনন্দমঠ ২।১১—বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮৮, ২৪৩-৪৪ পৃঃ। প্রঃ সং

১৪। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে পুনরায় সংসারী হইবার অনুমতি দিলে মহেন্দ্র যখন সাশ্রুনয়নে প্রশ্ন করিলেন, "ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী ত আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কন্যা কোথায় যে তাতো জানি না........"ইত্যাদি, তখন

['মাথার উপর গাছের ডালে বসিয়া কে বলিল, "আমি জানি কন্যা কোথায় আছে।" মহেন্দ্র উন্মুখ হইয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

সত্যানন্দ একটু রুষ্টভাবে উন্মুখ হইয়া বলিলেন, "নবীনানন্দ! আমি তোমাকে বিদায় দিয়াছিলাম। তুমি এখনও এখানে কেন?"

শান্তি গাছের উপর হইতে বলিল, "প্রভু, স্বর্গে মর্ত্তে আপনার অধিকার আছে; গাছের ডালে কি?"

এই বলিয়া চুপ করিয়া শান্তি নামিয়া পড়িল।'] সত্যানন্দ 'মহেন্দ্রকে বলিলেন, "ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন।" '

আনন্দমঠ ২।১২—বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৯, ১১ পৃঃ। প্রঃ সং

১৫। শান্তির পরিচয় দিতে যাইয়া কল্যাণী যখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, "ইনি ব্রহ্মচারিণী", তখন 'মহেন্দ্র বিষণ্ণভাবে বলিল, "হউক—তথাপি প্রায়শ্চিত্ত আছে।"পরে শান্তির মুখপানে চাহিয়া বলিল, "কি প্রায়শ্চিত্ত আপনি জানেন?"

শান্তি বলিল, "মৃত্যু। কোন্ সন্তানে না জানে? আগামী মাঘী পূর্ণিমায় সে প্রায়শ্চিত্ত হইবে স্থির হইয়াছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এই বলিয়া শান্তি সেখান হইতে চলিয়া গেল। মহেন্দ্র আর কল্যাণী বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।'

আনন্দমঠ ২।১৫—বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৯, ১৭-১৮ পৃঃ। প্রঃ সং

১৬। মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে মহাপুরুষের আহ্বানের উত্তরে সত্যানন্দ যখন বলিলেন, "....জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক", তখন

'মহাপুরুষ। [ব্রত সফল হইবে না—কেন তুমি অনর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিতে চাও?] যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর,........

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।"

মহাপুরুষ। [তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না—তোমার দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে—তোমারও আর পরমায়ু নাই।]'

আনন্দমঠ ২।২০—বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, ৬৮ পৃঃ। প্রঃ সং

১৭। 'বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল'—ইহার পরও কাহিনীর জের চলিয়াছে :

'বিষ্ণুমণ্ডপ শূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।'

আনন্দমঠ ২।২০—বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, ৬৯ পৃঃ। প্রঃ সং

শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তিত পাঠ এইরূপ :

(১) 'এ পণে হইবে না' স্থলে 'জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

(২) 'তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্ব্বস্ব।' স্থলে "ভক্তি।"

উপন্যাসের পরিসমাপ্তির সহিত এই পরিবর্ত্তিত বাণীর যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের 'উপক্রমণিকা'র বাণীর সে সামঞ্জস্য নাই। সত্যানন্দের 'মনস্কাম' সিদ্ধির জন্য 'প্রিয়জনের প্রাণসর্ব্বস্ব' যদি যথেষ্ট হইত তাহা হইলে জীবানন্দকে হারাইবার পর তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে আর কোন অন্তরায় থাকিত না। মনে হয় বঙ্কিম যখন 'আনন্দ-মঠে'র রচনা আরম্ভ করেন তখন ইহার উদ্দেশ্য তাঁহার মনে সম্পূর্ণ দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই। এবং এই কারণেই উপন্যাসখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে ইহার 'উপক্রমণিকা'র প্রয়োজনানুরূপ সংশোধন করিতে হইয়াছে।

২। নিমি বলিতেছে :

"এ কি এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথা পেলে? দাদা,

তোমার মেয়ে হয়েছে নাকি—আবার বিয়ে করেছ না কি ?" আনন্দমঠ ১।১৫, ৪৪ পৃঃ।

পরিহাসছলে হইলেও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে যে প্রচ্ছন্ন বাঁকা ইঙ্গিত রহিয়াছে, পরিবর্ত্তিত পাঠে সেরূপ ইঙ্গিত নাই। নিমাইয়ের মুখে ইহাই অধিকতর শোভন।

৩। শান্তির অতীত জীবনের কাহিনী (আনন্দমঠ ২।১) সম্পূর্ণ নূতন সংযোজনা। এই পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইয়াছে উপন্যাসের পঞ্চম সংস্করণে এবং এ সম্বন্ধে 'পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিম লিখিয়াছেন, 'তৎসম্বন্ধে [শান্তির সম্বন্ধে] যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল।'

শান্তি যখন সাধারণ বাঙ্গালীঘরের মেয়ে হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির তখন তাহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কৈফিয়তস্বরূপ তাহার অতীতের ইতিহাসের বিবৃতির নিশ্চয়ই প্রয়োজন রহিয়াছে।

৪। পরীক্ষোত্তীর্ণ সন্তানের সংখ্যা দুই হইতে 'চারি জনে' দাঁড়াইয়াছে : সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ ও জ্ঞানানন্দ। (আনন্দমঠ ২।৭, ৭১ পৃঃ)।

সত্যানন্দ ব্যতীত একমাত্র জীবানন্দ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন, এইরূপ বলিলে স্বভাবতঃই মনে হয় জীবানন্দকে এই সম্মান না দিলে শান্তির দ্বারা ধনুকে গুণ দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই জীবানন্দকে এই সম্মান দেখান হইয়াছে। ইহা বাস্তবতার পরিপন্থী।

৫। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে নূতন পাঠ এইরূপ : স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না ? তাই আসিয়াছি।

সত্য। ভাল, তোমায় দিন কত পরীক্ষা করিয়া দেখি।

(আনন্দমঠ ২।৭, ৭৩ পৃঃ)।

পরিবর্জ্জিত অংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) জীবানন্দের ব্রতচ্যুতি ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে শান্তি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বেই সত্যানন্দ এইরূপ সন্দেহ করিয়াছেন, এই কারণেই ব্রতচ্যুতি ঘটিয়া থাকিলে বা ভবিষ্যতে ঘটিলে ভবানন্দের ন্যায় জীবানন্দকেও তিনি তীর্থভ্রমণান্তর ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত স্থগিত রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। (আনন্দমঠ ১।২০—বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮৮, ১০৯ পৃঃ; শতবার্ষিক সংস্করণ, ২।৩, ৬৪ পৃঃ)। এমত অবস্থায় শান্তির নিকট তিনি

যে সংবাদ পাইলেন (পরিবর্ত্তিত পাঠে ইহার উল্লেখ নাই) তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নহে। সুতরাং এ সংবাদে সত্যানন্দের আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকিতে পারে না এবং হঠাৎ তাঁহার পক্ষে 'চক্ষু ঢাকিয়া' কাঁদিতে বসাও তাঁহার চরিত্রানুরূপ নহে।

(খ) জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে, কারণ তিনি শান্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। যেখানে পত্নীর সহিত সাক্ষাতেই ধর্ম্মচ্যুতি ঘটে, সেখানে 'সহধর্ম্মিণী-সাহায্যের অভাবে' তাঁহার ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে এরূপ উক্তি অর্থহীন এবং 'যাহা একবার ঘটিয়াছে তাহা আবার ঘটিতে পারে' এই অজুহাতে শান্তির আনন্দমঠে আগমন হাস্যোদ্দীপক।

অবশ্য এক্ষেত্রে এরূপ বলা চলে যে, সত্যানন্দের নিকট কথাটা খোলাখুলিভাবে বলা সম্ভব না হইলেও, জীবানন্দ যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন ইহাকেই শান্তি 'ধর্ম্মচ্যুতি' মনে করে নাই, তিনি যে তাহাকে 'গাঢ় আলিঙ্গন' করিয়াছেন, আসলে শান্তির দৃষ্টিতে ইহাই ধর্ম্মচ্যুতি এবং পুনরায় যাহাতে এরূপ আত্মবিস্মৃতি না ঘটে, সেদিকে তাঁহাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই শান্তি আনন্দমঠে আসিয়াছে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা কতখানি যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রশ্নাতীত নহে।

(গ) শান্তি বলিতেছে, 'যাহাতে জীবানন্দ না মরে, সেই জন্য আসিয়াছি।' এস্থলে মৃত্যু বলিতে যদি আধ্যাত্মিক মৃত্যু অর্থাৎ একবার যে আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি বুঝায় তাহা হইলে শান্তির এই উক্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু মৃত্যু বলিতে যদি পার্থিব জীবনের অবসান বুঝায় (যে প্রসঙ্গে শান্তি একথা বলিয়াছে সে প্রসঙ্গে এরূপ ব্যাখ্যা নাকচ করা যায় না; অন্ততঃ সত্যানন্দ জীবানন্দের দৈহিক মৃত্যুর কথা ভাবিয়াই শোক করিয়াছেন) তাহা হইলে পরবর্ত্তীকালে সত্যানন্দের নিকট শান্তির তেজোদৃপ্ত উক্তির ('মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।' আনন্দমঠ ২।৭--বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮৮, ২১৫ পৃঃ; শতবার্ষিক সংস্করণ ৩।৭, ৯৬ পৃঃ) সহিত ইহার কোনরূপ সঙ্গতি থাকে না। অবশ্য সত্যানন্দের কাতরতার প্রতিক্রিয়ায় শান্তির পক্ষে সাময়িক দুর্ব্বলতা হয়ত অসম্ভব নহে এবং এক সময় শান্তি নিজেই জীবানন্দের নিকট প্রায়শ্চিত্তের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইয়াছে। (আনন্দমঠ ৩।৩, ৮৪ পৃঃ; বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসে ইহার উল্লেখ নাই)। কিন্তু ব্রতগ্রহণের অব্যবহিত পরেই এরূপ দুর্ব্বলতা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

(ঘ) সত্যানন্দ শান্তির শারীরিক শক্তি ও তাহার স্পষ্টভাষণের পরিচয়

পাইয়াছেন ; কিন্তু "আমি এতক্ষণ তোমার মর্ম্ম বুঝি নাই;....আমি কি বুঝিব ?" এরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সময় এখনও আসে নাই।

(ঙ) 'উপক্রমণিকা'র ভাষা ও ভাবের পরিবর্তনের পর "আমার এ মহাব্রতের পণ প্রিয়জনের প্রাণ"—সত্যানন্দের এই উক্তি অর্থহীন। বলা বাহুল্য, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাস সম্বন্ধে এ আপত্তি খাটে না।

৬। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

৭। জীবানন্দের উক্তিতে 'আমার মরিবার দিন পর্য্যন্তই কি—' স্থলে পরিবর্ত্তিত পাঠ এইরূপ: 'আমার মরিবার দিন—' (আনন্দমঠ ৩৷৩, ৮৪ পৃঃ)। জীবানন্দের তৎকালীন মনোভাবের অভিব্যক্তির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

শান্তির উত্তর হইতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি চতুর্থ সংস্করণে নূতন সংযোজনা :

'কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ, কোন দিন ত একাসনে বসো নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন?'

সাময়িক হইলেও এইখানে শান্তি আদর্শের কল্পলোক হইতে পৃথিবীর বাস্তবতায় নামিয়া আসিয়াছে। তাহার চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের আলোচনাকালে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

৮। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে রহিয়াছে :

ক। না।

ভব। অভিধান ?

ক। ভাল লাগে না।

ভব। বিদ্যা অর্জ্জনে কিছু আগ্রহ দেখিয়াছিলাম। এখন এ অশ্রদ্ধা কেন ?

ক। আপনার মত পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ, তখন লেখাপড়া না করাই ভাল। আনন্দমঠ ৩৷৪, ৮৭ পৃঃ।

কল্যাণী যে ভবানন্দকে 'মহাপাপিষ্ঠ' বলিয়া সম্বর্দ্ধিত করিলেন, ইহা পুঞ্জীভূত বিরক্তির আকস্মিক অভিব্যক্তি। কিন্তু অতীতে কল্যাণী ভবানন্দের কি পরিচয় পাইয়া থাকিবেন সে প্রশ্ন বাদ দিলেও, বর্ত্তমান সময়ে 'যে দিন অবধি—' এইটুকু বলিয়া কথার মোড় ফিরাইয়া লইলেও ইহার ভিতর যে

ইঙ্গিত রহিয়াছে কল্যাণীর পক্ষে তাহা না বুঝিবার কথা নহে। বস্তুতঃ পরিবর্জ্জিত অংশেও কল্যাণীর উক্তিতে একটুকু শ্লেষের আভাষ রহিয়াছে। এ অবস্থায় মোটের উপর চোখা চোখা কথায় অতি সংক্ষেপে ভবানন্দের প্রশ্নের জবাব দেওয়াই কল্যাণীর পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, 'চিত্ত বশ নহে'—কল্যাণীর পক্ষে এই সময় ভবানন্দের নিকট এরূপ উক্তি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

৯। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশের পরিবর্ত্তে রহিয়াছে: 'বলিলেন, "ধীরানন্দ, যুদ্ধ কর, তোমায় বধ করিব। আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাস-হন্তা নই। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে পরামর্শ দিয়াছ। নিজেও বিশ্বাসঘাতক, তোমাকে মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় না। তোমাকে মারিব।" ধীরানন্দ কথা শেষ হইতে না হইতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ভবানন্দ তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন না।' আনন্দমঠ ৩।৫, ৯৩ পৃঃ।

এই পরিবর্ত্তনের ফলে ভবানন্দের উক্তির ভিতর দিয়া তাঁহার চরিত্রগত মহত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সত্যানন্দের প্রতি তাঁহার আনুগত্য প্রশ্নের অতীত।

১০। ভবানন্দের স্বগতোক্তি (আনন্দমঠ ৩।৬, ৯৩-৯৪ পৃঃ) আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে ধীরানন্দের প্রস্তাবের উল্লেখ নাই, অথবা সে সম্বন্ধে কোনরূপ ইঙ্গিত নাই। ধীরানন্দের প্রস্তাবের উত্তরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে যাইয়া তাঁহার স্বগতোক্তির এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তনের প্রযোজন হইয়াছে।

১১। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। শান্তির প্রশ্নের উত্তরে সত্যানন্দ বলিতেছেন, "তোমারে আমি চিনিতাম না। মা! দড়ির জোর না বুঝিয়া...." —আনন্দমঠ ৩।৭, ৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পরিবর্জ্জিত অংশ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে,

(ক) শান্তির চরিত্রে সত্যানন্দ যতই মুগ্ধ হইয়া থাকুন, তাহাকে পুরুষবেশে সন্তানসম্প্রদায়ের মধ্যে বাসের অনুমতি দেওয়া এক কথা আর জীবানন্দ পত্নীসহবাস ত্যাগ করিবেন না, তাঁহাকে দিয়া এরূপ প্রতিজ্ঞা করান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা; সত্যানন্দের পক্ষে কোন এক জন সন্তানের সম্বন্ধে (তা তিনি যত বড়ই হন) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কোন কারণেই সম্ভব নহে। অবশ্য ইহা সহজেই অনুমেয় যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ভাবের আতিশয্যে বলিয়াছেন, সুতরাং ইহার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নহে। কিন্তু সত্যানন্দের মত অধিনায়কের পক্ষে ভাবাবেশে এরূপ অতিশয়োক্তি শোভন নহে।

(খ) শান্তি যে আনন্দমঠে বাস করার অনুমতি পাইয়াছে তাহা সাময়িক হইলেও তাহার প্রতি সত্যানন্দের আচরণ হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা চলে যে, শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই বাহাল রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে নূতন করিয়া কোন নির্দ্দেশ বা অনুরোধের প্রয়োজনীয়তা নাই।

(গ) "তুমি স্ত্রীবেশ আর গ্রহণ করিও না"—এই উক্তির মধ্যে যে আতিশয্য রহিয়াছে সত্যানন্দের চরিত্রে তাহা শোভন নহে। এবং তাঁহার এই অনুরোধ বাদ পড়িলে শান্তির প্রত্যুত্তরও স্বভাবতঃই বাদ পড়ে।

(ঘ) শান্তি কি 'কাণ্ডে'র ইঙ্গিত করিতেছে তাহা নিঃসংশয়ে জানিবার উপায় নাই, কারণ শান্তি 'পরে বলিব' বলিলেও কথাটা বলা হয় নাই। তবে মনে হয় ইহা কল্যাণীর প্রতি ভবানন্দের আসক্তির ইঙ্গিত। কিন্তু তাহা হইলে সত্যানন্দ যে বলিলেন, "সকল জানি না!"—ইহার তাৎপর্য্য কি? ভবানন্দের আসক্তির কথা তাঁহার অবিদিত নহে।

দ্বিতীয়তঃ, আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশ বা চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়াও এই ইঙ্গিতের কোন সার্থকতা নাই।

(ঙ) শান্তি বলিতেছে, জীবানন্দ ধর্ম্মে পতিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মরিতে হইবে, সুতরাং শান্তিকেও মরিতে হইবে। তাহা হইলে সত্যানন্দের কার্য্যোদ্ধার করিবে কে? ঠিক কথা। কিন্তু "কিসে ঠাকুর—তোমার তো আজ্ঞা আছে আমার বৈধব্য?"—শান্তির এই উক্তির মধ্যে যে পরোক্ষ ভর্ৎসনা রহিয়াছে তাহার পর এরূপ প্রত্যক্ষ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন, বিশেষ করিয়া যেখানে সত্যানন্দ নিজেই অপরাধীর ন্যায় বলিতেছেন, "তোমারে আমি চিনিতাম না।"

১২। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

আনন্দমঠ ৩।৭, ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ভবানন্দের আচরণে এবং জীবানন্দ ও ভবানন্দের আসন্ন প্রায়শ্চিত্তের দিনের কথা চিন্তা করিয়া সত্যানন্দের মনে কিছুটা নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ মেয়েলী ঢঙের উক্তি তাঁহার মুখে শোভন নহে।

১৩। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

শান্তির পক্ষে বৃক্ষারোহণ বা যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়া অসম্ভব নহে, ইহা মানিলাম। কিন্তু আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশ বা শান্তির চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া এই চিত্রের কোন সার্থকতা নাই। তাহার চাতুর্য্য, সাহস ও শক্তিমত্তার অপর যে সকল পরিচয় রহিয়াছে তাহার পার্শ্বে এই চিত্র শান্তির চরিত্রে কোন নূতন

আলোকপাত করে না। পরন্তু 'গেছো মেয়ে'র এই কাহিনী যুদ্ধের কাহিনীর গাম্ভীর্য্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

১৪। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে এবং এই পরিবর্জ্জনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পরবর্ত্তী বাক্যেও একটুকু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ এইরূপ :

সত্যানন্দ তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, "ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন।"

আনন্দমঠ ৩।১২, ১০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

উপরোদ্ধৃত পাঠে 'তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া' নূতন সংযোজনা।

পরিবর্জ্জিত অংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(ক) 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে (এবং উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে) বঙ্কিম যখন ইতিপূর্ব্বে শান্তিকে গাছে চড়াইয়াছেন, তখন সে গাছে চড়িয়াছে যুদ্ধের উন্মাদনায়। এক্ষেত্রে সেরূপ কোন কৈফিয়ত নাই। শান্তি রঙ্গপ্রিয় ; কিন্তু বর্ত্তমানের পাঠক যে শান্তির সহিত পরিচিত তাহার আচরণে সর্ব্বত্রই পরিমাণবোধ লক্ষিত হয়। এই চিত্রে সেই পরিমাণবোধের একান্ত অভাব। ইহা ভাঁড়ামি মাত্র।

(খ) শান্তিকে তিরস্কৃত করার অব্যবহিত পরেই সত্যানন্দ মহেন্দ্রের নিকট তাহার পরিচয় দিতে যাইয়া তাহার উচ্চ প্রশংসা করিতেছেন ; এই উভয় জিনিষের সামঞ্জস্য কোথায় ?

(গ) প্রধান আপত্তি এই : সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় দিলেন কখন ? 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে (এস্থলে ইহাই আমাদের বিচার্য্য) সত্যানন্দ শান্তিকে পুরুষবেশে সন্তানসেনা মধ্যে' বাস করিতে স্পষ্টতঃ অনুরোধ করিয়াছেন। (১১ চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য সংস্করণে এই অংশ পরিবর্জ্জিত হইলেও সত্যানন্দ যে শান্তিকে জীবানন্দের প্রাণ রক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন (আনন্দমঠ ২।৭, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮৮, ২১৪-১৫ পৃঃ ; শতবার্ষিক সংস্করণ ৩।৭, ৯৫।৯৬ পৃঃ), তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শান্তি 'আনন্দমঠে' বাস করে ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। বস্তুতঃ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে সত্যানন্দের সুস্পষ্ট অনুরোধ এবং ঐ উপন্যাসে এবং শতবার্ষিক সংস্করণে পূর্ব্বাপর শান্তির প্রতি তাঁহার আচরণের সহিত সত্যানন্দের 'স্পষ্টভাবে' কঠোর উক্তির কোন সঙ্গতি নাই। এবং সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় দিয়াছেন

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে অথবা পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপন্যাসে কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই।

১৫। 'ইনি ব্রহ্মচারিণী।'—এইখানেই বঙ্কিম এই চিত্রের উপর যবনিকা টানিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই একটি কথার ভিতর জীবানন্দ ও শান্তির যে পরিচয় রহিয়াছে তাহাতে মহেন্দ্রের বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইবার কথা। প্রায়শ্চিত্তের কথা ঠিক এই মুহূর্ত্তে স্মরণে না আসাই স্বাভাবিক; বিশেষতঃ 'হউক'—এই কথাটির ভিতর যে তাচ্ছিল্যের ভাব রহিয়াছে তাহা একেবারেই অশোভন।

১৬। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশের পরিবর্ত্তে রহিয়াছে:

(ক) প্রথম অংশের স্থলে: ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংবেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ।

(খ) দ্বিতীয় অংশের স্থলে: শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই। আনন্দমঠ ৪।৮, ১৩২ পৃঃ।

ব্রত সফল কি নিষ্ফল হইয়াছে, এ প্রশ্নের উত্তর, ব্রত কি?—এই বৃহত্তর প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে। সত্যানন্দ ঠাকুর হিন্দুরাজ্য পুনঃসংস্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রত নিষ্ফল হইয়াছে একথা সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে বক্তা মহাপুরুষ এবং তিনি সন্ন্যাসীবিদ্রোহের উদ্দেশ্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ফল হইলেও, বৃহত্তর দৃষ্টিতে ব্রত সফল হইয়াছে। এবং সে অবস্থায় 'তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না'—এরূপ উক্তিরও কোন সার্থকতা নাই।

১৭। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

এস্থলে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের জের টানিয়া উপন্যাস রচনার অভিপ্রায় সূচিত হয়। 'দেবী চৌধুরাণী' কি সেই উপন্যাস?

যাহা হউক, উত্তরকালে অনুরূপ উপাদান লইয়া বঙ্কিম কি উপন্যাস রচনার ইচ্ছা পোষণ করেন, পাঠকের পক্ষে তাহা জানিবার আগ্রহ স্বাভাবিক হইলেও, উপন্যাসের সমাপ্তিকালে তাহার উল্লেখ আর্টের বিচারে অবাঞ্ছনীয়।

দেবী চৌধুরাণী

'দেবী চৌধুরাণী' ১২৮৯ সালের পৌষ সংখ্যা হইতে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১২৯০

সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ থাকে, সেই সঙ্গে 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রকাশও বন্ধ থাকে। পুনরায় কার্ত্তিক হইতে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ আরম্ভ হইলে 'দেবী চৌধুরাণী'ও প্রকাশিত হইতে থাকে। মাঘ মাসের পর 'বঙ্গদর্শন' আর প্রকাশিত হয় না : 'দেবী চৌধুরাণী'ও দ্বিতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। 'বঙ্গদর্শনে' উপন্যাসের যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সহিত শতবার্ষিক সংস্করণের সেই অংশ পর্য্যন্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রহিয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। প্রফুল্লের 'মা, ধুচুনী হাতে আবার চাউল ধার করিয়া আনিতে চলিল, তখন প্রফুল্ল মার হাত হইতে ধুচুনী লইয়া যে কয়টা চাউল ছিল—তাহা ফেলিয়া দিল। মা অবাক্ হইল—বলিল,

"সে কি? যে কয়টা ছিল তাও ফেলিয়া দিলি?"

প্রফুল্ল বলিল, "মা—আমি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব—আমার ত সব আছে?"'

দেবী চৌধুরাণী ১।১—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮৯, ৪২৪ পৃঃ।

২। প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ী যাত্রাকালে তাহার মা যখন মেয়ের চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিলেন, তখন 'প্রফুল্ল বলিল, "না থাক্। [কি অবস্থায় আমাকে রাখিয়াছে তা তাহারা দেখুক।]"'

দেবী চৌধুরাণী ১।১—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮৯, ৪২৫ পৃঃ।

৩। সাগর যখন প্রফুল্লকে বলিল যে, শ্বশুরের মত না হইলেও সে যেন এখনই চলিয়া না যায়, তখন উভয়ের সংলাপ এইরূপ :

প্র। না গিয়া কি করিব? আর কি জন্য থাকিব?

সা। একবার দেখা করবে না?

প্র। কার সঙ্গে? তোমার সঙ্গে?

সা। দূর। যেন হাবি। শ্বশুরবাড়ী এলে কি কেবল সতীনের সঙ্গে দেখা করতে হয়, আর কার সঙ্গে দেখা যেন করতে হয় না।

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই সে হাসি নিবিয়া গেল। বলিল, "বুঝি নাই ভাই—স্বামীর সঙ্গে? তা কি কপালে ঘটিবে?"

সা। আমি ঘটাইব। তুমি সন্ধ্যার পর, এই ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও।

দেবী চৌধুরাণী ১।৩—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮৯, ৪৩১ পৃঃ। প্রঃ সং

৪। সন্ধ্যার পর নয়ান যখন সাগরের ঘরে প্রফুল্লকে দেখিতে পাইল এবং সাগরের নিকট তাহার পরিচয় পাইল, 'তখন প্রফুল্লমুখী ও নয়নতারার চারি চক্ষে দেখাদেখি হইল। যেমন ব্যাঘ্র ও শিকারী দুইজনে পরস্পরে চাহে—কে কাহার প্রাণবধ করিবে—সেইরূপ দুইজনে পরস্পরের প্রতি চাহিল, দুই জনেই বুঝিল, "এই আমার পরম শত্রু।"'

দেবী চৌধুরাণী ১।৪—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮৯, ৪৩৪ পৃঃ।

৫। সাগরের কৌশলে ব্রজেশ্বর যখন রাত্রির জন্য প্রফুল্লের সহিত এক ঘরে বন্দী হইলেন তখন নয়ান সাগরের ঘরে আড়ি পাতিতে আসিয়া 'বুঝিয়া গেল যে বাগ্দী বউ ঘরে আছে।' নয়ান 'রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে' দাসীকে দিয়া শ্বশুরের নিকট সংবাদ পাঠাইল। শ্বশুরের হুকুম হইল, 'কালই প্রাতে নয়ান বৌমা' যেন 'স্বহস্তে তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া বিদায়' করেন।

দেবী চৌধুরাণী ১।৬—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮৯, ৪৪০ পৃঃ।

৬। 'প্রভাত হইতে না হইতেই' সাগর আসিয়া ঘরের কুলুপ খুলিয়া দিলে বিদায়ক্ষণে প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বরের সংলাপ এইরূপ :

প্র। ....তুমি আমায় ত্যাগ করিলে বটে ?

ব্র। এমন কথা কেন বল ? তোমায় আমি কখন ত্যাগ করিব না—যে স্ত্রী ত্যাগ করে সে মহাপাতকী। তবে যত দিন আমার বাবা বর্ত্তমান আছেন, তত দিন তোমায় আমায় দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। পিতার অবাধ্য কোন মতেই হইতে পারিব না—অবাধ্য হইবার আমার সাধ্য কি ? কিন্তু পিতার অবর্ত্তমানে—

প্র। অর্থাৎ তোমার আর আমার প্রাচীন বয়সে, তুমি আমায় গ্রহণ করিবে। ভালই। তত দিন আমি খাইব কি ? আমার শ্বশুর একথায় যে উত্তর দিয়াছেন তাহা ত তোমারই মুখে শুনিলাম। তোমারও কি সেই মত ? চুরি, ডাকাতি, ভিক্ষা করিয়া খাইব, তোমারও কি সেই মত ?

ব্রজেশ্বর অধোবদন হইল। কিছু পরে বলিল, "আমার নিজের কিছুই নাই কিন্তু যেমন করিয়া হৌক আমি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিব।"

প্র। সংগ্রহ করিয়া—অর্থাৎ বাপের টাকা হইতে কোনমতে কিছু লইয়া। আমি তাহা লইব না—তোমার বাপের এক পয়সা আমি খাইব না। তুমি নিজে উপার্জ্জন করিয়া আমাকে খাওয়াইতে পার না ?

ব্র। আমি বাপের অধীন—ঘরের বাহির হইতে পাই না—নহিলে উপার্জ্জনে আমি অক্ষম নহি। সে চেষ্টা এখন করা বৃথা।

প্র। তবে তোমার কিছু দিয়া কাজ নাই। আমি পারি, চুরি ডাকাতি ভিক্ষা করিয়াই খাইব। না পারি মরিয়া যাইব।

ব্র। অমন সকল কথা মুখে আনিও না। আমার একটি আঙ্গটি আছে—অনেক টাকা দাম—ঐটি লইয়া যাও—এখন কিছুদিন চলিবে—তারপর—

প্র। আঙ্গটি লইয়া আমি কোন্ বাজারে বেচিতে যাব? তবু আঙ্গটিটি দাও। তোমার সঙ্গে এক রাত্রির জন্য যে সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাতেই আমার জন্ম সার্থক হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে আঙ্গটি দেখিয়া এ স্মরণ করিব। কিন্তু এ আঙ্গটি আমার কাছে দেখিলে কেহ চোর বলিয়া ধরিবে না ত? কিম্বা আরও কি—

ব্র। এ আঙ্গটিতে আমার নাম খোদা আছে। নিতে কোন ভয় করিও না।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর আঙ্গটি আনিয়া দেখাইলেন। তাহার ভিতর পিঠে তাঁহার নাম ফারসী অক্ষরে খোদিত আছে। প্রফুল্ল আঙ্গটি লইল।

ব্র। এখন কোথায় কি প্রকারে তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া দাও।

প্র। সে ভার তোমার উপর—আমার যতদূর সাধ্য তাহা করিযাছি। এখানে ত আর আমার আসা হইতে পারে না। তুমি আমাদের বাড়ী যাইবে?

ব্রজেশ্বর অধোবদন হইল—বলিল, "শত্রুরা জাতি মারিবে।"

প্র। তবে দেখা সাক্ষাৎ এই পর্যন্ত।....'

অতঃপর পুনরায় কখন সাক্ষাৎ হইলে যাহাতে উভযে উভয়কে চিনিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে প্রফুল্ল 'এক হাতের পিতলের বালা খুলিয়া জোর করিয়া তাহা দুইখানা করিয়া ভাঙ্গিল।' এক খণ্ড ব্রজেশ্বরকে দিয়া বলিল, "আধখানা বালা তোমার কাছে থাক। আধখানা আমার কাছে রহিল। আধখানায় আর আধখানা মিলাইলে, তুমিও চিনিবে, আমিও চিনিব। এখন চলিলাম। মনে থাকে যেন—আমায় বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলে।"

'এই বলিয়া প্রফুল্ল দ্বার খুলিয়া বাহির হইল—ব্রজেশ্বর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।'

দেবী চৌধুরাণী ১।১৬- বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮৯, ৪৪০-৪২ পৃঃ।

৫। 'বাগ্দী বৌ' সম্বন্ধে শ্বশুরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার জন্য নয়ান যথাসময়ে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সুতরাং 'দ্বার খুলিয়া প্রফুল্ল

দেখিল, দ্বার পার্শ্বে নয়নতারা ঝাঁটা হাতে দাঁড়াইয়া আছে। প্রফুল্লকে দেখিয়াই নয়নতারা বলিল, "বের ত মাগী, ঝাঁটা মেরে তোর বিষ ঝেড়ে দিই।"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "তুমি কি বাড়ীর ঝাড়ুওয়ালা না কি?"

নয়নতারা জ্বলিয়া অঙ্গারের মত হইল। মারিবার জন্য ঝাঁটা তুলিল। প্রফুল্ল সরিল না। ব্রজেশ্বর ঘরেব ভিতর হইতে এ সব দেখিতে পাইল—ঝাঁটা প্রফুল্লের ঘাড়ে পড়ে পড়ে এমন সময়ে ব্রজেশ্বর নয়নতারার হাত হইতে ঝাঁটা কাড়িয়া লইল। প্রফুল্ল আবার হাসিয়া নয়নতারাকে বলিল—"তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হইও না দিদি—ও ঝাঁটা মারাই হইয়াছে। ইহজন্মে আমি তাই ভাবিব। মনে থাকে যেন—তুমি আমাকে ঝাঁটা মারিয়া এবাড়ী হইতে বিদায় করিলে!"'

দেবী চৌধুরাণী ১।৬—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮৯, ৪৪২ পৃঃ।

৮। বিদায়কালে সাগর যখন প্রশ্ন করিল, "তুমি আমার বাপের বাড়ী যাবে?" প্রফুল্ল উত্তর করিল, "আমার আর লজ্জা কি? [আমি আর কুলের কলবধূ নই। সে নাম আমার ঘুচিয়াছে।]

দেবী চৌধুরাণী ১।৬—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮৯, ৪৪২ পৃঃ।

৯। শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠের ৯নং চিহ্নিত অংশে ব্রজেশ্বরের সম্বন্ধে যে কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে সে কাহিনী নাই।

১০। প্রফুল্লের তিরোধান সম্বন্ধে ফুলমণি তাহার দিদি অলকমণির নিকট যে 'আষাঢ়ে গল্প' বলিল, অলকমণির কর্ম্মকুশলতায় 'সালঙ্কার ব্যাখ্যা' সমেত তাহা 'শীঘ্র প্রচারিত হইয়া প্রফুল্লের শ্বশুর শাশুড়ীর কানে পর্য্যন্ত গেল।' অর্থাৎ, গল্পটি রূপান্তরিত হইয়া সম্ভাব্য আকার ধারণ করিল এরূপ কোন আভাস নাই।

দেবী চৌধুরাণী ১।১২—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৯, ৫৪৮ পৃঃ।

১১। ভগ্ন অট্টালিকায় প্রফুল্লের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির বিবরণ এইরূপ: প্রফুল্ল একবার খুঁড়িয়া এক ঘড়া মোহর, হীরা, পান্না, চুনি পাইল। প্রথমে মোহর; প্রফুল্ল 'আঁজলা আঁজলা করিয়া মোহর তুলিয়া মাটিতে রাখিতে লাগিল--ইচ্ছা গণিবে কত মোহর। কিন্তু অঙ্কবিদ্যায় তত দখল নাই—গণিয়া সংখ্যা করিতে পারিল না। কেবল কাঁড়ি করিয়া সাজাইল।' মোহর ফুরাইলে হীরা, পান্না, চুনির পালা। 'অঞ্জলিপূর্ণ হীরা, পান্না, চুনি উঠিতে লাগিল।' প্রফুল্লের মাকে মনে পড়িল। তাহার মা না খাইয়া মরিয়াছেন, আর এই ধন রাখিতে পারিলে প্রফুল্ল রাজরাণীর ন্যায় দিন কাটাইবে।

প্রফুল্ল 'কেবল পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রা' বাহির করিয়া লইয়া ঘড়াটি পুনরায় পুতিয়া রাখিল। সিঁড়ি বাহিয়া অর্দ্ধেক উপরে উঠিয়া পুনরায় কৌতূহলবশতঃ নীচে নামিল। পুনরায় খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। আবার ঘড়া! আবার মোহর, হীরা, পান্না, চুনি। প্রফুল্ল ভাবে, "ভাল, দেখিই না কেন কুবেরের কত ধন আছে?" এই ভাবিয়া আবার খুঁড়িতে আরম্ভ করে। 'আবার সেইরূপ ঘড়া'। প্রফুল্ল 'বেশ করিয়া সব পুঁতিল। মনে ভাবিল, "আরও যদি থাকে, তা আমি চাই না।"'

কিন্তু শয়ন করিয়াও তাহার নিদ্রা আসিল না। মনে হইল, 'আরও ঘড়া আছে কি?' প্রফুল্ল শয্যা ছাড়িয়া আবার নীচে নামিল। আবার ঘড়ার পর ঘড়া পাইল। 'এইরূপে প্রফুল্ল বার ঘড়া ধন পাইল।'

'রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পর প্রফুল্ল হাত পা ধুইয়া আবার আসিয়া শয়ন করিল। এবার বোধ হয় পরিশ্রমের ফলে একটু নিদ্রা আসিল।'

দেবী চৌধুরাণী ১।৯—বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮৯, ৪৮৯-৯০ পৃঃ।

১২। কৃষ্ণগোবিন্দ দাসের কাহিনীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে সেই বনের ডাকাতের দলের সহিত তাহার সম্পর্কের বিবরণ এইরূপ :

বৃদ্ধ যে বনের ভিতর ভগ্ন অট্টালিকায় বাস করিত সেখানে এক ডাকাতের বনে দলের আড্ডা ছিল। ডাকাতেরা দেখিত বৃদ্ধ সপ্তাহে সপ্তাহে হাটে যায়, আবার আসে। তাহারা 'ভাঙ্গা বাড়ী দেখিয়া গেল। জানিল যে এইখানে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বাস করে, কিছু কাজকর্ম্ম করে না, অথচ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে। বুঝিল ইহাদের কিছু আছে।'

'অতএব একদিন তাহাবা জন কতক জুটিয়া সেখানে ডাকাইতি করিতে আসিল। ভাড়ের টাকাগুলি লুটিয়া লইল। তারপব "আর কি আছে দে", বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে বাঁধিয়া মশাল দিয়া পোড়াইতে লাগিল।' তখন বৃদ্ধ এক গল্প ফাঁদিল. বলিল, তাহার টাকা আছে সত্য, কিন্তু সে টাকা সেখানে নাই। কোনদিন সে মুর্শিদাবাদে চাকুরী করিত, সেখানে তাহার গচ্ছিত টাকা আছে, প্রতি বৎসর সুদ লইয়া আসে। বৃদ্ধ অতঃপর যখনই সুদ লইয়া আসিবে, তখনই তাহাদিগকে কিছু দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি পাইল।

সেই অবধি তাহারা প্রতি বৎসর তাহার নিকট 'কিছু' পায়। অসময়ে ধারও পায়, আবার শোধ দেয়, সুদ দিতে হয় না। ক্রমে বৃদ্ধ তাহাদেরই একজন বলিয়া গণ্য হইল। ডাকাতেরা যেমন তাহার নিকট ধার পাইত, কৃষ্ণগোবিন্দও তেমনি তাহাদের ডাকাতির লাভের এক অংশ পাইত।

দেবী চৌধুরাণী ১।১০—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৯, ৫৪২-৪৩ পৃঃ।

১৩। এই ডাকাতের দল সহসা দরজায় হানা দেওয়ায় তাহাদের চীৎকারে প্রফুল্লের নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রফুল্ল বুঝিল, যাহারাই আসিয়া থাকুক, লুকাইয়া আত্মরক্ষার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সে 'সাহসে ভর করিয়া' দরজা খুলিল। অমনি 'হুড় হুড় করিয়া জন কুড়ি পঁচিশ কালান্তক যমের ন্যায় জোয়ান ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।' তাহারা প্রফুল্লের নিকট বৃদ্ধের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। প্রফুল্ল বলিল, বুড়ো মরিয়াছে এবং তাহার বৈষ্ণবী টাকা কড়ি লইয়া পলাইয়াছে। নিজের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিল, 'বাবাজির' সে 'পুষ্যি মেয়ে', তাহার 'ব্যামো' শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিল। প্রফুল্লের 'বড় বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সাহস', 'আন্দাজি আন্দাজি' ডাকাতদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। প্রফুল্ল বুঝাইল, বুড়োর মুর্শিদাবাদে চাকুরীর কাহিনী মিথ্যা, আসলে সে সোনা তৈয়ার করিতে জানিত। প্রফুল্ল নিজেও তাহার নিকট এই বিদ্যা শিখিয়াছে। ডাকাতেরা ইহা শিখিতে চাহিলে সে বলিল, এ বিদ্যা শিখিলে তখনই তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে, কারণ 'এ বিদ্যা পরকে দিয়া আর বাঁচিতে নাই।' তাহাতেও না হয় সে রাজী হইল, কিন্তু 'এ বিদ্যা ছয় কান হইলে ফলে না!' তাই একজনকে বই আর শিখাইতে পারিবে না। প্রফুল্ল প্রশ্ন করিল, "কাকে শিখাইব?" ইহাতে ডাকাতদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, কারণ সকলেই শিখিতে চায়। শেষে যখন মারামারির উপক্রম হইল, তখন প্রফুল্ল বলিল, কোষ্ঠীতে না মিলিলে এ বিদ্যা শেখান মিথ্যা, কারণ সকলের হাতে ইহা ফলে না; সুতরাং তাহারা যেন পরের দিন কোষ্ঠী লইয়া আসে। এখন ডাকাতদের কাহারও কোষ্ঠী নাই, সুতরাং তাহারা শেষ পর্য্যন্ত বলিল, বিদ্যা শিখিয়া তাহাদের কাজ নাই, তাহাদের টাকা পাইলেই হইল। প্রফুল্ল ইহাতে স্বীকৃত হইল এবং 'যে শত স্বর্ণমুদ্রা' সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল তাহাই ডাকাতদের দিল। ডাকাতেরা খুশী হইয়া তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিল। প্রফুল্ল সুযোগ বুঝিয়া তাহার জন্য 'চারি জন দাসী' এবং 'আট জন পুরুষ মানুষ চাকর' যোগাড় করিয়া দিতে বলিল। তাহারা সম্মত হইল, অধিকন্তু 'চারি জন দরওয়ান' চাহিলে তাহারাই 'দরওয়ানে'র কাজ করিবে বলিল। প্রফুল্ল বলিল, তাহার 'বাসন কোষণ, কাপড় চোপড়, ঘরকন্নার জিনিষ সব' কিনিয়া দিতে হইবে এবং বাড়ী মেরামত করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ডাকাতেরা বলিল, সে সব তাহারা পারিবে না। ইহার জন্য তাহারা তাহাদের দলপতি পাঠক ঠাকুরকে পাঠাইয়া দিবে।

দেবী চৌধুরাণী ১।৯—বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮৯, ৪৯০-৯১ পৃঃ ও
ঐ ১।১১—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৯, ৫৪৩-৪৬ পৃঃ।

১৪। পরদিন 'বেলা প্রহরেকের মধ্যে' ভবানী পাঠক প্রফুল্লের নিকট আসিলেন এবং নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাহার 'ঘর বাড়ী, জিনিষ পত্র, দাস দাসী চাই'—এ কথা তিনি শুনিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন তাহার টাকা আছে, তাহার দেওয়া মোহরগুলিও তিনি দেখিয়াছেন। এখন তাঁহার সহিত প্রতারণা করার চেষ্টা বৃথা ; হয়ত ঐ ভাঙ্গা বাড়ীতেই সে টাকা পাইয়া থাকিবে। প্রফুল্লের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন যে, তিনি তাহার টাকা কাড়িয়া লইবেন না। কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে শুধু টাকা নহে, 'জাতিকুল' রক্ষা করাও কঠিন হইবে।

প্রফুল্ল 'সাহসের উপর ভর করিয়া' ভবানী পাঠকের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন, সে যদি তাঁহার কথানুযায়ী কাজ করে তাহা হইলে তিনি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এবং তিনি এই আশ্বাস দিলেন যে, তিনি তাহাকে কখনও অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবেন না। ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে এই ধন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন ; কারণ এই ধন লইয়া সে 'হয় বিপদে পড়িবে, নয় পাপাচরণ করিয়া নরকে যাইবে।'

'প্র। ধনে পাপ ?

ভ। হাঁ—যদি যথার্থ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ না কর।

প্র। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে ?

ভ। সর্ব্বস্ব। যদি এ ধন গ্রহণ কর, তবে সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর।

প্র। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিব—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কে ? কোথায় ? তিনি কি প্রকারে আমার এ ধন গ্রহণ করিবেন ?'

ভবানী পাঠক বলিলেন, তিনি তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবেন, তাহা হইলেই সে 'শ্রীকৃষ্ণের ধন কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে দিতে হয় তাহা শিখিবে।'

'প্র। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণকে দিব—আমার ত কিছু নাই, আমি খাইব কি ?

ভ। আমার বাড়ী দেখাইয়া দিব, প্রত্যহ তুমি সেখানে গিয়া ভিক্ষা করিও। যাহা ভিক্ষা পাইবে, তাহাই খাইবে।

প্র। আপনার ধন থাকিতে ভিক্ষা করিয়া খাইব ?

ভ। প্রফুল্ল মনে তুমি যদি এই ধন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ না কর. তবে তিনি গ্রহণ করিবেন না। তিনি গ্রহণ না করিলে ডাকাইতেরা উহা বেবাক গ্রহণ করিবে।

প্র। শ্রীকৃষ্ণ কে ? ঠাকুর ত মন্দিরে দেখি—তিনি ধন গ্রহণ করিবেন কি প্রকারে ? তাঁর কি কিছু নাই ?

ভ। তিনি জগদীশ্বর—সব তাঁর।

প্র। তবে তাঁর আমার ধনে প্রয়োজন কি ?

ভ। লেখাপড়া শেখ—বুঝাইব।....'

দেবী চৌধুরাণী ১।১২—বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৯, ৫৪৯-৫১ পৃ:।

১৫। প্রফুল্লের পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষাকালে চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে ভোজন সম্বন্ধে বিধি নিষেধ এইরূপ :

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি ইচ্ছানুযায়ী ভোজনের উপদেশ হইল। 'প্রফুল্ল কেবল নূন লঙ্কা ভাতে খাইল।'

'পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি প্রথম বৎসরের মত ভোজনের উপদেশ হইল। তদ্ভিন্ন দুগ্ধ 'ও মুদ্গও খাইতে পাঠক ঠাকুর অনুমতি করিলেন। বলিলেন, ''এখন তোমার শরীরে বল চাই। বলকারক আহার করিবে।'' '

পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষাকালে অন্যান্য বিষয়ে বিধিনিষেধের বর্ণনা এইরূপ :

'শয়ন, বসন, স্নান, নিদ্রা সম্বন্ধে এতদনুরূপ [ভোজন সম্বন্ধে বিধিনিষেধের অনুরূপ] অভ্যাসে ভবানীঠাকুর শিষ্যাকে নিযুক্ত করিলেন।'

দেবী চৌধুরাণী ১।১৬—বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৯০, ৮ পৃ:।

১৬। ভবানীঠাকুরের নিকট শিক্ষাকালে 'বাহিরে যাওয়ার পক্ষে প্রফুল্লের প্রতি কোন নিষেধ ছিল না। প্রফুল্লও কখন কখন মাঠে ঘাটে বেড়াইতে যাইত—কিন্তু কোন পুরুষের সঙ্গে কখন কোন কথা কহিত না। ভবানী ঠাকুরের চর যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত তাহা সে জানিত না।'

দেবী চৌধুরাণী ১।১৬—বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৯০, ৮ পৃ:।

১৭। ব্রজেশ্বর তাহাকে লাথি মারিয়াছেন সাগরের এই ভ্রমবশত: যখন উভয়ের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হইল তখন তাঁহাদের বাকযুদ্ধ এইরূপ :

ব্র। পাল্‌টে লাথি মারবে নাকি ?

সা। আমি তত অধম নহি। [কিন্তু তোমাকে দিয়া আমার পদসেবা করাইয়া লইব। নহিলে আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে নহি।]

দেবী চৌধুরাণী ২।২—বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৯০, ৭৮ পৃ:।

শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। প্রফুল্ল চাউল ফেলিয়া দেয় নাই; 'মার হাত হইতে ধুচুনী কাড়িয়া লইয়া তফাতে রাখিল।' দেবী চৌধুরাণী ১।১, ৬ পৃ:।

প্রফুল্লের পক্ষে অভিমানে চাউল ফেলিয়া দেওয়া অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু পরিবর্ত্তিত পাঠে তাহার সংযত আচরণ অধিকতর শোভন হইয়াছে।

২। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে এবং প্রফুল্লের মুখে "না, থাক্।"—এই কথার পরেই রহিয়াছে :

'মা ভাবিল, "থাক্। আমার মেয়েকে সাজাইতে হয় না।"

মেয়ে ভাবিল, "থাক্। সেজে গুজে কি ভুলাইতে যাইব? ছি!"

দেবী চৌধুরাণী ১।২, ৭ পৃঃ।

ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপন্যাসে নূতন সংযোজনা। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে প্রফুল্লের উক্তিতে শ্বশুরবাড়ীর অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব সুস্পষ্ট ; পরিবর্ত্তিত পাঠে তাহার আচরণ সংযত এবং তাহার স্বগতোক্তি অধিকতর শোভন এবং ইহা তাহার সহজাত মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দেয়।

৩। সাগরের নিকট হইতে স্বামীর সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব না আসিয়া এ বিষয়ে অনুরোধ আসিয়াছে সাগরের সহানুভূতি লাভের পর প্রফুল্লের নিকট হইতে (দেবী চৌধুরাণী ১।৩, ১৪ পৃঃ) এবং ইহাই অধিকতর স্বাভাবিক।

৪। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

প্রফুল্ল দরিদ্রের কন্যা, তাহাতে সে স্বামীপরিত্যক্তা ; তাহা হইলেও তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া নয়নতারার পক্ষে তাহাকে 'পরম শত্রু' মনে করা আদৌ অসম্ভব নহে। কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে সহসা কাহাকেও 'পরম শত্রু' মনে করা তাহার চরিত্রবিরুদ্ধ।

৫। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

সাগরের ঘরে আড়ি পাতা অথবা প্রফুল্ল সে রাত্রির জন্য ব্রজেশ্বরকে দখল করিয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে শ্বশুরের নিকট নালিশ করা—ইহার কোনটাই নয়নতারার পক্ষে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু হরবল্লভ যে প্রকৃতির লোক তাহাতে তিনি ব্যাপারটি জানিতে পারিলে সেই রাত্রেই একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইতেন ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় এবং হয়ত এই কারণেই এই অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকিবে।

৬। এই অংশ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত এবং স্থানে স্থানে পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এবং এই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্ল উভয়ের চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া তাৎপর্য্যপূর্ণ।

(ক) প্রফুল্ল বলিতেছে, "স্ত্রী বলিয়া স্বীকার কর না কর, দাসী বলিয়া মনে রাখিও।" উত্তরে ব্রজেশ্বর তাহাকে তখনই চলিয়া না যাইতে অনুরোধ করিলেন, কারণ তিনি একবার 'কর্ত্তাকে' বলিয়া দেখিবেন : তাহাকে অকারণ

ত্যাগ করিয়া তিনি অধর্ম্মে পতিত হইতে চাহেন না। প্রফুল্ল বলিল, "তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই—গ্রহণ করিয়াছ। আমাকে এক দিনের জন্য শয্যার পাশে ঠাঁই দিয়াছ—আমার সেই ঢের।" প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে তাহার হইয়া 'বাপের সঙ্গে' বিবাদ করিতে নিষেধ করিল। (১৬, ২৩-২৪ পৃঃ)। ব্রজেশ্বর অবশ্য কোন কারণেই পিতার সহিত বিবাদ করিতে যাইতেন না একথা সত্য; কিন্তু এ অবস্থায় প্রফুল্লের অনুরোধ তাহার চরিত্রের মাধুর্য্যের পরিচয় দেয়।

(খ) প্রফুল্ল শ্বশুরের নিকট তাহার প্রশ্নের উত্তর নয়ান বৌ-এর নিকট পরে শুনিয়াছে, স্বামীর নিকট হইতে নহে। প্রফুল্ল যে নয়ান বৌকে বলিল, "তার আর উত্তর কি?" (১৬, ২৫ পৃঃ), ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রজেশ্বর এ সম্বন্ধে তাহার নিকট কিছুই বলেন নাই। এইরূপে বঙ্কিম ব্রজেশ্বরকে অতি বড় হৃদয়হীন আচরণের গ্লানি হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

(গ) প্রফুল্ল শ্বশুরের নিকট হইতে ভিক্ষাস্বরূপ 'খোরপোষ' গ্রহণ করা সম্বন্ধে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে ব্রজেশ্বর নিজেই বলিলেন, তিনি যাহাতে 'দুপয়সা রোজগার' করিতে পারেন সেই চেষ্টা করিবেন এবং যেমন করিয়া পারেন তাহার 'ভরণপোষণ' করিবেন। (১৬, ২৪ পৃঃ)।

ব্রজেশ্বর যুবক; পিতার অধীন বলিয়া ঘরের বাহির হইতে পারেন না এবং উপার্জ্জনে অক্ষম না হইলেও 'সে চেষ্টা এখন করা বৃথা'—এরূপ উক্তি পিতৃভক্তির পরিচয় দেয় না; ইহা নিছক কাপুরুষতা ও কর্ম্মবিমুখতার নিদর্শন।

(ঘ) প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরের দেওয়া আঙ্গটি বিক্রয়ের কল্পনা করিতে পারে না। এই কারণেই পরিবর্ত্তিত পাঠে "আঙ্গটি লইয়া আমি কোন্ বাজারে বেচিতে যাব?"—তাহার মুখে এরূপ প্রশ্ন শুনিতে পাই না। প্রফুল্ল আঙ্গটি লইয়া বলিল, "আমি এ আঙ্গটি বেচিব না। না খাইয়া মরিব, তবু কখন বেচিব না।"

"কিম্বা আরও কি—" এই অসমাপ্ত প্রশ্নের ভিতর যে প্রচ্ছন্ন সন্দেহ রহিয়াছে সেরূপ সন্দেহ তাহার মনে আসে নাই। এবং সেরূপ সন্দেহ তাহার চরিত্রানুরূপ নহে। প্রফুল্ল শুধু প্রশ্ন করিল, "ইহাতে কি লেখা আছে?" ব্রজেশ্বর উত্তর করিলেন, "আমার নাম খোদা আছে।" (১৬, ২৪ পৃঃ)।

(ঙ) "এখন কোথায় কি প্রকারে তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া দাও।"—ব্রজেশ্বর এরূপ প্রশ্ন করেন নাই। এবং এরূপ প্রশ্ন অর্থহীন, কারণ ইহার পর সত্যই যদি তিনি প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন,

তাহা হইলে তাঁহাকেই যে প্রফুল্লের পিত্রালয়ে যাইতে হইবে, ইহা তাঁহার না বুঝিবার কথা নহে।

ব্রজেশ্বরের প্রশ্ন পরিবর্জ্জিত হওয়ায়, ইহার উত্তর দিতে যাইয়া প্রফুল্লের প্রশ্ন, "তুমি আমাদের বাড়ী যাইবে?" এবং ব্রজেশ্বরের প্রত্যুত্তর দুই-ই পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। ইহার ফলে ব্রজেশ্বরের চরিত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ব্রজেশ্বর পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না, ইহার ভিতর মহত্ত্ব আছে ; কিন্তু 'শত্রুরা জাতি মারিবে' এই ভয়ে তিনি প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না, তাঁহার এই ভীরুতা একেবারেই অমার্জ্জনীয়। আমাদের পরিচিত ব্রজেশ্বর এই দোষে দোষী নহেন।

(চ) প্রফুল্ল কর্তৃক এক হাতের বালা ভাঙ্গিয়া এক খণ্ড নিজে রাখা এবং এক খণ্ড ব্রজেশ্বরকে দেওয়ার কাহিনী পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কারণ ব্রজেশ্বরের দেওয়া আঙ্গটি দেখিলেই তিনি ভবিষ্যতে প্রফুল্লকে চিনিতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত ; তাহার নিজের পক্ষে ব্রজেশ্বরকে চিনিতে না পারার প্রশ্ন ওঠে না।

(ছ) প্রত্যাখ্যাত হইলেও প্রফুল্ল স্বামীর সহানুভূতি পাইয়াছে। "মনে থাকে যেন—আমায় বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলে।"—এরূপ অপ্রিয় রূঢ় উক্তি দ্বারা প্রফুল্ল বিদায়ের মুহূর্ত্তকে তিক্ত করে নাই। বস্তুতঃ পরিবর্ত্তিত পাঠে প্রথম হইতেই তাহার সুর ভিন্ন রকমের।

৭। হরবল্লভ নয়ান বৌকে প্রফুল্ল সম্বন্ধে কোন আদেশ দেন নাই ; সুতরাং তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রফুল্লের প্রতি নয়ান বৌ-এর আক্রমণের প্রশ্ন ওঠে না। বস্তুতঃ নয়ান বৌ-এর রণরঙ্গিনী মূর্ত্তির মধ্যে কিছুটা বাড়াবাড়ি রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার পরিবর্ত্তে প্রফুল্ল ও নয়ান বৌ-এর সাক্ষাৎকারের যে চিত্রের সহিত বর্ত্তমানের পাঠকের পরিচয় রহিয়াছে তাহাতে প্রফুল্লের চরিত্র আরও উজ্জ্বল, নয়ান বৌ-এর উত্তেজনার কারণ আরও বেশী, অথচ তাহার আচরণ অতটা উচ্ছৃঙ্খল নহে। চিত্রটি এইরূপ: প্রাতঃকালে সাগর ও নয়ান বৌ-এর সহিত প্রফুল্লের সাক্ষাৎ হইলে নয়ান বৌকে জ্বালাইবার জন্য সাগর তাহাকে জানাইয়া দিল যে, রাত্রে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া প্রফুল্ল 'বিষ্ণুর লক্ষ্মী হইয়াছিলেন।' ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে যে আঙ্গটি দিয়াছেন, সাগর তাহাও দেখাইল। 'নয়নতারা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া' প্রফুল্লকে জানাইয়া দিল যে, তাহার প্রশ্নের উত্তরে শ্বশুর তাহাকে 'চুরি ডাকাতি' করিয়া খাইতে বলিয়াছেন। প্রফুল্ল উত্তর করিল, "দেখা যাবে।" (১৬, ২৫ পৃঃ)।

বলা বাহুল্য এই চিত্রে সাগরের কৌতুকপ্রিয়তার সহিত তাহার নয়ান-বিদ্বেষ সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে।

৮। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে প্রফুল্লের আচরণে তাহাব প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের পরিচিত প্রফুল্লের আচরণে তাহার আভাস নাই। কোন অবস্থাতেই আমরা তাহাকে অসহিষ্ণু দেখিতে পাই না।

৯। প্রফুল্লের মাব মৃত্যুর পর তাহার প্রতিবেশীরা হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলে তাঁহার মন দ্রবীভূত না হইয়া যখন আরও কঠিন হইল, তখন ব্রজেশ্বর মনে মনে স্থির করিলেন 'একদিন রাত্রে লুকাইয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া' আসিবেন (১।৭, ২৭ পৃঃ) এবং এই সঙ্কল্প অনুযায়ী তিনি একদিন রাত্রে প্রফুল্লের পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহার 'অর্দ্ধ দণ্ড' পূর্ব্বে দুর্লভচন্দ্র ও ফুলমণির চক্রান্তে প্রফুল্ল গৃহহারা হইয়াছে। (১।৮, ২৮ পৃঃ)।

ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপন্যাসে নূতন সংযোজনা। বলা বাহুল্য ব্রজেশ্বরের চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া ইহা গুরুত্বপূর্ণ।

১০। প্রফুল্লের 'তিরোধান-বৃত্তান্ত' মুখে মুখে বদল হইয়া তাহার শ্বশুর-গৃহে 'এইরূপ আকারে পৌঁছিল যে, প্রফুল্ল বাত-শ্লেষ্ম-বিকারে মরিয়াছে—মৃত্যুর পূর্ব্বে তার মরা মাকে দেখিতে পাইয়াছিল।' (১।১৪, ৫২ পৃঃ)। উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহার আলোচনা করিয়াছি।

১১। প্রফুল্লের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত: 'খুঁড়িতে খুঁড়িতে "ঠং" করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বুঝিল, ঘটি কি ঘড়ার গায়ে শাবল ঠেকিয়াছে।' (১।১৯, ৩৩ পৃঃ)। ইহার পরেই বৃদ্ধ কৃষ্ণগোবিন্দ দাস কেমন করিয়া এই ঐশ্বর্য্য পাইল তাহার বিবরণ। এবং এই বিবরণের পরেই বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'সেই ধন এখন প্রফুল্ল পাইল। ঘড়াগুলি বেশ করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর....প্রফুল্ল শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইল।' (১।১৯, ৩৫ পৃঃ)।

মনে হয় অধ্যাত্মবাদী বঙ্কিম প্রফুল্লের মাধ্যমে যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আমাদের পরিচিত প্রফুল্ল নির্লোভ ও ধীরপ্রকৃতি। সহসা যখন সে কুবেরের ধন পাইল, তখনও তাহার আচরণে কিছুমাত্র চাঞ্চল্যের আভাস নাই। কিন্তু এতখানি নির্লিপ্ততা কি সম্ভব এবং স্বাভাবিক? অন্ততঃ এ অবস্থায় মৃত মাতা তাহার স্মরণে আসিবেন ইহাই স্বাভাবিক।

পরিবর্তিত পাঠে প্রফুল্ল বার ঘড়া নহে, কুড়ি ঘড়া ধন পাইল। (১।১২, ৪১ পৃঃ)। অবশ্য এই পরিবর্তনের কোনরূপ গুরুত্ব নাই।

১২-১৩। পরিবর্জিত হইয়াছে।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে ডাকাতদের কাহিনী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশ্ন ওঠে :

(ক) কৃষ্ণগোবিন্দ দাস বৎসর বৎসর ডাকাতের দলকে অর্থ দিয়া যায়। এই অর্থ কোথা হইতে আসে সে সম্বন্ধে 'বাবাজি' যে কাহিনী আমদানি করিল ডাকাতের দল তাহা বিশ্বাস করিল। অথচ প্রফুল্ল যখন বুঝাইল, চাকুরীর কাহিনী মিথ্যা, বাবাজি সোনা তৈয়ার করিতে জানিত, তখন ডাকাতেরা বলিল, 'বাবাজি বাজারে মোহর ভাঙ্গাইত' ইহা তাহারা শুনিয়াছে। (দেবী চৌধুরাণী ১।১১--বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৯, ৫৪৪ পৃঃ)। কিন্তু ডাকাতেরা ইহা শুনিয়া থাকিলে এতদিন যে এ সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান করে নাই, ইহা কি স্বাভাবিক? বিশেষতঃ, ডাকাতেরা যাহা শুনিয়াছে তাহাদের দলপতি ভবানী পাঠকের পক্ষে তাহা না শুনিবার কথা নহে। কিন্তু তিনি এ সংবাদ শুনিয়া থাকিলে কোনরূপ সন্ধান করিবেন না, ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

(খ) এই উচ্ছৃঙ্খল ডাকাতের দল কি ভবানী পাঠকের সহায় হইতে পারে?

(গ) আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশের দিক দিয়া এই কাহিনীর সার্থকতা কি? ডাকাতদের সহিত আচরণে প্রফুল্লের 'বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ইহা কি নিতান্তই অতিনাটকীয় নহে?

১৪। ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির পরের দিবস প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইলে ভাগ্যক্রমে ভবানী পাঠকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ভবানী পাঠক দেখিলেন, 'এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা।' তিনি তাহাকে নিজের দোকানে লইয়া গেলেন এবং সে যাহা 'একা বহিয়া লইয়া যাইতে' পারে এইরূপ প্রয়োজনানুরূপ জিনিষ লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। প্রফুল্ল দামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "এক আনা।" দাম দিতে যাইয়া প্রফুল্ল ধরা পড়িল। চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়া লইলেন, তাহার নিকট যাহা আছে 'সবই মোহর।' প্রফুল্ল তখন পাঠক ঠাকুরকে এড়াইতে চাহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া ভবানী পাঠক হাসিলেন, তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, তিনি তাহার সঙ্গ না ছাড়িলে তাহার সাধ্য নাই যে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিবে। তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন

যে, তিনি এই বালিকাকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন, তাহারাও যেন তাহাকে 'মার মত' দেখে।

প্রফুল্ল বুঝিল, ইঁহার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ভবানী পাঠকের ইচ্ছামত সে তাঁহাকে ভগ্ন অট্টালিকায় লইয়া গেল এবং সে কত ধন পাইয়াছে তাহাও বলিল। ভবানী পাঠক বলিলেন, এই ঐশ্বর্য্য দুই প্রকারে ব্যবহার করা চলে: প্রফুল্ল ইহার দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে, অথবা নরকের পথে যাইতে পারে। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কোন্ পথে যাইতে চাও?"

'প্র। যদি বলি, পাপই করিব?

ভ। আমি তাহা হইলে, লোক দিয়া, তোমার ধন তোমার সঙ্গে দিয়া তোমাকে এ বনের বাহির করিয়া দিব।....এ বন আমারই।

প্র। লোক দিয়া আমার ধন আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তবে সে আমার পক্ষে ক্ষতি কি?

ভ। রাখিতে পারিবে কি? তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, যদিও ডাকাইতের হাতে উদ্ধার পাও—কিন্তু রূপ যৌবনের হাতে উদ্ধার পাইবে না। পাপের লালসা না ফুরাইতে ফুরাইতে ধন ফুরাইবে। যতই কেন ধন থাক্ না, শেষ করিলে শেষ হইতে বিস্তর দিন লাগে না। তার পর, মা?

প্র। তার পর কি?

ভ। নরকের পথ সাফ। লালসা আছে, কিন্তু লালসাপরিতৃপ্তির উপায় নাই—সেই নরকের পরিষ্কার পথ। পুণ্য সঞ্চয় করিবে?

প্র। বাবা! আমি গৃহস্থের মেয়ে, কখনও পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাইব? আমি বড় কাঙ্গাল—আমার অন্ন বস্ত্র যুটিলেই ঢের, আমি ধন চাই না—দিনপাত হইলেই হইল। এ ধন তুমি সব নাও—আমি নিষ্পাপে যাতে এক মুঠো অন্ন পাই, তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও।'

ভবানী পাঠক বলিলেন, "ধন তোমার। আমি লইব না।" কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বলিলেন যে, সে যদি 'পাপাচরণে প্রবৃত্ত' হয় তাহা হইলে ইহা 'লুঠ করিয়া লইলেও লইতে' পারেন। "ধন লইয়া কি করিব?"—প্রফুল্ল এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, শিখিলে তিনি শিখাইতে পারেন; 'শিখাইতে পাঁচ সাত বৎসর লাগিবে।' এই 'পাঁচ সাত বৎসর' সে ধন স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাহার 'খাইবার পরিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক', পাঠক ঠাকুর তাহা পাঠাইবেন। কিন্তু তিনি যাহা বলিবেন 'দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিতে হইবে।' (১।১১-১২, ৩৮-৪৩ পৃঃ)।

প্রফুল্ল ও ভবানী পাঠকের সাক্ষাৎকালে তাঁহাদের সংলাপে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, প্রফুল্লের দিক দিয়া তাহা একাধিক কারণে তাৎপর্য্যপূর্ণ :

(ক) প্রফুল্ল হিন্দুর ঘরের মেয়ে; লেখাপড়া না শিখিলেও প্রখর বুদ্ধিশালিনী। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে তাহার মুখে 'শ্রীকৃষ্ণ কে? কোথায়?'; 'ঠাকুর ত মন্দিরে দেখি—তিনি ধন গ্রহণ করিবেন কি প্রকারে? তাঁর কি কিছু নাই?'—ইত্যাদি প্রশ্ন একেবারে বেমানানসই।

(খ) প্রফুল্লের চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার তীক্ষ্ণ আত্মমর্য্যাদানুভূতি। অথচ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসে দেখিতে পাই ভবানী পাঠক তাহার নিকট ভিক্ষায়ে জীবন ধারণের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং প্রফুল্ল কোনরূপ প্রতিবাদ করে নাই। ইহা কি তাহার চরিত্রানুরূপ? পরিবর্ত্তিত পাঠে প্রফুল্লকে এরূপ হীনতাব সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

(গ) পরিবর্ত্তিত পাঠে প্রফুল্লের ঐশ্বর্য্যে অনাসক্তি বিশেষভাবে প্রকট।

১৫। প্রফুল্লের পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষাকালে চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে ভোজন সম্বন্ধে বিধিনিষেধ এইরূপ :

'চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল। প্রফুল্ল তাহা খাইল।

পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ হইল। প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মত খাইল।' (দেবী চৌধুরাণী ১।১৫. ৫৩ পৃঃ)।

পরিবর্ত্তিত পাঠে শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হইয়া আসিল সেই সময় (অর্থাৎ পঞ্চম বৎসর) 'যথেচ্ছ ভোজনের' ব্যবস্থার ভিতর দিয়া শিক্ষার্থিনী কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করিল, তৎপূর্ব্বে নহে। ইহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তৎপূর্ব্ব বৎসর 'উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ' এবং প্রফুল্ল কর্ত্তৃক সেই আদেশ পালনের ভিতর দিয়া বঙ্কিম হয়ত ইহাই বলিতে চাহেন যে কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে যখন নিস্পৃহতা জন্মে তখন উপদেষ্টার আদেশ পালনই শিষ্য বা শিষ্যার একমাত্র কর্ত্তব্য এবং এই সময় প্রফুল্লের দৃষ্টিতে 'উপাদেয় ভোজ্য' ও 'নূন লঙ্কা ভাতে' কোন পার্থক্য নাই।

'শয়ন, বসন, স্নান, নিদ্রা সম্বন্ধে' বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। (১।১৫, ৫৪ পৃঃ)। ইহা এবং নিশির নিকট প্রফুল্লের মল্লযুদ্ধ শিক্ষা, তৎপরে ভবানী ঠাকুরের অনুচরদিগের মধ্যে 'বাছা বাছা লাঠিয়ালে'র সহিত তাহার মল্লযুদ্ধ (১।১৫, ৫৪।৫৫ পৃঃ) পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপন্যাসে নূতন সংযোজনা।

১৬। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

বাহিরে অবাধ স্বাধীনতা দিয়া গোপনে গুপ্তচরের সাহায্যে শিক্ষার্থী বা

শিক্ষার্থিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করার ফলে পরস্পরের প্রতি যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইতে পারে তাহা প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী।

১৭। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে রহিয়াছে : 'কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—'

এবং সাগরের মুখে এই অসমাপ্ত বাক্যের পরে রহিয়াছে :

'সাগরের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে পিছনের জানেলা হইতে কে বলিল, "আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

সাগরের মুখে সেই রকম কি কথা আসিতেছিল। সাগর না ভাবিয়া চিন্তিয়া, পিছন ফিরিয়া না দেখিয়া, রাগের মাথায় সেই কথাই বলিল, "আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।" ' (২।২, ৬৩ পৃঃ)।

এই পরিবর্ত্তনের ফলে একদিকে যেমন সাগরের আচরণ অধিকতর স্বাভাবিক হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই প্রফুল্লের চরিত্রের যে দিকটা বিকাশ লাভের কোনরূপ সুযোগ পায় নাই তাহার সেই কৌতুকপ্রিয়তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

ব্রজেশ্বর চলিয়া গেলে পরিচারিকার নিকট সাগরের প্রশ্ন, "তুই জানেলা হইতে কথা কহিয়াছিলি?"; পরিচারিকার উত্তর, "কই না।"; তাহার প্রতি সাগরের নির্দ্দেশ, "তবে কে জানেলায় দেখ্ ত।"—পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপন্যাসে নূতন সংযোজনা এবং উল্লিখিত পরিবর্ত্তনের জের।

সীতারাম

'সীতারাম' ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে 'প্রচারে' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ১২৯৩ সালের মাঘ সংখ্যায় উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ হয়। 'প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসের সহিত শতবার্ষিক সংস্করণের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

'প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। শ্রী গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য সীতারামের সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়া জীবন ভাণ্ডারীর মারফত তাঁহার নিকট ত্রিশূলাঙ্কিত মোহর পাঠাইল।

সীতারাম ১।২—প্রচার (প্রথম বৎসর), শ্রাবণ ১২৯১, ৩৩-৩৪ পৃঃ। প্রঃ সং

এই মোহরের ইতিহাস এইরূপ :

শ্রীকে ত্যাগ করিবার পর 'একবার সে বড় দুঃখে পড়িয়াছে, লোকমুখে শুনিয়া সীতারাম তাহাকে কিছু অর্থ পাঠাইয়া দিলেন—আর চিহ্নিত করিয়া আধখানা মোহর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন যে, "তোমার যখন কিছু প্রয়োজন হইবে, এই আধখানা মোহর সঙ্গে দিয়া একজন লোক আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।" শ্রী সে আধখানা মোহর কখনও কাজে লাগায় নাই—কখনও লোক পাঠায় নাই। কেবল ভাইয়ের প্রাণরক্ষার্থ সে রাত্রে মোহর লইয়া আসিয়াছিল।'

সীতারাম ১।১৩—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর), ১২৯২-৯৩, ২৩ পৃঃ। প্রঃ সং

মোহরের পরিণতি :

শ্রী যখন সীতারামের নিকট তাহাকে পরিত্যাগ করার প্রকৃত কারণ অবগত হইল, তখন সে আর কখন কোন কারণে সীতারামের সান্নিধ্যে আসিবে না, এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করিয়া অপ্রয়োজনীয়বোধে 'সেই স্বর্ণার্দ্ধ নদীসৈকতে নিক্ষিপ্ত করিয়া' সীতারামের নিকট হইতে চলিয়া গেল।

সীতারাম ১।১২—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর) ১২৯২-৯৩, ২৩ পৃঃ। প্রঃ সং

২। জীবন ভাণ্ডারী শ্রীকে পৌঁছাইয়া দিলে 'গৃহকর্ত্তা [সীতারাম] বলিলেন, "আমি সীতারাম রায়—তুমি কে? তোমার মুখে ঘোম্‌টা—কথা কহিতেছ না, আমি চিনিব কি প্রকারে?"

তখন শ্রী মুখের ঘোম্‌টা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দর-মুখী। বলিলেন, "তুমি শ্রী!"

শুনিয়া শ্রী কাঁদিয়া উঠিল।'

সীতারাম ১।২—প্রচার (প্রথম বৎসর), শ্রাবণ ১২৯১, ৩৫ পৃঃ। প্রঃ সং

৩। শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠের ৩নং চিহ্নিত অংশে যে উদ্ধৃতি রহিয়াছে তাহা নূতন সংযোজনা।

৪। শ্রী চলিয়া যাইবার 'দণ্ড চারি ছয় পরে' সীতারাম মৃণ্ময়কে ডাকাইয়া তাঁহার উপর নিজের পরিবারবর্গকে সেই রাত্রেই নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার ভার অর্পণ করিলেন। পরে অন্তঃপুরে যাইয়া প্রচার করিলেন যে, তিনি সকলের জন্য গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করিতে চাহেন এবং সেই রাত্রিতেই যাবার শুভ সময়। এই সংবাদে অপর সকলেই সুখী হইলেন, কিন্তু নন্দা ও রমাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হইল না। নন্দা বলিল, স্বামীই তাহার সকল তীর্থ, সুতরাং সে গঙ্গাস্নানে যাইবে না। সীতারাম আপত্তি করিলেন না। তখন নন্দা সোজা আসল কথা কি জানিতে চাহিল এবং যে স্ত্রীলোকটি রাত্রিকালে তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে সীতারাম বলিলেন, "বলিবার হইত ত বলিতাম।" দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আর একদিন বলিব।" প্রথম উত্তর শুনিয়া 'নন্দার মুখখানা মেঘঢাকা আকাশের মত' হইল ; দ্বিতীয় উত্তরে 'এইবার মেঘ বর্ষিল।.... তখন সীতারাম নন্দার চিবুক গ্রহণপূর্ব্বক বড় মধুর আদর করিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।'

এইবার রমার পালা। রমা বলিল যে, সে বুঝিয়াছে যে, তিনি কোনরূপ দুঃসাহসের কাজ করিতে চাহেন। সীতারাম ইহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু বলিলেন, "কোন ভয় নাই।" শুনিয়া রমা 'দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল। বলিল, "যাইতে হয়, আমার গলায় পা দিয়া যাও। এখন বল দেখি, আজ তোমার কাছে কে আসিয়াছিল?"' সীতারাম নন্দার নিকট গোপন করিলেও, রমার নিকট শ্রীর কথা সকলই বলিলেন। রমা তখন 'ভাল করিয়া দ্বার চাপিয়া বসিল।' সীতারাম 'অনেক মিনতি' করিলে শেষ পর্য্যন্ত এক সর্ত্তে সে দ্বার ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল ; সর্ত্তটি এই যে, তিনি 'বিনা বিবাদ বিসম্বাদে—দাঙ্গা লড়াই না করিয়া' শ্রীর ভাইয়ের জন্য যাহা করিতে পারেন তাহাই করিবেন, ইহার অতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবেন না। 'কিছুক্ষণ ভাবিয়া' সীতারাম স্বীকৃত হইলেন।

সীতারাম ১।৪ —প্রচার (প্রথম বৎসর), ভাদ্র ১২৯১,
৪৮-৫৭ পৃঃ। প্রঃ সং

৫। অতঃপর সীতারাম তদীয় গুরুদেব চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের নিকট যাইয়া শ্রী ও রমার নিকট তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, 'মারামারি কাটাকাটিতে' তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। অথচ 'স্তুতি মিনতিতেও' কার্য্যসিদ্ধি হইবে তিনি এরূপ আশা করেন না। যদি কার্য্য উদ্ধার না হয় তাহা হইলে 'পাপশান্তির' জন্য তিনি তীর্থযাত্রা করিবেন, সুতরাং গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছেন।

চন্দ্রচূড় চতুর লোক ; রমা সম্বন্ধে সীতারামের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার তীর্থযাত্রার সঙ্কল্পে তিনি 'বড় বিপন্ন' হইয়াছেন, কারণ তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের মঙ্গলার্থ তিনি এক যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহাতে 'এক সহস্র রৌপ্যের প্রয়োজন।' সীতারাম তখনই টাকার ব্যবস্থা করিলেন। চন্দ্রচূড় তখন জীবন ভাণ্ডারীকে লইয়া সেই রাত্রেই সীতারামের মাতব্বর স্থানীয় প্রজা ও খাতকের বাড়ী যাইয়া পূজার প্রসাদী ফুল এবং টাকা বিতরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে ঢাল শড়কী সঙ্গে

লইয়া গঙ্গারাম দাসের 'জীয়ন্তে কবর' দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

সীতারাম ১।৫—প্রচার (প্রথম বৎসর), ভাদ্র ১২৯১,
৫৭-৬২ পৃঃ। প্রঃ সং

৬। গঙ্গারামকে কেন্দ্র করিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামার পর 'চন্দ্রচূড় ঠাকুর মূর্চ্ছিতা শ্রীকে "ঝাড় ফুক" করিতেছিলেন। যদি সভ্য ভাষায় বলিতে হয়, বল, মেসেমেরাইস্ করিতেছিলেন।' পরে শ্রী, 'যে কারণেই হউক', সংজ্ঞালাভ করিয়া 'ধীরে ধীরে নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।' সীতারাম চন্দ্রচূড়কে তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। এবং চন্দ্রচূড় প্রস্থান করিলে সেই জনশূন্য প্রান্তরে 'সেই বৃক্ষমূলে, যে ডালের উপব চণ্ডীমূর্ত্তি শ্রী দাঁড়াইয়া রণজয় করিয়াছিল, সেই ডাল ধরিয়া' সীতারাম একাকী দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন 'যে দিকে সীতারাম মনশ্চক্ষু ফিরান, সেই দিকে দেখিতে পান, মুসলমানের অত্যাচার!' ভাবিলেন, কোথায় ইহার প্রতিকার? সীতারাম অন্তরমধ্যে উত্তর পাইলেন, প্রতিকাব 'ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপন।' ক্ষণিকের জন্য তাঁহাব আত্মশক্তিতে গর্ব্ব জন্মিল, কিন্তু পরক্ষণেই ভ্রম ঘুচিল। 'তখন সীতারাম কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরে চিত্তসমর্পণ করিলেন।' তিনি বুঝিলেন, 'ধর্ম্মই ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের উপায়।'

ততক্ষণে মাঠ মুসলমান সেনায ভরিয়া গিয়াছে। ইহাদেরই একজন সীতারামকে 'চোট্টা', 'ডাকু' প্রভৃতি সম্বোধনে সম্বর্দ্ধিত করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে এক পাইকেব জিম্মায় দিয়া তাহাব প্রতি হুকুম দিল যেন সে এই 'চোরকে' 'ফাটকের জমাদ্দারের' নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

সীতারাম ১।৬-৮—প্রচার (প্রথম বৎসর) কার্ত্তিক ১২৯১,
১৪০-৪৪ পৃঃ। প্রঃ সং

৭। এদিকে চন্দ্রচূড় ঠাকুর শ্রীকে নগরমধ্যে এক নিভৃত কালী মন্দিরে লইয়া গেলেন। সীতারামেব মনে যে প্রশ্ন, শ্রীব মনেও সেই একই প্রশ্ন। শ্রী চন্দ্রচূড়কে প্রশ্ন করিল, "ঠাকুর! মুসলমানের এ দৌরাত্ম্য কত কাল আব থাকিবে?" ইহার উত্তর দিতে যাইয়া হিন্দুর আসল দুর্ব্বলতা কোথায চন্দ্রচূড় তাহার উল্লেখ কবিলেন। তিনি বলিলেন, হিন্দুর মধ্যে বলবানের অভাব নাই, 'কিন্তু তাহারা মুসলমানের মুখ চায়।' দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সীতারামের কথা তুলিলেন। "সীতারাম না পারে কি? কিন্তু সীতারাম রাজভক্ত—বাদশাহের অনুগৃহীত—অকারণে রাজদ্রোহী হইবে না।" বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই তিনি শ্রীকে বুঝাইলেন যে, মুসলমান

সীতারামের উপর অত্যাচার না করিলে তিনি 'রাজদ্রোহ-পাপে' সম্মত হইবেন না।

ইহার ফল ফলিল। 'কোন বিশেষ সামগ্রী' হারাইয়া আসিয়াছি, এই অজুহাতে শ্রী মাঠের দিকে চলিল। চন্দ্রচূড় তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। সিপাহী আসিলে চন্দ্রচূড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু দাঙ্গার সময় গাছের উপর দাঁড়াইয়া যে তাহাদের দুর্দ্দশা করিয়াছে এ সেই, শ্রীর মুখে তাহার এই পরিচয় পাইয়া একজন সিপাহী তাহার 'ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া লইয়া চলিল।' 'ঘাড়-ধাক্কা খাইয়া শ্রী মৃদু হাসিল।...ডাকিয়া চন্দ্রচূড়কে বলিল, "ঠাকুর! যদি আমার স্বামীকে চেনেন, তবে বলিবেন, আমার উদ্ধার তাঁহার কাজ।"'

সীতারাম ১।৯—প্রচার (প্রথম বৎসর), পৌষ ১২৯১,
১৯৫-২০০ পৃঃ। প্রঃ সং

৮। বহুসংখ্যক লোকের সহিত সীতারাম 'ফৌজদারী কারাগারে' বাত্রির মত আবদ্ধ হইলেন। সীতারাম ইচ্ছা করিলে ফৌজদারের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা কবিতে পারিতেন, কিন্তু এতগুলি লোককে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে সীতারামের নির্দ্দেশ মত তাহারা কারাগারের লৌহ কপাটে পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে দেয়ালে ফাট ধরিল এবং শেষ পর্য্যন্ত 'লোহার কপাট, চৌকাট সমেত, দেয়াল ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।' বন্দীরা এইরূপে মুক্তিলাভ করিল। সীতারাম লক্ষ্য করিয়াছিলেন একজন বন্দী 'মুড়ি দিয়া' পড়িয়া রহিয়াছিল। এখন তাহার নিকট যাইয়া প্রশ্ন করিয়া সীতারাম জানিলেন, সে শ্রী।

'সীতারাম বলিলেন, "শ্রী—তুমি এখানে কেন?"

শ্রী। সিপাহীতে ধরিয়া আনিয়াছে।

সীতা। হাঙ্গামায় ছিলে বলিয়া? তা, ইহাদের বোধ সোধ নাই। অত্যাচার বেশী হইতেছে। যাই হউক, এখন ভগবানের কৃপায় আমরা মুক্ত হইয়াছি। এখন তুমি এখানে পড়িয়া কেন? আপনার স্থানে যাও।'

সীতারাম ১।১০-১১—প্রচার (প্রথম বৎসর) মাঘ ১২৯১, ২৩৭-৪৬ পৃঃ
ও ঐ (দ্বিতীয় বৎসর) ১২৯২-৯৩, ১৮-১৯ পৃঃ। প্রঃ সং

৯। 'শ্যামাপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে' একদিন সস্ত্রীক লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির দর্শনে যাইয়া দেখিলেন 'মন্দিরদ্বারে দেবমূর্ত্তিসমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে।' পরিচয়ে জানিলেন ইনি ফকির। ঠাকুর-

মন্দিরে মুসলমান প্রবেশ করায় মন্দির অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া সীতারাম প্রমাদ গণিলেন। ফকির ধীরে ধীরে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহারই উত্তরের ভিতর দিয়া সীতারামের ভ্রম সংশোধন করিলেন :

'ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর ? ইনি করেন কি ?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

সীতা। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর, তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইঁহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন ? এই বুদ্ধিতে বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা ? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন ? না, আর থাকিবার স্থান আছে ?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী ; সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন।

সীতা। অবশ্য—তোমরা মান না কেন ?

ফকির। বাবা ! ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উঁহার মন্দিরদ্বারে বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন ?'

সীতারাম অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন, ''এইরূপ আমাদের দেশাচার।'' ফকির সীতারামকে বুঝাইলেন, দেশাচারের বশীভূত হইলে তিনি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে পারিবেন না। মুসলমান রাজা হিন্দু ও মুসলমান প্রজায় প্রভেদ করিয়াছেন, এই পাপে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইতেছে। সীতারাম রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে তাঁহাকে সমদর্শী হইতে হইবে।

সীতারাম প্রীত হইলেন এবং ফকিরকে তাঁহার নূতন রাজধানীতে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। ফকির এক সর্ত্তে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন ; সর্ত্তটি এই যে, রাজধানীর নাম শ্যামাপুরের পরিবর্ত্তে 'মহম্মদপুর' রাখিতে হইবে, তাহা হইলে ফকির 'খাতির জমা' থাকিবেন যে, সীতারাম হিন্দু মুসলমানকে সমান দেখিবেন।

সীতারাম সম্মত হইলেন। ফকির সীতারাম ও তাঁহার ভার্য্যাদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন

সীতারাম ১।১৪—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর) ১২৯২-৯৩, ৬২-৬৬ পৃঃ। প্রঃ সং ; কিন্তু 'শ্যামাপুর' 'শ্যামপুরে' পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

১০। ভৈরবী (শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠে ইনি সন্ন্যাসিনী) শ্রীকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাধর স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি শ্রীর সঙ্গে কোন কথা কহিলেন না, বা তৎসম্বন্ধে ভৈরবীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। |ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বৎসে! তোমার মঙ্গল? তোমার ব্রত সাঙ্গ হইয়াছে?"

ভৈরবী। এ জন্মে হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বামী। পাপ!

ভৈরবী চুপ করিয়া, মুখ নত করিল।

স্বামী। তবে এক্ষণে কি করিবে?

ভৈরবী। যাহা করিতেছি, তাহাই করিব। আমার কোন দুঃখ নাই। যদিই থাকে, তবে একটা দুঃখের ভার মরণ পর্য্যন্ত বহা যায় না?

স্বামী। একটা কেন, সহস্র দুঃখভার বহন করা যায়। যাহার সহস্র দুঃখ, সে সহস্র দুঃখেরই ভার মরণ পর্য্যন্ত বহন করে। গর্দ্দভের পিঠে বোঝা চাপাইয়া দিলে, সে কি ফেলিয়া দেয়? যাহারা বহন করে, তাহারা মনুষ্যবেশে গর্দ্দভ। যে দুঃখ মোচন করে, সেই মানুষ। তুমি আপনার দুঃখ মোচন করিতেছ না কেন?

ভৈরবী। তাহার উপায় জানি না। স্ত্রীলোক বলিয়া, আপনি যোগাভ্যাস নিষেধ করিয়াছেন।

স্বামী। যোগ কি? জ্ঞানই যোগ। জ্ঞানে কে অনধিকারী? বেদে ভিন্ন কি জ্ঞান নাই? জ্ঞানই আনন্দ। তোমার ত জ্ঞানের অভাব নাই। দুঃখ কেন?

ভৈরবী। আমি উপদেশ লইয়াছি কিন্তু আমার শিক্ষা হয় নাই।

স্বামী। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান নাই।

ভৈরবী। আমার কর্ম্ম হয় নাই।

স্বামী। এখন কোথায় যাইতেছ?

ভৈরবী। পুরুষোত্তম দর্শনে।

স্বামী। কেন?

ভৈরবী। আর কোন কাজ নাই।

স্বামী। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর না কেন? তীর্থদর্শনও সকাম কর্ম্ম।

ভৈরবী। আমার ইহাতে কোন কামনা নাই। কেবল ভূততাড়িত হইয়া ফিরিতেছি।

স্বামী। ভাল, দর্শন করিয়া ফিরিয়া আইস। আমি উপযুক্ত কর্ম্ম বলিয়া দিব।] এ স্ত্রী কে?'

সীতারাম ১।১৯—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর) ১২৯২-৯৩, ১৪১-৪২ পৃঃ।

১১। গঙ্গাধর স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইবার পর পুরুষোত্তমের পথে ভৈরবী ও শ্রীর সংলাপ এইরূপ :

'ভৈরবী বলিতে লাগিল—"আর মা বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না—আমরা দুইজনেই সমান বয়স, [বুঝি সমান দুঃখে এই পৃথিবীতে ঘুরিতে থাকিব।] আমরা দুই জনে ভগিনী।"

শ্রী। [আমার এমনই অদৃষ্ট যে, যে আমার সংসর্গে আসে সেই দুঃখী।] তুমিও কি আমার মত দুঃখে সংসার ত্যাগ করিয়াছ?

ভৈরবী। [সে দুঃখ একদিন তোমাকে বলিব।] তোমার[ও] দুঃখের কথা শুনিব।....'

সীতারাম ১।২০—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর) ১২৯২-৯৩, ১১৪ পৃঃ।

১২। অদর্শনের ফলে 'ক্রমে তিল তিল করিয়া, শ্রী সীতারামের সমস্ত হৃদয় অধিকৃত করিল। হিন্দুসাম্রাজ্যের আর সেখানে স্থান নাই। সুতরাং হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনের বড় গোলযোগ। শ্রীর অভাবে, সীতারামের মনে আর সুখ নাই, রাজ্যে আর সুখ নাই, হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপনেও আর সুখ নাই। কাজেই আর হিন্দুরাজ্যসংস্থাপন হয় না।'

সীতারাম শ্রীর অনুসন্ধানের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই যখন সন্ধান মিলিল না, 'তখন সীতারাম হিন্দুসাম্রাজ্য জলাঞ্জলি দেওয়া স্থির করিলেন। একবার নিজে তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে শ্রীর অনুসন্ধান করিবেন। যদি শ্রীকে পান, ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য করিবেন। না পান, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন।' এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি 'ভার্যাদ্বয় এবং চন্দ্রচূড় প্রভৃতি অমাত্যবর্গের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, তিনি এ পর্যান্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই, কেন না দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইয়াছে।' তিনি তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করিয়া 'কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। নামে দিল্লীযাত্রা কিন্তু কোথায় যাইবেন, তাহা সীতারাম ভিন্ন আর কেহ জানিত না।'

সীতারাম ২।১—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর), ১২৯২-৯৩,
১৬১-৬২ পৃঃ। প্রঃ সং

১৩। মুরলার নিকট গালি খাইয়া রমার কথা ভাবিতে ভাবিতে

'গঙ্গারাম শয্যা লইল।' বিছানায় পড়িয়া শেষ পর্যন্ত সে স্থির করিল, "ধর্ম্মে হৌক, অধর্ম্মে হৌক, আমার রমাকে পাইতে হইবে, নহিলে মরিতে হইবে।" কিন্তু রমাকে পাইবার উপায় কি? গঙ্গারাম ভাবিল, 'কাল মুসলমান আসিবে, আজ বাপের বাড়ীতে যাইতে হইবে'—এই কথা বলিয়া সহজেই রমাকে হস্তগত করা যায়, কিন্তু তাহাকে লইয়া সে যাইবে কোথায়? সীতারামের এলাকায় থাকিলে তিনি ফিরিবার পূর্ব্বেই চন্দ্রচূড়ের হুকুমে মৃণ্ময় তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিবে। বাহিরে মুসলমানের এলাকা সেখানে সে 'ফেরারি আসামী'। সুতরাং তাহার যাইবার স্থান নাই। তবে এক উপায় আছে—তোরাব্ খাঁর সঙ্গে ভাব করা, তোরাব্ খাঁ অনুগ্রহ করিলে গঙ্গারাম জীবনও পাইবে, রমাকেও পাইবে।

সীতারাম ২।৯—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর), ১২৯২-৯৩,
২৮৫-৮৬ পৃ। প্র সং

১৪। বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ তোরাব্ খাঁ গঙ্গারামকে 'শিপাহ-শালার' করিতে এবং তাহাকে টাকা ও গ্রাম দিতে সম্মত হইল। গঙ্গারাম রমাকে প্রার্থনা করিলে তোরাব্ খাঁ 'তামাসা করিল' বলিল যে, হিন্দুর মধ্যে যখন বিধবাবিবাহ নাই, তখন সীতারামকে হত্যা করিলেও গঙ্গারাম কেমন করিয়া তাঁহার বিধবাকে বিবাহ করিবে?—মুসলমান হইলে না হয় 'নেকা' করিতে পারিত। 'গঙ্গারাম ভাবিল, এ পরামর্শ মন্দ নহে।' গঙ্গারাম মুসলমান হইতে স্বীকৃত হইল।

সীতারাম ২।১১—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর) ১২৯২-৯৩,
২৮৯-৯০ পৃ। প্র সং

১৫। তোরাব্ খাঁর সহিত গঙ্গারামের গোপন ষড়যন্ত্রের পর দিবস চাঁদশাহ ফকির নিভৃতে চন্দ্রচূড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সাক্ষাতের সংবাদ জানাইলেন।

সীতারাম ২।১১—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর) ১২৯২-৯৩,
২৯০ পৃ। প্র সং

চন্দ্রচূড় এই সংবাদে প্রথমে হতবুদ্ধি হইলেও 'কালে বুদ্ধি ফিরিয়া আসিলে' তিনি ইহার বিহিত চিন্তা করিলেন। চন্দ্রচূড় বুঝিলেন, গঙ্গারামকে পদচ্যুত করিয়া আবদ্ধ করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? 'নগর সিপাহী' গঙ্গারামের হাতে, সুতরাং মৃণ্ময়ের সাহায্য ব্যতীত গঙ্গারামকে আবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু মৃণ্ময় যে বিশ্বাসী তাহারই বা প্রমাণ কি?

সন্ধ্যার পর গুপ্তচর আসিয়া 'সংবাদ দিল যে, ফৌজদারী সৈন্য দক্ষিণ পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে।' চন্দ্রচূড় পরামর্শের জন্য মৃণ্ময় ও গঙ্গারামকে ডাকাইলেন। স্থির হইল সেই রাত্রেই মৃণ্ময় শত্রুসৈন্যের গতিরোধের জন্য দক্ষিণ পথে যাত্রা করিবেন। চন্দ্রচূড় গঙ্গারামকেও 'দ্বিতীয় সেনাপতি হইয়া' মৃণ্ময়ের সাহায্যে যাইতে পরামর্শ দিলেন। ইহাতে মৃণ্ময়ের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। কিন্তু তিনি মুখে বলিলেন, "তা চলুন না—বেশ ত।" গঙ্গারাম আপত্তি তুলিল, বলিল, "আমি যাব ত নগর রক্ষা করিবে কে?" চন্দ্রচূড় উত্তর করিলেন, "মৃণ্ময় না হয় সে জন্য একজন ভাল লোক রাখিয়া যাইবেন।" কিন্তু রাজার নিকট নগর রক্ষা ব্যাপারে তাহাকেই জবাবদিহি করিতে হইবে—এই অজুহাতে গঙ্গারাম এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। 'তখন চন্দ্রচূড় মনে মনে সন্দিগ্ধ হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "যাহা তোমরা ভাল বুঝ—তাই করিও।"' মৃণ্ময় 'দক্ষিণ পথে যাত্রা করিলেন'। গঙ্গারাম নগর রক্ষায় রহিয়া গেল।

সীতারাম ২।১২—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর) ১২৯২-৯৩, ৩৬১-৬২ পৃঃ। প্রঃ সং

১৬। তোরাব্ খাঁর সহিত যুদ্ধে সীতারামের জয় হইলে 'জয়ন্তী বলিল, "শ্রী! আর দেখ কি? এক্ষণে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কর।"

শ্রী। সেই জন্যই কি আসিয়াছি?

জয়ন্তী। [তোমাকে পাইলে তিনি যতদূর সুখী হইবেন, এত আর কিছুতেই না। তবে তাঁহাকে তুমি সুখী না করিবে কেন?

শ্রী। তুমি ত আমাকে শিখাইয়াছ যে ইন্দ্রিয়াদির নিরোধই যোগ।

জয়ন্তী। ইন্দ্রিয় সকলের আত্মবশ্যতাই যোগ। তাহা কি তুমি লাভ করিতে পার নাই?

শ্রী। আমার কথা হইতেছে না।

জয়ন্তী। যাহার কথা হইতেছে, তাঁহাকে তুমি এই পথে আনিতে পারিবে। সেই জন্যই সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন।] যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন?

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়ন্তী। আমি বুঝি যে, তোমা হইতেই এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রী। ...আবার কি ডুবিয়া মরিব?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়—কিন্তু মরে না রত্ন তুলিয়া আনে।

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। কিছুদিন না হয় এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি, যদি দেখি, আমার চিত্ত এখন অবশ্য, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।

[জয়ন্তী। আমি যে রাজার কাছে প্রতিশ্রুত আছি, যে তোমাকে দেখাইব।

শ্রী। কিছুদিন এইখানে থাকিয়া বিচার করিয়া দেখা যাক্, দুই দিক্ বজায় রাখা যায় কি না।]

সীতারাম ২।১৮—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর) ১২৯২-৯৩, ৪৪৩-৪৪৪ পৃঃ। প্রঃ সং

[প্রথম সংস্করণে শ্রীর উক্তিতে 'ইন্দ্রিয়াদির নিরোধই' স্থলে পাঠ ছিল: 'চিত্তবৃত্তির নিরোধই' এবং জয়ন্তীর উত্তরে 'ইন্দ্রিয় সকলের' স্থলে ছিল 'মনোবৃত্তি সকলের'। শতবার্ষিক সংস্করণ (পাঠভেদ)—১৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।]

১৭। গঙ্গারামের বিচারকালে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মুরলা 'সব কথা ঠিক বলিল—কিছুই ছাড়িল না। [আড়াইটা বিবাহের ব্যঙ্গটাও ছাড়িল না। শুনিয়া বাহিরের দর্শকমণ্ডলী মধ্যে অস্ফুট স্বরে কেহ কেহ বলিল, "আয়ি, আমি রাজি।" কেহ বা বলিল, "মাসী, আমার খুড়ো রাজি।"']

সীতারাম ৩।৪—প্রচার (তৃতীয় বৎসর) ১২৯৩-৯৪, ২২ পৃঃ। প্রঃ সং

মুরলার 'আড়াইটা বিবাহের ব্যঙ্গের' পশ্চাতের ইতিহাস এইরূপ: রমা যখন আর তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় না তখন গঙ্গারাম মুরলাকে ডাকিয়া আনিলে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে যাইয়া মুরলা বলিতেছে, "আমি জেতে কৈবর্ত্ত, বিবাহ আড়াইটা হইয়াছে, তাতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমার সাড়ে তিনটায় আপত্তি নাই।"

সীতারাম ২।৭—প্রচার (দ্বিতীয় বৎসর) ১২৯২-৯৩, ২৬৯ পৃঃ। প্রঃ সং

১৮। শাস্তিস্বরূপ মুরলার 'মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া' নগর হইতে বহিষ্করণকালে 'অনেকেই মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, আড়াইটার উপর সাড়ে তিনটা হয় না?" মুরলারও লজ্জা নাই—সে উত্তর দিল, "হয়—তোর বাবাকে ডেকে আন্‌গে যা—"'

সীতারাম ৩।৫—প্রচার (তৃতীয় বৎসর) ১২৯৩-৯৪, ৪১ পৃঃ। প্রঃ সং

শতবার্ষিক সংস্করণের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। মোহরের কাহিনী পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

শ্রী তীক্ষ্ণ আত্মমর্য্যাদাবোধসম্পন্না; সুতরাং সে যত দুরবস্থায় পড়ুক,

সীতারাম তাহাকে ত্যাগ করার পর তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা অথবা প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে সাহায্যের প্রত্যাশায় তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ নিদর্শন গ্রহণ করা তাহার চরিত্রানুরূপ নহে। গঙ্গারামের বিপদে তাহার প্রাণরক্ষা করার প্রার্থনা স্বতন্ত্র জিনিষ।

২। সীতারাম ও শ্রীর সংলাপের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে :

গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "তুমি কে ?"

শ্রী বলিল, "আমি শ্রী।"

"শ্রী! তুমি তবে আমাকে চেন না ? না চিনিয়া আমার আছে আসিয়াছ ? আমি সীতারাম রায়।"

তখন শ্রী ঘোমটা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারিনিষিক্ত পদ্মের ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দরমুখী। বলিলেন, "তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!"

শ্রী বলিল, "আমি বড় দুঃখী। তোমার ব্যঙ্গের যোগ্য নহি।" শ্রী কাঁদিতে লাগিল।' (১২, ৯ পৃঃ)।

পরিবর্ত্তিত পাঠে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি লক্ষণীয় :

(ক) শ্রী কোনরূপ নিদর্শন পাঠায় নাই, সুতরাং তাহাকে মৌখিক পরিচয় দিতে হইয়াছে।

(খ) শ্রীকে সীতারাম পূর্ব্বে যখন দেখিয়াছেন তখন সে বালিকা, এখন সে পূর্ণযৌবনা। শ্রী ঘোমটা তুলিলে "তুমি শ্রী!"—সীতারামের এই উক্তিতে তাহার সৌন্দর্য্যদর্শনে যে বিস্ময় প্রকাশ পাইয়াছে, "এত সুন্দরী!"—এই উক্তিতে (ইহা নূতন সংযোজনা) তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি।

(গ) কিন্তু অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় শ্রীর পক্ষে ইহাকে ব্যঙ্গ মনে করাই স্বাভাবিক।

৩। শ্রী প্রস্থান করিলে সীতারাম 'মনে মনে একবার আবার ভাবিলেন, "শ্রী এমন শ্রী ? তা ত জানি না, আগে শ্রীর কাজ করিব, তার পর অন্য কথা।"' (১২, ১১ পৃঃ)।

ইহা নূতন সংযোজনা এবং শ্রীকে দেখিবামাত্র সীতারামের উক্তি : "এত সুন্দরী!" যে রূপমোহের ইঙ্গিত করে ইহা তাহারই জের।

৪-৫। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে সীতারামের সহিত শ্রীর সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ এইরূপ :

শ্রী প্রস্থান করিবার পর 'কিছুক্ষণ পরে' সীতারাম চন্দ্রচূড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 'চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে নিভৃতে সীতারামের অনেক কথা হইল। .... কথাবার্ত্তার ফল এই হইল যে, সীতারাম ও চন্দ্রচূড় উভয়ে সেই রাত্রিতে....

সহরের অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সীতারাম রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনার পরিবারবর্গ একজন আত্মীয় লোকের সঙ্গে মধুমতীপারে পাঠাইয়া দিলেন।' (১৩, ১১ পৃঃ)।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ গঙ্গারামের জীবনরক্ষার ব্যবস্থার ইঙ্গিত করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ (ইহাও সংক্ষিপ্ত) রহিয়াছে গঙ্গারামের উদ্ধারের পর অতীতের ঘটনার বিবৃতি হিসাবে। (১৯, ২৮ পৃঃ)। ফলে ঘটনার দ্রুত গতির সহিত উপন্যাসের গতি সমান তালে চলিয়াছে। পক্ষান্তরে, 'প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসে অন্তঃপুরে নন্দা ও রমার সহিত সীতারামের সংলাপ এবং চন্দ্রচূড় কর্তৃক গঙ্গারামের উদ্ধারের আয়োজনের বিস্তারিত বর্ণনার ফলে গঙ্গারামকে জীবন্ত কবর দিবার আজ্ঞা প্রচারের পর হইতে পর দিবস সীতারামের চেষ্টায় তাহার উদ্ধারের কাহিনীর গতি অবাঞ্ছনীয়রূপে ব্যাহত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, 'প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসে রমার নিকট সীতারামের প্রতিশ্রুতি নিতান্ত কাপুরুষোচিত, সুতরাং তাঁহার চরিত্রবিরুদ্ধ। পরিবর্ত্তিত পাঠে হাঙ্গামা এড়াইতে চাহিলেও, প্রয়োজন হইলে প্রথম হইতেই সীতারাম ইহার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন এবং চন্দ্রচূড়ের সহায়তায় তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। (১৯, ২৮ পৃঃ)।

৮-৮। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে কাহিনী এইরূপ :

শ্যামপুর ('প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসে 'শ্যামাপুর') যাইবার নির্দ্দেশ পাইয়া গঙ্গারাম যখন মাঠের ভিতর 'অশ্বের সন্ধানে গেল', তখন 'চন্দ্রচূড় ঠাকুর সীতারামের ইঙ্গিত পাইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।' এবং শ্রী সংজ্ঞা লাভ করিলে (এ জন্য চন্দ্রচূড় ঠাকুর তাহাকে 'ঝাড়ফুক' বা 'মেসেমরাইস' করেন নাই) সীতারাম যখন তাহাকে শ্যামপুর পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন এই উপলক্ষ্যে তাঁহাদের মধ্যে বোঝাপড়া হইল। (১৫-৭, ২১-২৫ পৃঃ)।

পরিবর্জ্জিত অংশ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে :

(ক) এত বড় একটা হাঙ্গামার পর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া 'সেই জনশূন্য প্রান্তরে' দাঁড়াইয়া চিন্তামগ্ন হওয়া কি সীতারামের পক্ষে স্বাভাবিক? ইহা ভাবপ্রবণতার সাক্ষ্য দিলেও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দেয় না।

(খ) সীতারাম বুঝিয়াছিলেন, সিপাহীরা 'বড় ধড়পাকড়' করিবে, সুতরাং যাহারা কারারুদ্ধ হইবে তাহাদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই তিনি সিপাহীর আদেশমত তাহার অনুসরণ করিয়া বিনা প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় কারাবরণ

করিলেন, ইহা মানিলাম। কিন্তু যে উপায়ে তিনি বন্দীদিগকে মুক্ত করিলেন, তাহা কি স্বাভাবিক? দ্বিতীয়তঃ, ইহার ফলে হয়ত আরও গুরুতর হাঙ্গামার সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই? যেখানে প্রথম হইতেই তিনি হাঙ্গামা এড়াইতে চাহিয়াছেন, সেখানে জানিয়া শুনিয়া হাঙ্গামা বাড়াইবার সার্থকতা কি? আর যদি তিনি বিরোধই চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলেও এক্ষেত্রে ফৌজদারের সহিত বাহ্যতঃ মৈত্রী বজায় রাখিয়া গোপনে শক্তি সঞ্চয় করাই তাঁহার পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত-পক্ষে, পরে দেখিতে পাই তিনি কার্যাতঃ এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। (১।১৫, প্রচার—দ্বিতীয় বৎসর ১২৯২-৯৩, ৬৬-৬৮ পৃঃ; শতবার্ষিক সংস্করণ ১।৯, ২৮-৩০ পৃঃ)।

(গ) শ্রী সীতারামকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় সিপাহীর হাতে ধরা দিয়াছে, ইহা তাহার 'সিংহবাহিনী মূর্ত্তি'র অবস্থান্তর মাত্র, ইহা মানিলাম। এবং শ্রীর অনুরোধে সীতারাম যেমন গঙ্গারামকে উদ্ধার করিয়াছেন, শ্রী কারারুদ্ধ হইয়াছে জানিতে পারিলে তিনি সেইরূপ তাহার উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইবেন, ইহাও মানিলাম। কিন্তু শ্রীর উপর অত্যাচারকে নিজের উপর অত্যাচার মনে করিয়া সীতারাম 'রাজদ্রোহ-পাপে' সম্মত হইবেন, চন্দ্রচূড়ের মনে এরূপ ধারণা জন্মিলেও, শ্রী সীতারামের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে এরূপ আশা করিবার কোনরূপ সঙ্গত কারণ আছে কি? বস্তুতঃ, তাহাকে 'সিপাইতে ধরিয়া আনিয়াছে' শ্রীর নিকট এই সংবাদ শুনিয়া সীতারাম যে উত্তর করিলেন ('প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাস হইতে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য) তাহাতে স্বভাবতঃই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়: এই কি সেই সীতারাম কিছুকাল পূর্ব্বে জনশূন্য প্রান্তরে দাঁড়াইয়া যিনি 'ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের' স্বপ্ন দেখিয়াছেন?

৯। আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশে এই কাহিনীর কোন সার্থকতা নাই। হয়ত এই কারণেই এই পরিচ্ছেদটি পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

তথাপি বঙ্কিম সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার কত ঊর্দ্ধে ছিলেন তাহার নিদর্শন হিসাবে সীতারাম ও ফকিরের সংলাপের যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই কাহিনী একটি কিংবদন্তীর ভিত্তির উপর রচিত হইলেও (পরিশিষ্ট 'খ'-এ সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের 'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড হইতে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য) এই সংলাপ সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত।

১০। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী গঙ্গাধর স্বামী ও ভৈরবীর সংলাপ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে রহিয়াছে:

'তিনি কেবল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য—সকল কথাই সংস্কৃত ভাষায় হইল। শ্রী তাহার এক বর্ণ বুঝিল না। যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালায় বলিতেছি।

স্বামী। এ স্ত্রী কে?' সীতারাম ১।১৩, ৪২ পৃ:।

পরিবর্জ্জিত সংলাপ ভৈরবী সম্বন্ধে অনাবশ্যক কৌতূহল সৃষ্টি করে। পরিবর্ত্তিত পাঠে জয়ন্তী অতীতবিহীন, রহস্যময়ী সন্ন্যাসিনী।

১১। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে এবং ভৈরবীর (পরিবর্ত্তিত পাঠে 'সন্ন্যাসিনী'র) শেষ উক্তিতে 'সে দুঃখ একদিন তোমাকে বলিব'—এই কথার পরিবর্ত্তে রহিয়াছে: ''আমার সুখ দুঃখ নাই। তেমন অদৃষ্ট নয়।''

পূর্ব্বে (১০ চিহ্নিত অংশে) যে পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

১২। সমগ্র জিনিষটি নূতন রূপে পরিবেশিত হইয়াছে:

বহু অনুসন্ধানেও যখন শ্রীর সন্ধান মিলিল না, তখন 'সীতারাম স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ পর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই; কেন না, দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। তাঁহার সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইল।' এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজ্যরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া ঐ উদ্দেশ্যে তিনি 'কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন।' (২।১, ৪৬-৪৭ পৃ:)।

বলা বাহুল্য, সীতারামের চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়া এই পরিবর্ত্তন গুরুত্বপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত 'প্রচারে' প্রকাশিত কাহিনী সম্বন্ধে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে: সীতারাম যদি 'নামে দিল্লীযাত্রা' করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া ফিরিলেন কেমন করিয়া? ('প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসেও এই সনন্দলাভের বিবরণ রহিয়াছে—দ্বিতীয় বর্ষ ১২৯২-৯৩, ৪৪২ পৃ:)। যদিই বলা যায় যে, শ্রীর সন্ধান করাই ছিল সীতারামের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা হইলেও প্রশ্ন ওঠে: এই সীতারামই না শ্রীর সন্ধান না পাইলে 'সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন' সংকল্প করিয়াছিলেন?

১৩। সমগ্র পরিচ্ছেদটি পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

'রমা ও সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা' (২।৭) এবং বন্দে-আলিকে তোরাব্ খাঁর নিকট দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করা ('প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাস ২।১০; শতবার্ষিক সংস্করণ ২।৯)—এই দুইয়ের মাঝখানে শ্রী ও জয়ন্তীর কাহিনী সন্নিবিষ্ট করিয়া (২।৮) বঙ্কিম একদিকে যেমন যে শক্তি গঙ্গারামের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবে তাহার, অন্যদিকে তেমনই তাহার চিন্তা ও কার্য্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু 'প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসে (এবং উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে) বন্দেআলির দৌত্যের পূর্ব্বে পুনরায় গঙ্গারামের চিন্তাধারার বিস্তারিত বর্ণনা কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত করিয়াছে। পরন্তু শতবার্ষিক সংস্করণে এই বর্ণনা পরিবর্জ্জনের ফলে ঘটনার দ্রুত গতির সহিত উপন্যাসের কাহিনী সমান তালে চলিয়াছে।

১৪। গঙ্গারামকে লইয়া তোরাব্ খাঁর 'তামাসা' পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তিত পাঠ এইরূপ: 'গঙ্গারাম অভীষ্ট পুরস্কার চাহিলেন—বলা বাহুল্য, সে পুরস্কার রমা'। (২।১০, ৬৮ পৃঃ)।

গঙ্গারাম ধর্ম্মজ্ঞানহীন, অকৃতজ্ঞ লম্পট, তাহার পক্ষে রমাকে পাইবার লোভে মুসলমান হইতে স্বীকৃত হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। তথাপি এই অংশ পরিবর্জ্জিত হওয়ায় তাহার চরিত্রের কালিমা অন্ততঃ কিছুটা অপহৃত হইয়াছে।

১৫। সমগ্র ভিত্তিভূমিটি নূতন রূপে পরিবেশিত হইয়াছে।

যেদিন গঙ্গারাম তোরাব্ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিল, সেই রাত্রেই 'ফৌজদারী সৈন্য দক্ষিণ পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে'—গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ পাইয়া মৃন্ময় দক্ষিণ পথে যাত্রা করিলেন। গঙ্গারাম নগর-রক্ষায় রহিয়া গেল। তখন পর্য্যন্ত গঙ্গারামের গতিবিধি সম্বন্ধে চন্দ্রচূড় কোন গোপন সংবাদ পান নাই; সুতরাং তিনি তাহাকে কোনরূপ সন্দেহ করেন নাই। সমস্ত রাত্রি নগর ভ্রমণ করিয়া চন্দ্রচূড় দেখিলেন 'নগর রক্ষার কোন উদ্যোগই নাই'। গঙ্গারামকে ডাকিয়া সে কথা বলায়, গঙ্গারাম তাঁহাকে কড়া কড়া বলিয়া হাঁকাইয়া দিল। চন্দ্রচূড় চিন্তিত হইলেন। 'এমন সময়ে চাঁদশাহ ফকির আসিয়া গঙ্গারামের ভূষণাগমন বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল।' কিন্তু তখন আর গঙ্গারামের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় নাই, কারণ মৃন্ময়ের অনুপস্থিতিতে সমস্ত সিপাহী গঙ্গারামের বাধ্য (২।১১-১২, ৬৯-৭১ পৃঃ)।

এই পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসে

চন্দ্রচূড় সময়মত গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু মৃণ্ময়কে বিশ্বাস করিতে না পারায় তিনি কোনরূপ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না ; ইহা তাঁহার চাতুর্য্য বা কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দেয় না। মনে হয় এই কারণেই বঙ্কিম পরবর্তীকালে এই অংশ প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন করিয়া চন্দ্রচূড়ের চরিত্রের উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

১৬। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ দুইটি পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

প্রথম অংশে দেখিতে পাই শ্রী নিজের কথা ভাবিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতেছে না, ইতস্ততঃ করিতেছে স্বামীর কথা ভাবিয়া। শ্রী স্পষ্টই বলিতেছে, "আমার কথা হইতেছে না।" কিন্তু তাহার এই উক্তির সহিত তাহার পরবর্ত্তী উক্তির ("আবার কি ডুবিয়া মরিব ?" ইত্যাদি) সামঞ্জস্য কোথায় ?

পরিবর্জ্জিত দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে আপত্তি এই যে, জয়ন্তী রাজার কাছে কি প্রতিশ্রুত ছিল এস্থলে তাহাই বড় কথা নহে, আসল কথা, শ্রীর পক্ষে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মত শক্তি আছে কিনা। এবং তাহার এই শক্তি না থাকিলে জয়ন্তীর পক্ষে তাহার প্রতিশ্রুতির কথা তোলার কোন মূল্য নাই।

১৭। বন্ধনীমধ্যবর্ত্তী অংশ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

শতবার্ষিক সংস্করণে মুরলা কর্তৃক গঙ্গারামের ভর্ৎসনাকালে মুরলার 'আড়াইটা বিবাহের ব্যঙ্গ' পরিবর্জ্জিত হইয়াছে (২।৭, ৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং মুরলার পক্ষে বিচারসভায় ইহার উল্লেখের প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিতীয়তঃ, গঙ্গারামকে এইরূপ বিদ্রূপ করা মুরলার চরিত্রবিরুদ্ধ নহে, সুতরাং গঙ্গারামকে ভর্ৎসনাকালীন 'আড়াইটা বিবাহের ব্যঙ্গ' পরিবর্জ্জিত না হইলেও অশোভন হইত না। কিন্তু মুরলা যতই মুখরা ও বেপরোয়া হউক, বিচারসভায় সীতারামের সম্মুখে তাহার পক্ষে এরূপ ব্যঙ্গের উল্লেখ স্বাভাবিক নহে।

১৮। পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

ইহা গঙ্গারামের বিচারকালে মুরলার 'আড়াইটা বিবাহের ব্যঙ্গে'র উল্লেখের জের। সুতরাং এই ব্যঙ্গ (এবং বিচারকালে ইহার উল্লেখ) পরিবর্জ্জিত হওয়ায় ইহাও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট খ

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান

দুর্গেশনন্দিনী

'দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিক উপাদান ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাংলার ইতিহাস হইতে গৃহীত। এই গ্রন্থে মানসিংহের উড়িষ্যা অভিযানের বিবরণ এইরূপ :

In the year 998, the Raja [Raja Man Singh] planned an expedition for the recovery of Orissa out of the hands of the Afghans. Having assembled the troops of Behar, at Bhagalpur, he marched through the western hills to Burdwan; but, previous to his setting out, he had ordered Sayid Khan to march with the troops of Bengal by the route of Cutwa, and to form a junction with him at Burdwan. Upon his arrival at this place, he received an apology from his deputy, stating that he had experienced so much difficulty and delay in equipping his army, he was afraid the rainy season would set in before anything could be effected against the Afghans; and therefore strongly advised the Raja to canton his army till the conclusion of the rains, when he would immediately join him. The Raja was much disappointed at this intelligence; but seeing no remedy, he directed cantonments to be built for the army at Jehanabad, on the banks of the Dalkisor river, not many miles from the present Calcutta.

Whilst the royal army was in this situation, waiting the junction of the deputy governor of Bengal, Cuttulu Khan ordered a division of his troops to advance to Dherpore, which was within fifty miles of Jehanabad, and to plunder the country in that vicinity. To put a stop to the ravages of the Afghans, the Raja detached his son, Juggut Sing, who compelled them to retire, and to take refuge under the guns of a fort; a number of which had been constructed in different parts of that country. At this place they pretended to enter into a negotiation, whilst they were in daily expectation of a reinforcement from Cuttulu Khan The young Raja was deceived by their artifices; and as soon as the additional force arrived, the Afghans made an attack upon him by night, surprised his camp, took him prisoner,

killed a great number of his people, and compelled the remainder to seek their safety in flight. This victory raised the spirits of the Afghans to the highest pitch of exultation; whilst the Raja was overwhelmed with confusion at the disgrace, and with sorrow on account of his son, who was carried prisoner to Bissuntpore, and, according to report which prevailed for some days, had been put to death.

Fortunately for the royal cause, Cuttulu Khan, who had been for some time much indisposed, died a few days after this event; and as his children were not arrived at the age of manhood, the Afghan chiefs released the son of the Raja, and through him, sued for peace. As the rainy season was not yet terminated, and the Raja found himself unable to undertake any active measures, he readily listened to their proposals· in consequence of which the sons of Cuttulu Khan, attended by Khuaje Issa, their minister, visited the Raja, and presented him with one hundred and fifty elephants, and many other costly articles. They then agreed, if allowed to retain quiet possession of Orissa, to stamp the coin in the name of the emperor, and to prefix his name to all public edicts: further, in compliment to the Raja, they agreed to give up to him the temple of Jagarnaut and its domain, held sacred by all Hindoos.

Stewart's History of Bengal
(Edited by Fred. J. Mouat) pp. 115-16

'দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিক ভিত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য্য যদুনাথ এই কাহিনীর সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন : 'এখানে অসংখ্য ভুল আছে।' তিনি লিখিয়াছেন, 'জগৎসিংহের এই যুদ্ধ ['আকবরের সমসাময়িক পারসিক ইতিহাসগুলি'র মধ্যে] একমাত্র আকবরনামায় (৩য় ভল্যুমে) আছে।' কিন্তু বঙ্কিমের সময় পর্য্যন্ত এই সকল গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার পক্ষে 'মানসিংহের বঙ্গ-বিজয়ের নির্ভুল সংবাদ' জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। বাঙ্গালী পাঠকের জন্য আচার্য্য যদুনাথ 'আকবরনামা'র প্রয়োজনীয় অংশ বাংলাভাষায় এইরূপ পরিবেশন করিয়াছেন :

৯৯৮ হিজরী সনে [বাঙ্গলা ৯৯৭ সালে] রাজা মানসিংহ বিহার প্রদেশের বিদ্রোহীদিগকে পূর্ব্ববৎসর দমন করিবার পর ঝাড়খণ্ডের পথে উড়িষ্যা জয় করিবার জন্য রওনা হইলেন।......ভাগলপুর ও বর্দ্ধমান হইয়া জেহানাবাদে পেঁৗছিয়া তথায় শিবির স্থাপন করিলেন, বর্ষাশেষে জমিদারগণ সৈন্য লইয়া

তাঁহার সঙ্গে যোগ দিবে, এই প্রতীক্ষায়। কৎলু যুদ্ধাভিলাষে উড়িষ্যা হইতে ধরপুর আসিলেন। এই স্থানটি মানসিংহের শিবির হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে। সেখান হইতে কৎলু নিজ সেনাপতি বাহাদুর কুরুংকে প্রকাণ্ড সৈন্যদলসহ রায়পুরে পাঠাইলেন। রাজা কুমার জগৎসিংহের অধীনে এক ফৌজ তাহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন, এবং বাহাদুর একটি দুর্গে আশ্রয় লইয়া কুমারকে ভুলাইতে আরম্ভ করিল। বাহাদুর শয়তানি চালাকির দ্বারা এই অনভিজ্ঞ যুবক কুমারকে অসাবধান করিয়া ফেলিল। এবং তাহার পর কৎলুর নিকট আরও সৈন্য সাহায্য চাহিল। ২১এ মে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন জগৎসিংহ মদের নেশায় ঘুমাইয়াছিলেন, তখন কৎলুর অগণিত সৈন্য তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিল এবং পরাস্ত করিয়া দিল।......জমিদার হামির জগৎসিংহকে কত বলিয়াছিলেন যে, বাহাদুর প্রতারক এবং তাহার বলবৃদ্ধির জন্য আরও পাঠান সৈন্য আসিতেছে, কিন্তু কুমার তাঁহার কথা শুনিলেন না।......জগৎসিংহ আরও অসতর্ক হইয়া রহিলেন। দিনশেষে শত্রুরা আসিয়া [কুমারের শিবিরে] পৌঁছিল, পরামর্শ ও বন্দোবস্তের সূত্র ছিন্ন হওয়ায় অধিকাংশ বাদশাহী সৈন্য যুদ্ধ না করিয়াই পালাইল। অল্প ক'জন বীর খাড়া থাকিয়া যুদ্ধ করিল;

...হামির ঐ প্রমত্ত যুবক জগৎসিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ রাজধানী বিষ্ণুপুরে আনিলেন। একটি গুজব রটিল যে, কুমার মারা গিয়াছেন। ...

এই সময় শাহানশাহের ভাগ্য ফলিল। দশ দিন পরে কৎলু মারা গেল; তাহার রোগ হইয়াছিল এবং শীঘ্রই জীবন শেষ হইল। খাজা ইসা [কৎলুর দেওয়ান, এবং উসমানের পিতা]......সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহী সৈন্যরা অতিবৃষ্টি এবং মনঃপীড়াতে অভিভূত ছিল, এজন্য সন্ধি করিতে সম্মত হইল। আফঘানেরা বাদশাহকে অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করিল, এবং আকবরের নামে খুৎবা পড়িতে ও মুদ্রা অঙ্কিত করিতে এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও তাহার চতুর্দিকের জমি বাদশাহী সরকারকে দিতে প্রতিশ্রুত হইল। ১৫ই আগষ্ট খাজা ইসা কৎলুর পুত্র (জ্যেষ্ঠ পুত্র নসীর্) কে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং ১৫০টি হস্তী এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপহার দিল। তাহার পর মানসিংহ বিহারে ফিরিলেন।

দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫০ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (১৩৫০), ৫৯-৬০ পৃঃ।

উপরোদ্ধৃত কাহিনী হইতে জানা যায় যে, জগৎসিংহ কৎলু খাঁর সেনাদলের হস্তে পরাজিত হইলেও বন্দী হন নাই। বলা বাহুল্য জগৎসিংহের

বন্দী হওয়ার কাহিনী ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস হইতে গৃহীত হইলেও উপন্যাসে ইহার পশ্চাতে যে প্রণয় কাহিনী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত।

ঐতিহাসিক জগৎসিংহের চরিত্র ও তাঁহার জীবনের পরিণতি

জগৎসিংহ মদ্যপ ছিলেন এবং 'অতিশয় মদ খাওয়ার ফলে ৬ অক্টোবর ১৫৯৯ খ্রীঃ আগ্রার নিকটে অকালমৃত্যু বরণ করেন।' ঐ, ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মৃণালিনী

'মৃণালিনী'র ঐতিহাসিক উপাদান বখ্‌তিয়ার কর্তৃক গৌড়-বিজয়ের কাহিনী। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে এই কাহিনীর বর্ণনা এইরূপ :

In the 599th year of the Hejira, the Mohammedans having conquered the province of Behar, and extended their ravages to the borders of Bengal, the Brahmans and astrologers waited on the Raja [i.e. Raja Luchmunyah], and represented that their ancient books contained a prophecy that the kingdom of Bengal should be subdued by the Toorks ; that they were convinced the appointed time was now arrived; and advised him to remove his wealth, family and seat of government [then at Nubdeah], to a more secure and distant part of the country, where they might be safe from sudden incursion of their enemies.

The Raja, on hearing this representation, asked the Brahmans if their books gave any description of the person who was to be the conqueror of his dominions. They replied in the affirmative, and that the description exactly corresponded with the person of the Mohammedan General then in Behar [Mohammed Bukhtyar Khulijy].

The Raja, being far advanced in years, and partial to his capital, would not listen to their advice, and took no measures to avoid the danger......

In the year 600, Mohammed Bukhtyar Khulijy, having acquired sufficient information of the unguarded state of Bengal, secretly assembled his troops; and marching from Behar, proceeded with such expedition toward Nuddeah, that his approach was not even suspected.

On his arrival in the vicinity of the city, he concealed his

troops in a wood, and, accompanied by only seventeen horsemen, entered the city. On passing the guards, he informed them that he was an envoy, going to pay his respects to their master.

He was permitted to approach the palace; and having passed through the gates, he and his party drew their swords, and commenced a slaughter of the royal attendants.

The Raja Luchmunyah, who was then seated at dinner, alarmed by the cries of his people, made his escape from the palace by a private door, and, getting on board a small boat, rowed with the utmost expedition down the river.

The remainder of the Mohammadan troops now advanced, and, having slaughtered a number of the Hindoos, took possession of the city and palace.

Stewart's History of Bengal (Edited by F. J. Mouat), p. 27.

ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার কাহিনী আবু ওমার মিন্‌হাজউদ্দিন প্রণীত 'তাবাকৎ-ই-নাসিরি' নামক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কাহিনী যে অতিরঞ্জিত আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকগণ সে সম্বন্ধে একমত। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মন্তব্য এইরূপ : 'মোটের উপর মিনহাজুদ্দিনের উক্তি হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন যখন নদীয়ায় বাস করিতেছিলেন তখন বখতিয়ার খিলজী তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া বিহার হইতে দ্রুত-গতিতে অপ্রত্যাশিত পথে আসিয়া অতর্কিতে ঐ নগরী আক্রমণ করেন, এবং রাজাকে না পাইয়া ঐ নগরী লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন।...

...নদীয়া কিছুদিন বখতিয়ারের অধীনে থাকিলেও ইহা যে আবার সেন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত।'

বাংলা দেশের ইতিহাস, ৯৬-৯৭ পৃঃ।

নবদ্বীপ তথা বাংলার এক বিস্তৃত অংশ জয়ের গৌরব প্রকৃতপক্ষে বখ্‌তিয়ারের প্রাপ্য নহে; এ গৌরব তাঁহার পুত্র ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মহম্মদের প্রাপ্য। এ সম্বন্ধে মজুমদার-রায়চৌধুরী-দত্ত লিখিয়াছেন : 'Rai Lakhmaniya, usually identified with Lakshmana Sena, had to flee before the advancing arms of Malik Ikhtiyar-ud-din Muhammad Khalji towards the close of the twelfth or early in the thirteenth century.'

An Advanced History of India (Second Edition) Book 1, Part I, Chapter XIII, p. 188.

অন্যত্র, 'Meanwhile, Bihar and a part of Western Bengal had been added to the empire of Ghur by Ikhtiiyar-ud-din Muhammad, son of Bakhtiyar Khalji, who had driven Lakshamana Sena from Nadia probably to Eastern Bengal, to a place near Dacca, where the Sena power survived for more than half a century.'

Ibid, Part II, Chapter I pp. 279-80.

চন্দ্রশেখর

'চন্দ্রশেখরে'র ঐতিহাসিক পটভূমিকা ইংরেজের সহিত মীরকাসেমের বিরোধ এবং এই উপন্যাসে বঙ্কিম 'কোথাও কোথাও' সয়ের মুতাক্ষরীণের অনুবর্তী হইয়াছেন উপন্যাসের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :

মীরকাসেম যে জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করিতেন সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী

A son being born to him [i.e. Mir-Cassem-qhan] a little before this sudden elevation [i.e. to 'the mesned of command and sovereignty' with high-sounding 'titles and surnames'], he looked upon his birth as presaging certain success to his enterprise: and as he understood a little astrology, and believed in its maxims and predictions, he procured the child's horoscope to be accurately drawn by several able astrologers; and on their predictions he expressed his hope, that he would one day rise to the highest dignities.

Syed Gholam Hossein Khan's Seir Mutaqherin.
(Translated by M. Raymond under the pseudonym: Nota-Manus. Reprinted by D. C. Kerr.) Vol. II, Sec. X, p. 387.

মুঙ্গের হইতে উদয়নালাযাত্রার প্রাক্কালে অপর এক দৃষ্টান্ত

He [Mir-Cassem-qhan] then fixed a favourable day for his setting out; and quitting the castle of Monghyr, he sent his spare tents forwards, encamped in the neighbourhood, and gave orders for assembling troops: and as he was conversant in astrology, he had taken care to find out the favourable moment for commencing his march.

Ibid. p. 492.

মীরকাসেম নিজেই যে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করিতেন, এই উভয় কাহিনীতেই তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং উপন্যাসে মীরকাসেম কর্ত্তৃক দলনীর অদৃষ্টগণনা বঙ্কিমের অসম্ভব কল্পনা নহে।

গুরগণ খাঁর প্রথম জীবন

.. a cloth-seller by the yard, as was Gurghin-qhan.

Seir Mutaqherin Vol II, Sec X, p. 422.

মীরকাসেমের দরবারে গুরগণ খাঁর দায়িত্বপূর্ণ পদ

...an Armenian called Qhadja-gurghin, brother to Qhadja-bedross...was put at the head of the artillery, with orders to new-model it after the European fashion; and likewise to discipline the musqueteers in his [Mir-Cassem-qhan's] service after the English manner....To raise his character, he was henceforward called Gurghin-qhan, and distinguished by many favours, and he soon became a principal man in the Navvab's service.

Ibid. Vol II, Sec. X, p. 398

গুরগণ খাঁর চরিত্র

Gurghin-qhan......was both extremely imprudent, and extremely proud, and detested in his heart every man of birth or understanding.

Ibid. p. 455

মীরকাসেমের উপর তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি

Gurghin-qhan, the Armenian...was the principal General of his troops, and the trusty confidant of his heart; nay, the Navvab seemed to have sold himself to him totally.

Ibid. p. 421

গুরগণ খাঁর প্রতিপত্তিতে অপরাপর পদস্থ কর্ম্মচারীর অসন্তোষ

এই অসন্তোষ কি রূপ ধারণ করিয়াছিল মীরকাসেমের নিকট লিখিত আলি ইব্রাহিম খাঁর একখানি পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রের ইংরেজী অনুবাদের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

Since the advices and counsels offered by your well-wishers, and which your mind approves, never fail in the evening to be obliterated by Gurghin-qhan's suggestions, it is needless that either your Highness, or your friends and well-wishers, should

fatigue themselves any more upon an infructuous subject; for in the end, we shall find nothing is done, but what has been advised by Gurghin-qhan......Let us all do as he shall bid;... it is but what happens every day.

Ibid. p. 464

গুর্‌গুণ খাঁর উপদেশে মুঙ্গেরে ইংরেজের অস্ত্রের নৌকা আটক; ইহাতে আলি ইব্রাহিম খাঁর আপত্তি। হে সাহেবকে প্রতিভূ রাখিয়া নবাবের অনুমতিক্রমে আমিয়টের মুঙ্গের ত্যাগ

...a boat from Calcutta came to touch at Monghyr. She proved to be laden with a quantity of goods, under which were found five hundred fire-locks, destined for the factory of Azimabad. These Gurghin-qhan wanted to stop, whilst Mr. Amyatt insisted upon the boat's being dismissed without being stopped or even searched; and to that forbearance the Court would not listen. Aaly-hibrahim-Qhan objected to the boat's being stopped or visited at all; he contended, "That if peace was in contemplation, there was no colour for stopping the boat, and if hostilities were in view, then he saw no great harm in adding five hundred more musquets to the two thousand already in the English factory: For if we can fight against two thousand," said he, "I dare say, we can as well fight against two thousand five hundred." ......The Navvab...desired Radja Nobet-ray and Aaly-hibrahim-qhan to go and bring Gurghin-qhan to Court, as he intended to consult him on this subject. The two Lords accepted the commission and departed. Gurghin-qhan, on hearing their errand...explained his thought by this comparison or allegory: "*The Navvab and the English,*" said he, "*stand now in this manner: that is, they are upon a par and an equality, and on the same level*; *but if he does not stand firm, and chooses to lower his tone a little,......the other hand will remain where it is*; *and of course, higher. If, on the contrary, his hand remains where it is, the English hand must fall lower, and the Navvab will remain with a superiority on his side....*" The envoys returned to the Navvab with this answer,...this opinion of the General's having put an end to all thoughts about pacifications, nothing was thought of now but a rupture and open hostilities. So that Mr. Amyatt finding it useless to make any further stay, resolved to return, and he took his leave. The Navvab at first wanted to

keep everyone of the English, as hostages; at last, after a deal of parley, he consented to dismiss them all, under condition that Mr. Hay should be detained at Monghyr, until Mirza-mahmed-aaly and some other of the Navvab's officers confined at Calcutta, should be released, and upon their way to Monghyr; at which time he would release Mr. Hay. The latter having consented......Mr. Amyatt and the others obtained leave and went down the river in their boats.

Seir Mutaqherin, Vol. II, Sec. X
pp. 465-66

এই কাহিনী মীরকাসেমের উপর গুর্‌গণ খাঁর প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন। বঙ্কিম উপন্যাসের প্রয়োজনে এই কাহিনীর যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা লক্ষণীয়। (৩।৩)।

মুর্শিদাবাদে নবাবের ফৌজের আক্রমণে আমিয়ট ও তাঁহার সহচরবর্গের মৃত্যু

It was noon-day when he [Mir-Cassem-qhan] had received intelligence of the English having seized the city of Azim-abad, and expelled Mehdy-qhan; and such an intelligence had nearly killed him; when lo! about twelve hours after, in the middle of the night, another letter came, that mentioned how the Governor, having met by the re-inforcement intended for his garrison, had put himself at the head of those troops, and had recovered the city with a great slaughter of the English. This sudden intelligence revived the Navvab's spirits. ......The Navvab...... wrote circular letters throughout his dominions, by which he informed his officers of this event, and gave them notice of the rupture between him and the English,...commanding them... to put those perfides to the sword wherever they should find them. It is uncertain whether he may have comprised in this order Mr. Amyatt himself, with all those of his retinue; or whether those that killed that ill-fated man, availed themselves of the general order, arrived at Moorshood-abad. This much is certain that he was surrounded by Mahmed-taky-qhan's people, and by those of Sheh-savar-beg, who hacked him to pieces, with all the other English on board, although he made entreaties for his being sent alive to their master. But those impudent wretches proved deaf to his prayers, and cutting his

head off, they sent it to the Navvab. This event happened on a Thursday, the 18th of Zilhidj, in the year 1176 of the Hejira.

Seir Mutaqherin, Vol. II, Sec. XI, pp. 475-76

এই কাহিনীতে দেখা যায় নবাব যে সাধারণ আদেশপত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহার বলে আমিয়ট এবং তাঁহার সহচরবর্গকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে, তবে এই আদেশপত্রে আমিয়ট ও তাঁহার সহচরবর্গের উল্লেখ ছিল কিনা সে সম্বন্ধে লেখক নিঃসন্দেহ নহেন।

এই কাহিনী সম্পর্কে পাদটীকায় অনুবাদকের মন্তব্য এইরূপ :

What to think of this narrative of our author's, but that he was then far from the scene of action, or possibly wrote this narrative some years later? The Navvab's order being to send Amyatt with his retinue to Monghyr, Mohmed-taky-qhan betook himself to the following expedient, to execute the commission with ease, and without tumult: Being then encamped on the Bagraty, between Moorshood-abad and Cassimbazar, as soon as the boats were descried, he sent his friend and steward, Aga-aaly-toork, to invite Amyatt to an entertainment. Amyatt excused himself, and continued pushing in the middle of the stream. Another message was sent by a person of still greater consequence, who represented, that the entertainment being ready, the General would think himself aggrieved by the disappointment. Amyatt, having again excused himself, the envoy returned; and, on his landing, the boat-men were hailed from shore, and *ordered* to bring to. This order was answered by two musket-balls, and then by a volley, which being answered from shore, the boats were immediately boarded, and such a scene of slaughter ensued as is hardly to be described; as (sic) Amyatt, by his eternal instigations, as well as by his very haughty temper, was reputed the author of the rupture. All these particulars I know from the report then general; from Aga-aaly, who has been my friend and neighbour, for full sixteen years; from the Secretary and servants of the General's; and lastly, from three women from amongst the five sets of dancing girls, that had been assembled on the occasion.

Seir Mutaqherin, Vol. II, Sec. XI, Foot Note on p. 476

বঙ্কিম কিছুটা পরিবর্তিত রূপে এই শেষোক্ত কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। (৩।৩ ও ৫।১ দ্রষ্টব্য)।

সন্দেহপ্রযুক্ত শেঠভ্রাতৃদ্বয়কে মুঙ্গেরে নজরবন্দী রাখা

চন্দ্রশেখর ৫।৩

He [Mir-Cassem-qhan] remembered that they [i.e., the two Djagat-seats] had been deeply concerned, both by their money and influence, in transferring the supreme power from Seradj-ed-doullah to Mir-djaafer-qhan, and lately from Mir-djaafer-qhan to himself; and, being a great connoisseur in men's tempers, as well as an inquirer into their characters, he dreaded the consequences of two such men's remaining at Moorshood-abad, and so near Calcutta, at a time when his disputes with the English ran higher and higher, and his difficulties with them were increasing daily upon his hands. He therefore......wrote to Mahmed-taky-qhan, the Coozza-calanian, who commanded in Birbohom......requiring him to repair in all speed to Moor-shood-abad, where he was to surround the house of the Djagat-seats, in such a manner, as that not a man might come out, and then to wait until Marcar, the Armenian, might arrive and bring him a letter; on the perusal of which, he was to deliver the two Seats in his hands......After writing the above order, he dispatched Marcar,.........and putting three or four regiments of Talingas under his command, he ordered him to repair by water to Moor-shood-abad, where he was to receive from Mahmed-taky-qhan the two Djagat-seats, and to bring them in all speed to Monghyr, but without departing from a proper regard and attention to their persons and ranks. Mahmed-taky-qhan, on receipt of the order, repaired in all speed to Moorshood-abad, where he closely surrounded the house of the two Djagat-seats...The two brothers, finding themselves reduced to the single party of submission, prepared for their voyage. In three days more, Marcar, the Armenian, joined with his Talingas, and the two brothers being delivered up to him, were carried to Monghyr.

Seir Mutaqherin, Vol. II, Sec. X, pp. 456-57

কাটোয়ার যুদ্ধে তকি খাঁর মৃত্যু

The moment was becoming critical, when a ball of cannon wounded Mahmed-taky-qhan in the foot, and killed his horse,

which fell sprawling on the ground. The General, without betraying any anguish, mounted another, and continued to advance, and to exhort his men; and he was now very near the ranks of the English, who, on their side advanced; but it was with this advantage over him, that in compliance with their rules of discipline, they advanced firing. At this moment a musket-ball entering at his shoulder, came out on the opposite side. That brave man, without betraying any emotion, assembled the hem of his garment, and throwing it over his shoulder, to conceal his wound from his men, he still advanced. The English were on the point of retreating; but they had placed an ambuscade at the bottom of a little river, which was full on his passage; and the General being arrived there, was looking out for a passage to come to hand-blows with them, when the ambuscade-men rising at once, made a sudden discharge full in his face, overthrew numbers of his followers, and lodging a bullet in his forehead, that incomparable hero, who was the main prop of Mir-cassem-qhan's fortune, hastened into eternity in the middle of his slaughtered soldiers.

Seir Mutaqherin, Vol. II, Sec. XI, pp. 484-85

পাদটীকায় অনুবাদক লিখিয়াছেন:

On the first wound he received through his shoulder, he cried out in anguish, *ya Aaly, O ! Aaly*. Aga-aaly, his steward and townsman, as well as our friend and neighbour, advised him to retreat and go back. *Go back*, answered he, *and after that, shew again this black beard to Mir-Cassem-qhan ? Never*, added he, stroking it at the same time, *never*. On receiving the second ball through his head, he screamed out *ya Aaly*, again, and fell down with these words in his mouth: *Had the others* [i.e., the three 'refractory commanders'] *obeyed......*

Ibid. Foot note on p. 485

ইহাই হইল তকি খাঁর জীবনের গৌরবময় অবসানের সত্যকার চিত্র।

ইংরেজের সহিত গুরগণ খাঁর গোপন ষড়যন্ত্র

গুরগণ খাঁর অধীনস্থ দুই তিন জন মোগল সৈনিক কর্তৃক তাঁহার হত্যার বর্ণনার পর এ সম্পর্কে পাদটীকায় অনুবাদকের মন্তব্য এইরূপ:

The causes [i.e., of the murder of Gurghin-qhan], which no one dared to mention, are a conspiracy, said to be brewing

by Gurghin-qhan, incited underhand by the English. His brother, Aga-Bedross, alias Codja petruss, then residing at Calcutta, and an acquaintance of Governor Vansittart's, as well as of Mr. Warren Hastings, had, on their joint request, wrote pressingly to his brother, to engage him by all the motives which religion and a regard for his own safety could suggest, to lay hold of the person of Mir-Cassem-qhan, or at least, to come himself to the English camp with his own troops and friends. But this negotiation having been somehow smelt by Mir-Cassem's head-spy, he came at one o'clock in the morning, ordered him to be waked, and laying hold of him by the arm, *What are you doing in your bed*, said he, *whilst your General, Gurghin-qhan, is actually selling you to the Frenghies ? He is of intelligence with those without, and possibly with those within, with your prisoners.* Such was then the general report at that time...As to the Moguls murmuring for their pay, as pretends our author, their plea must have been a fictitious one; for, the author himself says, that the army had been mustered and paid a week before. It is also certain that never was the least murmuring among the troops, as they were regularly paid......This much is certain that it was this rumour of a conspiracy that put Mir-Cassem on one hand upon despatching his General, and, on the other, upon ridding himself of his prisoners of all sorts......

Seir Mutaqherin, Vol. II, Sec. XI,
Foot Note on p. 502

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় মহাশয় আরও তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইংরেজের সহিত গুর্‌গণ খাঁর গোপন ষড়যন্ত্র ঐতিহাসিক সত্য।

মীর কাসিম, ১৭৮-৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রাজসিংহ

রূপনগরের রাজকুমারীর কাহিনী

The Mogul [Arungzeb] demanded the hand of the princess of Roopnagarh, a junior branch of the Marwar house and sent with the demand (a compliance with which was contemplated

as certain) a *cortege* of two thousand horse to escort the fair to court. But the haughty Rajpootni, either indignant at such precipitation or charmed with the gallantry of the Rana [Raj Sing]......rejected with disdain the proffered alliance, and, justified by brilliant precedents in the romantic history of her nation, she entrusted her cause to the arm of the chief of the Rajpoot race, offering herself as the reward of protection. The family priest (her preceptor) deemed his office honoured by being the messenger of her wishes, and the billet he conveyed is incorporated in the memorial of this reign. "Is the swan to be the mate of the stork: a Rajpootni, pure in blood, to be wife of the monkey-faced barbarian !" concluding with a threat of self-destruction if not saved from dishonour. This appeal, with other powerful motives, was seized on with avidity by the Rana as a pretext to throw away the scabbard, in order to illustrate the opening of a war-fare, in which he determined to put all to the hazard in defence of his country and faith. The issue was an omen of success to his war-like and superstitious vassalage. With a chosen band he rapidly passed the foot of the Aravali and appeared before Roopnagarh, cut up the imperial guards, and bore off the prize to his capital.

The Annals and Antiquities of Rajasthan
James Tod—Published by S. K. Lahiri & Co., 1894, Vol. I,
pp. 351-52

ইহাই উপন্যাসে বর্ণিত বাদশাহের ফৌজের সহিত রাজসিংহের প্রথম সঙ্ঘর্ষের ঐতিহাসিক উপকরণ। জেব-উন্নিসা ও উদিপুরীর সহিত ইহার সম্পর্ক বঙ্কিমের কল্পনা প্রসূত। মবারক, দরিয়া, মাণিকলাল ও নির্ম্মলকুমারী বঙ্কিমের কল্পনার সৃষ্টি।

বলা বাহুল্য চঞ্চলকুমারীর পত্রে, 'রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বকসহচরী হইব?'—তাঁহার এই উক্তি টডের 'Is the swan to be the mate of the stork ?' —এই বাক্যের প্রতিধ্বনি।

আচার্য্য যদুনাথ বলেন, উপন্যাসে রূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চল আসলে কিষণগড়ের রাজকুমারী চারুমতী। ঔরঙ্গজেব চারুমতীকে দাবী করিলে 'মানিনী চারুমতী কুলপুরোহিতের হাত দিয়া মহারাণা রাজসিংহের নিকট নিজ বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন।' এবং মহারাণাও 'কিষণগড়ে গিয়া চারুমতীর পাণিগ্রহণ করিলেন।' কিন্তু এই সময় ঔরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার

কোন সম্বর্ষ হয় নাই। বিস্তারিত বিবরণের জন্য বঙ্কিম শত-বার্ষিক সংস্করণে আচার্য্য যদুনাথ লিখিত ভূমিকা ।৶৹ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মেবার যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের রন্ধ্রমধ্যে আবদ্ধ হওয়ার কাহিনী—উদিপুরী বন্দিনী—ঔরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী আচরণ

In the meantime Aurenzebe was carrying on the war against the Ranah of Chitore and the Rajah of Marwar, who on the approach of his army at the end of the preceding year, 1678, had abandoned the accessible country, and drew their herds and inhabitants into the vallies, within the mountains; the army advanced amongst the defiles, with incredible labour, and with so little intelligence, that the division which moved with Aurenzebe himself was unexpectedly stopped by insuperable defences and precipices in front; whilst the Rajpoots in one night closed the streights in his rear, by felling the overhanging trees; and from their stations above, prevented all endeavours of the troops either within or without, from removing the obstacle. Udeperri, the favourite and Circassian wife of Aurenzebe accompanied him in this arduous war, and with her retinue and escort was enclosed in another part of the mountains; her conductors, dreading to expose her person to danger or public view, surrendered. She was carried to the Ranah, who received her with homage, and every attention. Meanwhile the emperor himself might have perished by famine, of which the Ranah let him see the risque, by a confinement of two days: when he ordered the Rajpoots to withdraw from their stations, and suffer the way to be cleared. As soon as Aurenzebe was out of danger, the Rana sent back his wife, accompanied by a chosen escort, who only requested in return, that he would refrain from destroying the sacred animals of their religion, which might still be left in the plains; but Aurenzebe, who believed in no virtue but self-interest, imputed the generosity and forbearance of the Ranah to the fear of future vengeance, and continued the war. Soon after, he was again well-nigh enclosed in the mountains. This second experience of difficulties beyond his age and constitution, and the arrival of his sons, Azim and Ackar, determined him not to expose himself any longer in the field; but to leave its

operations to their conduct, superintended by his own instructions from Azmir, to which city he retired.

Orme: Historical fragments of the Mogul Empire, pp. 85-86

'রাজসিংহে' বঙ্কিম অর্মের কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন, একথা তিনি উপন্যাসের 'বিজ্ঞাপনে' উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষীর গ্রন্থেও অনুরূপ বিবরণ রহিয়াছে। এই বিবরণের জন্য Storia do Mogor-এর উইলিয়ম আর্ভিনকৃত ইংরেজী অনুবাদ, দ্বিতীয় ভলুম, ২৩৬-৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আধুনিক ইতিহাস ঔরঙ্গজেবের রন্ধ্র মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার কাহিনী অবিশ্বাস করিয়াছে। আচার্য্য যদুনাথ তাঁহার History of Auranzib, Vol III, ৩৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগল-রাজপুতের বিরোধের আধুনিক তথ্যাদিপূর্ণ ইতিহাসের জন্য History of Auranzib Vol III, ৩২২-৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দিলীর খাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে গোপীনাথ রাঠোর ও বিক্রম সোলাঙ্কি (৮।১৫)

Another band of the Imperialists, under the celebrated Delhire Khan, who entered by the Daisoorie pass from Marwar......was allowed to advance unopposed, and when in the long intricate gorge was assailed by Bikram Solanki and Gopinath Rahtor...... and after a desperate conflict entirely destroyed.

The Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. I, p. 357

আচার্য্য যদুনাথ এই কাহিনীর সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন: Both the man and the place are improbable...Dilir Khan was serving in the Deccan from June 1676 till after March 1680, and could not have taken any part in the Rajput war before July 1680.

History of Auranzib, Vol. III, Appendix X, p. 380

অবশ্য উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন অবান্তর।

উদিপুরী

The contemporary Venetian traveller Manucci speaks of her as a Georgian slave-girl of Dara Shukoh's harem, who, on the downfall of her first master, became the concubine of his

victorious rival. She seems to have been a very young woman at the time, as she first became a mother in 1667, when Auranzib was verging on fifty. She retained her youth and influence over the Emperor till his death and was the darling of his old age. Under the spell of her beauty he pardoned the many faults of Kam Bakhsh and overlooked her freaks of drunkenness, which must have shocked so pious a Muslim.

Sarkar: History of Auranzib Vol. I, Chap. IV, p. 64

That Udipuri was a slave and no wedded wife is proved by Auranzib's own words. When her son Kam Bakhsh intrigued with the enemies at the siege of Jinji, Auranzib angrily remarked,—

'A slave-girl's son comes to no good,
Even though he may have been begotten by a king.'

Ibid, p. 64 F.N.

উদিপুরী সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবের দুর্ব্বলতার কাহিনী

The holiday in Kashmir [in 1663] gave rise to a ridiculous affair. Udepuri, a Georgian by race, who had been formerly a wife of Dara, became afterwards a much-beloved wife of Aurangzeb. She was in the habit of drinking spirits, and that more liberally than discretion allows; thus frequently she was intoxicated. The other wives and concubines were jealous that Aurangzeb was so fond of Udepuri. They waited until one day the queen was in liquor, then went all in a body to the presence of Aurangzeb. He was pleased at such a visit, chiefly because they came in great glee, and resorted on this occasion to those cajoling ways which never fail women when they mean to conquer their husbands' heart. After a little talk, they prayed him to call for the attendance of Queen Udepuri, so that the conversation might take a more elevated tone. He sent a message to his beloved asking her to come and enjoy the cheerful hour. The maid-servant replied that Udepuri was somewhat indisposed.

The answer caused the other ladies to laugh loudly, hoping to arouse the king's suspicions of something wrong. He therefore sent a second message that she should come only to show herself and please the other queens and ladies, who so desired. Once more the servants sent back word that being oppressed by headache she could not leave her apartments. This reply only made those jealous of her to laugh the more, and in this

way Aurangzeb in person went to see the patient. She was all in disorder, her hair flying loose and her head full of drink. Aurangzeb seated himself by her, and touched her with his hand. Thinking it was her servant-girl she asked (drunk though she was) for more. Aurangzeb was upset by the odour of spirits and by such a request. He came downcast out of her apartments, and, although he did not lose the love he had for her, he turned in a fury upon the door-keepers, who were bastinadoed for want of vigilance over the gates.

Manucci's Storia do Mogor, Vol. II,
(Translated by William Irvine) pp. 107-08

ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে সম্রাট সাজাহানের প্রতিনিধি সেই সময় জনৈকা নর্ত্তকীর প্রতি আসক্তির অনুরূপ একটি কাহিনী

Aurangzeb grew very fond of one of the dancing-women in his harem, and through the great love he bore to her he neglected for some time his prayers and his austerities, filling up his days with music and dances; and going even farther, he enlivened himself with wine, which he drank at the instance of the said dancing girl. The dancer died, and Aurangzeb made a vow never to drink wine again nor listen to music.

Ibid. Vol. I, p. 231

অনুরূপ দুর্ব্বলতার অপর এক কাহিনী

Hira Bai surnamed Zianabadi was a young slave-girl in the keeping of Mir Khalil, who had married a sister of Aurangzib's mother. During the viceroyalty of the Deccan the prince paid a visit to his aunt at Burhanpur. There, while strolling in the park of Zianabad on the other side of the Tapti, he beheld Hira Bai unveiled among his aunt's trains. The artful beauty "on seeing a mango-tree laden with fruits, advanced in mirth and amorous play, jumped up and plucked a mango, as if unconscious of the prince's presence." The vision of her matchless charms stormed Aurangzib's heart in a moment; "with shameless importunity he took her away from his aunt's house and became utterly infatuated with her." So much so, that one day she offered him a cup of wine and pressed him to drink it. All his entreaties and excuses were disregarded, and the helpless lover was about to taste the forbidden drink when the sly

enchantress snatched away the cup from his lips and said, "My object was only to test your love for me, and not to make you fall into the sin of drinking !"

Sarkar: History of Aurangzib Vol. I, Chap. IV, pp. 65-66

এই সময় ঔরঙ্গজেবের বয়স অন্ততঃ ৩৫ বৎসর।

ঐ, ৬৬ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ইহা লক্ষণীয় যে, ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে সম্রাট সাজাহানের প্রতিনিধি উপরোক্ত উভয় কাহিনীই সেই সময়ের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন লেখকের বর্ণনায় স্বভাবতঃই কিছুটা পার্থক্য থাকিলেও কাহিনী দুইটিতে কি একই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে ?

জেব-উন্নিসা

She seems to have inherited her father's keenness of intellect and literary tastes.......

Scandal connected her name with that of Aqilmana Khan, a noble of her father's court and a versifier of some repute in his own day.

Sarkar: History of Aurangzib Vol. I, Chap. IV, pp. 69-70

পিসী-ভাইঝির মদন-মন্দিরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

রাজসিংহ ২।২, ২৩ পৃঃ

বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'পিসী ভাইঝি উভয়ে অনেক স্থলেই মদন-মন্দিরে প্রতিযোগিনী হইয়া দাঁড়াইতেন। সুতরাং ভাইঝি পিসীকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পিসীর মহিমা তিনি পিতৃসমীপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, রোশনারা পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইলেন, জেব-উন্নিসা তাঁহার পদমর্য্যাদা ও তাঁহার পদানতগণকে পাইলেন।'

মনে হয় মানুষীর নিম্নলিখিত কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া বঙ্কিম উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া থাকিবেন :

She [Roshan Ara Begum] kept there [i.e., in her apartments] nine youths in secret for her diversion. The discoverer of this noble conduct was Fakhr-un-nissa Begum, the daughter of Aurangzeb. This lady, although not desirous of marriage, had no intention of being deprived of her satisfaction. Therefore she asked her aunt to make over to her at least one of the nine. Roshan Ara Begum declined the request in spite of her

niece's importunity. Moved by envy, the young girl revealed to her father what was hidden in the apartments of Roshan Ara Begum. By diligent search they caught the young men, who were well-clothed and good-looking. They were made over to the criminal authorities, being announced to the world as thieves; and following the orders he had received the Kotwal...... destroyed them in less than a month by various secret tortures. Already angered at the misconduct of his sister, Aurangzeb shortened her life by poison. Thus in spite of all she had done to get her brother made king, she experienced herself his cruelty, being swollen like a hogshead, and leaving behind her the name of great lasciviousness.

Storia do Mogor, Vol. II, pp. 189-90

বঙ্কিম মনে করেন ফকর-উন্নিসা ও জেব-উন্নিসা একই ব্যক্তি। তিনি লিখিয়াছেন, 'মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিসা বা জয়েব্-উন্নিসা নামে পরিচিত। পাদ্রি কক্রু বলেন, ইহার নাম ফকর-উন্নিসা।' (রাজসিংহ ২।২, ২৩ পৃঃ পাদটীকা)। 'রাজসিংহে'র আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রিঙ্গেল কেনেডি হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছি (২৯১ পৃঃ) তাহাতেও দেখিতে পাই, তিনি ঔরঙ্গজেবের কন্যাকে ফকর-উন্নিসা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জেব-উন্নিসা জ্যেষ্ঠা কন্যা এ বিষয়ে মতভেদ নাই। সুতরাং প্রিঙ্গেল কেনেডির মতেও ফকর-উন্নিসা জেব-উন্নিসার নামান্তর মাত্র। কিন্তু মানুষীব মতে ফকর-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের চতুর্থ কন্যা। তিনি লিখিয়াছেন, ঔরঙ্গজেব যখন কঠিন রোগাক্রান্ত সেই সময় তাঁহার চারি পুত্র ও চারি কন্যা ছিল। তাঁহাদের বিবরণ এইরূপ: 'The sons were Sultan Muhammad......and Sultan Mu'azzam...They were the sons of one mother, a Rajput by race [Nawab Bae]...She had a daughter called Zebetnixa Begam (Zeb-un-nissa Begam)...The other sons were Sultan A'zam and Sultan Akbar, who were the sons of another mother, a Persian by race...This queen had two daughters called Zinethnexa Begam (Zinat-un-nissa Begam)....and...Bederexa Begam (Badr-un-nissa Begam)....The fourth daughter's name was Facronexa Begam (Fakr-un-nissa Begam) who was the child of another particular wife.'

Storia do Mogor, Vol. II, pp. 57-58

উপরোক্ত বিবরণে তথ্যগত ভুল রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ পাদটীকায় অনুবাদক উইলিয়ম আর্ভিনের মন্তব্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি

লিখিয়াছেন : The mothei of Zeb-un-nissa, Zinat-un-nissa and of Akbar is styled simply 'Begam' and this may possibly mean Dilras Banu. (৫৭ পৃষ্ঠা, পাদটীকা)। কিন্তু মানুষীর মতে জেব-উন্নিসা ও ফকর-উন্নিসা একই ব্যক্তি নহেন, সুতরাং মানুষী হইতে উদ্ধৃতি জেব-উন্নিসা সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতের পোষকতা করে না, বর্ত্তমান আলোচনার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মানুষীর মতে জেব-উন্নিসা ও ফকর-উন্নিসা যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি আচার্য্য যদুনাথ তাহা 'রাজসিংহে'র (শতবার্ষিক সংস্করণ) তাঁহার নিজের লেখা ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মানুষী-বর্ণিত পিসী ভাইঝির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন তুলিয়াছেন। (History of Aurangzib, তৃতীয় ভলুম, ৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনায় এ প্রশ্ন অবান্তর।

শাহজাদা আকবরের বিদ্রোহে জেব-উন্নিসার ভূমিকা

Zeb-un-nissa was an ardent partisan of her younger brother Muhammad Akbar and held a secret correspondence with him on the eve of his rebellion.

Sarkar: History of Aurangzib Vol. III,
Chap. XXVII, p. 54.

সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও দারার হিন্দু পত্নী রাণাদিল

নির্ম্মলকুমারী সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে বলিতেছে, "জাঁহাপনা! আপনার বড় ভাই দারা শেকোকে বধ করিয়া তাহার দুইটা কবিলা কাড়িয়া আনিতে গিয়াছিলেন—পারিয়াছিলেন কি? অধম খ্রিষ্টিয়ানীটা আসিয়াছিল জানি, রাজপুতনী দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় নাই কি?" (৬।৫, ১২২ পৃঃ)। এ সম্বন্ধে মানুষীর বিবরণ এইরূপ :

Aurangzeb sent for the two second wives of Dara—that is to say, the inconstant Udepuri, a Georgian by race, and the faithful Ranadel (Ra'na-dil), a Hindu by birth. Udepuri obeyed ......But Ra'na-dil...sent to ask the king why he wanted to see her. They answered her that the king wished to take her to wife, since the law thus directed that the wives of a dead elder brother belonged to the living younger brother. On hearing this reply, she sent to inquire with what in her was he enamoured. The king sent word that he had an affection for her lovely

hair. Owing to this answer, she cut off her hair and sent it to Aurangzeb, saying that here was the beauty that he longed for....But Aurangzeb, who wanted to marry her, sent once more to say that her beauty was great, that he would count her as one of his wives. She might assume that he was that same Dara. Not one point should be omitted in the pre-eminence due to the queen, nor in her rights as sovereign lady, being as she was, wife of his brother.

But the brave Ra'na-dil went into her apartments, and taking a knife, slashed her face all over, and collecting the blood in a cloth, sent it to Aurangzeb, saying that if he sought the beauty of her face it was undone, and if her blood gratified him he was welcome. Encountering such resolution, Aurangzeb ceased his solicitations, yielding high esteem to her, and treating her with the courtesy deserved by her constancy.

Storia do Mogor Vol. I, p. 361

দেখা যাইতেছে দারাকে হত্যা করার পর তাঁহার হিন্দু স্ত্রীকে কামনা করিলেও প্রত্যাখ্যাত ঔরঙ্গজেব তাঁহার প্রতি সম্ভ্রমসূচক আচরণ করিয়াছেন এবং ঐ হিন্দু স্ত্রী ঔরঙ্গজেবকে এড়াইবার জন্য স্বেচ্ছায় দৈহিক ক্লেশ বরণ করিয়া লইলেও, আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, দারার ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন তাঁহার প্রথমা পত্নী নূরমহল। নির্ম্মলের শ্লেষাত্মক উক্তির মধ্যে এই উভয় কাহিনীকে একত্র জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপন্যাসে নির্ম্মলের প্রতি ঔরঙ্গজেবের সংযত আচরণ রাণাদিলের চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইবার পর তাঁহার প্রতি বাদশাহের আচরণের অনুরূপ।

মোগল বাদশাহদের রঙ্ মহালে বাদশাহজাদীদের জীবন

......they [the young Sultanesses] are bred up in all the luxury imaginable. As they are generally the Emperor their Father's chief Amusements, their greatest study is how to endear him. By this means, they sometimes obtain more liberty than is decent for Princesses, and the Rigours of the Cloister are often dispensed with in their Favour. The Indulgences of the *Mogols* in this point extends sometimes to a Connivance at their keeping Gallants; the Example of which soon corrupts the whole Seraglio.

Idleness together with a delicious way of living and reading wanton Books must needs be a Source of Vice in Cloisters where the power of true Religion restrains to no rules.

F. F. Catrou: The Geneial History of the Mogol Empire, p. 328

ইহা সাধারণভাবে মোগল বাদশাহদের রঙ্মহালের চিত্র হইলেও যেখানে উদিপুরীর সুরাসক্তি, জেব-উন্নিসার প্রণয় ও 'পিসী ভাইঝি'র মদন-মন্দিরে প্রতিযোগিতার কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে, সেখানে 'রাজসিংহে' ঔরঙ্গজেবের রঙ্মহালে 'ব্যভিচার, অনাচার, সরাবের সমারোহের এবং নর্ত্তক নর্ত্তকীর কলকোলাহলের' চিত্র কোনক্রমেই ঐতিহাসিক উপন্যাসে অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

আনন্দমঠ

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বঙ্কিম স্বয়ং 'আনন্দমঠে'র পরিশিষ্টে (Appendix I & II) গ্লীগের (Gleig) Memoirs of the Life of Warren Hastings এবং হাণ্টারের Annals of Rural Bengal হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং শতবার্ষিক সংস্করণে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে ইহার উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

পূর্ব্বাভাস: In the early part of 1769 high prices had ruled, owing to the partial failure of crops in 1768. ...In spite of the complaints and forebodings of local officers, the authorities at headquarters reported that the land-tax had been rigorously enforced; and the rains of 1769...seemed for a time to promise relief. ...The September harvest, indeed, was sufficient to enable the Bengal Council to promise grain to Madras on a large scale, notwithstanding the high prices. But in that month the periodical rains prematurely ceased, and the crop which depended on them for existence withered—'The fields of rice',

wrote the native superintendent of Bishenpore at a later period, 'are become like fields of dried straw.'

Hunter: The Annals of Rural Bengal
(4th Edition of 1781)
Vol. I, Chap. II, pp. 20-21

মন্বন্তর: All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their cattle; they sold their implements of agriculture; they devoured their seed-grain; they sold their sons and daughters, till at length no buyer of children could be found; they ate the leaves of trees and the grass of the field: and in June 1770 the Resident at the Durbar affirmed that the living were feeding on the dead. Day and night a torrent of famished and disease-stricken wretches poured into the great cities At an early period of the year pestilence had broken out. In March we find small pox at Moorshedabad, where it glided through the Viceregal mutes, and cut off the Prince Syfut in his palace. The streets were blocked up with promiscuous heaps of the dying and dead. Internment could not do its work quick enough; even the dogs and jackals, the public scavengers of the East, became unable to accomplish their revolting work, and the multitude of mangled and festering corpses at length threatened the existence of the citizens. Ibid, pp. 26-27

দেখা যাইতেছে বঙ্কিমের বর্ণনা যতই বিভীষিকাপূর্ণ হউক না কেন, ইহাতে কোথাও কোন অতিরঞ্জন নাই।

মন্বন্তরে মৃত্যুর হিসাব

The famine......,the mortality, the beggary, exceed all description. Above one-third of the inhabitants have perished in the once plentiful province of Purneah, and in other parts the misery is equal.

From a letter from the President and Council to the Court of Directors, dated 9th May 1770.

Quoted by Hunter in The Annals of Rural Bengal, Vol. I,
Appendix B, p. 401

বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে,—কত কোটী তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল।' (আনন্দমঠ ৩।১, ৭৭ পৃ:)। এই হিসাবে কোন অতিরঞ্জন নাই।

রাজস্ব আদায়ে রেজা খাঁর কর্ম্মকুশলতা: 'একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল।' আনন্দমঠ ১।১

It was common at that period to make temporary remissions and advances wherever a harvest proved deficient; but during 1769-70, although such indulgences were constantly proposed, they were not, except in a very few isolated instances, granted. ......In April a scanty spring harvest was gathered in; and the Council, acting upon the advice of his Mussulman Minister of Finance, added ten per cent to the land-tax for the ensuing year.

Hunter: The Annals of Rural Bengal, Vol. I, Chap. II, p. 23

এই Mussulman Minister of Finance-ই কুশলী রেজা খাঁ।

......notwithstanding the loss of at least one-third of the inhabitants of the Province, and the consequent decrease of the cultivation, the nett collections of the year 1771 exceeded even those of 1768...

From a letter of Warren Hastings to the Court of Directors. Dated Fort William, the 3rd November 1772.

Quoted by Hunter in The Annals of Rural Bengal, Vol. I, Appendix A, pp. 380-81

'যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন।' আনন্দমঠ ১।১

As there is the greatest probability that this distress will increase, and a certainty that it cannot be alleviated for six months to come, we have ordered a stock of grain sufficient to serve our army for that period, to be laid up in proper store-houses......

From a letter from the President and Council to the Court of Directors, dated 23rd November, 1769.

Quoted by Hunter in The Annals of Rural Bengal, Vol. I, Appendix B, p. 399

'মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্‌ লেখে।' আনন্দমঠ ১।৭

......the treaty of 1765 only entrusted the fiscal administration to the Company, leaving criminal justice and the police to the

Nawab.......Until 1790 the Nawab retained the style and the responsibilities of chief magistrate. He left the duties wholly unperformed. Between 1765 and 1769 he did not even pretend to do what he had promised: the regular course of justice was at a stand; 'but every man exercised it who had the power of compelling others to submit to his decision.'.....

The Company had no legal right to interfere. Its duty, so fixed by treaty was to collect the revenue; and the same authority that invested it with fiscal functions, had also appointed the Nawab to the criminal administration.

Hunter: The Annals of Rural Bengal,
Vol. I, Chap. V, pp. 328-29

সয়ের মুতাক্ষরীণে মীরজাফরের ভাঙের নেশার উল্লেখ রহিয়াছে: '...when once duly seasoned with his dose of bang, he [Mir-djaafar-qhan] was incapable of attending to business, specially after his meal.' Vol II, Sec. IX, p. 258

কিন্তু মনুন্তরের অরাজকতার সহিত মীরজাফরকে জড়িত করা ঐতিহাসিক ভুল, কারণ মনুন্তরের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হয়। মীরজাফরের মৃত্যুর বিবরণ এইরূপ:

After languishing several weeks at Calcutta, he [Meer Jaffier] returned to Moorshedabad, loaded with disease, and died in January, 1765.

The History of British India by James Mill (4th Edition)
Vol. III, Bk. IV, Chap. V, p. 356

'The Annals of Rural Bengal' হইতে উদ্ধৃতিতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের যে সন্ধির উল্লেখ রহিয়াছে, সেই সন্ধির চুক্তি সম্পাদিত হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং মীরজাফরের পুত্র, মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব নুজুমুদ্দৌলার সহিত। নুজুমুদ্দৌলা নবাবী করে কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল এবং তাহার পর মসনদে আরোহণ করে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়েফুদ্দৌলা:

The Nabob of Bengal, Nujum ud Dowla......expired on the 8th of May [1766]......His brother Syeff ud Dowla, a youth of sixteen was elevated to the nominal office.........

Ibid, Bk. IV, Chap. 7, p. 427

মনুন্তরের বৎসরই সৈয়েফুদ্দৌলার মৃত্যু হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্থলাভিষিক্ত হয় কনিষ্ঠ মুবারেকুদ্দৌলা:

On the 10th of March, 1770, the Nabob Syeff ud Dowla died of the small pox; and his brother Mubarek ud Dowla, a minor was appointed to occupy his station.

Ibid, Bk. IV, Chap. 9, pp. 486-87

দেবী চৌধুরাণী

ঐতিহাসিক ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর কাহিনী

Rangpur, as a frontier province bordering on Nepal, Bhutān, Kuch Behar, and Assam, was peculiarly liable to be infested by banditti, who ravaged the country in armed bands numbering several hundreds......The tract of country lying south of the stations of Dinajpur and Rangpur and west of the present district of Bogrā, towards the Ganges, was a favourite haunt of these banditti, being far removed from any central authority. In 1787, Lieutenant Brenan was employed in this quarter against a notorious leader of dakāits (gang robbers), named Bhawāni Pathak. He despatched a native officer, with twenty-four sepoys, in search of the robbers, who surprised Pathak, with sixty of his followers, in their boats. A fight took place, in which Pathak himself and three of his lieutenants were killed, and eight wounded, besides forty-two taken prisoners. Pathak was a native of Bajpur.. ....We catch a glimpse from the Lieutenant's report of a female dakāit, by name Debi Chaudhrāni, also in league with Pathak. She lived in boats, had a large force of barkandāzs in her pay, and committed dakāitis on her own account, besides receiving a share of the booty obtained by Pathak. Her title Debi Choudhrāni would imply that she was a zāmindār —probably a petty one, else she need not have lived in boats for fear of capture.

Hunter: A Statistical Account of Bengal,
Vol. VII, pp. 158-59

বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল

In 1789 we have an account of a large band of bandits who had occupied the Baikunthpur forest, which lies in the apex of

the District, right under the hills, whence they issued on their predatory excursions.

Hunter: A Statistical Account of Bengal, Vol. VII, p. 159

একই কাহিনী প্রায় একই ভাষায় J. A. Vas প্রণীত Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, Rangpur—এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ২৮-২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ইজারাদার দেবীসিংহ

Devi Sing was invested in farm for two years with the three provinces of Dinagepur, Edrackpore and Rungpore.........An officer, called a dewan, had been established in the provinces, expressly as a check on the person who should act as farmer-general. This office he [i.e., Hastings] conferred along with that of farmer-general on Debi Sing, in ordert that Debi might become an effectual check upon Sing......

......At his very entrance into office he forced from the zemindars or landed gentry an enormous increase of their tribute. They refused compliance. On this refusal he threw the whole body of zemindars into prison; and thus in bonds and fetters compelled them to sign their own ruin by an increase of rent which they knew they could never realize.

Having thus gotten them under, he added exaction to exaction, so that every day announced some new and varied demand; until exhausted by these oppressions they were brought to the extremity to which he meant to drive them, the sale of their lands.

......They were sold for less than one year's purchase,—at less than one year's purchase, at the most underrated value...... Such a sale on such terms strongly indicated the purchaser. And how did it turn out in fact ? The purchaser was the very agent and instrument of Mr. Hastings, Devi Sing himself.

The Speeches of Edmund Burke on the Impeachment of Warren Hastings, Vol. I, pp. 180-82 (Published by G. Bell & Sons Ltd.)

সীতারাম

'সীতারামের' বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লিখিয়াছেন : 'যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Westland সাহেবের কৃত

যশোহরের বৃত্তান্ত, এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিবেন।' কিন্তু সীতারামের ইতিহাস হিসাবে বর্ত্তমানের পাঠকের নিকট ষ্টুয়ার্টের কাহিনী একেবারেই মূল্যহীন এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ডের কাহিনী অসম্পূর্ণ। সীতারাম সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্যাদি পরিবেশন করিয়াছেন সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং তাঁহার 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর আচার্য্য যদুনাথের ভাষায়, 'পুরাতন তর্কবিতর্কের নিরসন হইয়াছে, এবং সীতারামের প্রকৃত বিবরণ সম্পূর্ণ ও বিস্তৃতভাবে জানা গিয়াছে।' কিন্তু বঙ্কিমের ক্ষেত্রে, মাগুরা অবস্থানকালে তিনি যে সকল কিংবদন্তী শুনিয়া থাকিবেন সেগুলি বাদ দিলে, উপন্যাস রচনাকালে ষ্টুয়ার্ট ও ওয়েষ্টল্যাণ্ডের কাহিনীই একমাত্র সম্বল ছিল। তিনি প্রথমোক্ত কাহিনী পুরাপুরি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহা হইলেও কুতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য উভয় কাহিনীই আংশিক উদ্ধৃত করিতেছি:

ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে বর্ণিত কাহিনী

......a person of an illustrious family, named Syed Aboo Turab, having, through the interest of one of the Viziers, obtained the office of Foujedar of Bhoosnah in Bengal, adjacent to which resided a refractory zemindar, named Sittaram, who kept in his pay a band of robbers, with whom he used to infest the roads and plunder the boats on the rivers, and even carry off the cattle from the villages, setting at defiance the power of the Foujedar;—to extirpate this public depradator, Aboo Turab applied for assistance to the Nuwab: but, instead of affording him the required aid, he was supposed, in an underhand manner, to countenance and encourage Sittaram.

At length the Foujedar, finding he had nothing to expect from the governor, took into his own pay an Afghan officer, named Peer Khan, with 200 of his followers, well-mounted and armed, and sent him to beat up the quarters of the depradator; but Sittaram, having intelligence of the circumstance, moved to another part of the country, where by chance he fell in with the Foujedar, who was amusing himself in hunting, and attended by a very small escort. The robbers immediately attacked the Foujedar and his party, and, before their chief came up, killed Aboo Turab. When Sittaram found that it was the Foujedar he had slain, he much regretted the circumstance, and told his followers that the Nuwab would certainly revenge the insult offered to his govern-

ment, by flaying them alive, and by desolating the pergunnah of Mahmoodabad; he then respectfully delivered the body to the Foujedar's attendants, who carried it to Bhoosnah, and interred it in the vicinity of that town.

When the Nuwab received intelligence of the murder of Aboo Turab, he was greatly alarmed, being apprehensive of having incurred the displeasure of the emperor by his neglect of so respectable a person; and who he knew had many friends about the court, who would not fail to represent the state of the case. He therefore appointed Bukhsh Aly Khan to succeed the deceased; and sent with him a considerable force, with instructions to seize Sittaram and all his party. Orders were also issued to all the neighbouring Zemindars, to assist in seizing the offender;......the zemindars raised their posse comitatus and hemmed the robbers in on every side, until Bukhsh Aly Khan arrived, who seized Sittaram, his women, children, and accomplices, and sent them in irons to Moorshudabad, where Sittaram and the robbers were impaled alive, and the women and children sold as slaves.

Stewart: History of Bengal
(Edited by Mouat) pp. 239-40

এই কাহিনীতে সীতারাম সাধারণ দস্যুসর্দ্দার মাত্র এবং আসলে তিনি ভীরুস্বভাব। ইহা ইতিহাস নহে, ইতিহাসের অমার্জ্জনীয় বিকৃতি।

ওয়েষ্টল্যাণ্ড বর্ণিত কাহিনীঃ

The zemindari of Bhusna came whether by hereditary descent or by some other means, into the hands of Raja Sitaram Ray. The zemindari he held for fourteen years, during which time he built Muhammadpur for his capital, and adorned it with many fine buildings and tanks.......Before his time Muhammadpur was not in existence, and its site was a mere rice plain, the capital being then probably Bhusna, on the other side of what is now the Madhumati, what was then only a small Khal, the Alangkhali. At the beginning of the century, Muhammadpur was one of the chief towns in the district; it was in fact only of late years, that is, since 1836, that it has fallen from its high estate.

Of the origin of Sitaram Ray more than one story is current. The first story I shall narrate runs thus:—

On the other side the present Madhumati River there is a village, Hariharnagar. In this village Sitaram had a taluq. He held also a jumma in another village, Shyamnagar, close to the present Muhammadpur. One day he was riding across from his village, Hariharnagar, to see the jumma, when his horse's feet so stuck in the mud that it could not be got out. So he made some men dig up the ground so as to extricate the horse's feet, and in so doing they came upon a trishul or Hindu trident. Digging still further, they found it was the pinnacle of a temple which they accordingly proceeded to dig up. Inside the temple they found the idol Lakshmi Narayn......

Lakshmi Narayn is the god of good fortune; and when Sitaram was, in the manner just described, proclaimed the favourite of the gods, he was not long in finding adherents. He was himself an uttar rāre Kayath (an upcountry Kayath by caste), and ever so many upcountrymen flocked to him. He either received them, or he previously had in his service a certain giant, a mighty son of valour, named Menahati, from his elephantine strength; and this Menahati was, or became, the leader of a troop of fighting men.

Sitaram, strengthened by this accession, now planted himself at the place where Lakshmi Narayn had appeared......With the aid of his little army he commenced a war of aggression upon the possessors of the Bhusna Zemindari, and having obtained the Zemindari, fortified himself in it, refused to pay rents to the nawab and lived in magnificence on the produce of his lands.

......I consider the above story a mere dilution of the original legend, which I am about to relate, and which is probably nothing more than an embellishment of the truth.

In this part of the country there were twelve provinces, and the rajahs of these twelve provinces were (as was much the custom in those days) rather remiss in sending to the emperor, or his nawab at Dacca the revenues assessed upon their lands. Sitaram was accordingly deputed by the emperor of Delhi to "investigate" the matter by force of army, and this duty he performed with such effect that he not only turned the twelves rajahs out of possession, but installed himself as lord of their domains. The nawab now demanded from Sitaram the revenues due upon his lands but Sitaram refused to acknowledge his authority. He held his land from the emperor above, and to the emperor alone would he pay his rents......

Of Sitaram's history after his acquisition of the zemindari the legend has only one form. The nawab being refused his revenues, levied war against Sitaram; but the latter, who had fortified himself in Muhammadpur, and gathered around him many soldiers and servants, chief of whom were Menahati,...... Bakhtyar Khan, Muchra Singh, and Ghabar Dalan, was able to hold his own against the nawab's men.

Then the nawab sent against him his son-in-law, Abu Tarab, and he had a battle with Sitaram's men; but again the redoubtable Menahati was victorious having slain Abu Tarab with his own hand.

So the nawab now sent a more formidable force under his great general Singharam Sha; and he came to Bhusna and established his camp there. Profiting by the experience of his predecessors, he resolved to get Menahati into his power first before making any attack. Watching for his opportunity he at last captured him as he was passing the dhol mandir in the morning. .. ...Another account says that, receiving information from a spy, he secretly crossed the river at night, and captured Menahati sleeping at the 'lion gate' which was......the entrance to Sitaram's citadel, and close to the dhol mandir.

Menahati who was thus caught unarmed was bound by his capturers, who kept him for seven day's, belabouring him with sticks and hacking him, with swords. Menahati kept continually about him a wondrous drug, which was bound under the skin in front of his right shoulder, and its virtue was such that though it could not prevent him from feeling the pain of the blows, it rendered his body impenetrable to stick and sword. Wearied, however, with the continual assaults . ....and willing rather to suffer death than a life with such pain, he at last confessed the secret of the drug. The influence of it could be got rid of by taking him to the bank of the Ram Sagar,......plucking it from his arm, and throwing it into the water of the tank. So they did, and so Menahati died.

... ...

When Sitaram heard of the capture and death of his faithful general, he knew that his time too was come. He accordingly went and surrendered himself, or, more likely, was carried captive, to the nawab of Dacca, who locked him up in prison. He lingered there for a little time, but at last, when an officer of the

nawab came to him and told him that there was no hope, and he was sure to be hanged, he sucked poison from a ring which Hannibal-like, he kept against such emergencies, and so he died. The nawab sent for Sitaram to his darbar, but found that he had placed himself beyond his power.

There is some confusion here between the nawab at Dacca and the nawab at Moorshidabad. It is however excusable, seeing that these events occurred at the very latest, about 1712 or 1714 A.D. less than ten years after the transfer of the nawab's capital from Dacca to Moorshidabad.

J. Westland: A Report of the District of Jessore.
pp. 25-28

এই কাহিনীর সহিত উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীর নিম্নলিখিত সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয় ঃ

১। শ্যামনগর গ্রাম উপন্যাসে শ্যামপুর নামে অভিহিত হইয়াছে এবং এই গ্রামই সমৃদ্ধিলাভ করিয়া সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুরে পরিণত হইয়াছে। 'ওয়েষ্টল্যাণ্ডের কাহিনীতে মহম্মদপুর পূর্ব্বে ধানের ক্ষেত ছিল।

২। উভয় কাহিনীতেই যুদ্ধক্ষেত্রে মেনাহাতীর (উপন্যাসের 'মৃণ্ময়') হস্তে আবু তুরাবের (উপন্যাসের তোরাব্ খাঁ) মৃত্যুর উল্লেখ রহিয়াছে।

৩। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের কাহিনীতে মেনাহাতী অতর্কিতে শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হন, বঙ্কিম এই কাহিনীর উপর ঈষৎ রং ফলাইয়া লিখিয়াছেন, 'প্রাতে উঠিয়াই মৃণ্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান সেনা মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে—আগতপ্রায়—প্রায় গড়ে পৌঁছিল।....সংবাদ পাইবামাত্র মৃণ্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না, সুতরাং তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।' ওয়েষ্টল্যাণ্ডের গ্রন্থে মেনাহাতীর রক্ষাকবচের যে আজগুবী কাহিনী রহিয়াছে বঙ্কিম তাহা সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন।

৪। বঙ্কিমের সীতারাম শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই অথবা শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হন নাই। তিনি শেষ মুহূর্ত্তে তোপের সাহায্যে পথ করিয়া লইয়া 'নিজ মহিষী ও পুত্র কন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমানকটক কাটিয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন।' বঙ্কিমের এই কাহিনী অনৈতিহাসিক এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

৫। কাজীর আদালতে গঙ্গারামের বিচারের প্রহসন এবং ইহার

সূত্র ধরিয়া ফৌজদারের সিপাহীর সহিত সীতারামের সঙ্ঘর্ষ, সীতারাম ও শ্রীর প্রণয়কাহিনী, গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার বিচার সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী।

কাজীর আদালতে গঙ্গারামের বিচার

গঙ্গারামের বিচার কাল্পনিক কাহিনী হইলেও তৎকালীন বাংলায় এরূপ বিচার অসম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে আচার্য্য যদুনাথ লিখিয়াছেন:—

বাঙ্গলাদেশে সেই সময়ে এই শ্রেণীর একটি ঘটনা ঘটে, তাহা সলিমুল্লা ও ঘুলাম হুসেন সালিম নিজ নিজ ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন:

একজন ফকির চুনাখালীর তালুকদার বৃন্দাবনের নিকট ভিক্ষা চাওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া উহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। ফকির কতকগুলি ইট কুড়াইয়া আনিয়া তাহা সাজাইয়া বৃন্দাবনের বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া একটি ছোট দেওয়াল খাড়া করিল এবং উহাকে মসজিদ নাম দিল। যখনই বৃন্দাবন ঐ পথে চলিতেন, ফকির উচ্চস্বরে আজান পড়িত। বৃন্দাবন উত্যক্ত হইয়া একদিন কয়েকখান ইট ফেলাইয়া দিলেন এবং ফকিরকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ফকির গিয়া মুর্শিদ কুলীর নিকট নালিশ করিল। বিচারক কাজী মুহম্মদ শরফ্ উলেমাদের লইয়া আলোচনা করিয়া বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ড দিলেন। মুর্শিদ কুলী এই হত্যায় অনিচ্ছুক হইয়া কাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বেচারা হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য ধর্ম্ম-আইনের কড়া বিধি এড়াইবার কোন উপায় আছে কি?" কাজী উত্তর দিলেন, 'হাঁ আছে। উহার প্রাণ লইতে ততক্ষণ দেরি হইতে পারে, যতক্ষণে উহার প্রাণ-ভিক্ষার্থী বন্ধুকে আগে মারিয়া ফেলা হইবে। তাহার পর উহাকে বধ করা নিশ্চিত।' মুর্শিদ কুলী খাঁর সব চেষ্টা বিফল হইল; এমন কি, সুবাদার শাহজাদা আজীমউদ্দীনের অনুরোধ পর্য্যন্ত বাদশাহ গ্রাহ্য করিলেন না। ....তিনি শাহজাদার পত্রের উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন,—'কাজী শরফ্ খোদাকি তরফ্'। (তারিখ-ই-বংগালা, মুর্শিদ কুলী খাঁ অধ্যায়ের ঠিক শেষে; রিয়াজ-উস্ সালাতীন, মূল ২৮৫-৮৬ পৃঃ)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫১, ৫১শ ভাগ,
তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা: ৯২-৯৩ পৃঃ।

সীতারামের তিন বিবাহ

এ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন:

সীতারামের তিনটি বিবাহের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও

প্রবাদ ঠিক রাখিয়া তাঁহার তিন মহিষীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অতি অল্প বয়সে সীতারামের সহিত ভূষণার অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাসী এক মৌলিক কায়স্থের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। এ পত্নীর কোন সন্তানাদি হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহাকেই বঙ্কিমচন্দ্র "শ্রী" নামে কীর্ত্তিত করিয়া তাঁহার উপন্যাসের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। সীতারাম নল্‌দী পরগণা জায়গীর পাওয়ার পর অকস্মাৎ তাঁহাদের অবস্থা উন্নত হইয়া পড়ে। তখন তিনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত দাস-পল্‌শা গ্রামে সৌকালীন গোত্রীয় প্রসিদ্ধ কুলীন সরল খাঁ ঘোষের কন্যা কমলাকে বিবাহ করেন।....কমলাকে বঙ্কিমচন্দ্রের নন্দা বলা যাইতে পারে।

সীতারাম তৃতীয়বার বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পাটুলী গ্রামে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর নাম বা অন্য পরিচয় জানা যায় নাই।....এই তিন বিবাহ ব্যতীত সীতারামের অন্য বিবাহ হইয়াছিল কিনা, ঠিক জানা যায় না ; সম্ভবতঃ হইয়াছিল, কারণ বীরপুর গ্রামে তাঁহার নওয়ারাণীর বাটীর উল্লেখ আছে। যাহা হউক, এ সব বিবাহ উল্লেখযোগ্য নহে।....

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৩৭-৩৮ পৃঃ।

বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দলাভ

সীতারাম নবাব-দরবারে নিজ উকিল (অর্থাৎ দূত) দ্বারা সুবাদারকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সুপারিশে দিল্লীর দরবার হইতে 'রাজা' উপাধি ও জমিদারী ফর্ম্মান আনিয়া মহা গৌরবে স্বদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য যদুনাথ লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'" শীর্ষক প্রবন্ধ
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫১ সাল
৫১শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ৮৮ পৃঃ।

আচার্য্য যদুনাথ একই পৃষ্ঠায় পাদটীকায় লিখিয়াছেন: 'স্থানীয় প্রবাদ যে, সীতারাম স্বয়ং দিল্লী যান এবং সেখানে রাজমন্ত্রীদের টাকায় ও প্রতিশ্রুতিতে হস্তগত করিয়া এই উপাধি ও ফর্ম্মান লাভ করেন।' বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসে এই প্রবাদ অনুসরণ করিয়াছেন।

সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় মনে করেন '১৬৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে সীতারাম রাজোপাধি পান, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর।'

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৪০ পৃঃ পাদটীকা।

রাজধানী মহম্মদপুর

'সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুরের নামকরণ সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এইরূপ:

'সীতারাম যখন স্থান মনোনীত করেন, তখন এস্থলে মহম্মদ আলি বা মহম্মদ শাহ নামে এক ফকির বাস করিতেন। সীতারাম তাঁহাকে স্থানত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন না। অবশেষে অগত্যা তাঁহার নামে রাজধানীর নামকরণ করিলে তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন এইরূপ বলেন; সীতারাম সে প্রস্তাবে সম্মত হন।'

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৪২-৪৩ পৃঃ।

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও তাঁহার 'সীতারাম' প্রবন্ধে এই প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

সাহিত্য, ফাল্‌গুন ১৩০২, ৭৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এই কাহিনী অবলম্বনে এবং ইহার উপর রং ফলাইয়া 'প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসে (১।১৪) এবং উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে (১।১৩) বঙ্কিম একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ সংযোজিত করিয়াছিলেন। (পরিশিষ্ট ক, ''প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠ বা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণে'র ৯ চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য।)

প্রচলিত প্রবাদের মহম্মদ আলি বা মহম্মদ শাহই উপন্যাসের চাঁদ শাহ ফকির।

সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই প্রবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেনঃ 'কোন একজন মুসলমান ফকির সেখানে থাকিতে পারেন, কিন্তু শুধু তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য বা বিরাগের ভয়ে নহে, পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতির প্রত্যাশায় এবং হিন্দু মুসলমানের প্রীতিবন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে' সীতারাম তাঁহার রাজধানীর নাম মহম্মদপুর রাখিয়া থাকিবেন।

যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ভূষণা দখল

ক্রমে চারি দিকে রাজ্য বিস্তার করিয়া সীতারাম অবশেষে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণার ফৌজদার সৈয়দ্ আবুতুরাব্‌কে অকস্মাৎ আক্রমণে হত্যা করেন এবং ভূষণা দখল করিয়া ফেলেন।

আচার্য্য যদুনাথ লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'' শীর্ষক প্রবন্ধ
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫১;
৫১শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ৮৯ পৃঃ।

এই সময়েই সীতারামের চরম উন্নতি এবং এইখানেই তাঁহার ধ্বংসের

সূচনা। কারণ আবুতুরাবের প্রতি মুর্শিদ কুলী খাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থাকিলেও, একে আবুতুরাব্ বাদশাহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাহাতে দিল্লীর দরবারেও তাঁহার অনেক আত্মীয় বন্ধু ছিলেন। সুতরাং পাছে তিনি তাঁহার অমনোযোগিতার জন্য বাদশাহের নিকট তিরস্কৃত হন, এই আশঙ্কায় মুর্শিদ কুলী খাঁ এক্ষণে অতিমাত্রায় কর্ম্মতৎপর হইলেন। এবং 'স্বীয় শ্যালীপতি বক্স আলি খাঁকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া' সীতারামের ধ্বংসের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিলেন। 'হিন্দুরাজত্বের কল্পনা নিমেষে উড়িয়া গেল।'

যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৮৮-৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সীতারামের বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়বশ্যতা সম্বন্ধে জনশ্রুতি

সীতারামের বিলাসিতা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে।... উক্ত প্রবাদগুলির মধ্যে কতক সীতারামের অশনবসনাদি সম্বন্ধীয়, কতকগুলি তাঁহার নৈতিক চরিত্র বিষয়ক।....প্রথমতঃ প্রবাদ এই, সীতারাম নিত্য নূতন সূক্ষ্মবস্ত্র পরিতেন, নিত্য নূতন পুকুরের জলে স্নান করিতেন, নিত্য নূতন বিছানায় শয়ন করিতেন, প্রত্যহ তাঁহার জন্য সদ্য দুগ্ধ হইতে ঘৃত মাখন দধি ক্ষীর ও অন্যান্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত, তিনি কোন বাসি বা পর্য্যুসিত, অজানিতভাবে প্রস্তুত, বৈদেশিক বা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আনীত খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেন না।....

দ্বিতীয়তঃ প্রবাদ এই, সীতারামের নৈতিক চরিত্র কলুষিত ছিল, কতকগুলি বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার শত শত উপপত্নী ছিল, তিনি উহাদের সহিত চিত্ত-বিশ্রামের নিভৃত কুঞ্জে বা সুখসাগরের গর্ভস্থ দ্বিতল গৃহে বিলাস রঙ্গে মজিয়া থাকিতেন। "দাতার মধ্যে খেলারাম, বদমায়েসে সীতারাম"— এমন সব প্রবাদোক্তিরও অপ্রতুল ছিল না।

যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৭৪-৭৫ পৃঃ।

মিত্র মহাশয় স্বয়ং যে সীতারামের নৈতিক কলুষতার প্রবাদ বিশ্বাস করেন না উপন্যাসের আলোচনাপ্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

সীতারামের পরিণতি

সীতারামের পরিণতি সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী এইরূপ :

১। বন্দী সীতারাম মুর্শিদাবাদে নীত হইলে তাঁহাকে শূলে চড়ান হয়। (ষ্টুয়ার্ট-বর্ণিত কাহিনী দ্রষ্টব্য।)

২। সীতারাম বন্দী অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। (ওয়েষ্টল্যাণ্ড-বর্ণিত কাহিনী দ্রষ্টব্য।)

৩। সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই উভয় কাহিনীই অবিশ্বাস করিয়াছেন। তিনি বলেন, সীতারামের মৃত্যুদণ্ড হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু 'মৃত্যুদণ্ড হইয়া থাকিলে, তাঁহার যে শূলদণ্ড হয় নাই ইহা ধরিয়া লওয়া যায়, সম্ভবতঃ মুর্শিদকুলি খাঁ সে নিষ্ঠুরতা দেখান নাই। তবে গুপ্তহত্যা হওয়া বিচিত্র নহে ;......আবার অন্যপক্ষে সুখবিলাসী সীতারামের পক্ষে বর্ষাকালে অস্বাস্থ্যকর কারাগৃহে রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হওয়াও অস্বাভাবিক নহে।' (বিস্তারিত আলোচনার জন্য যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৮৯-৬০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

সীতারামের কাহিনীকে গীতোক্ত বাণীর উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করিতে যাইয়া কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া বঙ্কিম তাঁহার চরিত্র কোনরূপ বিকৃত করিয়া থাকিলেও, উপন্যাসে সীতারামের পরিণতির চিত্রের পরিকল্পনা (ইহা সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত) এই বাঙ্গালী বীরের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে সীতারামের একজন মহিষী শেষ পর্য্যন্ত রাজপুরীতে ছিলেন, 'এবং তিনি শেষ চেষ্টায় সীতারামকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন।' (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) বলা বাহুল্য ইনিই উপন্যাসের নন্দা।

সীতারামের 'পরাজয়ের তারিখ ফেব্রুয়ারী ১৭১৪ এবং মৃত্যুর সময় বোধ হয় সেই বৎসরের অক্টোবর মাসে।' (আচার্য্য যদুনাথ লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫১, ৫১ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ৮৯ পৃঃ)।

পরিশিষ্ট গ

সময় বিশ্লেষণ[1] (Time Analysis)

দুর্গেশনন্দিনী

সময়নির্দ্দেশক কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ :

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে জগৎসিংহ কতলু খাঁর অতর্কিত আক্রমণে পরাস্ত হন। ইহার দশ দিন পরে কতলু খাঁর মৃত্যু হয়। অতঃপর সন্ধি স্থাপিত হইলে ১৫ই আগষ্ট খ্বাজা ইসা কতলু খাঁর নাবালক পুত্রকে লইয়া নানা উপঢৌকন সহ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পর মানসিংহ বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

প্রথম খণ্ড

জগৎসিংহের পরাজয়ের পক্ষকাল পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে (৯৯৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখের শেষের দিকে) কাহিনীর সূচনা।

প্রথম হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদ : রাত্রিকালে ঝটিকা ও বারিধারার মধ্যে শৈলেশ্বরের মন্দিরে কুমার জগৎসিংহের সহিত অজ্ঞাতপরিচয় যুবতী ও প্রৌঢ়ার সাক্ষাতের চিত্রে (১।১-২) পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া তৃতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম পূর্ব্বকথা বিবৃত করিয়াছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাহিনী প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কাহিনীর অব্যবহিত পরের কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : 'তিন চারি দিবস' পরের কথা। এইখানেই এক হিসাবে কাহিনীর গোড়াপত্তন। কারণ বীরেন্দ্রসিংহ মোগলের পক্ষাবলম্বন না করিলে বিমলা প্রতিশ্রুতিমত জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেও তাঁহাকে দুর্গাভ্যন্তরে আনিবার প্রশ্ন উঠিত না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : জগৎসিংহকে দর্শন করার পর দশ বার দিনের মধ্যে যে কোন দিনের কাহিনী। তিলোত্তমার পূর্ব্বরাগের বর্ণনা একদিকে যেমন তাহার চরিত্রের উপর আলোকপাত করে, অন্যদিকে তেমনই শৈলেশ্বরের

---

১ ইতিহাসের সহিত যে সকল উপন্যাসের সংস্পর্শ রহিয়াছে কেবলমাত্র সেই সকল উপন্যাসের 'সময় বিশ্লেষণ' দেওয়া হইল।

মন্দিরে প্রথম দর্শনের পর যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে পরোক্ষে তাহার ইঙ্গিত করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : 'চতুর্দ্দশ দিবসে'র কথা। ইহা যেমন সময়ের নির্দ্দেশ করে তেমনই পরবর্ত্তী দিবসে বিমলার নৈশ অভিযানের প্রস্তুতি।

নবম পরিচ্ছেদ : পক্ষকাল জগৎসিংহের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

দশম হইতে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : 'পক্ষান্তে' প্রদোষকালে বিমলার নৈশ অভিযানের উদ্যোগপর্ব্ব হইতে আরম্ভ কবিয়া জগৎসিংহকে লইয়া দুর্গপ্রবেশের কাহিনী।

অষ্টাদশ হইতে একবিংশ পরিচ্ছেদ : একই রাত্রির কথা—পাঠানের দুর্গপ্রবেশ হইতে আরম্ভ কবিয়া দুর্গজয়ের রোমাঞ্চকর কাহিনী। বঙ্কিমের বর্ণনা ঘটনার দ্রুতগতিব সহিত সমান তালে চলিয়াছে এবং বিমলা-করিমবক্স সংবাদ এমন কৌশলে সংযোজিত হইয়াছে যে ইহা ক্ষণেকের হাসির যোগান দিলেও কাহিনীব দ্রুত গতি ব্যাহত করে নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ : কতলু খাঁর দুর্গে সংজ্ঞাহীন জগৎসিংহ ও শুশ্রূষারত ওসমান ও আয়েষা। ১।২১ এর সহিত সময়ের ব্যবধান ক্ষীণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সঙ্কটজনক অবস্থা কাটাইয়া জগৎসিংহ 'দুই দিবস পরে....প্রথম কথা কহিলেন।' কিন্তু ইহা গড় মান্দারণ জয়ের কত দিন পরের কথা? জগৎসিংহের প্রশ্নের উত্তরে আয়েষা বলিতেছেন যে, তিনি 'চারি দিন' কতলু খাঁব দুর্গে রহিয়াছেন এবং 'অদ্য [বীরেন্দ্রসিংহের] বিচাব হইবে।' কিন্তু চতুর্থ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম লিখিয়াছেন : 'দুর্গজয়ের দুই দিবস পবে....কতলু খাঁ নিজ দুর্গ মধ্যে দরবারে বসিয়াছেন। ....অদ্য বীরেন্দ্রসিংহের দণ্ড হইবে।' প্রকৃতপক্ষে ঐ দিবসই তাঁহার বিচার হইল। কিন্তু এই উভয় উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? ইহার একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর এই যে, বীরেন্দ্র-সিংহ ও জগৎসিংহ বন্দী হইলেও দুর্গজয়ের পর দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া কতলু খাঁর নিজ দুর্গে ফিরিতে আরও দুই দিন সময় লাগিয়া থাকিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কতলু খাঁর নিজ দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তনের দুই দিবস পরে : বীরেন্দ্রসিংহের বিচার ও প্রাণদণ্ড।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আরও দুই দিবস পরে : বিমলা ওসমানের হাতে জগৎসিংহের নিকট লিখিত লিপি প্রদান করিলেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ : লিপির বাণী—পূর্ব্বকথা ; কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ওসমান কর্ত্তৃক বিমলার মুক্তির ব্যবস্থা।

অষ্টম হইতে দশম পরিচ্ছেদ : 'দিনে দিনে জগৎসিংহের আরোগ্য জন্মিতে লাগিল।' (২।৮)।—এই মন্তব্য যেমন জগৎসিংহের আরোগ্য-লাভের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাহার আভাস দেয়, তেমনই অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার অব্যবহিত পর দিবস প্রত্যুষে জগৎসিংহের নিকট বিমলার লিপি প্রদানের (২।১০) ফলে ঘটনার দ্রুত গতি অব্যাহত রহিয়াছে। বিমলা ওসমানের নিকট লিপি প্রদান করেন সন্ধ্যার পর। (২।৫)। হয়ত একই দিবস অপরাহ্নে জগৎসিংহ গজপতির নিকট তিলোত্তমা সম্বন্ধে কুৎসা শুনিয়া থাকিবেন (২।৯) এবং পর দিবস প্রত্যুষে ওসমান জগৎসিংহের নিকট বিমলার লিপি প্রদান করিয়া থাকিবেন। এইরূপে কুশলী শিল্পী দূরত্ব ও নৈকট্য উভয়েরই আভাস দিয়াছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ : অপরাহ্নে ওসমান জগৎসিংহের নিকট হইতে বিমলার লিপির উত্তর পাইলেন।

দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : আনুমানিক তিন দিবস পরে—জগৎ-সিংহের পরাজয়ের পর দশম দিবস। বিমলার নিকট হইতে লিপিগ্রহণ-কালেও ওসমান বলিতেছেন, 'কতলু খাঁর জন্মদিবস আগতপ্রায়।' (২।৭)।

ঘটনাবহুল একই রাত্রির বিবরণ। বিমলার প্রতিশোধ এবং কতলু খাঁর মৃত্যুকালীন উক্তিতে জগৎসিংহের মনের সন্দেহের নিরাকরণে ইহার পরিসমাপ্তি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : ১৫ই আগষ্ট, অর্থাৎ কতলু খাঁর মৃত্যুর আড়াই মাস পরে খাজা ইসা কতলু খাঁর পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুতরাং এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ (ইহা ঐ সাক্ষাৎ-কারের পরের কথা) এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কিঞ্চিৎদধিক আড়াই মাস।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : পর দিবসের কথা : জগৎসিংহের নিকট আয়েষার লিপি।

বিংশ পরিচ্ছেদ : আরও এক দিন পরে : জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার পুনঃসাক্ষাৎকার।

একবিংশ পরিচ্ছেদ : দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তিলোত্তমা আরোগ্য-লাভ করিলে অভিরাম স্বামীর নিকট জগৎসিংহ কর্ত্তৃক তাঁহার পাণিপ্রার্থনা। যুদ্ধান্তে মানসিংহ বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এই ঐতিহাসিক সত্যের

পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় পিতার সহিত পাটনা যাইবেন এইরূপ মনস্থ করিয়া জগৎসিংহ আয়েষার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। (২।১৮)। কিন্তু পরে তিলোত্তমার সাক্ষাৎ পাইলে তাহার অসুস্থতার জন্য জগৎসিংহের পাটনা যাওয়া বন্ধ হইল। তিলোত্তমার আরোগ্যলাভ করিতে মাসাধিক কাল লাগিয়া থাকিবে।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ: জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহ-উৎসব। ইহা আনুমানিক পক্ষকাল পরের কথা। হয়ত, কার্ত্তিকমাস; বিবাহান্তে তিলোত্তমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া 'আপন আবাসগৃহে আসিয়া....আয়েষা.... শীতল-পবন-পথ কক্ষবাতায়নে দাঁড়াইলেন'—এই বর্ণনা তাৎপর্য্যপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা

কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ:

আকবরের মৃত্যু: ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর। সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করেন পিতার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে।

আকবরের মৃত্যুর পর কাহিনীর আরম্ভ। যাত্রীর দল গঙ্গাসাগর স্নান করিয়া ফিরিতেছিল, সুতরাং সময়টা মাঘের প্রথমার্দ্ধ, অর্থাৎ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষার্দ্ধ, ইহা সহজেই অনুমান করা চলে। কিন্তু বঙ্কিম এমন একটি তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন যাহার ভিত্তিতে এক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব। নবকুমার সাগরতীরে পরিত্যক্ত হইবার পর তৃতীয় রাত্রে অমাবস্যা তিথিতে কাপালিক তাঁহাকে ভৈরবীপূজায় বলি দিবার উদ্যোগ করেন। (১।৮ দ্রষ্টব্য)। এফিমেরিস (Ephemeris) দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী সোমবার রাত্রে ছিল অমাবস্যা তিথি।[১] সুতরাং উপন্যাসের ১।৬ হইতে ১।৮-এ বর্ণিত ঘটনা (অর্থাৎ নবকুমারকে বলি দিবার উদ্যোগ এবং কপালকুণ্ডলার তৎপরতায় তাঁহার উদ্ধার) ঐ রাত্রির ঘটনা। নবকুমার সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন ইহার দুই দিন পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী, শনিবার।

১ দেওয়ান বাহাদুর স্বামী কানুপিল্লাই কৃত An Indian Ephemeris A. D. 700 to A.D. 1799 showing the daily solar and lunar reckoning according to the principal systems in India. ষষ্ঠ ভলুম, ১৪ পৃঃ।

প্রথম খণ্ড

প্রথম খণ্ডে মোট পাঁচ দিনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম হইতে চতুর্থ পরিচ্ছেদ: প্রথম দিনের কাহিনী: কাষ্ঠান্বেষণে বাহির হইয়া নবকুমার 'সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত'; কাপালিকের সহিত তাঁহার কাল সাক্ষাৎকার এবং তাঁহার কুটীরে আপাত-আশ্রয়লাভ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: দ্বিতীয় দিবস: নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎ—নবকুমার পথ হারাইয়াছেন, কপালকুণ্ডলা তাঁহার পথপ্রদর্শিকা।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ: তৃতীয় দিবস: রাত্রিসমাগমে নবকুমারের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা এবং কপালকুণ্ডলার অনুকম্পা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার প্রাপ্তি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: একই রাত্রি: কপালকুণ্ডলার আনুকূল্যে নবকুমার অধিকারীর আশ্রয়ে। এই পরিচ্ছেদে অধিকারীর 'ঘটকালি'র সূত্র ধরিয়া নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ: পরবর্ত্তী দুই দিনের কাহিনী: প্রথম দিন গোধূলিলগ্নে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার বিবাহ; দ্বিতীয় দিন নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার পতিগৃহযাত্রা। 'অনেক বেলা হইলে মেদিনীপুরের পথে আসিয়া অধিকারী তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

নবকুমার যেদিন কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন তাহার পরের দিন হইতে এই খণ্ডে কাহিনীর আরম্ভ। মেদিনীপুর পৌঁছাইতে তাঁহাদের এক দিন লাগিয়াছে। বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'নবকুমার মেদিনীপুর আসিয়া অধিকারীর প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য একজন দাসী, একজন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইলেন। অর্থের অপ্রাচুর্য্য হেতু স্বয়ং পদব্রজে চলিলেন। নবকুমার পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বাহকেরা তাঁহাকে অনেক পশ্চাৎ করিয়া গেল।' (২।১)। এখানে সময়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট—নবকুমার পূর্ব্বদিনের, অর্থাৎ তাঁহারা যেদিন যাত্রা করিয়াছেন সেই দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ: নবকুমার যেদিন গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন তাহার পরের দিন—রাত্রি 'প্রায় চারি ছয় দণ্ড': মতিবিবির সহিত নবকুমারের আকস্মিক সাক্ষাৎকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : একই রাত্রি : মতিবিবি কর্ত্তৃক নবকুমারের পরিচয়-প্রাপ্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : একই রাত্রি : ভোগসুখরতা মতিবিবি ও প্রকৃতি-পালিতা কপালকুণ্ডলা—'মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।' মতিবিবি কপালকুণ্ডলাকে বহুমূল্য অলঙ্কারে সাজাইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পর দিবস প্রভাতের একটি ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা : ভিক্ষুককে কপালকুণ্ডলার অলঙ্কার প্রদান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কপালকুণ্ডলাকে লইয়া নবকুমারের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন। সমুদ্রকূলে যে পাঁচ দিন অতিবাহিত হইয়াছে তাহা ছাড়াও পথ অতিক্রম করিতে আরও আট দশ দিন সময় লাগিয়া থাকিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : 'অবরোধে' কপালকুণ্ডলা। আনুমানিক দশ বার দিন পরের কথা।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনী দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে মতিবিবির সূত্র ধরিয়া অতীতের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ২।৩ এ বর্ণিত রাত্রির অব্যবহিত পরের রাত্রি। বর্দ্ধমানের পথে মতিবিবি খাঁ আজিমের পত্র পাইলেন। ইহা আকবরের মৃত্যুর তিন মাস পরের কথা। (তখন আগ্রা হইতে বর্দ্ধমান ছিল তিন মাসের পথ। বঙ্কিম নিজেই কৌশলে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন : মতিবিবি মেহের-উন্নিসাকে বলিতেছে, 'দিন নিশ্চিত করিয়া তিন মাসের পথ যাতায়াত করা কি সম্ভব ?' ৩।৩।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মতিবিবি ও মেহের-উন্নিসা। ইহা মতিবিবি বর্দ্ধমানে পেঁৗছিবার দুই দিবস পরের কথা। মতিবিবি মেহের-উন্নিসাকে বলিতেছেন, 'তোমার সহিত অনেক দিন দেখা নাই, এই জন্য দুই দিন রহিয়া গেলাম।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তিন মাস পরের কথা : আগ্রায় জাহাঁগীরের সহিত মতিবিবির সাক্ষাৎ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অব্যবহিত পরে : মতিবিবির নূতন সাধ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : নবকুমার কর্ত্তৃক মতিবিবির প্রণয় প্রত্যাখ্যান। ইহা আরও দশ এগার মাস পরের কথা। বঙ্কিম স্পষ্টতঃ সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন : 'লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম

আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল।' (৪।১)। এবং সপ্তগ্রামেও ইহার পূর্ব্বে নবকুমারের সহিত মতিবিবির 'দুই একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।' আরও একদিক দিয়া হিসাব পাওয়া যায়ঃ এই সময় 'কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিণী।' (ঐ)।

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ প্রত্যাখ্যানের পর দ্বিতীয় দিবস; রাত্রিকালঃ কপালকুণ্ডলার সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে পুরুষবেশে মতিবিবির নৈশ অভিযান।

চতুর্থ খণ্ড

চতুর্থ খণ্ডে পুনরায় কপালকুণ্ডলার কাহিনী। 'কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিণী।' কুশলী শিল্পী মতিবিবির কাহিনী বর্ণনা করিয়া এই 'এক বৎসরের অধিককালে'র ফাঁক পূরণ করিয়াছেন।

এই খণ্ডে মোট দুই দিনের কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ অপরাহ্নে শ্যামাসুন্দরীর জন্য স্বামীবশের ঔষধ সংগ্রহের জন্য কপালকুণ্ডলার বনগমনের সঙ্কল্প এবং রাত্রি প্রহরাতীত হইলে এই উদ্দেশ্যে বনগমন। ইহা ৩।৭ এ বর্ণিত রাত্রি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ঐ রাত্রির বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ রাত্রিশেষে উষাকালে 'অপ্রগাঢ় নিদ্রায়' কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন এবং জাগরিত হইয়া 'ব্রাহ্মণবেশী'র লিপিপ্রাপ্তি।

চতুর্থ হইতে নবম পরিচ্ছেদঃ ঘটনাবহুল দ্বিতীয় রাত্রিঃ নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কাহিনীর উপর পূর্ণচ্ছেদ। কাহিনীর পরিসমাপ্তিকালে সময়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে। বঙ্কিম প্রশ্ন করিতেছেনঃ 'সেই অনন্ত গঙ্গা-প্রবাহমধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?' অর্থাৎ, বসন্তকাল; যে বৎসর নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার বিবাহ হইয়াছে তাহার পর বৎসর ফাল্গুন/চৈত্র মাস।

মৃণালিনী

ঐতিহাসিক ঘটনাঃ মুসলমান কর্তৃক বাংলা জয়। তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের মতে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখ্তিয়ার বাংলা জয় করেন।

প্রাবৃটের দিনান্তে কাহিনীর আরম্ভ এবং কার্ত্তিকে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। (গিরিজায়া মৃণালিনীকে বলিতেছে, "রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আর কার্ত্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?" ৪।৮। ইহা কাহিনীর পরিসমাপ্তির অল্প পূর্ব্বের কথা।)

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ: ৬১০ বঙ্গাব্দের (১২০৩ খ্রীঃ) বর্ষাকাল। প্রয়াগতীর্থে গুরুশিষ্যের সংলাপের ভিতর দিয়া আমরা যেমন অতীতের কাহিনী জানিতে পারি, তেমনই এই সংলাপ মৃণালিনী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: লক্ষ্মণাবতীতে (বর্ত্তমান মালদহ জেলায়) মৃণালিনী ও মণিমালিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সময়ের ব্যবধান দুই মাসের মত। প্রথম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপ যাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন; মৃণালিনী ও মণিমালিনী যখন সংলাপরত তখন হেমচন্দ্রের দূতী গিরিজায়া সেখানে উপস্থিত হইল। সুতরাং আনুমানিক সপ্তাহকাল পূর্ব্বে হেমচন্দ্র লক্ষ্মণাবতীতে পৌঁছিয়াছেন এরূপ অনুমান করা চলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের জের। গিরিজায়ার আগমন। এইখানেই প্রকৃতপক্ষে আখ্যায়িকার আরম্ভ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: একই দিবস অপরাহ্ণ: হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক গিরিজায়ার মারফত মৃণালিনীর নিকট পত্রপ্রেরণের ব্যবস্থা; মাধবাচার্য্যের আদেশে তাঁহার লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ঐ দিবস রাত্রির ঘটনা: হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর মাঝখানে কৃত্রিম বাঁধ দিবার ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, ব্যোমকেশের আবির্ভাবে তাহা জটিলতর হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: একই রজনী: ব্যোমকেশের আচরণের জের—মৃণালিনী গৃহহারা, গিরিজায়া তাঁহার একমাত্র অবলম্বন।

দ্বিতীয় খণ্ড

এখন হইতে ঘটনাস্থল নবদ্বীপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ: পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাহিনীর আনুমানিক

সপ্তাহকাল পরের কথা। নবদ্বীপে পৌঁছিয়া হেমচন্দ্র প্রথমেই গৌড়েশ্বরের সভায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: একই দিবস, সভাভঙ্গের পর: মনোরমার প্রথম আবির্ভাব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: একই দিবস রাত্রি। নবদ্বীপের পথে মৃণালিনী ও গিরিজায়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: 'বাতায়ন পথে মনুষ্যমুণ্ড' দেখিয়া 'বঙ্গে তুরক আসিয়াছে' এই সন্দেহে হেমচন্দ্রের নৈশ অভিযান। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার সহিত কয়েক দিনের, হয়ত সপ্তাহকালের ব্যবধান রহিয়াছে। পরিচ্ছেদের প্রথমেই বঙ্কিম এই ব্যবধানের উল্লেখ করিয়াছেন: 'হেমচন্দ্র কিছু দিন উপবন-গৃহে বাস করিলেন।' লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পর দিবস প্রত্যুষেই মৃণালিনী ও গিরিজায়া তাঁহাদের কুটীরের সম্মুখে বৃক্ষতলে আহত হেমচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহারা 'সবে দুই তিন দিন' নবদ্বীপে আসিয়াছেন। (৩।১)। কিন্তু এস্থলে 'দুই তিন দিন' বলিতে অল্প কয়েক দিন বুঝাইতেছে। তাছাড়া হেমচন্দ্র যেদিন অপরাহ্ণে লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ করিলেন, মৃণালিনী ও গিরিজায়া তাহার পর দিবস নবদ্বীপ যাত্রা করেন এবং পথ অতিক্রম করিতে তাঁহাদের দুই এক দিন বিলম্ব হওয়াও অসম্ভব নহে।

পঞ্চম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: একই রাত্রির চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে পশুপতির পূর্ব্ব পরিচয়; অন্যথা কাহিনী দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। এই সময় মৃণালিনী সম্পূর্ণ অন্তরালে রহিয়াছেন।

তৃতীয় খণ্ড

এই খণ্ডে মৃণালিনী পুনরায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ: পরবর্ত্তী প্রত্যুষের কথা।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ: একই দিবস অল্প পরের কথা: মনোরমাকে হেমচন্দ্রের সেবারত দেখিয়া মৃণালিনীর ও গিরিজায়ার প্রতিক্রিয়া; গিরিজায়ার নির্ব্বুদ্ধিতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: আরও কিছুকাল পরে: মাধবাচার্য্যের আগমনে হেমচন্দ্র-মৃণালিনী কাহিনীর জটিলতা চরম পর্য্যায়ে পৌঁছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: একই দিবস, সন্ধ্যার প্রাক্কালে: কাহিনী অগ্রসর হয় নাই; কিন্তু হেমচন্দ্র ও মনোরমার সংলাপ যেমন হেমচন্দ্রের তৎকালীন

মানসিক অবস্থার উপর, তেমনই মনোরমার চরিত্রের উপর আলোকপাত করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : একই দিবস, হয়ত একই সময়ের কথা : মৃণালিনী ও গিরিজায়া।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : একই দিবস, সন্ধ্যা হইতে অল্প রাত্রি পর্য্যন্ত : গিরিজায়া না বুঝিয়া যে অনর্থ ঘটাইয়াছে তাহার প্রতিকারের ব্যর্থ চেষ্টা ; মৃণালিনীর সঙ্কল্প।

নবম পরিচ্ছেদ : একই রাত্রি : হেমচন্দ্রের অন্তর্দাহের বর্ণনা প্রসঙ্গে মৃণালিনীর চরিত্রের দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত ; গিরিজায়ার শেষ দৌত্য।

দশম পরিচ্ছেদ : একই রাত্রি : হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর সাক্ষাৎকার ; মৃণালিনীর শেষ চেষ্টার ব্যর্থতা।

চতুর্থ খণ্ড

বঙ্কিম পুনরায় পশুপতি-মনোরমা কাহিনীর সূত্র অনুসরণ করিতেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ : একই রাত্রির কাহিনী : পশুপতি শান্তশীলকে বলিতেছেন, "শান্তশীল! প্রাতে যে সংবাদ দিয়াছ, তাহা কেবল তোমার অক্ষমতার পরিচয় মাত্র।"—এই সংবাদ পূর্ব্ব রাত্রে হেমচন্দ্রকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টার (২।১২) সংবাদ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ : একই রাত্রি, অল্প পরের কথা : পশুপতি মনোরমার পরিচয় পাইলেন ; মনোরমা বন্দিনী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পর দিবস 'বেলা প্রহরেকের সময়' : মুসলমান কর্ত্তৃক গৌড়েশ্বরের রাজপুরী দখল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : একই দিবস : কৃতঘ্নতার পুরস্কার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : একই সময় অর্থাৎ যখন 'ঊর্ণনাভের জাল ছিঁড়িল—সে জালে কেবল সে স্বয়ং জড়িত হইল', তখন অপাপবিদ্ধা মনোরমা 'পিঞ্জর ভাঙ্গিল।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ : একই দিবস নিশীথে : ব্যোমকেশের মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : একই দিবস : পূর্ব্ব রাত্রে হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে নির্দ্দয়ভাবে ত্যাগ করিয়া গেলে (৩।১০) প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মৃণালিনীর অবস্থার বর্ণনা।

নবম ও দশম পরিচ্ছেদ: নিশান্তে উষাকালে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর পুনর্মিলন।

একাদশ পরিচ্ছেদ: প্রভাতে: পূর্ব্বকথা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: হয়ত একই সময়: হেমচন্দ্রের নিকট মৃণালিনীর কাহিনী শ্রবণান্তর মাধবাচার্য্যের আশীর্ব্বাদ।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ: একই দিবস: পশুপতির মুক্তি ও তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ: একই দিবস অপরাহ্ণ: কেশবের কন্যার অদৃষ্ট ফলিল।

চন্দ্রশেখর

সময় নির্দ্দেশক ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ:

আমিয়ট ও হে সাহেবের কলিকাতা হইতে মুঙ্গেব যাত্রা: ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল; পাটনার পথে মুঙ্গেরে অস্ত্রের নৌকার আগমন: ঐ, ২৫শে মে; আমিয়টের মুঙ্গের হইতে কলিকাতা যাত্রা: ২৩শে জুন আমিয়টের মুঙ্গেব ত্যাগেব কথা ছিল এবং ঐ দিবসই তিনি মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। ২৩শে জুন রাত্রি শেষে এলিস সাহেব অতর্কিতে পাটনা আক্রমণ করেন এবং পব দিবস প্রভাতে পাটনা দখল করেন। ঐ তারিখেই মীরকাসেমের সেনাপতি উক্ত সহব পুনর্দখল করেন। ইহার ছয় দিন পরে অর্থাৎ. ৩০শে জুন আমিয়ট মুর্শিদাবাদে নিহত হন। কাটোয়ার যুদ্ধ: ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই; গিবিয়াব যুদ্ধ: ঐ, ২রা আগষ্ট; উদয়নালার যুদ্ধে মীরকাসেমের পরাজয়: ঐ, ৫ই সেপ্টেম্বর।[১]

১ এই সকল তাবিখ সয়েব মুতাক্ষবীণ, James Mill-এব The History of British India এবং J. C. Marshman-এব The History of India হইতে সংগৃহীত। মিলেব মতে এলিস সাহেব ২৪শে জুন রাত্রে অতর্কিতে পাটনা আক্রমণ কবেন এবং পর দিবস প্রভাতে সাময়িকভাবে পাটনা দখল করেন। (দি হিষ্ট্রী অব্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, তৃতীয় ভলুম, ৩৪১ পৃ: দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সয়েব মুতাক্ষরীণে ইংবেজ কর্ত্তৃক পাটনা দখলেব তারিখ ১২ই জেলহজ্জ শুক্রবাব, ১১৭৬ হিজরী, প্রভাতকাল। ('It was on a Friday morning, the 12th of the month of Zilhidj, in the year of the Hegira 1176'); একই তারিখ নবাব সৈন্য পাটনা পুনর্দখল করে। (দ্বিতীয় ভলুম, সেকশন ১১, ৪৭১-৪৭৪ পৃ:)। উক্ত তাবিখ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পাবে যে, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও ঐ তারিখ গ্রহণ করিয়াছেন। সয়েব মুতাক্ষরীণে আমিয়টের মৃত্যুব তারিখ ১৮ই জেলহজ্জ বৃহস্পতিবার, ১১৭৬ হিজবী (পরিশিষ্ট খ. ৫১৫ পৃ: দ্রষ্টব্য); অর্থাৎ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন।

উপক্রমণিকা

প্রথম হইতে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়; তাহাদের মৃত্যুর পরিকল্পনা; চন্দ্রশেখর কর্তৃক প্রতাপের উদ্ধার; চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীব বিবাহ। উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় এই বিবাহের তারিখ ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি, অর্থাৎ বাংলা ১১৬২ সালের বৈশাখের গোড়ার দিকে।

প্রথম খণ্ড হইতে ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত বর্ণিত কাহিনীর ঘটনাকাল ১৭৬৩ সালের এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে ঐ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর।

প্রথম খণ্ড

আট বৎসর পরের কথা

প্রথম পবিচ্ছেদঃ মুঙ্গের দুর্গে মীরকাসেম ও দলনী বেগম। উভয়ের সংলাপ তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার উপব আলোকপাত করে। পববর্ত্তী ঐতিহাসিক ঘটনার (মুঙ্গেরে অস্ত্রের নৌকা আগমনেব) তারিখের পরিপ্রেক্ষিতে এই কাল্পনিক কাহিনীর তারিখ অনুমান করিয়া লইতে হইবে। মুঙ্গেরে অস্ত্রেব নৌকা পৌঁছায় ২৫শে মে, সুতরাং অস্ত্রের নৌকা কলিকাতা হইতে যাত্রা করিযাছে হয়ত মে মাসের গোড়ার দিকে। ফষ্টর 'অস্ত্রের নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে', এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা যাইতে আদিষ্ট হইযাছিল। (২।৫)। এবং যাহাতে 'সপ্তাহে' কলিকাতা পৌঁছিতে পারে, এই উদ্দেশে ফষ্টর দ্রুতগামী নৌকায় রওয়ানা হয। (১।৪)। অর্থাৎ, ফষ্টর কলিকাতা রওযানা হইয়া থাকিবে এপ্রিলের শেষের দিকে। ইহা শৈবলিনী যে রাত্রে অপহৃত হয তাহার পর দিবসের কথা। এবং শৈবলিনী অপহৃত হইয়াছে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার দশ বার দিন পরে। (দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদের সময় বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)। এই হিসাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার তারিখ এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে, অর্থাৎ বাংলা ১১৭০ সালের বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ অন্যূন আট দশ দিন পরের কথা। ইতিমধ্যে মীরকাসেম চন্দ্রশেখরকে মুর্শিদাবাদে আনিবার জন্য আদেশ পাঠাইয়াছেন এবং এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাহিনীর পর দিবস প্রভাতে চন্দ্রশেখরের নিকট মুর্শিদাবাদ হইতে লোক আসিল।

ভীমার তীরে শৈবলিনী ও ফষ্টর; চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর মিলিত জীবনের চিত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: দুই তিন দিন পরের কথা: শৈবলিনীর অপহরণ —চন্দ্রশেখর তখন মুর্শিদাবাদে। ইতিমধ্যে ফষ্টর শৈবলিনীর নিকট লোক পাঠাইয়াছে এবং তাহা নিশ্চিত পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ফষ্টরের সহিত শৈবলিনীর সাক্ষাতের পরের কথা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: পর দিবস প্রভাতে: সুন্দরীর দুঃসাহসিক অভিযানের ব্যর্থতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: দুই এক দিন পরে: চন্দ্রশেখরের প্রত্যাবর্ত্তন ও গৃহত্যাগ।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিঞ্চিদধিক দেড় মাস পরের কথা: গুর্‌গণ খাঁর নিকট দলনীর পত্র এবং একই দিবস রাত্রে গুর্‌গণ খাঁর সহিত তাহার গোপন সাক্ষাৎ। এই কাল্পনিক কাহিনী আমিয়ট যেদিন মুঙ্গের ত্যাগ করেন তাহার দুই দিন পূর্ব্বের, অর্থাৎ সম্ভবতঃ ২১শে জুনের কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: একই রাত্রি, অব্যবহিত পরের কথা: চন্দ্রশেখরের আনুকূল্যে প্রতাপের গৃহে দলনীর আশ্রয় লাভ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: চন্দ্রশেখরের গৃহত্যাগের বেশ কিছু দিন (হয়ত মাসাধিক কাল) পরের কথা: সুন্দরী প্রতাপের নিকট শৈবলিনীর অপ-হরণের সংবাদ দিল। পর দিবস প্রতাপ চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধানে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।

শৈবলিনীর উদ্ধার (২।৫-৬) হয়ত পক্ষকাল পরের কথা।

পঞ্চম হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদ: যে রাত্রে দলনী প্রতাপের গৃহে আশ্রয় পাইল তাহার পর রাত্রির রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী: প্রতাপ কর্ত্তৃক শৈবলিনীর উদ্ধার, ইংরেজের হাতে প্রতাপের বন্দিদশা, শৈবলিনী ভ্রমে ইংরেজ কর্ত্তৃক দলনীর অপহরণ। এই কাল্পনিক কাহিনী আমিয়ট যেদিন মুঙ্গের ত্যাগ করেন তাহার পূর্ব্ব রাত্রির, অর্থাৎ সম্ভবতঃ ২২শে জুন রাত্রির কথা।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ: চন্দ্রশেখরের গৃহত্যাগের আনুমানিক দশ বার দিন পরের কথা। গৃহত্যাগের পর সান্ত্বনা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমেই

গুরুর আশ্রমে আসিয়া থাকিবেন। কিন্তু বঙ্কিমের পরিবেশনগুণে মনে হয় ইহা যেন নিরাশ্রয়া দলনীকে আশ্রয় দানের অব্যবহিত পূর্ব্বের কথা।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ২।৫-৮এ যে রাত্রির ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী দিবস: শৈবলিনীর সর্ব্বশেষ চাল।

চতুর্থ হইতে সপ্তম পরিচ্ছেদ: ঘটনাবহুল রাত্রি: প্রতাপের উদ্ধার; গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ ও শৈবলিনীর সন্তরণ; শৈবলিনীর শপথ; ইংরেজের বজরা হইতে রামচরণের পলায়ন।

আমিয়ট যেদিন বেলা দ্বিপ্রহরে মুঙ্গের ত্যাগ করেন সেই রাত্রেই নবাব প্রদত্ত দ্রুতগামী ছিপে শৈবলিনী তাঁহার অনুসরণ করে। এ অবস্থায় আমিয়টের বজরা ধরিতে তাহার দুই তিন দিনের বেশী সময় লাগিতে পারে না। অর্থাৎ, আমিয়ট ২৩শে জুন মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া থাকিলে উপরোক্ত ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে ২৪শে হইতে ২৬শে জুনের মধ্যে কোন এক তারিখ রাত্রিকালে। ৩।৮এ পার্ব্বত্য প্রদেশের যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহাও এই সিদ্ধান্তের অনুকূল; কারণ এই বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মুঙ্গের হইতে ঐ স্থানের দূরত্ব খুব বেশী নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম এমন একটি ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন যাহার সাহায্যে উপরোক্ত তিনটি তারিখের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখ বাছিয়া নেওয়া সম্ভব। প্রতাপের উদ্ধারের প্রস্তুতি হিসাবে শৈবলিনী যখন নদী-সৈকতে পাগলিনীর ভূমিকা অভিনয় করিতেছিল তখন 'জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে।' অর্থাৎ, স্বল্পকালের জন্য হইলেও ঐ রাত্রে প্রথমে অন্ধকার ছিল। কিন্তু ২৪শে জুন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি এবং ২৫শে তারিখও দিবা ৯ ঘণ্টা ৫০ মিঃ পূর্ণিমা ছিল।[১] সুতরাং তিথির বিচারে উভয় তারিখই নাকচ করিতে হয় এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া ২৬শে তারিখ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। হয়ত ঐ তারিখ সকালের দিকেই শৈবলিনী ইংরেজের বজরার সন্ধান পাইয়া থাকিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: শেষ রাত্রে শৈবলিনীর পলায়ন এবং পরবর্ত্তী রাত্রে তাহার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ: প্রতাপের কার্য্যাবলী; মুক্তিলাভের পর মাসাধিক কালের ইতিহাস।

---

১ দেওয়ান বাহাদুর কানু পিল্লাইকৃত 'এফিমেরিস', ষষ্ঠ ভলুম, ৩২৮ পৃঃ। এই উপন্যাসে অন্যত্রও (২।২, ২।৫ ও ৫।২ দ্রষ্টব্য) রাত্রির সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তিথির ইঙ্গিত লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ৩।৮ এ বর্ণিত কাহিনীর জের ; একই রাত্রি : শৈবলিনীর আরও কঠিন অভিজ্ঞতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পরবর্ত্তী সপ্তাহকালব্যাপী শৈবলিনীর বিচিত্র অনুভূতি ; সপ্তাহান্তে স্বামীদর্শন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অব্যবহিত পরে : জাগ্রতে নরকদর্শন ও উন্মত্ততা।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : ২।৩ এর সহিত সময়ের ব্যবধান সম্ভবতঃ নয় দিন। ৩০শে জুন : মুর্শিদাবাদে নবাবের ফৌজের সহিত আমিয়টের সংঘর্ষ ও তাঁহার মৃত্যু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : একই রাত্রি : নিরাশ্রয়া দলনী পুনরায় চন্দ্রশেখরের আশ্রয়ে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শৈবলিনী কর্ত্তৃক প্রতাপের উদ্ধারের আনুমানিক তিন সপ্তাহ পরের কথা। ইতিমধ্যে মুঙ্গেরে নবাবের সহিত সাক্ষাতের পর দেশে ফিরিয়া সুন্দরী ও রূপসীর নিকট বিদায় লইয়া প্রতাপ এমন আয়োজন আরম্ভ করিয়াছেন যাহা গুর্‌গণ খাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা অল্প দিনে সম্ভব নহে। তবে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাল্পনিক কাহিনী কাটোয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বের কথা এবং এই সময় 'উভয় পক্ষে প্রকৃতভাবে রণসজ্জা করিতেছিলেন।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাহিনীর জের—একই রাত্রি।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্ব্বকথা : শৈবলিনীর আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক অনুভূতির রহস্যোদ্‌ঘাটন ; ৪।৪এ বর্ণিত কাহিনীর অব্যবহিত পরে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে নিকটবর্ত্তী 'পার্ব্বত্য মঠে' রমানন্দ স্বামীর নিকট লইয়া গেলেন এবং আরও আনুমানিক তিন সপ্তাহ পরে—হয়ত এক মাসও হইতে পারে—তাহাকে লইয়া বেদগ্রাম ফিরিলেন। বঙ্কিম লিখিয়াছেন : 'বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। (৬।৫)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দলনীর কাহিনীতে পূর্ণচ্ছেদ।

যেদিন মুর্শিদাবাদে আমিয়টের মৃত্যু হয় ঐ দিন রাত্রে তকি খাঁ নবাবের নিকট দলনী সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসাপূর্ণ পত্র পাঠাইলেন। (৫।৪)। ঐ পত্র যখন মীরকাসেমের হস্তগত হয় তৎপূর্ব্বে তিনি কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত

হইয়াছেন। (৬।২)। হয়ত তিনি যুদ্ধ ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া পত্র পাইতে বিলম্ব ঘটিয়া থাকিবে।[১] ইহার পর নবাবের 'পরওয়ানা' মুর্শিদাবাদে পৌঁছিতে আরও ছয় সাত দিন দেরী হওয়ার কথা। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাল্পনিক ঘটনার তারিখ জুলাই-এর শেষ অথবা আগষ্টের গোড়ার দিকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মাসখানেক পরে—উদয়নালার পরাজয়ের দুই তিন দিন পূর্ব্বের কথা, অর্থাৎ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২।৩ সেপ্টেম্বর: নবাবের ভুল-ভাঙ্গা ও অনুশোচনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: একই দিবস অথবা পর দিবস—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের সহিত সময়ের ব্যবধান ক্ষীণ। (আমীর হোসেন ফষ্টরের সন্ধানে কলিকাতা যাইবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু 'একজন ইংরেজ আসিয়া মুসলমান সৈন্যভুক্ত হইয়াছে'—এইরূপ সংবাদ পাইয়া তিনি সমরুর শিবিরে গেলেন। ইহা নিশ্চিত অল্প পরের কথা; অন্যথা তিনি সঙ্কল্পানুযায়ী কলিকাতা যাত্রা করিতেন।)

জন ষ্ট্যালকার্টরূপী ফষ্টর ধৃত হইল।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: শৈবলিনীকে লইয়া বেদগ্রাম আসিবার আনুমানিক তিন সপ্তাহ পরের কথা—৪ঠা সেপ্টেম্বর। (রমানন্দ স্বামী বলিতেছেন, "আগামী কল্য আমাদের দুই জনকে নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"): শৈবলিনীর উপর ঔষধ প্রয়োগ, যোগবলে অভিভূতা শৈবলিনী।

সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ: পর দিবস (উদয়নালার পরাজয়ের দিবস, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৬৩ খ্রী:): নবাবের শেষ দরবার; প্রতাপের আত্মাহুতি।

রাজসিংহ

কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ: ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক জেজেয়া পুনঃপ্রবর্ত্তন: ২রা এপ্রিল ১৬৭৯; ঔরঙ্গজেবের দিল্লী হইতে যাত্রা: ৩রা

---

১ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১লা জুলাই মার্কারের সহিত সঙ্ঘর্ষে এলিস সাহেবের চরম পরাজয়ের সংবাদ অবগত হওয়ার পর মীরকাসেম মুর্শিদাবাদে আমিয়টের 'গতিরোধে'র আদেশ পাঠাইয়াছিলেন। (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: মীর কাসিম, ১৩৫ পৃ: দ্রষ্টব্য)। সে ক্ষেত্রে আমিয়টের মৃত্যু হইয়াছে আরও ছয় সাত দিন পরে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এবং ঐ তারিখ গ্রহণ করিলে কাটোয়ার যুদ্ধের পর তকি খাঁর পত্রপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনরূপ কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে বঙ্কিম সয়ের মুতাক্ষরীণের 'অনুবর্ত্তী' হইয়াছেন। সুতরাং উক্ত গ্রন্থে আমিয়টের মৃত্যুর যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে সময় বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া কৈফিয়তের প্রয়োজন হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর, ১৬৭৯; আজমীর হইতে উদয়পুর যাত্রা: ৩০শে নবেম্বর; দেবারিতে তাঁবু স্থাপন: ৪ঠা জানুয়ারী, ১৬৮০; ঔরঙ্গজেব উদয়সাগর তীরে: ২৪শে জানুয়ারী; ঔরঙ্গজেবের মেবার ত্যাগ: ৬ই মার্চ্চ, ১৬৮০।[১]

প্রথম খণ্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: চঞ্চলকুমারী কর্তৃক ঔরঙ্গজেবের চিত্রদলনে কাহিনীর গোড়াপত্তন। ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী। টড্ সাহেব রূপনগরের রাজকুমারীকে উপলক্ষ্য করিয়া বাদশাহের সৈন্যের সহিত রাজসিংহের যে সঙ্ঘর্ষের বিবরণ দিয়াছেন, তিনি তাহার সন তারিখ উল্লেখ করেন নাই। আচার্য্য যদুনাথের মতে উপন্যাসের চঞ্চলকুমারী আসলে কিষণগড়ের রাজকুমারী চারুমতী এবং তাঁহাকে লইয়া ঔরঙ্গজেবের সহিত রাজসিংহের কোনরূপ সঙ্ঘর্ষ হয় নাই, পূর্ব্বেই ইহার উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং উপন্যাসের গোড়াতেই যে কাল্পনিক কাহিনী রহিয়াছে ঐতিহাসিক ঘটনা জেজেয়া পুনঃপ্রবর্ত্তনের তারিখ ধরিয়া তাহার সন তারিখ অনুমান করিয়া লইতে হইবে। উপন্যাসে (এবং টডের 'রাজস্থানে') রূপনগরের রাজকুমারীকে কাড়িয়া লওয়া জেজেয়া পুনঃপ্রবর্ত্তনের অন্যতম প্রত্যক্ষ কারণ। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঔরঙ্গজেবের চিত্রদলন হয়ত ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীর গোড়ার দিকের কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: পর দিবস: নির্ম্মলের নিকট চঞ্চলের গোপন বাসনার অভিব্যক্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: আনুমানিক মাসাধিক কাল পরের কথা: 'বিলক্ষণ অতিরঞ্জিত' করিয়া চিত্রবিক্রেতী কর্তৃক পুত্রের নিকট কাহিনীটি পরিবেশন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: অনূ্যন পক্ষকাল পরে: সংবাদটি রঙ্মহালে বিক্রয়ের জন্য দরিয়ার প্রতি উপদেশ; দরিয়ার রঙ্মহাল অভিমুখে যাত্রা।

দ্বিতীয় খণ্ড

রূপনগরের রাজকুমারীর অদৃষ্ট রঙ্মহালের ঈর্ষ্যা দ্বেষের সহিত জড়িত হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ: ১।৫এ বর্ণিত কাহিনীর জের। একই দিবস, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে: রঙ্মহালের পথে 'চাঁদনী-চৌকে' দরিয়ার সহিত মবারকের সাক্ষাৎ; দরিয়ার আগ্রহাতিশয্যে মবারকের অদৃষ্টগণনা।

---

১ আচার্য্য যদুনাথের History of Auranzib হইতে সংগৃহীত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জেব-উন্নিসার পরিচয়। ইহা পরবর্ত্তী কাহিনীর ভূমিকাস্বরূপ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত রাত্রি : রঙ্গমহালে জেব-উন্নিসা ও মবারক ; প্রত্যাবর্ত্তনের পথে পুনরায় দরিয়ার সহিত মবারকের সাক্ষাৎ এবং এই সাক্ষাতের ফলে পুনরায় জেব-উন্নিসা সমীপে মবারক। 'চাঁদনী-চৌকে' মবারকের প্রতি দরিয়ার আচরণ দরিয়া সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগায় ; এই সময় উভয়ের সংলাপ এবং অব্যবহিত পরে জেব-উন্নিসার নিকট প্রত্যা-বর্ত্তনান্তর তাঁহার নিকট মবারকের অনুরোধ এই ঔৎসুক্য বাড়াইয়া তোলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : একই রাত্রি : জেব-উন্নিসা ও দরিয়া : দরিয়া সম্বন্ধে রহস্যোদঘাটন ; দরিয়ার সংবাদ বিক্রয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : একই রাত্রি : উদিপুরীর নিকট সংবাদ পরিবেশন করিতে যাইয়া জেব-উন্নিসার উপদেশ ; উপদেশানুযায়ী বাদশাহের নিকট উদিপুরীর আবদার ; ঔরঙ্গজেবের শপথ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : হয়ত সপ্তাহকাল পরের কথা : রূপনগরে ঔরঙ্গজেবের আদেশ প্রচার। ঔরঙ্গজেবকে প্রতিনিবৃত্ত করার ব্যর্থ চেষ্টার পর যোধপুরী বেগম ইতিমধ্যেই যথাযথ উপদেশ দিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট দেবীকে প্রেরণ করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : রূপনগর অভিযানের পূর্ব্ব রাত্রি : জেব-উন্নিসা ও মবারক। বঙ্কিমের পরিবেশনগুণে সহসা নজরে না পড়িলেও এই সাক্ষাৎকার পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত রূপনগরে বাদশাহের আদেশ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বের কথা। মনে হয় রূপনগরে আদেশপত্র পাঠাইবার পর দুই একদিনের মধ্যেই ঔরঙ্গজেব রাজকুমারীকে আনিবার জন্য ফৌজ প্রেরণ করেন। কারণ বাদশাহের আদেশ রূপনগরে প্রচারিত হইবার পর কালবিলম্ব না করিয়া চঞ্চল ও নির্ম্মল কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক ; এবং তাঁহারা যেদিন অনন্ত মিশ্রকে উদয়পুরে মহারাণার নিকট পাঠাইলেন সেই দিনই মোগলসৈন্য রূপনগরে পৌঁছিল। (৩১৭)।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হয়ত রূপনগরে বাদশাহের আদেশপত্র প্রচারিত হইবার পর দিবস, কিংবা বড়জোর তৎপর দিবস : চঞ্চল-কুমারী ও নির্ম্মলের মন্ত্রণা—একই সময় দেবীর আগমন ; অনন্ত মিশ্রের উদয়পুর যাত্রা।

তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : তিন চারি দিন পরের কথা। ('এক

দিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া পর দিন প্রভাতে গমনকালে তাঁহাকে [অনন্ত মিশ্রকে] সঙ্গী খুঁজিতে হইল না।')

দস্যুকবলে অনন্ত মিশ্র, মানিকলালের নবজীবন লাভ, রাজসিংহ কর্তৃক চঞ্চলকুমারীর পত্রপ্রাপ্তি, রাজসিংহের সঙ্কল্প।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: রূপনগরে মোগলসৈন্য। ইহা রূপনগরে সম্রাটের আদেশ প্রচারিত হইবার দুই এক দিন পরের কথা। (২।৭এর সময় বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: হয়ত দুই এক দিন পরে: মেহেরজানরূপিণী দরিয়া।

নবম পরিচ্ছেদ: রাজসিংহের আনুগত্য স্বীকার করার পর কন্যার সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া মানিকলাল প্রথমে রূপনগরে মোগলসৈন্যের সন্ধান লইল, পরে মহারাণার সহিত যোগ দিল। হয়ত মোট দুই দিনের কাহিনী।

দশম পরিচ্ছেদ: একই দিবস, 'তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে': মহারাণার সহিত সাক্ষাতন্তে রূপনগরে যাইয়া ছদ্মবেশে মানিকলালের মোগলবাহিনীতে প্রবেশ। ইহা মোগলসৈন্যের রূপনগরে ছাউনি ফেলার পর পঞ্চম দিবস। (বিক্রম সোলাঙ্কির অনুরোধে 'সেনাপতি আর পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন।' ৩।৭।)

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পর দিবস প্রভাতে: চঞ্চলকুমারীকে লইয়া মোগলসেনাদলের দিল্লীযাত্রা।

তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: একই দিবস: মাণিকলালের চাতুর্য্যে রাজসিংহের জয়লাভ। যুদ্ধের ফাঁকে মানিকলালের 'একটি ছোট রকমের লাভ।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ: মানিকলাল ও নির্ম্মলের বিবাহ; 'রাণার সৈনিকদিগের মধ্যে [মানিকলালের] বিশেষ উচ্চ পদ লাভ' এবং সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্তি—হয়ত পক্ষকালের ইতিহাসের চুম্বক।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ: ৪।৬এ বর্ণিত মবারকের 'সহসা অশ্বসমেত অদৃশ্য' হওয়ার সূত্র ধরিয়া তাহার কাহিনী অনুসরণ: যুদ্ধান্তে দরিয়া কর্ত্তৃক মবারকের উদ্ধার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বিক্রম সোলাঙ্কির নিকট রাজসিংহের পত্রপ্রেরণ। হয়ত চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারের পর সপ্তাহকাল পরের কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কিঞ্চিদধিক পক্ষকাল পরের কথা: বিক্রম সোলাঙ্কির উত্তর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: আরও দুই একদিন পরে: চঞ্চলকুমারী ও নির্ম্মল --চঞ্চলের অনুরোধে তাঁহার সঙ্গিনীরূপে মহারাণার অন্তঃপুরে বাস করিতে নির্ম্মলের সম্মতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: একই দিবস, অপরাহ্ণ: ব্যবস্থানুযায়ী মহারাণার অন্তঃপুরে যাত্রাপথে নির্ম্মল কর্ত্তৃক চঞ্চলের অদৃষ্টগণনা। আখ্যায়িকায় নূতন জটিলতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেব--উভয় পক্ষে যুদ্ধোদ্যম। ইহা জেজেয়া পুনঃপ্রবর্ত্তনের অব্যবহিত পরের কথা।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ: রাজসিংহের পত্র লইয়া মানিকলালের এবং চঞ্চলের পত্র লইয়া নির্ম্মলের দিল্লীযাত্রা। ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাল্পনিক কাহিনীর সময় অনুমান করিয়া লইতে হইবে। বঙ্কিম জেজেয়া সম্বন্ধে রাজসিংহের যে পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (৫।৬) টডের 'রাজস্থানে' তাহার ইংরেজী অনুবাদ রহিয়াছে (প্রথম ভলুম, ২৫৩-৫৪ পৃঃ পাদটীকা), কিন্তু ঐ পত্র কবে প্রেরিত হয় টড্ তাহার তারিখ উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, বঙ্কিম কাহিনীর যেরূপ পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় রাজসিংহ জেজেয়ার প্রতিবাদে যে পত্র লিখিয়াছেন মানিকলাল সে পত্র লইয়া দিল্লী যাত্রা করে নাই; শুধু জেজেয়া নহে, 'রাজ্যে গোহত্যা করিতে দিতে হইবে, এবং দেবালয় সকল ভাঙ্গিতে হইবে'--রাজসিংহের 'তীব্রঘাতী' পত্র ঔরঙ্গজেবের এই উদ্ধত আদেশের প্রতিবাদ এবং এই পত্র লইয়াই মানিকলাল দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইয়া থাকিবে। সে ক্ষেত্রে মানিকলাল ও নির্ম্মলকুমারী এপ্রিলের শেষের দিকে দিল্লী যাত্রা করিয়াছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যথাবিধি সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক মানিকলাল ও নির্ম্মলকুমারীর দিল্লী প্রবেশ। 'যাইতে অনেক দিন লাগিল।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যেদিন উভয়ে দিল্লী পৌঁছিল সেই দিন অপরাহ্ণ: বাদশাহের দরবারে মানিকলাল, যোধপুরী বেগমের আশ্রয়ে নির্ম্মলকুমারী।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ: একই দিবস অধিক রাত্রে: 'নিমন্ত্রণপত্র' পেশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নির্ম্মলকুমারী ঔরঙ্গজেবের নিকট ধরা পড়িল; 'ক্ষুদ্রা রাজপুতকুলবালার' নিকট বাদশাহের পরাজয়; ঔরঙ্গজেব-নির্ম্মলকুমারী সংবাদের গোড়াপত্তন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: পর দিবস অপরাহ্ণ: পূর্ব্বপরিকল্পনানুযায়ী নির্ম্মল কর্ত্তৃক মানিকলালের নিকট সংবাদ প্রেরণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: হয়ত সপ্তাহকাল পরের কথা: জেব-উন্নিসার প্রতিহিংসা; বাদশাহের আদেশে মবারকের মৃত্যুদণ্ড।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: একই দিবস: মবারকের মৃত্যুসংবাদে জেব-উন্নিসার প্রতিক্রিয়া, মবারককে পুনর্জীবিত করার গোপন ব্যবস্থা।

নবম পরিচ্ছেদ: নির্ম্মলকুমারীর নির্দ্দেশমত পর দিবস ঊষাকালে মানিকলালের দিল্লী হইতে যাত্রা, যাত্রাপথে মবারকের আপাতমৃতদেহ প্রাপ্তি; প্রভাতে মানিকলালের চেষ্টায় মবারকের পুনর্জীবনলাভ; সন্ধ্যায় উভয়ের উদয়পুর যাত্রা; রাত্রে জেব-উন্নিসার 'চোখে জল' দেখিয়া দরিয়ার প্রতিহিংসা পরিতৃপ্তি।

সপ্তম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ: ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধযাত্রা (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৬৭৯ খ্রীঃ)। বঙ্কিম এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদের সহিত সময়ের ব্যবধানের উল্লেখ করিয়াছেন: 'রাজসিংহের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ঔরঙ্গজেবের যাত্রার যে বিলম্ব হইল, তাহার কারণ, তাঁহার সেনোদ্যোগ অতি ভয়ঙ্কর।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ঔরঙ্গজেব উদয়সাগরতীরে (২৪শে জানুয়ারী, ১৬৮০ খ্রীঃ): সংগ্রামের প্রস্তুতি; নির্ম্মলকুমারীর প্রতি মুক্তির নির্দ্দেশ, নির্ম্মলকুমারী কর্ত্তৃক বাদশাহকে পারাবত প্রদান এবং স্বেচ্ছায় যোধপুরী বেগমের মহালে অবস্থিতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: পর দিবস মোগল সওদাগরবেশী মবারকের ছলনায় সসৈন্য ঔরঙ্গজেবের রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ; উদিপুরী ও জেব-উন্নিসা বন্দিনী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: একই দিবস, অল্প পরের কথা: মবারকের আত্মগ্লানি, ক্ষণিকের জন্য জেব-উন্নিসার দর্শনাকাঙ্ক্ষা।

অষ্টম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ: একই দিবস রাত্রিকাল: জালবদ্ধ ঔরঙ্গজেব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পর দিবস সসৈন্য অনাহারে; অপরাহ্ণে নিরুপায়

ঔরঙ্গজেব সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নির্ম্মলকুমারীর পারাবত উড়াইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ৭।৩এ বর্ণিত দিবস: উদিপুরীর বায়নার প্রত্যুত্তরের প্রথম পর্ব্ব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: একই দিবস, রাত্রিকাল: জেব-উন্নিসার মবারকদর্শন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: পর দিবস (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত দিবস), প্রভাত-কাল: চঞ্চলকুমারীর নিকট জেব-উন্নিসার প্রার্থনা, উদিপুরীর বায়নার প্রত্যুত্তরের দ্বিতীয় পর্ব্ব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: একই দিবস, 'অর্দ্ধরাত্রি' অতীত হইলে: জেব-উন্নিসার পুনরায় মবারকদর্শন, উভয়ের পরিণয়।

সপ্তম, অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদ: পর দিবস, অর্থাৎ বাদশাহের সসৈন্য উপবাসের দ্বিতীয় দিবস: পারাবত মারফত ঔরঙ্গজেবের প্রার্থনা জানিয়া অমাত্যবর্গের সহিত মহারাণার পরামর্শ এবং পর দিবস প্রভাতে পারাবত মারফত ঔরঙ্গজেবের নিকট সন্ধির সর্ত্তজ্ঞাপন।

দশম পরিচ্ছেদ: একই দিবস: সর্ত্তানুযায়ী সন্ধিতে ঔরঙ্গজেবের সম্মতি, উদিপুরীর বায়নার প্রত্যুত্তরের শেষ পর্ব্ব, সসৈন্য ঔরঙ্গজেবের মুক্তি, উদিপুরী ও জেব-উন্নিসার বাদশাহের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন।

একাদশ পরিচ্ছেদ: আনুমানিক পক্ষকালের ইতিহাস: বিক্রম সোলাঙ্কির নিকট রাজসিংহের পত্র ও তাহার উত্তর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: অন্যদিকে ঔরঙ্গজেবের পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন; মবারকের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য আদেশ, দিলীর খাঁর প্রতি গোপন নির্দ্দেশ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: সময়ের ব্যবধান ক্ষীণ; ঔরঙ্গজেবের আদেশে যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্ব রাত্রি: জেব-উন্নিসা ও মবারকের মাঝখানে দরিয়ার ছায়া।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ: প্রায় একই সময়ের কথা: দিলীর খাঁর বিরুদ্ধে গোপীনাথ রাঠোর, বিক্রম সোলাঙ্কি ও মানিকলালের যুদ্ধযাত্রা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ: সময়ের ব্যবধান ক্ষীণ; দাইস্বরীর যুদ্ধক্ষেত্রে: দরিয়ার প্রতিহিংসা। টডের গ্রন্থে দাইস্বরীর গিরিবর্ত্মে দিলীর খাঁর সহিত গোপীনাথ রাঠোর ও বিক্রম সোলাঙ্কির সংঘর্ষ ও দিলীর খাঁর পরাজয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। (পরিশিষ্ট খ, ৫২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু টড্ এই সংঘর্ষের কোন তারিখ উল্লেখ করেন নাই। এই কারণে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাল্পনিক কাহিনীর সঠিক তারিখ নির্দ্দেশ করা সম্ভব না হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুমান করা চলে যে ইহা ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহের কথা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : বিজয়ী বিক্রম সোলাঙ্কি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে 'সেই রাত্রেই' রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারীর শুভপরিণয়।

আনন্দমঠ

কাহিনীর পটভূমিকা : ১১৭৬ সালের মন্বন্তর।

প্রথম খণ্ড

মোট দুই দিনের কাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ : জ্যৈষ্ঠের প্রভাতে কাহিনীর আরম্ভ : কন্যা সুকুমারীকে লইয়া মহেন্দ্র ও কল্যাণীর পদচিহ্নত্যাগ ; সন্ধ্যার পূর্ব্বে চটিতে আশ্রয়-গ্রহণ।

দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অল্প পরের কথা : মহেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার গ্রামবাসী কর্ত্তৃক কল্যাণী ও সুকুমারীকে অপহরণ, কল্যাণীর লোমহর্ষণ অভিজ্ঞতা, পলায়ন ও সত্যানন্দ ঠাকুরের আশ্রয়লাভ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : একই রাত্রি, 'রাত্রি অনেক' : ভবানন্দের প্রতি মহেন্দ্রের সন্ধানের নির্দ্দেশ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : হয়ত একই সময় : মহেন্দ্র সিপাহী হস্তে বন্দী।

অষ্টম, নবম ও দশম পরিচ্ছেদ : অল্প পরে : সন্তান কর্ত্তৃক ইংরেজের অর্থলুণ্ঠন, মহেন্দ্রের উদ্ধার, ভবানন্দ কর্ত্তৃক মহেন্দ্রের নিকট সন্তান-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা, স্ত্রী ও কন্যাকে ত্যাগ করিয়া সন্তানের ব্রতগ্রহণে মহেন্দ্রের অসম্মতি।

একাদশ পরিচ্ছেদ : পর দিবস প্রভাত : মহেন্দ্র কর্ত্তৃক "আনন্দমঠে"র বিভিন্ন মাতৃমূর্ত্তিদর্শন ; স্ত্রী ও কন্যার সহিত সাক্ষাতের পর ব্রতগ্রহণ করিবেন, এই উদ্দেশ্যে স্ত্রী ও কন্যার সহিত সাক্ষাৎ।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : অল্প পরে : কল্যাণীর আপাতমৃত্যু, সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র বন্দী, সত্যানন্দের ইঙ্গিতপূর্ণ সঙ্গীত : 'ধীরসমীরে'।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : একই দিবস, রাত্রি : মহেন্দ্রের চক্ষে সত্যানন্দ 'সিদ্ধ পুরুষ।'

পঞ্চদশ ও ষোড়শ পরিচ্ছেদ : ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত সত্যানন্দ

'ও মহেন্দ্রের বন্দিদশার অল্প পরের কথা : সুকুমারীকে লইয়া জীবানন্দের নিমাই-এর গৃহে গমন, সেখানে শান্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : জীবানন্দ সুকুমারীকে লইয়া যাওয়ার অল্প পরে : ভবানন্দের চেষ্টায় কল্যাণীর মৃতকল্প দেহে প্রাণসঞ্চার।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : একই দিবস, রাত্রিকাল, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরের কথা : সন্তানেরা কারাগার ভাঙ্গিয়া সত্যানন্দ 'ও মহেন্দ্রকে মুক্ত করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : শান্তির পূর্ব্বপরিচয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ১।১৬এ বর্ণিত কাহিনীর জের : জীবানন্দ চলিয়া গেলে শান্তির সঙ্কল্প ; 'রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে' সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পর দিবস অপরাহ্ণ : মায়ের কার্য্যে সত্যানন্দের তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প, জীবানন্দ 'ও ভবানন্দের প্রতি তাঁহার উপদেশ।

চতুর্থ, পঞ্চম 'ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : একই দিবস, 'সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে' সত্যানন্দ কর্ত্তৃক মহেন্দ্র 'ও ছদ্মবেশিনী শান্তিকে দীক্ষাদান এবং মহেন্দ্রের প্রতি কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : অব্যবহিত পরের কথা : শান্তি সত্যানন্দকে ফাঁকি দিতে পারে নাই ; মহেন্দ্রকে বিদায় দিয়া তিনি শান্তির পরিচয় জানিয়া লইলেন এবং তাহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া সে রাত্রির জন্য মঠে বাস করার অনুমতি দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : একই রাত্রি : জীবানন্দ 'ও শান্তির কৌতুকচিত্র।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : পরবর্ত্তী প্রায় চারি বৎসরের ইতিহাস। বঙ্কিম কৌশলে পূর্ব্ববর্ণিত এবং পরবর্ত্তী ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধানের উল্লেখ বা ইঙ্গিত করিয়াছেন :

১। ভবানন্দ কল্যাণীকে বলিতেছেন, 'আজি চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না।' (৩।৪)।

২। জীবানন্দ শান্তিকে বলিতেছেন, "একটা ঘোর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই।" (৩।৩)। এই সংগ্রামে কাপ্তেন টমাসের মৃত্যু হয়। (৩।১১)। এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী (মাঘ, ১১৭৯) তারিখে লিখিত ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের পত্রে কাপ্তেন টমাসের মৃত্যুর উল্লেখ রহিয়াছে। (শত-

বার্ষিক সংস্করণের Appendix I দ্রষ্টব্য।) এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে এই পত্র তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পরে লিখিত হইয়াছে।

৩। অল্প দিন পরে অনুরূপ সংগ্রামে মেজর এড্‌ওয়ার্ডস্ পরাজিত হন। এই পরাজয়ের তারিখ বাংলা ১১৭৯ সালের মাঘী পূর্ণিমা। (৪।৬ এর সময় বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)।

[ওয়ারেন্ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক লিখিত ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চের (ফাল্গুন, ১১৭৯) পত্রে সন্ন্যাসীদের সহিত সংঘর্ষে কাপ্তেন এড্‌ওয়ার্ডসের মৃত্যুর উল্লেখ রহিয়াছে। Appendix I]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কাপ্তেন টমাস ও শান্তির কৌতুকাবহ কাহিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: অব্যবহিত পরে: জীবানন্দ ও শান্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সম্ভবতঃ অব্যবহিত পূর্ব্ব দিবস (সপ্তম পরিচ্ছেদের সময় বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য): ভবানন্দ কল্যাণীর নিকট দুষ্টক্ষত অনাবৃত করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ঐ দিবস, রাত্রি: ধীরানন্দ কর্ত্তৃক ভবানন্দের পরীক্ষা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: একই রাত্রি, 'ঘোর তমোময়ী': নেপথ্যে সত্যানন্দ ভবানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: তৃতীয় পরিচ্ছেদে জীবানন্দ ও শান্তির সংলাপের অব্যবহিত পরে: শান্তির নিকট সত্যানন্দের পরাজয়। এই সময় সত্যানন্দ শান্তির সহিত উচ্চকণ্ঠে গান গাহিয়াছেন, অর্থাৎ এখন আর গোপনে সন্তান-সম্প্রদায়ের গতিবিধি লক্ষ্য করার প্রয়োজন নাই। এই কারণেই মনে হয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনা পূর্ব্ব দিন দিবা ও রাত্রির কথা।

অষ্টম হইতে একাদশ পরিচ্ছেদ: অল্প দিন পরে: কাপ্তেন টমাসের সহিত সন্তানসেনার সংঘর্ষ ও ভবানন্দের প্রায়শ্চিত্ত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: একই দিবস যুদ্ধান্তে—'রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিয়াছে': রণজয়ী সত্যানন্দের সম্মুখে মহাপুরুষ চিকিৎসকের আবির্ভাব।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ: একই রাত্রি: কল্যাণীর অভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পর দিবস প্রভাতকাল: মহেন্দ্র ও কল্যাণীর পুনর্মিলন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: একই দিবস, অল্প পরের কথা: সুকুমারীকে ফিরাইয়া দিবার সময় নিমাই-এর চিত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ৩।৬-এ বর্ণিত দিবসের পক্ষকাল পরের কথা। : সে রজনী ছিল 'ঘোর তমোময়ী', 'এক্ষণে মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত।' মিথ্যা সংবাদে প্রতারিত করিয়া মেজর এড্‌ওয়ার্ডসের পদচিহ্ন আক্রমণের পরিকল্পনা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : একই দিবস : শান্তির কৌশলে পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : একই দিবস, রাত্রি—মাঘী পূর্ণিমা : মেজর এড্‌ওয়ার্ডসের সহিত সন্তানসেনার সংঘর্ষ, মেজর এড্‌ওয়ার্ডসের পরাজয়।

সপ্তম ও অষ্টম পবিচ্ছেদ : যুদ্ধান্তে মহাপুরুষ চিকিৎসক কর্তৃক জীবানন্দের মৃতকল্প দেহে প্রাণসঞ্চার এবং শান্তির সহিত জীবানন্দের এবং একই রাত্রে মহাপুরুষ চিকিৎসকের সহিত সত্যানন্দের হিমালয়প্রয়াণ।

দেবী চৌধুরাণী

ঐতিহাসিক তথ্য : ভবানী পাঠকের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ এবং এই সংঘর্ষে ভবানী পাঠকের মৃত্যু ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস (শতবার্ষিক সংস্করণে আচার্য্য যদুনাথ লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য), অর্থাৎ বাংলা ১১৯৪ সালের আষাঢ়/শ্রাবণ মাসের কথা।

উপন্যাসে ভবানী পাঠকের পরিণতি অন্যরূপ। কিন্তু প্রফুল্ল যখন রাণীগিরি ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যজীবন বরণ করিয়া লইল তখন দেবী চৌধুরাণীর সহিত ডাকাত ভবানী পাঠকেরও মৃত্যু হইল। এক হিসাবে ইহাই ভবানী ঠাকুরের মৃত্যু! এবং ইহার তারিখ যদি ১১৯৪ সালের প্রথম দিকে, এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উপন্যাসের কাহিনীর আরম্ভ এগার বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১১৮৩ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকে। (১।৭ ও ২।১ এর সময় বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রভাতকাল : মায়ের সহিত প্রফুল্লের ভাগ্যপরীক্ষার্থ শ্বশুরবাড়ী যাত্রা।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বেলা তৃতীয় প্রহর : প্রফুল্লের মা এবং শাশুড়ীর কোন্দল, প্রফুল্লের হইয়া শাশুড়ীর শ্বশুরের নিকট দরবার করিতে

গমন, সাগরের সহিত প্রফুল্লের পরিচয় (ইহা যেমন ভবিষ্যতের ভূমিকা, তেমনই শ্বশুরের নিকট দরবার করিয়া ফিরিয়া আসিতে শাশুড়ীর যে সময় লাগিতে পারে তাহার ইঙ্গিত করে), শাশুড়ীর চেষ্টার ব্যর্থতা, শাশুড়ীর মারফত শ্বশুরের নিকট প্রফুল্লের প্রশ্ন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: একই দিবস, সন্ধ্যার পর: সাগর, প্রফুল্ল ও নয়ান বৌ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: একই দিবস, রাত্রি: ব্রজেশ্বরের প্রতি প্রফুল্ল সম্বন্ধে হরবল্লভের নির্দেশ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: একই রাত্রি: কিছুকাল পরে সাগরের অনুকম্পায় প্রফুল্লের তীর্থ দর্শন; পর দিবস প্রভাতে প্রফুল্লের বিদায় গ্রহণ, বিদায়ের পূর্ব্বে নয়ান বৌ-এর মুখে শ্বশুরের নিকট তাহার প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: প্রফুল্লের মাতার মৃত্যু এবং তাঁহার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী পাঁচ ছয় মাসের ইতিহাস।

প্রফুল্ল যে রাত্রে গৃহহারা হইয়াছে সেই রাত্রে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাহার শ্বশুরালয়ে সংবাদ পৌঁছায় এবং ইহার দশ বৎসর পরে দেবী চৌধুরাণীরূপে সে ব্রজেশ্বরকে অর্থসাহায্য করে। (ব্রজেশ্বরের স্বগতোক্তি 'এ কি প্রফুল্ল? সে যে দশ বৎসর মরিয়াছে!' স্মরণীয়—২।৮)। এই গেল একদিকের হিসাব, অন্যদিকে সাগরের সহিত প্রফুল্লের প্রথম সাক্ষাৎকালে সাগরের বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর (১।৩), প্রফুল্লের সহিত পুনঃসাক্ষাৎকালে (ইহা পূর্ব্বোক্ত অর্থসাহায্যের অব্যবহিত পূর্ব্বের কথা) তাহার বয়স পঁচিশ (২।৬ দ্রষ্টব্য), অর্থাৎ মাঝখানে ব্যবধান এগার বৎসর। এই উভয় জিনিষের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া দেখা যায় প্রফুল্ল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অন্ততঃ পাঁচ ছয় মাস পরে তাহার মাতার মৃত্যু হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: মাতৃশ্রাদ্ধের পর দিবস গভীর রাত্রে ফুলমণির সহায়তায় দুর্লভ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রফুল্লের অপহরণ; প্রফুল্লের মুক্তি এবং পর দিবস নিবিড় বনমধ্যে ভগ্ন অট্টালিকায় মুমূর্ষু কৃষ্ণগোবিন্দ দাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ; অপরাহ্নে বৃদ্ধের মৃত্যু।

নবম পরিচ্ছেদ: একই দিবস, রাত্রি: প্রফুল্লের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি।

দশম পরিচ্ছেদ: একই দিবস: ফুলমণির কাহিনী, প্রফুল্ল সম্বন্ধে 'আষাঢ়ে গল্প।'

একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির পর দিবস: পাঠক ঠাকুরের সহিত প্রফুল্লের সাক্ষাৎ এবং শিষ্যত্বগ্রহণে তাহার সম্মতি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : একই দিবস : প্রফুল্ল ও নিশিঠাকুরাণী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ব্রজেশ্বরের ব্যর্থ আগমন—ইহা প্রফুল্লের অপহরণের রাত্রিতে এই দুর্ঘটনার অল্প পরের কথা —প্রফুল্লের মৃত্যুসংবাদে তাঁহার কঠিন ব্যাধি ও ব্যাধিমুক্তি। মোটের উপর তিন চারি মাসের কথা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : প্রফুল্লের পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : জ্ঞানাত্মক শিক্ষার পর কর্ম্মাত্মক শিক্ষার উদ্যোগ।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : কর্ম্মাত্মক শিক্ষান্তে অর্থাৎ, আরও পাঁচ বৎসর পরে ; মোটের উপর প্রফুল্ল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার এগার বৎসর পরে : প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণী ; হরবল্লভের বিপদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পিতার বিপদে সাহায্যের আশায় ব্রজেশ্বরের শ্বশুরালয়ে গমন। একই সময়ে সাগরের নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে যাইয়া প্রফুল্ল যে নূতন জটিলতা সৃষ্টি করিল তাহাই শেষ পর্য্যন্ত আখ্যায়িকার গতি নির্দ্ধারণ করিল।

তৃতীয় হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদ : সম্ভবতঃ একই দিবস, রাত্রিকাল : ব্রজেশ্বরের বজরায় ডাকাতির ভান, সাগরের পণরক্ষা, ব্রজেশ্বরকে প্রয়োজনীয় অর্থদান, তখন বর্ষাকাল, 'বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে' ঋণপরিশোধের প্রতিশ্রুতি এবং সাগরকে লইয়া ব্রজেশ্বরের বিদায়ের পর প্রফুল্লের চিত্র।

নবম পরিচ্ছেদ : পর দিবস প্রভাতকাল : আঙ্গটির মাধ্যমে ব্রজেশ্বরের দেবী চৌধুরাণীর পরিচয়প্রাপ্তি।

দশম পরিচ্ছেদ : একই দিবস : ভবানী পাঠকের সহিত দেবী চৌধুরাণীর সাক্ষাৎ, 'আগামী সোমবার' (বার নির্দ্দেশ করিয়া বঙ্কিম কাহিনীতে বাস্তবের রূপ দিয়াছেন) দেবীর দরবারের দিন ধার্য্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ : দেবীর দরবার ; রাণীগিরির নমুনা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : ব্রজেশ্বরের অর্থপ্রাপ্তির দুই একদিন পরের কথা : পিতাকে অর্থদান এবং ঋণপরিশোধ সময় ও স্থান নির্দ্দেশ, হরবল্লভের দুরভিসন্ধি।

তৃতীয় খণ্ড

সময়ের ব্যবধান আনুমানিক আট নয় মাস। দেবী চৌধুরাণী যখন ব্রজেশ্বরকে অর্থদান করিয়াছে তখন বর্ষাকাল, হয়ত শ্রাবণ মাস, তৃতীয় খণ্ডের

কাহিনীর সময় বৈশাখ মাস। এই প্রসঙ্গে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে: দেবী চৌধুরাণীকে দেখিয়া প্রফুল্লকে স্মরণ হওয়ায় ব্রজেশ্বর ভাবিলেন, "সে যে দশ বৎসর মরিয়াছে।"—পূর্ব্বেই ইহার উল্লেখ করিয়াছি; অথচ, প্রফুল্ল যখন নূতন বৌরূপে শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করিল, তখনও পরিচয় পাইয়া হরবল্লভ বলিলেন, "সে যে দশ বৎসর হলো ম'রে গেছে।" (৩।১২)। এই উভয় জিনিসের সামঞ্জস্য কোথায়? ইহার উত্তর এই যে প্রথমোক্ত ঘটনা দশ বৎসরের গোড়ার দিকের এবং শেষোক্ত ঘটনা দশ বৎসরের শেষের দিকের কথা।

প্রথম হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদ: বৈশাখের শুক্লা সপ্তমীর বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলী।

নবম পরিচ্ছেদ: পর দিবস প্রভাতের কাহিনী: লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট্‌ ব্রেনানের মুক্তি, হরবল্লভকে লইয়া নিশির কৌতুক।

দশম পরিচ্ছেদ: একই প্রভাত: ব্রজেশ্বর কর্ত্তৃক পিতার নিকট প্রফুল্লের পরিচয় দিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবার ভারগ্রহণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ: একই দিবস: প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: প্রফুল্ল শ্বশুরালয়ে; পৌঁছিতে হয়ত দুই তিন দিন সময় লাগিয়া থাকিবে: দূরত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিম রঙ্গরাজের মারফত জানাইয়াছেন, 'ডাঙ্গা-পথে ভূতনাথে একদিনে যাওয়া যাইতে পারে।' (৩।৯)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: শ্বশুরালয়ে নূতন কর্ম্মজীবনে দীক্ষা এবং নূতন পরিবেশে অভাবনীয় সাফল্য।

সীতারাম

কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ: সীতারামের সনন্দলাভ: ১৬৮৭।৮৮ খ্রীঃ; ভূষণা দখল: ১৭১২ খ্রীঃ; সীতারামের পরাজয়: ফেব্রুয়ারী, ১৭১৪ খ্রীঃ।

সীতারাম গ্রন্থরচনার 'প্রায় একশত আশী বৎসর পূর্ব্বে' আখ্যায়িকার গোড়াপত্তন। (১।১)। 'সীতারামে'র প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস, সুতরাং আনুমানিক ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে কাহিনীর আরম্ভ। তখন ভূষণা মুসলমান ফৌজদারের শাসনাধীন ছিল।

এই হিসাব অনুসারে সীতারামের সনন্দলাভ কাহিনী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বের ঘটনা। কিন্তু উপন্যাসের প্রয়োজনে ইহা পরবর্ত্তীকালের এবং ভূষণা দখলের অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (৩।১ এর সময় বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)।

প্রথম পরিচ্ছেদ: রাত্রিশেষে গঙ্গারামের অপরাধ (?), অপরাহ্নে গ্রেপ্তার, সায়াহ্নে বিচার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: একই সায়াহ্ন: সীতারামের নিকট শ্রীর গঙ্গা-রামকে উদ্ধার করার প্রার্থনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: একই দিবস, রাত্রিকাল: উদ্যোগপর্ব্ব।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ: পর দিবস: গঙ্গারামের উদ্ধার এবং সীতারামের নির্দ্দেশে তাহার শ্যামপুর যাত্রা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: একই দিবস: শ্রীকে লইয়া সীতারামের নিরাপদ স্থানে যাত্রা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: একই দিবস রাত্রি: কোষ্ঠীর ফল জানিয়া শ্রীর পলায়ন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: শ্রীর পলায়নের পর প্রথম সপ্তাহ: ব্যর্থ অন্বেষণ।

নবম পরিচ্ছেদ: আনুমানিক বৎসরাধিক কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: শ্যামপুরে নগরীস্থাপন, নূতন নাম মহম্মদপুর; মহম্মদপুরের সমৃদ্ধি; ইহাতে তোরাব্ খাঁর সন্দেহ।

দশম পরিচ্ছেদ: একই সময়ের কথা: শ্রীর অদৃশ্য আকর্ষণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ: বৈতরিণীতীরে শ্রী ও জয়ন্তী। ইহা সীতারামের নিকট হইতে শ্রীর পলায়নের চারি বৎসর পরের কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপন্যাসের কাহিনীর আরম্ভ ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ঐ সময় কোষ্ঠীর ফলাফল জানিয়া শ্রী সীতারামের নিকট হইতে পলায়ন করে। অন্যদিকে সীতারাম ভূষণা দখল করেন ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাহিনী তাহার এক বৎসর পূর্ব্বের কথা—বৎসরান্তে গঙ্গাধর স্বামীর নির্দ্দেশানুযায়ী জয়ন্তী ও শ্রী মহম্মদপুরে গমন করে এবং ঐ সময় জয়ন্তীর আনুকূল্যেই সীতারামের পক্ষে তোরাব্ খাঁর আক্রমণ ব্যর্থ করা সম্ভব হয়। অন্যত্রও বঙ্কিম দীর্ঘ ব্যবধানের উল্লেখ করিয়াছেন: 'বৎসরের পর বৎসর গেল, এই কয় বৎসর সীতারাম.... শ্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন।' (২।১)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: পর দিবস: জয়ন্তী ও শ্রীর গঙ্গাধর স্বামীর উদ্দেশ্যে যাত্রা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: পর দিবস প্রভাতকাল: গঙ্গাধর স্বামী কর্ত্তৃক শ্রীর অদৃষ্টগণনা এবং আগামী বৎসর তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুজ্ঞা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : অব্যবহিত পরে : শ্রী ও জয়ন্তীর পুরুষোত্তমযাত্রা।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : ১১১১-১৪ এ বর্ণিত কাহিনীর সমসাময়িক কাল পর্য্যন্ত সীতারামের কাহিনী—সীতারামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তোরাব্ খাঁর উদ্যোগ, সীতারামের তরফ হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এবং পরে দিল্লী যাত্রা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সীতারামের অনুপস্থিতিতে রমার দুশ্চিন্তা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তোরাব্ খাঁর আক্রমণের উদ্যোগের সংবাদে মহম্মদপুরে সন্ত্রাস। ইহা সীতারামের দিল্লীযাত্রার সাত আট মাস পরের কথা।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ : এক দিবস রাত্রে রমার আহ্বানে রাজ-অন্তঃপুরে তাহার সহিত গঙ্গারামের সাক্ষাৎ—আখ্যায়িকায় নূতন জটিলতার সৃষ্টি।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ : কয়েক রাত্রি সাক্ষাতের পর রমা যখন নিজের ভুল বুঝিল তখন গঙ্গারাম সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল ; গঙ্গারাম 'রমা ও সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা করিল।' ইহা প্রথম সাক্ষাতের আনুমানিক পক্ষকাল পরের কথা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : গঙ্গাধর স্বামীর নির্দ্দেশে জয়ন্তী ও শ্রীর মহম্মদপুর যাত্রা। ইহা গঙ্গাধর স্বামীর সহিত শ্রীর সাক্ষাতের বৎসরেক পরের কথা।

নবম পরিচ্ছেদ : গঙ্গারামের পক্ষ হইতে বন্দে আলির দৌত্য (ইহা গঙ্গারামের প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর দিবসের কথা) ; চাঁদশাহ ফকিরের সতর্কতা।

দশম পরিচ্ছেদ : এক দিন পরে : রাত্রিকালে তোরাব্ খাঁর সহিত গঙ্গারামের গোপন ষড়যন্ত্র।

একাদশ পরিচ্ছেদ : পর দিবস : গঙ্গারামের পরামর্শানুযায়ী তোরাব্ খাঁর চক্রান্ত, সন্ধ্যার পর বিভ্রান্ত মৃণ্ময়ের 'দক্ষিণ পথে যাত্রা', সহসা রাত্রি-কালে জয়ন্তী ও শ্রীর আবির্ভাব।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : একই রাত্রি : ভৈরবীরূপিণী জয়ন্তী কর্ত্তৃক পুরীরক্ষার ভারগ্রহণ এবং তাহার আনুকূল্যে সদ্যপ্রত্যাগত সীতারাম কর্ত্তৃক পুরীরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : পরদিবস প্রভাতকাল : গঙ্গারাম ও তোরাব্ খাঁর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ এবং গঙ্গারাম কারারুদ্ধ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : একই দিবস রাত্রি : মৃণ্ময়ের বিজয় সংবাদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : একই দিবস : জয়ন্তী ও শ্রী ; আত্মপরীক্ষার পূর্ব্বে সীতারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে শ্রীর অসম্মতি।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : ভূষণা দখলের পর গঙ্গারামের বিচার ও রমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে দরবারের সঙ্কল্প।

সীতারাম সনন্দ লাভ করেন ১৬৮৭।৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভূষণা দখল করেন ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ এই উভয় ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ২৪।২৫ বৎসর। কিন্তু উপন্যাসে দেখিতে পাই সনন্দ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরে সীতারাম তোরাব্ খাঁর আক্রমণ ব্যর্থ করেন এবং ভূষণা দখল ইহার অল্প পরের কথা। কাহিনীর ক্ষিপ্র গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য এই সময়-সঙ্কোচন প্রয়োজন হইয়াছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হয়ত তিন চারি দিন পরের কথা : জয়ন্তীর দ্বারা প্রভাবিত অবস্থায় গঙ্গারামের স্বীকারোক্তি, গঙ্গারামের মৃত্যুদণ্ডাদেশ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হয়ত সপ্তাহকাল পরের কথা : অভিষেক উপলক্ষ্যে গঙ্গারামের দণ্ড স্থগিত রহিয়াছে : অভিষেক দিবসে জয়ন্তীর প্রার্থনায় গঙ্গা-রামের দণ্ডাদেশ রহিত, বিনিময়ে সীতারামের শ্রীকে প্রার্থনা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : একই দিবস, নিশীথকাল : গঙ্গারামের মুক্তি।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ : হয়ত একই সময়ে সীতারামের সম্মুখে শ্রীর আবির্ভাব ; কিন্তু এ শ্রী সীতারামের শ্রী নহে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : 'চিত্তবিশ্রামে' সীতারাম ও শ্রীর চিত্র—আনুমানিক বৎসরেক কালের কাহিনীর চুম্বক।

নবম পরিচ্ছেদ : শ্রীর আবির্ভাবের বৎসরেক কাল পরের কথা : রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের সংলাপ—ধ্বংসের পথে মহম্মদপুর।

দশম পরিচ্ছেদ : একই সময়ে রাজ্যলিপ্সু ও শ্রীর সান্নিধ্যকামী সীতারামের দ্বিধাগ্রস্ত মনের চিত্র।

একাদশ পরিচ্ছেদ : একই সময়ে অবহেলিত রমার চিত্র।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : অল্পদিন পরের কথা : রমার মৃত্যু ; রমার মৃত্যুতে সীতারামের প্রতিক্রিয়া।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : পর দিবস, দরবার : সীতারামের বুদ্ধিভ্রংশ, রাজাদেশে 'লঘুপাপে গুরুদণ্ড।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : আরও কয়েকদিন পরে : সীতারামের শাসন প্রজা-পীড়নের নামান্তর মাত্র ; শ্রীর সম্বন্ধে সীতারামের পৈশাচিক সঙ্কল্প।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : একই রাত্রে সীতারামেব অনুপস্থিতিতে জয়ন্তীর সাহায্যে শ্রীর পলায়ন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : শ্রীর পলায়নের পর তৃতীয় দিবস : রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের সংলাপের ভিতর দিয়া পর দিবস জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে, এই সংবাদ পরিবেশন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : পর দিবস : সীতারামের চরম অধঃপতনের চিত্র ; নন্দার তৎপরতায় রাজা ও রাজ্যেব মর্য্যাদাবক্ষা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর আনুমানিক চারি পাঁচ মাসের চিত্র : 'চিত্তবিশ্রামে' ব্যভিচারের সমারোহ ; চন্দ্রচূড় ও চাঁদশাহ ফকিরের মহম্মদপুর ত্যাগ।

বিংশ পরিচ্ছেদ : শ্রীকে লইয়া জয়ন্তীর মহম্মদপুর অভিমুখে যাত্রা। সীতারামের রাজধানী ত্যাগ করিয়াই জয়ন্তী বুঝিয়াছে তাহাকে সীতারামের উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে যত শীঘ্র সম্ভব শ্রীকে লইয়া সে মহম্মদপুরে ফিরিয়াছে। কিন্তু শ্রীকে জয়ন্তী কোন্ গ্রামে কোন্ রাজপুরোহিতের নিকট যাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছিল তাহা অনির্দ্দিষ্ট রাখিয়া তাহাদের ফিরিতে কতদিন সময় লাগিতে পারে—বঙ্কিম কৌশলে এই প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন। ফলে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ সময় অনুমিত হইলেও, এই পরিচ্ছেদে মনে হয় জয়ন্তীর মহম্মদপুর ত্যাগ এবং শ্রীকে লইয়া তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ক্ষীণ। এইরূপে কুশলী শিল্পী কাহিনীর ক্ষিপ্রগতি অব্যাহত রাখিয়াছেন।

একবিংশতিতম ও দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ : মুসলমান কর্ত্তৃক মহম্মদপুর আক্রমণ ; সীতারামের চৈতন্যোদয় ; সীতারামের পার্শ্বে নন্দার সহিত শ্রী ও তাঁহাদের শুভানুধ্যায়িনী জয়ন্তী।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ : একই দিবস : শ্রী 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' ; সীতারামের রাজ্যধ্বংস। (ফেব্রুয়ারী, ১৭১৪ খ্রীঃ)।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ : একই দিবস সন্ধ্যায় জয়ন্তী ও শ্রীর অনির্দ্দেশ যাত্রা।

নির্ঘণ্ট

ত

দ

ধ

ন

প

ভ

ম

হ